রচনা বিচিন্তা

পি. আচার্য

প্রধান অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, হেরম্বচন্দ্র কলেজ [সিটি কলেজ, দক্ষিণ কলিকাতা, দিবা শাখা] ও ভূতপূর্ব অধ্যাপক, উমেশচন্দ্র কলেজ [সিটি কলেজ, সূর্য সেন স্ট্রীট, প্রভাতী শাখা] এবং পরীক্ষক,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

রবীন্দ্র লাইব্রেরী
১৫/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা : ৭০০ ০১২

প্রকাশক
শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
১৫/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০১২

প্রথম সংস্করণ : ১৯৩৯

প্রচ্ছদ :
শ্রীপ্রভাত কর্মকার

মুদ্রাকর :
শ্রীযামিনীভূষণ উকিল
দি মুকুল প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৯এ, বিধান সরণি
কলিকাতা-৭০০ ০০৬
ও
শ্রীনিশীথকুমার ঘোষ
দি সত্যনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৯এ, বিধান সরণি
কলিকাতা-৭০০ ০০৬
এবং
শ্রীগঙ্গারাম পাল
মহাবিদ্যা প্রেস
১৫৩, তারক প্রামাণিক রোড
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

মাধ্যমিক রচনা বিচিন্তার বৈশিষ্ট্য

- পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষতের মাধ্যমিক নবম ও দশম শ্রেণীর নব-বিন্যস্ত পাঠ্যসূচী অনুযায়ী লিখিত ও পর্ষৎ কর্তৃক অনুমোদিত।
- সাতান্নটি সুলিখিত **প্রবন্ধ** এবং ষাটটি **প্রবন্ধ-সংকেত** সন্নিবেশিত, যাদের অনুসরণে আরো প্রায় ৪০০টি নতুন প্রবন্ধ স্বাধীনভাবে লেখা যেতে পারে।
- প্রতিটি প্রবন্ধের **শীর্ষে প্রবন্ধ-সূত্রাকারে** প্রবন্ধে-আলোচিত সকল প্রসঙ্গ সন্নিবেশিত ; যা পরীক্ষায় দ্রুত-প্রস্তুতির সহায়ক।
- প্রতিটি প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ-সংকেতের **পাদ-টীকায় প্রবন্ধের অনুসরণে** আরো কি কি নতুন প্রবন্ধ রচিত হতে পারে, তার উল্লেখ আছে।
- সামান্য পরিশ্রমে প্রবন্ধ-সংকেতগুলি থেকে পূর্ণায়তন প্রবন্ধ রচনা করা যেতে পারে।
- প্রবন্ধগুলির মধ্যে ***প্রধানমন্ত্রীর বিশদফা কর্মসূচী, *বর্তমান জরুরী অবস্থার গুরুত্ব, *ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ : আর্যভট্ট, *অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী** বিষয়ক নানা প্রবন্ধ এবং ***বিদ্যালয়-জীবনের প্রথম দিনের স্মৃতি, বাংলার গ্রাম, রূপসী বাংলা ও তাহার ঋতু-বৈচিত্র্য, ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে বাংলার রূপ-বিস্তার** ছাড়াও অতি-সাম্প্রতিক বিষয়াবলী নিয়ে রচিত বহু প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয়েছে। যেমন : ***ভারতের প্রথম পরমাণু-বোমা, *নগর-সজ্জা, *বিদ্যালয়ে শেষদিনের স্মৃতি, *পরীক্ষার পূর্বরাত্রি, *পরীক্ষা-মন্দিরের দৃশ্য, *গৃহ-সজ্জা, ভারতীয় জীবনে রামায়ণের প্রভাব, *তোমার ভালোলাগা একটি চলচ্চিত্র** ইত্যাদি।
- ভারতের বিভিন্ন দিক্-দিগন্ত নিয়ে ১৬টি এবং বাংলার বিভিন্ন দিক্-দিগন্ত নিয়ে মোট প্রায় ২০টি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয়েছে।
- মহাপুরুষগণের জীবনী-বিষয়ক প্রবন্ধ ১৬টি।
- উদ্ধৃতি-বাক্য নিয়ে রচিত প্রবন্ধ-সংখ্যা ১৯।
- তাছাড়া বিজ্ঞান, বাণিজ্য, সাহিত্য, অর্থনীতি, ইতিহাস, সংস্কৃতি, সমাজ, মানবচরিত্রের গুণাবলী ও আদর্শমূলক প্রবন্ধ সুপ্রচুর।
- **বঙ্গানুবাদে হাতে-কলমে অনুবাদ** শেখার পদ্ধতিটি কেবলমাত্র এই বইতে পাওয়া যাবে। সেজন্যে বঙ্গানুবাদ অংশটিকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে।
- ভাবার্থ ও ভাব-সম্প্রসারণের জন্য সুনির্বাচিত রচনাংশ [আলোচনা ও সংকেতসহ] প্রদত্ত হয়েছে।
- সর্ববিষয়ে **সহজবোধ্যতা ও সাবলীলতা** গ্রন্থটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য।
- ব্যাকরণে প্রতি অধ্যায়ের আলোচনার শেষে সুবিস্তৃত ও সুচিন্তিত অনুসরণী [কোথাও কোথাও সংকেত-সহ] প্রদত্ত হয়েছে। তাছাড়া রয়েছে **পাঠ্যগ্রন্থের প্রয়োজনীয় ব্যাকরণ**।
- **অতিরিক্ত সংযোজনে** নতুন নতুন প্রবন্ধ, প্রবন্ধ-সংকেত, প্রচুর ভাবার্থ, ভাবসম্প্রসারণ, গল্পরচনা ও অনুবাদ সংযোজিত।

প্রকাশক

SYLLABUS FOR REORGANISED PATTERN OF SECONDARY EDUCATION [IX & X]

মাতৃভাষা [প্রথম ভাষা]

প্রথম পত্র : [লেখ্য বিষয় ৮০ + মৌখিক ২০] = ১০০

১.	কাব্য পাঠ্যগ্রন্থ	৩০
২.	প্রবন্ধ	২০
৩.	ইংরাজী হইতে বঙ্গানুবাদ	১০
৪.	ভাব-সম্প্রসারণ/সারাংশ	১০
৫.	সহায়ক পাঠ [কাব্য]	১০
৬.	মৌখিক	২০
		১০০

দ্বিতীয় পত্র : [লেখ্য বিষয় ৮০ + মৌখিক ২০] = ১০০

১ ক.	গদ্য পাঠ্যগ্রন্থ	৩০
খ.	পাঠ্যবিষয়গত ব্যাকরণাংশ	১০
২.	ব্যাকরণ	২৫
৩.	সহায়ক পাঠ [গদ্য]	১৫
৪.	মৌখিক	২০
		১০০

নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য পাঠ্যগ্রন্থ পর্ষৎ কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত হইবে।

দ্বিতীয় পত্রের ব্যাকরণের পাঠসূচী :

॥ নবম শ্রেণী ॥

[সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে অধীত বিষয়ের মৌখিক পুনরালোচনা প্রয়োজনীয়।]

ক. বর্ণের শ্রেণীবিভাগ : বাংলা স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ-স্থান ও উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য, একই বর্ণের বিভিন্ন ধ্বনি, বিভিন্ন বর্ণের একই ধ্বনি, ধ্বনি-বিলোপ ইত্যাদি। বিদেশী শব্দের বাংলা বর্ণীকরণ।

খ. সাধু ও চলিত ভাষারীতির পূর্ণাঙ্গ আলোচনা। খাটি বাংলা শব্দের সন্ধি।

গ. ক্রিয়াপদ ও ক্রিয়া-বিভক্তি সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা। ধাতু ও প্রত্যয়—মৌলিক ধাতু, প্রযোজক ধাতু, ধ্বন্যাত্মক ধাতু, নামধাতু। অকর্মক ও সকর্মক ক্রিয়া। সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া, মৌলিক ক্রিয়া ও ক্রিয়ার কাল [বিশেষ আলোচনা], ক্রিয়ার রূপ।

ঘ. অব্যয়ের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা [শ্রেণীবিভাগ ও বিভিন্ন সূক্ষ্ম অর্থে প্রয়োগ]।

ঙ. পূর্ণাঙ্গ কৃৎ-প্রত্যয়: সংস্কৃত—শতৃ [অৎ], শানচ্ [মান], নক্ [অক], তৃচ্ [তা], ইষ্ণু, আলু। বাংলা—অ, অন, আও, উ, উনি, ত [অত, অতা], তি [অতি], না, রি [আরি, উরি]।

পূর্ণাঙ্গ তদ্ধিত-প্রত্যয়: সংস্কৃত—ষ্ণি [ই], ষ্ণেয় [এয়], ষ্ণায়ণ [আয়ন], ষ্ণীয় [ঈয়], ষ্ণিক [ইক], ইত, ইল, ইন, ঈন, বিন্, ময়, মতুপ্-বতুপ্ [মান্-বান্], তন ইমন্, র, ল। বাংলা—আমি [মি], আর, আরি, আরু, ই, ইয়া [এ], ঈ, উয়া [উ] উক, টিয়া [টে], পারা, পানা, খানা, বন্ত, মন্ত। বিদেশী—আনা, আনি, ওয়ালা, ওয়ান, খানা, খোর, গর, চি, দান, দানি, দার, গিরি, নবিশ, বাজ।

চ. পূর্ণাঙ্গ উপসর্গ [সংস্কৃত, বাংলা ও বিদেশী]। অনুসর্গ [দ্বারা, দিয়া, হইতে, থেকে, চেয়ে, মধ্যে প্রভৃতি]।

ছ. বিভিন্নার্থে বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের প্রয়োগ। বিশিষ্টার্থে ক্রিয়াপদের প্রয়োগ। একই শব্দের বিভিন্নার্থে প্রয়োগ। ভিন্নার্থক একশব্দ ও সদৃশ শব্দ।

জ. ইংরাজী হইতে বাংলায় অনুবাদ-শিক্ষা [বাক্য-অনুসারে অনুবাদ দেখাইয়া ক্রমে অনুচ্ছেদে অভ্যস্ত করাইতে হইবে]।

॥ দশম শ্রেণী ॥

ক. সমাস—বিস্তৃততর আলোচনা।

খ. বাংলার শব্দাবলী। বাংলা শব্দের শ্রেণী-বিন্যাস [তৎসম, তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী]।

গ. ধ্বন্যাত্মক শব্দ। শব্দ-দ্বৈত।

ঘ. বাক্য সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা। বাক্যের প্রকারভেদ। সরল, জটিল, যৌগিক। অস্ত্যর্থক, নাস্ত্যর্থক, নির্দেশক, প্রশ্নবোধক। বাক্যান্তরীকরণ।

ঙ. শব্দ ও বাক্যাংশের বিশেষ অর্থে প্রয়োগ। প্রবাদ-প্রবচনাদি।

চ. বাক্য-প্রসারণ। বহুপদের একপদে পরিণতকরণ। শব্দ ও বাক্যগত শুদ্ধি-অশুদ্ধি বিচার।

প্রবন্ধ, অনুবাদ, ভাবার্থ, ভাব-সম্প্রসারণ: পাঠ্য-বহির্ভূত অংশ হইতে প্রশ্ন করা হইবে। প্রবন্ধ-পুস্তকে পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধের দৃষ্টান্ত অপেক্ষা পর্যাপ্ত **প্রবন্ধের সংকেত** দেওয়ার উপর গুরুত্ব দিতে হইবে।

সহায়ক পাঠ: আলোচ্য বৎসরে [১৯৭৪-৭৫] নবম-দশম শ্রেণীর জন্য নিম্নলিখিত গদ্য ও পদ্যগ্রন্থগুলি নির্বাচিত হইল। আবশ্যক-বোধে পর্ষৎ এই গ্রন্থের তালিকা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

॥ গদ্য ॥

১. জীবন-স্মৃতি [নির্বাচিত অংশ]—রবীন্দ্রনাথ

২. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—স্বামী বিবেকানন্দ

৩. রামায়ণী কথা [নির্বাচিত অংশ]—দীনেশচন্দ্র সেন।

॥ পদ্য ॥

১. কথা ও কাহিনী—রবীন্দ্রনাথ।

২. কবিতা-সংকলন—পর্ষৎ পক্ষে বিশ্বভারতী প্রকাশিত।

উক্ত তালিকা হইতে মাত্র একখানি গদ্য ও একখানি পদ্য মোট দুইটি গ্রন্থ পাঠ করিতে হইবে। সহায়ক গ্রন্থের আখ্যান, ঘটনাবর্ণনা, ভাববস্তু ইত্যাদি সম্বন্ধে ছাত্র-ছাত্রীদের সাধারণ পরিচয় মাত্র প্রয়োজন।

মৌখিক ঃ কবিতা, নাট্যাংশ ও গদ্যের আবৃত্তি ও পাঠ, বিতর্ক, আলোচনা কথোপকথন, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি।

West Bengal Board of Secondary Education.
77/2, Park Street, Calcutta-16.

চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা।

গুণগ্রাহী শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং স্নেহাস্পদ ছাত্র-ছাত্রীদের অভিনন্দন জানিয়ে মাধ্যমিক 'রচনা বিচিন্তা'র চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হলো। নতুন নতুন প্রবন্ধের সংযোজন, পূর্ববর্তী প্রবন্ধগুলির পরিমার্জন এবং কতকগুলির পরিবর্তন গুণগ্রাহী দৃষ্টিতে অবশ্যই ধরা পড়বে। এই সংযোজন, পরিমার্জন এবং পরিবর্তনকর্মে ছাত্র-ছাত্রীদের সর্বাধিক প্রয়োজন-পূরণই হলো অন্যতম লক্ষ্য। গ্রন্থখানিকে তার ঐতিহ্য-অনুসারে ছাত্র-ছাত্রীদের সর্বাধিক উপযোগী করে তোলার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তা কতখানি সফল হয়েছে, তার বিচারের ভার রইলো সতীর্থ শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের ওপর।

নমস্কারান্তে॥ ইতি—

হেরম্বচন্দ্র কলেজ
কলকাতা : ৭০০ ০১৯ — বিনীত
গ্রন্থকার

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

বর্তমান লেখকের উচ্চ-মাধ্যমিক ও স্কুল-ফাইন্যাল 'রচনা বিচিন্তা' গুণগ্রাহী ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের প্রীতিলাভে সমর্থ হয়েছিল। এবার নতুন পাঠসূচী অনুযায়ী রচিত হলো মাধ্যমিক 'রচনা বিচিন্তা'।

গতানুগতিকতাই যদি লক্ষ্য হতো, তবে এই গ্রন্থ রচিত হতো না। নতুনের সংবাদ যদি বহন করে আনতে না পারে, তবে রচনা-ব্যাকরণের বিশাল গ্রন্থ-সমাজে নতুন গ্রন্থের আবির্ভাবের কি প্রয়োজন? 'রচনা বিচিন্তা' গতানুগতিকতা পরিহার করে সম্পূর্ণ নতুন পদক্ষেপে চলবার চেষ্টা করেছে এবং সেই নতুনত্বের পরিচয় তার সর্বত্র ছড়ানো রয়েছে, গুণগ্রাহী দৃষ্টিতে তা অবশ্যই পড়বে। কিন্তু তা কতখানি সফল হয়েছে, তার বিচারের ভার গুণগ্রাহী শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের ওপর।

'রচনা বিচিন্তা'র রচনাগুলি সম্পূর্ণভাবে নতুন রীতিতে রচিত। এই নতুন রীতি বর্তমান গ্রন্থকারের স্নাতক শ্রেণীর জন্যে রচিত 'বাণিজ্য বিচিন্তা'য় সফল হয়েছে। অনুরূপ সাফল্যের প্রত্যাশায় সেই রীতি 'রচনা বিচিন্তা'য়ও অনুসৃত হলো। এর রচনা-বিন্যাসই বড়ো কথা নয়, প্রবন্ধ-সূত্র বা প্রসঙ্গ-উল্লেখও বড়ো কথা নয়; আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সাম্প্রতিকতম বিষয়ে রচিত প্রবন্ধগুলির অনুসরণে স্বাধীনভাবে অধিক-সংখ্যক প্রবন্ধ রচনায় ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করার প্রয়াসই এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

এ বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ সহায়ক হবে প্রবন্ধ-সংকেতগুলি। 'রচনা বিচিন্তা'য় যতগুলি প্রবন্ধ পরিবেশিত হয়েছে, তাদের অনুসরণে অনেক বেশী প্রবন্ধ রচিত হতে পারে। সেজন্যে প্রত্যেক প্রবন্ধের পাদ-টীকায় অনুসারী প্রবন্ধ-সূচী প্রদত্ত হয়েছে।

ব্যাকরণ-অংশেও নতুনত্ব সকলের চোখে পড়বে। ব্যাকরণ সাধারণতঃ ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বিভীষিকারূপে পরিগণিত হয়। বিষয়টি নবীনদের কাছে দুরূহ সন্দেহ নেই; কিন্তু বিভিন্ন গ্রন্থে 'দুর্দান্ত পাণ্ডিত্য' প্রকাশ করতে গিয়ে ব্যাকরণের সূত্রাবলীকে দুরূহতর করে তোলার অপপ্রয়াস লক্ষিত হয়। তাতে আমাদের শিক্ষার ভোজে 'মাঝপথে অনেকখানি অপচয় হয়ে যায়'। ব্যাকরণ-বিভীষিকা দূর করে তাকে সহজবোধ্য করে তার সবখানি কাজে লাগাবার চেষ্টা করা হয়েছে এই গ্রন্থে। ব্যাকরণের সূত্র-ব্যাখ্যানে এবং দৃষ্টান্ত-চয়নে নতুন রীতি অনুসৃত হয়েছে। পাঠ্যগ্রন্থের ব্যাকরণে [দ্বিতীয় পত্র] ব্যাকরণের নানা দিক্-দিগন্ত প্রদর্শিত হয়েছে। সেই সঙ্গে পরীক্ষার প্রশ্নসমূহের শ্রেষ্ঠ উত্তর-রচনার জন্যেও বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়েছে।

ভাবার্থ-রচনা ও ভাব-সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে কাব্য ও গদ্যাংশ-নির্বাচনে পরীক্ষায় প্রশ্নাগমের সম্ভাব্যতার দিকে দৃষ্টি রাখা হয়েছে। অনুসরণীতে যে কাব্য ও গদ্যাংশগুলি প্রদত্ত হয়েছে, ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার জন্যে তাদেরও সংকেত দেওয়া হয়েছে।

বঙ্গানুবাদে বাক্য-বিশ্লেষণের সাহায্যে বিভিন্ন প্রকার বাক্যের অনুবাদ হাতে-কলমে শেখাবার চেষ্টা করেছি। তাতে শেষ থেকে শুরু না করে শুরু থেকেই শুরু করেছি। এবং অনুচ্ছেদ-নির্বাচনে পরীক্ষায় প্রশ্নাগমের সম্ভাব্যতার দিকে নজর রেখেছি।

পরিশেষে একটি কথা, গ্রন্থটিকে নিখুঁত এবং মাধ্যমিক ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ উপযোগী করে তোলার জন্যে যত্নের কোন ত্রুটি ছিল না। তবু যদি ত্রুটি থেকে থাকে পরবর্তী সংস্করণে তার সংশোধন অবশ্যই হবে। সেজন্যে গুণগ্রাহী শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের সহৃদয়তা লাভ করলে এবং যাদের জন্যে গ্রন্থখানি লেখা, তারা উপকৃত হলে আমার সকল শ্রম সার্থক মনে করবো।

নমস্কারান্তে। ইতি—

হেরম্বচন্দ্র কলেজ — বিনীত

কলিকাতা: ৭০০ ০১৯ — গ্রন্থকার

সূচীপত্র

প্রবন্ধ

প্রস্তাবনা

সঙ্কেত-সংকেত

সূচীপত্র

ব্যাকরণ

ক. নবম শ্রেণীর জন্য

খ. দশম শ্রেণীর জন্য

রচনা-বিচিন্তা

। প্রবন্ধ

ওরে, ওই উঠেছে শঙ্খ বেজে, খুলল দুয়ার মন্দিরে যে—
লগ্ন বয়ে যায় পাছে, ভাই, কোথায় পূজার অর্ঘ্য !
এখন যার যা-কিছু আছে ঘরে সাজা পূজার থালার 'পরে
আত্মদানের উৎসধারায় মঙ্গলঘট ভর্ গো।'

—রবীন্দ্রনাথ

প্রবন্ধের মূল ভিত্তি মননশীলতা। মননশীলতায় প্রবন্ধের জন্ম, কিন্তু শেষ নয়। মননশীলতার শুষ্ক প্রান্তরে আবেগের বারিবর্ষণও প্রয়োজন। তাতেই প্রবন্ধের বীজ বপন করতে হবে। তবেই সোনার ফসলের লগ্ন সমাগত হয়। কিন্তু ভাবাবেগের অতিবর্ষণ আবার শস্যের পক্ষে হানিকর, তাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ভাবের উন্মত্ত বন্যায় মূল বক্তব্য যেন ভেসে না যায়, সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ, হৃদয় ও মনের সুষ্ঠু সমাহারেই প্রবন্ধের চরম সফলতা।

হৃদয় ও মনের সুষ্ঠু সমাহার

তথ্য হচ্ছে প্রবন্ধের কংকাল। তা দিয়ে প্রবন্ধের মোটামুটি একটা কাঠামো [Structure] গড়ে তোলা যেতে পারে। কিন্তু তা প্রবন্ধ নয়। তাতে প্রাণ সঞ্চার করতে পারা চাই। তথ্যগুলিকে পরিকল্পনামতো প্রথমে সাজাতে হবে। তারপর পরিবেশনের কাজ। পরিবেশন-নৈপুণ্য আনতে হলে প্রকাশভঙ্গি কোথাও হবে গুরুগম্ভীর, কোথাও হবে লঘু পরিহাস-চটুল; কোথাও বিদ্রূপ-বক্রোক্তির তির্যক কশাঘাত হানতে হবে, কোথাও বা মনস্বী মহাপুরুষদের সুভাষিত বাণী-মঞ্জরীর দু' একটি চয়ন করে উপযুক্ত স্থানে সন্নিবেশ করতে হবে। তারপর আছে প্রারম্ভিক-বাক্য ও সমাপ্তি-বাক্য রচনার শিল্প-নৈপুণ্য। এই বাক্য দুটি নিভুঁল, নিটোল এবং দৃঢ়পিনদ্ধ হওয়া চাই। বাক্য দুটির সাফল্য প্রবন্ধের সামগ্রিক সাফল্যের দুয়ার খুলে দেবে। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, প্রবন্ধের ভাষা আদ্যন্ত হয় সাধু অথবা চলিত ভাষা হওয়া চাই। দুইয়ের সংমিশ্রণে 'গুরুচণ্ডালী' দোষে সমগ্র প্রবন্ধটি দুষ্ট হতে পারে।

পরিবেশন-নৈপুণ্য

'রচনা বিচিন্তা'য় প্রতিটি প্রবন্ধের শীর্ষে প্রবন্ধ-সূত্র প্রদত্ত হয়েছে। তাতে বিষয়টির উপলব্ধি এবং মনে রাখা সহজ হবে এবং দ্রুত পরীক্ষা-প্রস্তুতির সহায়ক হবে। প্রবন্ধ-শেষে পাদ-টীকায় অনুসারী প্রবন্ধ-সূচী প্রদত্ত হয়েছে। তার দ্বারা ছাত্র-ছাত্রীরা সহজেই প্রবন্ধ রচনার ক্ষমতা আয়ত্ত করতে পারবে। তাছাড়া, বহু প্রবন্ধের বিস্তারিত প্রবন্ধ-সংকেত দেওয়া হয়েছে, যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা অনায়াসে সম্পূর্ণ প্রবন্ধগুলি রচনা করে নিতে পারবে। আমাদের বিশ্বাস, 'রচনা বিচিন্তা'র সাহায্যে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রবন্ধ-রচনার শক্তি সংগ্রহ করে আত্মনির্ভর হয়ে উঠবে এবং পরীক্ষা-বিষয়ে বিশেষ সফলতা লাভ করতে পারবে।

শেষকথা

প্রবন্ধ-সূত্র : সূচনা ॥ স্কুলে ভর্তি ॥ স্কুলে যাইবার প্রস্তুতি ॥ স্কুল সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা ॥ প্রস্তুতির সম্পূর্ণতা ॥ স্কুলে যাত্রা ॥ প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা ॥ উপসংহার ॥

তোমার বিদ্যালয়-জীবনের প্রথম দিনের স্মৃতি

তখন আমি ছিলাম নিতান্তই শিশু—অজ্ঞতার অন্ধকারে বন্দী। আমার জগৎ বলিতে ছিল আমাদের বাড়ি, বাড়ির উঠোন এবং বাড়ির সম্মুখের কিছুদূর রাস্তা। তাহার বাহিরে যে বিশাল জগৎ, সে সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই ছিল না। আমি দিনরাত বাড়ির মধ্যে দাপাদাপি করিয়া বেড়াইতাম, বাড়ির উঠোনে নিজের মনে খেলিতাম আর সুযোগ পাইলে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িতাম। দিদি বলিত, রাস্তায় একা বাহির হইলে কাবুলিওয়ালায় ধরিয়া লইয়া যাইবে। তাই রাস্তায় বেশীদূর যাইতে সাহস হইত না। কিন্তু দূরের মাঠ, মাঠের ওপারে গ্রামরেখা এবং সুদূর নীলাকাশ আমাকে হাতছানি দিয়া ডাকিত। আমি দূরের দিকে তাকাইয়া থাকিতাম। কুয়াশার মতো রহস্যের এক আশ্চর্য মায়াজাল সারা পৃথিবীকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। দাদার এসব দেখিবার কত সুবিধা! সে স্কুলে যায়। সে প্রাণ ভরিয়া কত কী দেখিতে পায়! আমি বাড়িতে বন্দী—অজ্ঞতায় বন্দী। কবে মুক্তি পাইব?

সূচনা

দেখিতে দেখিতে আমার বয়স চার বছর পূর্ণ হইল। বাবা একদিন বাড়ি ফিরিয়া বলিলেন যে, তিনি আমাকে স্কুলে ভর্তি করিয়া দিয়া আসিয়াছেন। আমি মনে মনে খুশী হইতে পারিলাম না। কারণ ছোটবেলা হইতে আমার সাধ ছিল, আমি দাদার স্কুলে ভর্তি হইব, দাদার মতো রোজ রিক্শায় চড়িয়া স্কুলে যাইব। কিন্তু আমার সে আশা অপূর্ণ থাকিয়া গেল। বাবা আমাকে আমাদের স্থানীয় স্কুলেই ভর্তি করিয়া দিয়া আসিয়াছেন। আমি যেন দাদার কাছে চিরদিনের মতো পরাজিত হইলাম। তাহার উপর দাদা এই স্কুল সম্বন্ধে নানা আজগুবি কথা বলিয়া আমাকে ভয় পাওয়াইয়া দিয়াছিল। এই স্কুলে নাকি কারণে-অকারণে কঠোর শাস্তিদানের ব্যবস্থা আছে, সহপাঠীরা শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের নিকট নানা মিথ্যা অভিযোগে শাস্তি দেওয়ায়। বাবা আমাকে সেই স্কুলেই ভর্তি করিয়া দিয়া আসিয়াছেন—সে কথা ভাবিয়া আমি মনে মনে বিপন্ন বোধ করিতে লাগিলাম। কিন্তু মুখ ফুটিয়া কাহাকেও কিছু বলিতে পারিলাম না।

স্কুলে ভর্তি

বাবা স্কুল হইতে একখানা বুকলিস্ট লইয়া আসিয়াছিলেন। সেদিন সন্ধ্যায় দোকান হইতে আমার বই খাতা পেন্সিল সব কিনিয়া আনা হইল। বইগুলি দেখিয়া উহাতে কি লেখা আছে, তাহা পড়িতে আমার খুব ইচ্ছা হইতে লাগিল। কিন্তু পড়িব কি প্রকারে? তখনও তো আমার অক্ষর-জ্ঞান হয় নাই। দিদি বইগুলির কিছু অংশ পড়িয়া শুনাইল। শুনিয়া খুব মজা পাইতে

স্কুলে যাইবার প্রস্তুতি

লাগিলাম। বইগুলির ছবি দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা কাটিয়া গেল। আর বইগুলির কী সুন্দর গন্ধ! আমি সেই গন্ধ শুঁকিতে শুঁকিতে বুকের উপর বইগুলি লইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম।

যেদিন আমি স্কুলে প্রথম আসিয়াছিলাম, সেদিনটির কথা আমার খুব মনে পড়ে। আজ কৈশোরের শেষ প্রান্তে দাঁড়াইয়া আমার শৈশবের সেই রোমাঞ্চকর দিনটির কথা মনে মনে স্মরণ করি। সেই দিনটিই স্কুলে আমার প্রথম দিন—আমার বিদ্যালয়-জীবনের সেই হইল প্রথম দিন। স্কুল সম্বন্ধে তাহার পূর্বে আমার মনে ছিল কত উদ্ভট সব চিন্তা, কত ভয় আর কত উদ্বেগ। সেখানে নাকি খেলাধূলা করিতে দেওয়া হয় না, শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত পড়া—কেবল পড়া। লেখাপড়া ছাড়া কোন কথাই নাকি সেখানে নাই, পড়া না পারিলে সেখানে খুব কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়। এমনি কত দুশ্চিন্তায় আমার শিশু-হৃদয় সেদিন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

স্কুল সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা

পরের দিন আমার নূতন জামা-প্যান্ট আসিল। শাদা জামা—বুক-পকেটে উদীয়মান সূর্যের ছবি; প্যান্টের রং গাঢ় নীল। এগুলি নাকি আমার স্কুলের ইউনিফর্ম। সেই সঙ্গে আসিল নীলরঙের একটি সুটকেস, টিফিনের বাক্স এবং খাবার জলের বোতল। এই সব দেখিয়া মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। কিন্তু রাতে বিছানায় ঘুমাইতে যাইবার সময় দাদা কানের কাছে ফিস ফিস করিয়া বলিল—'ঐ স্কুলে কিন্তু পড়া না পারিলে ঘরে আটকাইয়া রাখার ব্যবস্থা আছে।' ভয়ে আমার বুক শুকাইয়া গেল। দাদার কথা ভাবিতে ভাবিতে আমি মনে মনে আমার স্কুলের একটি ছবি আঁকিয়া ফেলিলাম। বলা বাহুল্য, সেই ছবির সঙ্গে জেলখানার ছবির বিশেষ তফাৎ ছিল না।

প্রস্তুতির সম্পূর্ণতা

সকালে ঘুম ভাঙিতেই আমার দাদার কথাটাই বেশী করিয়া মনে পড়িতে লাগি[illegible] স্কুলের কথা যতই ভাবিতেছিলাম, ততই ভয়ে আমার বুক শুকাইয়া আসিতে[illegible]ল। দিদি আমাকে জোর করিয়া বিছানা হইতে তুলিয়া আমার স্কুলে যাইবার কথা মনে করাইয়া দিল। তখন [illegible]াল। দিদি আমাকে ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করাইয়া খাওয়াইতে বসিল। খাওয়া[illegible] দিদি আমাকে আমার স্কুলের ইউনিফর্মে সাজাইয়া দিল। সুটকেসে বই এব[illegible]িফিনের বাক্স চলিল, কাঁধে চলিল জলের বোতল। দিদির হাত ধরিয়া ভয়ে ভয়ে [illegible]রি পথে পাড়ি দিলাম।

স্কুলে যাত্রা

যতই স্কুলের নিকটবর্তী হইতে লাগিলাম, ততই ভয়ে [illegible]টা আরো জোরে জোরে টিপটিপ করিতে লাগিল। কত বড় স্কুল! কত ছেলেমেয়ে! কত বড় গেট! গেটে কত বড় ঘণ্টা! এক পাশে গোঁফওয়ালা কত মোট[illegible] দারোয়ান! দিদি আমাকে আমাদের ক্লাসের শিক্ষিকার কা[illegible] লইয়া গেল। মীরাদি আমাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। তাঁ[illegible]ার সুমিষ্ট ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হইলেও আমার অন্তরে ভয় তখনও কাটে না[illegible]। দেখিলাম, আমার বয়সী কত [illegible] দিদি বলিল—'ছুটির পর আসিয়া

প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা

তোকে ঠিক লইয়া যাইব। মন দিয়া পড়াশুনা করিস।' আমি মীরাদিকে এবং স্কুলের ছেলেমেয়েদের দেখিতেছিলাম। পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলাম, দিদি নাই। আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। মীরাদি আমাকে সান্ত্বনা দিয়া সস্নেহে আমার হাতে একটি খেলনা দিয়া একটা সীটে বসাইয়া দিলেন। আমি কান্না ভুলিয়া গেলাম। কিছুক্ষণ পরেই প্রার্থনার ঘন্টা বাজিল। আমি মীরাদি এবং অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে স্কুলের হলঘরে গিয়া প্রার্থনায় যোগদান করিলাম। প্রার্থনার পর সকলে যে যাহার জায়গায় আসিয়া বসিলাম। আমি চারিদিকে তাকাইলাম। কেহ আমাকে দেখিতেছে না। সেই ফাঁকে আমি সুটকেস খুলিয়া টিফিনের বাক্স বাহির করিয়া দিদির-দেওয়া টিফিনগুলি শেষ করিয়া ফেলিলাম।

তারপর পড়াশুনা আরম্ভ হইল। মীরাদি সুর করিয়া আমাদের ছড়া শিখাইলেন। ছড়ার পর হাতের লেখা। তারপরই খেলাধূলা আরম্ভ হইয়া গেল। কয়েকজনের সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব হইয়া গেল। তাহাদের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া খেলা করিলাম। বিকালে ছুটি হইল। ছুটির পর বন্ধুদের কাছে বিদায় লইতে কষ্ট হইতেছিল। মনে মনে বলিলাম, কাল আবার আসিব। কাল আবার বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধূলা হইবে। সেদিন স্কুলে আসিয়া প্রথমে কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলাম, আর আজ স্কুলে আসিতে না পারিলে আমার কান্না পায়। কিন্তু দাদা যে আমার স্কুল সম্বন্ধে কত বড় মিথ্যা কথা বলিয়াছিল, তাহা পরে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে॥

উপসংহার

প্রবন্ধ-সূত্র : সূচনা। গ্রামের নাম নিশ্চিন্তপুর। গ্রামের সৌন্দর্য বর্ণনা। তাহার কর্মব্যস্ততার রূপ। তাহার সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন। তাহার সাংস্কৃতিক জীবন। উপসংহার।।

আমার গ্রাম

উ. মা. '৬৯

"বাঁধিলাম ঘর এই শ্যামা আর খঞ্জনার দেশ ভালোবেসে,
ভাসানের গান শুনে কত বার ঘর আর খড় গেল ভেসে
মাথুরের পালা বেঁধে কতবার ফাঁকা হ'ল খড় আর ঘর।"··· —জীবনানন্দ দাশ

বাংলার আম-জাম-কাঁঠালের ছায়াভরা গ্রামেই বাংলার করুণ-সুন্দর মুখ আমি দেখিয়াছি। তাহার শ্যামল-শোভন, ছায়া-সুনিবিড় পথে আমার বাউল মন উদাস হইয়া ফেরে। এইখানে আসিলে আমি যেন চিরন্তন বাংলাদেশের স্পর্শ পাই, পাই তাহার মৃন্ময় ঘ্রাণ। এখানকার অবারিত প্রসন্ন আকাশ, দিগন্তশায়ী শস্য-প্রান্তর, দোয়েল-খঞ্জনা-শালিক-বউ-কথা-কও পাখির কল-কূজন আমার হৃদয়ে যেন কোন এক স্বপ্নলোকের ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া দেয়। তাহার বেণুবনে, বেতস-কুঞ্জে, বনের পত্র-মর্মরে এবং স্নেহশালিনী নদীর কলগুঞ্জনে আমার তাপদীর্ণ হৃদয় চুরি গিয়াছে। মায়ের স্নেহ-সম্ভাষণের মতো, তাঁহার করুণ মমতাভরা দৃষ্টির মতো গ্রামখানির অঙ্গে যেন জড়াইয়া রহিয়াছে এক মায়াময় স্নিগ্ধ রূপশ্রী।

সূচনা

গ্রামের নাম নিশ্চিন্তপুর। চারিদিকে ধূ-ধূ বিস্তীর্ণ মাঠ, মাঝখানে একটি সবুজ দ্বীপের মতো স্বপ্নমাখা গ্রামখানি জাগিয়া আছে। মাঠের পূর্বপ্রান্তের কিনারা ঘেঁষিয়া প্রতিদিন প্রভাতে প্রকাণ্ড সূর্য উঠিয়া আসে। বনে বনে পাখির গলায় বাজিয়া উঠে মধুর-ললিত প্রভাত-কাকলি। মাঠে মাঠে অলস ভঙ্গিতে গ্রামের গোরুগুলি চরিতে থাকে। অবারিত মাঠ এবং প্রসন্ন আকাশ পূর্ণ করিয়া বাজিতে থাকে রাখালের মন-উদাস করা বাঁশি। তারপর গ্রামের ছায়াবটের নীচে কর্মহীন রাখাল-বালকদের বসে খেলার আসর। দূরে সরু আঁকাবাঁকা মেঠোপথ ধরিয়া হাঁটিয়া আসে নিঃসঙ্গ পথিক। বনের শুকনো পাতা, দিঘির কলমী-ঢাক, বনতুলসী-ভাটফুল ইত্যাদি অজস্র নাম-না-জানা ফুলের ঘ্রাণ এবং দোয়েল-শ্যামা-শালিক-খঞ্জনার কল-কাকলি তাহাকে গ্রামের অন্দরে আমন্ত্রণ জানায়। আম-কাঁঠাল-নিম-অর্জুন-শিরিষ তাহার মাথার ছায়া বিছাইয়া দেয়। পথের দু'ধারের তরুশাখা হইতে ঝুলন্ত গুল্মলতা পেলব বাহু দিয়া পথিকের গলা জড়াইয়া ধরিয়া প্রশ্ন শুধায় : 'হে বন্ধু, আছ তো ভালো ?'

গ্রামের নাম নিশ্চিন্তপুর

বাঙালীর সম্মুখে গ্রাম-লক্ষ্মীর রূপময় অন্তর-লোকের অন্দর-দুয়ার যেন খুলিয়া যায়। তাহার পল্লবঘন আম্রকানন, তাহার রাখালের স্বপ্নময় খেলাঘর, তাহার স্তব্ধ-অতল দিঘিকালো-জলে নিশীথ-শীতল স্নেহ অপূর্ব মাধুর্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। কোথাও কলমীর দাম এবং শাপলা-ফুলে-ভরা দিঘির বিষণ্ন জলে দুটি হাঁস খেলা করিতেছে, কোথাও সজিনা গাছের ডালে ডানা গুটাইয়া ধ্যানমগ্ন বক পরম আরামে রৌদ্র সেবন করিতেছে, কোথাও লেজঝোলা পাখি পরমানন্দে বাতাসে ডিগবাজি খাইতেছে, কোথাও প্রচুর ঘাস খাইয়া একটি গোরু রৌদ্রে শুইয়া পরম পরিতৃপ্তিতে রোমন্থন

করিতেছে, একটি কাক তাহার মেরুদণ্ডের উপর বসিয়া তাহাকে বিরক্ত করিতেছে, গোরুটি মাথা ও লেজ নাড়িয়া তাহাতে তীব্র আপত্তি জানাইতেছে। কলসী কাঁখে লইয়া গ্রামের বধূ বিদ্যালয়-ভবনের ও-পাশের নলকূপ হইতে জল লইয়া যাইতেছে, ফসলের আঁটি মাথায় লইয়া চাষীরা বাড়ি ফিরিতেছে, ছেলেরা বই বগলে লইয়া বিদ্যালয়ে যাইতেছে। যাইতে যাইতে তাহারা তালগাছের বাকলে বাবুইয়ের ঝুলন্ত বাসার দিকে পরম কৌতুকভরা দৃষ্টিতে তাকাইতেছে। কোথাও গ্রামের কুকুরগুলি নিরুদ্দেশভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সেখানে পুকুরের ধারে হিজল-গাছের ডালে একটি মাছরাঙা এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল, হঠাৎ ঝুপ্ করিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া একটি মাছ ধরিয়া লইয়া গেল। দূরে বনান্তরাল হইতে অত্যন্ত ব্যথা-বিহ্বল স্বরে একটি ঘুঘু ডাকিতেছে। একটি শঙ্খচিল মাথার উপর দিয়া যেন তীব্র নিখাদে আকাশের নির্মল প্রশান্তি বিদীর্ণ করিয়া দিয়া উড়িয়া গেল। জাল কাঁধে লইয়া জেলেরা নদীর দিকে চলিয়া গেল। হাটের জনশূন্যতায় টিনের ছোট ছোট চালাঘরগুলি রৌদ্রে দাঁড়াইয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে। রথতলা বামে রাখিয়া এবং মন্দির ও নদীর গোলা পিছনে ফেলিয়া গ্রামের রাস্তা আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে। তারপর বিশালাক্ষীর মন্দির ছাড়াইয়া চৌধুরীদের মাটির পাঁচিলের গা ঘেঁষিয়া, রায়দের সুপুরির বাগান ডানে দিকে রাখিয়া বাগ্‌দিদের বাঁশচিতার বেড়ার পাশ দিয়া এবং মসজিদকে পিছনে ফেলিয়া রাস্তাটি অলসভাবে গিয়া নদীর বাঁধের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়াছে। নদীর ঘাটে কয়েকটি ডিঙি-নৌকা বাঁধা, একটি-কি-দুইটি ডিঙি, রৌদ্রে পিঠ দিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে, ছেলেমেয়েরা জলে নামিয়া সোল্লাসে স্নান করিতেছে। সমস্ত কিছু মিলিয়া-মিশিয়া গ্রামের সৌন্দর্যের পাত্রটি যেন কানায় কানায় পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে এবং এইখানে আমার মনটিও চুরি গিয়াছে।

গ্রামের সৌন্দর্য বর্ণনা

'তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও—আমি এই বাংলার পারে রয়ে যাব।' নিশ্চিন্তপুরের চাষীরা হাল-বলদ লইয়া মাঠে চাষ করিতে যায়, তাহারা বীজ বোনে, পাকা ফসল খামারে তোলে। জেলেরা মাছ ধরে, ঘরামিরা ঘর বানায় এবং মেরামত করে, কুমোরেরা হাঁড়ি-কলসী তৈয়ারী করে, কামারেরা লোহার জিনিসপত্র বানায়, তাঁতী তাঁত [illegible] কলুরা ঘানিতে তেল তৈয়ারী করে। কোথাও চাষী বলদ হাঁকিতেছে, কোথাও নদীতে দাঁড়ের ছপ্‌ছপ্ শব্দ উঠিতেছে, কোথাও কুমোরের চাকের শব্দ শোনা যাইতেছে, কামারের কামারশালায় কোথাও 'ঠকা ঠাঁই ঠাঁই [illegible] কিছু নেহাই,' কোথাও 'কলুর ঘানির তীক্ষ্ণকাতর নিখাদ স্বর' গ্রামের আকাশ পূর্ণ ক[illegible] তুলিতেছে। তাহাদের বিচিত্র কর্মকোলাহলের কলধ্বনির সহিত তাঁতীর তাঁতবো[illegible] শব্দ, রাখালের বাঁশির সুর, ঢেঁকির পাড়ের শব্দ ইত্যাদি মিলিয়া-মিশিয়া সৃষ্টি করি[illegible]ছে এক অপূর্ব ঐকতান।

তাহার কর্মব্যস্ততার রূপ

এইভাবে গ্রামের জীবনছন্দ প্রতিদিন বিচিত্র ভঙ্গিতে বিকশিত হইয়া উঠে। তাহার জীবন খুব সচ্ছল নয়। কিন্তু একটি আশ্চর্য আত্মতৃপ্তির ভাব লাগিয়া আছে গ্রামের অধিবাসীদের চোখে-মুখে। দৈন্য আছে, অভাব-অনটন আছে, আছে

রোগতাপের জ্বালা। কিন্তু তাহাই সব নয়। আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্যের উপর মুখর হইয়া উঠে এক অপরাজেয় প্রাণ-প্রাচুর্য। হাট তাহার বিনিময়-কেন্দ্র। মহাজন ও বিভিন্ন ব্যবসায়ীরা গ্রামের পণ্য-সম্ভার দূরে শহরে, গঞ্জে কিংবা রেল-স্টেশনে চালান দেয়। গ্রামের সকলের পর্যাপ্ত-পরিমাণ জমিজমা নাই; আবার, অবস্থাপন্ন সচ্ছল যাহারা, তাহারা প্রয়োজনাতিরিক্ত জমির মালিক। তাহারা কোঠাবাড়িতে বাস করে। তাহাদের মধ্যে কেউ করে মহাজনী কারবার, কেউ করে ব্যবসা-বাণিজ্য, আবার বড় বড় চাকরিও করে কেউ কেউ। কিন্তু যাহারা সঙ্গতিহীন, তাহারা অন্যের কাজে মজুর খাটিয়া কিংবা স্বল্প-পরিমাণ জমির চাষ করিয়া কায়ক্লেশে দিনাতিপাত করে। অথচ, তাহাদের কাহারও বিরুদ্ধে নালিশ নাই, বিক্ষোভ নাই।

তাহার সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন

যুগ যুগ ধরিয়া পূজা-পার্বণ ও উৎসব-অনুষ্ঠান ইত্যাদির মধ্য দিয়া গ্রামের সাংস্কৃতিক জীবন বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে দুর্গা পূজা, কালী পূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা, সরস্বতী পূজা, বিশ্বকর্মা পূজা, ঝুলন, গাজন, নবর্বর্ষ, দোল, মহরম ইত্যাদি উৎসব তো তাহার বারো মাসের তেরো পার্বণ। গ্রামের রথতলায় বসে রথের মেলা, বারোয়ারিতলায় দুর্গা পূজা ও কালী পূজায় আসে শহরের সার্কাসের দল, চড়কের সময় গাজনতলায় বসে চড়কের মেলা। অধুনা তাহাদের সহিত মিশিয়াছে পনেরই আগস্ট, পঁচিশে বৈশাখ, তেইশে ও ছাব্বিশে জানুয়ারী ইত্যাদি নবযুগের উৎসবসমূহ। তাহা ছাড়া নবান্ন, অন্নপ্রাশন, জামাই-ষষ্ঠী, ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া ইত্যাদি তো আছেই।

তাহার সাংস্কৃতিক জীবন

তাইতো নিশ্চিন্তপুরের 'ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড়' আমার বড় ভালো লাগে। ভালো লাগে তাহার কীর্তন-ভাসান-রূপকথা ও যাত্রা-পাঁচালীর নরম নিবিড় ছন্দ। কিন্তু তাহার অপরাজেয় প্রাণরস নিঃশেষে শোষণ করিবার জন্য যেভাবে সর্বগ্রাসী যন্ত্র-সভ্যতা ও নাগরিকতার উগ্র আক্রমণ সূচিত হইয়াছে, তাহাতে নিশ্চিন্তপুরের মানুষগুলি আর বেশীদিন নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবে, বোধ হয় না। সেদিন হয়তো আর কুটিরে কুটিরে সন্ধ্যায় শাঁখ বাজিবে না, বিশাল[illegible]র মন্দিরে আর আরতির ঘণ্টা শোনা যাইবে না, মসজিদে আর [illegible] উঠিবে না; সেদিন তাহার পরিবর্তে হয়তো উচ্চকণ্ঠ লাউড্ স্পীকারে শোনা [illegible]বে শহুরে সিনেমার নানা চটকদার গান।

উপসংহার

"দেখিব না হেলেঞ্চার ঝোপ থেকে এক ঝাড় [illegible] কখন
নিভে যায়;—দেখিব না আর আমি পরিচিত [illegible] বাঁশবন,
শুকনো বাঁশের পাতা-ছাওয়া মাটি হয়ে যাবে [illegible]গীর আঁধার…"

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- বাংলাদেশের তোমার একটি পরিচিত গ্রাম, উ. মা. '৬৯
- তোমার গ্রাম
- তোমার দেখা একটি গ্রাম

প্রবন্ধ-সূত্র : সূচনা। মৌনী তাপস গ্রীষ্ম : ধূসর রুক্ষতা। সজল বর্ষা : নয়নরঞ্জন রূপশ্রী। শারদ-লক্ষ্মী : ছুটির রাগিণী : অনুপম রূপসৌন্দর্য। হেমন্ত-লক্ষ্মী : মমতাময়ী নারী। শীতের বার্ধক্য : সীমাহীন শূন্যতা। রূপময় ও রসময় বসন্ত : পুষ্প-পর্যাপ্তি। উপসংহার।

রূপসী বাংলা ও তাহার ঋতু-বৈচিত্র্য

ক. প্রা. '৬৫

প্রকৃতির ঋতুরঙ্গশালায় চলে রূপসী বাংলার নানা ছন্দ-বিলসিত অনুপম রূপ-বিস্তার। ঋতু-বিবর্তনের ধারাপথ বাহিয়া চলে তাহার অন্তহীন রূপের খেলা, রঙের খেলা, সুরের খেলা। আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতির প্রেরণায় পৃথিবী তাহার সূর্য-পরিক্রমার পথে অগ্রসর হইয়া চলে। তাহার সঙ্গে ছন্দ মিলাইয়া চলে ঋতুর পর ঋতুর নিরবচ্ছিন্ন বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। ঋতু-বৈচিত্র্যের এমন উজ্জ্বল প্রকাশ বাংলাদেশ ছাড়া অন্য কোথাও দেখা যায় না। তাই কবি বাংলাদেশকে বলিয়াছেন—'রূপসী বাংলা'। প্রতিটি ঋতু এখানে তাহার আপন বর্ণ-বিলসিত সংগীত-মুখরিত রূপ-স্বাতন্ত্র্য লইয়া আসে, প্রকৃতিকে সাজায় তাহার বৈচিত্র্য-মণ্ডিত স্বাতন্ত্র্যের অনুপম রূপসজ্জায়, তারপর তাহার রূপ-বিস্তারের সর্বশেষ স্মৃতিচিহ্নটুকু নিষ্ঠুর হাতে নিঃশেষে মুছিয়া লইয়া আবার বিদায় গ্রহণ করে। নৃত্য-চঞ্চল নটরাজের হাতের রুদ্রাক্ষের মালা ঘুরিয়া চলে। এক ঋতু যায়, আসে অন্য ঋতু। রূপসী বাংলার রূপ-সাগরে উঠে নূতন ঢেউ।

সূচনা

বাংলাদেশের প্রকৃতির রূপরঙ্গশালার প্রথম ঋতু গ্রীষ্ম। ধূ-ধূ রুক্ষ দুইচক্ষে প্রখর বহ্নিজ্বালা লইয়া রুদ্র আবির্ভাব ঘটে এই মৌনী তাপসের। নিষ্করুণ নিদাঘ-সূর্য তাঁহার তাপ-দহনের অসহ্য জ্বালাময় তীর ছুঁড়িয়া মারেন। ধরিত্রীর বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যায়, ফুটি-ফাটা হইয়া যায় দিগন্তশায়ী প্রান্তর। গ্রীষ্মের মরু-রসনায় মৃত্তিকার প্রাণ-রস শোষিত হইয়া দূর-দিগন্তে অজস্র কম্পিত শিখায় ঊর্ধ্বে উঠিতে থাকে। কোথাও প্রাণের চিহ্নমাত্র নাই, শ্যামলতার আভাস [illegible] নাই। সর্বত্রই মরুভূমির ধূ-ধূ বিস্তার। সমগ্র জীবজগৎ ও উদ্ভিদ-জগতে নামিয়া আসে এক প্রাণহীন, রসহীন পাণ্ডুর বিবর্ণতা। 'ধূলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল [illegible]জাল' লইয়া 'তপঃক্লিষ্ট, তপ্ততনু ভীষণ ভয়াল' গ্রীষ্ম অপরাহ্ণের দিকে ডাক দেয় কালবৈ[illegible]কে। তাহার সেই রুদ্র-সুন্দর মূর্তি, সেই ভীষণ-মধুর রূপ দেখা যায় শুধু বাংলাদেশের [illegible]শেই। গ্রীষ্ম ফুলের ঋতু নয়, ফুল ফুটাইবার দায়িত্ব তাহার নাই। ফলের ডালা সা[illegible]তেই তাহার বেলা কাটিয়া যায়।

মৌনী তাপস গ্রীষ্ম : ধূসর [illegible]

দেখিতে দেখিতে আক[illegible] নবীন মেঘ জমিয়া উঠে। আসে শ্যামল-সুন্দর বর্ষা। বাংলাদেশের বর্ষা আসে র[illegible]জ-সমারোহে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ-বিকাশ ও গুরুগম্ভীর বজ্রধ্বনির 'অতি-ভৈরব হরষে'র [illegible]ধ্যে সূচিত হয় তাহার শুভাগমন। সেই সঙ্গে নিদাঘ-দগ্ধ পৃথিবীতে ঘনাইয়া আসে 'শ্যা[illegible]য়াঘন দিন'। আকাশের একপ্রান্ত হইতে অপর

প্রান্ত পর্যন্ত ঘনকৃষ্ণ পুঞ্জীভূত মেঘের অপূর্ব স্তর-বিন্যাসে, নিম্নে শ্যামায়মান বন-প্রকৃতির বুকে মেঘ-কজ্জল ছায়া-বিস্তারে জাগিয়া উঠে পৃথিবীর বহু-প্রতীক্ষিত মর্মর-মুখর মহোল্লাস। নিঃসীম শূন্য হইতে বন্ধনবিহীন বায়ুপ্রবাহ দুরন্ত বেগে ছুটিয়া আসে, শুরু হয় শীতল ধারাবর্ষণ। বিশুষ্ক প্রান্তর, মাঠ-জলাশয়, নদীনালা, খালবিলে বহুদিন পরে জাগে প্রবল প্রাণোচ্ছ্বাস। মাটির কঠিন শাসন ভেদ করিয়া নব তৃণাঙ্কুরের দল বাহির হইয়া আসে। প্রকৃতির সকল অঙ্গ হইতে গ্রীষ্মের ধূসর ক্লান্তি

সজল বর্ষা : নয়নরঞ্জন

মুছিয়া গিয়া উদ্ভাসিত হইয়া উঠে সজল বর্ষার নয়নরঞ্জন রূপশ্রী। এক অপূর্ব শ্যামলিমার মহাসমারোহের মধ্যে ঘনাইয়া আসে বর্ষা-প্রকৃতির পুষ্প-বিকাশের স্বপ্ন। কদম্ব-কেয়া-যূথিকা-গন্ধরাজ-হাসনাহানার বিবিধ বর্ণ ও বিচিত্র গন্ধের উৎসবে সুরভিত বঙ্গ-প্রকৃতির হৃদয়ের দ্বার যেন খুলিয়া যায়। পুষ্প-সৌরভের সম্পদে চারিদিক কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠে। তারপর শেষ-বর্ষণের পালা-গান গাহিয়া, পথে পথে কদম্ব-কেশরের শেষ স্মৃতিচিহ্ন ছড়াইয়া বাংলার পল্লী-প্রকৃতিকে হাসাইয়া কাঁদাইয়া সুন্দরী বর্ষা বিদায় গ্রহণ করে।

বর্ষা-বিদায়ের পর আবার বঙ্গ-প্রকৃতির রূপের রঙ্গমঞ্চে ঘটে পট-পরিবর্তন। বর্ষণ-ক্লান্ত লঘুভার মেঘ অলস-মন্থর ছন্দে নিরুদ্দেশে ভাসিয়া চলে। বর্ষণ-ধৌত, মেঘমুক্ত আকাশের সুনীল রূপ-লাবণ্য, আলোছায়ার লুকোচুরি, শিউলিফুলের মন-উদাস-করা গন্ধ, নদীতীরে কাশফুলের অপূর্ব সমারোহ, সবুজ তৃণ-পল্লবে নব-শিশিরের আলিম্পন তাহাতে প্রভাত-সূর্যের রশ্মিপাত এবং শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত রাত্রি—এই অনুপম

শারদ-লক্ষ্মী : ছুটির রাগিণী : অনুপম রূপশোভিনী

রূপটি লইয়া শারদ-লক্ষ্মীর ঘটে আনন্দময় আবির্ভাব। দেখিতে দেখিতে বাজিয়া উঠে ছুটির রাগিণী। বাঙালীর আনন্দ-ঘন উৎসব দুর্গা পূজার আয়োজনে মুখর হইয়া উঠে গ্রাম ও নগর। বাংলা দেশের আকাশে-বাতাসে দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তরে ও কানায় কানায় পূর্ণ নদীবক্ষে এবং ভাবপ্রবণ বাঙালীর অন্তরে অন্তরে অনুভূত হয় শারদ-লক্ষ্মীর স্নেহ-সিক্ত আবির্ভাব। রূপালি জ্যোৎস্নার অপরূপ রথে চড়িয়া যেন শারদ-লক্ষ্মীর ঘটে মর্ত্যাবতরণ। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে রূপের দুয়ার খুলিয়া যায়, বাংলাদেশের লাবণ্য যেন কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠে। শরৎকালের মধ্যে যেন বাংলাদেশের হৃদয়ের স্পর্শ পাওয়া যায়।

হেমন্ত শরতেরই বিলম্বিত পরিণতি। কিন্তু হেমন্তের নাই শরতের রূপৈশ্বর্য, আছে সুদূর-ব্যাপ্ত বৈরাগ্যের সুগভীর বিষণ্ণতা। হেমন্ত-লক্ষ্মী ধূমল কুয়াশার আবরণে মুখ ঢাকিয়া নিঃসঙ্গ সাধনায় মগ্ন থাকে। সেই সাধনা তাহার ফসল ফলাইবার সাধনা। ক্ষেতে-খামারে হেমন্তের সোনার ধান উঠিতে থাকে এক অন্তহীন

হেমন্ত-লক্ষ্মী : মমতাময়ী নারী

কর্ম-ব্যস্ততার মধ্যে। হেমন্তের ফুল নাই। তাহার ফুলের বাহার নাই, সৌন্দর্যের জলুস্ নাই, রূপসজ্জারও নাই অফুরন্ত প্রাচুর্য; কিন্তু আছে মমতাময়ী নারীর এক অনির্বচনীয় কল্যাণী রূপশ্রী। সে আমাদের ঘর সোনার ধানে ভরিয়া দিয়া যায়, আমাদের কুটির-আঙিনায় রাশি রাশি ঐশ্বর্য রাখিয়া দিয়া শিশিরের নিঃশব্দ চরণে বিদায় গ্রহণ করে।

হেমন্তের প্রৌঢ়ত্বের পর আসে জড়তাগ্রস্ত শীতের নির্মম বার্ধক্য। রুক্ষ কাঠিন্য ও রিক্ততার বিষাদঘন প্রতিমূর্তিরূপে শীতের আবির্ভাব। তাহার তাপ-বিরল রূপমূর্তির মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তপশ্চর্যার সুকঠোর কৃচ্ছ্রসাধন এবং বৈরাগ্যের ধূসর অঙ্গীকার। বিবর্ণ বনভূমির পত্র-গুচ্ছগুলিতে ঝরিয়া পড়িবার নির্মম ডাক আসিয়া পৌঁছায়, এক চরম রিক্ততায় অসহায় ডালপালাগুলি একদিন হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে। ওদিকে, ধান-কাটা মাঠে কী সীমাহীন শূন্যতা, কি বিশাল কারুণ্য! ত্যাগের কী অপরূপ মহিমা!

শীতের বার্ধক্য : সীমাহীন শূন্যতা

তারপর 'মাঘের সূর্য উত্তরায়ণে পার হয়ে এল চলি।' বসন্তের আবির্ভাবকে সম্ভব করিয়া তুলিবার জন্যই মৌনী তাপস শীতের এই কঠোর তপশ্চর্যা। আসে ঋতুরাজ বসন্ত, আসে পুষ্প-পর্যাপ্তির লগ্ন। মৃদুমন্দ দক্ষিণ-বাতাসের যাদুস্পর্শে শীতের জরাগ্রস্ত পৃথিবীর অঙ্গে লাগে অপূর্ব পুলক, বন-তরুর রিক্ত শাখায় জাগে কচি কিশলয়ের অফুরন্ত উজ্জ্বল সমারোহ। বাতাসের মর্মর-ধ্বনি এবং দূর বনান্তরাল হইতে ভাসিয়া-আসা কোকিলের কুহুগীতি পৃথিবীতে সৃষ্টি করে এক অপূর্ব মায়ালোক। দিকে দিকে লাগে রূপের ঢেউ রঙের ঢেউ। অশোক-পলাশের রঙীন বিহ্বলতায় ও শিমুল-কৃষ্ণচূড়ার রক্তিম উল্লাসে, মল্লিকা-মালতী ও মাধবী-মঞ্জরীর আতুর প্রগল্‌ভতায়—সারা আকাশতলে এই গন্ধ ও বর্ণের তুমুল কোলাহলে লাগিয়া যায় এক আশ্চর্য মাতামাতি। এইভাবে হোলি খেলিয়া, ফুল ফুটাইয়া, ফুল ঝরাইয়া পৃথিবীকে রিক্ত করিয়া দিয়া রূপ-নায়ক বসন্ত চলিয়া যায়।

রূপময় ও রসময় বসন্ত : পুষ্প-পর্যাপ্তি

রূপসী বাংলার এই রূপ-বিচিত্র ঋতু-চক্র নানা বর্ণ-গন্ধ গানের সমারোহ লইয়া নিত্য আবর্তিত হইয়া চলিয়াছে। এক ঋতু যায়, আসে আর এক ঋতু; বাংলাদেশের রূপ-সাগরে ঢেউ লাগে। কিন্তু শহরবাসী ও শহরমুখী বাঙ্গালী আজ আর অন্তরে তাহার নিমন্ত্রণ অনুভব করে না। ঋতু-পরিবর্তনের মধ্য দিয়া প্রকৃতি যখন বিবাহের কন্যার মত অপরূপ সাজে সাজিয়া উঠিবে, বাঙ্গালী তখন কারখানার যন্ত্র-ঘর্ঘর ধ্বনি শুনিবে কিংবা সওদাগরী অফিসে হিসাবের খাতায় অঙ্ক মিল[illegible] থাকিবে। আজ আমরা প্রকৃতিকে নির্বাসিত করিয়া বরণ করিয়া লইতেছি উগ্র ন[illegible]য় তপ্ত নিঃশ্বাস। কিন্তু উপেক্ষিতা প্রকৃতি একদিন নয় একদিন তাহার চরম প্রতিশোধ লইবে। জানি না, সেই প্রতিশোধের রূপ কেমন হইবে!

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- ঋতুচক্র ও বাংলার পল্লী-প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্য
- বাংলার ঋতু-পর্যায়
- বাংলাদেশে বিভিন্ন ঋতুর সৌন্দর্য, ২

প্রবন্ধ-সূত্র ঃ সূচনা ॥ শারদ-লক্ষ্মীর অনুপম রূপশ্রী ॥ শরৎ আমাদের ছুটির ঋতু ॥ শরৎ আমাদের উৎসবের ঋতু ॥ শরতের জ্যোৎস্নাবিধৌত রাত্রি ॥ শরতের বৈশিষ্ট্য ॥ অর্থনৈতিক পটভূমি ॥ উপসংহার ॥

আমার প্রিয় ঋতু ঃ শরৎ

মা. '৬৬, '৬৯

বাংলাদেশের হৃদয়ের মণিকোঠায় শরতের প্রতিষ্ঠা। শরৎ কচি-কাঁচা সোনার মতো 'অরুণ আলোর অঞ্জলি লইয়া যখন বাংলাদেশের বর্ষণ-ক্লান্ত আকাশের বুকে শাদা মেঘের পান্‌সি চড়িয়া অপূর্ব রূপ কান্তিতে আবির্ভূত হয়, তখন পরিপূর্ণ বর্ষার পর এক অনির্বচনীয় প্রশান্তিতে আমাদের বুক জুড়াইয়া যায়। আকাশ নীল,—গাঢ় নীল। আকাশের ন্যায় বাতাসেও এক উদার প্রসন্নতা, উজ্জ্বল আলোর আঙ্গিকে রচিত এক

সূচনা

স্নিগ্ধ আনন্দঘন পরিবেশের মধুর আগমনী। চারিদিকে সবুজের সমারোহ, সোনালি আলোর অফুরন্ত আয়োজন। বাংলাদেশের আনন্দময়ী পল্লী-প্রকৃতি যেন গাঢ় সবুজ রঙের পিচ্‌কারি দিয়া মনের আনন্দে হোলি খেলিয়াছে। গাছে-গাছে, লতায়-পাতায় সবুজের আলিম্পন। দিগন্ত-বিস্তীর্ণ ধানের ক্ষেতে সবুজের ঢেউ; নদী ও খালের ধারে শুভ্র কাশগুচ্ছের লীলায়িত মৃদু চামর। শরতের এই মোহন-সুন্দর নয়ন-জুড়ানো রূপ দেখিয়া বাংলাদেশের কবি আবেগ-বিহ্বল কণ্ঠে গাহিয়া উঠেন :

'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী !
ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে !
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে ॥'

বর্ষা-বিদায়ের পর শরতের এই উদার আবির্ভাব সত্যই অনির্বচনীয়। শারদ-লক্ষ্মীর এই অনুপম রূপশ্রী চারিদিকে এক আকুল উচ্ছ্বাসে দিগন্ত ছাপাইয়া যায়। বর্ষণ-ক্লান্ত লঘুভার মেঘের অলস-মন্থর ছন্দে নিরুদ্দেশ-যাত্রা, বর্ষণ... আকাশের সুনীল রূপকান্তি, আলোছায়ার লুকোচুরি, শিউলিফুলের গন্ধ, নদীতীরে কাশফুলের

শারদ-লক্ষ্মীর অনুপম রূপশ্রী

অপূর্ব সমারোহ, প্রভাতে তৃণ-পল্লবে নব শিশিরের আলিম্পন, তাহাতে প্রভাত-সূর্যের রশ্মিপাত— শরতের নয়ন-রঞ্জন রূপের অনবদ্য প্রকাশ। এই সৌন্দর্য-...সিত অপরূপ পটভূমিকায় শস্য-বিচিত্রা ধরিত্রীর নয়ন-ভোলানো রূপলাবণ্য এবং বনভূমির স্নিগ্ধ প্রশান্ত গভীর বর্ণচ্ছটা মনকে এক নিরুদ্দেশ ভাবাবেগে উন্মুখ করিয়া তোলে। এই সঙ্গে নদীর ভরা-স্রোতে ভাসমান পাল-তোলা নৌকার সারি, মাঝিদের সারি-গান এবং শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত রাত্রি সেই রূপের সহিত যোজনা করিয়া দেয় এক অতিরিক্ত অনবদ্য সৌন্দর্য-সুষমা।

এই রূপসৌন্দর্য-বিকাশের মাঝখানে দেখিতে দেখিতে ছুটির বাঁশি বাজিয়া উঠে। 'স্থলে জলে আর গগনে গগনে বাঁশি বাজে যেন মধুর লগনে।' সেই বাঁশি যেন ছুটির বাঁশি, ঘর হইতে বাহির-হইয়া-পড়ার বাঁশি, অজানার উদ্দেশে ছুটিয়া চলার বাঁশি। শরৎ আমাদের ছুটির ঋতু, অবকাশের ঋতু। হাতে তাহার অবকাশ-মঞ্জুরীর চিঠি। তাহার মন-কেমন-করা আকাশের নীলিমা, প্রাণ-উদাস-করা স্নিগ্ধ শীতল বাতাস, হৃদয়-ভুলানো আলোর রাগিণী আমাদের অন্তরের অন্তঃপুরে পাঠায় ছুটির নিমন্ত্রণ। 'তাই দেখি, শরতের রৌদ্রের দিকে তাকাইয়া মনটা কেবল চলি-চলি করে—বর্ষার মত সে অভিসারে চলা নয়, সে অভিমানের চলা।'

শরৎ আমাদের ছুটির ঋতু

শরৎ আমাদের উৎসবের ঋতুও বটে। জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে মাটির কন্যার আগমনী গান বাজিয়া উঠে। মেঘের নন্দী-ভৃঙ্গীর দল শিঙা বাজাইতে বাজাইতে গৌরী শারদাকে ধরা-জননীর কোলে রাখিয়া যায়। বাস্তবিকই, ক্ষান্ত-বর্ষণ আকাশের নীল চন্দ্রাতপের তলে, নানা বৃক্ষলতা ও ওষধির অজস্র সফল অভিব্যক্তির মাঝে প্রকৃতি যেন বিশ্বজননীর পূজার অপূর্ব আয়োজন করিয়া রাখে। বাতাসে ভাসিয়া আসে উৎসবের বাঁশির সুর। পাখি-ডাকা গ্রামগুলির ছায়া-সুনিবিড় আঙিনায় পড়ে উৎসবের আলপনা। এ পূজা যেন শরৎ-ঋতুর পূজা। দেখিতে দেখিতে পূজার আনন্দে মাতিয়া উঠে সমগ্র বাংলাদেশ। নূতন বসন-ভূষণে সাজিবার ধুম পড়িয়া যায়, বাংলাদেশের অন্তরে পড়িয়া যায় এক অভূতপূর্ব প্রাণোচ্ছ্বাসের সাড়া। দুর্গা-পূজা, লক্ষ্মীপূজা, শ্যামাপূজা, ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া—সবই শরৎ-ঋতুর আলোকোজ্জ্বল অবদান।

শরৎ আমাদের উৎসবের ঋতু

শরৎকালের জ্যোৎস্না-পুলকিত রাত্রির যেন তুলনাই মেলে না। তাহা অনির্বচনীয় রূপ[illegible] লইয়া বাংলাদেশের হৃদয়ের দ্বারে আসিয়া দাঁড়ায়। শস্য-শ্যামলা, বনানী-কুন্তলা, নদী-মে[illegible]নীর উপর শুক্লা রজনীতে যখন চন্দ্রোদয় হয়, তখন যেন এক স্বর্গীয় শোভায় চা[illegible]ক সুন্দর, মনোহর ও অনির্বচনীয় হইয়া উঠে। আকাশে ও মাটিতে [illegible] এক নিষ্কলুষ শুভ্রতার অপূর্ব সমারোহের মধ্যে যেন শারদ-লক্ষ্মীর [illegible]য়ের স্নিগ্ধ স্পর্শ পাওয়া যায়। বিগলিত রজতধারার ন্যায় জে[illegible]র পুলকিত প্রবাহে স্নান করিয়া বিশালাক্ষীর মন্দিরের লক্ষ্মীপেঁচাটি যেন এক গভী[illegible]বেগে ডাকিয়া উঠে। তাহার আনন্দ-বিহ্বল কণ্ঠে মর্ত্যে লক্ষ্মীর আগমনী বিঘোষিত হ[illegible]। সেই অনির্বচনীয়তার মধ্যে স্বর্গ পৃথিবীতে নামিয়া আসে, না পৃথিবী স্বর্গে পরি[illegible] হয়, ঠিক বোঝা যায় না। তবে স্বর্গ ও মর্ত্য যেন একাকার হইয়া যায়।

শরতের জ্যোৎস্না-বিধৌত রাত্রি

আমাদের এই আনন্দময় শর[illegible]র অন্তরে আছে অফুরন্ত অশ্রুজলের উৎস। ছুটি ও আনন্দ-উৎসবের কলতান ধীরে ধী[illegible]ান্ত হইয়া আসে। আসে কর্মের আহ্বান, আসে বিচ্ছেদের [illegible]। 'আমাদের শরতে আগমনীটাই ধুয়া। সে ধুয়াতেই বিজয়া[illegible] গানের মধ্যেও উৎসবের তান লাগিল। আমাদের শরতে বিচ্ছেদ-বেদনার ভিতরে[illegible] একটা কথা লাগিয়া আছে যে, বারে

বারে নূতন করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া আসিবে বলিয়াই চলিয়া যায়—তাই ধরার আঙিনায় আগমনী গানের আর অন্ত নাই। যে লইয়া যায় সেই আবার ফিরাইয়া আনে। তাই সকল উৎসবের মধ্যে বড়ো উৎসব এই হারাইয়া ফিরিয়া পাওয়ার উৎসব।' তাই শরৎ যখন আসে, তখন আমাদের মনের সমস্তটাই সে অবলীলায় দখল করিয়া বসে। আবার যখন চলিয়া যায়, তখন সমস্তটাই একেবারে শূন্য করিয়া দিয়া চলিয়া যায়। শরতের ন্যায় অন্য কোন ঋতুর বিচ্ছেদ-বেদনা আমরা এত গভীর করিয়া অনুভব করি না। শরৎ-বিদায়ের পর আমাদের অন্তরলোক সত্যই বিজয়ার গানের মতো বেদনায় খিন্ন ও অশ্রুবিধুর হইয়া উঠে। দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ব্যথাভারাক্রান্ত হৃদয়ে তারপর আমরা কর্মজগতের দিকে পা বাড়াই। কিন্তু আমাদের ব্যথাহত মন পড়িয়া থাকে পিছনে, যেখানে শিউলি-বিছানো শিশির-সিক্ত পথে শরৎ তাহার শেষ পদচিহ্ন আঁকিয়া দিয়া বিদায় লইয়া চলিয়া গিয়াছে।

শরৎকালে ফসল পাকে না। শরৎ তাই ফসল কাটে না। ফসল পাকাইবার কাজ তাহার নয়, ফসল কাটিবার তাড়াও তাহার নাই। সে ফসলের উজ্জ্বল সম্ভাবনার বাণী বহন করিয়া লইয়া আসে। বাংলাদেশ বর্ষায় যে ফসল ফলাইয়াছে এবং যাহা হেমন্তে পাকিয়া উঠিবে, শরৎ সেই আগামী ফসলের শুভ সম্ভাবনার খবর আনিয়া বাংলাদেশের অন্তরে বহাইয়া দেয় এক আবেগময় আনন্দের বান। দেখিতে দেখিতে সেই আনন্দ তাহার বর্ণাঢ্য উৎসবে মূর্ত হইয়া উঠে। তাই তো

অর্থনৈতিক পটভূমি

বাহিরের এই অর্থনৈতিক পটভূমিকায় তাহার অন্তরলোকে শারদীয় উৎসবের প্রাণোচ্ছল আয়োজন। আর, শরৎ যে ফসলের সম্ভাবনার বাণী বহন করিয়া লইয়া আসে, তাহার সুগভীর আশ্বাসেই কৃষিমাতৃক বাংলাদেশের সারা বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ রচিত হয়। সেই আশ্বাসের নিবিড় স্পর্শে বাঙ্গালীর মুখে ফুটিয়া উঠে উৎসবের অমলিন হাসি। শরৎ বাংলাদেশের আনন্দে [illegible] ক-দূত, বাঙ্গালীর মুখের হাসির শুভ বার্তাবহ, সুগভীর আশ্বাসের নিপুণ কারিগর

তারপর বাংলাদেশকে আগমনী ও বিজয়া গান শুনাইয়া উৎসবের আনন্দে মাতাইয়া হাসাইয়া-কাঁদাইয়া শরৎ বিদায় লইয়া চলিয়া যায়। তাহার [illegible] পথে পড়িয়া থাকে বিষণ্ণ ঝরা-কাশের গুচ্ছ, ছিন্ন-ম্লান [illegible]ের মালা, আর নবীন

উপসংহার

ধানের অজস্র মঞ্জরী। শিশিরাশ্রুপূ[illegible]চোখে বাংলাদেশ তাহার বিদায়-পথের দিকে করুণ বিষণ্ণ হৃদয়ে চাহিয়া থাকে। [illegible]। বাঙ্গালীর প্রিয় ঋতু, কিন্তু শরৎ বাংলাদেশের হৃদয়ের ঋতু। বাংলাদেশের হৃদয়ের [illegible]ণিকোঠায় শরতের প্রতিষ্ঠা॥

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- শরৎকালে বাংলাদেশ, মা. '৬৯
- বাংলাদেশে শরৎকালের উৎসব ও আনন্দ, ম' '৬৬
- বাংলার শ্রেষ্ঠ ঋতু

৫.

প্রবন্ধ-সূত্র : সূচনা ॥ সূর্যোদয়ের পূর্বে শীতের সকাল ॥ শীতের সকালের ভাবরূপ ॥ শীতের সকালের বৈরাগ্য-মূর্তি ॥ ত্যাগের মূর্তি ॥ রূপ-বদল ॥ শহরে শীতের সকাল ॥ উপসংহার ॥

শীতের সকাল

উ. মা. '৬৮

পূর্ব-দিগন্তে তখনও আলোর সুষমা পরিপূর্ণরূপে ফুটিয়া উঠে নাই। অথচ বনে বনে পাখিদের হৃদয়ে তাহার গোপন সংবাদ সবার অলক্ষ্যে ছড়াইয়া পড়িল। বনান্তরালে তাহাদের মধুর কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠিল দিবারম্ভের কল-মুখরিত আনন্দ-রাগিণী। এখনই পূর্ব-দিগন্তে রাখালের বেশে আবির্ভূত হইবে সকাল, স্নিগ্ধোজ্জ্বল শীতের সকাল। তাহাকে সাদর স্বাগত জানাইবার জন্য বনে বনে পাখির কণ্ঠে উঠিতেছে মধুর আবাহন-গীতি। তাহাদের শিশির-সিক্ত কণ্ঠে আনন্দের অনবদ্য জোয়ার লাগিল। কুয়াশা-জড়িত বনভূমি প্লাবিত করিয়া তাহাদের কলমধুর গানের সুর-লহরী ছড়াইয়া পড়িল দিক্-দিগন্তে। আর বিলম্ব বড় বেশী নাই। স্বল্পকালের মধ্যেই কুয়াশার ধূমল জাল ছিন্নভিন্ন করিয়া আমাদের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইবে একটি পরিপূর্ণ আলো-ঝলমল সকাল।

সূচনা

লেপের তলা হইতে উঠি-উঠি করিয়াও উঠিতে ইচ্ছা হয় না; শিয়রে হিংস্র শীত কেশর ফুলাইয়া, থাবা পাতিয়া বসিয়া আছে। গরম বিছানার স্ব-রচিত উত্তাপ ছাড়িয়া উঠিতে গেলে কেমন এক দুর্নিবার আলস্য সমস্ত চেতনাকে ঘিরিয়া ধরে। তন্দ্রা-বিজড়িত চেতনায় দূর বনান্তরাল হইতে পাখিদের কল-কূজন শোনা যায়, আর শোনা যায় পথচারীদের বাতাসে-ভাসিয়া-আসা দুই একটি বিচ্ছিন্ন সংলাপ; অথচ চারিদিকে পৃথিবী এক আশ্চর্য নিস্তব্ধতায় মগ্ন। [illegible] সীমাহীন বিষণ্ণতা ও বৈরাগ্যে সকালের হৃদয় কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়া[illegible]। শূন্যতাই বুঝি তাহার সঠিক পরিচয়। শীতের সকালে তাই এক [illegible] জড়তা স[illegible]র চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। কর্মের আহ্বান সত্ত্বেও এক সু[illegible] নৈষ্কর্ম্যের [illegible]ায় মানুষ আরামের শয্যায় পড়িয়া থাকে এবং কল্পনা [illegible]তে পারে, শীতের [illegible] কুয়াশার কম্বল গায়ে দিয়া আগুন পোহাইবার জন্য শুকনো পাতা কুড়াইতে বনের ভিত[illegible] দিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে চলিয়াছে।

সূর্যো[illegible]র পূর্ব শীতের [illegible]

পূর্ব-দিগন্তে ধীরে ধীরে [illegible] ফুটিতে থাকে। উত্তর দিক হইতে হিমগর্ভ ঠাণ্ডা বাতাস একটি দীর্ঘশ্বাসের ম[illegible] হঠাৎ শির্‌শির্ করিয়া বনের গাছগুলির পাতার ফাঁক দিয়া বহিয়া [illegible]। পাতাগুলি সহসা কাঁপিয়া উঠে। টুপ্ টাপ্ করিয়া শিশির [illegible]রিয়া পড়ে। বনের পথ শিশিরে সিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। টিনে[illegible] চালে এবং ঘাসে ঘাসে শিশির-বিন্দু জমিয়া ভোরের আলোয় ঝলমল করিতেছে। দূরে কোথাও খেজুর-রস জ্বাল দেওয়া হইতেছে। বাতাসে তাহার লোভনীয় [illegible] গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে। জ্বাল-দেওয়া

শীতের সকালের ভাবরূপ

খেজুর-রসের গন্ধে বাতাস মো মো করিতেছে। একজন ফেরিওয়ালা 'নলেন গুড়ের সন্দেশ' হাঁকিয়া গেল। তাহার পর আর একজন ফেরিওয়ালা 'ফুলকপি' হাঁকিয়া গেল। গ্রামের রাস্তায় কৃষাণেরা বলদ হাঁকিয়া মাঠের দিকে চলিয়াছে : মুগ, মসুর, ছোলা, অড়হর ইত্যাদি কলাই বুনিবার জন্য সময়মতো ক্ষেত প্রস্তুত করা চাই। এদিকে সরিষার ক্ষেতে মৌমাছিদের গুঞ্জরণ উঠিতে শুরু করিয়াছে। দূরে গ্রামের পাঠশালায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এক বিচিত্র সুর করিয়া কবিতা মুখস্থ করিতেছে। চারিদিকে এই কর্ম-প্রবাহের ব্যস্ততার মধ্যে বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া গভীর আলস্যে তন্দ্রাসুখ উপভোগ করা অনুচিত। তাই অগত্যা সকাতরে গায়ের লেপ সরাইয়া রাখিয়া বিছানা হইতে বাহির হইবার জন্য সচেষ্ট হইতে হয়।

ততক্ষণে বাহিরের পৃথিবীর ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। দিকে দিকে কর্মের মুখরতায় শীতের সকাল কর্মব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব-দিগন্তে আলো ছড়াইয়া সূর্যের রথ আকাশ-পরিক্রমায় বাহির হইয়া পড়িয়াছে। একটি নীলকণ্ঠ পাখি রিক্তপত্র বাবলার ডালে বসিয়া রৌদ্র পোহাইতেছে। একজোড়া ফিঙে মনের আনন্দে সকালের আলোয় হাবুডুবু খাইতেছে। একজোড়া খঞ্জনা পাখি ডানায় বাতাস কাটিয়া কুয়াশার ভিতর দিয়া কোথায় উড়িয়া গেল। শীতের সকাল যেন এক প্রৌঢ়া কুলবধূ। তাহার সলজ্জ মুখখানি দিগন্ত-বিস্তৃত কুজ্ঝটিকার অবগুণ্ঠনে অবগুণ্ঠিত। ধূমল কুয়াশার অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া সে দিগন্তের গা ঘেঁষিয়া ধীর-মন্থর পায়ে চলিতে থাকে। তাহার করুণ বিষণ্ণ চোখ দুইটি দেখা যায় না, তাহার লজ্জাবনত মুখখানিও দেখা যায় না। তাহার আপাদমস্তক কুয়াশার গাঢ় আবরণে ঢাকা। তারপর বেলা বাড়িতে থাকে। শীতের সকালও তাহার কুয়াশার অবগুণ্ঠন ধীরে ধীরে খুলিতে থাকে। তাহার বৈরাগ্য-কঠিন অঙ্গ হইতে শুভ্র-সমুজ্জ্বল ত্যাগের সুষমা বিচ্ছুরিত। সে তাহার সকল সঞ্চয় নিঃশেষে উজাড় করি[illegible] দিয়া ধারণ করিয়াছে এক সর্বত্যাগিনী তাপসী-মূর্তি। দুই [illegible] বিষণ্ণ প্রশান্তি, হাতে বরাভয়। সে কুড়াইতে জানে না, সংগ্রহ করিতে জানে না; জানে শুধু ছড়াইয়া দিতে, উড়াইয়া দিতে।

শীতের সকালের বৈরাগ্য-মূর্তি

তাহার হাতে বৈরাগিণীর একতারা। সে তাহার সেই [illegible]তারার নিঃসঙ্গ তারে হানে নির্মম আঘাত। তাহার ফলে বনের শুষ্ক বিবর্ণ [illegible]গুলি একে একে ঝরিয়া পড়ে। উত্তরের হিমগর্ভ হাওয়া তাহাদের দুই হাতে লুফি লইয়া অবলীলায় উড়াইয়া দেয়। বনের বুকে শুষ্ক পাতার জীর্ণ কবর স্তূপীকৃত হই[illegible] উঠিল। তাহার উপর দিয়া উত্তরের শীতল হাওয়া হাহাকার [illegible]রিয়া কাঁদিয়া চলে। কোথাও আমের মুকুল চুঁয়াইয়া শি[illegible]রের কান্না ঝরিতেছে, কোথাও বাতাসের বুক চিরিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠি[illegible] একটি নিঃসঙ্গ শঙ্খচিল। এদিকে পাকা ধান কাটিয়া দিগন্ত-প্রসারিত মাঠখানিকে [illegible]সাণেরা রিক্ত করিয়া তুলিল। পাকা ধান নৌকায়, গোরুর গাড়িতে কিংবা [illegible]ষাণদের ভারে বোঝাই হইয়া গ্রামের রাস্তা তাহার গন্ধে আমোদিত করিয়া চলিয়াছে অলস মন্থর গতিতে। রাস্তায় ও মাঠে

ত্যাগের মূর্তি

রাশি রাশি কলাই ফলিয়া উঠিয়াছে। তাহার সবুজ ঘ্রাণ সকালের বাঁতাসকে ভারী করিয়া তুলিয়াছে। কুয়াশার গন্ধ, পাকা ধানের গন্ধ, সবুজ কলাইর গন্ধ, দূর হইতে ভাসিয়া-আসা খেজুর রসের গন্ধ—সমস্ত মিলিয়া ধরণীর মাটির পাত্রটিকে কানায় কানায় পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে।

তারপর বেলা বাড়িতে থাকে। শীতের সূর্য পূর্ব-দিগন্তের কুয়াশার জাল ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া পরম ঔদাস্যে উপরে উঠিতে থাকে। তাহার রশ্মি-বাণে পর্যুদস্ত হয় শীতের তীব্রতা। প্রার্থিত রৌদ্রে চারিদিক ভাসিয়া যায়। রৌদ্রের পাত্রে শীতের সকাল যেন একবিন্দু শিশিরের মতো টলমল করিয়া কাঁপিতে থাকে।

রূপ-বদল

দূরে রাখাল ছেলে বাঁশি বাজায়। মাঠে লেজ দুলাইয়া মনের আনন্দে গোরুগুলি চরিতে থাকে। ধীরে ধীরে রৌদ্রের তাপ বাড়িতে থাকে। উত্তরের বাতাসের ধারও ধীরে ধীরে কমিয়া আসে। গায়ের গরম জামা-কাপড়গুলিকে তখন হালকা করিবার প্রয়োজন অনুভূত হয়।

শহরের শীতের সকালগুলির মূর্তি ভিন্নরূপ। ভোরের কাকের ডাকে শহরের শীতের সকালের ঘুম ভাঙে। সেখানেও শিশির পড়ে, কিন্তু তাহাতে সবুজ ঘাসের গভীর করুণ ঘ্রাণ মিশিয়া থাকে না। সেখানেও উত্তরের শীতল হাওয়া বহিয়া আসে; কিন্তু তাহাকে খেজুরের রস কিংবা নলেন গুড়ের মন-মাতানো গন্ধ আমোদিত করিয়া তুলে না। শহরের শীতের সকাল কেবল কাকের ডাক, কলের শব্দ, কেরোসিন-

শহরের শীতের সকাল

কয়লার গন্ধ এবং বাস-ট্রামের ঘড়ঘড়ানিই লইয়া আসে। অবশ্য রাস্তায় ফেরিওয়ালা খেজুর-রস, ফুলকপি, বাঁধাকপি হাঁকিয়া যায়। কিন্তু শহরের ইট-কাঠ-পাথরের কৃত্রিম কাঠিন্যের মধ্যে গ্রাম-বাংলার উদাস-করুণ শীতের সকালের ধ্যান-সমাহিত স্নিগ্ধ-মধুর রূপটিকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সেখানে সওদাগরী অ্যাকেনার ভিড়ে শীতের সকালও যেন খানিকটা কেতাদুরস্ত হইয়া শহরে ভয়ে ভয়ে প্র... দিবার পায়।

শ... [illegible] ...থরের নিদারুণ চাপে শীতের সকাল তাহার নিজস্ব মূর্তিতে প্রকাশিত হইতে পারে না। এখানে কুয়াশার সেই স্নিগ্ধ জলুস নাই। তাহার পরিবর্তে ধুঁয়াশায় মানুষের বুঝি শ্বাসরোধ হইয়া আসে। তবু কুয়াশার বুক চিরিয়া যখন ভোরের বা... কিংবা ট্রামটি দুলিতে দুলিতে ভাসিয়া আসে, তখন সত্যই অপূর্ব ... । শহরে রাজপথে শীতের রূপ কুণ্ঠিত হইলেও গরম-চা ও

উপসংহার

তেল ভাজার গন্ধে তাহাকে সংগোপনে আত্মপ্রকাশ করিতে দেখা যায়। কিন্তু শীতের সকালের ... প্রধান আকর্ষণ—খেজুর-রস কিংবা পায়েস ও পিঠেপুলি, তাহার জন্য শহর ছাড়িয়া দূরে গ্রাম-বাংলায় যাইতে হইবে। সেইখানেই শীতের সকাল তাহার সৌন্দর্যের ও মাধুর্যের ... পসরা সাজাইয়া আজও বসিয়া আছে॥

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- **শীতকালের সকাল**
- **শীতের সকালের বিশিষ্ট রূপ**

প্রবন্ধ-সূত্র ঃ সূচনা ॥ কলিকাতায় প্রকৃতির প্রবেশ নিষিদ্ধ ॥ কলিকাতায় বর্ষার আগমন ॥ বর্ষায় কলিকাতার রাস্তার দৃশ্য ॥ শিশুর দল ॥ কলিকাতার বর্ষায় নাগরিক জীবন ॥ আলোকের পিছনে অন্ধকার ॥ অন্ধকারের ইতিকথা ॥ উপসংহার ॥

বর্ষার কলিকাতা

"রামগিরি হইতে হিমালয় পর্যন্ত প্রাচীন ভারতবর্ষের যে দীর্ঘ এক খণ্ডের মধ্য দিয়া মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা ছন্দে জীবন-স্রোত প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে সেখান হইতে, কেবল বর্ষাকাল নহে, চিরকালের মতো আমরা নির্বাসিত হইয়াছি।"

—রবীন্দ্রনাথ

সূচনা

নিষ্ঠুর পাষাণ-কায়া কলিকাতা। ঋতুতে ঋতুতে প্রকৃতির যে বর্ণ-বিলাস, যে রূপবিস্তার, তাহা এখানে অনুপস্থিত। বর্ষা-প্রকৃতির মোহিনী মায়া, যূথীবন-বিধৌত শারদ-প্রকৃতির বিগলিত স্বর্ণ-কান্তি ও অমলিন শিউলি-সুরভি, শীতের বৈধব্য-মূর্তি, মায়াবী বসন্তের রূপাভিসার ও তাহার রক্তিম প্রগল্‌ভতার এখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ। এখানে কেবল মরুভূমির ধূধূ-বিস্তার, ইট-কাঠ-পাথরের হৃদয়হীন মরুমায়া! আমরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অলকাপুরী হইতে মরু-যন্ত্রণাময় রামগিরি-শিখরে প্রভুশাপে চির-নির্বাসিত হইয়াছি।

কলিকাতায় প্রকৃতির প্রবেশ নিষিদ্ধ

তবু কলিকাতার আকাশে নিদাঘ-সূর্যের ক্রোধ প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মতো ফাটিয়া পড়ে, বর্ষায় মেঘের পর মেঘ জমিয়া উঠিয়া আকাশের বুক ভরিয়া তোলে সজল-স্নিগ্ধ, আকাশের নিবিড় নীলিমা ঘোষণা করে শরতের আগমন, উত্তরের হিম-শীতল বাতাস বহিয়া আনে শীতের আমেজ, আবার দক্ষিণের মৃদু-মন্দ সমীরণ জানাইয়া দেয় নব-বসন্তের শুভ আগমন-বার্তা। সমস্তই রুটিন-মাফিক নিয়মিত আসে; কিন্তু সবই যেন কুণ্ঠিত, সীমাবদ্ধ ... সংকুচিত। কলিকাতা ঋতুদের অবাধ আবির্ভাব পছন্দ করে না ... সজ্জিত প্রকৃতিকে সে দ্বারের বাহিরে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া লাভ-ক্ষতির হিসাবের অঙ্ক কষে কিংবা প্রকৃতির সৌন্দর্য-পুরীর দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া সে ভারবাহী গর্দভের মতো হিসাবের খাতা বহিয়া মরে।

কলিকাতায় বর্ষার আগমন

তবু পাষাণ-পুরীর ইট-কাঠ-পাথরের কঠিন নিষেধ অমান্য করিয়া কলিকাতার আকাশে আবির্ভাব হয় নববর্ষার। 'গুরু গুরু মেঘ গুমরি' গুমরি গরজে গগনে গগনে।' আকাশের বিদ্যুৎ-বিকাশে ও বজ্র-নিঃস্বনে কলিকাতায় বর্ষা আগমন বিঘোষিত হয়। গুরু-গম্ভীর পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের নবোদয়ে সওদাগরী অফিসের হিসাব-রক্ষকের হিসাবের অঙ্কের ভুল হয় কেনা জানি না; কিন্তু গ্রীষ্মের প্রখর শাসনের পর বৃষ্টির ধারাবর্ষণে, বাতাসের শীতল স্পর্শে কলিকাতার নাগরিক জীবনে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস নামিয়া আসে। ছায়াহীন কলিকাতার তাপদহন-ক্লিষ্ট পিচ-গলা দিনগুলির অবসান হয়।

নবযৌবনা বর্ষা যখন ঘন-গৌরবে অতি-ভৈরব-হরষে কলিকাতার আকাশে আবির্ভূত হয়, তখন তাহার জলসিঞ্চিত ক্ষিতি-সৌরভে নাগরিক হৃদয়ে নামিয়া আসে এক অনবদ্য প্রশান্তি। এখানে বর্ষার অবারিত সৌন্দর্য-বিস্তারের জন্য বনভূমি নাই, নদ-নদী নাই। বিস্তীর্ণ প্রান্তর নাই। এখানে দিগন্ত কুণ্ঠিত, বর্ষার আগমনও তাই অবগুণ্ঠিত। কিন্তু তাই বলিয়া কলিকাতার বর্ষা একেবারে বৈচিত্র্যহীন নয়। গলির মুখে ঘোলা জল থই থই করে, বড় বড় রাজপথ জলে ভাসিতে থাকে, পার্কগুলি যেন লেকের ক্ষুদ্র সংস্করণে পরিণত হয়। সঙ্গে সঙ্গে ছাতা ও বর্ষাতির ভিড়ে কলিকাতার পথ-ঘাটের চেহারা যায় বদলাইয়া। পথচারীদের কেহ-বা ভিজিতে ভিজিতে দোপদুরস্ত পোশাক-পরিচ্ছদের পাট-ভাঙা আভিজাত্য অক্ষুন্ন রাখিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে করিতে হাঁটুজল ভাঙ্গিয়া গন্তব্য-স্থলের দিকে অগ্রসর হয়। বাসগুলি ভারী মাল-বোঝাই জাহাজের মতো রাস্তার জলে তরঙ্গ-সংঘাত সৃষ্টি করিয়া ভীষণ আক্রোশে ছুটিয়া চলে। বিশেষতঃ 'ডবল ডেকার'গুলির জল ভাঙ্গিয়া অগ্রগমনের দৃশ্য সত্যই উপভোগ্য হইয়া উঠে। আর যাহারা আরোহী, তাহাদের তো কথাই নাই। স্বল্প টিকিটে তাহারা কলিকাতার রাস্তায় স্টীমার-ভ্রমণের আনন্দ লাভ করে। বাঁকা জলের তরঙ্গ-রেখা দোকানগুলির উপকূল স্পর্শ করে। পথচারীদের বেশবাস ভিজাইয়া দিয়া প্রকৃতি তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

বর্ষায় কলিকাতার রাস্তার দৃশ্য

'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান।' বর্ষার আগমনে কলিকাতার শিশুদের মনেই আনন্দের জোয়ার আসে বেশী। তাহারা প্রথমে ছড়া কাটিয়া বর্ষার আগমনী গান গাহিয়া উঠে। বৃষ্টিতে ভিজিয়া, রাস্তার ঘোলা জলে সাঁতার কাটিয়া তাহার আনন্দে আত্মহারা হইয়া যায়। কেহ ভাসায় কাগজের ময়ূরপঙ্খী কেহ ভাসায় কলার মোচার সপ্তডিঙা, কেহ ভাসায় চটি-জুতার মধুকর। ময়ূরপঙ্খী-সপ্তডিঙা-মধুকরের সারি বাঁকা জলের স্রোতে হেলিয়া-দুলিয় সু... কোন কল্পনা-রাজ্যের উদ্দেশে ভাসিয়া চলে।

শিশুর দল

স... ...রিমায় ঢাকা। তাহা হইতে চলিয়াছে অবিরল ধারা-বর্ষণ মেঘে মেঘে কখন বেলা হইয়া যায়, কেহ জানিতে পারে না। অফিসে কে যাইবে যাহারা যাইবার ... যাহারা মাঝপথে বিপদে পড়িয়াছে কিংবা অফিস হইতে ফিরিবা পথের দুর্ভাবনায় ...ল। যাহারা অফিসে যায় নাই, তাহারা বাড়িতে মহানন্দে তাসখেলায় মাতিয়া ...ছে। স্কুল-কলেজের আজ বহু-বাঞ্ছিত 'রেনি-ডে'। ছাত্রদে অ... অনধ্যায়। তাহাদের কেহ সিনেমায় লাইন দিয়াছে, কেহ-ব খেল মাঠে ভিড় জমাইয়া তুলিয়াছে। বাড়িতে খিচুড়ি, ইলি মাছ ভ...র ধুম। দোকানে তেলেভাজার গন্ধ। সমস্ত মিলি কলিকাতার বর্ষণ-মুখর আকাশ ... মাতাইয়া তুলিয়াছে। ঘরে-ঘরে আজ অলস আড্ড চায়ের দোকানে-দোকানে গল্পের ...লিস। বাহিরের ধারা-বর্ষণের সঙ্গে পাল্লা দি চলিয়াছে রাজনীতি-অর্থনীতি-সাহিত্য আলোচনার তুমুল তর্ক। তাহারই মাঝখা একটি করুণ রাগিণীর মতো বাজিয়া চ...য়াছে রাস্তায় রিক্সার ঠুন্ ঠুন্ আওয়াজ।

কলিকাতার বর্ষায় নাগরিক জীবন

বর্ষার দিনে কলিকাতায় গৃহে প্রত্যাবর্তন এক সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। যানবাহন বন্ধ হইয়া যায়। ফলে, গৃহমুখী মানুষকে আকাশের ধারাজলে স্নান করিতে করিতে বাড়ি ফিরিতে হয়। পায়ের জুতার পদোন্নতি ঘটে ; পরনের কাপড়েরই যত দুর্গতি। রাস্তার জলে কাপড় যায় ভিজিয়া। মহিলাদের অসুবিধার অন্ত থাকে না। ধোপদুরস্ত বাবুরা যখন ঠেলাগাড়ি চড়িয়া জলমগ্ন রাস্তা পার হন, তখন একটি কৌতুকপূর্ণ দৃশ্যের অবতারণা হইয়া থাকে। সারাদিন সূর্যের মুখ দেখা যায় না। ঘরে ঘরে ভিজা কাপড়ের স্তূপ জমিয়া উঠে।

আলোকের পিছনে অন্ধকার

নবধারাজলে স্নানের আনন্দে যখন শহর-কলিকাতা পুলকিত, ঠিক তখনই তাহার অন্তরলোকের সংবাদ কিন্তু আনন্দ-বেদনার মিশ্র অনুভূতিতে রহস্যময়। প্রাসাদময়ী কলিকাতার মুখে হাসি ফুটিলেও তাহার দারিদ্র্য ও হাহাকারপূর্ণ বস্তিগুলির চোখে জল আর ধরে না। উপরের চালা ভেদ করিয়া বৃষ্টির জল ঝরিতে থাকে ; আর ঠিক তখনই রাস্তার জল ঘরে ঢুকিয়া চারিদিক একাকার করিয়া দেয়। রান্না-খাওয়া মাথায় উঠে। নোংরা জলের আক্রমণ হইতে গৃহস্থালীর দ্রব্যসামগ্রী ও বিছানাপত্র বাঁচাইতে তখন বস্তিবাসীদের হিমসিম খাইতে হয়।

প্রাসাদ-নগরী কলিকাতার জল-নিষ্কাশন-ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয় বলিয়া এই দুরূহ সমস্যা বর্ষাকালের একটি চিরন্তন ব্যাপার। কলিকাতা পৌর নিগমও ইহার সমাধানে যথেষ্ট যত্নশীল নয়। সে যাহাই হউক, কলিকাতা-নগরীতে যাহারা বস্তিবাসী, স্টেশনের প্লাটফর্ম কিংবা ফুটপাত যাহাদের একমাত্র আশ্রয় এবং যাহারা রোজ আনে রোজ খায়, সেই ফেরিওয়ালাদের এই সময় অসুবিধার অন্ত থাকে না।

অন্ধকারের ইতিকথা

রিক্সাওয়ালাদের এই সময় কষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহারা এই সময় বেশ দু'পয়সা রোজগার করিতে পায়। ইহাই কলিকাতার অন্ধকারময় জীবনের ইতিকথা।

কলিকাতার বর্ষার মেঘ-সৌন্দর্য নাই, নাই বৃষ্টি-বাহার, পত্র-মর্মর নাই, পক্ষী কাকলি নাই, জলের কলধ্বনিও নাই—পল্লী-বাংলার বর্ষণ-সৌন্দর্যের কিছুই [illegible]। মেঘের 'পরে মেঘ জমিয়া আকাশ আঁধার করিয়া আসিলে [illegible] না, দিদিমারাও আর বলেন না সেই চির-নূতন রূপকথার গল্প। ছোট ছোট [illegible]মেয়েরাও আর আকাশে ঘনায়মান মেঘের দিকে চাহিয়া সুর করিয়া ছড়া [illegible]ট না—'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এলো বান।' শিব[illegible]রাও এখানে আর বিবাহের সাজে সাজেন না। কলিকাতা [illegible]ধানী পাষাণ-কায়া'।

উপসংহার

তবু বাতায়ন-পথে শোনা যায় রবীন্দ্র-কাব্যের আবৃত্তি কিংবা [illegible]তারে রবীন্দ্র-সংগীতের বর্ষার গান। কেহ আবৃত্তি করে—'হৃদয় আমার নাচে রে [illegible]জিকে ময়ূরের মত নাচে রে।' কেহ গায়—'আজি বারি ঝরে ঝর ঝর ভরা বাদরে।' বর্ষার কলিকাতার তাহাই অনির্বচনীয় সৌন্দর্য!!

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- বর্ষায় নাগরিক জীবন
- কলিকাতায় বর্ষার রূপ

প্রবন্ধ-সূত্র : সূচনা ॥ সংস্কৃতির প্রকৃত পরিচয় ॥ বাংলার সংস্কৃতির মূল-সূত্র ॥ বঙ্গ-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হইল ধর্ম ॥ লোক-সাহিত্য লোক-সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি ॥ কারু-শিল্পে বঙ্গ-সংস্কৃতির অম্লান স্বাক্ষর ॥ বঙ্গ সংস্কৃতির রূপ-রূপান্তর ॥ বঙ্গ-সংস্কৃতির সংকট ॥ উপসংহার ॥

বাংলার সংস্কৃতি

গৌ. প্রা. '৭৪

সংস্কৃতি হইল জাতির চিৎ-প্রকর্ষের ব্যঞ্জনাময় প্রকাশের সম্মিলিত যোগফল। জাতির যুগ-যুগান্তের স্বপ্ন ও সাধনা, তাহার ভাব-লোকের গৌরব-সমুন্নতি তিলে তিলে দান করিয়া সৃষ্ট হয় সংস্কৃতির বহমান জীবন্ত ধারা। সমগ্র জাতির চিন্তাধারা, ভাবধারা ও কর্মধারার গৌরবময় প্রতিচ্ছবি হইল তাহার সংস্কৃতি। 'মানবীয় আচার-পদ্ধতি, শিক্ষা-দীক্ষা, মানসিক উন্নতি, পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব—এই সবের সমন্বয়ের এক অপূর্ব মনোভাবই হইতেছে সংস্কৃতি।' জাতির সর্ববিধ বিষয়ে সর্বাঙ্গীণ উন্নতির চরমতম পরিণাম-ফল হইতেছে তাহার সংস্কৃতি।' কাজেই, সংস্কৃতির মুকুরে ধরা পড়ে জাতির এমন একটি মানস-প্রবণতা, এমন একটি সামাজিক অনুষ্ঠানময়তা, শিল্প-সাহিত্যের এমন কারুকৃতি, ধর্মের ভাব-প্রেরণা ও ঐতিহ্যের চরম সমুন্নতি, যাহা জাতির আনন্দময় অবচেতন মনের সামগ্রিক প্রয়াস যাহা যুগ-যুগান্তরের নিরবচ্ছিন্ন সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ ফসল। সংস্কৃতি সমগ্র সমাজের যৌথসৃষ্টি, সম্মিলিত সফলতা, জাতির প্রাণচ্ছন্দের চিন্ময় ও কর্মময় অভিব্যঞ্জনা। কাজেই, সাংস্কৃতিক ইতিহাসের স্বর্ণ-তারেই বাজিয়া উঠে সমগ্র জাতির কল্লোলিত মর্মবাণী।

সূচনা

'সংস্কৃতি'র মধ্যে আছে যেমন সামগ্রিকতার সমানাধিকার, তেমনি আছে তাহার 'কৃতি' বা কৃতিত্বময়তার দিক। যে জাতি বাঁচিয়া আছে, সে প্রতিনিয়ত সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে একটি বহমান সংস্কৃতির ধারা। সংস্কৃতিই জাতীয় প্রাণময়তার সামগ্রিক অভিব্যক্তি। মানুষ তাহার কথায়-বার্তায়, চলনে-বলনে, পোশাকে-পরিচ্ছদে, খেলা-ধূলায়, আমোদ-প্রমোদে প্রতি মুহূর্তে তাহার বিচিত্র সংস্কৃতির ধারা রচনা করিয়া চলিয়াছে, রক্ষা করিয়া চলিয়াছে সংস্কৃতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রবহমানতা। যে জাতির সংস্কৃতির রূপান্তর নাই, নাই ক্রম-বিবর্তন, তাহার সংস্কৃতি মৃত, সেই জাতিও মৃত। কারণ, সংস্কৃতির মধ্যেই নিয়ত ধ্বনিত-প্রতিধ্ব[illegible] হয় সমগ্র জাতির প্রাণের হৃৎস্পন্দন।

সংস্কৃতির প্রকৃত

বাংলার সংস্কৃ[illegible] সৃষ্টি ও বিকাশের মূলে রহিয়াছে তাহার অফুরন্ত প্রাণ-প্রাচুর্য এবং তাহার প্রকৃতির [illegible]বারিত দাক্ষিণ্য। সব-ভারতীয় সংস্কৃতির সহিত তাহার নিবিড় যোগ-বন্ধন থাকিলেও [illegible] তাহার স্বতন্ত্র প্রাণ-রসের সকল অভিব্যক্তিতে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত, 'আপনাতে আপনি বিকা[illegible]ত'। সর্ব-ভারতীয় প্রাণ-গঙ্গা যেমন বাংলাদেশের কোমল মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া পদ্মা ও ভাগীরথী নাম পরিগ্রহ করিয়াছে, তেমনি সব-ভারতীয় সাংস্কৃতিক ধারা বাঙালী মনী[illegible] বিশিষ্টতায় এবং হৃদয়াভিব্যক্তির অনন্যতায় স্বতন্ত্র বাঙ্গালী সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত [illegible]ইয়াছে। কাজেই, কেবল অস্ট্রিক-দ্রাবিড়-গোষ্ঠীই নয়,

ই খিড় ঢুক রাম গাঁড়ার বোঝল এক দেছে তুল শীর্ষ'। সর্বশেষে আসিয়াছে 'প্রবল ধর্ম'। বাঙালী কাহাকেও দূরে সরাইয়া রাখে নাই। সকলকে সে অন্তরে গ্রহণ করিয়াছে। সকলের সংস্কৃতির তিল তিল সোনা সংগ্রহ করিয়া সে রচনা করিয়াছে তাহার সংস্কৃতির অনবদ্য তিলোত্তমা-মূর্তি। কিন্তু তাই বলিয়া সে তাহার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জন দেয় নাই। সে সর্ব-ভারতীয় সংস্কৃতির কমলমণির উপর তাহার স্বাতন্ত্র্যের দ্যুতি সংযোজিত করিয়াছে। বাঙ্গালী সংস্কৃতি তাই সর্ব-ভারতীয় সংস্কৃতির উপধারা হইয়াও পৃথক, স্বতন্ত্র।

লার সংস্কৃতির -সূত্র

বঙ্গ-সংস্কৃতির প্রাণ-কেন্দ্র হইল তাহার ধর্ম। সেই ধর্ম লৌকিক ও পৌরাণিক বিশ্বাসের সমন্বয়ে রচিত। লৌকিক দেব-দেবী ও পৌরাণিক দেব-দেবী এখানে যুগ যুগ ধরিয়া পাশাপাশি বসবাস করিতেছেন। সহাবস্থানের ফলে তাঁহারা কখনও কখনও অভিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। চণ্ডী, ষষ্ঠী, মনসা, ধর্মঠাকুর, ওলাবিবি প্রভৃতিকে লইয়া রচিত হইয়াছে নানা গীতি, নানা চিত্র, সৃষ্ট হইয়াছে তাহার বিশাল লোক-সাহিত্যের ধারা। সেই লোক-সাহিত্যের বিশাল দর্পণে ধরা পড়িয়াছে সমগ্র সমাজের অব্যর্থ রূপচিত্র।

ঙ্গ-সংস্কৃতির প্রাণ-কেন্দ্র হইল ধর্ম

বাংলার লোক-সাহিত্যের মধ্যে দেখা যায় তাহার লোক-সংস্কৃতির জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। শিবায়ন-মঙ্গলকাব্যে, যাত্রা-পাঁচালী ও কবিগানে, বাউল-ভাটিয়ালী-জারি-সারি-মুর্শিদা ও কীর্তনের গানে বাঁচিয়া রহিয়াছে বাঙ্গালীর অফুরন্ত প্রাণসত্তা। ফুল্লরা-খুল্লনা, বেহুলা-লখীন্দর, কালু-লখ্যা, মেনকা-উমা, মহুয়া-মলুয়া, লীলা-কঙ্ক, সোনাই-কাজলরেখা—ইহারা আমাদের প্রাণেরই প্রতিচ্ছবি। ইহাদের মধ্যে রহিয়াছে যেমন বিপুল বৈচিত্র্যের ব্যাপ্তি, তেমনি আছে অশ্রুধারার অফুরন্ত উৎস। ইহাদের আশ্রয় করিয়া বাঙ্গালী যত কাঁদিয়াছে, তাহার তুলনা আর কোন জাতির ইতিহাসে নাই। সেই রূপসৃষ্টির অপূর্ব মায়াকাজলে অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে তাহার ব্রতকথা, রূপকথা ও ছেলে-ভুলানো ছড়াগুলি।

লোক-সাহিত্য লোক-সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি

বঙ্গ-সংস্কৃতির অম্লান স্বাক্ষর রহিয়াছে তাহার গৃহ-নির্মাণ-পদ্ধতিতে ... তা, ভাস্কর্যে ও মৃৎশিল্পে। বাঙ্গালী কারিগরের মতো আটচালা-নির্মাণের নৈপুণ্য আর কাহারও নাই। কৃষ্ণনগরের শিল্পীদের হাতের তৈয়ারী মাটির পুতুল, কালীঘাটের অঙ্কিত পট, বাংলার মেয়েদের হাতে আঁকা আলপনা, নক্সী-করা কাঁথা আজিও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তা ছাড়া, হাঁড়ি-কলসী, বাসন ও বস্ত্রে সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম প্রশংসনীয় গৌরব অর্জন করিয়াছে। শীতলপাটি-মাদুর, মোড়া ও আসন তৈয়ারীতে বাঙ্গালী সংস্কৃতির রহিয়াছে স্মরণীয় স্বাক্ষর।

কারু-শিল্পে বঙ্গ-সংস্কৃতির অম্লান স্বাক্ষর

বাঙ্গালী সংস্কৃতির জন্ম প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে। অষ্ট্রিক-গোষ্ঠীর মানুষেরাই প্রথমে এই সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল। তাহার পর আসিয়া যুক্ত হইয়াছে দ্রাবিড় ও ভোট-ব্রহ্ম সংস্কৃতির ধারা। পরবর্তীকালে তাহার সহিত মিলিত হইল সর্ব-ভারতীয় পৌরাণিক সংস্কৃতির ধারাস্রোত। সেই সমন্বয় সম্পূর্ণ হইয়াছিল অষ্টম শতকের

কাছাকাছি সময়ে। সেই সময় হইতেই বাঙালী-সংস্কৃতির সূচনাও। আদিম ভোট-ব্রহ্ম সংস্কৃতির মৌল প্রেরণায় এবং হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈনধর্মের প্রভাবে যে বাঙালী-সংস্কৃতির বিকাশ হইয়াছিল, দ্বাদশ শতকের কাছাকাছি সময়ে তাহার উপর আসিয়া পড়িল মুসলমান সংস্কৃতি—বিশেষ করিয়া সুফী সাধনার প্রভাব। আজ বাংলার লোক-সংস্কৃতি তো হিন্দু-মুসলমানের যৌথ সম্পত্তি। তাহার পর অষ্টাদশ শতকে বাংলাদেশে আসিল ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার ঢেউ। বাঙ্গালী তাহাকেও বাঁধিয়াছে নিবিড় যোগ-বন্ধনে। কিন্তু প্রাচীন বাংলার লোক-সংস্কৃতিতে লাগিল ভাঙ্গনের নির্মম আঘাত। পল্লী-কেন্দ্রিক বঙ্গ-সংস্কৃতি সেই রূপান্তরের মধ্য দিয়া হইয়া পড়িল নগর-কেন্দ্রিক এবং তাহার অফুরন্ত প্রাণ-উৎস ধীরে ধীরে আসিল শুকাইয়া।

বঙ্গ-সংস্কৃতির রূপ-রূপান্তর

আজ বঙ্গ-সংস্কৃতি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে চরম সংকটের মুখে। রাজনৈতিক চক্রান্তে আজ বাংলাদেশ দ্বিধা-বিভক্ত। দেশ বিভক্ত হইয়াছে; রাজনৈতিক ছুরিকাঘাতে বাংলার প্রাণ-প্রবাহিনী পদ্মাও বিভক্ত হইয়াছে। কিন্তু যুগ যুগ ধরিয়া বাঙ্গালী তাহার সম্মিলিত সাধনার দ্বারা যে অনবদ্য সংস্কৃতির উপচার সাজাইয়াছে, তাহা কি কখনও বাহিরের চক্রান্তে বিভক্ত হইতে পারে? বঙ্গ-প্রেমিকের আজ তাহাই একমাত্র আশা-ভরসা, তাহাই একমাত্র সান্ত্বনা। আজ দেশ-বিভাগের সীমারেখার ওপারে মহুয়া-মলুয়া-কাজলরেখার দল কাঁদিতেছে, এপারে কাঁদিতেছে ফুল্লরা-বেহুলা-খুল্লনার দল। ওপারে ভাটিয়ালি, এপারে বাউল। তাহার উপর আজ আসিয়া পড়িতেছে প্রবল মার্কিনী প্রভাব। যাহা অবশিষ্ট ছিল, উৎকট যান্ত্রিকতার বিষ-নিঃশ্বাসে এবং মার্কিন সংস্কৃতির অগ্নিশিখায় তাহা ভস্মীভূত হইতে চলিয়াছে। ভিতরের ও বাহিরের আঘাতে বাংলার সংস্কৃতি আজ ক্ষতবিক্ষত, বিপর্যস্ত।

বঙ্গ-সংস্কৃতির সংকট

রবীন্দ্রনাথ তাই একদিন সখেদে বলিয়াছিলেন—'সমস্ত দিনের দুঃখধান্দার রিক্তপ্রান্তে নিরানন্দ ঘরে আলো জ্বলবে না, সেখানে গান উঠবে না আকাশে। ঝিল্লী ডাকবে বাঁ... ন, ঝোপঝাড়ের মধ্য থেকে শেয়ালের ডাক উঠবে প্রহরে-প্রহরে, আর সেই সময়ে শিক্ষা... ...ত আলোয় সিনেমা দেখতে ভিড় করবে।' তবু আশা করিব, বঙ্গ-সংস্কৃতি এই সংকট উত্তীর্ণ হইবে, এই রূপ-রূপান্তরের মধ্য দিয়া জন্মলাভ করিবে আগামীকালের উজ্জ্বল বঙ্গ-সংস্কৃতি। ভিতরের ও বাহিরের দুর্জয় আ... আজ বাঙ্গালীর প্রাণ-পুরুষ জাগিয়া উঠিয়াছে। সে আর এপার বাংলা-ওপার বাংলার ...কৃতির মাঝখানের কৃত্রিম ভেদ-রেখাকে স্বীকার করিবে না। সে তিল তিল করিয়া বু...র রক্ত ও ভালোবাসা দিয়া সংস্কৃতির যে স্বর্ণ-প্রতিমা নির্মাণ করিয়াছিল, বুকের রক্ত তি... তিল দান করিয়া সে আবার তাহার পুনরভিষেক করিবে।

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- বাঙ্গালীর সংস্কৃতির পরিচ...
- বাঙ্গালীর সংস্কৃতির রূপ-রূপা...
- বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য, গৌ. প্রা. '৬

৮.

প্রবন্ধ-সূত্র : সূচনা ॥ বাংলার প্রধান গৃহপালিত পশু : গোরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল, গাধা, ঘোড়া, কুকুর, বিড়াল ॥ বাংলার অরণ্য-পালিত পশু : হাতী, চিতাবাঘ, নেকড়ে বাঘ, সজারু, খরগোশ, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, হরিণ, শিয়াল, নেউল ॥ বাংলার পাখি : ডাঙার পাখি : দোয়েল, শ্যামা, ফিঙে, পাপিয়া, বুলবুল, কোকিল, বউ-কথা-কও, ঘুঘু, বাদুড়, লক্ষ্মীপেঁচা ॥ জলের পাখি : পাতিহাঁস, রাজহাঁস, বক, মাছরাঙা, ভরত পাখি, ধনেশ, বেলেহাঁস, কাদাখোঁচা, জলপিপি, পানকৌড়ি, চিল, গাঙ্-চিল, গাঙ্-শালিক ॥ উপসংহার ॥

বাংলার পশুপাখি

মা. '৫৬

বাংলাদেশের অপূর্ব প্রাকৃতিক রূপসম্ভারের মতো, বাঙালী জাতির নিজস্ব বিশিষ্ট মানসিকতা ও হৃদয়-সৌন্দর্যের মতো বাংলাদেশের পশুপাখির রূপ-প্রকৃতিরও আছে এমন এক স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, যাহা অনায়াসে চোখে পড়িবার মতো। বঙ্গ প্রকৃতি যেন আপন হস্তে তাহার পশুপাখির রূপ-প্রকৃতি রচনা করিয়া দিয়াছেন। বিচিত্র বর্ণ-বাহারে ও অপূর্ব কণ্ঠ-মাধুর্যে তাহারা দীর্ঘকাল বাঙালী জাতির মনোহরণ করিয়া আসিয়াছে। বাংলাদেশের শ্যামলী-ধবলী হইতে আরম্ভ করিয়া

সূচনা

চন্দনা 'বউ-কথা-কও' পর্যন্ত—বঙ্গ-প্রকৃতির হৃদয়ের সেই সরলতাময়, মাধুর্যপূর্ণ অভিব্যক্তির নিশ্চিত প্রতীক। পূর্ব-দিগন্তে সপ্তাশ্বের বিজয় ঘোষণার পূর্বেই তাহারা সমবেত কলকাকলিতে বাঙালীর ঘুম ভাঙায়, সারাদিন সেবা ও সৌন্দর্যে করে মনোরঞ্জন, দিনান্তে এক অপূর্ব বিদায়-রাগিণী সৃষ্টি করিয়া তাহারা ঘরে ফেরে। আবার, রাত্রি-নিশীথে তাহারা বনান্তরাল হইতে আপন সংগীত-প্রসন্নতা দিয়া বাংলাদেশের নৈশ আকাশ প্লাবিত করিয়া দেয়। ইহারা বঙ্গ-প্রকৃতির আত্মার অনবদ্য প্রকাশ। বাঙালীর মন-মাধুরী সৃষ্টিতে ইহাদের দান অসামান্য।

বাংলাদেশের গৃহপালিত পশুদের মধ্যে গোরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল, কুকুর, বিড়াল, গাধা ও ঘোড়ার নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ঘোড়া বাংলার পশু নয়, কিন্তু বহুকাল বাংলায় প্রতিপালিত হইয়া বাংলার ঘরের প্রাণী হইয়া গিয়াছে। গোরুই বাংলাদেশের সর্বাধিক আদরের প্রাণী। গৃহে গৃহে গোরু শুধু প্রতিপালিত নয়, পূজিতও। বহির্বঙ্গের গোরুদের মতো তাহার দৈহিক বিশালতা বা মেদ-বাহুল্য না থাকিলেও তাহার শরীরে এমন একটি বিশিষ্ট সৌন্দর্য আছে, যাহা বাংলাদেশের জল-হাওয়ার সঙ্গে

বাংলার প্রধান গৃহপালিত পশু : গোরু

অপূর্বরূপে মিলিয়া যায়। কৃষি-মাতৃক বাংলাদেশের অর্থনীতিকে গোরুই যুগ যুগ ধরিয়া সমৃদ্ধ করিয়া আসিয়াছে এবং আজিও করিতেছে। সে লাঙল টানিয়াছে, গাড়ি টানিয়াছে, বোঝা বহিয়াছে। আর, মাঠে যখন তাহারা দলবদ্ধভাবে চরিয়া বেড়ায়,

তখন সৃষ্টি করিয়াছে এক দুর্লভ সৌন্দর্য। বাংলাদেশের গোরু-চরা মাঠের দৃশ্য সত্যই অপূর্ব। বাংলাদেশের শ্যামলী, ধবলী, মঙ্গলা, মহেশকে কে না চেনে?

গোরুর পর মহিষ। 'মোষ নিয়ে পার হয় রাখালের ছেলে।'—ইহা বাংলাদেশের একটি সুলভ দৃশ্য। মহিষ গোরুর মতো ক্ষীর, দুধ, সর, ননী দিয়া, লাঙল ও গাড়ি টানিয়া, বোঝা বহিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া বাংলাদেশের সেবা করিলেও গোরুর মতো জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে নাই। ভেড়া ও ছাগল বাঙ্গালীকে দুধ দিয়াছে, মাংস দিয়াছে। গাধা ও ঘোড়া বোঝা বহিয়াছে, গাড়ি টানিয়াছে। কুকুর ও বিড়াল দিয়াছে সেবা ও সাহচর্য। এমন-কি, বহু-তিরস্কৃত শূকরও তাহার নীরব আত্মদানের মধ্য দিয়া রাখিয়াছে সেবার চরম স্বাক্ষর।

মহিষ, ভেড়া, ছাগল, গাধা, ঘোড়া, কুকুর, বিড়াল

এ তো গেল গৃহপালিত পশুদের কথা। বাংলার প্রকৃতি-জননীর কোলে যে পশুরা স্বাধীনভাবে বিচরণ করে, তাহাদের কথা বলা হয় নাই। তাহারা অরণ্যের শ্যামল ছায়ায় জন্মায় এবং অরণ্য-জননীর স্নেহে প্রবর্ধিত হয়। হিমালয়ের তরাই অঞ্চল, ছোটনাগপুরের অরণ্য-ভূমি এবং দক্ষিণের সুন্দরবন আরণ্যক পশুদের স্বাধীন বিহার-ভূমি। তরাই অঞ্চলে হাতী, চিতাবাঘ ও নেকড়ে বাঘের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ছোটনাগপুরের সন্নিহিত পশ্চিম বাংলা সজারু, ভালুক প্রভৃতি পশুর বিচরণ-ভূমি। সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার তো বিশ্ববিখ্যাত। 'সেখানে মানুষ কেউ যায় নাকো—দেখা যায় বাঘিনীর ডোরা বেতের বনের ফাঁকে,—জারুল গাছের তলে রৌদ্র পোহায় রূপসী মৃগীর মুখ দেখা যায়—।' সুখ-দর্শন হরিণ ও সুন্দরবনের সৌন্দর্য। তাহা ছাড়া, হায়েনা, চিতাবাঘ তো আছেই। বাংলাদেশের শিয়াল তো কাব্য-মর্যাদা লাভ করিয়াছে। 'রাতে ওঠে থেকে থেকে শিয়ালের হাঁক।' সারা রাত ধরিয়া পল্লী-বাংলার শিয়ালের দল প্রহর ঘোষণা করিয়া চলে। অ[illegible] আছে নেউল। সর্পসঙ্কুল বাংলাদেশে নেউলের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে।

বাংলার অরণ্য-পালিত পশু: হাতী, চিতা-বাঘ, নেকড়ে বাঘ, সজারু, খরগোশ, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, হরিণ, শেয়াল, নউল

ব[illegible] [illegible]দের একটা নিজস্ব সৌন্দর্য আছে। বাংলার কাকের কণ্ঠে প্রথম প্রভাত রা[illegible]টি বাজিয়া উঠে। তারপর শ্যামা, ফিঙে, দোয়েল, পাপিয়া তাহাদের বিচিত্র কলতা[illegible] সৃষ্টি করে অপূর্ব ঐকতান। পূর্বাকাশে অরুণোদয়ের রক্তিমার সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া [illegible]দের সংগীত পৃথিবীর মৃন্ময় পাত্রটিকে হিরণ্ময় করিয়া তোলে। [illegible] গ্রাম-বাংলার মুখর গায়ক, উদাসী বাউল। বাঙ্গালী কবি[illegible] ইহাদের প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন। দোয়েল, শ্যামা, ফিঙে তো একান্তভাবে [illegible]লারই পাখি। বুলবুল একেবারে বাংলার ঘুমপাড়ানী গানে চির-অমরত্ব লাভ ক[illegible]য়া আছে। বসন্তের কোকিল বহু-প্রশংসিত। শিমুল, পলাশ, দাড়িম্ব ও মাধবী-মঞ্জ[illegible]র রক্তিম প্রগল্‌ভতার দিনে কোকিলের পঞ্চম তান এক অনির্বচনীয় সুর-মূর্ছনায় [illegible]লার আকাশকে প্লাবিত করে। 'তিনটি শালিখ' শুধু রান্নাঘরের চালে ঝগড়াই ক[illegible] না, গানও শোনায়। এবং 'হলুদ নরম পায়ে

বাংলার পাখি

খয়েরী শালিখগুলো ডলিছে উঠান।' তাহা ছাড়া আছে বসন্তবৌরি ও নীলকণ্ঠ পাখি। ময়না ও কাকাতুয়া শিশুপাঠ্য পুস্তকে স্থান গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের নিজস্ব জনপ্রিয়তার গুণে। চন্দনা টিয়াও বাংলাদেশে বিশেষ জনপ্রিয়। গ্রীষ্মকালে চাতকের বারি-প্রার্থনা, জ্যোৎস্না-নিশীথে নিদ্রা-জাগর 'বউ-কথা-কও' পাখির ডাক এক অনবদ্য স্বর-মূর্ছনায় বাংলাদেশের আকাশকে প্লাবিত করে। বাংলাদেশের 'বউ-কথা-কও' পাখির অনেক নাম। কখনও সে 'বউ-কথা কও', কখনও সে 'চোখ-গেল', কখনও সে 'গৃহস্থের-খোকা-হোক', আবার কখনও সে 'কুটুম-এলো' পাখিও। ঘুঘুও বাংলার একটি অতি-পরিচিত পাখি। নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন তাহার করুণ ডাকে ব্যথিত হইয়া উঠে। তাহা ছাড়া, অন্ধকার রাতে বাদুড়ের চিৎকার কে না শুনিয়াছে? আর 'কদমের ডালে আমি শুনেছি যে লক্ষ্মীপেঁচা গেয়ে গেছে গান', সে গান সবার শোনা।

ডাঙ্গার পাখি: দোয়েল, শ্যামা, ফিঙে, পাপিয়া, বুলবুল, কোকিল, বউ-কথা-কও, ঘুঘু, বাদুড়, লক্ষ্মীপেঁচা

বাংলাদেশ পুকুর-দীঘি, খাল-বিল, নদী-নালার দেশ। কাজেই, বাংলাদেশ জলচর পাখিদের বিশেষ প্রিয়স্থান। বাংলার পুকুর-দীঘিতে গৃহপালিত পাতিহাঁস-রাজহাঁসের সারি প্রায়ই চোখে পড়ে, আর চোখে পড়ে মৎস্য-ধ্যানে নিমগ্ন বক ও মাছরাঙা। কালো মেঘের বুকে উড্ডীয়মান বক-পঙ্‌ক্তির দৃশ্য অতীব সুন্দর। 'সে আকাশ পাখনায় নিঙ্‌ড়ায়ে লয়ে কোথায় ভোরের বক মাছরাঙা উড়ে যায় আশ্বিনের মাসে।' তাহা ছাড়া, চলনবিল-অঞ্চলে, গঙ্গা-পদ্মা-মেঘনায় এবং দক্ষিণের সমুদ্র-উপকূলে দেখা যায় ভরত পাখি, ধনেশ, বেলেহাঁস, কাদাখোচা, জলপিপি, পানকৌড়ি, চিল, গাঙ্‌-চিল, গাঙ্‌-শালিক ইত্যাদি পাখি। ইহাদের মধ্যে বক, মাছরাঙা, জলপিপি, পানকৌড়ি, চিল, গাঙ্‌-চিল, গাঙ্‌-শালিক তো যথারীতি কাব্য-মর্যাদা লাভ করিয়াছে। বাংলাদেশের প্রকৃতির মতো তাহার পাখিগুলিরও রহিয়াছে এক দুর্লভ কমনীয়তা।

জলের পাখি: পাতিহাঁস, রাজহাঁস, বক, মাছরাঙা, ভরত পাখি, ধনেশ, বেলেহাঁস, কাদাখোচা, জলপিপি, পানকৌড়ি, চিল, গাঙ্‌-চিল, গাঙ্‌-শালিক

বাংলার পশুপাখি বাংলার প্রকৃতির রূপমাধুরীর অবিভাজ্য অঙ্গ। ইংরেজ [illegible] নলে নির্মমভাবে বাংলার পশুপাখিকে হত্যা করা হইয়াছে। বলা [illegible] বাংলার প্রকৃতিকে, তাহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে নিষ্ঠুর ঘাতকের মতো হত্যা করা হইয়াছে। রূপসী বাংলার এই রূপ-ক্ষয় প্রতিরোধ ক[illegible]র জন্য জাতীয় সরকার কৃতসংকল্প। বন্য পশু-পাখিদের [illegible] সংরক্ষিত বনভূমি—'অভয় অরণ্য' ও 'পক্ষীর আলয়' রচিত হইয়াছে এবং [illegible]ন্য বন-রচনার কাজ চলিয়াছে দ্রুতগতিতে। তাহা ছাড়া, বৃক্ষরোপণ সপ্তা[illegible] ন্যায় পশু-সপ্তাহ পালনের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহে একটি শুভ-সং[illegible]।

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- বাংলাদেশের পশুপাখির পরিচয়
- পশু-সপ্তাহ

প্রবন্ধ-সূত্র : সূচনা ॥ গ্রামগুলির স্বয়ংসম্পূর্ণতায় হাটের ভূমিকা ॥ বাণিজ্যিক ও বণ্টনগত ভূমিকা ॥ হাটের স্থান এবং হাট ও বাজারের পার্থক্য ॥ হাটের দৃশ্য ॥ ভাবের আদান-প্রদান ও যোগাযোগের স্থান ॥ উপসংহার ॥

৯. গ্রামের হাট

উ. মা. '৬০

"দূরে দূরে গ্রাম দশ-বারোখানি মাঝে একখানি হাট।" —যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

সূচনা

দশ-বারোখানি গ্রামের কেন্দ্রস্থলে একখানি হাট—গ্রামীণ জীবনের হৃৎপিণ্ড। 'ছায়া-সুনিবিড়, শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি'র আদান-প্রদান ও পণ্য-বিকিকিনির এক-মাত্র কেন্দ্র হইল এই হাট। গ্রাম-ভারতের ব্যস্ততাবিহীন গতানুগতিক জীবনধারায় হাট সঞ্চারিত করে এক সহজ গতির জোয়ার। সেই গতি সঞ্চারিত হয় গ্রামগুলির উৎপাদন-প্রকরণে, তাহার কুটির-শিল্পে, তাহার কৃষি-প্রান্তরে, সামগ্রিকভাবে তাহার জন-জীবনে। সেই গতির প্রেরণায় শহর ও গ্রামের মধ্যে রচিত হয় পণ্য-বিকিকিনি ও আদান-প্রদানের এক অদৃশ্য সংযোগের সেতু। কর্মের দোলায় একসঙ্গে দুলিয়া উঠে গ্রাম ও শহর। দূর-দূরান্তের উৎপাদক-বেপারী ও ক্রেতারা দল বাঁধিয়া হাটে আসে। কেহ আসে নৌকায়, কেহ আসে গোরুর গাড়িতে, কেহ-বা আসে পদব্রজে। নৌকা বোঝাই হইয়া কিংবা গোরুর গাড়ি বোঝাই হইয়া আসে পণ্য-সম্ভার; কেহ-বা মাথায় করিয়া, আবার কেহ-বা বাঁকে করিয়া বহিয়া লইয়া আসে বিকিকিনির দ্রব্য সামগ্রী। সকলেই হাটে সমবেত হয়। দর-জানাজানি, দর-কষাকষি এবং সর্বশেষে ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে এখানে একটি বিশেষ অর্থ নৈতিক উদ্দেশ্য সাধিত হয়। গ্রাম-গ্রামান্তরের, এমন-কি সুদূর শহরের বহু মানুষের সমাগমে, তাহাদের কথা-বার্তায় যে উত্তাল কোলাহলের সৃষ্টি হয়, তাহা দূর-দূরান্তের গ্রামেও প্রবাহিত হইয়া যায়। গ্রামের হাটে বহু হৃদয়ের সংস্পর্শে ভাবের যে তরঙ্গ উঠে, তাহা গ্রামা[illegible]বর উপকূলকে স্পর্শ করে। হাট তাই স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ জীবনের অর্থ নৈতিক ও ভাব[illegible] কেন্দ্র-ভূমি।

গ্রামগুলির স্বয়ংসম্পূর্ণতায় হাটের ভূমিকা

সপ্তাহে সাধারণতঃ একদিন বা দুইদিন করিয়া হাট বসিয়া থাকে। এই দিনটির দিকে তাকাইয়া কৃ[illegible] উৎপাদন করে তাহার কৃষিজ দ্রব্য, শিল্পী উৎপাদন করে তাহার শিল্প-সামগ্রী, দোকান[illegible]রীরা সাজায় তাহাদের নানা বিচিত্র পণ্যের দোকান ও পস[illegible] যাহারা চিরাচরিত ক্রেতা, তাহারাও হাতে তাহাদের সঞ্চিত [illegible]ড়ি লইয়া এই দিনটির মুখের দিকে তাকাইয়া বসিয়া থাকে। [illegible]ই আদান-প্রদানের সূত্র ধরিয়া গ্রামগুলিতে আসে শ্রী, আসে সমৃ[illegible] ও সচ্ছলতা। প্রতিটি গ্রাম স্ব-স্ব উৎপাদন-বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। কিন্তু অন্য-নিরপেক্ষভা[illegible] কোন গ্রামই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদানের মাধ্যমেই আসে গ্রা[illegible]লির স্বয়ংসম্পূর্ণতা। এবং সেই স্বয়ংসম্পূর্ণতার মূলে রহিয়াছে হাটগুলির মূল্যবান বাণিজ্যিক অবদান।

গ্রামে গ্রামে যে পণ্য উৎপন্ন হয়, তাহার সমস্তটাই গ্রামের প্রয়োজনে লাগে না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত পণ্য হাটে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে আনীত হয়। সেই উদ্বৃত্ত পণ্য ক্রয় করিবার জন্য আসে ঘাটতি গ্রামের ক্রেতারা; আর আসে দূর-দূরান্তের দালাল-ফড়িয়া-বেপারীরা। এইভাবে হাটের বাণিজ্যিক মধ্যস্থতায় গ্রামের উদ্বৃত্ত পণ্য গ্রামান্তরে কিংবা শহরে, গঞ্জে কিংবা বড় বড় রেল-স্টেশনে প্রবাহিত হইয়া যায়। কাজেই, অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে কেবল বাণিজ্যিক আদান-প্রদানেই গ্রামের হাটের ভূমিকা নিঃশেষিত নয়, ইহার বাণিজ্যিক ও বণ্টনগত ভূমিকারও আছে গৌরবময় তাৎপর্য।

বাণিজ্যিক ও বণ্টনগত ভূমিকা

সাধারণতঃ নদীতীরে স্টীমার বা নৌকার ঘাটে, বড় রাস্তার সান্নিধ্যে বা রেল-স্টেশনের কাছে হাট বসিয়া থাকে। হাটের সঙ্গে দূর-দূরান্তরের পরিবহণের থাকে গভীর সংযোগ। সেখানে গ্রামের পণ্য শহরে কিংবা গ্রামান্তরে, শহরের পণ্য গ্রামে প্রবাহিত হইয়া যাইবার ব্যবস্থা থাকে সম্পূর্ণ। যেখানে হাট বসে, সেখানে প্রত্যহ বাজারও বসিয়া থাকে। বাজার হইল প্রাত্যহিক সংস্করণ আর হাট হইল সাপ্তাহিক কিংবা অর্ধ-সাপ্তাহিক। কাজেই, হাট এবং বাজারের আছে কালগত ও আকৃতিগত ব্যবধান।

হাটের স্থান এবং হাট ও বাজারের পার্থক্য

হাটে থাকে কতকগুলি টিন বা খড়ের চালার স্থায়ী দোকান। এই দোকানগুলি বর্ধিষ্ণু কিংবা অবস্থাপন্ন বিক্রেতাদের। আর কতকগুলি থাকে অস্থায়ী দোকান। খুটি দিয়া তৈয়ারী দোচালা-ঘরে অল্পবিত্ত দোকানগুলি বসে। যাহাদের পুঁজির সামর্থ্য আরও কম, তাহারা খোলা জায়গায় সারিবদ্ধভাবে বসিয়া যায়। বহু দোকানের ভিড়ে এবং বহু মানুষের সমাগমে হাট যখন জমিয়া উঠে, তখন সেই বিকিকিনির ব্যস্ততার দৃশ্য সত্যই অপূর্ব লাগে। কাল কিংবা আজ সকালেই হাটের অনাবৃত স্থানটি পরিত্যক্ত পড়িয়া ছিল। তাহাতে লোকজনের কোন সমাগমই ছিল না। মধ্যাহ্নের পর হইতে লোক-সমাগম শুরু হইল। অপরাহ্ণে মানুষের জোয়ারে হাট যেন থই-থই করিতে থাকে। একপাশে তরি-তরকারি শাক-সব্জির দোকান, অন্য পাশে কলসী-হাঁড়ি ও অন্যান্য মা[illegible] দোকান, কোথাও একপাশে জামা-কাপড়-গামছার দোকান, কোথাও-বা ধান-চালের দোকান, কোথাও-বা মাছের দোকান, কোথাও-বা ময়রার মিষ্টির দোকান। সব দোকানেই সমান ভিড়। সর্বত্রই 'মাল-চেনাচেনি, দর-জানাজানি [illegible] নোকড়ি নিয়ে কত টানাটানি।' 'উচ্ছে বেগুন পটল মূলো, বেতের বোনা [illegible] কুলো, সর্ষে ছোলা ময়দা আটা, শীতের র‍্যাপার নক্সা-কাটা, ঝাঝরি কড়া বেড়ি হা[illegible], শহর থেকে সস্তা ছাতা'—সবই এখানে দর-দস্তুর করিয়া বিক্রয় হয়। সর্বোপরি সব মানুষের কলকোলাহলে যে সোরগোল সৃষ্ট হয়, তাহার তুলনা হয় না। কোন কোন হাটে ধান, পাট, নারিকেল প্রভৃতি প্রধান প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য এবং তাঁ[illegible]স্ত্র ইত্যাদি শিল্পজাত দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া [illegible]কে গোরু, মহিষ, ছাগল, হাঁস, মুরগী প্রভৃতি বিক্রয়ের পৃথক্ পৃথক্ ব্যবস্থা।

হাটের দৃশ্য

হাট যেমন পণ্য-বিকিকিনির কেন্দ্র, তেমনি ভাবের আদান-প্রদান ও যোগাযোগের প্রধান কেন্দ্র। কৃষক ও শিল্পীরা সারা সপ্তাহ ধরিয়া নিজ নিজ কর্মস্থলে থাকে কর্মব্যস্ত। পরস্পরের সঙ্গে কোন যোগাযোগ থাকে না। হাট ভাব-বিনময়ের ও বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের সার্থক কারিগর। হাটের কাছে সাধারণতঃ থাকে পোস্ট-অফিস, স্কুল, ডাক্তারখানা, আর দুই-একটি সরকারী অফিস। ডাক-পিয়ন এখানে চিঠি বিলি করে। খবরের কাগজ আসে দুই-একখানা। তাহা ছাড়া, শহর হইতে আসে দালাল-ফড়িয়া ও পাইকারী ক্রেতারা। খবরের কাগজের মাধ্যমে বা দালাল-ফড়িয়া প্রভৃতির মধ্যস্থতায় বহির্বিশ্বের সঙ্গে গ্রামের একটি অদৃশ্য যোগবন্ধন স্থাপিত হয়। একদিকে আসে গ্রামান্তরের মানুষ, অন্যদিকে আসে দূর শহরের ব্যবসায়ীরা। পরস্পরের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়, অন্তর জানাজানি হয়, সেই সঙ্গে সমস্বার্থে সকলে এক অখণ্ড আর্থিক দুনিয়ার বৃত্তের মধ্যে আসিয়া পড়ে। গ্রামের পণ্য নৌকা, ট্রেন কিংবা ট্রাক বোঝাই হইয়া শহরে চলিয়া যায়, বিনিময়ে শহরের টাকা প্রবাহিত হইয়া আসে গ্রামে। তাহা ছাড়া, গ্রামের সহজ সরল মানুষদের কাছে শহরের কোন নূতন আবিষ্কৃত পণ্য বিক্রয় করিবার জন্য শহর হইতে দলে দলে আগমন ঘটে ফেরিওয়ালাদের। বিচিত্র তাহাদের বেশবাস, বিচিত্র তাহাদের কণ্ঠস্বর, বিচিত্র তাহাদের বিক্রয়-কলা। কেহ মাইক্রোফোনে করিয়া কিংবা রেকর্ড বাজাইয়া, কেহ-বা পায়ে ঘুঙুর বাঁধিয়া নাচিয়া নাচিয়া, কেহ-বা আবার হারমোনিয়াম-সহযোগে গান গাহিয়া তাহাদের পণ্য বিক্রয় করে। তাহাদের বক্তৃতায় ও নাচে-গানে হাট মুখর হইয়া উঠে। আবার, কোথাও-বা পথের ধারে বসিয়া অন্ধ ভিক্ষুক করুণ কণ্ঠে গান গাহিয়া ভিক্ষা করে। তাহার গানের আবেদনে সমগ্র হাটের পরিবেশটি করুণ হইয়া উঠে।

ভাবের আদান-প্রদান ও যোগাযোগের স্থান

বিকালের কর্মব্যস্ততার পর সন্ধ্যা নামে; এখানে-ওখানে হ্যারিকেন, লণ্ঠন, হ্যাজাক্ ইত্যাদি জ্বলিয়া উঠে। বেচাকেনার মধ্য দিয়া ক্রমে রাত্রি বাড়িতে থাকে। ধীরে ধীরে মানুষের ভিড় কমিতে থাকে। বেচাকেনা সাঙ্গ করিয়া এবার হাট ভাঙিবার পালা। দোকান-পাট গুছাইয়া, টাকা-পয়সার হিসাব সারিয়া দিনের বেচাকেনার গল্প করিতে করিতে দোকানী-পসারীরা স্ব-স্ব গ্রাম অভিমুখে চলিতে থাকে। গ্রামের প্রান্তরে গভীর অন্ধকারের মধ্যে অসংখ্য চলমান আলোর বিন্দু দিক্-দিগন্তের উদ্দেশে যাত্রা করে। নদীতে ভাসমান নৌকায় আলোর বিন্দু এবং গোরুর গাড়ির মৃদু ঘণ্টাধ্বনি অস্পষ্ট হইতে হইতে দূরে মিলাইয়া যায়। নির্জন নিঃসঙ্গ অন্ধকারে এক করুণ বিষণ্ণ মূর্তিতে গ্রামের হাট নিঃশব্দে পড়িয়া থাকে॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- একটি হাটের বর্ণনা
- পল্লীর জীবনে হাটের স্থান

প্রবন্ধ-সূত্র : সূচনা। আনন্দের অনুসন্ধান ও বনভোজন। রাজা-মহারাজাদের মৃগয়াযাত্রা। জীবন-স্মৃতিতে বনভোজনের বর্ণনা। বনভোজনের আধুনিক রূপ। উপসংহার।

১০. বনভোজন

মা. '৭০

দৈনন্দিন জীবনাচরণের গতানুগতিকতার কঠিন সীমাবেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া মানুষ একসময় দুর্জয় ক্লান্তিভারে হাঁপাইয়া পড়ে। তাহার মনের রাজ্যে সেই ক্লান্তির সঙ্গে আসে সংকীর্ণতা, আসে সহস্র ক্ষুদ্রতা, সৃষ্টি হয় স্বার্থক্লিন্ন ভেদবুদ্ধির পঙ্কিলতা।

সূচনা

সেই দুঃসহ সংকীর্ণ সীমায়তন হইতে বাহিরে আসিয়া শত-সহস্র মানুষের অবারিত সান্নিধ্যে দাঁড়াইবার প্রয়োজন হয়। তাহার ফলে বৃদ্ধি পায় তাহার মানস-প্রসারতা এবং গড়িয়া উঠে একটি অখণ্ড সামাজিকতা। মানুষ তাই মাঝে মাঝে তাহার স্বরচিত অচলায়তনের পাষাণ-গুহা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া উন্মুক্ত আকাশের নীচে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিতে চায়। বনভোজন সেই গতানুগতিকতার নাগপাশ হইতে মুক্তির একটি আনন্দঘন প্রমোদ-পন্থা।

মানুষ স্বভাবতঃই আনন্দবাদী। সে আনন্দ চায়। তাহার নিরানন্দ জীবনকুঞ্জে আনন্দ-মহাসাগরের বন্যা আসিয়া লাগুক, তাই সে চায়। কিন্তু কর্মব্যস্ত জীবনে

আনন্দের অনুসন্ধান ও বনভোজন

তাহার সুযোগ কোথায়? সভ্যতা তাহাকে সব দিয়াছে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের নামে বিজ্ঞান তাহার জীবনকে যন্ত্রে যন্ত্রে ভরিয়া দিয়াছে, কিন্তু কাড়িয়া লইয়াছে তাহার মনের শান্তি, অন্তরের আনন্দ। সেই আনন্দের সন্ধানে একদিন তাহারা গৃহবাস ছাড়িয়া দলবদ্ধভাবে বনের গভীরে প্রবেশ করে। অরণ্যের অভ্যন্তরে করে আহার-বিহারের আয়োজন। বনভোজন তাহার নাম।

পূর্বে আমাদের দেশের রাজা-মহারাজারা মাঝে মাঝে ঝ[illegible]লোণপুরী ত্যাগ করিয়া পাত্রমিত্রদের সহচরে দলবদ্ধভাবে ছায়া-শীতল বনে মৃগয়া করিতে যাইতেন। রাজধানীতে সুকঠোর রাজকার্যে তাঁহারা যখন হইয়া [illegible]তেন ক্লান্ত-প্রাণ,

রাজা-মহারাজাদের মৃগয়াযাত্রা

তপ্ত-হৃদয়, তখনই তাঁহারা রাজধানীর কর্ম[illegible]তার জীবন হইতে মুক্তি লইয়া দূরে অরণ্যের শ্যামল [illegible]বেষ্টনীতে কিছু সময় অতিবাহিত করিবার জন্য অন্তরে একপ্রকার তাগিদ অনুভব করিতেন। রাজার সঙ্গে রাজধানীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাও মৃগয়ার আনন্দের অংশভাগী হইতেন। তাঁহাদের সপারিষদ বন-ভ্রমণের সঙ্গে শিকারের আনন্দ যুক্ত হইয়া কয়েকটি দিন রঙে-রসে নিটোল হইয়া উঠিত।

বলাবাহুল্য, বনভোজন সেই মৃগয়ারই আধুনিক সংস্করণ। পূর্বে মৃগয়ায় থাকিত মৃগ বা পশু-শিকারের আয়োজন। পরবর্তীকালে তাহা কষ্টসাধ্য বলিয়া বর্জিত হয়

রবীন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতিতে তাহার একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা আছে : 'রবিবারে জ্যোতিদাদা

দলবল লইয়া শিকার করিতে বাহির হইতেন। রবাহুত, অনাহুত যাহারা আমাদের দলে আসিয়া জুটিত তাহাদের অধিকাংশকেই আমরা চিনিতাম না। আমাদের মধ্যে ছুতার, কামার প্রভৃতি সকল শ্রেণীরই লোক ছিল। এই শিকারে রক্তপাতটাই সব চেয়ে নগণ্য ছিল, অন্তত সেইরূপ ঘটনা আমার তো মনে পড়ে না। শিকারের অন্য সমস্ত অনুষ্ঠানই বেশ ভরপুর মাত্রায় ছিল—আমরা হত-আহত পশু-পক্ষীর অতি তুচ্ছ অভাব কিছুমাত্র অনুভব করিতাম না। প্রাতঃকালেই বাহির হইতাম। বউঠাকুরাণী রাশীকৃত লুচি তরকারী প্রস্তুত করিয়া আমাদের সঙ্গে দিতেন। ঐ জিনিসটাকে শিকার করিয়া সংগ্রহ করিতে হইত না বলিয়া একদিনও আমাদিগকে উপবাস করিতে হয় নাই।' তাঁহার এই বর্ণনায় সেকালের সাপ্তাহিক বনভোজনের অহিংসক আয়োজনের একটি নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায়। গৃহ হইতে আনীত খাদ্য-সামগ্রী বনভোজনের মুখরক্ষা করিত। বর্তমানে সেই রক্তপাতবিহীন মৃগয়ার আধুনিক সংস্করণ বনভোজনেও সেই ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ আছে। শুধু অক্ষুণ্ণই নয়, তাহার জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

জীবন-স্মৃতিতে বনভোজনের বর্ণনা

আধুনিক নাগরিক জীবনেও বনভোজনের বিশেষ ভূমিকা আছে। শুষ্ক নাগরিকতা ও হৃদয়হীন যান্ত্রিকতার তপ্ত নিঃশ্বাস হইতে মুক্তির আহ্বান আসে বনভোজনের মাধ্যমে। নগরের রুটিন-বাঁধা দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার গ্লানি হইতে মুক্তি পাইতে হইবে। বড়দিন, নিউ ইয়ার্স ডে, নববর্ষ ইত্যাদি ছুটির সুযোগে বন্ধুবান্ধবেরা দলবদ্ধভাবে চলে শহরের বাহিরে। সঙ্গে চলে প্রচুর খাদ্যসামগ্রী এবং নানা তৈজসপত্র। কেহ যায় কাকদ্বীপ, কেহ যায় বকখালি, কেহ যায় ডায়মণ্ডহারবার, কেহ যায় ফলতা, কেহ যায় দমদম, কেহ কল্যাণী পিক্‌নিক পার্কে, কেহ-বা দীঘার সমুদ্র-সৈকতে। মাটিতে গর্ত খুঁড়িয়া উনুন প্রস্তুত হয়। তাহাতে আগুনের চেয়ে ধোঁয়া হয় প্রচুর। তবু চোখের জলে মনের আনন্দে সবাই মিলিয়া রান্না করিতে থাকে। অনভ্যস্ত হাতে ভাত হয়তো ঠিকমতো ফুটে না, রান্না হইয়া ... তাহাতে কি আসে যায়? প্রাণের আনন্দে সবাই সেই অখাদ্য ভক্ষণ করিয়া নানা খেলাধূলায় মাতিয়া উঠে।

বনভোজনের আধুনিক রূপ

বনভোজন আমাদের বর্তমান নাগরিক জীবনের শুষ্ক মরুভূমির বক্ষে এক টুকরা শ্যামল ওয়েসিস্। যান্ত্রিকতার মরু-নিঃশ্বাসে যখন আমাদের প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে, তখনই অরণ্য কিংবা নদীতীর কিংবা পাহাড় কিংবা সমুদ্র-সৈকত আমাদের হাতছানি দিয়া ডাকে। বনভোজনে উদর-সর্বস্ব ভোজন-বিলাসিতা নাই. আছে মানুষে মানুষে বন্ধুত্বের নিবিড় আশ্বাস ও প্রকৃতির স্নেহ-সুশীতল স্পর্শ এবং আনন্দের অফুরন্ত আস্বাদন॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- চড়ুই ভাতি
- একটি ছুটির দিন
- একটি বনভোজনের বর্ণনা

ভারতের জাতীয় সংহতি

প্রবন্ধ-সূত্র ঃ সূচনা ॥ য়ুরোপে ও ভারতে জাতি-গঠন—'ভারত-সংস্কৃতি' ॥ ভারতে জাতীয় ঐক্যের সাধনা ও সফলতা। স্বাধীন ভারতে জাতীয়তায় ভাঁটা ও সংহতিতে ফাটল ॥ কারণ: শিক্ষার একদেশদর্শিতা ॥ ভাষা-সমস্যা ॥ সাম্প্রদায়িকতা, রাজনৈতিক দলাদলি, আঞ্চলিকতা ও প্রাদেশিকতা ॥ উপসংহার ॥

সূচনা

সমগ্র জাতির ভাগ্যাকাশে আজ ঘনাইয়া আসিয়াছে এক ঘোরতর দুর্যোগ। স্বাধীনতা লাভের পর এত বড় দুর্যোগ আর কখনও আসে নাই। আজ দিকে দিকে চলিয়াছে ভারত-ভাঙ্গার নানা চক্রান্ত। সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, রাজনৈতিক ভেদবুদ্ধি, ভাষা-কলহ দিনে দিনে স্ফীতকায় হইয়া উঠিতেছে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত ভাঙ্গিয়া তিন খণ্ড করিয়া আমরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি। দেশ একবার ভাঙ্গিলে ভাঙ্গনের নেশায় পাইয়া বসে। এখন তাই ভাঙ্গনের চক্রান্ত দিকে দিকে সক্রিয় হইয়া উঠিতেছে। ভারতের জাতীয় সংহতি আজ তাই বিপন্ন। তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে। সকল ভেদবুদ্ধির চক্রান্তের অবসান ঘটাইয়া ভারতে আবার প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে 'এক জাতি, এক প্রাণ, একতা।'

য়ুরোপে ও ভারতে জাতি-গঠন—'ভারত-সংস্কৃতি'

ভারতের ন্যায় য়ুরোপও একই ভূখণ্ড। একই ভূখণ্ড হইয়াও য়ুরোপীয় দেশগুলি দ্বন্দ্ব-সংঘাত-কাতর বহু বিবদমান জাতির সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু ভারতের ভৌগোলিক বিস্তার এবং বহু দুর্জয় প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও 'নানা ভাষা নানা বেশ ভূষা পরিধানে'র বিবিধত্বের মধ্যে এখানে এক মহান্ মিলনের স্বপ্ন সার্থক হইয়া উঠিয়াছে! এত বৈচিত্র্য, এত বিশালতা! তবু ভারত 'একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া।' আকুমারিকা-হিমাচল—এই বিশাল ভূখণ্ড জুড়িয়া এখানে কেবল একটিমাত্র জাতির বিকাশ হইয়াছে। সে জাতির নাম ভারতীয় জাতি। সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র হইতে কৃষ্ণা-কাবেরী-গোদাবরী পর্যন্ত কেবলমাত্র একটি প্রাণ-প্রবাহিনী শক্তি প্রবাহিত। তাহা হইল 'ভারত-সংস্কৃতি'। তাহাই 'পাঞ্জাব-সিন্ধু-গুজরাট-মারাঠা-দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গে' নানারূপে নানাভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। এই সত্যটি না জানিলে ভারতকে জানা হয় না এবং ভারতকে না জানিয়া তাহার ঐক্য-সমস্যারও সমাধান করা যায় না।

জাতীয় সংহতির এই অন্তর্লীন সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ভারতে জাতীয় সংহতি বারে-বারে বিঘ্নিত হইয়াছে। কেবল মৌর্য-শাসনের যুগে ভারতের সংহতি-সাধনা একবার সফল হইয়াছিল। বাহিরের ও অন্তরের ঐক্য সেদিন ভারতবর্ষের ইতিহাসকে

গৌরবমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিল। তারপর কত যুগ কাটিয়া গিয়াছে। ভারতের জাতীয় ঐক্য আর সাধিত হয় নাই। ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতে বাহিরের চাপে ঐক্যের যে সূচনা হইয়াছিল, পরাধীনতার বন্ধন-মুক্তির আত্মিক প্রয়াসে তাহা সম্পূর্ণতা লাভ করিল ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে। সে ভারতের জাতীয় ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।

ভারতে জাতীয় ঐক্যের সাধনা ও সফলতা

কিন্তু কূট-কুশলী ইংরেজ ভারতে যে দ্বিজাতি-তত্ত্বের বীজ বপন করিয়াছিল, তাহার বিষময় পরিণামে দেখা দিল বিভীষিকাময় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা এবং বেদনাবহ দেশ-বিভাগ। কিন্তু দেশ বিভাগের দ্বারা আমরা ভারতশরীর হইতে সাম্প্রদায়িকতার বিষকে নির্মূল করিতে পারি নাই, বরং তাহাকে প্রশ্রয় দিয়াছি। আজ স্বাধীনতালাভের দীর্ঘদিন পরে যখন হিসাব মিলাইতে বসি, তখন তাই দেখি বিপরীত চিত্র। আজ কোথায় সেই সংহতি? কোথায় গেল সেই ঐক্যমন্ত্র—'এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্র জীবন'? আসল কথা, স্বাধীনতালাভের পর আমাদের স্বদেশপ্রেমে ভাঁটা পড়িয়াছে। জাতীয়তার জোয়ারে ভাঁটা আসায় জল সরিয়া গিয়া সাম্প্রদায়িক, প্রাদেশিক ও রাজনৈতিক ভেদবুদ্ধির জীর্ণ স্তূপ আজ অত্যন্ত প্রকটরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

স্বাধীন ভারতে জাতীয়তায় ভাঁটা ও সংহতিতে ফাটল

এই সর্বব্যাপী জাতীয় অনৈক্যের মূলে আছে আমাদের আত্যন্তিক বাস্তবমুখীনতা। স্বাধীনতালাভের পর আমাদের দেশ অধিক সংখ্যক ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার ইত্যাদি চাহিয়াছে। সেই সঙ্গে আহ্বান করিয়াছে অতি-যান্ত্রিকতা ও ব্যাপক শিল্পায়ন। কিন্তু সেই সঙ্গে দর্শন চিন্তা, ইতিহাস-চর্চা, ভাষা ও সাহিত্যালোচনার সহিত সংহতিপূর্ণ একটি সুসমঞ্জস শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন প্রয়োজন ছিল। শিক্ষার এই একদেশদর্শিতার বিষময় পরিণামে ভেদবুদ্ধি লোকচক্ষুর অন্তরালে ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করিয়া নানা স্থানে প্রচণ্ড স্তূপের মতো ফাটিয়া পড়িতেছে।

কারণ: শিক্ষার একদেশদর্শিতা

একদিকে রাজ্য পুনর্বিন্যাস কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ভারত ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠন করে নাই। বহু ভাষাভাষী দেশ এই ভারতে ইংরেজিকে অপসারিত করিয়া কৃত্রিম সংখ্যা গরিষ্ঠতার জোরে একটিমাত্র ভাষা হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় অভিষিক্ত করিয়া জাগাইয়া তোলা হইয়াছে এক সুতীব্র ভাষা সমস্যা। এইভাবে হিন্দী-সাম্রাজ্যবাদের সূচনা। এই সমস্যার একমাত্র সমাধান হইল, সোভিয়েট রাশিয়ার মতো সকল আঞ্চলিক ভাষাকে স্বীকৃতি দান।

ভাষা-সমস্যা

আবার, আমরা সাম্প্রদায়িকতাকে অস্বীকার করিয়া দেশ বিভাগকে স্বীকার করিয়া লইয়াছি। তারপর কায়েমী স্বার্থচক্রের ক্রমাগত সাম্প্রদায়িক প্ররোচনা ভারতের ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রাদর্শকে বারে-বারে অগ্নি-পরীক্ষার সম্মুখীন করিতেছে। এদিকে আবার, ভারতে গণতন্ত্রের প্রয়োজনে বহু রাজনৈতিক দল সংগঠিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাতে রাজনৈতিক দলাদলি ও ভেদবুদ্ধি বৃদ্ধি পাইয়াছে। কোন কোন রাজনৈতিক দল ধর্মের

মুখোশ পরিয়া সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত ভেদবুদ্ধিকে জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছে। সেই সঙ্গে বৈষয়িক উন্নয়নে বৈষম্য, সুতীব্র ধন-বৈষম্য, ঘৃণ্য আঞ্চলিকতা ও প্রাদেশিকতা ভেদ-মূলক বিদ্বেষকে ধূমায়িত করিয়া তুলিতেছে। আজ আবার দিকে দিকে শিবসেনা, নাগসেনা, লাচিতসেনা, ভূমিসেনা—ইত্যাদি নানা বিচ্ছিন্নতাবাদী সেনাবাহিনী মাথা চাড়া দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে। এই সমস্ত কারণে ভারতে নিত্য-নূতন সংঘাত ও সংঘর্ষ এবং বৈষম্যের রক্তাক্ত বহ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিতেছে। এবং 'হবে তা সহিতে মর্মে দহিতে, আছে সে ভাগ্যলিখা।'

সাম্প্রদায়িকতা, রাজনৈতিক দলাদলি, আঞ্চলিকতা ও প্রাদেশিকতা

একথা সর্বজনবিদিত যে, আমাদের সকল অসংহতি ও অনৈক্যের মূলে রহিয়াছে কতকগুলি মৌল বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অভিসন্ধিমূলক ও অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্ত এবং তাহাদের রূপায়ণে অহেতুক হঠকারিতা। তাহার ফলে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের দিকে দিকে অশান্তির ধূমায়িত অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। বর্তমানে সেই মৌলিক সত্যটি কেন্দ্রীয় সরকারের বিলম্বে হইলেও উপলব্ধি হইয়াছে—ইহা সুখের কথা। আজ তাই ভারতের আবালবৃদ্ধবনিতা জাতীয় সংহতির প্রশ্নে 'মায়ের ডাকে' সম্মিলিত হইয়াছে। ইহা জাতীয় জীবনের একটি বড় সুলক্ষণ। ইহা যাহাতে আমাদের জাতীয় জীবনে দীর্ঘস্থায়ী হয়, তাহার জন্য সকলেই আজ উৎসুক। সকল কূট চক্রান্ত ও ঘৃণ্য ভেদবুদ্ধির উর্ধ্বে একসূত্রে বাঁধা সহস্র জীবন, জননীর স্নেহধন্য পুত্র-সংঘ আজ মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গনে অনুতপ্ত, দুঃখদীর্ণ, বেদনা-বিহ্বল কণ্ঠে প্রার্থনা করিতেছে: 'জননি, সময় নিকটবর্তী হইয়াছে....এখন বাজাও তোমার শঙ্খ, জ্বালো তোমার প্রদীপ—তোমার প্রসারিত শীতলপাটির উপরে আমাদের ছোট বড় সকল ভাইয়ের মিলনকে তোমার অশ্রু-গদগদ আশীর্বাদের দ্বারা সার্থক করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকো।' কাজেই, এখন আমাদের বিলম্ব করিবার সময় নাই। দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত মাতৃ-অভিষেকের পবিত্র লগ্ন সমাগত।

উপসংহার

'মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা
মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা
সবার-পরশে-পবিত্র-করা তীর্থনীরে—

সকল ভ্রান্ত বিরোধ এবং সকল নির্লজ্জ বিভেদের অবসানে আজ এক নূতন ভারত জন্মলাভ করিতেছে। ভারতের জাতীয় ইতিহাসের এই শুভতম দিনটি ভারতবাসীর জীবনে সফল হউক, সত্য হউক॥

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- ভারতের জাতীয় ঐক্য
- বৈচিত্র্যময় ভারত
- বিচিত্র ভারত
- ভারতের ভাষা-সমস্যা
- 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে'।

১২

সমাজ-জীবনে সংবাদপত্রের প্রভাব

ক. প্রা. '৭৪

প্রবন্ধ-সূত্র ঃ সূচনা। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংবাদপত্রের ভূমিকা। সংবাদপত্রের নানা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। সংবাদপত্রের আবির্ভাবের ইতিহাস। 'It is the people's Parliament always in session'। উপসংহার।

সূচনা

পূর্ব-দিগন্তে আলোকের বিজয়-ঘোষণার পূর্বেই সমগ্র পৃথিবী আমাদের দুয়ারে আসিয়া করাঘাত করে। সংবাদপত্রই সেই পৃথিবীর বাণীরূপ। গৃহবদ্ধ মানুষ এক মুহূর্তে তাহার সকল সংকীর্ণতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বিশাল পৃথিবীর উদার আকাশের নীচে আসিয়া দাঁড়ায়। সংবাদপত্র দৈনন্দিন জীবনের সীমাবদ্ধ মানুষকে বিশ্ব-মানবতা ও বিশ্ব-নাগরিকতার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়। মানুষ স্বভাবতঃই সুদূরকে জানিতে চায়, আপন হাতের মুঠায় পাইতে চায় বৃহৎ বিশ্বকে। সংবাদপত্র তাহার সেই আকাঙ্ক্ষাকে সফলতা দান করিয়াছে। সংবাদপত্র মানুষের দুয়ারে বহন করিয়া আনে সেই বাঞ্ছিত সুদূরকে ঘরের প্রাঙ্গণে আনিয়া উপস্থিত করে সুদূর বিশ্বকে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংবাদপত্রের ভূমিকা

শুধু তাই নয়। সংবাদপত্র গণতন্ত্রের সদা-জাগ্রত প্রহরী। গণদেবতার বিচারশালায় সে নিপীড়িত মানুষের পক্ষ সমর্থন করে। সর্বদা ন্যায় ও সত্যের মন্ত্রে সে করে জন-গণেশের পূজা। কোথাও জন-গণেশের পূজার ব্যাঘাত হইলে, গণতন্ত্রের মর্যাদা ধূলিলুণ্ঠিত হইলে কিংবা গণতন্ত্রের পবিত্রতা কোন কারণে কলুষিত হইলে সংবাদপত্রের নির্ভীক কণ্ঠ সেখানে সোচ্চার হইয়া উঠে। তখন তাহার কালো-কালো অক্ষরগুলি অগ্নিশিখার মতো জ্বলিয়া উঠে, সুবিন্যস্ত বাক্যাবলী গণতন্ত্রের শত্রুদের হৃদয় লক্ষ্য করিয়া বুলেটের মতো ছুটিয়া চলে, মানবতার শত্রুদের হৃদয় বিদ্ধ করিয়া জনসাধারণের ন্যায়সঙ্গত অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া সে বিজয়গর্বে ফিরিয়া আসে। অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় জনগণের, জয় হয় গণতন্ত্রের। সংবাদপত্র তাই জনগণের পবিত্র গণতান্ত্রিক অধিকার-সংরক্ষণের সর্বদা দায়িত্বশীল অভিভাবক।

সংবাদপত্রের নানা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

সংবাদপত্র বর্তমান সভ্যতার অপরিহার্য অঙ্গ। এত অপরিহার্য যে, তাহা বর্তমান সভ্যতার দৃষ্টিশক্তির সঙ্গে অনায়াসে তুলনীয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মানব-ভাগ্যে যখন দুর্দিন ঘনাইয়া আসে, তখন সংবাদপত্রই সেই দুঃসংবাদ গণ-দুয়ারে পৌঁছাইয়া দিয়া ত্রাণকার্যকে করে ত্বরান্বিত। বজ্র-সংঘাতময় অগ্নি-পরিধি, মহাসাগরের দুস্তর ব্যবধান কিংবা গিরি-কান্তার ও মরু-প্রান্তরের দুঃসাধ্য দুর্গমতাকে তুচ্ছ করিয়া সে বিশ্ববার্তা সংগ্রহ করিয়া আনে। রোগজর্জর পৃথিবীর শিয়রে বসিয়া সে মহাতাপসীর মতো অনুভব করে তাহার বক্ষঃস্পন্দন এবং পৃথিবীর মানুষের কানে পৌঁছাইয়া দেয় তাহার সকল সংবাদ, দূর করে মানুষের উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুল সংবাদ-তৃষ্ণা। বিশ্বের রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি

বিজ্ঞান, বাণিজ্য, সাহিত্য, সংস্কৃতি, খেলাধুলা, আমোদ-প্রমোদ—সকল ক্ষেত্রেই তাহার অবাধ পদসঞ্চার। মানুষের দয়া-দাক্ষিণ্য, তাহার ক্ষমতার অহংকার, তাহার পৈশাচিক উল্লাস—সকল বিবরণ আনিয়া সে উপস্থিত করে মানুষের বিবেকের দরবারে, গণদেবতার নির্মম বিচারশালায়। আর, পৃথিবীর যেখানে 'প্রতিকারহীন শক্তির অপরাধে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে,' সেখানেই সংবাদপত্রের নির্ভীক ধিক্কার-বাণী ধ্বনিত হইয়া উঠে; সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর লক্ষ-কোটি মূক কণ্ঠস্বরও প্রবল বিক্ষোভে সোচ্চার হইয়া উঠে। শক্তিমদমত্ত অত্যাচারীর দল সেই প্রবল গণ-বিক্ষোভের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে না। তখন ভীত, সন্ত্রস্ত অত্যাচারীর দল নতি স্বীকার করে সেই জাগ্রত জনমতের নিকট। অন্যায়ের পরাভবে ন্যায়ের অম্লান মর্যাদা হয় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত। পরাজিত হয় অত্যাচারী স্বৈরতন্ত্র, জয় হয় মানবতার। নির্ভীক সংবাদপত্রই সেই কৃতিত্বের কারিগর।

সংবাদপত্রের আবির্ভাবের ইতিহাস

একদা যুগ-প্রয়োজনেই সংবাদপত্রের প্রথম আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। যুগে যুগে তাহার সেই প্রয়োজনীয়তা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুগের অনিবার্য প্রয়োজনে তাহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে নানা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার দায়িত্বও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ যুগের শিক্ষা ও সভ্যতা সংবাদপত্রের সহায়তা ভিন্ন সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। কাগজ ও মুদ্রণ-যন্ত্র আবিষ্কারের ন্যায় সংবাদপত্র প্রকাশের প্রথম গৌরবও চীনদেশের প্রাপ্য। ভারতবর্ষেও মোগল-রাজত্বকালে ছিল হস্তলিখিত সংবাদপত্রের সীমিত প্রচলন। একমাত্র প্রশাসনিক বিভাগের মধ্যেই তাহার প্রচার ছিল সীমাবদ্ধ। য়ুরোপে সংবাদপত্রের প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে ইতালি দেশে। বাংলাদেশে মুদ্রণ-যন্ত্রের প্রথম আবির্ভাব সূচিত হয় অষ্টাদশ শতকের শেষপাদে। সেই সূত্রে বাংলা সংবাদপত্র উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ-লগ্নে আত্মপ্রকাশ করে শ্রীরামপুরের খ্রীস্টান মিশনারীদের হাতে। মুষ্টিমেয় কয়েকটি দেশ ব্যতীত পৃথিবীর সর্বত্রই আজ সংবাদ-পত্রের অবাধ পদসঞ্চার। সংবাদপত্রহীন আধুনিক জীবন সম্পূর্ণরূপে অচল, অসম্ভব ও অকল্পনীয়। বর্তমানে ভারতে প্রচলিত সংবাদপত্রের মোট-সংখ্যা ১২,৬৫৩। তন্মধ্যে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের সংখ্যা ৭৮৪ এবং ইহাদের বিক্রয়-সংখ্যা কিঞ্চিদধিক দুই কোটি। স্বাধীন বাংলাদেশে সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর মুখের ভাষাও বাংলা। সেখানে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির মধ্যে 'ইত্তেফাক'ই প্রধান।

'It is the people's Parliament always in session'

সংবাদপত্র মহামানবের দরবার, গণদেবতার বিচারশালা। জনস্বার্থের উদ্দেশ্যে গৃহীত কোন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার রূপায়ণ ও তাহার সাফল্য বা ব্যর্থতার চিত্র গণদেবতার দরবারে উপস্থাপিত হওয়া চাই। সংবাদপত্র সেই চিত্র উপস্থাপনায় বিশ্বস্ত ও দায়িত্বশীল মাধ্যম। কোথাও গণস্বার্থ পদদলিত কিংবা অবহেলিত হইয়া মুষ্টিমেয়ের স্বার্থ স্বীকৃত হইলে সংবাদপত্রের নির্ভীক কণ্ঠ সোচ্চার হইয়া উঠে। কোথাও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ব্যর্থতা বা ত্রুটি-বিচ্যুতি, কোথাও বা কায়েমী স্বার্থের পদ-লেহন—সেই সব ক্ষেত্রে সংবাদপত্র তাঁহার ক্ষুরধার মন্তব্যে ও তির্যক ঘৃণা-বর্ষণে মুখর হইয়া উঠে।

তাহা ছাড়া, জনসাধারণের চিঠিপত্র প্রকাশনার মাধ্যমে জাগ্রত গণমতকে প্রতিফলিত করিয়া উহা বহন করে তাহার পবিত্র নৈতিক দায়িত্ব। এইভাবে যখন সারাদেশে প্রবল জনমত গড়িয়া উঠে, তখন নীতিভ্রষ্ট স্বৈরাচারী সরকারকে নিরুপায়ভাবে শাসকের আসন হইতে নামিয়া আসিতে হয়—গণদেবতার বিচারশালার কাঠগড়ায় ন্যস্ত দায়িত্ব বহনে অসামর্থ্যের কথা স্বীকার করিয়া তাহাকে নতজানু হইয়া ক্ষমাভিক্ষা করিতে হয় মনে হয়, 'It is the people's Parliament always in session'—সর্বতোভাবে সার্থক। সংবাদপত্র, আক্ষরিক অর্থেই, জনগণের সদাজাগ্রত লোকসভা।

সংবাদপত্রের এই ভূমিকা গৌরবোজ্জল, কিন্তু সংকটমুক্ত নয়। সংকটের নানা রাহুগ্রাসে নিপতিত হইয়া সংবাদপত্র মাঝে মাঝে তাহার পবিত্র দায়িত্ব বহনে অসমর্থ হইয়া পড়ে। স্বভাবতঃই সংবাদপত্রের প্রকাশনা আজ একটি লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। বলাবাহুল্য, অন্যান্য বহু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মতো সংবাদপত্র-প্রকাশন ব্যবসায়ও ধনিক-সমাজের কুক্ষিগত। সংবাদপত্রের ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের মালিকরা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থরক্ষার জন্য ক্ষমতারূঢ় শক্তিশালী শাসকগোষ্ঠীর মনোরঞ্জনে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকে। তাহাতে ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠীর জনস্বার্থ-বিরোধী কার্যাবলীও সমর্থিত হয় এবং পবিত্র জনস্বার্থ নির্মমভাবে হয় পদদলিত। তখন মানবজাতির বিশেষ জাতিগোষ্ঠীর ভাগ্যে সত্যই বড় দুর্দিন

উপসংহার

ঘনাইয়া আসে। নানা কায়েমী-স্বার্থের হাতে ক্রীড়নক হইয়া তখন সংবাদপত্র তাহার নিরপেক্ষতা বিসর্জন দিয়া জনগণের দুঃখ-দুর্দশার মাত্রাকে আরও বাড়াইয়া তোলে। যেখানে 'প্রতিকারহীন শক্তির অপরাধে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে,' সেখানে যদি সংবাদপত্রের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যায়, যদি সংবাদপত্র লাঞ্ছিত নিপীড়িত মানবতার মূঢ়, মূক, ম্লান মুখে ভাষা যোগাইতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে এই আধুনিক পৃথিবীর লক্ষ-কোটি নিঃসহায় মানুষ বিচারের প্রার্থনায় কাহার দ্বারে গিয়া দাঁড়াইবে? মুষ্টিমেয় শক্তিমান্, বুদ্ধিমান্ ও ধনবানের হাতে যদি সংবাদপত্র অমূল্য গণস্বার্থকে বিকাইয়া দেয়, তবে এই লোভ-জটিল পৃথিবীতে মানুষের আর আশা-ভরসা কি রহিল? সংবাদপত্র কবে এই সর্বনাশের রাহুমুক্ত হইবে?

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- সংবাদপত্র-পাঠের প্রয়োজনীয়তা
- গণতন্ত্র ও সংবাদপত্র
- জনগণের সেবায় সংবাদপত্র
- গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংবাদপত্রের ভূমিকা
- সংবাদপত্র ও তাহার দায়িত্ব, ক. প্রা. '৬৪
- সংবাদপত্র-পাঠের উপকারিতা
- জাতি-গঠনে সংবাদপত্রের স্থান
- সমাজ-গঠনে সংবাদপত্র

প্রবন্ধ-সূত্র : সূচনা। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। মানবজীবনে বিজ্ঞানের অবদান। প্রতিদিনের জীবনে বিজ্ঞানের অবদান। বিজ্ঞানের বিভীষিকাময় রূপ। বিজ্ঞানের সর্বধ্বংসী অকল্যাণ-মূর্তি। দোষ কাহার? বিজ্ঞানের না প্রয়োগ-পদ্ধতির? উপসংহার।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া ও মানব-সভ্যতা

উ. মা. '৬৯ ; মা. '৬০

মানুষ তাহার যুগ-যুগান্তরের স্বপ্ন ও সাধনার অনবদ্য ফসল দিয়া সভ্যতার এই বিশাল ইমারৎ গড়িয়া তুলিয়াছে। আপনার প্রাণশক্তি তিল তিল দান করিয়া, বুকের রক্ত বিন্দু বিন্দু ঢালিয়া দিয়া সে রচনা করিয়াছে সভ্যতার এই তিলোত্তমা-মূর্তি। সে সভ্যতার বেদীমূলে দিয়াছে বাহুর শক্তি, মস্তিষ্কের বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি এবং হৃদয়ের ভালোবাসা। বিজ্ঞানও মানুষের অতন্দ্র সাধনার ফসল। বিজ্ঞানকে সে সভ্যতার বনিয়াদ-রচনার কাজে করিয়াছে নিয়োজিত। বর্তমান সভ্যতার এই চরম সমুন্নতির মূলে রহিয়াছে তাই বিজ্ঞানের অপরিসীম বিস্ময়।

সূচনা

আজ বিজ্ঞানের বিশ্ববিজয় বিস্ময়কর হইলেও বিজ্ঞান-সাধনার সূচনা হইয়াছিল অত্যন্ত দীনভাবে। বহু মানবের যুগ-যুগান্তরের সাধনায় ও সর্বত্যাগী জ্ঞান-তপস্বীদের দুশ্চর তপস্যায় সাফল্য লাভ করিয়া বিজ্ঞান রূপকথার দৈত্যপুরী হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে সোনার কাঠি এবং রূপার কাঠি। তাহা হস্তগত করিয়া সভ্যতার প্রত্যূষলগ্নের সেই অসহায় মানুষ আজ অসীম শক্তিধর। সেদিনের অরণ্যচারী, গুহাবাসী মানুষ আকাশে মেঘ এবং মেঘের বুকে বিদ্যুল্লেখা দেখিলে ভয় পাইত। আর, আজ মানুষ মেঘকে করিয়াছে বশীভূত, বিদ্যুৎকে করিয়াছে পদানত।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার

বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান্ মানুষ আজ খনির অন্ধকারে আলো জ্বালিয়াছে, ঘুম ভাঙাইয়াছে পাতালপুরীর ঘুমন্ত রাজকন্যার, দৈত্যপুরীর বন্দীশালা হইতে মুক্ত করিয়া আনিয়া তাহাকে নিজের পরিকল্পনা অনুসারে সাজাইয়াছে, উদ্ভাবন করিয়াছে উৎপাদনের নব নব প্রকরণ, পৃথিবীর শৈশবের জড়তা কাটাইয়া আনিয়া দিয়াছে যৌবনের অফুরন্ত কর্মশক্তি ও গতির উল্লাস। অন্যদিকে, বিজ্ঞানের ঐন্দ্রজালিক শক্তিবলে মানুষ উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল নদীস্রোতকে বশীভূত করিয়া ঊষর মরু-প্রান্তরকে করিয়াছে জলসিক্ত, ভূগর্ভের সঞ্চিত শস্য-সম্ভাবনাকে করিয়া তুলিয়াছে উজ্জ্বল, পাষাণী অহল্যা ধরিত্রীর সর্বদেহে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছে অপূর্ব প্রাণস্পন্দন। বিজ্ঞান আজ উর্বরতা দিয়া ক্ষয়িষ্ণু বসুধাকে শস্যবতী করিয়া তুলিয়াছে, শিল্প-শৈলীর নব নব প্রবর্তনে সে উৎপাদন-জগতে আনিয়াছে যুগান্তর এবং সুদূরকে করিয়াছে আমাদের নিকটতম। বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব সাফল্যে জীবধাত্রী বসুধা আজ সদা-হাস্যময়ী।

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

প্রাগৈতিহাসিক মানবের অগ্নি-প্রজ্বলন-কৌশল আয়ত্ত করার দিন হইতে আধুনিক রকেট-স্পুটনিক-মহাকাশযানের যুগ পর্যন্ত মানুষের অতন্দ্র সাধনা বিজ্ঞানকে করিয়াছে সমৃদ্ধ, সভ্যতাকে করিয়াছে জঙ্গম। বাষ্পীয় শক্তিকে সে করিয়াছে বশীভূত, আকাশের

বিদ্যুৎকে সে করিয়াছে করায়ত্ত, মুঠিতে পুরিয়া লইয়াছে আণবিক, পারমাণবিক শক্তিকে। স্থলপথে ছুটিয়াছে মোটর-ট্রেন, জলপথে ঢেউ-এর ঝুঁটি জাপ্‌টিয়া ধরিয়া ভারি জাহাজ ছুটিয়া চলিয়াছে, আকাশ তোলপাড় করিয়া উড়িয়া চলিয়াছে শব্দের চেয়েও দ্রুতগামী বিমান-পোত, মহাশূন্যে পাড়ি দিতেছে রকেট-স্প্‌টনিক-মহাকাশযান। অন্যদিকে, বিজ্ঞান সাবিত্রীর মতো মৃত্যুর করালগ্রাস হইতে জীবনকে বাঁচাইয়া তুলিবার জন্য প্রতিশ্রুতি-বদ্ধ।

মানবজীবনে বিজ্ঞানের অবদান

আজ মানুষের জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অবাধ পদসঞ্চার। প্রভাতের শয্যাত্যাগ হইতে নিশীথের শয্যাগ্রহণ পর্যন্ত বিজ্ঞান তাহার অনুগত অনুচর। প্রভাতে 'এলার্ম ঘড়ি'র শব্দে কিংবা রেডিয়োর প্রভাতী ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভাঙিল তাহার। বিজ্ঞানের বিচিত্র কৌশলে ততক্ষণে কলে জল আসিয়াছে। প্রয়োজনমতো কখনও সে জল উষ্ণ, কখনও-বা শীতল। মাথার উপর পাখা ঘুরিতে লাগিল, রেডিয়োতে বাজিতে লাগিল নানা বিচিত্র গান। কোথাও-বা দূর-দূরান্তরের ছবি ও বাণী চক্ষের নিমেষে টেলিভিশনের পর্দায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বাজারে যাইবার প্রয়োজন নাই। বিজ্ঞানের দৌলতে ঘরের একপাশে 'ফ্রীজে'র মধ্যে একটি আস্ত বাজারকে অবিকৃত অবস্থায় বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে। এদিকে, বৈদ্যুতিক উনানে বা গ্যাসের উনানে চা-কফির জল গরম হইল, প্রস্তুত হইল প্রাতরাশ। সম্মুখের টেবিলে সংরক্ষিত সংবাদপত্র এবং অন্যান্য পত্রিকা মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে মুদ্রিত; এবং তাহাও বিজ্ঞানের অবদান। একপাশে রক্ষিত নীরব টেলিফোন সহসা বাজিয়া উঠিল। হাজার মাইল দূরের বন্ধুর কণ্ঠস্বর টেলিফোনে ভাসিয়া আসিল। 'কলিং বেল' বাজিল। কোন অতিথি বিশেষ প্রয়োজনে সাক্ষাৎ-প্রার্থী। অতিথির সহিত আলাপান্তে ঘড়িতে চোখ পড়িল। ওদিকে বিজ্ঞানের হাতে বাথরুমে স্নানের জল প্রস্তুত। স্নানাহার সারিয়া বাহিরে যাইতে হইবে। পোশাক-পরিচ্ছদ পূর্ব হইতেই ওয়াশিং মেশিনে কাচিয়া ইলেকট্রিক ইস্ত্রিতে ইস্ত্রি করিয়া রাখা হইয়াছে। বিজ্ঞানের কল্যাণে কোন কোন পোশাক-পরিচ্ছদের আবার ইস্ত্রি করিবার প্রয়োজনই হয় না। যাহা হউক, 'দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি'। সে সৌভাগ্য যাহাদের নাই, তাহাদের জন্য রহিয়াছে ইলেক্ট্রিক ট্রেন, ট্রাম, বাস বা ট্যাক্সি। অফিসে আলো জ্বলিতেছে, পাখা ঘুরিতেছে, কোন অফিস হয়তো বা শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত। চাবি টেপার সঙ্গে সঙ্গেই ঊর্ধ্বলোক হইতে রথ নামিয়া আসিল; সেই লিফ্‌ট তাহাকে অফিসের দ্বার-প্রান্তে নামাইয়া দিয়া গেল। 'টাইপ রাইটার'-এ চিঠিপত্র টাইপ করা হইতেছে; কম্‌পিউটারের সাহায্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসাব রক্ষিত হইতেছে। ছুটির পরে আমোদ-প্রমোদের জন্য রহিয়াছে সিনেমা-বায়োস্কোপ। ইতিমধ্যে শরীর অসুস্থ বোধ হইলে আছে ডাক্তারখানা, আছে ডাক্তারখানার ঔষধ। রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িলে ও আহারান্তে ঘুম না আসিলে বিজ্ঞান রেডিয়োর সাহায্যে শুনাইবে ঘুম-পাড়ানিয়া গান। বিজ্ঞান তাহার শিয়রে সারারাত অক্লান্ত হাতে পাখা ঘুরাইবে কিংবা শীতাতপ-নিয়ন্ত্রক যন্ত্রটিকে চালু রাখিয়া মানুষের সুখনিদ্রার ব্যবস্থা করিবার জন্য বীতনিদ্র থাকিবে।

প্রতিদিনের জীবনে বিজ্ঞানের অবদান

এই সমস্ত হইল বিজ্ঞান-নির্ভর সভ্যতার উজ্জ্বল দিগন্ত। অন্য দিগন্তে জমিয়াছে অনেক দুঃখ, অনেক প্রবঞ্চনা। বিজ্ঞান আসিয়া জোর করিয়া মানুষের হাতের কাজ কাড়িয়া লইয়া তাহাকে নিশ্চিত অনাহারের দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে; দরিদ্রকে করিয়াছে আরও দরিদ্র, ধনিককে করিয়াছে আরও ধনী। সে প্রাচীন, শান্ত, সুন্দর, সনাতন জীবন-ছন্দের তার ছিঁড়িয়া দিয়াছে। মানুষের এই বোবা দুঃখ, এই নিঃসহায় নৈষ্কর্ম্য পৃথিবীর বুকে আজ সৃষ্টি করিয়াছে এক দুরপনেয় ক্ষত। বিজ্ঞানের এই যন্ত্র-সিদ্ধ কাপালিক বিভীষিকা হইতে মানুষের মুক্তি নাই, মুক্তি নাই শোষণের এই সর্বনাশা পরিণাম হইতে।

বিজ্ঞানের বিভীষিকাময় রূপ

বিজ্ঞান যে-সভ্যতার শরীরে জীবন প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, আজ তাহারই বিনাশে সে মাতিয়া উঠিয়াছে রুধির-তৃষাতুর ছিন্নমস্তার মতো। বর্তমান শতাব্দীতে সংঘটিত দুইটি বিশ্ব মহাযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসলীলা বিজ্ঞানের দানবীয় শক্তি সম্বন্ধে মানুষের মনে আনিয়া দিয়াছে এক ঘোরতর আতঙ্ক। বর্তমান কালে বিজ্ঞান কী চায়? জীবন, না মৃত্যু? আজ পৃথিবীর মানুষের মনে জাগিয়াছে এই অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

বিজ্ঞানের সর্বধ্বংসী অকল্যাণ-মূর্তি

কিন্তু দোষ কাহার? বিজ্ঞানের, না যাহারা বিজ্ঞানকে স্বার্থ-লোলুপ দানবীয় প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য নির্লজ্জভাবে প্রয়োগ করে, তাহাদের? সেই স্বার্থপর নরপিশাচদের হাতেই বিজ্ঞান বারেবারে তাহার মানবিক কল্যাণ-ব্রত হইতে ভ্রষ্ট হইয়া করিয়াছে নরমেধ যজ্ঞের আয়োজন। দোষ হইতেছে সেই লোভী শয়তানদের সংকীর্ণ স্বার্থ-বুদ্ধির, দোষ এই শক্তি-স্পর্ধিত ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার। আজ আর বিজ্ঞানের হাত ছাড়িয়া দিয়া জীবনাচরণ সম্ভব নয়। কাজেই, আজ প্রয়োজন বিজ্ঞানের প্রয়োগ-পদ্ধতির পরিবর্তনের।

দোষ কাহার? বিজ্ঞানের না প্রয়োগ-পদ্ধতির?

অসীম সম্ভাবনাময় বিজ্ঞান মুষ্টিমেয় স্বার্থপর নরঘাতীদের হাতে আজ সমাজের সার্বিক দুঃখ ও আতঙ্কের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আর কতকাল বিজ্ঞান-লক্ষ্মী হৃদয়হীন নর-পিশাচের গৃহে দাসীবৃত্তি করিবেন? যিনি কল্যাণের অধিষ্ঠাত্রী, তিনি কি তাঁহার কল্যাণপূত দক্ষিণ হস্ত সকল মানুষের জন্য প্রসারিত করিয়া দিবেন না? বিজ্ঞান যদি সর্বধ্বংসী মারণাস্ত্র নির্মাণ হইতে বিরত হইয়া কেবল মানবিক কল্যাণে ব্যবহৃত হয়, তবেই মানুষের এই দুঃখ-রজনীর অবসান হইবে, রক্ত-বিপ্লবের হাত হইতে রক্ষা পাইবে জীবধাত্রী বসুধা॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের প্রভাব, মা. '৮০
- প্রতিদিনের জীবনে বিজ্ঞান, উ. মা. '৮৯
- সভ্যতার বিকাশে বিজ্ঞানের অবদান
- বিজ্ঞান কী চায়: জীবন, না মৃত্যু?
- বিজ্ঞান ও মানব-সভ্যতা
- বিজ্ঞানের দান

১৪.

প্রবন্ধ-সূত্র ঃ সূচনা। বেতার-যন্ত্র বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার। বেতার-যন্ত্রের কারিগরী দিক। বেতার-যন্ত্রের আবিষ্কার। জগদীশচন্দ্র ও মার্কনি। প্রচার ও উপযোগিতা। শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান-সূচী। ভারতের আকাশবাণী। উপসংহার।

বেতার-বার্তা

ক. প্রা. '৬৭

'কত অজানারে জানাইলে তুমি
কত ঘরে দিলে ঠাঁই,
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু
পরকে করিলে ভাই।'

—রবীন্দ্রনাথ

বিজ্ঞান আজ সুদূরকে করিয়াছে নিকটতম, পরকে করিয়াছে ভাই, বিশ্ব-জগৎকে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে আমাদের ঘরের দুয়ারে। পৃথিবীর কেহ আজ আর দূরে নাই, কোন কিছুই আজ আর দূরে নাই, সবাই নিকটে আসিয়াছে, সবই নিকট হইয়াছে। বিজ্ঞানের যে বিস্ময়কর আবিষ্কার এই অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছে—এই অসাধ্য সাধন করিয়াছে, তাহা বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার অবদান—বেতার-যন্ত্র। বেতার-যন্ত্র আজ লক্ষ কোটি মাইলের দুর্বার বন্ধুরতা জয় করিয়া বাহির-বিশ্বকে মানুষের করতলে আনিয়া দিয়াছে। ঘরে বসিয়া আমরা আজ ইহার সাহায্যে সুদূরের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইতেছি এবং আমাদের কণ্ঠস্বর সুদূরের মানুষকে শুনাইতে পারিতেছি।

সূচনা

বেতার-যন্ত্র বিজ্ঞানের একটি অত্যাশ্চর্য অবদান। ইহা দূরকে করিয়াছে আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। পৃথিবীর দেশ-দেশান্তরের সুখ-দুঃখ ও রাজ্য-ভাঙাগড়ার সকল গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আমাদের নিকট মুহূর্তে সে বহন করিয়া আনিয়া আমাদের কর্ণে ঢালিয়া দিতেছে। বিশাল এই বিশ্বকে সে সংকুচিত করিয়া আমাদের গৃহকোণে আনিয়া উপস্থিত করিতেছে। যোজন যোজন মাইলের দুর্লঙ্ঘ্য দূরত্বকে অপসারিত করিয়া সুদূরের মানুষকে সে করিয়াছে আমাদের পরমাত্মীয়। প্রাগাধুনিক কালের মানুষের কল্পনায় একদিন দৈব-বাণীর জন্ম হইয়াছিল; আধুনিক কালের মানুষ সেই রূপকথা ও পুরাণ-কথিত দৈব-বাণীকে দিল আকাশ-বাণীর রূপ। আকাশের নীরব নীলিমার বুক হইতে সে মানুষের ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত ভাষাকে বিজ্ঞান-বলে মাটিতে নামাইয়া আনিল। বেতার-যন্ত্র মানুষের বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন-শক্তির একটি বিস্ময়কর নিদর্শন। বিজ্ঞানের এই পরম বিস্ময়কর আবিষ্কার আজ মানুষের অন্তরলোক জয় করিয়া অল্পকালের মধ্যেই বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। বিপুলা এই পৃথিবীর কত নগর, রাজধানী, মানুষের কত কীর্তির পরিচয় ইহা নিত্য আমাদের নিকট বহন করিয়া আনিতেছে। সহস্র যুগের অপরিচয় ও সহস্র যোজনের দুর্বারতাকে বশীভূত করিয়া ইহা পৃথিবীর সুদূরতম দিগন্তসমূহের মধ্যে রচনা করিয়াছে মিলনের অপূর্ব সেতু-বন্ধন।

বেতার-যন্ত্র বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার

ঈথারের মধ্য দিয়া কিভাবে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ভ্রমণ করে, সেই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়াই বেতার-যন্ত্রের সৃষ্টি। শব্দতরঙ্গকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গে রূপান্তরিত করিয়া

মাইক্রোফোনের সাহায্যে তাহা উচ্চতর শক্তি-সম্পন্ন ট্রান্স্মিটিং স্টেশনের প্রেরক-যন্ত্রে মহাকাশের ঊর্ধ্বস্থিত ঈথার-সমুদ্রে প্রেরিত হয়। প্রেরক-স্টেশনের এরিয়েলের সাহায্যে মহাশূন্যে প্রেরিত সেই বিদ্যুৎ-তরঙ্গ স্থানান্তরে গ্রাহক-যন্ত্রের এরিয়েলে তরঙ্গ সৃষ্টি করে এবং তাহা আবার মাইক্রোফোনের সাহায্যে সম্প্রচারিত হইয়া আমাদের শ্রুতিগোচর হয়। ইহাই হইল বেতার-যন্ত্রের কারিগরী দিক। অর্থাৎ ইহার এক দিগন্তে প্রেরক-স্টেশন, অন্য দিগন্তে বিশেষভাবে নির্মিত গ্রাহক-যন্ত্র। মাঝখানে অন্তহীন শব্দহীন ঈথার-সমুদ্র।

বেতার-যন্ত্রের কারিগরী দিক

বেতার-যন্ত্রের আবিষ্কারের ইতিহাসের সঙ্গে বিজড়িত হইয়া আছে বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রের চিরস্মরণীয় নাম। ইহার বিস্ময়কর আবিষ্কার সর্বপ্রথমে উঁকি মারিয়াছিল তাঁহারই অনুসন্ধিৎসু মনে। সুদীর্ঘ গবেষণার দ্বারা তিনিই সর্বাগ্রে জানিতে পারিয়াছিলেন, বিশ্বভুবন এক নিঃসীম বিদ্যুৎ-সমুদ্রে ভাসমান। কাজেই, এই নিঃসীম বিদ্যুৎ-মহাসমুদ্রে কোন শব্দ নিক্ষিপ্ত হইলেই তাহা এক অদৃশ্য তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়া সমগ্র মহাসাগরটিকে অতি দ্রুত আলোড়িত করিয়া তোলে। পৃথিবীপৃষ্ঠ ছাড়িয়া যতই ঊর্ধ্বে আরোহণ করা যায়, বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ততই শান্ত হইয়া আসে। সেই শান্ত বিদ্যুৎ-সমুদ্রকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় বলা হয় ঈথার-লোক কোন উচ্চ-শক্তিসম্পন্ন প্রেরক-যন্ত্রের সাহায্যে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে কোন শব্দকে যদি সেই ঈথার-সমুদ্রে প্রেরণ করা যায়, তবে পৃথিবীর অন্য প্রান্ত হইতে গ্রাহক-যন্ত্রের সাহায্যে সেই শব্দকে আকর্ষণ করিয়া আনা সম্ভব। জগদীশচন্দ্র পরাধীন ভারতের দরিদ্র বৈজ্ঞানিক বলিয়া তাঁহার সেই আবিষ্কার পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান-জগতে স্বীকৃতি লাভ করিতে পারে নাই। তাঁহার আবিষ্কারের সূত্র ধরিয়া অবশেষে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ইতালীয় বৈজ্ঞানিক মার্কনি এই 'তারবিহীন টেলিগ্রাফ যন্ত্রের' আবিষ্কার করেন। ক্রমশঃ তাহার বহুতর উন্নতি সাধিত হইয়া বর্তমানে উহা পরিগ্রহ করিয়াছে বেতার-যন্ত্রের সুসংস্কৃত ও সুমার্জিত রূপ।

বেতার-যন্ত্রের আবিষ্কার: জগদীশচন্দ্র ও মার্কনি

প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকাল হইতে সূচিত হইয়াছে বেতার-যন্ত্রের বহুল প্রচলন। বিপন্ন জাহাজ কিংবা বিমান হইতে এই যন্ত্রের সাহায্যে বিপদ-বার্তা প্রেরণ করা যায়। কেবল বিপদ-বার্তা প্রেরণই নয়, বিপন্মুক্তির জন্য সাহায্য প্রেরণের আবেদনও ইহা নিরাপদ বন্দরে পৌছাইয়া দেয়। নিরাপদ বন্দরের সহিত বা অন্য জাহাজের সহিত মহাসমুদ্রে দুর্ঘটনায় নিপতিত বিপন্ন মজ্জমান জাহাজের একমাত্র সংযোগ-সূত্র হইল এই বেতার-যন্ত্র। বিপন্ন মানুষের সাহায্যের জন্য বেতার-যন্ত্র যে কল্যাণ-মণ্ডিত ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, তাহা সত্যই অনবদ্য। বাস্তবিকই, তাহার জন্য এই আবিষ্কারের নিকট সমগ্র মানব-সমাজ গভীরভাবে ঋণী।

প্রচার ও উপযোগিতা

বর্তমান বিশ্বে বেতার-যন্ত্রের ব্যবহার অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। সে আজ ক্লান্ত অবসন্ন মানুষের মনে আনন্দ-বিতরণের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। মানুষের অবসর-বিনোদনের জন্য বেতারের মাধ্যমে গীত-বাদ্য-নাট্যানুষ্ঠান ইত্যাদি এবং নানা উত্তেজনাপূর্ণ ক্রীড়ার ধারা-বিবরণী প্রচারিত হইয়া থাকে। আনন্দ-পরিবেশনের

ভূমিকা ছাড়াও বেতার-বার্তার শিক্ষাদানেরও একটি গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা আছে। বেতার-বার্তা আমাদের দায়িত্বশীল লোক-শিক্ষক। বিশ্ব-বিশ্রুত বিদ্বজ্জনের মূল্যবান বক্তৃতাদি বেতার-মারফৎ সম্প্রচারিত হইয়া থাকে। বেতারের সংবাদ পরিবেশনার দায়িত্বও অসীম। দেশে ইহার দ্বারা লোক-শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা করা যায়। ইহার মাধ্যমে শিক্ষামূলক রূপকানুষ্ঠানগুলি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী-মহলে অত্যন্ত জনপ্রিয়। তাহা ছাড়া, দেশ-বিদেশের সংবাদ আদান প্রদান, রাজনীতি এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি ব্যাপারে যোগসূত্র-স্থাপনের বিশেষ উপায় হইল বেতার-যন্ত্র।

শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান-সূচী

ভারতে বেতার-যন্ত্র জাতীয় জীবন সংগঠনে গ্রহণ করিয়াছে নূতন দায়িত্ব। স্বাধীনতা-লাভের পর সূচিত হইয়াছে ইহার এক নবতর অধ্যায়। বর্তমানে ভারতে রহিয়াছে মোট ছিয়াত্তরটি সম্প্রচার-কেন্দ্র। তাহাদের মোট প্রেরক-যন্ত্রের সংখ্যা হইল একশো একচল্লিশ। ভারতের মতো দেশে এই আয়োজন নিঃসন্দেহে ব্যাপক এবং সন্তোষজনক। অতি স্বল্পকালের মধ্যেই দেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-প্রচারে যে মূল্যবান্ ভূমিকা ইহা গ্রহণ করিয়াছে, তাহা অকুণ্ঠভাবে প্রশংসনীয়। ইহার মাধ্যমে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে শিল্পিগণ নব নব উপায় উদ্ভাবনে প্রয়াসী হইয়াছেন। প্রত্যহ সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত দীর্ঘ আঠারো ঘণ্টা ভারতীয় বেতার-প্রতিষ্ঠান—আকাশবাণী—সংবাদাদি পরিবেশন করিয়া জনজীবনে ধন্যবাদার্হ হইয়াছে।

ভারতের আকাশবাণী

আধুনিক বিশ্বে যোগাযোগ স্থাপনে দ্রুততর উপায় হইল বেতার-যন্ত্র। ইহার দ্বারা সর্বদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির বহমান ধারার সহিত যত সহজে আমাদের পরিচয় সংসাধিত হয়, এমন আর কোন কিছুতেই সম্ভব নয়। ইহার ব্যাপক ব্যবহারের ফলে আজ 'বসুধৈব' আমাদের 'কুটুম্বক' হইয়াছে। বেতার-যন্ত্র মুহূর্তের মধ্যে বিশ্ববার্তাকে আনিয়া আমাদের কর্ণগোচর করিয়া দিতেছে। বিজ্ঞানের এই বিস্ময়কর আবিষ্কার এখন আমাদের আর বিস্ময়ের উদ্রেক করে না। ইহা আমাদের গৃহস্থালির সহিত মিলিয়া-মিশিয়া আমাদের একেবারে ঘরোয়া জিনিস হইয়া গিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, বেতার-যন্ত্র আজ ভ্রমণে-পর্যটনে, স্বদেশে-বিদেশে, বিপদে-আপদে আমাদের নিত্য-সাথী। তাহা ছাড়া, বেতার-যন্ত্র আজ সুদূর পল্লী-অঞ্চলকেও সভ্যতার অগ্রগতির সহিত এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধিয়া দিয়াছে। দুস্তর ভৌগোলিক ব্যবধান আজ আর কোন ব্যবধানই নয়। বেতার-যন্ত্রের কল্যাণে 'দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার' উত্তীর্ণ হইয়া দেশ-দেশান্তর আমাদের গৃহকোণে আনিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বেতার-যন্ত্র বিশ্ব-মানবের মিলনের বিশ্বস্ত দূত, বিশ্বের দুঃখ-সুখের দ্রুততম বার্তাবহ।

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- আধুনিক যুগে রেডিয়োর প্রভাব, ক. প্রা. '৬৭
- বর্তমান মানব-সভ্যতা ও বেতার-যন্ত্র
- মানব-সভ্যতার সেবায় বেতার-যন্ত্র
- বেতার-যন্ত্রের জনপ্রিয়তা

১৫.

প্রবন্ধ-সূত্র ॥ সূচনা ॥ মহাকাশ ও মানুষ ॥ স্বপ্ন ও সাধনা ॥ রকেটের জন্ম-ইতিহাস ॥ মহাকাশ-অভিযানে প্রথম পদক্ষেপ : স্পুটনিক ॥ সোভিয়েট মহাকাশ-অভিযান ॥ মার্কিন মহাকাশ-অভিযান ॥ চন্দ্র-বিজয় : এক. আর্মস্ট্রং, অলড্রিন ও কলিনস ॥ চন্দ্র-বিজয় : দুই. কোনার্ড, বীন ও গর্ডন ॥ উপসংহার ॥

চন্দ্রলোক বিজয়

উ. মা. '৭০, '৭৩, '৭০

'হাসই চড়ে চায় যেতে কে চন্দ্রলোকের অচিনপুরে।' —নজরুল ইস্‌লাম

অবশেষে আসিল মানব-ইতিহাসের সেই চরম রোমাঞ্চকর মুহূর্ত। ১৯৬৯ সাল, ২০শে জুলাই। ভারতীয় সময় : সোমবার সকাল ৮টা ২৬ মি. ২০ সেকেণ্ড। মানুষের বহু শতাব্দীর স্বপ্ন সেদিন সফল হইল। পৃথিবীর দুই দুঃসাহসী সন্তান নীল আর্মস্ট্রং ও অলড্রিন সেদিন চন্দ্রের বুকে তাঁহাদের পদচিহ্ন আঁকিয়া দিলেন। এতদিনে সুদূর আকাশের দুর্লভ চাঁদ-মামা মর্ত্যের মানব-শিশুর হাতে সত্যসত্যই ধরা দিলেন।

সূচনা

স্মরণাতীত কাল হইতে মানুষ মহাকাশের সুদূর নীলিমাকে উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া বলিয়াছে : 'খোলো খোলো, হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা।' কিন্তু আমাদের মর্ত্য-জননী বড় মমতাময়ী। তাহার নিবিড় মাধ্যাকর্ষণের বিপুল স্নেহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া গ্রহ-গ্রহান্তরে যাত্রার জন্য চলিয়াছে মানুষের নিরলস প্রচেষ্টা। একদিন গ্যালিলিও-র দূরবীক্ষণ-যন্ত্র মহাকাশের জানালা খুলিয়া দিল। তারও পরে কেপ্‌লারের গ্রহ-গতিতত্ত্ব এবং নিউটনের মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব তাহার মহাকাশের ঠিকানা আবিষ্কারের হইল বড় হাতিয়ার। তারপর এডগার অ্যালেন পো, হেল, এইচ. জি. ওয়েলস্, জুল ভার্ন, সিয়লকভস্কি এবং গডার্ডের রচনায় মানুষের সেই আকাঙ্ক্ষা আরও উদ্দীপিত হইয়া উঠিল।

মহাকাশ ও মানুষ

স্বপ্ন ও সাধনা

মহাকাশ-অভিযানের পথ-নির্মাণে সর্বাধিক কার্যকরী হইয়াছে আধুনিক বিজ্ঞানের বিস্ময়কর সৃষ্টি—রকেট। রকেট নির্মাণের প্রাথমিক গৌরব চীন দেশকেই দান করা হয়। অতি আধুনিককালে রকেটের গতিপথ নিয়ন্ত্রণের কলাকৌশল এবং তাহার গতিবেগ যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, মানুষের মহাকাশ-বিজয়ের কল্পনাও ততই প্রসারিত হইতে লাগিল।

রকেটের জন্ম-ইতিহাস

১৯৫৭ সালের ৪ঠা আগস্ট : মহাকাশ-অভিযানের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন সেদিন রাশিয়ার উৎক্ষিপ্ত প্রথম 'স্পুটনিক' প্রায় ৯১৮ কিলোমিটার ঊর্ধ্বলোকে পৃথিবী প্রদক্ষিণ শেষ করিয়া সগৌরবে ফিরিয়া আসিল মর্ত্যের মাটিতে তারপর ১৯৫৭ সালের ৩রা নভেম্বর 'লাইকা' নামে একটি জীবন্ত কুকুরকে বহন করিয়া রাশিয়ার দ্বিতীয় স্পুটনিক প্রায় ১,৫১। কিলোমিটার ঊর্ধ্বলোকে পৃথিবী পরিক্রমা শেষ করিয়া সাফল্যের সহিত 'মাটি মায়ের কোলে' ফিরিয়া আসিল। প্রাথমিক সাফল্যের উৎসাহে উৎসাহিত বিজ্ঞানীরা

মহাকাশ-অভিযানে প্রথম পদক্ষেপ : স্পুটনিক

চন্দ্রলোক-বিজয়ের স্বপ্ন- দেখিতে লাগিলেন। ১৯৫৯ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর রাশিয়ার রকেট চন্দ্র-বিজয় সমাপ্ত করিল।

এইবার মহাকাশ-বিজয়ের কলম্বাস য়ুরি গাগারিন ১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল মহাকাশের রহস্য-যবনিকা উত্তোলন করিয়া পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিলেন। তারপর মহাকাশে 'অগ্নি-আখরে' নিজেদের নাম যাঁহারা লিখিয়া আসিলেন, তাঁহারা হইলেন টিটভ, নিকোলায়েভ, পোপোভিচ, বিকোভস্কী এবং ভ্যালেন্তিনা তেরেস্‌কোভা।

সোভিয়েট মহাকাশ-অভিযান

তারপর কোমরভ, ইয়েগোরভ ও ফিওকতিস্তোভ ভস্কদ: এক-যোগে ১৯৬৪ সালে, এবং লিওনভ ও বেলায়েভ ভস্কদ: দুই-যোগে ১৯৬৫ সালে সাফল্যের সহিত মহাকাশ-পরিক্রমা সমাপ্ত করিয়া আসিলেন। কিন্তু তারপর মহাকাশ-পরিক্রমাকালে সোভিয়েট নভশ্চর কোমরভ দুর্ঘটনায় নিপতিত হইয়া নিহত হন। মহাশূন্যে ইহাই প্রথম দুর্ঘটনা। তারপর ১৯৬৮ সালে এককভাবে বেরেগোভয় এবং ১৯৬৯ সালে যৌথভাবে সাতালভ, ইলিসিয়েভ ও ক্রুনভ এবং ভলিনভ ও ক্রুনভ সাফল্যের সহিত মহাকাশ-অভিযান সারিয়া আসেন।

মহাকাশ-অভিযানে সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের সাফল্য মার্কিন বিজ্ঞানীদের অনুপ্রাণিত করে। ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় মার্কিন জাতীয় বিমান-বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা। এই সংস্থা ১৯৬৩ সালের মধ্যে পৃথিবীর কক্ষপথে শতাধিক এবং সূর্যের কক্ষপথে পাঁচটি মহাকাশযান স্থাপন করে। তারপর ১৯৬১ সালে মার্কিন মহাকাশচারী শেপার্ড ও গ্রিসম, ১৯৬২ সালে গ্লেন, কার্পেন্টার ও সিরা এবং ১৯৬৩ সালে কুপার সাফল্যের সহিত মহাকাশ-পরিক্রমায় অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে গ্রিসম ও ইয়ং,

মার্কিন মহাকাশ-অভিযান

এপ্রিল মাসে হোয়াইট ও ম্যাকডিভিট, আগস্ট মাসে কুপার ও কনরাড, ডিসেম্বর মাসে বোরম্যান ও জেমস্ লোভেল্ এবং উহার এগারো দিন পরে সিরা ও স্ট্যাফোর্ড মহাকাশে পৃথিবী পরিক্রমা সারিয়া মর্তে ফিরিয়া আসেন। ১৯৬৬ সাল: এবার মার্কিন মহাকাশ-অভিযানের যুগ্ম নাবিক হইলেন যথাক্রমে নীল আর্মস্ট্রং ও ডেভিট স্কট, টমাস স্ট্যাফোর্ড ও ইউজেন সারনাক্স, ইয়ং ও কলিন্‌স্, কনরাড ও গর্ডন, লোভেল ও অল্‌ড্রিন। তারপর ১৯৬৮ সালে সিরা, ইজল ও কানিংহাম অভিযাত্রীত্রয় মহাকাশ পরিভ্রমণ করিয়া আসেন।

এ সব 'সাঁঝবেলাকার পিদিম জ্বালার আগে সকালবেলার সলতে পাকানো'র মতো চন্দ্রাভিযানের প্রস্তুতিমাত্র। সেই প্রস্তুতির চূড়ান্ত পর্যায়ে ১৯৬৮ সালে বোরম্যান, লোভেল ও এণ্ডের্স চাঁদের প্রায় ১১২ কিলোমিটার দূরত্ব হইতে ফিরিয়া আসেন। তারপর ১৯৬৯ সালে ম্যাকডিভিট, স্কট ও সোয়েকার্ট মহাকাশে চন্দ্রযানের পরীক্ষা-কার্য সমাপ্ত করিয়া আসিলেন। সব শেষে স্ট্যাফোর্ড, ইয়ং ও সারনাজ চন্দ্রযানে চাঁদের প্রায় ১৫ কিলোমিটারের মধ্যে পরিভ্রমণ করিয়া আসেন। তারপর ১৯৬৯ সালের ১৬ই জুলাই। ঐদিন অ্যাপোলো: এগারো-যোগে আর্মস্ট্রং, কলিন্‌স্ ও অল্‌ড্রিন চন্দ্রাভিমুখে শুরু করিলেন পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা দুঃসাহসিকতম অভিযান। ২০শে জুলাই ভারতীয় সময় রাত্রি ১টা ৫৩ মি.-এ চন্দ্রযান 'ঈগল' আর্মস্ট্রং ও অলড্রিনকে লইয়া চাঁদের প্রান্তিকায়

স্পর্শ করিল। ২১শে জুলাই ভারতীয় সময়ঃ সকাল ৮টা ২৬ মি. ২০ সেকেণ্ড। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গৌরবময় ও চিরস্মরণীয় মুহূর্ত। প্রথমে নীল আর্মস্ট্রং 'ঈগলে'র দরজা খুলিয়া মই বাহিয়া চাঁদের মাটিতে পদস্থাপন করিলেন। প্রাণহীন, জলহীন, ধূসর চন্দ্রবক্ষে পৃথিবীর দুঃসাহসী মানুষের প্রথম পদচিহ্ন অঙ্কিত হইল। কিছুক্ষণ পরে অলড্রিনও আর্মস্ট্রং-এর অনুসরণ করিলেন। প্রায় আড়াই ঘণ্টা কাল তাঁহারা চন্দ্রের প্রান্তরে বিচরণ করেন এবং যথানির্দিষ্ট কর্তব্যগুলি সমাধা করেন। তারপরে ঘরে ফিরিবার পালা। ভারতীয় সময় বেলা ১১টা ২৪মি.-এ 'ঈগল' চন্দ্রপৃষ্ঠ ত্যাগ করিয়া উঠিয়া আসিল। রাত প্রায় ৩টার সময় কলিন্‌স্‌-চালিত অ্যাপোলো-যানের সহিত 'ঈগলের' মিলন ঘটিল। 'ঈগল'কে দূরে নিক্ষেপ করিয়া অ্যাপোলোঃ এগারো মহাকাশচারীত্রয়কে লইয়া ২৪শে জুলাই ভারতীয় সময় রাত্রি ১০টা ১৯মি.-এ নিরাপদে প্রশান্ত মহাসাগরে অবতরণ করিল।

চন্দ্র-বিজয়ঃ এক. আমষ্ট্রং, অলড্রিন ও কলিন্‌স্‌

এই জয় কেবলমাত্র রাষ্ট্রবিশেষের জয় নয়, এই জয় সমগ্র বিশ্বমানবের জয়, মানব-সভ্যতার জয়। আবার, ১৯৭০ সালের মার্কিন চন্দ্রাভিযান ব্যর্থ হওয়ার পরে ১৯৭১ সালের ৩১শে জানুয়ারী অ্যাপোলোঃ চোদ্দ অ্যালেন শেপার্ড, স্টুয়ার্ট রুসা ও এডগার মিচেলকে লইয়া চন্দ্রাভিমুখে যাত্রা করে। ৫ই ফেব্রুয়ারী চন্দ্রযান 'আন্তারাস' চাঁদের 'ফ্রা মরো' অঞ্চলের মাটি স্পর্শ করিল। চাঁদের বুকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি-সমেত রিকশা টানিয়া অভিযাত্রীত্রয় কয়েক কিলোমিটার পথ পরিভ্রমণ করেন। পরিকল্পনা ছিল, চাঁদের একটি পাহাড়ের উপর অভিযান চালানো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহা পরিত্যক্ত হয়। তারপর সেই অঞ্চলে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালাইবার জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি স্থাপন করিয়া এবং সেই অঞ্চলের মাটি সংগ্রহ করিয়া অভিযাত্রীরা মূল মহাকাশ-যানে ফিরিয়া আসিলেন। তারপর ঘটিল প্রশান্ত মহাসাগরে তাঁহাদের সফল প্রত্যাবর্তন।

চন্দ্র-বিজয়ঃ দুই. শেপার্ড, রুসা ও মিচেল

সাফল্যের পর আবার সাফল্য। সোভিয়েট স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র-গবেষক লুনাখোদঃ ১ চাঁদের 'বর্ষণ সাগর' এলাকায় অ্যালুমিনিয়াম, লোহ, সিলিকন, টাইটেনিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়ামের আকর খুঁজিয়া পাইয়াছে। এইভাবে মানুষের যুগ-যুগান্তরের চন্দ্র-বিজয়ের স্বপ্ন অবশেষে সফলতা লাভ করিল। 'সুদূরের পিয়াসী' মানুষের গ্রহান্তর-বিজয়ের স্বপ্নও এইভাবে হয়তো একদিন সাফল্যমণ্ডিত হইবে। কিন্তু—'নিদারুণ দুঃখরাতে/মৃত্যুঘাতে/মানুষ চূর্ণিবে যবে নিজ মর্ত্য-সীমা/তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা?'

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়ঃ

- মহাকাশ-অভিযান
- মানুষের চন্দ্রলোক-অভিযান
- মানুষের আকাশ-বিজয়. উ. মা. '৮০
- মানুষের অন্তরীক্ষ-বিজয়. উ. মা. '৮০

প্রবন্ধ-সূত্র : সূচনা। বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। বিদ্যুৎ-শক্তি : ঈথার, ইলেকট্রন : টেলিগ্রাফ, টেলিফোন। টেলিভিশন। ইহার আবিষ্কার। ইহার [illegible] : বেতার ও চলচ্চিত্র। ইহার ব্যবহার : [illegible]। ইহার কার্যকারিতা। ভারতে টেলিভিশন। উপসংহার।

টেলিভিশন

সূচনা

সৃষ্টির কোন্ আদিম প্রভাত হইতে প্রকৃতির জগতে শুরু হইয়াছে মানুষের জয়যাত্রা। সেই জয়যাত্রা আজও চলিয়াছে নিরবচ্ছিন্ন ও অপ্রতিরোধ্য গতিতে। [illegible] চেনালগ্নে দুর্জয় প্রকৃতি প্রতি পদবিক্ষেপে তাহার যাত্রাপথে সৃষ্টি করিয়াছে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা, সকল শক্তি দিয়া প্রতিরোধ করিয়াছে তাহার জয়যাত্রাকে। কিন্তু মানুষ সেই দুর্জয় প্রতিরোধ মানে নাই, নির্মমভাবে সকল বাধাকে সে করিয়াছে পদ-দলিত। তারপর কৌতূহলী মানুষ ধীরে ধীরে প্রকৃতির হাত হইতে কাড়িয়া লইল তাহার রহস্য-নিকেতনের গোপন চাবিকাঠি, জয় করিয়া আনিল এই বিপুল-ব্যাপ্ত জড়বিশ্বের বিচিত্র তথ্য-সম্ভার, কার্যকারণসূত্রে গ্রথিত করিল সংগৃহীত মূল্যবান তথ্যসমূহকে। এইভাবে সূচিত হইল বিজ্ঞানের নবজন্ম. শুরু হইল বিজ্ঞানের নিরলস জয়যাত্রা।

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

সেই বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান্ মানুষ বলিষ্ঠ পদবিক্ষেপে আজ প্রকৃতির রহস্য-নিকেতনের কক্ষ-কক্ষান্তরে যাত্রা শুরু করিয়াছে। বিজ্ঞানের সেই অভিযান, বিজ্ঞানীদের সেই অতন্দ্র সাধনা চলিয়াছে অব্যাহত গতিতে। সেই অক্লান্ত বিজ্ঞান-তপস্বীর দল মাতিয়া রহিয়াছেন নিত্য-নূতন বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনে। তাঁহাদের সাধনাপুষ্ট বিজ্ঞান আজ মানুষের পদচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে, পরিদৃশ্যমান্ এই বিরাট বিশ্ব-সংসারের সর্বত্র বিজ্ঞান প্রসারিত করিয়া দিয়াছে তাহার বিস্ময়কর ঐন্দ্রজালিক শক্তি। সেই শক্তির দ্বারা মানুষ সুদূরকে করিয়াছে নিকটতম, অদৃশ্যকে করিয়া তুলিয়াছে পরিদৃশ্যমান্।

বিদ্যুৎ-শক্তি : ঈথার, ইলেকট্রন : টেলিগ্রাফ, টেলিফোন

'টেলিভিশন' হইল বিজ্ঞানের জয়যাত্রার নবতর সাফল্যের দিক্‌চিহ্ন। সুদূরকে নিকটতম করিবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছিল টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন। টেলিগ্রাফ-টেলিফোনের আবিষ্কার সেদিন বিশ্বকে চমৎকৃত করিয়াছিল। কিন্তু তাহা আজ বিজ্ঞানে সফলকাম মানুষের মনে আর কোন বিস্ময় উৎপাদন করে না। তারপর বৈজ্ঞানিক একদিন আবিষ্কার করিলেন বিদ্যুৎ-শক্তি। সেইদিন হইতে মানুষ দুর্জয় শক্তিশালী হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাতে ধরা পড়িল ঈথার এবং ইলেকট্রনের গোপন রহস্য। বিজ্ঞানের জয়যাত্রার ইতিহাসে সংযোজিত হইল এক নূতনতম অধ্যায়।

শুধু টেলিগ্রাফ-টেলিফোনের উদ্ভাবন-সাফল্যেই মানুষ তৃপ্ত থাকিতে পারিল না। [illegible]পর্বে সে অসীম শক্তি-সম্পন্ন বিদ্যুৎকে করিয়াছে করায়ত্ত। এখন সে আরও কাছে

পাইতে চাহিল সুদূরকে, শুনিতে চাহিল দূরান্তরের মানুষের সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বর। তাহারই সেই আকাঙ্ক্ষার তাগিদেই উদ্ভাবিত হইল বেতার-বার্তা। এবার আর শুধু কণ্ঠস্বরেই সে তৃপ্ত রহিতে পারিল না, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মূর্তিও সে চাহিল প্রত্যক্ষ করিতে। আসিল টেলিভিশন। লক্ষ-কোটি মাইলের দূরবর্তী মানুষকে মুহূর্ত-মধ্যে নিবিড় সান্নিধ্যে পরিদৃশ্যমান্ করিয়া তুলিতে পারে এই বিস্ময়কর আবিষ্কারটি। কেবল তাহাই নয়, ইহার দ্বারা সুদূর বহির্বিশ্বকে মানুষ তাহার আপন কক্ষে করায়ত্ত আমলকীবৎ আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। টেলিভিশন আধুনিক বিজ্ঞানের একটি অভূতপূর্ব আবিষ্কার, একটি অতি বিস্ময়কর অবদান।

টেলিভিশন

বৈদ্যুতিক শক্তির আবিষ্কারই টেলিভিশন আবিষ্কারের মৌল প্রেরণা। বৈদ্যুতিক শক্তি আবিষ্কারের দ্বারা বেতার-যন্ত্র ও চলচ্চিত্র আবিষ্কার সম্ভব হইয়াছে। বেতার-যন্ত্র সুদূরের কণ্ঠস্বর নিকটে বহন করিয়া আনিয়াছে। আবার, চলচ্চিত্র মানুষের নির্বাক্ স্থির ছবিকে করিয়া তুলিয়াছে সচল এবং সবাক্। টেলিভিশন বেতার-যন্ত্র ও চলচ্চিত্রের সমবায়িক কার্যকারিতার আশ্চর্য যোগফল। ইহা সুদূরের চিত্রকে মুহূর্ত-মধ্যে কাছে আনিয়া সচল এবং সবাক্ করিয়া তোলে। টেলিভিশনের আবিষ্কারের জন্য ইহার অন্যতম আবিষ্কর্তা জন বেয়ার্ডের নিকট বিশ্ববাসী কৃতজ্ঞ।

ইহার আবিষ্কার

টেলিভিশনের একদিকে বেতার-বার্তা, অন্যদিকে চলচ্চিত্র। উচ্চশক্তি-সম্পন্ন ট্রান্সমিটারযোগে পৃথিবীর কোনও শব্দ মহাশূন্যের ঈথার-সমুদ্রে প্রেরিত হয়। সেই সঙ্গে এক উচ্চশক্তি-সম্পন্ন ক্যামেরার সাহায্যে ঊর্ধ্বের ঈথার-লোকে প্রেরিত হয় ক্রমান্বয়ে ত্বরিত-গতিতে-গৃহীত সংখ্যাতীত আলোকচিত্র। তারপর এক বিশেষ প্রকারে প্রস্তুত গ্রাহক-যন্ত্রের দর্পণে আলোকচিত্রগুলির ক্রমিক প্রতিফলন হয় এবং তাহার সহিত গৃহীত শব্দের হয় সম্প্রসারণ। তাহার ফলে কোন দূরবর্তী স্থানের ব্যক্তি বা বস্তুর গৃহীত এবং প্রেরিত চিত্র ও শব্দ-সম্ভার নিমেষ-মধ্যে এই যন্ত্রে আসিয়া পরিদৃশ্যমান্ ও সরব হইয়া উঠে।

ইহার কলা-কৌশল: বেতার ও চলচ্চিত্র

টেলিভিশনের আবিষ্কার ইদানীংকালের। কাজেই, ইহার বয়স বেশী হয় নাই। কিন্তু ইতিমধ্যেই ইহার ব্যবহার পৃথিবীর সকল উন্নত রাষ্ট্রেই জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। উল্লেখ্য যে, মহাকাশ-অভিযানে ইহার সাহায্য বিশেষ কার্যকরী হইয়াছে। মহাকাশযানের অভ্যন্তরে মহাকাশ-অভিযাত্রীর চিত্র ও বাণী প্রতিমুহূর্তে ইহা পৃথিবী-পৃষ্ঠে পৌঁছাইয়া দিয়া মানুষের উদ্বেগ-নিরসনের হইয়াছে বিশেষ সহায়ক। মহাকাশ-অভিযাত্রীর সকল অবস্থার চিত্র ও শব্দ স্বয়ংক্রিয় টেলিভিশন পৃথিবীতে বহন করিয়া আনিয়াছে বলিয়া তাহা সম্ভব হইয়াছে। চন্দ্রলোক-বিজয়ে টেলিভিশন অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত চন্দ্রাভিযাত্রী-দের সাফল্যের চরম মুহূর্তগুলিকে মর্ত্যবাসীদের দৃষ্টির সম্মুখে দৃশ্যমান্ করিয়া তুলিয়াছিল। অভিযাত্রীগণ পৃথিবীর মানুষের মহাবিশ্ব-গবেষণার সুবিধার জন্য চন্দ্রপৃষ্ঠে একটি শক্তিশালী টেলিভিশন প্রেরক-যন্ত্র স্থাপন করিয়া আসিয়াছেন।

ইহার ব্যবহার: পৃথিবীতে

টেলিভিশন সুদূরকে অত্যন্ত সন্নিকটে প্রত্যক্ষ ও শব্দমুখর করিয়া তোলে। ইহা বর্তমানে পৃথিবীর ধনী-রাষ্ট্রগুলির অধিবাসীদের আমোদ-প্রমোদ ও অবসর-বিনোদনের মূল্যবান উপকরণরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। তাহা ছাড়া, ইহা বিশ্বের এক সুদূর প্রান্তের সংবাদ ও ঘটনা মুহূর্ত-মধ্যে অন্য প্রান্তে প্রত্যক্ষ ও জীবন্তরূপে পরিবেশন করিতে পারে। আমাদের বিশ্বাস, ইহা যেমন মানুষের চন্দ্রাভিযানে চন্দ্রলোকের চিত্র ও বাণী বহন করিয়া আনিয়াছিল, তেমনি ইহা একদিন হয়তো গ্রহান্তরের চিত্র ও বাণী পৃথিবীপৃষ্ঠে বহন করিয়া আনিতে সক্ষম হইবে। সেদিন বোধ হয় আর বেশী দেরী নাই।

ইহার কার্যকারিতা

ভারতে টেলিভিশন-যুগের সবেমাত্র সূচনা হইয়াছে। অতীব ব্যয়-সাপেক্ষ বলিয়া ইহা ভারতে এখনও জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে পারে নাই। দিল্লীর ৬০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে ইহার কার্যকারিতা এখন সীমাবদ্ধ। শীঘ্রই ভারতের অন্যান্য বৃহৎ শহরগুলিতে টেলিভিশন সম্প্রসারিত হইতেছে। ১৯৫৯ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর ভারত টেলিভিশন-যুগে পদার্পণ করে। প্রাথমিক স্তরে ইহার কার্যকারিতা টেলি-ক্লাবগুলিতে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমানের চেহারা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। ১৯৬৫ সালের ১৫ই আগস্ট হইতে ইহার কর্মসূচী প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান-সূচীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। হিন্দী এবং ইংরেজিতে সংবাদ, সংবাদ-সমীক্ষা, লোকনৃত্য, লোকসংগীত, বিষয়-নির্ভর আলোচনা, সাহিত্য-বাসর, দেশ-বিদেশের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্পর্কে প্রামাণিক চিত্র-প্রদর্শনী ইহার অনুষ্ঠান-সূচীর অঙ্গ। ভারতে বর্তমানে প্রায় পৌনে দুই লক্ষ টেলিভিশন গ্রাহক-যন্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে। কলিকাতা, বোম্বাই, অমৃতসর, পুনা ও শ্রীনগরে টেলিভিশন-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে এবং কানপুর, দুর্গাপুর, আসানসোল ও মুসৌরিতে টেলিভিশন পুনঃসম্প্রচার কেন্দ্র স্থাপিত হইবে। ১৯৭৫ সালে কলিকাতায় টেলিভিশন আসিয়াছে। কিন্তু ব্যয়বাহুল্যের জন্য উহা জনপ্রিয় হইতে পারে নাই, প্রচার-সূচীও সীমিত। কাজেই, কেবল টেলিভিশন-কেন্দ্রের সম্প্রসারণই যথেষ্ট নয়, দেশে সুলভে পর্যাপ্ত-সংখ্যক টেলিভিশন গ্রাহক-যন্ত্র উৎপন্ন হওয়াও উচিত।

ভারতে টেলিভিশন

টেলিভিশন আধুনিক বিজ্ঞানের একটি বিস্ময়কর আবিষ্কার। মানুষের যুগ-যুগান্তরের স্বপ্ন ও কল্পনা আজ ইহার মাধ্যমে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। মহাভারতে বর্ণিত আছে, মহাত্মা সঞ্জয় হস্তিনানগরে বসিয়া কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের বর্ণনা শুনাইতে গিয়া এক অদৃশ্য এবং অলৌকিক শক্তিবলে যুদ্ধক্ষেত্রের সমস্ত দৃশ্য ও শব্দাবলী দেখিতে ও শুনিতে পারিতেন। আধুনিক-কালের মানুষ বৈজ্ঞানিক শক্তিবলে মহাকবি-কল্পিত সেই অদৃশ্য শক্তি করায়ত্ত করিয়াছে। টেলিভিশন মহাকবি-বর্ণিত সেই অদৃশ্য শক্তির বিজ্ঞান-সিদ্ধ মূর্ত প্রতীক॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

● বিজ্ঞানের একটি বিস্ময়কর আবিষ্কার

বর্তমান সভ্যতায় বিদ্যুতের দান

ক. প্রা. '৭৫

প্রবন্ধ-সূত্র : সূচনা। বর্তমান সভ্যতা বিদ্যুৎ-নির্ভর। দৈনন্দিন জীবনে বিদ্যুতের দান। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে বিদ্যুতের দান। উৎপাদনে বিদ্যুতের দান। পরিবহণ ও যোগাযোগ। জ্বালানির পরিবর্তে জল-বিদ্যুৎ। উপসংহার।

সূচনা

বৈজ্ঞানিক ফ্যারাডেকে ধন্যবাদ, তিনি আকাশের বিদ্যুৎকে নামাইয়া আনিয়া মাটির মানুষের কাজে লাগাইয়াছেন। সৃষ্টির আদিম প্রভাতে আকাশে বিদ্যুতের অহংকার দেখিয়া অসহায় ভয়ার্ত মানুষ তাহাকে কোন অলক্ষিত দেবতার নির্দয় হাতের দুর্জয় আয়ুধ ভাবিয়া অরণ্য অথবা গুহার নিরাপদ আশ্রয়ে আত্ম-গোপন করিয়াছিল। আধুনিক কালের বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান্ মানুষ আজ সেই দেবরাজ ইন্দ্রের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়াছে দুর্জয় বজ্র, কাড়িয়া লইয়াছে দুর্বার বিদ্যুৎ। সকল শক্তির উৎস বিদ্যুৎকে সে আলাদীনের প্রদীপের দুর্ধর্ষ দৈত্যের মতো করিয়াছে বশীভূত, তাহাকে নিয়োজিত করিয়াছে মানুষের একনিষ্ঠ সেবায়—সভ্যতার সার্বিক বিকাশে।

বর্তমান সভ্যতা বিদ্যুৎ-নির্ভর

আসলে, বিদ্যুৎ যে শুধুমাত্র আকাশেই ছিল, তাহা নয়। সর্বত্রগামী বিদ্যুতের উপস্থিতি রহিয়াছে জড়-জগতের প্রতিটি ক্ষেত্রে। এই দুর্লভ সত্যটি সর্বপ্রথম উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল আচার্য জগদীশচন্দ্রের নিত্য-উদ্ভাবনশীল মনোলোকে। উপযুক্ত পরীক্ষার দ্বারা আচার্য জগদীশচন্দ্র প্রমাণিত করিয়াছিলেন যে, সমগ্র জড়-জগৎকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে সর্বশক্তিমান্ বিদ্যুৎ। কিংবা বলা চলে, অসীম শক্তিশালী বিদ্যুতের এক বিশাল মহাসমুদ্রে এই জড়-জগৎ নিত্য-ভাসমান। সে যাহা হউক, দুর্জয় বিদ্যুৎকে করায়ত্ত করিয়া মানুষ ধীরে ধীরে সম্ভব-অসম্ভবের সীমারেখা মুছিয়া ফেলিতেছে। বিদ্যুৎ-শক্তির বিচিত্র কার্যকারিতার উপর রচিত হইয়াছে বর্তমান সভ্যতার সুদৃঢ় বনিয়াদ। বর্তমান সভ্যতা এত বেশী বিদ্যুৎ-নির্ভর যে, বিদ্যুতের হাত ছাড়িয়া দিয়া আজ তাহার পক্ষে একপদও অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়।

আকাশের অবাধ্য বিদ্যুৎ প্রথম যেদিন মানুষের হাতে ধরা দিল, সেদিনটি মানব-ইতিহাসের একটি স্মরণীয় দিন। সেইদিন মানুষের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল একটি নূতন যুগ, নূতন জীবনাদর্শ। সেই নূতন যুগের নামকরণ করা যাইতে পারে আলোকের যুগ, গতির যুগ। সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের পাতা গেল উল্টাইয়া, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও গতি-ব্যস্ততার মহোল্লাস শুরু হইয়া গেল দিকে দিকে। আজ বিদ্যুৎ মানব-জীবনের নানা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিয়াছে, দূর-দূরান্তরে প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে তাহার অবাধ গতিবিধি। বৈদ্যুতিক বাতি, বৈদ্যুতিক পাখা, টেলিগ্রাফ-টেলিফোন, রেডিও, টেলিভিশন—সবই রহস্যময় বিদ্যুৎ-শক্তির বিস্ময়কর অবদান। ঘরের কোণে বসিয়া আমরা আজ দূর-দূরান্তের

পৃথিবীকে সহজে প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছি। অনায়াসে তাহার সহিত যোগাযোগ 'পন করিতে পারিতেছি। এমন-কি, মানুষের ব্যাধি-বিজয়ের কাজেও বিদ্যুৎ আসিয়া ঃসঙ্কোচে হাত লাগাইয়াছে; রোগ-জর্জর মানুষকে দিতেছে আরোগ্যের ঠিকানা।

দৈনন্দিন জীবনে বিদ্যুতের দান

বিদ্যুৎ আজ রাত্রির অন্ধকারকে আলোকিত করিতেছে, দাবদগ্ধ গ্রীষ্মের নিদারুণ অস্বস্তির অবসান ঘটাইয়া ঘুরাইতেছে পাখা, চালাইতেছে এয়ার-কুলার, বাসগৃহকে করিয়াছে শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত। রন্ধন-কার্যেও বিদ্যুৎ হাত লাগাইয়াছে। রন্ধনের নানা ব্যবস্থা আজ বৈদ্যুতিক উনানে সম্ভব। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সকল ক্ষেত্রেই ছড়াইয়া রহিয়াছে বিদ্যুতের সক্রিয় স্পর্শ। বিদ্যুৎকে বাদ দিয়া আধুনিক সুসভ্য জীবন একেবারেই অচল।

আজ মানুষের আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের যে বিস্ময়কর উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহা বিদ্যুতের সাহায্যেই সম্ভব হইয়াছে। দেহাভ্যন্তরে কোন স্থান ব্যাধিগ্রস্ত হইলে যখন বাহির হইতে কিছুতেই রোগ-নির্ণয় করা সম্ভব হয় না, তখন অনুমান-নির্ভর

চিকিৎসা-বিজ্ঞানে বিদ্যুতের দান

চিকিৎসা না চালাইয়া 'এক্স-রে' বা রঞ্জন রশ্মির সাহায্যে দেহাভ্যন্তরের ছবি তুলিয়া রোগ-নির্ধারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়া সঠিক চিকিৎসা করা সম্ভব। অনুমান-নির্ভরতা হইতে বিদ্যুৎ চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে মুক্তি দিয়াছে। তাহা ছাড়া, বৈদ্যুত রশ্মির সাহায্যে ক্যান্সার প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসাও করা হইতেছে।

বিদ্যুৎ আজ বিশ্বের উৎপাদনের ইতিহাসে আনিয়াছে যুগান্তর। সে আজ দ্রুত ছন্দে কলকারখানায় চাকা ঘুরাইতেছে। দ্রুততর উৎপাদনের নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে। কেবল বৃহদায়তন শিল্পেই নয়, আজ কুটির-শিল্প ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিতেও বিদ্যুতের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে, বিদ্যুৎ কৃষির সেবায়ও আজ লাগাইয়াছে

উৎপাদনে বিদ্যুতের দান

তাহার শক্ত-সমর্থ হাত। পাম্পের সাহায্যে গভীর নলকূপের জল-উত্তোলন এবং তৃষ্ণার্ত কৃষিক্ষেত্রে প্রেরণ বিদ্যুতের দ্বারাই সম্ভব হইয়াছে। ফলে, বৃষ্টিহীন অঞ্চলে ও শুষ্ক মরশুমে জলসেচের সাহায্যে কৃষি শস্যবতী হইয়া উঠিয়াছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সঙ্গে পাল্লা দিয় বর্তমান দুনিয়ার উৎপাদন যে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার মূলে রহিয়াছে বিদ্যুৎ বিদ্যুৎই বর্তমানকালের কৃষি ও শিল্পোৎপাদনে গ্রহণ করিয়াছে চালক-শক্তির ভূমিকা।

পরিবহণ ও যানবাহনের ইতিহাসেও বিদ্যুতের দান অসীম। বিদ্যুৎ শহরে ট্রাম গাড়ি চালাইতেছে। শহর ও গ্রামের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছে বৈদ্যুতিব ট্রেন। ইহা বাষ্পচালিত ট্রেনের অপেক্ষাও দ্রুতগামী এবং ইহার সাহায্যে দূরবর্তী স্থানে অল্প সময়ের মধ্যে যাতায়াত করা যায়। ভারতের গুরুত্বপূর্ণ রেলপথগুলিতে

পরিবহণ ও যোগাযোগ

দ্রুত বৈদ্যুতীকরণের কাজ চলিতেছে। শহরে সম্প্রতি যে সমা গগনচুম্বী অট্টালিকা নির্মিত হইতেছে, বিদ্যুৎ-চালিত 'লিফ্‌ট' তাহাতে উঠানামার একমাত্র ভরসা। তাহা ছাড়া, বন্দরে এবং রেলস্টেশনে ' 'ক্রেন' অতি ভারী সমস্ত মাল উত্তোলন করে ও নামাইয়া দেয়। তাহাতে শ্রি

উৎস হইল বিদ্যুৎ। অন্যদিকে, টেলিগ্রাম, টেলিফোন ও টেলিপ্রিণ্টার যে বিশ্বের যোগাযোগ-ব্যবস্থাকে দ্রুততর করিয়া তুলিয়াছে, তাহাও তো বিদ্যুতেরই অবদান

জ্বালানি পুড়াইয়া বিদ্যুৎ উৎপাদনের দিন অতীত হইয়াছে। আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিকগণ বন্যা-নিয়ন্ত্রণের জন্য পৃথিবীর খরস্রোতা নদীগুলিকে বন্দী করিতে গিয়া পাইলেন অফুরন্ত জল-বিদ্যুতের সন্ধান। পৃথিবীর উচ্ছৃঙ্খল নদীগুলির অবাধ্য জল-স্রোতে যে এত প্রচুর পরিমাণ বিদ্যুতের সম্ভাবনা ছিল, তাহা আগে কে জানিত? এবং সেই বিদ্যুৎ যে এত সস্তায় উৎপাদন করা সম্ভব, তাহাই বা কে জানিত? জল-বিদ্যুতের উৎস অফুরন্ত। কিন্তু পৃথিবীর জ্বালানি-সম্ভার সীমিত কার্জেই, পৃথিবীর সকল দেশেরই উচিত জ্বালানি সংরক্ষণ করিয়া অবাধ্য নদীগুলির জল স্রোত হইতে জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনে মনোনিবেশ করা। বিশেষতঃ অনুন্নত দেশগুলি দুরন্ত নদীগুলিকে শক্ত কংক্রিটের বাঁধন পরাইয়া যদি জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন করে, তবে তাহারা উপকৃত হইবে এবং তাহাতে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দুয়ার খুলিয়া যাইবে। কয়লার খনিগুলিতে হাত না দিয়া জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া দেশের ভবিষ্যৎ গঠনে মনোনিবেশ করা বুদ্ধিমানের কাজ।

জ্বালানির পরিবর্তে জল-বিদ্যুৎ

বর্তমানকালে বিদ্যুৎ আমাদের নিত্য সহচর। বিদ্যুৎ ছাড়া আমরা একপদও অগ্রসর হইতে পারি না। সে আমাদের পরিশ্রম-ভার লাঘব করিয়া দিতেছে, আমাদের বিশ্রাম-সুখকে পরিপূর্ণতা দান করিতেছে। শুধু তাহাই নয়, সে আমাদের শহরগুলিকে আলোকমালায় সাজাইয়া তাহাদের অপরূপ করিয়া তুলিয়াছে। তাহা ছাড়া, আমাদের সহস্র যুগের অন্ধকার গ্রামগুলিতেও আলো জ্বালাইবার দায়িত্ব সে আজ গ্রহণ করিয়াছে। সকাল হইতে রাত্রি এবং রাত্রি হইতে সকাল—বিদ্যুৎ আমাদের সেবায় নিয়োজিত এমন কি, আমরা যখন ঘুমাইয়া পড়ি, তখনও বিঘূর্ণিত পাখার হাওয়ায় এয়ার কুলারের সাহায্যে অথবা শীতাতপ-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে বিদ্যুৎ রাখে তাহার নিরলস সেবার স্বাক্ষর। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের জীবন-ধারণের সার্বিক স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের জন্য বিদ্যুতের চোখে ঘুম নাই। এমন-কি মৃত্যুর পরেও যখন সকলের সকল সেবাযত্নের অবসান হয়, তখনও বৈদ্যুতিক চুল্লীতে বিদ্যুৎ আমাদের নশ্বর দেহখানাকে সযত্নে গ্রহণ করিয়া সেবার সর্বশেষ স্বাক্ষর মুদ্রিত করিয়া দেয়। এক কথায়, বিদ্যুৎ মানব-জীবনে আজ অপরিহার্য। মানব-সভ্যতার বিকাশে বিদ্যুতের অবদান যে অসামান্য, তাহা আজ অস্বীকার করিব কিরূপে?

উপসংহার

প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- বিদ্যুৎ-শক্তি ও মানব-সভ্যতা
- সভ্যতার বিকাশে বিদ্যুতের অবদান
- আধুনিক-সভ্যতায় বিদ্যুৎ-শক্তির দান, ক. প্রা. '৮৫

১৮.

প্রবন্ধ-সূত্র ঃ সূচনা। ইংরেজ আমলে ভারতে শিক্ষা-ব্যবস্থা। স্বাধীন ভারত ও শিক্ষার ধারা। শিক্ষা ও উন্নয়নের বৈচিত্র্য-সাধনের প্রয়োজনীয়তা : শিক্ষা-সংস্কারের ভিত্তি কি হওয়া উচিত। শিক্ষার নববিধান। পরীক্ষা-সংস্কার ও ফলাফল। উপসংহার।

স্বাধীন ভারতে শিক্ষা-সংস্কার ও পরীক্ষা-সংস্কার

'দেশের লোককে শিশুকাল হইতে মানুষ করিবার সদুপায় যদি নিজে উদ্ভাবন এবং তাহার উদ্যোগ যদি নিজে না করি তবে আমরা সর্বপ্রকারে বিনাশপ্রাপ্ত হইব, অন্নে মরিব, স্বাস্থ্যে মরিব, বুদ্ধিতে মরিব, চরিত্রে মরিব—ইহা নিশ্চয়।'
—রবীন্দ্রনাথ

শিক্ষায় এক অকালমৃত্যুর মড়ক আজ আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহার প্রতিকারের জন্য আজ আমাদের বুঝিতে হইবে যে, জাতীয় শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়ন—জাতীয় জীবনের এই দুইটি মৌল দিকের মধ্যে একটা গভীর সামঞ্জস্য প্রয়োজন। বর্তমানে ভারতের জাতীয় উন্নয়ন শুরু হইয়াছে। স্বাধীনতালাভের পর আটাশ বৎসর অতিবাহিত হইল, কিন্তু সেই উন্নয়ন-ধারা এখনও আমাদের জাতীয় জীবনের সকল দিক স্পর্শ করিতে পারে নাই। স্বাধীন ভারতে শিক্ষা-সংস্কারও সূচিত হইয়াছে। বহু কমিটি ও বহু কমিশন বসাইয়া ইংরেজ-আমলের শিক্ষা-ব্যবস্থার যে পুনর্গঠনের আয়োজন করা হইল, তাহার সহিত জাতীয় উন্নয়নের যোগ কোথায়? তাহা ছাড়া, সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে রহিয়াছে দুঃখজনক বিচ্ছেদ। এই বিচ্ছেদের ফলে ভারতে চলিয়াছে মানবিক শক্তি ও সম্ভাবনার অফুরন্ত অপচয়। তরুণ-সমাজ শিক্ষা-ব্যবস্থার এই শৃঙ্খলাহীনতায় দিশাহারা, অভিভাবকগণ বিমূঢ়। শক্তির এই বিপুল অপচয় ভারত-ভাগ্যবিধাতা আর বেশীদিন ক্ষমা করিবেন না।

সূচনা

ইংরেজ আমলে ভারতে য়ুরোপীয় ভাবধর্মী শিক্ষাধারা প্রবর্তিত হওয়ায় ভারতের সার্বজনীন শিক্ষার ধারা রুদ্ধ হইল। শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চারি দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া সেখানে শেক্সপীয়ার, শেলী, কীট্‌স্‌, বায়রনের কবিতার পঠন-পাঠন শুরু হইল, কিন্তু যে শিক্ষা জাতির অর্থনৈতিক উন্নতির বনিয়াদ রচনা করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা হইল না! 'নিজে চিন্তা করিবে, নিজে সন্ধান করিবে, নিজে কাজ করিবে, এমনতরো মানুষ তৈরী করিবার প্রণালী এক; আর পরের হুকুম মানিয়া চলিবে, পরের মতের প্রতিবাদ করিবে না, ও পরের কাজের জোগানদার হইয়া থাকিবে মাত্র, এমন মানুষ তৈরীর বিধান অন্যরূপ।' ইংরেজ এদেশে দ্বিতীয় প্রকারের মানুষ তৈরীর অপচেষ্টা করিয়াছিল। সাম্রাজ্যিক প্রয়োজনে এবং বাণিজ্যিক হিসাব-রক্ষার উদ্দেশ্যে তাহারা এদেশে চাহিয়াছিল ইংরেজি শিক্ষিত একদল সিবিলিয়ান ও করণিক সৃষ্টি করিতে। তাহাদের সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। কিন্তু ভারতবাসীর সম্মুখে যে সকল দুয়ার রুদ্ধ করিয়া কেবল একটি দুয়ার খুলিয়া রাখা হইল, তাহাতে সমগ্র জাতি একটি কলম-পেষা যন্ত্রে পরিণত হইল।

ইংরেজ আমলে ভারতে শিক্ষা-ব্যবস্থা

দুর্ভাগ্যের কথা, স্বাধীন ভারতেও সেই অবরুদ্ধ দুয়ারগুলির সব কয়টি উন্মুক্ত হয় নাই। গণ-শিক্ষার দিক হইতে ভারতের অবস্থা হতাশাব্যঞ্জক। শতকরা দশ-বারোজন মাত্র সাক্ষর। অবশ্য অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হওয়ায় এ সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু তাহাতে ভারতের লাভ হইয়াছে কতটুকু? যাঁহারা উচ্চশিক্ষা লাভ করিবার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছেন, তাঁহারা যে শিক্ষা পান, তাহাতে দেশের বৈষয়িক উন্নয়নের কোন্ প্রয়োজনই বা মেটে? ছাপ্পা কোটি জনসংখ্যার মধ্যে বৎসরে কয়েক হাজার স্নাতক লাভ করিলে কি দেশ কৃতার্থ হইবে? ডিগ্রী-ডিপ্লোমা হাতে তাহারা অবশেষে সকল দুয়ার হইতে প্রত্যাখ্যাত হইবে। কেবলমাত্র কেরানীগিরি তাহাদের কতজনের ভাগ্য-সংস্থান করিয়া দিতে পারে? কর্মসংস্থান-কেন্দ্রে তাহাদের অধিকাংশই পড়িবে বাতিলের খাতায়। তাহার ফলে সমাজের সকল স্তরে অশান্তি ও বিক্ষোভ উঠিবে দানা পাকাইয়া। আর, তখন অন্তদিকে ভারতের সার্বিক উন্নয়নের বিপুল সম্ভাবনার উপকরণ হাতে লইয়া ভারতের ভাগ্য-বিধাতা বসিয়া মুখ টিপিয়া হাসিবেন।

স্বাধীন ভারত ও শিক্ষার ধারা

আসল কথা হইল, শিক্ষার সকল দুয়ার উন্মুক্ত করিয়া দিতে হইবে এবং তাহাতে ধনী-দরিদ্র—শ্রেণী-ভেদ করিলে চলিবে না। কারণ গরীবের ছেলেও তো বড়ো ডাক্তার কিংবা বড়ো ইঞ্জিনিয়ার হইতে পারে। তাই শিক্ষার ক্ষেত্রে চাই সমানাধিকার, চাই প্রতিভার পূর্ণ সদ্ব্যবহার। সেই সঙ্গে দেশের বৈষয়িক উন্নয়নের সকল দুয়ার খুলিয়া দিতে হইবে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া দেশময় ব্যাপক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করিতে পারিলে এবং শিক্ষা-ব্যবস্থার বৈচিত্র্য সাধন করিয়া তাহার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধিয়া দিতে পারিলে শক্তির মর্মান্তিক অপচয় অবরুদ্ধ হইবে এবং জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে উন্নতির বান ডাকিবে।

শিক্ষা ও উন্নয়নের বৈচিত্র্য-সাধনের প্রয়োজনীয়তা

জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিবার উপযুক্ত আয়ুধে সজ্জিত হওয়াই আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। রবীন্দ্রনাথ তাই শান্তিনিকেতনের পাশে বিভিন্ন কারিগরী বিদ্যার কেন্দ্র শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ভাবের সঙ্গে ভাতের ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন সর্বদর্শী কবি। গান্ধীজী তাঁহার ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় যে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার আয়োজনের নির্দেশ দিয়াছিলেন, তাহাকে বাস্তবায়িত করিলে তাহা জাতির পক্ষে গৌরবজনক হইবে। আমাদের শিক্ষাকে গ্রন্থকেন্দ্রিক না করিয়া কর্মকেন্দ্রিক করিয়া তুলিতে হইবে, মুক্তিলাভ করিতে হইবে কেরানী-জীবনের ঘৃণ্য নাগপাশ হইতে।

শিক্ষা-সংস্কারের ভিত্তি কি হওয়া উচিত

ভারতে শিক্ষার নববিধানে শিক্ষার বহুমুখিতা আনয়ন করিবার জন্য এবং কলেজে-কলেজে ছাত্রদের ভিড় হ্রাস করিবার জন্য বহুমুখী বিদ্যালয়সমূহের প্রতিষ্ঠা এবং ত্রৈ-বার্ষিক ডিগ্রী কোর্স চালু করা হইয়াছিল। স্কুল-ফাইন্যাল বিদ্যালয়গুলির কিছু-সংখ্যক উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। যাহারা স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে, তাহাদের জন্য প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ-সূচী প্রবর্তিত হয়। তাহারা প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয়

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের সহিত ত্রৈ-বার্ষিক ডিগ্রী কোর্সে প্রবেশাধিকার লাভ করিতেছিল। ১৯৭৪ সালে আবার উচ্চ-মাধ্যমিক তুলিয়া দিয়া স্কুল-ফাইন্যাল চালু করা হইয়াছে। ইহাতে উত্তীর্ণ হইলে দুই বৎসর ইণ্টারমিডিয়েট পড়িতে হইবে। তাহাতে পাস করিলে ত্রৈ-বার্ষিক ডিগ্রী কোর্সে প্রবেশাধিকার লাভ করিবে। তাহা হইলে পরিবর্তন কি হইল? এবং সেই পরিবর্তনের সুফল আমরা কি পাইলাম?

শিক্ষার নববিধান

এত করিয়াও স্কুল ও কলেজগুলিতে ছাত্র-সংখ্যা হ্রাস করা যায় নাই। এখনও শিক্ষক-পিছু ছাত্র-সংখ্যার অনুপাত বিশাল। পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন এখন একটি প্রায় সার্বজনীন ব্যাপার। কিছুদিন পূর্বে ছাত্ররা পরীক্ষা-মন্দিরে বই লইয়া আসিত মগজের তলায়; এখন লইয়া আসে জামার তলায়। দুইটিই সমান অপরাধ। এই অপরাধ হইতে ছাত্রদের মুক্তি দিবার জন্য বিদ্যালয়-স্তরে নূতন পাঠ-সূচী চালু হইয়াছে; নূতন পরীক্ষা-রীতিও চালু হইবার কথা। পর্যায়ন-প্রথা [gradation] চালু না করিয়া নম্বরদান প্রথাকেই বহাল রাখা হইয়াছে। কারিগরী শিক্ষার অগ্রগতিও হতাশাজনক। শিক্ষক-সমাজের আর্থিক দুর্গতি এখনও ভয়াবহ। বলাবাহুল্য, এ পর্যন্ত শিক্ষাখাতে ব্যয়িত অর্থের ফলভোগ শিক্ষক বা ছাত্র—কাহারও ভাগ্যেই ঘটে নাই, ঘটিয়াছে কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় কতকগুলি ঠিকাদারদের ভাগ্যে। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া কমিটি-কমিশন গঠিত হইয়াছে, কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়া বিশাল-বিশাল ইমারত নির্মিত হইয়াছে। তাহা দেখাইয়া শিক্ষাখাতে প্রচুর ব্যয় করা হইতেছে বলিয়া সরকারের সোচ্চার ঘোষণা কি ভারতের দরিদ্র জনসাধারণের সঙ্গে একটা স্থূল রসিকতা মাত্র নয়? গগনচুম্বী স্কুল-ভবন নির্মিত হইয়াছে, কিন্তু ল্যাবরেটরীতে যন্ত্রপাতি নাই, উপযুক্ত শিক্ষক নাই, খেলার মাঠ নাই—একেবারে অন্তঃসারশূন্য। এইভাবে আমাদেব জাতীয় শিক্ষার অকাল-মৃত্যুর মড়ক ডাকিয়া আনা হইয়াছে। তাই আজ আমরা অন্নে মরিতেছি, স্বাস্থ্যে মরিতেছি, বুদ্ধিতে মরিতেছি, চরিত্রে মরিতেছি। এই দেশব্যাপী মড়কের হাত হইতে আমাদের শিক্ষার কি মুক্তি নাই?

পরীক্ষা-সংস্কাব ও ফলাফল

আসল কথা, বর্তমানে জাতীয় শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়ন হইয়াছে বিপরীতমুখী। ইহাদের একই খাতে প্রবাহিত করিতে পারিলে তবেই সুফল পাওয়া যাইবে। অর্থাৎ, কেবল শিক্ষা-সংস্কাবেই চলিবে না, তাহার সঙ্গে সমতা রক্ষা করিয়া ব্যাপক সুযোগ-সৃষ্টির জন্য দেশময় কর্মোদ্যোগের একটি জোয়ার আনিতে হইবে। তবে শিক্ষা-সংস্কারের পূর্ণ সফলতা লাভ করা যাইবে। শিক্ষক-সমাজের জীবনধারণের মান ও সামাজিক মর্যাদা উন্নীত করিতে হইবে এবং সর্বোপরি জাতীয় শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়নের মধ্যে স্থাপন করিতে হইবে একটি নিবিড় যোগ-বন্ধন। নচেৎ, জাতীয় অর্থ এবং শক্তির এই বিরাট অপচয় রোধ করা যাইবে না॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- আমাদের শিক্ষা-সংস্কার
- ভারতের বৈষয়িক উন্নয়ন ও শিক্ষা-সংস্কার

১৭.

প্রবন্ধ-সূত্র : সূচনা। ইংরেজি ভাষার প্রয়োজনীয়তা। ইংরেজি ভাষা-সর্বস্বতার পরিণাম। জাতীয় অপচয়। মাতৃভাষার অভিষেক। শিক্ষা ও জীবনে মাতৃভাষা। চিত্ত-মুক্তি ও মাতৃভাষার সমৃদ্ধি। মাতৃভাষার মুক্তি-আন্দোলন : বাংলাদেশ ও তামিলনাড়ু। বাংলা ভাষার মাধ্যমে পঠন-পাঠন। উপসংহার।

শিক্ষার বাহনরূপে মাতৃভাষা

মাতৃভাষার মাধ্যম ব্যতীত জাতির ক্রমমুক্তি নাই। এতকাল আমরা বিদেশী ভাষার দাসত্ব গ্রহণ করিয়াছিলাম। দেশের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মানুষ সেই ইংরেজি ভাষায় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়াছেন, বিতর্কমূলক আইনের খসড়া প্রস্তুত করিয়াছেন এবং দেশময় প্রবল হৈ-চৈ শুরু করিয়াছেন। ইংরেজি ভাষার সেই দুর্বোধ্য সাইক্লোনে দেশের অগণিত অশিক্ষিত জনসাধারণ দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে। অর্থাৎ, সেই মুক্তি-যজ্ঞে জনসাধারণের আমন্ত্রণ ছিল না। দেশের সংখ্যা-গরিষ্ঠ মানবগোষ্ঠীকে ইংরেজি ভাষার কৃত্রিম গণ্ডির বাহিরে নির্বাসিত রাখিয়া তাহারা শিক্ষায়-দীক্ষায়, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, রাজনীতি-সমাজনীতিতে একটি নূতন সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। বলা বাহুল্য, দেশের মাটির সঙ্গে, দেশের জল-হাওয়ার সঙ্গে তাহার কোন যোগ-বন্ধন ছিল না। দেশের আপামর জনসাধারণ তাহাতে অংশ গ্রহণ করিতেও পারে নাই।

সূচনা

কিন্তু একদিন আমাদের জাতীয় জীবনে ইংরেজি ভাষারও প্রয়োজন ছিল। প্রাচীন কালের অন্ধকার-অপসারণ ও মূঢ়তা-মুক্তির জন্য পাশ্চাত্য চিত্ত-সংঘাতের প্রয়োজন ছিল। বিশাল বিশ্ব হইতে নির্বাসিত হইয়া আমরা এক আলোহীন, প্রাণহীন অন্ধকূপে নিমজ্জিত হইয়াছিলাম। নানা অন্ধ কুসংস্কারে পরিপূর্ণ সেই অচলায়তনকে বিধ্বস্ত করিল য়ুরোপীয় মনের জঙ্গম শক্তি। এ কথা আজ স্বীকার করিতেই হইবে যে, ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের হাত ধরিয়া আমরা আধুনিক যুগে পদার্পণ করিয়াছি।

ইংরেজি ভাষার প্রয়োজনীয়তা

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে আমাদের চিত্ত-মুক্তি ঘটিলেও এদেশে ইংরেজি ভাষা প্রবর্তনের মূলে ছিল ভারতের মনোবিজয়ের চক্রান্ত। সেই চক্রান্ত সফল হইয়াছে। কিন্তু তাহার ফলে এ দেশে যে নব-জাগরণ আসিল, তাহা আমাদের অতিরিক্ত লাভ। কিন্তু তাই বলিয়া বিদেশী ভাষা-সর্বস্বতা কোন জাতির পক্ষেই গৌরবজনক নয়। ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে আমরা সুদূর বিশ্বকে জানিয়াছি; কিন্তু আমরা আমাদের ঘরকে, ঘরের মানুষকে কিংবা ঘরের মানুষের সুখদুঃখকে জানিতে পারি নাই।

ইংরেজি ভাষা-সর্বস্বতার পরিণাম

তাই স্কুল-কলেজে ইংরেজি ভাষায় অবগুণ্ঠিত বিদ্যা স্বভাবতঃই আমাদের মনের সহবর্তিনী হইতে পারে নাই। সেইজন্য আমরা যে পরিমাণ শিক্ষা পাইয়াছি, সে পরিমাণে বিদ্যা পাই নাই। আমাদের শিক্ষার ভোজে ঘটে তাই অপরিমেয় অপচয়।

সেই অপচয় হইল শক্তির অপচয়, সম্পদের অপচয়, এক কথায় জাতীয় অপচয়।

জাতীয় অপচয়

রবীন্দ্রনাথ তাই অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলিয়াছিলেন, 'চারিদিকের আবহাওয়া থেকে এ বিদ্যা বিচ্ছিন্ন, আমাদের ঘর আর ইস্কুলের মধ্যে ট্রাম চলে, মন চলে না।'

দীর্ঘকালের সংগ্রামের পর আজ আমরা পরাধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছি। আজ নিজের ঘরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে, সেখানে কত দুঃখ, বেদনা ও দারিদ্র্যের অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা দূর করিতে হইবে।

মাতৃভাষার অভিষেক

তাহা ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে সম্ভব হইবে না। সেখানে মাতৃভাষাকে আহ্বান করিতে হইবে। দেশব্যাপী দুঃখ-যন্ত্রণা ও দারিদ্র্যের সিংহাসনে আজ আমাদের অবহেলিত মাতৃভাষাকে সসম্মানে অভিষিক্ত করিতে হইবে। কারণ, সাতসমুদ্র তেরোনদীর পারের ভাষা দিয়া আর যাহাই হউক, মাতৃ পূজার বোধন-মন্ত্র কখনই রচিত হইতে পারে না।

'আমরা যেভাবে জীবন নির্বাহ করিব আমাদের শিক্ষা তাহার আনুপাতিক নহে, আমরা যে গৃহে আমৃত্যুকাল বাস করিব সে গৃহের উন্নত চিত্র আমাদের পাঠ্যপুস্তকে নাই, যে সমাজের মধ্যে আমাদিগকে জন্ম যাপন করিতেই হইবে, সেই সমাজের কোন উচ্চ আদর্শ আমাদের নূতন শিক্ষিত সাহিত্যের মধ্যে লাভ করি না, আমাদের পিতামাতা—আমাদের সুহৃৎ-বন্ধু—আমাদের ভ্রাতাভগ্নীকে তাহার মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখি না, আমাদের দৈনিক জীবনের কার্যকলাপ তাহার বর্ণনার মধ্যে কোনো স্থান পায় না, আমাদের আকাশ এবং পৃথিবী আমাদের নির্মল প্রভাত এবং সুন্দর সন্ধ্যা—আমাদের পরিপূর্ণ শস্যক্ষেত্র এবং দেশলক্ষ্মী স্রোতস্বিনীর কোনো সংগীত তাহার মধ্যে ধ্বনিত হয় না, তখন বুঝিতে পারি আমাদের শিক্ষার সহিত আমাদের জীবনের তেমন নিবিড় মিলন হইবার কোনো স্বাভাবিক সম্ভাবনা নাই। উভয়ের মাঝখানে একটা ব্যবধান থাকিবেই থাকিবে, কিন্তু এ মিলন কে সাধন করিতে পারে? বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য।'

শিক্ষা ও জীবনে মাতৃভাষা

যে ভাষায় শিশুর মুখে বুলি ফোটে, সে ভাষা তাহার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে, তাহার শোণিত-ধারার সঙ্গে মিশিয়া থাকে। মাতৃভাষায় ভাবপ্রকাশ তাহার জন্মগত অধিকার। সেই ভাষাতেই তাহার চিত্ত মুক্তি ঘটা সম্ভব। সোভিয়েট রাশিয়া যতদিন তাহার মাতৃভাষাকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে নাই, ততদিন সে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আশানুরূপ অগ্রসর হইতে পারে নাই। তাহার আজ যে বিজ্ঞান-সাধনার চরম সমুন্নতি, তাহার মূলে রহিয়াছে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার আয়োজন। বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মতে, আমাদের পার্থিব জীবনের সকল ভাব-চিন্তা, আশা-আকাঙ্ক্ষার সঠিক রূপায়ণ বাংলা ভাষার মাধ্যমে সম্ভব। বিশেষতঃ, যে ভাষায় মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যের দিক্‌পালগণ তাঁহাদের প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ উপচার দিয়া নৈবেদ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা কখনই ব্যর্থ হইতে পারে না।

চিত্ত-মুক্ত ও মাতৃভাষার সম্বন্ধ

পূর্ব-বাংলায় মাতৃভাষার জন্মগত অধিকারকে খর্ব করিবার জন্য যখন চক্রান্ত হইয়াছিল, তখন কেবলমাত্র উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাবকে কেন্দ্র করিয়া সেখানকার জনগণের ক্রোধ প্রচণ্ড বিক্ষোভের আকারে ফাটিয়া পড়িল : 'বাংলা ভাষার কণ্ঠ রোধ করা চলিবে না।' তাহারা বুকের রুধির দিয়া মুখের ভাষাকে অভিষিক্ত করিল। বুকের রক্তের মূল্যে তাহারা রক্ষা করিয়াছে মাতৃভাষার পবিত্র অধিকার। ভারত-রাষ্ট্রেও মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় অগ্রণী হইয়াছে তামিলনাড়ু রাজ্য। অন্যদিকে সীমান্তের অপর পারে বাংলাদেশ বাংলা ভাষায় টেলিগ্রাম প্রেরণ, এমন-কি মুদ্র-লিখন যন্ত্র নির্মাণ সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। আমরা এখনও তাহা পারি নাই। সেদিক হইতে পশ্চিমবঙ্গ যে পশ্চাদ্বর্তী, তাহা অনস্বীকার্য।

মাতৃভাষার মুক্তি-আন্দোলন : বাংলাদেশ ও তামিলনাড়ু

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ, স্যার আশুতোষ প্রমুখ মনীষীগণের চেষ্টায় বহুদিন হইল উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার পঠন-পাঠন শুরু হইয়াছে। আবার, বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরে উচ্চশিক্ষায়ও বাংলা ভাষার মাধ্যম সম্প্রতি স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। ইহা আশার কথা। কিন্তু এতদিন বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরে বাংলা ভাষার মাধ্যম যে স্বীকৃতি লাভ করে নাই, তাহার মূলে ছিল বিভিন্ন বিষয়ে বাংলা ভাষায় উপযুক্ত গ্রন্থের অভাব। সম্প্রতি বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় গ্রন্থ-রচনার জন্য উপযুক্ত গ্রন্থকারদের সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ঘোষিত হইয়াছে। কাজেই, যোগ্যতা-সম্পন্ন ব্যক্তিদের এ বিষয়ে উদ্যোগী হইতে হইবে। সেই সঙ্গে উদ্যোগী হইতে হইবে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে।

বাংলা ভাষার মাধ্যমে পঠন-পাঠন

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার সরকারী কার্যে বঙ্গভাষা ব্যবহারের একটি বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু সরকারী কার্যে বাংলা ভাষার প্রয়োগ-সাফল্য এতদিনে যতখানি অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল, সরকারী আমলাদের চক্রান্তে তাহা সম্ভব হয় নাই। তাহারা বাংলা ভাষাকে দূরে সরাইয়া রাখিয়া ইংরেজিকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বহাল রাখিতে চায় এবং সরকারী কার্যে ইংরেজি শিক্ষিতদের একাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিতে চায়। তথাপি আমরা প্রার্থনা করি, মাতৃভাষার মাধ্যমে আমাদের জাতীয় শিক্ষা ও জাতীয় জীবন—এই দুইয়ের মধ্যে এক নিবিড় যোগসূত্র স্থাপিত হউক। এইবার 'মাতৃভাষার অপবাদ দূর হোক, যুগশিক্ষার উদ্বেল ধারা বাঙালীচিত্তের শুষ্ক নদীর রিক্ত পথে বান ডাকিয়ে বয়ে যাক্, দুই কূল জাগুক পূর্ণ চেতনায়, ঘাটে ঘাটে উঠুক আনন্দ-ধ্বনি ॥'

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান
- 'বিনা স্বদেশীভাষা মিটে কি আশা ?'
- 'মোদের গরব মোদের আশা আ-মরি বাংলা ভাষা'
- বুকের রুধির মুখের ভাষা

প্রবন্ধ-সূত্র ঃ সূচনা ॥ অতীত ভারতে বৃত্তি-শিক্ষা ॥ ভারতের বর্ণাশ্রম সমাজ ও বৃত্তি-শিক্ষা ॥ ইংরেজ-আমলে কারিগরী-শিক্ষার পরিণতি ॥ স্বাধীন ভারতে বৃত্তি-শিক্ষা ও বৃত্তি-নির্বাচন ॥ কারিগরী-শিক্ষার উপকারিতা ॥ অপকারিতা ॥ উপসংহার ॥

বৃত্তি-শিক্ষা ও বৃত্তি-নির্বাচন

সূচনা

আজ ভারতের দিকে দিকে দারিদ্র্যের হাহাকার। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির যাহা কিছু সম্বল ছিল, ইংরেজ সমস্ত কিছু ধ্বংস করিয়া তাহাকে একটি দীনতার বিস্তীর্ণ ধ্বংসস্তূপরূপে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। সে ভারতের কৃষি ও শিল্প-সম্পদকে ধ্বংস করিয়া তাহার চরম সর্বনাশ সাধন করিয়া গিয়াছে। ভারতের সেই উন্নত কারিগরী শিক্ষা, যাহা ভারতের প্রতিটি পরিবারের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিত, তাহা আজ কোথায়? ভারতের সেই প্রখ্যাত শিল্পী-কারিগরেরা, যাহারা তাহাদের কুশলী কলা-নৈপুণ্যে বিশ্বের মনোরঞ্জন করিত, তাহারাই বা কোথায় গেল? ভারতের এই সর্বব্যাপী দারিদ্র্যের পিছনে রহিয়াছে তাহার কারিগরী-শিক্ষার অভাব, তাহার কারিগরী-শিক্ষার অবলুপ্তি।

অতীত ভারতে বৃত্তি-শিক্ষা

অথচ কারিগরী-শিক্ষার দ্বারা লোকে একদা ঘরে বসিয়াও তাহার জীবিকা-নির্বাহের ব্যবস্থা করিতে পারিত। তাঁতী তাঁত বুনিয়া, ডোম ঝুড়ি-চুবড়ি-ধামা-কুলো ইত্যাদি তৈয়ারী করিয়া, মৃৎশিল্পী নানাপ্রকারের মাটির পুতুল তৈয়ারী করিয়া জীবিকা অর্জন করিত। তাহাদের হাতের তৈয়ারী জিনিসপত্রে সূক্ষ্ম রুচিবোধ ও গভীর কারিগরী জ্ঞানের পরিচয় থাকিত মুদ্রিত। স্বদেশে-বিদেশে সেই সমস্ত দ্রব্য-সামগ্রী বিক্রয় হইত উচ্চমূল্যে এবং অর্থনৈতিক শক্ত বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত হইত প্রতিটি পরিবার। তাহার ফলে সমগ্র সমাজে একটা সচ্ছলতার হাওয়া বহিত। ঘরে আসিত সুখ, আসিত শান্তি। প্রাচীন ভারতের স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতির মূল চাবিকাঠি ছিল ইহাই। আজ আমরা ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে তাহা হারাইয়া জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন একটি শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু করিয়া জাতিকে কেবল কেরানীগিরির দিকে পথ-নির্দেশ করিতেছি। এক দিগন্তে রহিল শিক্ষা, অন্য দিগন্তে দারিদ্র্য-অভিশপ্ত জীবন; ইহাতে জাতির মুক্তি কোথায়?

ভারতের বর্ণাশ্রম সমাজ ও বৃত্তি-শিক্ষা

প্রাচীন ভারত ছিল বর্ণাশ্রম ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্ব-স্ব বৃত্তি অনুযায়ী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিটি বর্ণের উদ্ভব হইয়াছিল। পরিবারের বৃত্তি ছিল বংশানুক্রমিক। বংশ বংশ ধরিয়া একই বৃত্তির অনুশীলনে প্রত্যেক পরিবারই হইয়া উঠিত এক-একটি শ্রেষ্ঠ বৃত্তিমূলক শিক্ষায়তন। পিতা পুত্রকে তাঁহার নিজস্ব কারিগরী বিদ্যা ও অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞান দান করিয়া যাইতেন। এইভাবে যুগাযুগান্তর ধরিয়া অনুশীলিত ও কর্ষিত হইবার ফলে প্রাচীন ভারত এক বিস্ময়কর কারিগরী উৎকর্ষ ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল।

তারপর আসিল ইংরেজ। নানা কলকারখানাজাত পণ্যসামগ্রী লইয়া ব্রিটিশ বাণিজ্য-জাহাজ আমাদের উপকূলে আসিয়া ভিড়িল। ইতিহাস বলে, সে আমাদের পণ্যসামগ্রীর কারিগরী উৎকর্ষের আকর্ষণে এদেশে বাণিজ্য করিতে ছুটিয়া আসিয়াছিল। শক্তিমান্ ইংরেজ আমাদের সেই সনাতন কারিগরী শিক্ষা-নিকেতনের উপর হানিল প্রথম আঘাত। তাহাদের শিল্পজাত পণ্যের সহিত প্রতিযোগিতায় আমাদের কারিগরদের হাতের তৈয়ারী শিল্পদ্রব্য পরাজিত হইল। বিলাতী পণ্যের চাক্‌চিক্য আমাদের মনোহরণ করিল এবং আমরা আমাদের ঘরের লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলিয়া বিদেশী পণ্যের প্রতি আকৃষ্ট হইলাম। যে কারিগরী-শিক্ষার সাফল্যে আমরা অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিয়াছিলাম, তাহা হারাইয়া বিদেশী-প্রবর্তিত ডিগ্রীর মোহে আকৃষ্ট হইয়া স্বাধীন জীবিকার পরিবর্তে পরাধীন কেরানীগিরির জন্য উমেদারী করিতে লাগিলাম।

ইংরেজ-আমলে কারিগরী-শিক্ষার পরিণতি

তারপর পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী হৃতসর্বস্ব ভারতীয়দের একদিন জ্ঞান-চক্ষুর উন্মেষ ঘটিল। সেদিন তাহারা 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' মাথায় তুলিয়া লইল। ম্যাঞ্চেস্টার-বাকিংহাম পরিত্যক্ত হইল। ঘরের ছেলে বহুদিন পরে ঘরে ফিরিয়া আসিল। ইতিমধ্যে দেশ স্বাধীন হইয়াছে। স্বাধীন ভারতে বৃত্তি-শিক্ষার গুরুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। শিক্ষার নব-বিধানে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রাথমিক পাঠ-সূচীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। শৈশব-শিক্ষার প্রারম্ভ হইতে যাহাতে শিশুরা কারিগরী-শিক্ষায় দক্ষতা অর্জন করিতে পারে, তাহার জন্য বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিতে ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষকেরা তাহাদের এ বিষয়ে শিক্ষাদান করেন। তাহা ছাড়া, বহু কারিগরী বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে সব ছাত্র উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে অসমর্থ, অথচ কারিগরী-শিক্ষায় উৎসাহী, তাহারা কারিগরী বিদ্যালয়ে উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়া কর্ম-জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে। ইহার দ্বারা ভারতের বেকার-সমস্যার কিছুটা সমাধান হইতেছে। কিন্তু এই জাতীয় বিদ্যালয়ের সংখ্যা দেশে আরও বর্ধিত হওয়া উচিত।

স্বাধীন ভারতে বৃত্তি-শিক্ষা ও বৃত্তি-নির্বাচন

কারিগরী-শিক্ষা কেবল জাতির অর্থনৈতিক বনিয়াদই রচনা করে না, তাহাকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিও দান করে। ইহার দ্বারা সমাজের প্রতিটি পরিবার অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিতে পারে। জাতির সুখ ও সমৃদ্ধি রচনা করিয়া কারিগরী-শিক্ষা দেশের সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গঠন করে। ইহা বেকার-সমস্যার তীব্রতা হ্রাস করিয়া নানা অশান্তির সম্ভাবনাকে বিলুপ্ত করে। কারিগরী-শিক্ষা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হইলে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত ভিড় হ্রাস পাইবে। এক কথায়, কারিগরী-শিক্ষা ভারতের ন্যায় দরিদ্র দেশের হাতে তুলিয়া দিবে দারিদ্র্য-বিজয়ের সুনিশ্চিত হাতিয়ার। আজ দেশের তরুণ-সমাজ যে অন্তহীন নৈরাশ্য ও শূন্যতাবোধের মধ্যে ভবিষ্যৎ-জীবনের কোন সুনিশ্চিত প্রতিশ্রুতি না পাইয়া দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে, বৃত্তি-শিক্ষার ব্যাপক আয়োজনের মধ্যে তাহারা তাহাদের সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎকে খুঁজিয়া পাইবে। ধীরে ধীরে তাহাদের মনে নৈরাশ্য ও

কারিগরী-শিক্ষার উপকারিতা

শূন্যতাবোধ কাটিয়া গিয়া পূর্ণ দায়িত্ববোধ বিকশিত হইয়া উঠিবে। ফলে, দেশব্যাপী আন্দোলনের কিছুটা উপশম ঘটিবে। তাহা ছাড়া, বৃত্তি-সাধনার মধ্য দিয়া রতের অবহেলিত কুটির-শিল্প পুনর্জীবন লাভ করিবে এবং জাতির সম্মুখে অর্থনৈতিক সচ্ছলতার এক নূতন দিগন্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।

কারিগরী-শিক্ষার অপকারিতাও আছে। ইহা মানুষকে বড় বেশী বাস্তবমুখী করিয়া তোলে। রূঢ় বাস্তবের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে মানুষ সূক্ষ্ম ও উচ্চ চিন্তা হইতে বিরত হইয়া পড়ে এবং ধীরে ধীরে বিরক্তি ও ক্লান্তি আসিয়া তাহাদের হৃদয় ও মন অধিকার করিয়া বসে। শিল্পী-কারিগরের জীবন ক্রমে ক্রমে যান্ত্রিক ও গতানুগতিক হইয়া পড়ে।—এই অপপ্রচারের দ্বারা আমাদের বিদেশী প্রভুরা এতদিন এদেশে কারিগরী-শিক্ষার প্রবর্তনকে বিলম্বিত করিয়াছে। আমরাও তাহাদের অভিসন্ধিপূর্ণ অপপ্রচারে ভুলিয়া প্রতারিত হইয়াছি। কিন্তু বোঝা উচিত ছিল যে, শূন্য উদরে উচ্চ চিন্তা বেশীদিন চলে না। দলে দলে শিক্ষিত বেকার দিয়া রাস্তার চৌমোহানায় কী উচ্চ চিন্তার বিকাশ হয়, জানি না এবং তাহার গতানুগতিকতায় যদি ক্লান্তি না আসে, তবে কারিগরী-শিক্ষার দ্বারাও ক্লান্তি আসিবে না। অবশ্য, বৃত্তিমাত্রেরই অনুশীলনে আছে যান্ত্রিকতা, আছে গতানুগতিকতা। যান্ত্রিকতা ও গতানুগতিকতার ভয়ে যদি তরুণেরা বৃত্তি-চর্চা হইতে বিরত হয়, আপন মেধাশক্তির সামর্থ্যকে উপেক্ষা করিয়া যদি উচ্চশিক্ষার জন্য কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিড় করে, তবে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আর তিলধারণের স্থান থাকিবে না, পরীক্ষায় অকৃতকার্যের সংখ্যা হইবে ক্রমবর্ধমান, শিক্ষার মানও অবনমিত হইয়া পড়িবে এবং দেশে বেকার-সমস্যার তীব্রতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। পরিণামে সমগ্র দেশে দেখা দিবে চরম অর্থ-সংকট। অলস কর্ম-বিমুখদের নিকট যাহা গতানুগতিকতা, তাহাই উৎসাহী ও উদ্যোগীদের সুদক্ষ বিশেষজ্ঞ হইয়া উঠিতে সাহায্য করিবে এবং নূতনত্বের দ্বারা প্রতিদিন পুরাতনের অভিষেক হইবে।

অপকারিতা

একথা আজ স্বীকার করিতেই হইবে যে, ডিগ্রির মোহ বা চাকুরির মোহ জাতির কর্মদক্ষতাকে, তাহার কলা-নৈপুণ্যকে পঙ্গু করিয়া ফেলে। একটা বিশাল জাতির মুক্তি কেবল পরাধীন চাকুরিগিরিতে সম্ভব নয়। তাই আজ কারিগরী-শিক্ষা বা বৃত্তিমূলক শিক্ষার রুদ্ধ দুয়ারগুলি একে একে উন্মুক্ত করিয়া দিতে হইবে। কারিগরী-শিক্ষা জাতীয় জীবনের ভিত্তি-প্রস্তর রচনা করিয়া দিবে এবং তাহার ফলে দূর হইবে দীর্ঘকালের পরাধীনতার বেদনা এবং বহু শতাব্দীর দৈন্য ও দারিদ্র্যের অভিশাপ। 'ভারত আবার জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।'

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- বৃত্তি-শিক্ষা
- জীবিকামূলক শিক্ষা
- বৃত্তিমূলক শিক্ষা
- কারিগরী-শিক্ষা

প্রবন্ধ-সূত্র : সূচনা। ফটোগ্রাফি ও ম্যাজিক লণ্ঠন। চলচ্চিত্রের আবিষ্কার : এডিসন ও ইষ্ট্ম্যানের অবদান। শব্দ-ফটোগ্রাফি। চলচ্চিত্রের দ্বৈত দায়িত্ব। বিদ্যালয়ে চলচ্চিত্র : য়ুরোপে, আমেরিকায় ও ভারতে। ভারতীয় চলচ্চিত্রের রুচি-বিকৃতি ও তাহার পরিণাম। উপসংহার।

শিক্ষা-বিস্তারে ও সমাজ-জীবনে চলচ্চিত্র

উ. মা. '৭২

শিক্ষা-সম্প্রসারণ ও আনন্দ-পরিবেশন—এই দ্বৈত দায়িত্ব যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্করণের মাধ্যমে সংসাধিত হইতেছে, তাহার নাম 'চলচ্চিত্র'। প্রমোদমূলক শিল্প হিসাবে ইহার জনপ্রিয়তা ক্রমসম্প্রসারণশীল। চলচ্চিত্র-শিল্প আজ সমাজের সর্বস্তরের উপর যে অভাবনীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া চলিয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। ইহার সর্বব্যাপী প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া এবং মায়া-মদির আকর্ষণের দুর্বারতার কাছে আমাদের চিরাচরিত রঙ্গমঞ্চের আবেদন-জলুসও আজ নিষ্প্রভ। ইহার আবেদনের মনোহারিত্ব ও সার্বজনীনতা ইহাকে শিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যমের মর্যাদা দান করিয়াছে। বিশেষতঃ, লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে ইহার সাফল্যের সম্ভাবনা অসামান্য।

সূচনা

আজ চলচ্চিত্র আমাদের কাছে আর বিস্ময়ের বস্তু নয়। কিন্তু একদিন এমন ছিল, যেদিন ছবির মানুষ হাত-পা-মুখ নাড়িয়া রক্ত-মাংসের জীবন্ত নরনারীর মতো কথা বলিতে পারে, গান গাহিতে পারে—ইহা ছিল এক পরম বিস্ময়ের ব্যাপার। চলচ্চিত্র আবিষ্করণের পূর্বে আবিষ্কৃত হইয়াছিল ফটোগ্রাফি। আর ছিল ম্যাজিক লণ্ঠন। পর্দায় প্রতিফলিত নিশ্চল ছবির সঙ্গে চলিত কথকতার মতো নীতিগর্ভ বক্তৃতা। তাহাও সেদিন লোকশিক্ষা ও লোক-রঞ্জনের দ্বৈত ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল।

ফটোগ্রাফি ও ম্যাজিক লণ্ঠন

মানবের চক্ষু-তারকায় কিভাবে ছবি প্রতিফলিত হয়, সে সম্বন্ধে গবেষণায় রত পিটার মার্ক রজেট্ নামক জনৈক বিজ্ঞানী আবিষ্কার করিলেন যে, মানুষের চক্ষু-তারকায় বস্তুর যে প্রতিবিম্ব পড়ে, বস্তুটি চক্ষুর সম্মুখ হইতে অপসারিত হইবার পরেও কিছুক্ষণ পর্যন্ত ঐ প্রতিবিম্ব স্থায়ী হয়। এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিল চলচ্চিত্র শিল্প। চলচ্চিত্রে যে চিত্র প্রতিফলিত ও প্রদর্শিত হয়, তাহা ফিল্মে দ্রুত-গৃহীত কয়েকটি ছবির সমষ্টি মাত্র। ক্রমান্বয়ে গৃহীত গতিশীল ভঙ্গীর প্রতিটি চিত্র ক্রমান্বয়ে সাজানো থাকে—যন্ত্রের সাহায্যে দ্রুত আবর্তনের ফলে ছবির পর ছবি আসিয়া পর্দায় পড়ে এবং সেই চলমান গতিটি তখন আমাদের মায়া-বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। প্রতিটি ছবি যদি কিছুক্ষণ অন্তর পর্দায় প্রতিফলিত করা যায়, তখন আর ছবির গতি থাকে না। এই শিল্পের পূর্ণাঙ্গ রূপ দিলেন আমেরিকার শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী এডিসন। তবে এই কার্যে ফটোফিল্ম-আবিষ্কর্তা ইস্ট্ম্যান তাঁহাকে প্রচুর সাহায্য করিয়াছেন। এডিসন আমেরিকায় তাঁহার ল্যাবরেটরিতে সর্বপ্রথম এই চলন্ত ছবি দেখান ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে।

চলচ্চিত্রের আবিষ্কার : এডিসন ও ইষ্ট্ম্যানের অবদান

তারপর শিল্পী ও বিজ্ঞানীরা কাজে লাগিয়া গেলেন। সেলুলয়েড ফিতার মুদ্রিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্র-সম্বলিত রীল্ চিত্রক্ষেপণ-যন্ত্রের [Projector] দ্বারা তীব্র আলোকের সাহায্যে পর্দার উপর বড় করিয়া প্রতিফলিত করিয়া ছবি দেখানো হইতে লাগিল। চলন্ত ছবি দেখিতে বেশ ভিড় জমে দেখিয়া ব্যবসায়ীরাও তাহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিল—ক্রমশঃ সৃষ্টি হইল সবাক্ চলচ্চিত্র। ছবির ফটোগ্রাফের পাশে পাশে সেলুলয়েডের ফিল্মের উপর Sound Photograph বা শব্দেরও ফটো উঠিতে লাগিল। তখন আর কি! গল্প, উপন্যাস, নাটক, অভিনয় ইত্যাদি নিত্য-নূতন আনন্দের আয়োজনে যোগ দিল লক্ষ-লক্ষ লোক।

শব্দ-ফটোগ্রাফি

চলচ্চিত্রের আনন্দ-বিতরণী ও চিত্ত-বিনোদিনী ক্ষমতা অসামান্য। তাই চলচ্চিত্র তাহার ভূমিষ্ঠ-লগ্ন হইতেই লোক-রঞ্জনী ভূমিকায় নিয়োজিত রহিয়াছে। আনন্দাভিলাষী কর্মক্লান্ত মানুষের দর্শনেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করিয়া নূতন কর্মোদ্যম ও কর্ম-প্রেরণা সঞ্চারে তাহার জুড়ি নাই। কিন্তু সেই ভূমিকাতেই চলচ্চিত্রের সকল দায়িত্ব অবসিত হয় নাই। সকল শিল্পের কাছে যেমন সমাজের একটা দাবি আছে, চলচ্চিত্র-শিল্পের কাছেও তেমনি আছে সমাজের মহত্তর দাবি। তাহা হইল চলচ্চিত্রের দ্বিতীয় ভূমিকা—লোকশিক্ষা। ছায়াচিত্র আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষাদানে অদ্বিতীয়। বিশেষতঃ, ভারতের মতো দেশে, যেখানে নিরক্ষরের সংখ্যা সামগ্রিক জন-সংখ্যার সত্তর-শতাংশ, সেখানে চলচ্চিত্রের ভূমিকা অত্যন্ত সম্ভাবনাপূর্ণ। শিক্ষাকে মানুষের দৃষ্টিশক্তির সহিত তুলনা করা হয়। শিক্ষাহীন মানুষ অন্ধ। কিন্তু নিরক্ষর মানুষ জ্ঞানদৃষ্টিহীন হইলেও মানবিক-দৃষ্টি-সম্পন্ন। সেই দৃষ্টিতে অক্ষর নিষ্ফল হইতে পারে, কিন্তু চিত্র নিষ্ফল হয় না। এইখানেই চিত্রের সার্বজনীনতা। চলচ্চিত্র আবার চলমান জীবনের শিল্পিত বিবৃতি। সকল মানুষের দৃষ্টিতেই রহিয়াছে তাহার সার্বজনীন আবেদন। ভারতের উচিত ইহার পূর্ণতম সুযোগ গ্রহণ করিয়া লোক-শিক্ষার জনপথ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া।

চলচ্চিত্রের দ্বৈত দায়িত্ব

বিদ্যায়তনগুলিতে চলচ্চিত্র-ব্যবহারের সাফল্য বিস্ময়কর। য়ুরোপ ও মার্কিন দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে সাফল্যের সহিত চলচ্চিত্র ব্যবহৃত হয়। জার্মানীর বিদ্যালয়গুলিতে চলচ্চিত্রের ব্যবহার সর্বাধিক। সোভিয়েট রাশিয়াও এ-বিষয়ে যথেষ্ট অগ্রসর। ইংলণ্ডের বিদ্যালয়গুলিতে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে ভূগোল, ইতিহাস, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, জীব-বিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে অত্যন্ত সরল ও সহজভাবে শিক্ষা দান করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা-কার্যে, বিশেষতঃ বিজ্ঞানচর্চায় চলচ্চিত্রের ভূমিকা অনবদ্য। ইংলণ্ডের বৃত্তিমূলক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেও চলচ্চিত্রের ব্যবহার বহুল। কিন্তু ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ একান্তভাবে নৈরাশ্যজনক। আমাদের দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে চলচ্চিত্রকে প্রয়োগ করা হয় নাই। চলচ্চিত্র আমাদের দেশে কেবল বিলাসের সামগ্রী, জাতি-গঠনে ও চিত্তের উদ্বোধনে ইহার যে ভূমিকা আছে, তাহা রাষ্ট্র কর্তৃক পুরোপুরি উপেক্ষিত। কেবল বিদ্যায়তনগুলিতেই নয়, সমগ্র সমাজের শিক্ষার দায়িত্ব বহনে চলচ্চিত্রের তুলনা নাই। যাহারা নিরক্ষর, তাহাদের

বিদ্যালয়ে চলচ্চিত্র : য়ুরোপে, আমেরিকায় ও ভারতে

কাছে সংবাদপত্র মূল্যহীন ; কিন্তু চলচ্চিত্র সেই হতভাগ্যদের অজ্ঞানতার অন্ধকার হইতে জ্ঞানের আলোতে লইয়া আসিতে পারে। পৃথিবীর নানা বৈচিত্র্যময় রূপ, দেশ-বিদেশের মানুষের জীবন-যাত্রা-পদ্ধতি, ইতিহাস-বিশ্রুত দ্রষ্টব্য স্থান ইত্যাদি আমরা ইহার সাহায্যে প্রত্যক্ষ করিয়া আমাদের জ্ঞান-তৃষ্ণা প্রশমিত করিতে পারি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতে নির্মিত চলচ্চিত্রগুলির লোক-রঞ্জনী ভূমিকা যাহাই থাকুক, শিক্ষামূলক ভূমিকা নগণ্য। ভারত সরকারের ফিল্ম্ ডিভিশন প্রযোজিত তথ্যচিত্রগুলির প্রচারমূলক ভূমিকা যতখানি, শিক্ষামূলক ভূমিকা ততখানি নয়।

ভারতীয় চলচ্চিত্রের শিক্ষামূলক ভূমিকা তুচ্ছ হইলেও তাহার কুশিক্ষা ও কুরুচি সৃষ্টির ভূমিকা অসামান্য। সেই দিক দিয়া ফিল্ম্ সেন্সর বোর্ডের দায়িত্ব অসীম হইলেও কুরুচিপূর্ণ চলচ্চিত্রের সৃষ্টির ধারা অবারিত। ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রযোজক-পরিচালকদের নির্লজ্জ অর্থ-লিপ্সার কাছে সমাজের রুচিবোধ ও নৈতিক চরিত্র আজ বলি দেওয়া হইয়াছে। ভারতীয় চলচ্চিত্রে নাই কোন সুস্থ সবল জীবনাদর্শের বলিষ্ঠ প্রতিফলন, নাই কোন মহৎ হৃদয়-বৃত্তির রূপায়ণ, নাই উদার চরিত্র-মহিমা, নাই বাস্তব জীবনের বিশ্বস্ত প্রতিচ্ছবি ; কোন উচ্চতর শিল্প-সুষমার উপস্থাপনাও দুর্লভ। আছে কেবল অসুস্থ মনোবিকার, দেহ-কামনার উন্মত্ত উল্লাস, যৌন-বিলাসের নিরাবৃত প্রকাশ। ইহাতে প্রযোজক-পরিচালকদের অর্থাগমের পথ সুগম হইয়াছে বটে, কিন্তু জাতির সর্বনাশ সাধিত হইতেছে।

ভারতীয় চলচ্চিত্রের রুচি-বিকৃতি ও তাহার পরিণাম

ভারতীয় চলচ্চিত্র আজ বিশ্ব-বিজয় সমাপ্ত করিয়াছে। বাঙালী চলচ্চিত্র-পরিচালক সত্যজিৎ রায়ই সেই সাফল্যের পথিকৃৎ। কিন্তু একদিকে যেমন ভারতীয় চলচ্চিত্রের গৌরব সাত-সমুদ্র তেরো নদীর পারকে স্পর্শ করিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি ভারতীয় চলচ্চিত্রের ব্যর্থতা প্রকটিত হইয়া পড়িয়াছে। ভারতীয় চলচ্চিত্রকে রুচি-বিকারের রাহু গ্রাস করিয়াছে। সর্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয়, ভারতে চলচ্চিত্রের উপযুক্ত শ্রেণী-বিন্যাস নাই। সোভিয়েট রাশিয়া, ইংলণ্ড প্রভৃতি রাষ্ট্রে কারখানার শ্রমিক-সমাজ এবং বিদ্যালয়ের ছাত্র-সমাজের জন্য পৃথক্ পৃথক্ চলচ্চিত্রের ব্যবস্থা রহিয়াছে। কিন্তু ভারতে সেরূপ কোন ব্যবস্থাই নাই। যে চিত্র কারখানার শ্রমিক-সাধারণ দেখিয়া চিত্ত-বিনোদন করে, সেই চিত্র দেখিবার জন্য দুগ্ধপোষ্য বালকেরাও দলে দলে ভিড় করে। যে অশ্লীলতা কারখানার শ্রমিকদের মনোরঞ্জন করে, তাহা যে অল্পবয়স্ক বালকদের চারিত্রিক সর্বনাশ সাধন করে, তাহা এই দুর্ভাগা দেশে কেহ বুঝিতে চায় না। তাই দেখা যায়, 'কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য' নির্মিত ছবি দেখিবার জন্য অপ্রাপ্তবয়স্কদের ভিড় নিয়ন্ত্রণে পুলিশবাহিনীকে আহ্বান করিতে হয়। ইহাতে চলচ্চিত্র-নির্মাতা, সরকার, শিক্ষক, ছাত্র ও অভিভাবক—কাহারও লজ্জায় মাথা কাটা যায় না। 'সত্য সেলুকাস্, কি বিচিত্র এই দেশ !!'

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- শিক্ষা সম্প্রসারণে চলচ্চিত্র, উ. মা. '৬২
- ছায়াচিত্র ও সমাজ-জীবনে তাহার প্রভাব
- ছায়াছবির সুফল ও কুফল

•২২•

প্রবন্ধ-সূত্র ঃ সূচনা। ভারতে নারী-শিক্ষা ও নারী-স্বাধীনতা : বৈদিকযুগে ও বৌদ্ধযুগে। মধ্যযুগে ভারতীয় নারী। উনবিংশ শতাব্দীতে নারী-মুক্তির আন্দোলন। স্বাধীন ভারতে নারী-শিক্ষা ও নারী-প্রগতি। নারী-প্রগতির মূলসূত্র। উপসংহার।

আন্তর্জাতিক নারী-বর্ষ

"নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার ?"
—রবীন্দ্রনাথ

১৯৭৫ সাল। আন্তর্জাতিক নারী-বর্ষ। আজ নবযুগের নবীন প্রভাতে দিকে দিকে নারী-প্রগতির জয়ধ্বনি বিঘোষিত হইতেছে। নারী পূর্বে ছিল পুরুষের ভাগ্যের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। নারীর কোন স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকৃত ছিল না। নারীর পরিচয় ছিল কখনও কন্যারূপে, কখনও ভগ্নীরূপে, কখনও পত্নীরূপে, কখনও মাতারূপে। সর্বত্রই ছিল তাহার নিঃসহায় গলগ্রহতার প্রকটিত রূপ। সুখের বিষয়, নারী আজ আর সেই বিগত শতাব্দীর অন্ধকারাচ্ছন্ন অন্তঃপুরে মৌন ম্লান মুখে বসিয়া নাই। সে সেই আলোহীন, প্রাণহীন দুর্ভেদ্য অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া আজ আলোকিত জগতের উদার প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পৃথিবীর প্রগতি ধারার সহিত সমান তালে নারীও চলিয়াছে দ্রুত পদবিক্ষেপে। প্রাগাধুনিক কালে নারী ছিল অন্তরালবর্তিনী, অসূর্যম্পশ্যা। যে দুর্জয় চালক-শক্তি তাহাকে পাষাণ-পুরীর অন্ধকার হইতে মুক্ত করিয়া আধুনিক জগতের আলোকিত প্রাঙ্গণে দাঁড় করাইয়াছে, তাহা হইল আধুনিক শিক্ষা। সেই শক্তিবলে নারী আধুনিক যুগে লাভ করিয়াছে আপন ভাগ্য জয় করিবার দুর্লভ অধিকার।

সূচনা

আজ যে বাহিরের জগতে নারী-স্বাধীনতার উজ্জ্বল আলো ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সেখানে যুগ-যুগান্তরের অবগুণ্ঠনবতী ভারতীয় নারীরাও উপস্থিত। প্রাচীন ভারতে বৈদিকযুগে নারী-স্বাধীনতা স্বীকৃত ছিল সমাজে। নারী-শিক্ষারও ছিল অবাধ অধিকার। ব্রহ্মবাদিনী, লোপামুদ্রা, বিশ্ববারা, গার্গী, মৈত্রেয়ী, অরুন্ধতী প্রমুখ মহীয়সী নারীদের নাম ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। নারী সেদিন পুরুষের শুধু সহধর্মিণীই ছিলেন না, সহকর্মিণীও ছিলেন। এমন-কি, বেদের আলোকিত বিদ্যায় ছিল তাঁহাদের সমান অধিকার। উপবীত-ধারণে, বৈদিক মন্ত্র-রচনায় তাঁহারা স্মরণীয়া হইয়া আছেন। বৌদ্ধযুগেও নারীর সম-অধিকার ছিল স্বীকৃত। সুজাতা, সুপ্রিয়া, সংঘমিত্রার নাম বৌদ্ধধর্ম-প্রচারের ইতিহাসে অম্লান মহিমায় আজও ভাস্বর। শিক্ষায়-দীক্ষায়, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে তাঁহারা ছিলেন প্রাগ্রসর।

ভারতে নারী-শিক্ষা ও নারী-স্বাধীনতা : বৈদিকযুগে ও বৌদ্ধযুগে

তারপর আসিল মুসলমান-যুগ। এবার শিক্ষা ও স্বাধীনতার উন্মুক্ত জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নারী হইল অন্তরালবর্তিনী, নিক্ষিপ্ত হইল সূচীভেদ্য অন্ধকারময় অন্তঃপুরের পাষাণ-বেষ্টনীর মধ্যে। বাহিরে সূর্য উঠিয়াছে, সূর্য ডুবিয়াছে। যুগচক্র

আবর্তিত হইয়াছে। কিন্তু নারীজাতি 'যেই তিমিরে, সেই তিমিরে' রহিয়াছে পড়িয়া। সেই চরম অগৌরবের মধ্যে তাহাদের মুক্তির আহ্বান আসে নাই, উন্মুক্ত হয় নাই পাষাণ-কারার রুদ্ধ দুয়ার। অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও আচার-অনুষ্ঠানাদির কুসংস্কারকে নিত্য সঙ্গী করিয়া তাহারা যাপন করিয়াছে নিতান্তই গৌরবহীন জীবন। জগদ্দল পাষাণের মতো সমাজের বাহিরের সকল পরাভবের গ্লানি তাহাদিগকেই বরণ করিতে হইয়াছে।

মধ্যযুগে ভারতীয় নারী

প্রগতির সকল পথ অবরুদ্ধ হওয়ায় এ দেশের মানহীনা নারী প্রাণহীন আচার-কুসংস্কারের মধ্যে আত্মনিয়োগ করিল। সুযোগ বুঝিয়া তাহাদের গ্রাস করিল কৌলিন্য-প্রথা, বাল্য-বিবাহ-প্রথা ও সতীদাহ প্রভৃতি নানা নিষ্ঠুর প্রথার নিষ্ঠুরতম শাসন। জীবনের সকল প্রকার বহমানতা হারাইয়া, জগতের প্রগতির ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহারা তাহাদের নিস্তরঙ্গ জীবনে প্রথানুগত্যের অজস্র জঞ্জাল জমাইয়া সমাজকে একটি ঘৃণ্য নরককুণ্ডে পরিণত করিল।

তারপর প্রগতির জয়ধ্বজা উড়াইয়া আমাদের ঘরের দুয়ারে আসিল আধুনিক য়ুরোপ। য়ুরোপের সঙ্গে ভারতের বাধিল চিত্ত-সংঘাত। তাহাদের জঙ্গম শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সভ্যতার অভিঘাতে আমাদের স্থবির সমাজের উপকূলে জাগিল প্রচণ্ড তরঙ্গ-বিক্ষোভ। পুরুষ-সমাজে সেই জাগৃতির ঢেউ আসিয়া লাগিল প্রথমে। তারপর নারী-সমাজকে স্পর্শ করিল সেই তরঙ্গ-সংঘাত। প্রকৃতপক্ষে, উনবিংশ শতাব্দীতে যদিও সকল বন্ধন-

উনবিংশ শতাব্দীতে নারী-মুক্তির আন্দোলন

মুক্তির নেতৃত্ব পুরুষেরা গ্রহণ করিয়াছে, তবু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সকল সামাজিক মুক্তি-আন্দোলন বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে নারী-সমাজকে কেন্দ্র করিয়া। রামমোহন সতীদাহ-প্রথার উচ্ছেদ আনিলেন, বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন এবং তৎসহ নারী-শিক্ষার আন্দোলন আনিলেন প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়। সহস্র যুগের বন্দিনী নারী অন্ধ-তামসিকতার অচলায়তনে শিকল-দেবীর পূজাবেদীতল হইতে আলোকোজ্জ্বল বহির্বিশ্বের উদার প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল। এত আলো, এত জীবন!—তাহারা এই প্রথম দেখিল। আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ নারী সেদিন উচ্চারণ করিল—'আমি নারী, আমি মহীয়সী!'

তারপর দেশে নারী-শিক্ষার অগ্রগতির জন্য স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। নারী-জাতির চিত্তোন্মেষ ঘটিতে লাগিল নব নব জ্ঞানের স্পর্শে। ভারতের চিত্ত-শতদল একে একে বিকশিত হইতে লাগিল। আসিল ভারতের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম। জাতির সেই মুক্তি-সংগ্রামে নারীরা আসিয়া পুরুষদের পাশে স্থান গ্রহণ করিল। স্বাধীন

স্বাধীন ভারতে নারী-শিক্ষা ও নারী-প্রগতি

ভারতে নারী-শিক্ষার অগ্রগতি অব্যাহত আছে। সকল প্রকার শিক্ষায়-দীক্ষায়, কর্ম-সংস্থানে নারী-জাতির সমানাধিকার আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। নারী-জাতিকে অন্তঃপুরচারিণী করিয়া সমগ্র সমাজ যে পক্ষাঘাত-দুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার অবসানে আজ নারী-জাতির প্রতি দৃষ্টি-ভঙ্গীর মৌলিক পরিবর্তন আসিয়াছে। নারী আজ আপন ভাগ্য জয় করিবার পাইয়াছে পূর্ণ অধিকার। বিজ্ঞান, সাহিত্য, চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং, সাংবাদিকতা, রাজনীতি ইত্যাদিতে আজ আমরা আধুনিক যুগের স্ব-প্রতিষ্ঠ নারীকে দেখিতে পাই।

উন্নত মানসিকতা-সম্পন্ন সবল, বলিষ্ঠ জাতি-গঠনের জন্য নারী-জাতির শিক্ষা প্রগতি অত্যাবশ্যক। যে হাত দোলনা দোলায়, সেই হাতই বিশ্ব শাসন করে। শি জীবনে জননীর শিক্ষা ও প্রগতিশীলতার প্রভাব অনস্বীকার্য। তাহা ছাড়া, সমাে অর্ধাংশকে বহির্বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত রাখা কেব সামাজিক অপচয় নয়, আত্মহত্যার সামিল। কাজেই, সমাজে নারী-জাতিকে যুগে সহবর্তিনী করিতে হইবে। কেবল নারী-জাতির প্রয়োজনেই নয়, পুরুষের প্রয়োজনে-সমাজের সামগ্রিক প্রয়োজনে নারী-জাতির উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষা, মুক্তি-মানসিকতা আ আবশ্যিক। আমরা চাই শিক্ষায়-দীক্ষায়, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে উজ্জ্বল পরিবার এবং সে সুখী, সন্তুষ্ট ও আদর্শ পরিবার-রচনায় নারীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাজে

নারী-প্রগতির মূলসূত্র

সেক্ষেত্রে নারী-শিক্ষা প্রসারের গুরুত্ব সন্দেহাতীত। তাহাে সামাজিক অচলায়তন সৃষ্টির সকল সম্ভাবনাও বিলুপ্ত হইবে কিন্তু নারী-শিক্ষার আদর্শ কি হওয়া উচিত? আমাদের দেশে পরিবারই সমাজে কেন্দ্র-বিন্দু এবং নারী হইল পরিবারের সক্রিয় নিয়ামক শক্তি। তাহাকেই কে করিয়া আমাদের পরিবার-চক্র আবর্তিত হইয়া চলে। প্রতি পরিবারের নারীকে তা সাহিত্য, ভূগোল, গণিত, ইতিহাস, গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান, শিশু-মনস্তত্ব, সূচীশিল্প এব রন্ধনশিল্প ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষাদান করিতে হইবে। সেই সঙ্গে উচ্চশিক্ষার দুয়ার উন্মুক্ত রাখিতে হইবে প্রতিভাসম্পন্না নারীদের জন্য। আসল কথা, আমাদের সমাে চাই আদর্শ জননী, চাই আদর্শ কন্যা। আন্তর্জাতিক নারী-বর্ষের শিক্ষা তো তাহাই।

আমরা বিশ্বাস করি, নারী-জাতির মুক্তির মধ্য দিয়া আমাদের সমাজের বহু যুগে অনড় অচল রথচক্র আবার সচল হইয়া উঠিবে। কাজেই, আমাদের সমাজের প্রয়োজনে আদর্শ পরিবার-গঠনের প্রয়োজনে, এমন-কি, আদর্শ জীবন-গঠনের প্রয়োজনে চাই উপযুক্ত নারী-শিক্ষা। সেই নারী-শিক্ষা নারী-প্রগতির পথ নির্মাণ করিয়া দিবে, নারীর ভাগ্যরচনার হইবে প্রধান হাতিয়ার। কিন্তু সেই নারী-প্রগতির অর্থ যথেচ্ছাচার নয়। আমরা চাই নারীর মেধা ও বুদ্ধির সহিত তাহার ঔদার্য ও মহত্বের সুসমঞ্জস্ বিকাশ।

উপসংহার

সোভিয়েট রাশিয়ার মহাকাশচারিণী ভ্যালেন্তিনা তেরেস্‌কোভার মতো ভারতীয় নারীও বিশ্বসম্মান অর্জন করুক। কেবল মাঙ্গলিক-বোধহীন, বাঁধন-ছেঁড়া নিরুদ্দেশ প্রগতির মোহে ছুটিয়া চলিলে তাহাতে নারীর মুক্তি নাই, তাহার মুক্তি সামাজিক কল্যাণের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া আদর্শ পরিবার-রচনায়। ভারতীয় নারী ঘর আর বাহির, অন্তঃপুর ও বহির্বিশ্ব—এই দুয়ের মধ্যে উপযুক্ত যোগবন্ধন রচনার মধ্য দিয়া স্ব-মহিমায় বিকশিত হইয়া উঠুক, তাহার পূত-পবিত্র কল্যাণ-সাধনায় কল্যাণশ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠুক আন্তর্জাতিক নারী-বর্ষ

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- নারী-শিক্ষা
- বর্তমান ভারতে নারী-শিক্ষার রূপ
- স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা
- ভারতে নারী-প্রগতি

প্রবন্ধ-সূত্র ঃ সূচনা। ভারতের ভৌগোলিক বিশালতা ও সীমান্ত-রেখার বিস্তৃতি। ভারতের যুদ্ধ-বিরোধী জীবন-দর্শন। প্রাচীন ভারতে সামরিক শিক্ষা। মোগল ও ব্রিটিশ আমলে সামরিক শিক্ষা। স্বাধীন ভারতের যুদ্ধ-বিরোধী মনোভাব ও সামরিক শিক্ষার বিপর্যয়। বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা। ফলাফল বিচার। উপসংহার।

ছাত্র-জীবনে সামরিক শিক্ষা

ক. প্রা. '৬৩

সুদীর্ঘ দুই শতাব্দীর পরাধীনতার অবসানে ভারত লাভ করিয়াছে তাহার দুর্লভ স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা অর্জন করিতে তাহাকে কত অমূল্য প্রাণ বলি দিতে হইয়াছে, কত দুঃসহ কৃচ্ছ্রসাধন ও দুঃখবরণ করিতে হইয়াছে। ভারতের এই কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে অপহরণ করিবার জন্য, কণ্ঠরোধ করিয়া তাহাকে হত্যা করিবার জন্য আজ চারিদিকে চলিয়াছে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কত ষড়যন্ত্র। ভারতকে আজ তাহার সেই দুঃখ-লব্ধ স্বাধীনতাকে রক্ষা করিতে হইবে। তাহার জন্য চাই উপযুক্ত শিক্ষা, চাই উপযুক্ত প্রস্তুতি।

সূচনা

ভারত-রাষ্ট্রের ভৌগোলিক বিশালতার দিকে দৃষ্টি-ক্ষেপণ করিলে ভারতে সামরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যে কত গুরুত্বপূর্ণ, তাহা সহজে অনুভূত হইবে। তাহার ভৌগোলিক বিস্তৃতি যেমন বিশাল, তাহার সীমান্ত-রেখাও তেমনি সুবিস্তৃত। দেশবিভাগের পর সেই সীমান্ত-রেখা আরও প্রসারিত হইয়াছে। পূর্ব ও পশ্চিমে যে প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল দুর্ভেদ্য, তাহা পড়িল পাকিস্তানের ভাগে। আর, ভারতের ভাগে পড়িল তাহার বিনিময়ে সুদীর্ঘ সমতল-সীমান্ত, যাহার প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া ভারতের উপায় নাই। তাহা ছাড়া, স্বাধীনতা-লাভের পর পাকিস্তানের জঙ্গী-শাসন ক্রমাগত সেই প্রয়োজনীয়তাকে দিয়াছে আরও বাড়াইয়া। অন্যদিকে, ভারতের 'উত্তরস্যাং দিশি নগাধিরাজ হিমালয়ে'র প্রাকৃতিক পার্বত্য বন্ধুরতাও আজ আর নির্ভরযোগ্য নয়। এই আলোকে ভারতের সামরিক প্রস্তুতির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

ভারতের ভৌগোলিক বিশালতা ও সীমান্ত-রেখার বিস্তৃতি

ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে ভারত চিরকালই সামরিক ক্ষেত্রে গৌরবহীন। মাঝে মাঝে তাহার ব্যতিক্রম লক্ষিত হইলেও তাহার ইতিহাস এই অভিমতের অনুকূলেই সাক্ষ্য দেয়। সে কদাচিৎ তাহার বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিয়াছে। ইতিহাস সাক্ষী, ভারত কোনদিন পররাজ্য আক্রমণ করে নাই। শুধু তাই নয়, যখন কোন বৈদেশিক শক্তির দ্বারা সে আক্রান্ত হইয়াছে, তখনই তাহার প্রতিরক্ষার ব্যূহ তাসের প্রাসাদের মতো ভাঙিয়া পড়িয়াছে। পরাভব এবং পর-দাসত্বের কলঙ্ক হইয়াছে তাহার ললাট-লিপি। ভারতের এই-যে দুর্ভাগ্য, তাহার মূলে আছে তাহার নিরুদ্বেগ, পরলোক-বিশ্বাসী জীবন-দর্শন। সেই যুদ্ধ-বিরোধী জীবন-দর্শনই তাহার প্রতিরক্ষা-প্রস্তুতির বেদনাবহ অবহেলার জন্য দায়ী।

ভারতের যুদ্ধ-বিরোধী জীবন-দর্শন

তথাপি প্রাচীন কাল হইতে ভারতের সামরিক প্রস্তুতির আয়োজন কম ছিল না। বেদ-বেদান্ত শিক্ষার পাশাপাশি প্রবাহিত ছিল সামরিক শিক্ষার ধারা। কিন্তু সেই সামরিক শিক্ষা লাভের অধিকার ছিল কেবলমাত্র ক্ষত্রিয়-সন্তানদের। বলাবাহুল্য, সেই সামরিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল নিরঙ্কুশ রাজশক্তির স্থায়িত্ব রক্ষা, জ্ঞাতি-কলহে কিংবা প্রতিবেশী রাজ্য-কলহে জয়লাভ। আর, সমাজের বৃহত্তম শক্তি শূদ্র-সন্তানেরা মহাভারতের একলব্যের মতো দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ গুরু-দক্ষিণা দিয়া চির-পঙ্গুত্ব বরণ করিয়াছে। তাহাতে ভারতের সামরিক শক্তি হইয়াছে চির-দুর্বল। অন্যদিকে, ক্ষত্রিয়-সীমিত সামরিক শক্তি জ্ঞাতি-কলহে কিংবা প্রতিবেশী-সংঘর্ষে হইয়া পড়িয়াছে হীনবল। তারপর যখন প্রবল বহিঃশত্রুর দল দুর্বার বন্যার মতো ভারতের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে, তখন সেই বহিঃশত্রুর আক্রমণে পরাজয়ই হইয়াছে তাহার ভাগ্য-লিপি।

প্রাচীন ভারতে সামরিক শিক্ষা

মোগল-আমলে সামরিক শিক্ষার তেমন কোন উন্নতি হয় নাই। যেটুকু হইয়াছিল, তাহার কৃতিত্বের দাবিদার হইলেন বাবর, শেরশাহ এবং আকবর। কিন্তু তাহাও ছিল গতানুগতিক সমর-কৌশলের জীর্ণ পুনরাবৃত্তি। তবে ব্রিটিশ আমলে দুই-এক স্থানে আধুনিক পদ্ধতিতে সামরিক শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল মাত্র। তাহাতে ভারতীয়রা যোগদান করিয়া আধুনিক সমর-রীতি আয়ত্ত করে। ইংলণ্ডের সামরিক শিক্ষায়তনে তাহারা শিক্ষা লাভেরও অধিকারী হইয়াছিল। পরে দেখা গিয়াছে, ভারতীয় যুবকরা স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনী—সামরিক বিভাগের সকল শাখাতেই উজ্জ্বল কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে।

মোগল ও ব্রিটিশ-আমলে সামরিক শিক্ষা

স্বাধীন ভারতে নানা কারণে সামরিক শিক্ষার প্রতি একটা প্রতিকূল মনোভাবের সৃষ্টি হইয়াছিল। অহিংসা, নিরপেক্ষতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান-নীতির প্রতি আনুগত্যই ভারতের সেই সামরিক দুর্বলতার মূল কারণ। তাই বলিয়া বর্তমান জগতে এই নীতিগুলির কি কোন মূল্যই নাই?—আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে স্মরণীয় যে, মহামতি অশোকের সুমহান শান্তি ও অহিংসা-নীতির উপর অতি-নির্ভরতা পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যিক পতনকে অনিবার্য করিয়া তুলিয়াছিল।

স্বাধীন ভারতে যুদ্ধ-বিরোধী মনোভাব ও সামরিক শিক্ষার বিপর্যয়

ভারত পররাজ্য আক্রমণ করিবে না, কিন্তু বহিঃশত্রুর আক্রমণও বরদাস্ত করিবে না—ইহাই তাহার সোচ্চার ঘোষণা। বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে তাহার স্বাধীনতার প্রদীপ-শিখাকে রক্ষা করিবার জন্ম ভারত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার প্রবর্তন করিয়াছিল। এন. সি. সি. ও এন. সি. সি. আর. সমর-শিক্ষার্থীবাহিনীতে প্রত্যেক সমর্থ ছাত্রদের যোগদান বর্তমানে স্বেচ্ছামূলক। ছাত্রগণ ইচ্ছানুযায়ী স্থল, নৌ বা বিমান—সমর-শিক্ষার্থী বাহিনীতে যোগদান করিতে পারে। এ বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষার জন্ম রাষ্ট্রীয় সৈনিক-স্কুল রহিয়াছে দেরাদুনে। আহম্মদনগরে আছে যান্ত্রিক যুদ্ধ-কৌশল শিখাইবার ব্যবস্থা। বিমানবাহিনীর শিক্ষাকেন্দ্র আছে দেরাদুন ও বাঙ্গালোরে।

বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা

ভারতে সমর-শিক্ষা যতদিন স্বেচ্ছাবৃত্ত ছিল, ততদিন নৈপুণ্য বা কৃতিত্ব প্রদর্শন ছিল সীমাবদ্ধ। সীমান্ত-সংকটের প্রেক্ষাপটে ব্যাপক সমর-শিক্ষার মাধ্যমে তাহা সম্প্রসারিত হয়। কেবল তাহাই নহে, যে দেশ-প্রেম ছিল সুপ্ত, আজ তাহা সামরিক শিক্ষার সুযোগে হইয়াছে জাগ্রত। সীমান্তে যে ভারতীয় জওয়ানেরা দেশের নিরাপত্তা-রক্ষায় ব্যাপৃত, তাহারা যে একা কিংবা অসহায় নয়, তাহাদের পশ্চাতে রহিয়াছে বিপুল সম্ভাবনাময়, উপযুক্ত শিক্ষার শিক্ষিত এবং সদাজাগ্রত যুব-সম্প্রদায়, তাহা আজ স্পষ্ট এবং তাহা আজ অগ্রগামী সৈন্যবাহিনীর দৃঢ় মনোবলের ভিত্তিভূমি রচনা করিয়াছে। ইহারা প্রয়োজনবোধে আগামীকাল তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হইতে পারিবে।

ফলাফল বিচার

ভারতে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা বহু সমালোচনার সম্মুখীন হইয়াছিল। যেখানে ছাত্রসমাজের একাংশ দরিদ্র, কায়ক্লেশে যাহাদের গ্রাসাচ্ছাদান ও শিক্ষা-ব্যয় সংগ্রহ করিতে হয়, সেখানে তাহাদের উপরে এই সামরিক শিক্ষার দুরূহ গুরুভার চাপাইয়া দেওয়া অসঙ্গত। তাহা ছাড়া, মুসোলিনী-হিটলারের ন্যায় জঙ্গী-নীতি প্রবর্তনের দ্বারা দেশের জনমনের সুকোমল বৃত্তিগুলিকে কণ্ঠরোধ করিয়া হত্যা করিলে দেশের সামূহিক সর্বনাশ যে অবশ্যম্ভাবী, ইহা অনেকেরই সুচিন্তিত অভিমত। কারণ, লাইকারগাসিজ্‌ম স্পার্টাকে যতই শক্তিশালীরূপে গড়িয়া তুলুক, বিশ্বের শ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিল এথেন্সের শিল্প-সৌন্দর্যের নব নব উপহার। তবু স্বাধীন রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রয়োজনে সামরিক শক্তি-বৃদ্ধি নিঃসন্দেহে আবশ্যক। পরাধীনতার ক্ষত-চিহ্নগুলির তিক্ত যন্ত্রণা আমরা আজও ভুলিতে পারি নাই। আমাদের সামরিক দুর্বলতার সুযোগে বহিঃশত্রুরা বাঁরে বারে আমাদের স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া আমাদের হাতে-পায়ে দাসত্বের শৃঙ্খল পরাইয়া দিয়াছে—ভারতের ইতিহাসে রহিয়াছে তাহার বেদনাদায়ক সাক্ষ্য। কাজেই, ভবিষ্যতে যাহাতে আমাদের স্বাধীনতা দুর্ধর্ষ বিদেশী দস্যুদের হাতে অপহৃত না হয়, তাহার জন্য উপযুক্ত সামরিক শক্তি-সংগঠন আমাদের দরকার। তাই স্বাধীন ভারতে ব্যাপক সামরিক শিক্ষা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু সামরিক শক্তির উপর আত্যন্তিক প্রাধান্য আবার দেশের বিপদ ডাকিয়া আনিতে পারে—সে বিষয়েও আমাদের সতর্ক থাকিতে হইবে। ইতিমধ্যে তাই ভারতে সামরিক শিক্ষাকে স্বেচ্ছাবৃত্ত করা হইয়াছে॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- দেশরক্ষায় ছাত্রদের কর্তব্য
- সামরিক শিক্ষা ও জাতীয় প্রতিরক্ষা-বাহিনী
- ভারতে দেশরক্ষার প্রস্তুতি

২৪.

প্রবন্ধ-সূত্র : সূচনা। ছাত্র-সমাজের অপরাজেয় শক্তি। ছাত্র-সমাজ ও সামাজিক নেতৃত্ব। ভারতে ছাত্র-সমাজ। লোকসেবায় ছাত্র-সমাজ। ছাত্র-সমাজের স্বেচ্ছাবৃত লোকসেবা। লোকসেবায় ছাত্র-সমাজের একটি সুচিন্তিত কার্যসূচী। উপসংহার।

সমাজসেবা ও ছাত্র-সমাজ

উ. মা. '৬৯

সূচনা

সবুজ, সতেজ ছাত্র-সমাজ জাতির সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠতম অংশ। নবীন প্রাণশক্তির অফুরন্ত উচ্ছ্বাসে ভরপুর তাহাদের দেহমন; হৃদয়ে তাহাদের অসীম দুঃসাহস, 'বাহুতে নবীন বল'। তাহাদের চক্ষে উদ্দীপনার জ্বলন্ত মশাল, বক্ষে অসম্ভবকে 'চ্যালেঞ্জ' করিবার দুর্বার প্রতিশ্রুতি। সঞ্জীবতার এমন বলিষ্ঠ প্রকাশ সমাজের অন্য কোন অংশে দেখা যায় না। প্রাণ-প্রাচুর্যে-ভরা এই তরুণ গরুড়ের দল অসীম শক্তি ও সম্ভাবনার প্রতীক। সামাজিক স্বাধীনতা, প্রগতি ও কল্যাণের স্বার্থে জীবন-বলিদানের জন্য তাহারা চির-অঙ্গীকারবদ্ধ। যখন সমাজের অন্যান্য অংশ অজগর-নিদ্রায় নিমগ্ন, তখনই ছাত্র-সমাজের ঘুম ভাঙে। যুগে যুগে ছাত্র-সমাজের ইতিহাসে রহিয়াছে তাহার উজ্জ্বল সাক্ষ্য। সমাজের অন্যায়, অসত্য ও প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে তাহাদের চিরন্তন সংগ্রাম। যেখানে ব্যথা-বেদনার হাহাকার, আর্ত-পীড়িতের ক্রন্দন-রোল, সেখানেই ছাত্র-সমাজের নির্ভীক উপস্থিতি।

ছাত্র-সমাজের অপরাজেয় শক্তি

সামাজিক শক্তির এই সর্বাপেক্ষা সতেজ অংশটি পৃথিবীর দেশে দেশে উপেক্ষিত। সামাজিক নেতৃত্বের দায়িত্বভার ধূসর বার্ধক্যের পশ্চিম দিগন্তে পুঞ্জিত হওয়ায় জীবন-প্রভাতের পূর্ব-দিগন্ত সর্বদাই অবহেলিত হইয়া থাকে। অথচ এই ছাত্র-সমাজের মধ্যে যে শক্তি-সম্ভাবনার অপরাজেয় উৎস নিহিত রহিয়াছে, তাহা বিকাশের যথাযোগ্য সুযোগ লাভ করিলে এবং পূর্ণভাবে ব্যবহৃত হইতে পারিলে বহু অসাধ্য সাধিত হইতে পারে, সামাজিক কল্যাণের রুদ্ধদ্বার উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, জরাগ্রস্ত সমাজ এই দুর্জয় শক্তির সন্ধান রাখে না, কোন মহত্তর সামাজিক কল্যাণের মন্ত্রে ইহাকে অনুপ্রাণিতও করে না। ফলে, যাহা হইবার, তাহাই হয়। যে শক্তি সামাজিক কল্যাণকর্মে নিয়োজিত হইয়া সোনা ফলাইতে পারিত, তাহা নানা অবাঞ্ছিত বিধি-নিষেধ ও নৈষ্কর্ম্যের প্রাচীরে প্রতিহত হইয়া সামাজিক অকল্যাণের অভিমুখে ধাবিত হয় ও নানা সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপে মাতিয়া উঠে।

ছাত্র-সমাজ ও সামাজিক নেতৃত্ব

তবে দোষ কাহাকে দিব? সাধারণতঃ ছাত্র-সমাজের স্কন্ধেই এই দোষের দায়ভাগ চাপাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু অকর্মণ্য অভিভাবকত্বের পরিণামেই যে তরুণ ছাত্র-সমাজ আজ বিপথগামী, তাহা অস্বীকার করিবে কে? আসল কথা হইল, ছাত্র-সমাজ স্বতঃস্ফূর্ত জীবনী-শক্তির দ্যোতক। তাহাদের মধ্যে গতির আহ্বান, কর্মের নেশা, সৃষ্টির মহোল্লাস। কিন্তু নেতৃত্বের দিগন্তে জরা এবং বার্ধক্য, অনড় অচলায়তনের লৌহ-প্রাচীর। সামাজিক অভিভাবকদের দিক্-নির্দেশ ও কর্ম-প্রবর্তনার অভাবে অফুরন্ত গতি ও কর্মোন্মাদনার

উৎস ছাত্র-সমাজ সৃষ্টির বিপরীত দিগন্তে ধ্বংসের নেশায় মাতিয়া উঠে। ছাত্র-সমাজের এই ধ্বংসমূলক কার্যকলাপ অবশ্যই নিন্দনীয়; কিন্তু সামাজিক নেতৃত্বের জড়তা ও নৈষ্কর্ম্যও কি প্রশংসাযোগ্য ?

কাজেই, অতি-সাম্প্রতিককালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছাত্র-সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা ও বিপথগামিতার জন্য ছাত্র-সমাজ যতখানি দায়ী, তদপেক্ষা অধিক দায়ী জড়তাগ্রস্ত সামাজিক নেতৃত্ব। দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রও একদিন গভীর আক্ষেপে বলিয়াছিলেন, আমাদের দেশে ছাত্র-সমাজ গৃহে ভৎর্সনার পাত্র, বিদ্যালয়ে শাসনের পাত্র এবং সমাজে উপেক্ষার পাত্র। কেবলই ভৎর্সনা, শাসন ও উপেক্ষা আমাদের হতভাগ্য ছাত্র-সমাজের ভাগ্য-লিপি। উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে, শুভকর্মে আহ্বানের অভাবে অফুরন্ত প্রাণশক্তির দুর্মর প্রকাশ ছাত্র-সমাজ যখন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া অশুভকর্মে লিপ্ত হয়, তখন চারিদিকে প্রবল চিৎকার ধ্বনিত হইয়া উঠে। কিন্তু সমাজের বোঝা উচিত, দোষ কাহার ? দোষ সমাজেরই। কারণ, কোনকালেই আমাদের ছাত্র-সমাজকে শুভ কর্মপথে চলিবার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা হয় নাই।

ভারতে ছাত্র-সমাজ

ভারতের মতো দেশে, যেখানে সাধারণ মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্যের অন্ত নাই, অশিক্ষা-কুশিক্ষার শুষ্কতাপে যেখানে নিরানন্দ মরুভূমি তাহার স্থায়ী আসন কায়েম করিয়া বসিয়াছে, যেখানে রোগ-তাপ-জর্জরতায় এবং প্রাকৃতিক দৈব-দুর্বিপাকে কোটি-কোটি মানুষের জীবন বিপন্ন, অসহায়, সেখানে ছাত্র-সমাজের ভূমিকা অসামান্য। অর্থাৎ, ভারতের মতো দারিদ্র্য-জর্জর, রোগ-জর্জর, সমস্যা-জর্জর দেশে ছাত্র-সমাজের সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে লোকসেবার বিস্তীর্ণ প্রান্তর। প্রকৃতির নিষ্করুণ রুদ্রশাপে এদেশে মানুষের দুঃখ-দুর্গতির অন্ত নাই। বন্যা-প্লাবন-জলোচ্ছ্বাস এবং ভূমিকম্প-ঘূর্ণিবাত্যা-ধসের ফলে প্রতি বৎসরই ভারতে বহু মানুষের জীবন বিপন্ন হইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি মনুষ্য-সৃষ্ট মহাবিপত্তিসমূহ তো আছেই। দীর্ঘকালব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের শোষণে, অনিয়ন্ত্রিত প্রাকৃতিক শক্তির আকস্মিক আক্রমণে এবং অর্থ নৈতিক দুঃখ-দুর্দশার ভয়াবহ পরিণামে প্রতিনিয়ত জনগণের ভাগ্যে ঘনাইয়া আসে দুঃখের অমারাত্রি। বিপন্ন মানবতার আর্ত হাহাকারে আকাশ-বাতাস যখন পূর্ণ হইয়া উঠে, অকাল-মৃত্যুর হাতে অসহায় জনগোষ্ঠীর অক্ষম আত্মসমর্পণে যখন বেদনার অশ্রুসিক্ত ইতিহাস রচিত হয়, তখন আমাদের দেশের ছাত্র-সমাজের কি কিছুই করণীয় নাই ?

লোকসেবায় ছাত্র-সমাজ

লোকসেবায় অনুপ্রাণিত হইবার জন্য যখন সমাজ বা রাষ্ট্র ছাত্র-সমাজকে আহ্বান করে না, তখন ছাত্রগণ স্বেচ্ছাবৃতভাবেই অনেক সময় লোকসেবায় ঝাঁপাইয়া পড়ে। মানুষের অসহ দুঃখ-বেদনার নীরব দর্শক হইয়া তাহারা কিছুতেই থাকিতে পারে না। দুঃখ-সংকটের আবর্ত-মাঝে নিজেদের নিক্ষেপ করিয়া বিপন্নের উদ্ধারে রচনা করে আত্মত্যাগের নূতন ইতিহাস। ছাত্রসমাজ স্বভাবতঃই লোকসেবার ব্রতধারী। সেকথা সমাজ অনায়াসে অস্বীকার করে। বন্যার্ত বা দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সেবায় টিকিনের পয়সা দিয়া কি ছাত্ররা ত্রাণ-তহবিল

ছাত্র-সমাজের স্বেচ্ছাবৃত লোকসেবা

গড়িয়া তোলে না? দলবদ্ধভাবে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া কি তাহারা আর্ত-পীড়িতের সেবায় সাহায্য সংগ্রহ করিয়া বেড়ায় না? জীবন বিপন্ন করিয়া কি তাহারা আক্রান্ত এলাকায় ছুটিয়া যায় না? 'চ্যারিটি শো'র ব্যবস্থা করিয়া, সারাদিন রিক্শা চালাইয়া, এমন-কি জুতা পালিশ করিয়া তাহারা আর্তসেবায় রাখে গৌরবোজ্জ্বল স্বাক্ষর।

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অভিভাবকেরা তাহাদের এই মহান্ মানবিকতার দিকটি দেখিতে পান না। তাঁহারা তাহাদের কেবল উচ্ছৃঙ্খলতাই দেখিতে পান এবং সেই অজুহাতে তাহাদের ধিক্কার জানাইবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত। কিন্তু এতদিন তাঁহারা লোকসেবার একটি সুচিন্তিত কার্যসূচী প্রণয়ন করিয়া ছাত্র-সমাজের হাতে তুলিয়া দিতে পারিয়াছেন কি? অর্থাৎ, সমাজের সজীবতম অংশ ছাত্র-সমাজকে তাঁহারা কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার সাহায্যে গঠনমূলক কর্মে অনুপ্রাণিত করিতে পারেন নাই। এই ব্যর্থতা তাঁহাদের অভিভাবকত্বের ব্যর্থতা। একথা সত্য যে, সমাজের বিশাল জনগোষ্ঠীর দুঃখ-দারিদ্র্য ও রোগ-জর্জরতার মূলে রহিয়াছে তাহাদের শতাব্দী-লালিত অশিক্ষা। অশিক্ষার সেই জগদ্দল পাথরটাকে জনজীবনের বুকের উপর হইতে অপসারিত করিতে পারিলে জনগণকে সচেতন ও স্বনির্ভর জীবন-যাপনে উদ্বুদ্ধ করা যায় এবং লোকসেবার মহত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়। স্কুল-কলেজে এমন কি কোন কার্যসূচী চালু করা যায় না, যাহার ফলে ছাত্র-সমাজ বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ দুই-তিন সপ্তাহের জন্যও দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণের অভিযানে সক্রিয় অংশ গ্রহণে কার্যতঃ বাধ্য থাকে? বিপন্ন জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করিবার জন্য সেবাই কি শুধু লোকসেবা? সম্ভাব্য বিপদের মূলোৎপাটন কি লোকসেবা নয়? তাহা ছাড়া, স্কুল-কলেজে আর্তত্রাণ দল সংগঠিত করিয়া লোকসেবার স্থায়ী ব্যবস্থা করিয়াও রাখা যায়। অবশ্য সেজন্য 'স্কাউট দল', 'সেণ্ট জন্স্ অ্যাম্বুলেন্স কোর' ইত্যাদির সেবা-সূচী অত্যন্ত সীমিতভাবে চালু আছে।

লোকসেবা ছাত্র-সমাজের একটি সুচিন্তিত কার্যসূচী

কিন্তু তাহাই যথেষ্ট নয়। স্কুল-কলেজে বাধ্যতামূলকভাবে লোকসেবার সম্প্রসারিত কার্যসূচীর প্রচলন চাই। ইহার দ্বারা কেবল লোকসেবার মহত্তম দৃষ্টান্তই স্থাপিত হইবে না, ইহার দ্বারা ছাত্র-সমাজের জ্ঞানার্জন পরিপূর্ণতা লাভ করিবে এবং সেই সঙ্গে সামাজিক দায়িত্ববোধেরও উন্মেষ ঘটিবে। এইভাবে গঠনমূলক কার্যে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে পারিলে ছাত্রসমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা ও বিপথগামিতা প্রতিরুদ্ধ হইবে। ফলে, একদিকে যেমন নবীন প্রাণের উৎস ছাত্র-সমাজের শক্তি-সামর্থ্য জাতির সেবায় সার্থকতা লাভ করিবে, অন্যদিকে তেমনই সমগ্র জাতি এই সেবায় চির-নিন্দিত ছাত্র-সমাজের কাছে থাকিবে চির-কৃতজ্ঞ।

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- লোকসেবা ও ছাত্র-সমাজ
- দেশগঠনে ছাত্র-সমাজ
- আর্তের সেবা ও ছাত্র-সমাজের কর্তব্য
- ছাত্র-সমাজের শক্তির অপচয় বন্ধ করিবার উপায়
- নিরক্ষরতা দূরীকরণে ছাত্রগণের কর্তব্য

২৫.

প্রবন্ধ-সূত্র : সূচনা। ব্যক্তি-জীবনে শৃঙ্খলা-বোধের প্রয়োজনীয়তা। সমাজ-জীবনে শৃঙ্খলা-বোধের প্রয়োজনীয়তা। শৃঙ্খলা ও মানব-সমাজের সামগ্রিক উন্নতি। ছাত্র-জীবনই শৃঙ্খলানুশীলনের উপযুক্ত সময়। শৃঙ্খলা শৃঙ্খল নয়। বর্তমানে ছাত্র-সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ। উপসংহার।

ছাত্র-সমাজ ও শৃঙ্খলাবোধ

এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড এক অদৃশ্য দুর্লঙ্ঘ্য নিয়মের সূত্রে গ্রথিত। ক্ষুদ্রতম অণু-পরমাণু হইতে বিশালকায় গ্রহ-নক্ষত্র পর্যন্ত—সর্বত্রই বিরাজিত এক কঠোর নিয়মের শাসন। প্রভাতে পূর্ব-দিগন্তে সূর্যোদয় এবং সায়াহ্নে পশ্চিম-দিগন্তে সূর্যাস্ত—সবই এক দুর্লঙ্ঘ্য নিয়মাধীন। মানব-জীবনেও প্রয়োজন সেই নিয়মের শাসন। মানুষের জীবনকে সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত করিয়া তুলিতে হইলে জীবনেও আহ্বান করিতে হইবে শৃঙ্খলাবোধ। কেবল ব্যক্তি-জীবনেই নয়, সামাজিক শান্তি, শ্রী ও কল্যাণের জন্য চাই সামাজিক নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা।

সূচনা

প্রকৃতির রাজ্যে যে শৃঙ্খলার শাসন-চক্র নিত্য-আবর্তমান, সেই শৃঙ্খলার শাসনে মানুষের দেহ-মনে আসে অনিবার্য ক্রমবিবর্তন। কোন্ মানুষ সেই নিয়মকে অস্বীকার করিতে পারিয়াছে? শৈশবকালই মানব-জীবনে প্রবেশের সিংহ-দ্বার। কাজেই, শৈশবের শুভলগ্নেই নিয়মানুশীলনের ব্রতে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। আসল কথা, এই মানব-জীবনে সোনা ফলাইতে হইবে। দুর্লভ মানব-জীবন কেবল ছন্দোহীন অপচয়ের জন্য নয়। মানব-জমিনে সোনা ফলাইতে হইলে চাই নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধের বিশ্বস্ত অনুশীলন।

ব্যক্তি-জীবনে শৃঙ্খলা-বোধের প্রয়োজনীয়তা

প্রতিটি কর্মানুশীলনের জন্য আছে একটি বিশেষ ধারাক্রম, যাহার নাম ছন্দ। সেই ছন্দই শৃঙ্খলা, সেই ছন্দই সাফল্যের পুরোহিত। শৈশবকাল হইতে মানুষকে সমাজে বিচরণ করিতে হয়, গ্রহণ করিতে হয় নানা সামাজিক দায়িত্ব। কিন্তু সমাজবদ্ধ প্রতিটি মানুষ যদি খেয়াল-খুশিমতো যথেচ্ছাচার শুরু করে, তাহা হইলে সমগ্র সমাজটাই উচ্ছৃঙ্খলতার উন্মাদাগারে পরিণত হইবে। অবিশ্রান্ত সংঘর্ষে মানব-জীবনের অস্তিত্বও বিপন্ন হইয়া পড়িবে। সৌরজগতে নিয়মের সামান্যতম ব্যতিক্রমে যেমন সর্বধ্বংসী বিপর্যয় ঘটিতে পারে, তেমনি নিয়মের ব্যতিক্রমে সমগ্র সমাজ-জীবনে ঘনাইয়া আসিতে পারে এক ঘোরতর বিশৃঙ্খলা।

সমাজ-জীবনে শৃঙ্খলা-বোধের প্রয়োজনীয়তা

কাজেই, মানব-সমাজের সার্বিক উন্নতি ও মানব-সভ্যতার চরম বিকাশের মূলে রহিয়াছে মানুষের সুশৃঙ্খল ও সুসংহত কর্মোদ্যোগ। যেখানে শৃঙ্খলা নাই, সেখানে শ্রী নাই, কল্যাণ নাই, আনন্দ নাই, শান্তি নাই। সেই নিরানন্দ, কল্যাণশ্রী-সুষমাহীন অশান্ত অরাজকতায় ঘনাইয়া আসে মানব-জীবনের অন্তিম লগ্ন। শৃঙ্খলাবদ্ধ, নিয়মানুবর্তী, সুসংহত সৈন্যবাহিনীই যুদ্ধ-বিজয় করিতে পারে। কিন্তু বিশৃঙ্খল উন্মত্ত জনতাকে বহন করিতে হয় পরাজয়ের গ্লানি। তাই তো সুশৃঙ্খল জাতির ভাগ্যে জোটে সাফল্যের জয়টিকা এবং উচ্ছৃঙ্খল জাতির ভাগ্যে জোটে ব্যর্থতার দুরপনেয় গ্লানি।

শৃঙ্খলা ও মানব-সমাজের সার্বিক উন্নতি

ছাত্র-জীবনই শৃঙ্খলাবোধ ও নিয়মানুবর্তিতা অনুশীলনের উপযুক্ত সময়। এই সময় সজীব-কোমল মানব-ভূমিতে শৃঙ্খলাবোধ ও নিয়মানুবর্তিতার বীজ বপন করিলে উত্তরকালে তাহাতে অমৃত ফল ফলে। ভারতের বৈদিক সমাজ তাই ছাত্র-জীবনে কঠোর ব্রহ্মচর্য পালনের নির্দেশ দিয়াছিল। সেই ব্রহ্মচর্য-পালন, সেই ব্রতানুবর্তিতা জীবনের মৃত্তিকায় শৃঙ্খলা-বোধ-উৎকর্ষণের ভূমিকা। শৃঙ্খলানুশীলন তাই সর্বকালের সর্বদেশের ছাত্র-জীবনের অবশ্য-আচরণীয় বিধি।

ছাত্র-জীবনই শৃঙ্খলানুশীলনের উপযুক্ত সময়

শৃঙ্খলাবোধ জীবন-বিকাশের উজ্জীবন-মন্ত্র। তাহা জীবন-বিকাশের অনুকূল গতিপথ রচনা করিয়া দেয়। কিন্তু শৃঙ্খলা যদি শৃঙ্খল হইয়া প্রতিনিয়ত পদযুগলে নির্দয়ভাবে বাজে, যদি অগ্রগতির পথে সৃষ্টি করে দুর্বার প্রতিবন্ধকতা, তাহা হইলে জীবন কূপ-মণ্ডুকতার পাষাণ-প্রাচীরে মাথা কুটিয়া মরে এবং সমাজ প্রাণহীন নিয়ম-শৃঙ্খলার আচারানুষ্ঠানের মাধ্যমে পরিণত হয় এক সংকীর্ণ অচলায়তনে। যুগে যুগে দেখা গিয়াছে, অর্থহীন নিয়মের নিগড়ে বাঁধা পড়িয়া বারে বারে সামাজিক প্রগতি প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে, জীবন পরিণত হইয়াছে শুষ্ক মরুভূমিতে।

শৃঙ্খলা শৃঙ্খল নয়

বর্তমানকালে ছাত্র-সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতায় সকলেই বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন। বলাবাহুল্য, সেই উদ্বেগ অমূলক নয়। তাহাদের উচ্ছৃঙ্খলতার কলঙ্কিত স্বাক্ষর পড়ে পরীক্ষা-মন্দিরে, ট্রামে-বাসে, পথে-ঘাটে, সমাজ-জীবনের অলিতে-গলিতে। ছাত্র-সমাজ অগ্রযাত্রীর দল। তাহারা স্বভাবতঃই অগ্রসর হইতে চায়, চায় কর্ম-ব্যস্ততা। কিন্তু আজ তাহাদের সম্মুখে অগ্রসরণের সকল পথ রুদ্ধ। কর্মহীনতার বিশাল অবকাশ তাহাদের মানস-ক্ষেত্রকে শয়তানের কারখানায় পরিণত করিয়াছে। দেশব্যাপী আশাহীনতা তাহাদের নিক্ষেপ করিয়াছে এক গভীর নৈরাশ্যের অন্ধকারে। তাহা ছাড়া, কুরুচি ও দুর্নীতিপূর্ণ চলচ্চিত্র-প্রদর্শনী ছাত্র-সমাজকে উচ্ছৃঙ্খলতার পথে চালিত করে। ছাত্র-সমাজে যদি শৃঙ্খলা-বোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, তবে তাহাদের উচ্ছৃঙ্খলতার মূল কারণগুলির বিলোপ-সাধন করিতে হইবে। কেবল ছাত্র-সমাজকে তিরস্কার করিয়া কিছু হইবে না।

বর্তমানে ছাত্র-সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ

বর্তমান জরুরী অবস্থা ছাত্র-সমাজের শৃঙ্খলা দাবী করে। ছাত্র-সমাজেরও মনে রাখিতে হইবে যে, ছাত্র-জীবনই হইল জীবন-গঠনের সময়, উত্তর-জীবনের প্রস্তুতির কাল। শৃঙ্খলাবোধ জীবনের ভিত্তি-স্বরূপ। বর্তমানের নৈরাশ্যবোধ কিংবা রুচি-বিকৃতি অপসরিত হইয়া শীঘ্রই নূতন আশা ও আদর্শের সূর্যোদয় ঘটিবে। ইহার পর আসিবে নূতন দিন, নূতন জীবন। আমাদের ছাত্র-সমাজ তাহাকে বরণ করিবার জন্য যেন প্রস্তুত থাকে॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- ছাত্র-সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য
- শৃঙ্খলাবোধ
- নিয়মানুবর্তিতা
- ছাত্র-উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ ও প্রতিকার

প্রবন্ধ-সূত্র : সূচনা। জীবন-চরিত পাঠের উপকারিতা। বৃহতের সংস্পর্শে নবজন্ম লাভ। মৃত্যু-জয়ের মন্ত্র। জীবন-চরিত স্পর্শমণি-স্বরূপ। উহা দিক্-দর্শনযন্ত্র-স্বরূপ। উপসংহার।

জীবন-চরিত পাঠ

'মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে গমন
হ'য়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়
সেই পথ লক্ষ্য করে স্বীয় কীর্তিধ্বজা ধরে
আমরাও হব বরণীয়।'

সূচনা

আমরা সাধারণ মানুষ। অসাধারণত্বের ঐশ্বর্য বলিতে আমাদের কিছুই নাই। সে বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণরূপে নিঃস্ব। কিন্তু মানব-সমাজে যাঁহারা অসাধারণ কিংবা অনন্যসাধারণ, যাঁহাদের মধ্যে আমরা দেখিয়াছি মনুষ্যত্বের অপার বিস্ময়, আমরা তাঁহাদের শ্রদ্ধা করি। হৃদয়ের ভক্তি ও ভালোবাসা দিয়া আমরা তাঁহাদের উদ্দেশ্যে রচনা করি অর্ঘ্য-ডালা। মহাপুরুষগণের জীবন-চরিত আমাদের অন্তরে সেই শ্রদ্ধা-ভক্তির অর্ঘ্য-ডালা রচনার প্রেরণা জাগায়। তাই আমরা পাঠ করি তাঁহাদের অমূল্য জীবন-চরিত এবং হৃদয়কে তদনুসারে বিকশিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করি।

জীবন-চরিত পাঠের উপকারিতা

আমরা যে মহাপুরুষগণের জীবন-চরিত পাঠ করি, তাহাতে মহাপুরুষগণের কল্যাণ হয় না, কল্যাণ হয় আমাদেরই। যাঁহারা প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ, তাঁহারা ইতিহাসের পাতায় তাঁহাদের মহানুভবতা ও জাগতিক কল্যাণ-ব্রতের অম্লান স্বাক্ষর রাখিয়া পৃথিবী হইতে তিরোহিত হইয়াছেন, পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছেন অক্ষয় কীর্তির নানা উজ্জ্বল কাহিনী। আমরা সেই সকল কাহিনী পাঠ করিয়া তাঁহাদের মহান্ কীর্তির স্পর্শে অভিষিক্ত হই, ধন্য হই। তাঁহাদের পবিত্র জীবনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আমাদের মানসিক উৎকর্ষ ঘটে, আমাদের চিত্ত-শতদল বিকশিত হয়।

বৃহতের সংস্পর্শে নবজন্ম লাভ

কাজেই, আমাদের জড়, তামসিকতাময় জীবনের উদ্বোধনের জন্য মহাপুরুষগণের জীবন-চরিত পাঠ অত্যন্ত আবশ্যক। অত্যন্ত সাধারণ মানুষ আমরা। সহস্র ক্ষুদ্রতা-তুচ্ছতা লইয়া এই ধূলিময় পৃথিবীতে আমরা ঘর বাঁধি। সংকীর্ণ আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি, স্বার্থ-গ্লানিময় আমাদের জীবন। সেই ক্ষুদ্রতা-তুচ্ছতার মধ্যে আমাদের প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে। মহাপুরুষগণের উদার, বিশ্বমুখী জীবনের সংস্পর্শে উদ্বোধন হয় আমাদের চেতনার। আমরা আমাদের স্বার্থমগ্নতার সংকীর্ণ সীমা-বেষ্টনী হইতে তাঁহাদের হাত ধরিয়া উদার উন্মুক্ত জীবনে বাহির হইয়া পড়ি। বৃহতের সংস্পর্শে আমরা যেন নবজন্ম লাভ করি।

যে পৃথিবীতে আমরা বাস করি, সেখানে 'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু'। আছে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, আছে সুতীব্র সংগ্রাম। এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় পৃথিবীতে দুঃশাসনের অত্যাচারে

অত্যাচারিত হইয়া আমরা অশ্রু-মোচন করি, মৃত্যুর পূর্বে বহুবার মৃত্যু বরণ করি। তখন মহাপুরুষগণের জীবন-চরিত আমাদের সম্মুখে আঁকিয়া দেয় আলোকিত পথ-রেখা, আমাদের কর্ণে ঢালিয়া দেয় দুঃখ-জয়ের অমৃত-বাণী। উহা মৃত্যু-জয়ের মন্ত্রে দীক্ষা দিয়া আমাদিগকে যথার্থ মানুষ করে, অনিবার্য নৈরাশ্যের হাত হইতে রক্ষা করে। তাঁহারা যেভাবে দুঃখ-সংকটের সহিত সংগ্রাম করিয়া অবশেষে জয়লাভ করিয়াছেন, তাহা আমাদিগকে দেয় সংকট-উত্তরণের প্রেরণা।

মৃত্যু-জয়ের মন্ত্র

স্পর্শমণি আমরা দেখি নাই, উহা কাব্য-কথিত বস্তু। কিন্তু মহাপুরুষগণের জীবন-চরিতই আমাদের নিকট প্রকৃত স্পর্শমণি। উহার স্পর্শে আমাদের হৃদয়ে ক্ষুদ্রতা তিরোহিত হইয়া মহান্ আদর্শের প্রতিফলন ঘটে; ইতিহাসে সেই হৃদয়-সংশোধন বা চিত্ত-শুদ্ধির অনেক দৃষ্টান্ত আছে। ভগবান বুদ্ধের জীবন ও বাণী কিরূপে চণ্ডাশোককে ধর্মাশোকে রূপান্তরিত করিয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই কাল্পনিক সত্য নয়, উহা একটি ঐতিহাসিক সত্য।

জীবন-চরিত স্পর্শমণি-স্বরূপ

বিধাতা-পুরুষ সকল মানুষকে একটা স্বাভাবিক উচ্চতা দান করেন। কিন্তু এই পৃথিবীর কতিপয় মানুষ লাভ করেন স্বাভাবিকতার অধিক উচ্চতা—চতুর্দিকের দীনতা, হীনমন্যতার ক্ষুদ্র ওষধি-পুঞ্জের মধ্যে তাঁহারা বৃহৎ বনস্পতির ন্যায় অসামান্যতার ঊর্ধ্বগগন স্পর্শ করেন। আমরা সামান্য মানুষ, তাঁহাদের মহৎ ছায়ায় গিয়া দাঁড়াই। পার্থিব জ্বালা জুড়াই, মানুষের দেবত্ব দেখিয়া বিস্মিত হই।

এই পৃথিবীর 'পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা'র দুঃখ-বেদনাপূর্ণ ঘূর্ণাবর্তে অনেক সময় আমরা দিশাহারা হইয়া বিমূঢ় হইয়া পড়ি। কোন্ পথে চলিব—পথের ঠিকানা খুঁজিয়া পাই না। অন্ধকারের পাহাড়ে তখন মাথা কুটিয়া মরি। জীবন-চরিতে বর্ণিত মহাপুরুষগণের জীবনী ও বাণী আমাদের দেয় সঠিক পথ-নির্দেশ। এই উত্তাল তরঙ্গ-সংকুল জীবন-সমুদ্রে আমরা দিশাহারা পথিক। ক্ষণজন্মা মহাপুরুষগণের জীবন-চরিত আমাদের নিকট দিক্-দর্শনযন্ত্র-স্বরূপ—আমাদের পার্থিব জীবনের চির-উজ্জ্বল আলোকস্তম্ভ।

উহা দিক্-দর্শন-যন্ত্র-স্বরূপ

বর্তমানকালের পৃথিবী অন্ধ-তমসামগ্ন, ক্ষুদ্রতা-তুচ্ছতা-স্বার্থপরতার ক্লেদ-কলঙ্কে পঙ্কিল। চতুর্দিকে ঘৃণা, বিদ্বেষ এবং দুর্নীতির অট্টহাসি—সর্বদা মানবতার বিরুদ্ধে চলিয়াছে কুটিল চক্রান্ত। আজ মানুষের চিত্ত-শুদ্ধির একান্ত প্রয়োজন, প্রয়োজন পাপ-পঙ্কিল হৃদয়ের যথার্থ সংশোধন। আজ কে মানুষকে এই নিবিড় ঘন অন্ধকারে পথ দেখাইবে? কে তাহাকে দিবে পথের সঠিক ঠিকানা?...কে তাহাকে এই বিশ্বব্যাপী নৈরাশ্যের মধ্যে শুনাইবে উজ্জ্বল আশার বাণী? আজ মহাপুরুষগণের জীবন-চরিতই আমাদের একমাত্র ভরসা। উহাই আধুনিক পৃথিবীর প্রকৃত মুক্তি-বেদ॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- মহাপুরুষগণের জীবনী-পাঠের উপকারিতা
- জীবন-চরিত পাঠের উপকারিতা, মা. '৬২
- মহাপুরুষগণ ও আমরা

প্রবন্ধ-সূত্র: সূচনা। সীমাবদ্ধ জীবনে অধিক জ্ঞানলাভের উপায়: গ্রন্থ-পাঠ। দুর্গম পৃথিবীর সংবাদলাভ। দুর্গমতম মানুষের পরিচয় লাভ। মহাপুরুষগণের জীবনী-পাঠ। অবকাশ-যাপন ও আনন্দলাভ। গ্রন্থ-নির্বাচন। উপসংহার।

গ্রন্থ-পাঠ ও গ্রন্থ-নির্বাচন

বিপুলা এই পৃথিবী। দিকে দিকে তাহার বৈচিত্র্যের অফুরন্ত সমাবেশ। মানুষের জিজ্ঞাসাও তেমনই অন্তহীন। এই বিপুল বৈচিত্র্যময় পৃথিবীর দিকে চাহিয়া তাহার অন্তরে জাগে বিস্ময়, জাগে অদম্য কৌতূহল। সে জানিতে চায় পৃথিবীকে, পৃথিবীর লক্ষ-কোটি মানুষকে এবং নিঃসঙ্গ আপনাকে। 'দেশে দেশে কত-না নগর রাজধানী—মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু, কত-না অজানা জীব কত-না অপরিচিত তরু' রহিয়াছে এই পৃথিবীতে। একজন মানুষের পক্ষে তাহার সংক্ষিপ্ত জীবনায়তনের মধ্যে সমস্ত কিছু দেখা কিংবা জানা সম্ভব নয়।

সূচনা

'বিশাল বিশ্বের আয়োজন;
মন মোর জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তারি এক কোণ।
সেই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমণবৃত্তান্ত আছে যাহে
অক্ষয় উৎসাহে—'

মানুষের গ্রন্থ-পাঠের ভূমিকা হইল ইহাই। কাল নিরবধি এবং পৃথিবী বিপুলা। সেই তুলনায় মানুষের জীবন সংক্ষিপ্ত। এই সংক্ষিপ্ত জীবনায়তনের মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত কিছু প্রত্যক্ষ করিয়া উঠা অসম্ভব। কিন্তু যাঁহারা পৃথিবীকে অল্প-বিস্তর প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের অভিজ্ঞতাকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন গ্রন্থাকারে। সেই গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা জ্ঞান লাভ করি। সেই জ্ঞান পরোক্ষ-জ্ঞান, কিন্তু তাহাতেও আমরা পাই যে অনাবিল আনন্দের ভাগ, তাহা আমাদের জীবনে মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। এইভাবে ঘটে আমাদের জ্ঞানের প্রসার, সভ্যতার সামগ্রিক অগ্রগতি। যুগ-যুগান্তরের মানুষ তাঁহাদের দুঃখলব্ধ চরম অভিজ্ঞতা এবং দুশ্চর জ্ঞান-তপস্যার পরম সিদ্ধিকে গ্রন্থের হিরণ্ময় পাত্রে ভরিয়া ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে নিরবধি কাল-প্রবাহে ভাসাইয়া দিয়াছেন। মহাকালের ঘাটে ঘাটে উৎসুক জ্ঞান-পিপাসুদের ভিড়। তাঁহারা অঞ্জলি ভরিয়া সেই অনন্ত সাধনালব্ধ অমৃতরস আকণ্ঠ পান করেন। অনন্ত কাল-প্রবাহে সেই অমৃত-কুম্ভ পুনরায় ভাসিয়া চলে। সর্বাধুনিক জ্ঞান-চর্চার মূলে এইভাবে গ্রন্থের রহিয়াছে অসামান্য অবদান।

সীমাবদ্ধ জীবনে অধিক জ্ঞানলাভের উপায়: গ্রন্থ-পাঠ

জ্ঞানস্পৃহা হইল আমাদের সীমাবদ্ধ জীবনের আত্মার আকুতি। সেই জ্ঞানের পিপাসার চরিতার্থতার জন্য মানুষ ঘরের বাহির হইয়া পড়ে। বাহিরের পৃথিবীতে কোথাও দুর্গম গিরি, কোথাও কান্তার মরু, কোথাও দুস্তর পারাবার। কিন্তু গ্রন্থ আমাদের ঘরের দ্বারে বহন করিয়া আনে সেই দুর্গম পৃথিবীর সংবাদ। আমরা ঘরে বসিয়াই সেই বন্ধুর

দুর্গম পৃথিবীর সংবাদলাভ

দেশ-বিদেশের রূপ মানস-চক্ষে প্রত্যক্ষ করিতে পারি, জানিতে পারি সেখানকার জীবজন্তুর বৈশিষ্ট্যের কথা এবং সেখানকার মানব-গোষ্ঠীর বিশেষ জীবনাচরণের কথা।

কিন্তু বিশ্বে সবচেয়ে দুর্গম হইল মানুষ। সে দুর্গমতম 'আপন অন্তরালে'। অন্তর মিশাইলে তবেই তাহার অন্তরের পরিচয় প্রাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের পক্ষে তাহা হইয়া উঠা সম্ভব নয়। কিন্তু যাঁহারা তাহাদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মেলামেশা করিয়া তাঁহাদের কষ্টলব্ধ অভিজ্ঞতাকে গ্রন্থকারে পরিবেশন করিয়াছেন, তাঁহাদের রচিত গ্রন্থ-পাঠে আমরা পাই তাঁহাদের গভীর পরিচয়।

দুর্গমতম মানুষের পরিচয় লাভ

তাহা ছাড়া, মহাপুরুষগণের সাধনালব্ধ অভিজ্ঞতা এবং তাঁহাদের অপূর্ব জীবন-কাহিনী পাঠ করিয়া আমাদের চিত্তের উদ্বোধন ঘটে। তাঁহাদের রচিত গ্রন্থে তাঁহাদের দুরবগাহ অনুভূতি এবং জীবন-রহস্য আমাদের মনোভূমিকে করে অভিষিক্ত। তাহাতে আমাদের অন্তরলোক জ্ঞানের এক অপূর্ব আলোকে আলোকিত হইয়া উঠে।

মহাপুরুষগণের জীবনী-পাঠ

গ্রন্থ নিঃসঙ্গতার সঙ্গী, অবকাশের আনন্দ। গ্রন্থপাঠের মতো অবকাশ-যাপনের এমন উপকরণ আর নাই। গ্রন্থ অনাবিল আনন্দের অফুরন্ত উৎস। কাব্য, উপন্যাস, গল্প, রম্য-রচনা পাঠ করিয়া যে আনন্দ পাওয়া যায়, তাহার তুলনা হয় না। কালিদাসের রঘুবংশ, শকুন্তলা, মেঘদূত কিংবা শেক্সপীয়ারের নাটকমালা কিংবা রবীন্দ্রনাথের কবিতা-সম্ভার, গল্পগুচ্ছ, ছিন্নপত্র প্রভৃতি কোনদিন কি পুরাতন হইবে? ইহারা নব নব রসবর্ষণে চির-নূতন। সর্ব দেশের সর্ব-কালের মানুষকে ইহারা অম্লান মহিমায় আনন্দ বিতরণ করিতে থাকিবে।

অবকাশ-যাপন ও আনন্দলাভ

কিন্তু গ্রন্থ-নির্বাচনে পাঠক-সাধারণকে সতর্কতা-অবলম্বন করিতে হইবে। বিশেষ করিয়া তরুণ-সমাজকে। তরুণ-সমাজ স্বভাবতঃই অপ্রাপ্তবয়স্ক। কাজেই, প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য রচিত গ্রন্থ-সম্ভার তাহাদের পাঠ করা উচিত নয়। যে সব গ্রন্থে জীবন-জিজ্ঞাসা নাই, আছে কেবল ইন্দ্রিয়-বাসনার বহ্যুৎসব, সেগুলি পাঠকের জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর। গ্রন্থ-নির্বাচনে তরুণ-সমাজকে পাঠাগারিক কিংবা শিক্ষক মহাশয়গণ সাহায্য করিতে পারেন। যদি গ্রন্থের এবং সেই সঙ্গে গ্রন্থাগারের শ্রেণীবিভাগ নিখুঁত হয়, তবে এই গ্রন্থ-নির্বাচন ব্যাপারটিও সহজ হইয়া যায়।

গ্রন্থ-নির্বাচন

যে গ্রন্থগুলি মহান্ ভাবাদর্শের দ্যোতক, সেগুলি মহাসাগরের ন্যায় অনন্তের বার্তাসহ। তাহাতে 'ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন তুষারের মধ্যে যেমন কত শত বন্যা বাঁধা পড়িয়া আছে, তেমনি এই পুস্তকাগারের মধ্যে মানব-হৃদয়ের বন্যা কে বাঁধিয়া রাখিয়াছে?'

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- গ্রন্থ-পাঠের উপকারিতা
- ভ্রমণ-কাহিনী পাঠের প্রয়োজনীয়তা

প্রবন্ধ-সূত্র। সূচনা। চলাই জীবনের মর্মবাণী। জানার আগ্রহ ও দেশভ্রমণ। শিক্ষার অঙ্গরূপে দেশভ্রমণ। তীর্থ-ভ্রমণের ন্যায় হৃদয়ের প্রসারতা লাভ। গতির নেশা : নামহীন গিরি-নদী আবিষ্কার। দেশভ্রমণ-ব্যবস্থার উন্নতি। পারস্পরিক বোঝাপড়া : জাতীয় সংহতি ও সৌভ্রাত্রবোধের উন্মেষ। উপসংহার।

দেশভ্রমণ

মা. '৬১, '৬৩

'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি
দেশে দেশে কত না নগর রাজধানী—
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
কত-না অজানা জীব কত-না অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে।'

—রবীন্দ্রনাথ

বিশাল এই পৃথিবী। আয়োজন তাহার বিপুল, অফুরন্ত। কত নূতন নূতন দেশ, কত নদী-নির্ঝর, কত গিরি-পর্বত সৌন্দর্যের অপরূপ ডালি সাজাইয়া পৃথিবীর বুক জুড়িয়া বিরাজ করিতেছে। আমরা তাহার কতটুকুই বা জানি? আমাদের জানার পরিধি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। চারিদিকে সবই অজানা, সবই অচেনা। আমাদের নিত্যকার পরিচিত পৃথিবীর বাহিরে অপরিচয়ের দুস্তর মহাসমুদ্র। সেই মহাসমুদ্রের অদৃশ্য তরঙ্গ প্রতিনিয়ত আমাদের হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে।

সূচনা

সেই অজানা, অচেনা বিপুলা পৃথিবীকে আমরা জানিতে চাই। জানিবার জন্য আমাদের অসীম আগ্রহ, অনন্ত উৎকণ্ঠা। তাই সেই অভাব পূরণ করিবার জন্য আমরা পাঠ করি ভ্রমণ-কাহিনী। কিন্তু ভ্রমণ-কাহিনী পড়িয়া আমাদের মন ভরে না। কারণ, ইহা তো পরোক্ষ অভিজ্ঞতার নিরুত্তাপ বিবৃতি। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার রোমাঞ্চ ইহাতে কোথায়? তাই আমরা অজানার আকর্ষণে পরিচিত পৃথিবীর দুয়ার খুলিয়া বাহির হইয়া পড়ি। দেশ-ভ্রমণ করিয়া আমরা লাভ করিতে চাই ভ্রমণের প্রকৃত আনন্দ।

তাই সমুদ্র-মেখলা, নদী-পর্বত-মরু-উপবন-শোভিত এই বিপুল বিশ্ব আমাদের অন্তরকে প্রতি মুহূর্তে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। বিশ্বের এই বিশাল আয়োজনের সঙ্গে রহিয়াছে আমাদের অন্তরের একটি নিগূঢ় যোগসূত্র। 'চরৈবতি চরৈবতি'—চলো, চলো, চলো—সমুদ্রের ঢেউ-এর মতো চলো, পাখির গানের মতো চলো, প্রভাতের আলোর মতো চলো। ইহাই আমাদের অন্তরাত্মার মর্মবাণী। কত অজানিত দেশ, কত বিচিত্র রকমের মানুষ, কত বিচিত্র তাহাদের জীবন-ধারা—কিছুই জানা হইল না। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কত অফুরন্ত আয়োজন লইয়া কত ভূখণ্ড অধীর আগ্রহে আমাদের আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছে। সেই সমস্ত আমাদের দেখা হইল না। আমাদের হৃদয়ের ক্ষুধা, আমাদের অন্তরের অতৃপ্তি আমাদিগকে আমাদের গৃহ-প্রাচীরের আবেষ্টনী হইতে মুক্ত করিয়া সুদূরের অনন্ত আহ্বানে সাড়া দিবার জন্য মহাবিশ্বের মুক্তাঙ্গনে টানিয়া লইয়া চলে।

চলাই জীবনের মর্মবাণী

এইরূপে আমাদের অন্তরের ক্ষুধা মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির নব নব রূপায়ণের মধ্যে আমাদিগকে আনিয়া উপস্থিত করে। ইতিহাস ও ভূগোলের প্রত্যক্ষ এবং অবারিত সান্নিধ্যে দাঁড়াইয়া আমরা অতীত ও বর্তমানের স্মৃতি গায়ে মাখিয়া ধন্য হই এবং সুদূরের ঘনিষ্ঠ স্পর্শ লাভ করিয়া অন্তরে অনুভব করি অতুলনীয় অপার আনন্দ। মানুষের এই-যে জানিবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা, তাহার অনন্ত জিজ্ঞাসা—তাহার পরিতৃপ্তি সাধনের মধ্য দিয়া এক পবিত্র আনন্দানুভব দেশভ্রমণের একমাত্র উদ্দেশ্য। যাহারা দিগ্বিজয় করিয়া সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছে, তাহাদের ছিল না সেই আনন্দানুভূতি, তাহাদের অন্তরে ছিল রাজ্যলোভ, ছিল কুটিল পাপ। তাই তাহারা ছিল অসুখী।

জানার আগ্রহ ও দেশভ্রমণ

কেবল ইতিহাস ও ভূগোল পাঠই জ্ঞানলাভের পরিপূর্ণতা আনিতে পারে না। তাহার জন্য প্রয়োজন দেশভ্রমণ। ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ ভ্রমণ করিলে শিক্ষা সম্পূর্ণতা লাভ করে। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হইতে আমরা বিশেষ বিশেষ স্থান সম্পর্কে কিছু কিছু জানিতে পারি মাত্র। কিন্তু তাহাতে অন্তর ভরে না; তাহাতে আনন্দ নাই, নাই শিক্ষার পূর্ণতা; পৃথিবী মানে তো আর মানচিত্রের কতকগুলি মৃত রেখা নয়, দেশ মানেও নয় ভূগোলের নিষ্প্রাণ বিবৃতি। পৃথিবী বহু মানুষের কলরব-মুখরিত সজীব-সুন্দর বিচিত্র বিস্ময় এবং দেশ রক্তমাংসের মানুষের হাসিকান্নার সংমিশ্রিত শ্যামল শোভন প্রাণোচ্ছল ভূখণ্ড। বাহিরে অবাধ উন্মুক্ত আকাশের নীচে জীবন্ত দেশটি দেখিয়া তাহার অধিবাসীদের প্রত্যক্ষ স্পর্শ লাভ করিয়া তাহাদের জীবনধারা জানিতে হইবে, তাহাদের দেশের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিতে হইবে। সেই জানাই প্রকৃত জানা।

শিক্ষার অঙ্গরূপে দেশভ্রমণ

মানুষ দিনের পর দিন তাহার গৃহের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের মধ্যে বন্দী থাকিয়া হাঁপাইয়া উঠে। সে সেই চারি দেওয়ালের স্বরচিত কারাগার হইতে খোঁজে মুক্তি। তাই তীর্থভ্রমণের তাগিদ সে মাঝে মাঝে অন্তরের মধ্যে অনুভব করে। মানুষ বৃহতের সন্তান। সে বৃহতের মধ্যে নিজেকে দেখিতে চায়। অনেকের মধ্যে নিজেকে হারাইয়া খুঁজিবার জন্য তাহার অনন্ত আকুতি। ক্ষুদ্রতা ও সংকীর্ণতার কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া প্রকৃতির অবারিত সান্নিধ্যে স্থাপিত তীর্থস্থানগুলির পাদপীঠতলে দাঁড়াইয়া তাহার মুগ্ধ হৃদয় ছড়াইয়া পড়ে প্রকৃতির সীমাহীন সৌন্দর্যের মধ্যে, বহু মানবের স্পর্শ লাভ করিয়া ঘটে তাহার নবজন্ম। তারপর সম্পূর্ণ নূতন মানুষ হইয়া সে গৃহে ফিরিয়া আসে।

তীর্থ-ভ্রমণের ন্যায় হৃদয়ের প্রসারতা লাভ

ভ্রমণের নেশাই গতির নেশা। এই গতির নেশা যাহার শোণিত-ধারায় দোলা লাগাইয়াছে, তাহার কাছে গৃহ-বন্দী জীবনের সুখ মিথ্যা, রুটিন-বাঁধা জীবনাচরণ মিথ্যা। যাঁহারা স্মরণীয় পরিব্রাজক, তাঁহারা এই গতির নেশায় জীবনকে তুচ্ছ করিয়া অজানিতের পথে পাড়ি দিয়া 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার' লঙ্ঘন করিয়া ছুটিয়াছেন। ফা-হিয়েন, হিউয়েন-সাঙ্‌, ইবন্ বতুতা, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান—পৃথিবীর দেশ-দেশান্তরের সভ্যতা ও

গতির নেশা : নামহীন গিরি-নদী আবিষ্কার

সংস্কৃতির সম্যক্ পরিচয় লাভের জন্য দূর অজানার পথে পাড়ি দিয়াছিলেন। ভাস্কো-ডা-গামা, কলম্বাস, লিভিংস্টোন, ক্যাপ্টেন কুক, মার্কো পোলো প্রমুখ দুর্বার পর্যটকগণের দুঃসাহসিক পর্যটনের ফলে আজ পৃথিবীর বহু দুর্গম দেশ-দেশান্তর মানুষের জ্ঞানের পরিধির মধ্যে আসিয়াছে। তাঁহাদের দুর্বার দেশ-পর্যটনের ফলে পৃথিবীর কত নামহীন গিরি-নদী আবিষ্কৃত হইয়া আজ মানুষের জ্ঞান-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়াছে।

দেশভ্রমণ-ব্যবস্থার উন্নতি

অতীতকালে দেশভ্রমণ ছিল অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আজ নানা পথ ও পরিবহণ প্রস্তুত হওয়ার ফলে দেশভ্রমণ হইয়াছে সহজসাধ্য। দেশ-দেশান্তরে রেলপথ বিস্তৃত হইয়াছে, প্রস্তুত হইয়াছে বিশালকায় সেতু। রেল, মোটর, এরোপ্লেন ইত্যাদির প্রচলনের ফলে পথের বাধা-বিপত্তি প্রায় উধাও। ভ্রমণ-ব্যাপারে সাহায্য করিবার জন্য এখন দেশে দেশে 'ট্যুরিস্ট ব্যুরো' স্থাপিত হইয়াছে। সেখানে দ্রষ্টব্য স্থান সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ, পথের বর্ণনা, মানচিত্র ইত্যাদি প্রকাশ করিয়া ভ্রমণার্থীদিগকে নানাভাবে সাহায্য করা হয়।

পারস্পরিক বোঝাপড়া : জাতীয় সংহতি ও সৌভ্রাত্রবোধের উন্মেষ

বর্তমান কালে দেশভ্রমণ শিক্ষার একটি অপরিহার্য অঙ্গরূপে স্বীকৃত। দেশ-দেশান্তরের ভৌগোলিক পরিস্থিতি, প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সেখানকার নরনারীদের জীবনাচরণের প্রত্যক্ষ জ্ঞান-লাভ দেশভ্রমণের মাধ্যমে সম্ভব হয়। আনন্দলাভই দেশভ্রমণের একমাত্র ফলশ্রুতি নয়, মনের প্রসারতা, হৃদয়ের ব্যাপ্তি ও সেই সঙ্গে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়া অখণ্ড সংহতি সৃষ্টিও দেশভ্রমণের অতি গুরুত্বপূর্ণ ফল। তাহা ছাড়া, ব্যবসা-বাণিজ্য-সংক্রান্ত জ্ঞানলাভও দেশভ্রমণের পরোক্ষ ফল। অন্যদিকে, ভ্রমণের মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যে একটা ভাবমূলক সংহতি গড়িয়া উঠে, তাহা জাতীয় সংহতির পক্ষে, মানবিক সৌভ্রাত্রবোধের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উপসংহার

দিনে দিনে সারা পৃথিবীতেই দেশভ্রমণ জনপ্রিয়তা অর্জন করিতেছে। রাষ্ট্রসংঘও দেশভ্রমণকে 'বিশ্বশান্তির ছাড়পত্র' [a Passport to World Peace] অভিহিত করিয়া বিশ্ববাসীকে দেশভ্রমণে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। তাই আজ পৃথিবীর দেশে দেশে লক্ষ-কোটি ভ্রমণ-বিলাসীর দল ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ইহা আনন্দের কথা। ইহাতে যেমন পারস্পরিক সহিষ্ণুতার ভাবটি জাগিয়া উঠিতেছে, তেমনি আমাদের অন্তরে গতির নেশা ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইতেছে। অজানিতের পথে পাড়ি দিবার জন্য দূর-দিগন্তে কে যেন ঘন ঘন হাতছানি দিয়া আমাদের ডাকিতেছে। 'উত্তর-মেরু মোরে ডাকে, ভাই, দক্ষিণ-মেরু টানে।' আমরা কি চক্ষুকর্ণ দুইটি ডানায় ঢাকিয়া ঘরে বসিয়া থাকিতে পারি?

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- দেশভ্রমণের উপকারিতা, মা. '৬১, '৬৬
- শিক্ষার অঙ্গরূপে দেশভ্রমণ
- দেশভ্রমণের শিক্ষাগত মূল্য

প্রবন্ধ-সূত্র : সূচনা। গ্রন্থাগার ভাব-চিন্তার যোগ-মিলনের সেতু॥ গ্রন্থাগারের সুবিধা॥ গ্রন্থাগারের আদিম অবস্থা॥ প্রাচীনকালের গ্রন্থাগার॥ গ্রন্থাগার ধ্বংসের অপকীর্তি। গ্রন্থাগারে জাতির পরিচয়। ভারতে গ্রন্থাগার। বরোদার গ্রন্থাগার॥ উপসংহার॥

গ্রন্থাগার

গৌ. প্রা. '৮২

সূচনা

'মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমন্ত শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই কারাগারের তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর-আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন তুষারের মধ্যে যেমন কত শত বন্যা বাঁধা পড়িয়া আছে, তেমনি এই পুস্তকাগারের মধ্যে মানব-হৃদয়ের বন্যা কে বাঁধিয়া রাখিয়াছে?'—রবীন্দ্রনাথ

গ্রন্থাগার ভাব-চিন্তার যোগ-মিলনের সেতু

গ্রন্থাগার অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের যোগ-মিলনের সেতু। নদীর স্রোতের মতো জ্ঞান-প্রবাহ দেশ-দেশান্তর ও যুগ-যুগান্তরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া চলে। এক হৃদয়ের ভাবরাশি নিঃশব্দে সঞ্চারিত হইয়া যায় হৃদয়ান্তরে। গ্রন্থাগার তাই লক্ষ-কোটি মানুষের নীরব আলাপনের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। এখানে চিন্তাবিদ্ পায় চিন্তার খোরাক এবং নানা দুরূহ জিজ্ঞাসার উত্তর, ভাবুক পায় ভাবরসের সন্ধান। হৃদয় ও মনের ক্ষুন্নিবৃত্তির এমন বিপুল আয়োজন আর কোথায় আছে? গ্রন্থাগার, বলা যায়, ভাব-তৃষিত ও জ্ঞান-পিপাসু সহস্র চিত্তের তৃপ্তি-সরোবর, তথা অমৃত-সরোবর।

গ্রন্থাগারের সুবিধা

জ্ঞান অজস্র, ভাবরাশিও অফুরন্ত। বিভিন্ন ভাব ও চিন্তা বিষয়ে রচিত হইয়াছে অসংখ্য পুস্তক। কোন একজন ব্যক্তির পক্ষে সেই সকল গ্রন্থ সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। গ্রন্থাগার বহু মানুষের যৌথ প্রতিষ্ঠান। সেখানে বহুর প্রয়াসে সংগৃহীত বহু গ্রন্থ পাঠের সুযোগ মেলে। তাহা ছাড়া, গ্রন্থাগার হইতে বালক, বৃদ্ধ, যুবক—সকলেই নিজ নিজ রুচি-অনুযায়ী সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ে গ্রন্থ লইয়া পাঠ করিতে পারেন।

গ্রন্থাগারের আদিম অবস্থা

গ্রন্থাগারের ইতিহাস অতি প্রাচীন। সভ্যতার আদিম প্রত্যূষেই মানুষের মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল অদম্য জ্ঞান-পিপাসা। সেই জ্ঞান-পিপাসার তীব্র তাগিদে শুরু হইয়াছিল জ্ঞান-চর্চা। ভারতে অতি প্রাচীনকালে সেই জ্ঞান-চর্চার ফসল বেদের আকারে সমাহৃত হইয়াছিল। 'বেদ' কথার একটি অর্থ 'জ্ঞান', অন্য অর্থ 'শ্রুতি'। যখন লেখার অক্ষর আবিষ্কৃত হয় নাই, যখন আবিষ্কৃত হয় নাই গ্রন্থ-রচনার অমূল্য কৌশল, তখন কেবল মানুষের স্মরণ-শক্তিকে আশ্রয় করিয়া চলিত জ্ঞান-চর্চা ও তাহার মূল্যবান আদান-প্রদান।

মানুষের স্মরণ-শক্তিতেই ছিল জ্ঞানের অবস্থিতি। শ্রুতিধর পণ্ডিতরাই ছিলেন সেদিনের জ্ঞানাধার। শিষ্য-পরম্পরায় সেই সকল জ্ঞান যুগ-যুগান্তরে, দেশ-দেশান্তরে প্রবাহিত হইয়া যাইত। পথের দুঃখ-কষ্ট ও দৈব-দুর্বিপাক তুচ্ছ করিয়া জ্ঞানের মধু আহরণের জন্য দেশ-দেশান্তর হইতে আসিতেন জ্ঞান-পিপাসু পরিব্রাজকের দল। তাঁহারা নানা বিষয়ে জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া সানন্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতেন। এইভাবে গ্রন্থাগার সৃষ্টির পূর্বে জ্ঞানের ধারা সীমিতভাবে হইলেও দেশ-দেশান্তরে, যুগ-যুগান্তরে প্রবাহিত হইয়া যাইত। ইহাতে পথ-ক্লেশ ছিল, ছিল আকস্মিক বিপৎপাত। গ্রন্থাগার তাহা দূর করিয়া বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডারকে আমাদের ঘরের দুয়ারে আজ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে।

তারপর অক্ষর আবিষ্কৃত হইল। কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে মানব-মনের অসংখ্য ভাব-চিন্তা বাঁধা পড়িল। রচিত হইল গ্রন্থ। তালপত্রে ও ভূর্জপত্রে হস্তলিখিত গ্রন্থ রচিত হইল। কিন্তু ইহাদের অচিরস্থায়িত্ব সকলকে চিন্তিত করিল। আসিল পশুচর্ম। পশুচর্মে অক্ষরের শৃঙ্খলে জ্ঞান-সম্ভারকে বন্দী করা হইল। প্রাচীন মিশর 'প্যাপিরাস'-এর পাতা জোড়া দিয়া কাগজ প্রস্তুত করিয়া জ্ঞান-সংরক্ষণের পদ্ধতি আবিষ্কার করিল। পরে কাগজ আবিষ্কৃত হইল এবং কাগজে গ্রন্থ রচিত হইতে লাগিল।

প্রাচীনকালের গ্রন্থাগার

সর্বপ্রথম গ্রন্থাগার স্থাপনের কৃতিত্ব রোম দেশের। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে সর্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞান-বিস্তারকল্পে সেই গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। তাহা ছাড়া ভারতবর্ষ, চীন, তিব্বত, মিশর ও ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশে প্রাচীন গ্রন্থাগারের নিদর্শন আছে। প্রাচীন ভারতের নালন্দা ও বিক্রমশীলার গ্রন্থাগার ছিল বিখ্যাত। হিন্দু দেব-মন্দির ও বৌদ্ধমঠ ছিল জ্ঞানচর্চার পীঠস্থান। বারাণসীতেও ছিল বিশাল গ্রন্থাগার। বিদ্যোৎসাহী শ্রীহর্ষের ছিল এক বিপুলায়তন গ্রন্থাগার।

কিন্তু মুসলমান আক্রমণ ও তাহাদের ধ্বংসলীলার কবল হইতে ভারতের গ্রন্থাগারগুলি রক্ষা পায় নাই। নির্মমভাবে সেগুলি ধ্বংস করিয়া তাহারা কত মূল্যবান গ্রন্থ যে লেলিহান অগ্নিশিখায় সমর্পণ করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইংরেজরা কোন গ্রন্থাগার নষ্ট হইতে দেয় নাই। বরং লুপ্ত গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার আবিষ্কারে উৎসাহ দান করিয়া এবং বর্তমান গ্রন্থাগারগুলির সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া তাহারা ভারতের জ্ঞান-চর্চার দ্বার মুক্ত রাখিয়া গিয়াছে। কিন্তু মুসলমানেরা এদেশের গ্রন্থাগারগুলির ধ্বংস-সাধন করিয়া এদেশে জ্ঞান চর্চার দ্বার চিররুদ্ধ করিয়া দিতে চাহিয়াছিল।

গ্রন্থাগার ধ্বংসের অপকীর্তি

সোমনাথ মন্দিরের গ্রন্থাগারের ধ্বংস-সাধন সুলতান মামুদের দুরপনেয় অপকীর্তি। বারাণসীর গ্রন্থাগারের ধ্বংস-সাধন মুসলমান আক্রমণের আর একটি কলঙ্ক-চিহ্ন। নালন্দা ও বিক্রমশীলার বিখ্যাত গ্রন্থাগারগুলিও তাহাদের আক্রমণ হইতে রক্ষা পায় নাই। গ্রন্থ ছিল বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নিকট প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর। তাই মুসলমান আক্রমণ হইতে গ্রন্থগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া নালন্দা-বিক্রমশীলা মহাবিহারের ভিক্ষুগণ মূল্যবান্ বহু গ্রন্থ নেপাল ও তিব্বতে লইয়া যান। নেপালের রাজ-গ্রন্থাগারে সেই গ্রন্থগুলি আজও সসম্মানে রক্ষিত আছে। মুসলমানদের এই গ্রন্থাগার-ধ্বংসের অপকীর্তি ভারতের

ব...রহিয়াছে। আলেকজান্দ্রিয়া, বাগদাদ ও সেকেন্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার ধ্বংস সাধনের কলঙ্ক-কালিমা আজও ইতিহাস বিস্মৃত হইতে পারে নাই।

সেই সকল গ্রন্থাগারে বহু মূল্যবান পুস্তক স্থান পাইয়াছিল সত্য, কিন্তু জনসাধারণের জন্য তাহাদের দ্বার কোনকালেই উন্মুক্ত ছিল না। স্মরণীয় যে, গ্রন্থাগার সভ্যতার প্রতীক-চিহ্নস্বরূপ। কোন সভ্যতার অগ্রগতির প্রকৃত পরিচয় তাহার গ্রন্থাগারেই পাওয়া যাইবে। যে জাতির সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার নাই, সে জাতি অন্ধ। গ্রন্থাগার সার্বজনীন পাঠশালা। এখানে সকল মানুষের অবাধ আমন্ত্রণ। বিদ্যার শ্রেণীবদ্ধ উপচার সাজাইয়া গ্রন্থাগারগুলি জ্ঞান-পিপাসুদের জ্ঞান-তৃষ্ণা দূর করিবার জন্য দেশ-দেশান্তরে পবিত্র মন্দিরের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে।

গ্রন্থাগারে জাতির পরিচয়

দিল্লীতে সম্রাট হুমায়ুনের ছিল বিখ্যাত গ্রন্থাগার। কিন্তু ভারতে আধুনিক গ্রন্থাগার সূচিত হইয়াছে ইংরেজ আমলে। স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে ইংরেজদের অনুকরণে গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। স্কুল-কলেজের গ্রন্থাগারগুলি ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সর্বসাধারণের জন্য স্থাপিত গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে রামমোহন লাইব্রেরী, চৈতন্য লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, এশিয়াটিক সোসাইটি, বিশ্ব-ভারতী গ্রন্থাগার বিখ্যাত। তাহা ছাড়া, বহু বিখ্যাত ব্যক্তিদের গৃহে ছিল বহু মূল্যবান গ্রন্থ-সংগ্রহ। ইংরেজ-আমলে স্থাপিত ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী স্বাধীন ভারতে 'জাতীয় গ্রন্থাগার' নামে ওয়ারেন্ হেস্টিংসের বাসভবনে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

ভারতে গ্রন্থাগার

সুষ্ঠুভাবে গ্রন্থাগার পরিচালনা একটি দায়িত্বপূর্ণ কাজ। অন্যান্য বিষয়ের মতো গ্রন্থাগার-পরিচালনা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে আজ স্বীকৃত। ভারতের মধ্যে বরোদাই গ্রন্থাগার পরিচালনায় সমধিক অগ্রসর। সেখানকার পাঠক-সমাজের দায়িত্বশীলতা অভিনন্দনযোগ্য। সেখানে আছে ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার, যাহার অভাব ভারতে বিশেষভাবে অনুভূত হয়। গ্রামে গ্রামে ইহার পুস্তক লেনদেনের দৃষ্টান্ত সমগ্র ভারতের অনুকরণযোগ্য।

বরোদার গ্রন্থাগার

অতীতের কোলে যে সমস্ত মনীষীবৃন্দের কণ্ঠ চিরদিনের মতো নীরব হইয়া গিয়াছে, যাঁহাদের জ্ঞানালোকিত সান্নিধ্য লাভের আর উপায় নাই, গ্রন্থরাজির মাধ্যমে আমরা তাঁহাদের লেখনী-নিঃসৃত বাণীময় জগতের সহিত পরিচিত হইতে পারি। স্বাধীন ভারতে কেন্দ্রীয় তত্ত্বাবধানে দেশময় গ্রন্থাগারের একটি জাল বিস্তৃত হওয়া উচিত, যাহাতে গ্রাম ও শহর বাঁধা পড়িবে, যাহাতে ধনী-দরিদ্র সকলের থাকিবে প্রবেশের সমান অধিকার॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- পুস্তকাগার
- পাঠাগার
- সাধারণ পাঠাগার

সময়ের মূল্য

মা. '৫৭, '৭৩

প্রবন্ধ-সূত্র : সূচনা। সময় অনন্ত, কিন্তু জীবন ক্ষুদ্র, তাই সময় মূল্যবান। সময় অমূল্য। সময়ের অবহেলাই সময়ের অপচয়। সময়ের মূল্যবোধের অর্থ। উপসংহার।

অনন্ত প্রসারিত সময়ের পথ। পথিক-মানুষ সময়ের সেই পথ-রেখা ধরিয়া অগ্রসর হয়। সময়ের ন্যায় মানব-জীবন যদি অন্তহীন হইত, তবে মানুষের দুঃখ থাকিত না। সময় নিরবধি, কিন্তু মানব-জীবন সংক্ষিপ্ত। এইখানেই গরমিল। মানুষ চায় তাহার সংক্ষিপ্ত জীবনায়তনের মধ্যে বহুতর কর্মের উদ্‌যাপন। কিন্তু সময় তাহা মঞ্জুর করে না। কর্ম-উদ্‌যাপনের পূর্বেই তাহার বিদায়ের ডাক আসিয়া পড়ে।

সূচনা

মানুষের কাছে সময় তাই অমূল্য ধন। 'সময় চলিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায়।' বাস্তবিকই, নদীর স্রোতের ন্যায় সময়ও সদা অস্থির। প্রবহমানতাই তাহার মৌল বৈশিষ্ট্য। কোথাও সে স্থির থাকে না, কাহারও জন্য সে অপেক্ষা করে না— 'চরৈবেতি চরৈবেতি—' চলো, চলো, চলো—অনাহত রবে ছুটিয়া চলাই তাহার মর্মবাণী। মানুষের জীবনও সেই চলার ছন্দে সুর বাঁধিয়াছে। সময়ের অন্তহীন প্রবাহে সে ছুটিয়া চলিয়াছে জন্ম হইতে মৃত্যুর অভিমুখে।

সময়ের এই ধাবমানতার জন্যই জীবন মানুষের কাছে পরম মূল্যবান। সময় অনন্ত, কিন্তু জীবন সীমাবদ্ধ। তাহার এক প্রান্তে জন্ম, অন্য প্রান্তে মৃত্যু। এই জন্ম ও মৃত্যুর শাসনে জীবন সদা-সঙ্কুচিত। মানুষ চায় সময়ের অন্তহীনতার মতো অন্তহীন জীবন কিন্তু পায় না। তাহাই মানব-জীবনের চরম ট্র্যাজেডি। তাই কবি সুইনবার্ন বলিয়াছেন—'His life is a vision or a watch between a sleep and a sleep.' দুই প্রান্তেই ঘুম, ঘুমের মতো অন্ধকার। মাঝখানে শুধু একটুখানি চোখ মেলিয়া চাওয়াই জীবন। জীবনের এই সীমাবদ্ধতার জন্য বাংলার লোককবিও অশ্রু বিসর্জন করিয়াছেন—'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর।' এক পারে জন্ম, অন্য পারে মৃত্যু; মাঝখানে সংক্ষিপ্ত, সীমাবদ্ধ জীবন। জীবনের এই সীমাবদ্ধতার জন্যই সময় এত মূল্যবান। সময় অনন্ত, কিন্তু জীবন তাহার অতি সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র। তাই তো জীবন আমাদের নিকট পরম আদরণীয় এবং আমাদের নিকট অমূল্য ও আকর্ষণীয়।

সময় অনন্ত, কিন্তু জীবন ক্ষুদ্র, তাই সময় মূল্যবান

সময়ের চলমানতার জন্যই তাহা মানব-জীবনের একটি সম্পদ। সদা-চঞ্চল সময় কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। অর্থবান লোকেরা ইচ্ছামতো জগতের যে-কোন দ্রব্য ক্রয় করিতে পারেন। কিন্তু সময়কে ক্রয় করা যায় না। সময় মানুষের সকল ক্রয় ক্ষমতার ঊর্ধ্বে। পার্থিব জগতের সমস্ত কিছুকে অনায়াসে উদ্ধত অবহেলা করিয়া সময় বাধাবন্ধনহারারূপে ছুটিয়া চলিয়া যায়। তাহার কোন কিছুর প্রতি আসক্তি নাই, নাই অহেতুক আকর্ষণ। শুধু চলা,—চলা,—চলা। তাহার এই নির্মম নিষ্ঠুর চলার জন্যই তো সময় এমন [illegible]

সময় অমূল্য

জীবনের এই সীমাবদ্ধ অবসরে সময়ের যে ভগ্নাংশটুকু পাওয়া যায়, তাহার সদ্ব্যবহারের মাধ্যমেই জীবন সার্থক এবং সুখময় হইয়া উঠে। কাজেই, জীবনের সীমায়তনের মধ্যে যে পরম মূল্যবান সময় আমরা পাই, তাহার যদি অবহেলা করি, যদি আলস্যভরে সেই দুর্লভ সময় কাটাইয়া দিই, তাহা হইলে তাহা হয় সময়ের অপচয় মাত্র। সেই অপচয়ের বেদনা আমাদের জীবনে একদিন মর্মান্তিক দুঃখের আকারে নামিয়া আসিবে। তখন বুক-ফাটা আর্তনাদে কিংবা অজস্র অশ্রুবর্ষণে কিংবা অনুতাপের অন্তর্দাহে সেই আলস্যে-অতিবাহিত সময় আর ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না।

সময়ের অবহেলাই সময়ের অপচয়

আসল কথা হইল, সময়ের যথার্থ মূল্যবোধই জীবনে সাফল্য অর্জনের সোপান। সময়ের মূল্যবোধ হইল, যে সময়ের যে কাজ, তাহা সেই সময়ে সম্পাদন করা। যে তাহা করে না, সে করে সময়ের অমর্যাদা; পরাজয়ই হয় তাহার জীবনের ভাগ্যলিপি। সময়ের এই অবহেলার জন্য ভবিষ্যতে তাহাকে কাঁদিতে হইবে। যে কৃষক ফসলের ঋতুতে ফসলের বীজ বপন না করিয়া আলস্যে সময় অতিবাহিত করে, সে কিরূপে ফসল উঠিবার সময় খামার-পূর্ণ ফসল আশা করিবে? ফসল উঠিবার সময় ফসলের বীজ বপন করিলে তো আর চলিবে না? সময় চলিয়া গিয়াছে, ফসলের ঋতু কবে সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। এখন কাঁদিয়া কিছু হইবে না। মানব-জীবনেও সেই এক কথা। জীবনে যখন শক্তি থাকে, সামর্থ্য থাকে, তখন আলস্যে অযথা কালহরণ করিয়া জীবন কাটাইলে জীবন-সায়াহ্নে অবশ্যই দুঃখ-ভোগ করিতে হইবে।

সময়ের মূল্যবোধের অর্থ

শৈশবই কর্ম-জীবনে প্রবেশের তোরণ-দ্বার। এই সময়ই জীবনের প্রস্তুতির কাল। ভবিষ্যৎ কর্ম-জীবনে সকল দায়িত্বভার বহনের যোগ্যতা এই সময়েই অর্জন করিতে হইবে। শৈশবকালের প্রতিটি মুহূর্তকে যথাযথভাবে ব্যবহার করিলে এবং অমূল্য সময়ের অপচয় না করিয়া প্রতিটি দুর্লভ মুহূর্তকে জীবনক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলে পরবর্তী কালে সুখ ও শান্তি—দুই-ই পাওয়া যাইবে। শৈশবেই আমাদের উপলব্ধি করিতে হইবে যে, সময় অমূল্য রতন। সেই অমূল্য রতন রহিয়াছে আমাদের সকলের অধিকারে। তাহাকে কাজে লাগাইতে পারিলেই হইবে তাহার পরম সদ্ব্যবহার। আবাল্য অভ্যাসের দ্বারাই দুর্লভ সময়ের সেই সদ্ব্যবহার আয়ত্ত করা যায়; সেই অভ্যাসের ফলে জীবনে আসে সময়ানুবর্তিতা। সময়ানুবর্তিতাই জীবনে সাফল্য লাভের চাবিকাঠি এবং সময়ানুবর্তিতার মাধ্যমে কল্যাণপূত কর্মেই জীবনের চরম সার্থকতা॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- সময়ের সদ্ব্যবহার, মা. '৫৭
- সময়ানুবর্তিতা, মা. '৭৩
- 'জীবনের মূল্য আয়ুতে নহে, কল্যাণপূত কর্মে।'

৩১.

পরিশ্রমের মর্যাদা

উ. মা. '৬১, '৬৩; গো. প্রা. '৬৩

প্রবন্ধ-সূত্র : সূচনা। পরিশ্রম : ভাগ্য-রচনা ও প্রতিভার বিকাশ। পরিশ্রম বিশ্ব-জননীর পূজার উপচার। পরিশ্রম-ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ, জাতিভেদের কুফল। শ্রমিক-লাঞ্ছনা। উপসংহার।

পরিশ্রমই বর্তমান দুনিয়ার সংগ্রামের প্রধানতম হাতিয়ার। বর্তমানের পৃথিবী সংগ্রামময়। সংগ্রাম ভিন্ন এই পৃথিবীতে জয়লাভের দ্বিতীয় পন্থা নাই। অতএব সংগ্রামই শক্তি এবং পরিশ্রম সেই সংগ্রামের রূপকার। বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার এই চরম সমুন্নতির দিকে তাকাইয়া আমরা মাঝে মাঝে বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া যাই। সভ্যতার এই চরম বিকাশের মূলে রহিয়াছে যুগ-যুগান্তরের লক্ষ-কোটি মানুষের অফুরন্ত শ্রম। বহু মানব তাহাদের বহু দিবসের শ্রম তিলে তিলে দান করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে সভ্যতার এই তিলোত্তমা মূর্তি। তাহাদের নাম ইতিহাসে লেখা নাই। তাহারা পাহাড় ভাঙিয়া পথ প্রস্তুত করিয়াছে, সেতু-বন্ধনে বাঁধিয়াছে নদীর উভয় তটভূমিকে, নির্মাণ করিয়াছে প্রাসাদ-অট্টালিকা। কেহ ফলাইয়াছে সোনার ধান, কেহ বুনিয়াছে লজ্জা-নিবারণের বস্ত্র, কেহ-বা জীবনকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করিয়া তুলিবার জন্য রচনা করিয়াছে সৌন্দর্য-বিলসিত, শিল্প-সৌকর্যময় নানা দ্রব্য-সামগ্রী। সকলের পরিশ্রমের যৌথ প্রয়াসে সভ্যতার এই অনবদ্য বিকাশ সম্ভব হইয়াছে। সভ্যতা তাই মানুষের যুগ-যুগান্তরের পরিশ্রমের সম্মিলিত যোগফল।

সূচনা

মানুষ একদিকে যেমন সভ্যতার স্রষ্টা, অন্যদিকে সে তেমনি আপন ভাগ্যের কারিগর। নিজের ভাগ্যকে মানুষ নিজেই নির্মাণ করিতে পারে। তাহার ভাগ্য-নির্মাণের হাতিয়ার হইল তাহার পরিশ্রম। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আছে সুপ্ত প্রতিভা। পরিশ্রমের দ্বারাই সেই সুপ্ত প্রতিভা জাগরিত হইতে পারে। পৃথিবীতে যে সব ব্যক্তি প্রতিভাবান বলিয়া স্মরণীয় ও বরণীয় হইয়া আছেন, তাঁহারা আশৈশব করিয়াছেন কঠোর পরিশ্রম এবং তাহার ফলে তাঁহাদের প্রতিভা পুষ্পের মতো বিকশিত হইয়া পৃথিবীকে সৌরভ বিতরণ করিয়াছে। পরিশ্রমের অভাবে তাঁহাদের সেই প্রতিভা কখনও বিকশিত হইতে পারিত না। পরিশ্রম ভাগ্য-গঠনের বড়ো হাতিয়ার।

পরিশ্রম : ভাগ্য-রচনা ও প্রতিভার বিকাশ

পৃথিবীর সকল কার্য-সম্পাদনে পরিশ্রম প্রয়োজন। পরিশ্রম ব্যতীত কোন কাজই সম্পাদিত হইতে পারে না। আর, সকল কাজই পৃথিবীর কাজ—বিশ্ব-জননীর পূজার আয়োজন। পৃথিবীতে স্ব-স্ব শক্তি-অনুযায়ী সকল কাজই মানুষের করণীয়। তাহাতে কাজের যেমন কোন জাতিভেদ নাই, যাহারা সেই কাজ করে, তাহাদেরও কোন জাতিভেদ নাই। সুতরাং পরিশ্রমের মাধ্যমে জগতের যে কাজ সংসাধিত হয়, তাহা আর কিছু নয়, বিশ্ব-জননীর পূজা। পরিশ্রম হইল বিশ্ব-জননীর তথা মানব-সভ্যতার সেই পূজার উপচার।

পরিশ্রম বিশ্ব-জননীর পূজার উপচার

মানুষ এই পৃথিবীতে সমাজ রচনা করিয়াছে। সমাজের উন্নতি-বিধানের জন্য সকল মানুষেরই পরিশ্রম করা উচিত। কিন্তু সকল মানুষের পক্ষে সমাজের সকল কাজই করিয়া উঠা সম্ভব নয়। তাহাতে সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। সেই সামাজিক বিশৃঙ্খলা পরিহার করিবার জন্য মানুষ করিয়াছে কার্যের শ্রেণী-বিভাগ। তাহারই পরিণামে সমাজে আসিয়াছে ঘৃণ্য জাতিভেদ-প্রথা। ভারতের মতো পৃথিবীর কোন দেশেই এই কর্ম-ভিত্তিক, শ্রম-ভিত্তিক জাতিভেদ-প্রথা ছিল না। কিন্তু তাহাতে মানুষকে করা হইয়াছে ঘৃণা, মানবতার ঘটিয়াছে চরম অপমান। তাই জাতিভেদ লইয়া পৈশাচিক উল্লাস ভারতবর্ষের মতো পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় নাই।

পরিশ্রম-ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ, জাতিভেদের কুফল

সমাজের উচ্চস্তরের মানুষ যাহারা, তাহারা লইয়াছে সম্মানের কাজ, গৌরবের কাজ। সমাজের সমস্ত সুখ-সুবিধা আপনাদের কুক্ষিগত করিয়া তাহারা তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মানুষকে নিক্ষেপ করিয়াছে অপমান, ঘৃণা ও বঞ্চনার নীরন্ধ্র অন্ধকারে। অথচ সেই শ্রমিকেরা চিরকাল 'অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের সমুদ্র-নদীর ঘাটে ঘাটে' বীজ বুনিয়াছে, পাকা ধান কাটিয়াছে। তাহারা ধরিত্রীর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া সোনার ফসল ফলাইয়াছে, তাঁতী বসিয়া তাঁত বুনিয়াছে, জেলে ধরিয়াছে মাছ। 'বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার, তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।' অথচ তাহারাই পায় নাই যথার্থ মানুষের সম্মান।

শ্রমিক-লাঞ্ছনা

যুগের পর যুগ চলিয়া গিয়াছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হইয়া গিয়াছে। শত শত সাম্রাজ্যের ধ্বংস স্তূপের উপরে শ্রমিক-দুনিয়ার মানুষ সভ্যতার বেদীমূলে অকাতরে তাহাদের শ্রম ঢালিয়া দিয়া নীরবে চিরকাল কাজ করিয়া আসিয়াছে। তাহাদের কর্মের জয়োল্লাসে মুখরিত পৃথিবীর পথ-প্রান্তর। কত রাজ্য-ভাঙ্গাগড়া হইয়া গিয়াছে, পৃথিবীতে ঘটিয়াছে কত সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন। কিন্তু তাহারা 'যেই তিমিরে, সেই তিমিরে।' আজ পৃথিবীতে নবযুগ আসিয়াছে। শ্রমিক-স্বার্থ আজ দিকে দিকে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়ায়, কম্যুনিস্ট চীনে শ্রমিক-সমাজ আজ রাষ্ট্র-পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। ব্রিটেনেও রহিয়াছে শ্রমিক দল। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব পরিচালনার ক্ষমতা রহিয়াছে তাহাদেরও। ভারতেও এখন সেই পুরাতন সমাজ ভাঙিয়া নূতন সমাজ-বিন্যাসের কাজ শুরু হইয়াছে। জাতিভেদ-প্রথা এখন অতীত ইতিহাসের বিষয়। তাহা ছাড়া, ভারতে অনেক শ্রমিক-কল্যাণ সমিতিও স্থাপিত হইয়াছে। আজ ভারতে কোন কাজ, কোন পরিশ্রমই আর ঘৃণ্য নয়। পরিশ্রমের গৌরব আজ বিঘোষিত হইতেছে দিকে দিকে।

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- শ্রমের মূল্য
- শ্রমের মর্যাদা, উ. মা. [কম্পার্ট.] '৬১, '৬৩ ; গৌ. প্রা. '৬৩

প্রবন্ধ-সূত্র ঃ সূচনা। ক্রিকেট খেলার ইতিহাস। সরঞ্জাম ও ক্রীড়া-বিধি। ক্রিকেটের পোশাক ও ক্রীড়ার আনুপূর্বিক অনুষ্ঠান। খেলার আরম্ভ ও খেলার নিয়ম। আউট-বিধি। ক্রিকেট-জগৎ। ক্রিকেট-জগতে ভারত। উপসংহার।

৩২. খেলার রাজা ক্রিকেট

খেলার রাজা ক্রিকেট ; আবার রাজার খেলা ক্রিকেট। ক্রীড়া-জগতে ক্রিকেটের স্থান সর্বোচ্চে ; তেমনি ক্রিকেট খেলার ব্যয়-বাহুল্য এবং ক্রীড়া-পরিধির দীর্ঘায়ত ব্যাপ্তি ইহাকে রাজকীয় মর্যাদা দান করিয়াছে। আভিজাত্যের জলুসে এবং চিত্তহারী চমৎকারিত্বের আকর্ষণে এই খেলার বুঝি তুলনাই নাই। ক্রিকেটের স্বভাব-ধর্মে আছে যে গৌরবজনক অনিশ্চয়তা, তাহাতে ইহার আকর্ষণীয়তা বৃদ্ধি পাইয়াছে সমধিক। তাহাছাড়া, এই খেলার নিয়ম-কানুনের এত কড়াকড়িরও তুলনা নাই। আবার, এই খেলা উপভোগের জন্য হাতে অফুরন্ত অবকাশ এবং আর্থিক সচ্ছলতার বিশেষ প্রয়োজন। তাই ক্রিকেট যেমন খেলার রাজা, তেমনি রাজার খেলাও বটে।

সূচনা

এই খেলার জন্মভূমি ইংলণ্ড। ইংরেজ জাতির উদ্ভাবনী শক্তিতে ইহার উদ্ভব, তাহাদের উৎসাহে ইহার বিকাশ, তাহাদের বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য-বিস্তারে ইহার প্রচার এবং খেলার উন্নত ক্রীড়াশৈলীতে ইহার শ্রেষ্ঠতা। উনবিংশ শতাব্দীতে এবং বিংশ শতাব্দীর পূর্বাহ্নে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত হইয়াছিল। পৃথিবীর যেখানেই ইংরেজ জাতি গিয়াছে, সেখানেই সে তাহার এই গৌরবজনক ক্রীড়ার জাতীয় ঐতিহ্যকে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে। আজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কিন্তু বিভিন্ন দেশের মধ্যে সেই ক্রীড়ার গৌরবময় ঐতিহ্য এখনও অক্ষুণ্ণ আছে।

ক্রিকেট খেলার ইতিহাস

পূর্বে এই খেলার পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল একটু অদ্ভুত ধরনের। উপকরণগুলিও ছিল অদ্ভুত আকৃতির। ক্রমে বিবর্তিত হইয়া তাহাদের রূপ-পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এক জোড়া ব্যাট্, ছয়টি স্টাম্প ও বল—ক্রিকেট খেলার ইহাই সরঞ্জাম। বৃত্তাকার মাঠের কেন্দ্রে বাইশ গজ সুনির্মিত জমি—ক্রিকেটের পরিভাষায় ইহার নাম 'পীচ'। পীচের উভয় প্রান্তে 'বেল্'-নিবদ্ধ তিনটি করিয়া স্টাপ প্রোথিত থাকে। এক প্রান্তের স্টাম্পের সম্মুখে ব্যাট্স্‌ম্যান 'ব্যাট্' করেন এবং অন্য প্রান্তে প্রতিপক্ষের বোলার করেন 'বল'। বল পড়ে, ব্যাট্ নড়ে। চলে ব্যাট্ ও বলের লড়াই। উভয়ে উভয়ের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিবার জন্য করেন প্রাণপণ প্রয়াস। ব্যাট্স্‌ম্যান বলকে বাউণ্ডারীর বাহিরে পাঠাইয়া 'রান' তুলিবার চেষ্টা করেন। অন্যদিকে, বোলার-সমেত মোট এগারোজন ফিল্ড্‌স্ম্যান তাঁহাকে আউট্ করিবার জন্য ওত পাতিয়া থাকেন। মাত্র কয়েক ফুট পিছনে থাবা পাতিয়া থাকেন উইকেট-কীপার তাঁহাকে 'স্টাম্প-আউট্' করিবার জন্য।

সরঞ্জাম ও ক্রীড়া-বিধি

নির্ধারিত সময়ের পূর্বে কালো প্যান্ট্, শাদা আলখাল্লার মতো জামা এবং মাথায় টুপি পরিয়া দুইজন আম্পায়ার মাঠে উপস্থিত হইয়া পীচের উভয় প্রান্তে 'উইকেট' রচনা করিয়া দেন। ক্রীড়ারম্ভের সংকেতমাত্র উভয় পক্ষের ক্যাপ্টেন বা স্কীপার প্যাভিলিয়ান বা শিবির হইতে বাহির হইয়া আসেন। তাঁহাদের পরনে শাদা ফুলপ্যান্ট্, পায়ে কেড্স, গায়ে শাদা ফুলশার্ট, মাথায় ক্যাপ। খেলা আরম্ভ হইবার আগে তাঁহারা পীচ পরীক্ষা করিয়া উইকেটটিকে ভালো করিয়া দেখিয়া যান। উইকেটের চরিত্র দেখিয়াই তাঁহারা বোলিং বা ব্যাটিং-এর ধারা নির্ধারিত করিয়া লইতে পারেন। তারপর 'টস্' করিয়া স্থির হয়, কোন্ পক্ষ আগে ব্যাটিং করিবেন কিংবা কোন্ পক্ষ ফিল্ডিং করিবেন।

ক্রিকেটের পোশাক ও ক্রীড়ার আনুপূর্বিক অনুষ্ঠান

'টসে' বিজয়ী দলের দুইজন ব্যাট্স্ম্যান 'ওপেনার' হিসাবে ব্যাট করিতে নামেন। তাহাদের ক্রীড়া-নৈপুণ্যের উপর সমস্ত খেলাটির ভাগ্য নির্ভর করে। তাঁহারাই ইনিংসের গোড়াপত্তন করেন। প্রতিপক্ষের ক্যাপ্টেন নির্দিষ্ট বোলারের হাতে বল দিয়া বিশেষ কৌশলে আক্রমণ রচনা করিবার নির্দেশ দেন। বিধি-বহির্ভূত বল হইল 'নো বল'। পীচে বল পড়িবামাত্র উইকেটটিকে আড়াল করিয়া ব্যাট্স্ম্যান্ বল মারিয়া 'রান' তুলিতে থাকেন। বল হয় নানা ধরনের—ফাস্ট, স্পিন, ইন্সুইং, গুগ্লি, অফ্ব্রেক, ইয়র্কার, বাম্পার ইত্যাদি। ব্যাট করার ভঙ্গিও নানা প্রকারের—ড্রাইভ, সুইপ্, স্ট্রোক ইত্যাদি।

খেলার আরম্ভ ও খেলার নিয়ম

বোলার করিবেন ব্যাট্স্ম্যানকে আউট্ করিবার চেষ্টা; আর, ব্যাট্স্ম্যান উইকেট রক্ষা করিয়া চেষ্টা করিবেন বলকে সীমানার বাহিরে পাঠাইয়া রানের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে। এইভাবে খেলা বেশ জমিয়া উঠে। প্রতিপক্ষের এগারোজন খেলোয়াড় বিভিন্ন স্থানে শিকারী বাঘের মত ওত পাতিয়া থাকেন। তাঁহারা বলকে সীমানার বাহিরে যাইতে না দিয়া রান রক্ষা করিবেন কিংবা মাটি ছুঁইবার আগে শূন্যে বলটি ধরিয়া ব্যাট্স্ম্যানকে 'ক্যাচ্-আউট্' করিবার চেষ্টা করিবেন। ক্যাচ্-আউট্ ছাড়া আছে বোল্ড্-আউট্, রান-আউট্, লেগ-বিফোর উইকেট, স্টাম্প-আউট ইত্যাদি। প্রথম ইনিংসে দ্বিতীয় পক্ষ যদি প্রথম পক্ষের অপেক্ষা দুইশত রান কম করেন, তাহা হইলে অসম্মানজনক 'ফলো-অন্' করিতে বাধ্য হন।

আউট-বিধি

ক্রিকেট-জগৎ ইংলণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ্, ভারত, পাকিস্তান, নিউজিল্যাণ্ড, শ্রীলঙ্কা ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ্ই ছিল সাম্প্রতিক ক্রিকেট-জগতে দুর্ধর্ষ দল। এখন অস্ট্রেলিয়া। ভারতের জাতীয় ক্রিকেটে রন্জি ট্রফির প্রতিযোগিতা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় হইয়া উঠে আন্তর্জাতিক টেস্ট খেলাগুলি। উন্নত ক্রীড়াধারা, প্রতিযোগিতার তীব্রতা এবং জাতীয় মর্যাদা-বোধের সংমিশ্রণে সেই খেলাগুলি অত্যন্ত উপভোগ্য হইয়া উঠে। ভারতীয় ক্রিকেটে রণজিৎ সিংজী, লালা অমরনাথ, বিজয় হাজারে, সি. কে. নাইডু, বিজয় মার্চেন্ট প্রভৃতির নাম স্মরণীয় হইয়া আছে। বিশ্ব-ক্রিকেটে ডন ব্র্যাড্ম্যান, ওরেল—ইঁহারা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। বর্তমান

ক্রিকেট-জগৎ

ক্রিকেট-বিশ্বে যাঁহারা ক্রিকেটকে উজ্জ্বল ও উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গত ওরেল সর্বাগ্রগণ্য। তিনিই ক্রিকেটকে অপমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়া সাবলীল ও প্রাণবন্ত করিয়া গিয়াছেন।

ক্রিকেট-জগতে ভারত সম্পর্কে ইংলণ্ডের উন্নাসিকতা ছিল প্রচুর। তাহাদের মনোভাবের সমুচিত জবাব তাহারা পাইয়াছে দুইবার—১৯৬১ সালে ও ১৯৬৩ সালে। দুইবারই তাহারা ভারত-ভ্রমণে আসিয়া পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হয়। এমন-কি, ১৯৬০ ও ১৯৬৪ সালে ভারত দুর্ধর্ষ অস্ট্রেলিয়া দলকেও পরাস্ত করিয়া তাহাদের বিশ্বজয়ী গৌরব ম্লান করিয়া দিয়াছে। ১৯৬৬-৬৭ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ্ ভারত-ভ্রমণে আসে। তাহাতে দুইটি টেস্টে ভারত পরাজিত হয় এবং তৃতীয় টেস্টে গৌরবদীপ্ত জয়ের পথে অগ্রসর হইলেও শেষ পর্যন্ত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ্ দলের দৃঢ়তায় খেলাটি অমীমাংসিতভাবে সমাপ্ত হয়। কারণ, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ্ তখন বিশ্ববিজয়ী, 'ব্যাটিং' এবং 'বোলিং' উভয় দিকেই প্রচণ্ড শক্তিশালী। ১৯৬৭ সালে ভারত ইংলণ্ড ভ্রমণে গিয়া সব কয়টি টেস্টেই পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু

ক্রিকেট-জগতে ভারত

—ভারতীয় স্কুল-ক্রিকেট দল ইংলণ্ডের মাটিতে যে গৌরবদীপ্ত জয়ের স্বাক্ষর রাখিয়া আসে, তাহাতে বিশ্ব চমৎকৃত হইয়া যায়। এদিকে, ১৯৬৭-৬৮ সালে ভারতীয় ক্রিকেট দলের অস্ট্রেলিয়া-সফর কেবল পরাজয়ের গ্লানিতেই পূর্ণ হইয়া উঠে। ১৯৬৯-৭০ সালে অস্ট্রেলিয়া ভারত-সফরে আসিয়া 'রাবার' জয় করিয়া লইয়া যায়। ইতিমধ্যে ভারতীয় ক্রিকেটের অধিনায়কত্ব মনসুর আলি পতৌদির হাত হইতে আসে সুযোগ্য অধিনায়ক ওয়াদেকারের হাতে। তাঁহার নেতৃত্বে ভারতীয় দল ১৯৭১ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ্ ও ইংলণ্ড সফরে অর্জন করিয়াছে 'রাবার' লাভের দুর্লভ গৌরব। তারপর ১৯৭২-৭৩ সালে ইংলণ্ড দল ভারত-সফরে আসে এবং ভারত তাহাতে তাহার বিজয়ীর গৌরব অম্লান রাখে। কিন্তু ১৯৭৪ সালে ভারতীয় দলের ইংলণ্ড সফর পরাজয়ের গ্লানিতে ভরা। এদিকে ১৯৭৪-৭৫ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ্ দলও ভারত-সফরে আসিয়া 'রাবার' লইয়া ঘরে ফেরে। ইতিমধ্যে ওয়াদেকারের অবসর গ্রহণের পর বিষেণ সিং বেদী দল-নায়ক নির্বাচিত হইয়াছেন।

এখন পৃথিবীতে সকলেই 'ব্রাইট' ক্রিকেট খেলার পক্ষপাতী। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ্ দলের ওরেলই ছিলেন এই 'ব্রাইট' খেলার একজন প্রধান প্রবক্তা। বর্তমানে ভারতীয় দল 'ব্যাটিং', 'বোলিং' এবং 'ফিল্ডিং'-এ ধীরে ধীরে শক্তি অর্জন করিতেছে। ক্রিকেট ভারতের জাতীয় খেলা নয়, তবু ভারত

উপসংহার

ইহাতে পৃথিবীর শক্তিশালী দলগুলির সমীহ আদায় করিতে সক্ষম হইতেছে. ইহা নিঃসন্দেহে ভারতের পক্ষে পরম গৌরবের বিষয়॥

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- ক্রিকেট খেলা
- ক্রিকেটে ভারতের স্থান

প্রবন্ধ-সূত্র : সূচনা। জীবনে শরীর-চর্চার প্রয়োজনীয়তা। স্বাস্থ্য সুখলাভের প্রথম শর্ত। স্বাস্থ্যই দ্বন্দ্ব-সংঘাত জয়ের শ্রেষ্ঠ আয়ুধ। জীবনে প্রতিযোগিতায় জয়লাভের প্রধান উপায়। শরীর-চর্চার দিক্-দিগন্ত। উপসংহার।

শরীর-চর্চা ও খেলাধুলা

মা. '৬৯

"চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু, সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট।" —রবীন্দ্রনাথ

সূচনা

শরীরই সর্বস্ব। শরীরই মানুষের প্রথম পরিচয়। এই শরীর লইয়াই মানুষ পৃথিবীতে আসে। কাজেই, জীবন-পথে তাহার পরিক্রমণের প্রধান অবলম্বন হইল এই শরীর। শরীরই হইল তাহার ভেলা। তাহাতে চড়িয়াই সে জীবন-সমুদ্র সাবলীলভাবে অতিক্রম করিবে। সেজন্য চাই সুস্থ, সবল নীরোগ শরীর। ধনৈশ্বর্য নয়, বিষয়-আশয় নয়; শরীরই সব। শরীরই সুখ, শরীরই সম্পদ।

জীবনে শরীর-চর্চার প্রয়োজনীয়তা

কবি তাই বলেন—'চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু, সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট।' সংসার-যাত্রায় আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু কাম্য। কিন্তু তাহা লাভের প্রকৃষ্টতম পন্থা হইল সুস্থ, সবল ও নীরোগ শরীর-গঠন। শরীর-চর্চাই হইল গোড়ার কথা। শরীর-চর্চা বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যলাভের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। সেই বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যই জীবনে সাফল্য লাভের প্রধানতম হাতিয়ার। মানবজীবনে সাফল্য লাভের জন্য মানুষকে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হয়। বহু দুঃখ-দহন ও কষ্ট-সহনের পরিণামে একদিন মানুষের কপালে জোটে সাফল্যের বিজয়-তিলক। দুর্বল ও রুগ্‌ণ শরীরের অধিকারী যাহারা, তাহাদের দ্বারা সম্ভব নয় কষ্টসাধ্য কর্মের উদ্‌যাপন; সাফল্যের অমৃত-ভাগ তাই তাহাদের ভাগ্যে দুর্লভ।

স্বাস্থ্য সুখলাভের প্রথম শর্ত

মানুষ মাত্রেই সুখের প্রত্যাশী। সুখের অন্বেষণে সে জীবনের পথে-প্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়। সুস্থ শরীরই সেই সুখলাভের প্রথম শর্ত। অসুস্থ শরীর যাহাদের, রোগ-যন্ত্রণায় যাহারা সর্বদা কাতর, তাহারা প্রকৃতই হতভাগ্য। কারণ তাহারা জীবনে দুর্লভ সুখের আস্বাদন করিতে পারিল না। জীবনে যাহারা সুখের মুখ দেখিল না, তাহাদের জীবন ব্যর্থ। আবার, সুস্থ ব্যক্তির কাছে যাহা সুখ, অসুস্থ ব্যক্তির কাছে তাহাই চরম অসুখের কারণ। কাজেই, সুখ ব্যক্তি-সাপেক্ষ এবং স্বাস্থ্য সুখলাভের প্রধানতম উপকরণ।

স্বাস্থ্যই দ্বন্দ্ব-সংঘাত জয়ের শ্রেষ্ঠ আয়ুধ

অপর পক্ষে, জীবন-পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়; যন্ত্রণাজর্জর, কণ্টকাকীর্ণ। এখানে পদে পদে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর হাতছানি। প্রাকৃতিক বিরুদ্ধ শক্তি এবং রোগ-তাপ-জরা জীবনের অস্তিত্বকে নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য নিয়ত গোপন চক্রান্তে লিপ্ত। সেই চক্রান্তকে পরাস্ত করিয়া জীবনের ললাটে জয়টিকা পরাইবার শ্রেষ্ঠ উপায় হইল শরীর-চর্চা। স্বাস্থ্যই পৃথিবীতে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও মৃত্যুর চক্রান্ত-বিজয়ের একমাত্র আয়ুধ।

শত্রুর আক্রমণে পর্যুদস্ত হয় তখন সমগ্র জাতি স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া স্বদেশের ও স্বজাতির মানমর্যাদা-রক্ষাকল্পে রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিবার জন্য দলে দলে ছুটিয়া যায়। তখন মনে হয় 'নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।' দেশ-দেশান্তরের ইতিহাসই তাহার সাক্ষী। দলে দলে অকাতরে প্রাণ বলি দিতে গিয়া কোন কোন দেশ অবীরা হইয়াছে এবং মহিলারা জহর-ব্রত অনুষ্ঠান করিয়াছে কিংবা জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিয়াছে। ভারতের রাজপুতানার এইরূপ স্বদেশপ্রেমের কথা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে।

স্বদেশপ্রেমের উন্মেষ

প্রকৃতপক্ষে, দেশপ্রেমের উদ্ভব আত্মসম্মান-বোধ হইতে। যে জাতির আত্মসম্মান-বোধ যত প্রখর, সেই জাতির স্বদেশপ্রেম তত প্রবল। স্বদেশপ্রেম একপ্রকার পরিশুদ্ধ ভাবাবেগ। নিঃস্বার্থ হিংসাবিহীন দেশপ্রেমই প্রকৃত স্বদেশপ্রেম। ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র-স্বার্থের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বৃহত্তর স্বার্থের দিকে যখন মন পরিচালিত হয়, যখন আত্মকল্যাণ অপেক্ষা বৃহত্তর কল্যাণবোধ সক্রিয় হইয়া উঠে, তখন জ্বলিয়া উঠে স্বদেশপ্রেমের নিষ্কলুষ প্রদীপশিখা। স্বদেশের মান-মর্যাদা, তাহার গৌরব-খ্যাতি-রক্ষাকল্পে কত অমর প্রাণ শহীদ হইয়াছে। স্বদেশ-প্রেমিকের দেশসেবার পথে বাধা অনেক, অত্যাচার সীমাহীন। কিন্তু পথের ঝড়ঝঞ্ঝা-বজ্রপাত তাহাদের দৃঢ় বলিষ্ঠ পদক্ষেপের নিকট মিথ্যা প্রমাণিত হইয়া যায়। পরদেশী শাসকের রক্তচক্ষু কিংবা উদ্যত অস্ত্র তাহাদের নিবৃত্ত করিতে পারে না। রাণা প্রতাপসিংহ, ছত্রপতি শিবাজী, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, বীর সূর্য সেন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রমুখ স্বদেশপ্রেমিকদের জীবনে লক্ষ্য করা যায় স্বদেশ-প্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

স্বদেশপ্রেমের প্রকৃত স্বরূপ

স্বদেশপ্রেম দেশ ও জাতির গৌরবের বস্তু, পরম শ্লাঘার বিষয়। কিন্তু অন্ধ স্বদেশ-প্রেম ধারণ করে ভয়ঙ্কর রূপ; জাতিতে জাতিতে সংঘাত ও সংঘর্ষ অনিবার্য করিয়া তুলে। অন্ধ স্বদেশপ্রেম কেবল স্বদেশের কথাই চিন্তা করে। আমার স্বদেশের জয়গান গাহিতে গিয়া যদি অপরের স্বদেশপ্রেমকে আহত করি, তবে সেই অন্ধ স্বদেশপ্রেম বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে ডাকিয়া আনে ভয়াবহ রক্তাক্ত দ্বন্দ্ব-সংঘাত। মানুষের বক্ষ-ক্ষরিত রক্ত-পিচ্ছিল পথে চলিতে থাকে উগ্র দেশপ্রেমের নৃশংস অভিযান। হিটলারের জার্মানি এবং মুসোলিনীর ইতালি উগ্র জাতীয়তার সেই নগ্ন বীভৎস প্রকাশের মধ্য দিয়া সেদিন বিশ্ব-মানবতার বক্ষে পদস্থাপনে উদ্যত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ এই উগ্র এবং অন্ধ জাতীয়তার ছিলেন ঘোর বিরোধী। যখন পাশ্চাত্য দেশগুলি অন্ধ জাতীয়তার মোহে উন্মত্ত হইয়া পরস্পর হানাহানিতে ব্যস্ত, তখন রবীন্দ্রনাথ তাহার উগ্র ছিন্নমস্তা রূপের সমালোচনা করিয়া ও সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়া অনেকের বিরাগভাজন হন।

অন্ধ স্বদেশপ্রেমের ছিন্নমস্তা রূপ

আসল কথা, স্বদেশপ্রেমের সহিত বিশ্বপ্রেমের কোন পার্থক্য নাই। স্বদেশপ্রেম বিশ্বপ্রেমেরই নামান্তর। স্বদেশ, বলাবাহুল্য, বিশ্বেরই অন্তর্ভুক্ত। স্বদেশের মধ্য দিয়া পৃথিবীর সহিত আমাদের পরিচয় ঘটে। আমরা স্বদেশকে ভালোবাসিয়া তাহার

পদমূলে যে পূজা নিবেদন করি, তাহা বিশ্ব-দেবতার পদতলে গিয়া পৌঁছায়। কাজেই, স্বদেশপ্রেম, বলা যায়, বিশ্বপ্রেমের প্রথম সোপান। স্বদেশপ্রেমের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই আমরা বিশ্বপ্রেমের জগতে উপনীত হই। স্বদেশবাসীকে ভালোবাসিতে পারিলে আমরা বিশ্ববাসীকেও ভালোবাসিতে পারি। আবার, যে স্বদেশবাসী, সে বিশ্ববাসীও বটে। কাজেই, স্বদেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেমের উৎস এক ও অভিন্ন।

স্বদেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেম

জাতীয়তা ও স্বদেশপ্রেম যখন সংকীর্ণতার অন্ধকূপে বন্দী হইয়া উগ্র ছিন্নমস্তা রূপ ধারণ করে, তখন বিশ্বপ্রেম পদদলিত হয়। স্বদেশকে একমাত্র পরম প্রিয় মনে করিয়া আমরা বিশ্বকে শত্রু মনে করি এবং উহাকে ধ্বংস করিবার জন্য ধাবিত হই। তখন শুভ বিচার-বুদ্ধি স্বদেশপ্রেমের অন্ধ আবেগে লুপ্ত হয়। ফলে, পরস্পর-হানাহানি এবং অবারিত রক্তক্ষয় অনিবার্যরূপে দেখা দেয়। আর, নানা মারণাস্ত্র আবিষ্করণের ফলে সেই হানাহানি অচিরেই চরম বিভীষিকাময় রূপ ধারণ করে। কাজেই, উগ্র জাতীয়তাবোধে কল্যাণ নাই। তাই রবীন্দ্রনাথ গাহিলেন :

রবীন্দ্রনাথের মতে : স্বদেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেমের মধ্যে সম্পর্ক

'ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা,
তোমাতে বিশ্বময়ীর—তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।'

দেশজননী ও বিশ্ব-জননী এক এবং অভিন্ন। কারণ, দেশজননীর বক্ষের উপরে বিশ্ব-জননীরও আঁচল পাতা। স্বদেশ ও বিশ্ব আমাদের ঐক্য-চেতনার এপিঠ আর ওপিঠ।

স্বদেশপ্রেম আমাদের অন্তরের জ্বলন্ত বহ্নিশিখা। সেই বহ্নিশিখায় হয় বিশ্ব-জননীর পূজার আরতি। য়ুরোপীয়দের আগমনের পূর্বে আমাদের স্বদেশপ্রেম ছিল অন্তর্লীন, ছিল সুপ্তিমগ্ন। পরে বিদেশীর নির্মম অত্যাচার ও ইংরেজ-বিদ্বেষের ফলে ঘটিল তাহার ঘনীভূত প্রকাশ। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসে আমরা দেশমাতৃকাকে ভাঙিয়া তিন টুকরা করিয়াছি, পূজার নামে করিয়াছি মাতৃ-বিগ্রহের অঙ্গচ্ছেদ। এ বেদনা কোথায় রাখিব? বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ কি এই মাতৃ-বিগ্রহ কল্পনা করিয়াছিলেন? ক্ষুদিরাম-প্রফুল্ল চাকীর দল কি এই মাতৃ-মূর্তি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করিয়াছিল? আমাদের স্বার্থ-বুদ্ধি মাতৃ-বিগ্রহকে যে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়াছে, এই আত্মগ্লানির হাত হইতে আমাদের আর মুক্তি নাই॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- স্বদেশপ্রেম
- স্বদেশপ্রীতি
- স্বদেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেম
- 'দেশের কুকুর ধরি বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া'

প্রবন্ধ-সূত্র : সূচনা। পুরীর পথের অভিজ্ঞতা। পুরীর সমুদ্র-দর্শন। পুরীর মন্দির-দর্শন ও মন্দির-নির্মাণের ইতিহাস। অতীতের স্মৃতিচারণা। ওড়িশার মন্দির-নির্মাণ-রীতি। সমুদ্রতীরে সূর্যোদয়। উপসংহার।

৩৫

একটি ভ্রমণ-কাহিনী

যাত্রীদের তুমুল কোলাহলে ঘুম ভাঙিয়া গেল। জানিতে পারিলাম, আমরা আমাদের গন্তব্যস্থল পুরীতে পৌঁছিয়া গিয়াছি। ট্রেনের ভিতরে-বাহিরে কোলাহল ও কর্মব্যস্ততা সমানে চলিয়াছে। সদ্য-ঘুমভাঙা চোখে যাত্রী, পাণ্ডা, কুলি ও বাক্স পেট্‌রার দারুণ ভিড় দেখিয়া প্রথমতঃ দিশাহারা হইয়া পড়িলাম। ভিড় কমিলে ধীরে ধীরে প্ল্যাট্‌ফর্মে নামিয়া চারিদিকে চাহিলাম। ঘুম-জড়ানো চোখে যাহা কিছু দেখিলাম, তাহাই ভালো লাগিল। পুরী সম্বন্ধে অনেক পড়িয়াছি, শুনিয়াছি আরও অনেক। বহুদিন হইতে পুরী দেখিবার ইচ্ছা বড় প্রবল আকারে মনের মধ্যে আন্দোলিত হইতেছিল। আজ আর বইতে-পড়া কাহিনী নয়, অন্যের মুখে শোনা বর্ণনা নয়, নিজের চোখেই পুণ্যশ্লোক বহু মহাপুরুষের স্মৃতি-বিজড়িত পুরীতীর্থকে দেখিব ভাবিয়া মনে মনে উল্লসিত হইয়া উঠিলাম।

সূচনা

সাইকেল-রিক্‌শায় করিয়া প্রথমে হোটেলের সন্ধানে চলিলাম। পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে পিচের রাস্তা ধরিয়া দুইপাশে ঝাউগাছের সারির মধ্য দিয়া সাইকেল-রিক্‌শা ছুটিয়া চলিয়াছে। সম্মুখে পথ বাঁকিয়া গিয়াছে। কিন্তু যতদূর চোখ চলে চাহিয়া দেখিলাম, নীল আকাশ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়িল না। বিশাল নীল আকাশটা যেন বালির উপর আসিয়া হঠাৎ হুমড়ি খাইয়া পড়িয়াছে। সমুদ্র কোথায়, খুঁজিয়া পাইলাম না। রিক্‌শা-চালককে নির্বোধের মতো জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সমুদ্র কোথায় ?' রিক্‌শা-চালক সম্মুখের আকাশের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করিয়া বলিল, 'ওই ত।' এবার আসল কথাটা বলি। শহরে বাস করিয়া ইট-কাঠ-পাথরের আবেষ্টনী দেখিতেই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি। আকাশকে অধিকাংশ দিন দেখিতেই পাই না। আমার কাছে আকাশ যা, সমুদ্রও তাহাই। দুই ই অপার বিস্ময়। পুরীতে আসিয়া এই দুই মহাবিস্ময়ের মিলন দেখিয়া একেবারে দিশাহারা হইয়া গেলাম। কাছে আসিয়া দেখিতে পাইলাম, উত্তাল তরঙ্গমালা বালুকাময় বেলাভূমির কোল ঘেঁষিয়া উন্মত্ত নৃত্য করিতেছে। বুঝিতে পারিলাম, সমুদ্র ও আকাশ এখানে বিরাট্ ব্যাপ্তিতে একাকার হইয়া গিয়াছে। আকুল উৎসাহে কাছে ছুটিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। কিন্তু তখন হোটেলের চিন্তায় উদ্বিগ্ন। ট্রেনে শুনিয়াছি, হোটেলে স্থান পাওয়া দুষ্কর। যাহা হউক, পূর্ব হইতে হোটেল ঠিক করা ছিল বলিয়া কোন অসুবিধা হইল না।

পুরীর পথের অভিজ্ঞতা

পুরীর সমুদ্র দর্শন

বিকালে পুরীর যাহা কিছু দর্শনীয় আছে, তাহা দেখিবার জন্য বাহির হইয়া পড়িলাম। পুরীতে বহু ইতিহাস, জনশ্রুতি, কিংবদন্তী এবং অজস্র মন্দিরের ছড়াছড়ি।

বহু বিখ্যাত মঠ, মন্দির ও ধর্মশালা রহিয়াছে পুরীতে। যাহা পুরীধামের সর্বাপেক্ষা অধিক আকর্ষণীয়—জগন্নাথদেবের মন্দির, গম্ভীরা ও গুণ্ডিচা মন্দির—সেদিন এগুলি না দেখিয়াই ফিরিয়া আসিলাম। অতীতের বহু স্মৃতি-বিজড়িত, পরম আকর্ষণীয় সেই মন্দিরগুলি সেদিন না দেখিবার কারণ ছিল। আসলে ঐ মন্দিরগুলি দেখিবার জন্ত চাই ভিন্ন মানসিকতা, চাই অতীতের স্মৃতিচারণা। তাহা ছাড়া, একদিনে দর্শনীয় সেই মন্দিরগুলি দেখিয়া ফেলিলে হাতে অবশিষ্ট থাকিবে কি? আমি ধীরে-সুস্থে সব দেখিব বলিয়া সেদিন মনের অদম্য উৎসাহ অবদমন করিয়াছিলাম।

পুরীর মন্দির-দর্শন ও মন্দির-নির্মাণের ইতিহাস

পরদিন সকালে জগন্নাথদেবের মন্দির, গম্ভীরা ও গুণ্ডিচা মন্দির দেখিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। তুর্কী-আক্রমণের পূর্বেই জগন্নাথের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ইহার প্রতিষ্ঠাতা। অরণ্যভূমিতে শবর নামে অনার্যগণের দ্বারা পূজিত নীলমাধব বা জগন্নাথ-বিগ্রহকে তিনিই আনিয়া মন্দিরে স্থাপন করেন। ব্রাহ্মণ-পাণ্ডা পুরোহিত, কিন্তু সেই শবরের বংশধরদের দ্বারা পূজিত না হইলে জগন্নাথদেবের পূজা সম্পূর্ণ হয় না। এই রীতি উদার মানবতা ও শ্রেণী-সম্প্রীতির পরিচায়ক। শুধু তাহাই নয়, রথযাত্রার দিন রথের পুরোভাগে পুরীর রাজাকে সমবেত লক্ষ-লক্ষ যাত্রী ও দর্শক-সাধারণের সম্মুখে সম্মার্জনী হস্তে পথ মার্জনা করিয়া চলিতে হইবে। অদ্যাবধি এই রীতি সসম্মানে প্রতিপালিত হয়।

তারপর ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলার ছেলে নিমাই সমগ্র বাংলাদেশকে কাঁদাইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তাঁহার পুণ্য জীবনের দীর্ঘ আঠারো বৎসরের সাধনার ফল রাখিয়া গিয়াছেন এখানেই। নাটমন্দিরের প্রান্ত-দেশে যেখানে দাঁড়াইয়া তিনি জগন্নাথ-বিগ্রহের মূর্তি প্রত্যক্ষ করিতে করিতে ধ্যানস্থ হইতেন, সেই স্থানটি প্রত্যক্ষ করিলাম। বহু যুগের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া যেন মধ্যযুগের ইতিহাসের একটি অবিস্মরণীয় কক্ষে উপনীত হইলাম।

অতীতের স্মৃতিচারণা

মন্দিরের স্থাপত্য-রীতি ও উহার বিশালত্ব আমাকে বিস্মিত করিল। কিন্তু মন্দির-গাত্রে ধর্ম-বিদ্বেষী কালাপাহাড়ের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হইলাম। মন্দির হইতে বাহির হইয়া গম্ভীরায় গেলাম। সেখানে দেখিলাম শ্রীচৈতন্তের বহুস্পর্শ-বিজড়িত পবিত্র স্মৃতি। সেগুলি আজও সসম্মানে রক্ষিত দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। গম্ভীরা হইতে গুণ্ডিচা মন্দিরে গেলাম। সেখানে গুণ্ডিচা মাসীর মন্দির। একপাশে একটি মন্দিরে শূন্য বেদী। রথযাত্রার দিন জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা—এই তিন বিগ্রহ রথে করিয়া আনীত হইলে এই বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে।

শুধু পুরীর মন্দিরেই কেন, ওড়িশার যেখানে গিয়াছি, যে-কোন মন্দির প্রত্যক্ষ করিয়াছি—ওড়িশার প্রাচীনতম মন্দির ভুবনেশ্বর কিংবা পরিত্যক্ত মন্দির কোণারক—সব একই রীতিতে নির্মিত। ইহাদের স্থাপত্য-রীতি বা গঠন-কৌশল একই রকম। সেই রীতিটি হইল রথের রূপের অনুসারী। দূর হইতে মন্দিরগুলি এক-একটি রথের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। কোণারকের রথচক্রে এবং অশ্ববাহনে এই রীতি অত্যন্ত স্পষ্ট। এই রীতির আবির্ভাব

ওড়িশার মন্দির-নির্মাণ-রীতি

সম্ভবতঃ গণ-মানসে সপ্তাশ্ব-বাহিত রথে চড়িয়া সূর্যদেবের আকাশ-পরিক্রমার কল্পনা হইতে। সূর্যদেবতা সাত ঘোড়ার রথে চড়িয়া প্রত্যহ আকাশ-পরিক্রমায় যাত্রা করেন। এই সুপ্রাচীন গণ-কল্পনা হইতে মন্দিরগুলির রথানুসারী আশ্চর্য স্থাপত্য-রীতির উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হইল। পরে দক্ষিণ-ভারত পরিক্রমা করিয়া আসিয়াছি। পুরীর মন্দিরগুলির স্থাপত্য-রীতির সহিত সেখানকার মন্দিরগুলির স্থাপত্য-রীতির আংশিক সাদৃশ্য আছে। তবে মন্দিরময় ওড়িশা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে অধিক।

সমুদ্রতীরে আসিয়া যেন অনন্তকালের মধ্যে হারাইয়া গেলাম। সমুদ্রের অবিশ্রান্ত তরঙ্গ-নৃত্য দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেলাম। অনন্ত নীল জলরাশির অন্তহীন ফেনিল কলরোলে আমার সমস্ত চেতনা কেমন যেন আবিষ্ট হইয়া গেল। মনে হইল, দূরে কোথায় যেন এক মহাপূজার আয়োজন চলিয়াছে। সেখানে শতসহস্র শঙ্খ এক অনবদ্য ঐকতান সৃষ্টি করিয়া ধ্বনিত হইতেছে। এক আশ্চর্য অনুভূতির মধ্যে আমি মগ্ন হইয়া গেলাম। পরদিন প্রভাতে সূর্যোদয় দেখিতে গেলাম। সে এক অনির্বচনীয় দৃশ্য! পুরীর সমুদ্রোপকূলে সূর্যোদয়ের দৃশ্য সত্যই নয়নাভিরাম! গোলাপী রঙে চিত্রিত আকাশ ও সমুদ্রের সীমারেখায় রক্তবর্ণ সূর্যরশ্মির প্রথম আবির্ভাব।

সমুদ্রতীরে সূর্যোদয়

তারপর সিঁদুরের বিন্দুর ন্যায় ধীরে ধীরে সূর্যের আত্মপ্রকাশ। না, ঠিক সিঁদুরের বিন্দু নয়, একটি রক্তিম কলস যেন আকাশ ও সমুদ্রের সীমারেখায় ভাসিয়া উঠিল। আকাশে ও সমুদ্রে তখন রঙের ছড়াছড়ি। সেই রঙ গায়ে মাখিয়া আকাশের বুকে উড়িয়া চলিয়াছে সামুদ্রিক পাখিরা আর কাঠের ভেলার ডিঙি ভাসাইয়া উত্তাল তরঙ্গমালার বুকের উপর দিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে সমুদ্রের পরম প্রিয়পাত্র নুলিয়ারা। সমুদ্রতীরের বালিতে কুড়াইলাম ঝিনুক। কোন্ অদৃশ্য শিল্পী যেন সমুদ্র-গর্ভের নির্জনে আপন চিত্রশালায় বসিয়া ইহাদের গায়ে বিচিত্র রঙের নক্শা চিত্রিত করিয়া দিয়াছেন।

সূর্যাস্তের পূর্বে সমুদ্রোপকূলে ভিড় জমিতে আরম্ভ করে। ভ্রমণকারীদের অধিকাংশই বাঙালী। পুরী বাঙালীর কাছে পরম প্রিয় তীর্থস্থান। মনে পড়িল একটি কিংবদন্তীর কথা। ইহাতে বলা হয়, শ্রীচৈতন্য পুরীতে নীলাভ সমুদ্র-তরঙ্গকে নীলকান্ত শ্রীকৃষ্ণ কল্পনা করিয়া ভাব-বিহ্বল চিত্তে তাহাকে আলিঙ্গন করিতে গিয়া দেহত্যাগ করেন। অন্য একটি কিংবদন্তীতে বলা হয়, শ্রীচৈতন্য জগন্নাথ-মন্দিরে আরতি-কালে ভাব-তন্ময় হইয়া জগন্নাথ-বিগ্রহের সহিত বিলীন হইয়া যান। সে যাহাই হউক, শ্রীচৈতন্য যে পুরীধামেই দেহরক্ষা করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নাই। তাই পুরী বাঙালীর কাছে পরম পবিত্র ক্ষেত্র, বেদনার অশ্রুতীর্থ। তাই বোধ হয়, যেদিন পুরী ত্যাগ করিলাম, সেদিন কোন এক অজ্ঞাত কারণে চোখের কোণটি ভিজিয়া উঠিয়াছিল।

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- **একটি প্রসিদ্ধ স্থানে তোমার ভ্রমণ**
- **একটি দর্শনীয় স্থান ভ্রমণের কাহিনী**

প্রবন্ধ-সূত্র : সূচনা। স্মৃতিকথা : জন্ম-বৃত্তান্ত। বটগাছের শৈশব। বটগাছের যৌবনকাল। গ্রামের জীবন ও বটগাছের জীবন। গ্রামের ইতিহাস ও বটগাছ। উপসংহার।

একটি বটগাছের আত্মকাহিনী

আমি একটি বৃদ্ধ বটগাছ। তোমাদের যাওয়া-আসার পথের ধারে নির্বাকভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া রোজ তোমাদের গতিবিধি নিরীক্ষণ করি। তোমাদের পারস্পরিক কথোপকথনে, আচার-আচরণে আমি বড় আনন্দ পাই, আবার কখনও কখনও দুঃখও পাই। সে যাহাই হউক, আমার সব কথা গুছাইয়া বলিবার শক্তি নাই, তোমাদের মতো আমার হাঁটিবার শক্তিও নাই। তাহা ছাড়া, আমি বৃদ্ধ। চুল পাকিয়া সব জট পাকাইয়া গিয়াছে। আমার জটাজুট ঝুলিয়া পড়িয়া মাটি স্পর্শ করিয়াছে। বিশ্বাস কর, আমি খুব প্রাচীন লোক। জীবনে অনেক কিছু দেখিয়াছি, অনেক কিছু শুনিয়াছি। আমার শাখায়-শাখায় কতো কাহিনী, আমার পাতায়-পাতায় কতো কথা! সব জমিয়া আছে। তোমরা এসো, চুপ করিয়া বসো আমার কোলের কাছে। আমি তোমাদের মাথায় ছায়া বিছাইয়া দিব; আর, নিঃশব্দে শুনাইব আমার অনেক দিনের সঞ্চিত সুখ-দুঃখের অনেক কথা!

সূচনা

আমি অনেকদিনের লোক। আমার বয়স একশত বৎসর পূর্ণ হইল। চোখের সম্মুখে এতগুলি বৎসর দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল। কতো কি দেখিলাম, কতো কি শুনিলাম! সে সব কথা পরে বলিতেছি। এখন বলি, কি করিয়া আমি জন্মগ্রহণ করিলাম। পাশের গ্রামের পথের ধারে আমার মাকে দেখিয়াছ কি? গত উনপঞ্চাশের ঝড়ে আমার মাতা ঠাকুরাণী দেহত্যাগ করিয়াছেন। পাশের গ্রামের লোকেরা মাকে বড়ো ভালোবাসিত। তাহারা ফুল, বেলপাতা আর গঙ্গাজল দিয়া মায়ের পূজা করিত। আমি মায়ের শাখায় একদিন ফুল হইয়া জন্মিয়াছিলাম। তারপর একটি ফলের মধ্যে আমরা ভাইবোন মিলিয়া অনেকে জন্মিলাম। একদিন একটি টিয়াপাখি তাহার শক্ত ঠোঁটে আমাদের মায়ের কোল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া এখানে বহিয়া আনিল। টিয়াপাখি ফলটিকে খাইয়া ফেলিল, আমার সকল ভাইবোন তাহার উদরস্থ হইল। কেবল আমিই পথের প্রান্তে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিলাম।

স্মৃতিকথা : জন্মবৃত্তান্ত

দিন গেল, মাস গেল। আসিল বর্ষাকাল। বৃষ্টির ধারাজলে স্নান করিয়া আমি যেন নবজীবন লাভ করিলাম। একদিন বুকের মধ্যে অসহ ব্যথা অনুভব করিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া হইল অঙ্কুরোদ্গম। আমার সৌভাগ্য বলিতে হইবে, কোন গোরু বা ছাগল আমাকে সংহার করিবার জন্য আসিল না। আমি মনের আনন্দে হেলিয়া দুলিয়া দক্ষিণের বাতাসের সঙ্গে খেলা করিতে লাগিলাম। সূর্যের আলোতে এবং বৃষ্টি ও শিশিরে ধারা-স্নান করিয়া আমি বড় হইয়া উঠিতে লাগিলাম।

বটগাছের শৈশব

ক্রমে আমি যৌবনে পদার্পণ করিলাম। ধীরে ধীরে বেশ শক্ত সমর্থ স্বাস্থ্যবান্ হইয়া উঠিলাম। চারিদিকে সবুজ ছাতার মতো আমার ডালপালা মেলিয়া ধরিলাম। দেখিতে দেখিতে আমার চুলে জট ধরিল। আমাকে অনেকটা সন্ন্যাসীর মতো দেখিতে হইল। জানি না, আমার মনের ধর্মভাবের কথা পাখিরা কী প্রকারে জানিয়াছিল। দেখিলাম, দলে দলে নানা জাতের পাখি আসিয়া বাসা বাঁধিল আমার শাখায়। তাহারা বলিল, সকালে-সন্ধ্যায় তাহারা আমাকে গান শোনাইবে। আমি বলিলাম : উত্তম। কেন জানি না, শৈশব হইতে আমার হৃদয়ে ঈশ্বরভক্তি প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। পাখিরা সকালে এবং সন্ধ্যায় আমাকে ঈশ্বরের বন্দনাগীতি শোনায়। আমি শুনি এবং মনে মনে ভগবানকে প্রণাম করি।

বটগাছের যৌবনকাল

একদিন সকালে আমার পায়ের কাছে গ্রামের লোকেরা একটি মাটির বেদী নির্মাণ করিল। দেখিয়া আমার ভারি আনন্দ হইল। সেই আনন্দ কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠিল, যখন সন্ধ্যাবেলায় কথক ঠাকুর সেই বেদীতে বসিয়া পুরাণের কাহিনী শুনাইতে আরম্ভ করিলেন। আলো জ্বলিতেছে, একদিকে ধূপের ধোঁয়া উঠিতেছে। সম্মুখে গ্রামের বহু লোক। আমিও পুরাণের কাহিনী শুনিতাম। শুনিয়া হাসিতাম, কখনও কাঁদিতাম। সত্য কথা বলিতে কি, আমি গ্রামের জীবনের সঙ্গে যেন একেবারে মিশিয়া গিয়াছিলাম।

গ্রামের জীবন ও বটগাছের জীবন

এই জীবনে কত কী দেখিলাম! এই কিছুদিন আগেও গ্রামে সুখ-শান্তির অন্ত ছিল না। কিন্তু তারপর দেখিলাম, শ্বেতাঙ্গরা গ্রামে আসিতে শুরু করিল। কাগজের নোট দিয়া গ্রামের জিনিস সব কিনিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। আমার ভীষণ রাগ হইত। গ্রামের সব লইয়া গেলে গ্রামের লোকেরা কি খাইবে? তারপর শুনিলাম, তোমরা সেই শ্বেতাঙ্গদের তাড়াইবার জন্য চেষ্টা করিতেছ। কিন্তু তাহার আগেই দেখিলাম, গ্রামের যে হিন্দু-মুসলমান এতদিন ভাই-ভাইরূপে পাশাপাশি বসবাস করিতেছিল, তাহারাই হঠাৎ মারামারি করিতে লাগিল। অনেক রক্তপাত হইল, অনেকে প্রাণ হারাইল। কষ্টে আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। ইস্, ইহারা কী নির্বোধ!

গ্রামের ইতিহাস ও বটগাছ

তারপর দেশ স্বাধীন হইল। তোমরা অনেক রাস্তা বানাইতেছ, সেতু তৈয়ারী করিতেছ। আমার পায়ের কাছে একটা শানের বেদী তৈয়ারী করিয়া দিতে পার না? আমি আজ বৃদ্ধ! আর কতদিন বাঁচিব, জানি না। শুনিতেছি, তোমরা অনেক আত্মত্যাগী মহাপুরুষের জন্মশতবার্ষিকী পালন করিতেছ। যদিও আমার আত্মত্যাগ কিছুই নাই, তবু আমার বয়সও শতবর্ষ পূর্ণ হইল! তোমরা আমার শতবার্ষিকী পালন করিবে না?

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- একটি বটগাছের আত্মজীবনী
- একটি বটগাছের স্মৃতিকথা

প্রবন্ধ-সূত্র : সূচনা। আবির্ভাব। বাল্যকাল। ভক্তির উন্মেষ। সাধু-সঙ্গ। কলিকাতা আগমন। যাজকতা। ভবতারিণী দেবী-মন্দিরে পূজারীর ভূমিকা। ভাব-বিহ্বলতা। বিবাহ। ভক্তি-সাধনা। বেদান্ত-সাধনা। সাধনায় সিদ্ধিলাভ। শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃত-বাণী ও শিষ্য-সম্প্রদায়। মহাপ্রয়াণ। উপসংহার।

পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ

উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাতে আমাদের ধর্ম-বিশ্বাস, আচার-সংস্কৃতি, জ্ঞান-সাধনা ও কর্ম-সাধনায় আসিল অভাবনীয় রূপান্তর। বহুদিনের জড়তাগ্রস্ত, সুপ্তিমগ্ন সমাজ 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি'তে গতির আবেগে চঞ্চল হইয়া উঠিল। বাঙ্গালীর চিন্তায়, মনস্বিতায় আসিল অভূতপূর্ব পরিবর্তন। আসিল 'রেনেসাস্'। কিন্তু জ্ঞানের শুষ্ক বালুকারাশিতে বাঙ্গালীর হৃদয় পরিতৃপ্তি পাইল না। হৃদয় মনের শাসন মানিল না। বাঙ্গালীর পিপাসার্ত হৃদয় এমন এক মহামানবের আবির্ভাবের প্রতীক্ষা করিতেছিল, যিনি ভাবের বন্যায় বাঙ্গালীর মনোভূমিকে শ্যামল, সরস করিয়া তুলিবেন, যাঁহার স্পর্শে লোহাও সোনায় রূপান্তরিত হইবে, যিনি বহু মতের, বহু পথের সমন্বয়-সাধন করিয়া ধর্মের গণ্ডীকে মানবতার সুদূর জগতে প্রসারিত করিয়া দিবেন। তিনি আসিলেন—পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ।

সূচনা

'ওই মহামানব আসে—
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত্য ধূলির ঘাসে ঘাসে।
সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক
এলো মহাজন্মের লগ্ন—'

আবির্ভাব

হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রাম। নব-ভারতের তীর্থভূমি। ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে সেখানে জন্মগ্রহণ করিলেন নব-যুগের আধ্যাত্মিকতার মূর্ত বিগ্রহ গদাধর। গদাধর শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্য-নাম। শৈশবে গ্রামের পাঠশালায় হইল তাঁহার বিদ্যারম্ভ। কিন্তু সেই সীমাবদ্ধ কেতাবী বিদ্যা তাঁহার বিশাল মানসভূমিকে বাঁধিতে পারিল না। অনন্ত বিশ্বপ্রকৃতি—যাহা স্রষ্টার বিশ্ব-বিভূতি—তাহাই হইল তাঁহার শিক্ষানিকেতন। শৈশব হইতেই তাঁহার মেধা এবং উপলব্ধি-শক্তি ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। মূর্তি-রচনা, যাত্রা, গান, কথকতা ইত্যাদির প্রতি তাঁহার অস্বাভাবিক ঝোঁক ছিল এবং ভাব-তন্ময়তা ছিল তাঁহার আবাল্য প্রকৃতি। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি পুরাণ ও ধর্মগ্রন্থের প্রতি তাঁহার দেখা যাইত প্রগাঢ় অনুরাগ। কিন্তু সর্বোপরি, তাঁহার জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রকাশ পাইত এমন একটি সহজ অসাধারণত্ব, যাহা বিস্মিত করিত এবং সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত।

বাল্যকাল

ভক্তির উন্মেষ

কামারপুকুরে তাঁহাদের গৃহের পাশ দিয়া ছিল পুরী-যাত্রার হাঁটা-পথ। সেই পথে যে-সকল তীর্থযাত্রী সাধু-সন্ন্যাসী যাতায়াত করিতেন, তাঁহারা মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের গ্রামে বিশ্রাম গ্রহণ করিতেন। বাল্যেই তিনি সেই সব ধর্মপ্রাণ সন্ন্যাসীদের সহিত, তাঁহাদের ধ্যান-ধারণার সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। মনের মধ্যে ছিল ধর্ম-ভাবনার অমোঘ বীজ, অনুকূল পারিপার্শ্বিকতায় তাহা ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত, মুকুলিত হইতে লাগিল।

সাধু-সঙ্গ

বিদ্যায়তনিক লেখাপড়া গদাধরের হইল না। যিনি বিশ্বের অনাথ আতুরজনের জন্য মুক্তির বাণী বহন করিয়া আনিয়াছেন, তাঁহাকে বিদ্যালয়ের গতানুগতিক শিক্ষা বাঁধিবে কোন্ শক্তিতে? ইতিমধ্যে তিনি ধর্মের অমৃত-বাণী কণ্ঠে লইয়া জনগণের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তিনি গ্রামে গ্রামে যাত্রা-কথকতা করিয়া দিন কাটাইতেছেন শুনিয়া অগ্রজ রামকুমার যাজকতা-কার্যে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসিলেন।

কলিকাতা আগমন

কলিকাতায় আসিয়া গদাধরের পূজা-অর্চনা, স্তবপাঠ ইত্যাদিতে দেখা দিল আশ্চর্য ভাব-তন্ময়তা। কিন্তু শত চেষ্টা করিয়াও রাজকুমার তাঁহাকে শাস্ত্র-সম্মত যাজন-ক্রিয়া শিখাইতে পারিলেন না। হৃদয়হীন শাস্ত্রীয় পূজার্চনায় গদাধরের ছিল প্রবল অনীহা। যে পূজায় হৃদয়ের স্পর্শ নাই, নাই অন্তরের সহজ স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাকুলতা, সেই পূজার প্রতি গদাধরের কোনদিনই সমর্থন ছিল না। সম্পূর্ণ মন্ত্রহীন, ক্রিয়াহীন হইয়াও কেবল ভাবাকুতির দ্বারা দেবতাকে বুকের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

যাজকতা

ক্রমে গদাধর দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী বিগ্রহের বেশকারীর পদে নিযুক্ত হইলেন। সেই হইতে গদাধর ভাব-তন্ময় হইয়া দেবীর সাজসজ্জায় আত্মনিয়োগ করিতেন। দেবী যে প্রস্তরময়ী, ভক্তি-বিহ্বলতার প্রবল আবেগে তাহাও তিনি বিস্মৃত হইলেন। পরে রাজকুমারের মৃত্যুর পর গদাধর ভবতারিণী মন্দিরের পূজারীর পদে বৃত হইলেন। তাঁহার ভক্তিপ্লুত পূজা-নিবেদনের অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া সকলে বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গেল। এই সময় গভীর নিশীথে পঞ্চবটী বনের নিঃসঙ্গ নির্জনতায় তিনি ধ্যানস্থ হইতেন।

ভবতারিণী দেবী-মন্দিরে পূজারীর ভূমিকা

পূজার প্রচলিত শাস্ত্রীয় রীতি পরিত্যাগ করিয়া গদাধর যখন ভক্তি-ব্যাকুল কণ্ঠে স্তবপাঠ করিতেন, কিংবা গান করিতেন, কিংবা 'মা খাও', 'মা পর' বলিয়া নৈবেদ্য হইতে অন্ন তুলিয়া বিগ্রহের মুখের কাছে ধরিতেন, তখন অনেকের এই ধারণা হইল যে, তাঁহার বুঝি মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিয়াছে। ক্রমশঃ গদাধরের আর আনুষ্ঠানিক পূজা করিবার ক্ষমতা রহিল না। তিনি মাতৃধ্যানে সর্বদা তন্ময় হইয়া থাকিতেন এবং জীবজন্তু-মাত্রকেই 'মা'-'মা' বলিয়া তাহাদের গলা জড়াইয়া ধরিতেন। এইভাবে তিনি সর্বভূতেই মাতৃ-দর্শন করিতে লাগিলেন।

ভাব-বিহ্বলতা

এই সময় তাঁহার মাতা তাঁহাকে স্বদেশে ফিরাইয়া লইয়া গিয়া রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীশ্রীসারদামণির সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। কিন্তু গদাধর

পত্নীকেও মাতৃজ্ঞানে পূজা করিতে লাগিলেন। গদাধর কিছুদিন পরে আবার দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিলেন। এখানে একদিন ভাবাবেশে তন্ময় হইয়া তিনি গঙ্গাতীরে বসিয়া গান গাহিতেছেন, এমন সময় এক ভৈরবী সন্ন্যাসিনী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার মধ্যে মহাভাবের দিব্য আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া স্বয়ং সমস্ত উপকরণাদির আয়োজন করিয়া দিয়া ভক্তি-সাধন-মার্গে তাঁহাকে দিলেন পথ-নির্দেশ। তারপর আসিলেন পরম সাধক তোতাপুরী। তিনি তাঁহার গুরুপদে বৃত হইয়া তাঁহাকে দিলেন বৈদান্তিক সাধনায় দীক্ষা। যে বেদান্ত-সাধনায় মহাসাধক তোতাপুরীর লাগিয়াছিল সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর, গদাধর সেই দুশ্চর সাধনা মাত্র একদিনেই আয়ত্ত করিয়া লাভ করিলেন নির্বিকল্প সমাধি। আসল কথা, ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল; অপেক্ষা ছিল কেবলমাত্র বীজবপনের। সময়মত সেই বীজ উপ্ত হইল এবং স্বল্পকালের মধ্যেই ফলিল সাফল্য ও সিদ্ধির সোনার ফসল। তোতাপুরী বিস্মিত হইলেন। কামারপুকুরের গদাধর হইলেন বিশ্বের শ্রীরামকৃষ্ণ।

বিবাহ

ভক্তি-সাধনা

বেদান্ত-সাধনা

সাধনায় সিদ্ধিলাভ

অতঃপর তাঁহার সিদ্ধিলাভের কথা দিকে দিকে প্রচারিত হইয়া গেল। চুম্বকের আকর্ষণে লৌহখণ্ডের মতো বহু পিপাসিত চিত্ত ছুটিয়া আসিল দক্ষিণেশ্বরে। তিনি সকলকে পরম সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—'যত মত তত পথ।' সকল পথই গিয়া পৌঁছিয়াছে পরমেশ্বরের পদতলে। অন্ধকারে অজ্ঞানাবদ্ধ মানুষ পাইল আলোকের ঠিকানা, মুক্তি-পথের নির্দেশ। আসিলেন সিমলার দত্ত-পরিবারের নরেন্দ্রনাথ। তিনি এই পরশমণির স্পর্শে হইলেন জ্যোতির্ময় বিবেকানন্দ। তিনি সমগ্র বিশ্বে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী বহন করিয়া লইয়া গেলেন এবং শিবজ্ঞানে জীব-সেবার গুরু-নির্দেশকে মূর্ত করিয়া তুলিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের মাধ্যমে। ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দ। জগতের সকল পাপ আকণ্ঠ ধারণ করিয়া ক্যান্সার রোগে শ্রীরামকৃষ্ণ করিলেন মহাপ্রয়াণ।

শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃত-বাণী ও শিষ্য-সম্প্রদায়

মহাপ্রয়াণ

শ্রীরামকৃষ্ণ বাঙ্গালীর ভক্তি-সাধনার, এক কথায়, বাঙ্গালীর হৃদয়ের মূর্ত প্রতীক। খ্রীস্টধর্মের প্রবল বন্যায় যখন হিন্দুধর্মের ভিত্তি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল, যখন ভাঙ্গন ধরিয়াছিল মানুষের ঈশ্বর-বিশ্বাসে, যখন অজ্ঞান-তিমিরে পথের ঠিকানা হারাইয়া ফেলিয়াছিল সমগ্র জাতি, তখনই শ্রীরামকৃষ্ণ দেখাইলেন আলোকিত পথ, আসন্ন ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিলেন হিন্দু-সমাজকে। জীর্ণ প্রাচীন সমাজে সঞ্চারিত করিলেন নবজীবনের প্রাণোচ্ছ্বাস॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- **শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী**
- **ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ**
- **বাংলার প্রধান ধর্মগুরু**

প্রবন্ধ-সূত্র : সূচনা। জন্ম ও বংশ-পরিচয়। বাল্যকাল ও বিদ্যাশিক্ষা। কর্মজীবন। বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন ও বাল্য-বিবাহ নিবারণ। শিক্ষা-বিস্তার। দয়ার সাগর ও মাতৃভক্তি। সাহিত্য-কীর্তি। চরিত্র-সুষমা। উপসংহার।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

'বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে দীনের বন্ধু!'
—কবি শ্রীমধুসূদন

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাঙ্গালী জাতির নিকট একটি প্রাতঃস্মরণীয় নাম। শাস্ত্রীয় প্রাচীরের অচলায়তনের মধ্যে যখন সমগ্র সমাজের নাভিশ্বাস উঠিয়াছিল, তখন পৃথিবীর পশ্চিম দিগন্ত হইতে ছুটিয়া আসিল দুরন্ত পশ্চিমা ঝড়। সেই ঝড়ের আঘাতে আমাদের অন্ধকার অচলায়তনের রুদ্ধদ্বার খুলিয়া গেল। ঝড়ের অবসানে পশ্চিম আকাশ হইতে অফুরন্ত আলো আসিয়া গৃহের অভ্যন্তরে ছড়াইয়া পড়িল। সেই আলোতে আমরা দেখিলাম, কতকালের কত অর্থহীন জঞ্জাল আমাদের সমাজের আনাচে-কানাচে স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে। সেই কুসংস্কারের আবর্জনা-স্তূপ হইতে মুমূর্ষু সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য সর্বপ্রথম আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন কর্মবীর রামমোহন। তথাপি সমাজে জমিয়াছিল বহু অন্ধকার, জমিয়াছিল বহু দুঃখ, বহু ক্রন্দন। যিনি সেই পুঞ্জীভূত অন্ধকার, দুঃসহ বেদনা ও অসহায় ক্রন্দন সহৃদয়তার করস্পর্শে মুছাইয়া দিয়া সমাজের মুখে হাসি ফুটাইয়াছিলেন, তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

সূচনা

১৮২০ খ্রীস্টাব্দ। মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহের সিংহ-শাবক ঈশ্বরচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হইলেন। পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা ভগবতী দেবী। দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবার। দারিদ্র্য অনেক সময় মানুষের মনকে দুর্বল করিয়া দেয়, তাহার মেরুদণ্ডকে করিয়া দেয় নমনীয়। কিন্তু দারিদ্র্য তেজস্বী ঈশ্বরচন্দ্রের বলিষ্ঠ মানসিকতাকে দুর্বল করিতে পারে নাই। বরং দারিদ্র্যের সহিত সংঘাতে তিনি দুর্দমনীয় তেজস্বী এবং অনমনীয় জেদী হইয়া উঠিয়াছিলেন। শৈশবেই তিনি তাঁহার দুর্জয় জিদের জন্য পিতামাতার চিন্তার কারণ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

জন্ম ও বংশ-পরিচয়

বালক ঈশ্বরচন্দ্র অতি শৈশবেই গ্রামের চতুষ্পাঠীতে শিক্ষালাভ সমাপ্ত করিয়া দরিদ্র পিতার হাত ধরিয়া পদব্রজে শহর কলিকাতায় পাড়ি দিলেন। যে কলিকাতা একদা তাঁহার অক্লান্ত কর্মভূমি হইয়া উঠিবে এবং যেখান হইতে তাঁহার দুর্জয় সংগ্রামী শক্তি সারা ভারতকে একদা স্তম্ভিত করিয়া দিবে, সেই কলিকাতায় অত্যন্ত দীনভাবে শুরু হইল এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তানের শিক্ষা। আপন মেধা ও প্রতিভা-বলে তিনি দারিদ্র্যের সকল চক্রান্তকে পরাজিত করিয়া সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিলেন। অসীম ক্ষমতাবলে তিনি প্রতি বৎসরই প্রথম স্থান অধিকার ও বৃত্তিলাভ করিতে লাগিলেন। কঠোর পরিশ্রমে এই

বাল্যকাল ও বিদ্যাশিক্ষা

দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তানকে বাসার সকল কাজ স্বহস্তে সম্পাদন করিতে হইত। একদিকে অবর্ণনীয় দারিদ্র্য, অন্যদিকে অসাধারণ অধ্যয়ন-স্পৃহা। দারিদ্র্যের কশাঘাত তাঁহাকে বিদ্যার সাধনা হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। অসামান্য প্রতিভাবলে তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করিলেন। কেবল প্রাচ্য সংস্কৃত-বিদ্যাই নয়, পাশ্চাত্য ইংরেজি-শিক্ষার প্রতিও ছিল তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ। তাই সংস্কৃত কলেজে শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি স্বচেষ্টায় ইংরেজি শিক্ষাও তাঁহার চলিতেছিল। এইভাবে কঠোর অধ্যবসায় ও অমানুষিক পরিশ্রমের মধ্য দিয়া তাঁহার জীবনের প্রস্তুতি-পর্ব সমাপ্ত হয়।

কর্মজীবন

বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অধ্যাপকের পদে বৃত হইলেন। কিছুকাল পরে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ পরিত্যাগ করিয়া সংস্কৃত কলেজে যোগদান করেন। প্রথমে তিনি সহকারী সম্পাদকের পদ এবং পরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ লাভ করিলেন। সেই সঙ্গে স্কুল পরিদর্শকের অতিরিক্ত কার্যভারও গ্রহণ করিলেন। কিছুকাল পরে কর্তৃপক্ষের সহিত মতভেদ হওয়ায় তিনি কর্মত্যাগ করিয়া বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। এই সময় তিনি কঠোর পরিশ্রমে মেট্রোপলিটন্ কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন ও বাল্য-বিবাহ নিবারণ

ভারত-পথিক রামমোহন ভারতে সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ করিয়াছিলেন, ফলে, কৌলিন্য-প্রথা ও বহুবিবাহ-রীতির অনুগ্রহে সমাজে বিধবার সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছিল। ঘরে ঘরে বৈধব্যের কাতর ক্রন্দনে বিদ্যাসাগরের হৃদয় বিগলিত হইল, তিনি সমাজে বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের জন্য কৃত-সংকল্প হইলেন। 'সুরধনী যখন মর্ত্যে অবতরণ করে তখন কাহার সাধ্য যে সেই প্রবাহ রোধ করে?' দৃঢ় পদবিক্ষেপে অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য অগ্রসর হইয়া চলিলেন একক পথিক। তাঁহার প্রচেষ্টায় ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে বিধবা-বিবাহ বিধিবদ্ধ হইল। বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন তাঁহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ। বাল্য-বিবাহ নিবারণও তাঁহার অন্যতম কীর্তি।

শিক্ষা-বিস্তার

তিনি বুঝিয়াছিলেন, সমাজের যত অন্ধকার, যত দুঃখ, যত ব্যভিচার—তাহার মূলে আছে শিক্ষার অভাব। এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন জড়তাগ্রস্ত সমাজের পক্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষার গুরুত্ব কতখানি, তিনি তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। শিক্ষা-বিস্তারে তাঁহার অদম্য উৎসাহের মূলে ছিল তাঁহার সেই উপলব্ধি। দেশময় শিক্ষার জাল বিস্তার করিয়া দিবার মানসে তিনি নির্বিচারে দেশময় স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শিক্ষা বিস্তার ছিল তাঁহার সমাজ সংস্কারের প্রাথমিক সোপান। কেবল পুরুষদের মধ্যেই নয়, নারী-সমাজেও শিক্ষা-বিস্তারের জন্য ছিল তাঁহার সমান উৎসাহ। বহু বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনও তাঁহার অবিস্মরণীয় কীর্তি। শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি যে প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা সেকালের এক ব্রাহ্মণ-সন্তানের পক্ষে সত্যই বিস্ময়কর।

বাংলাদেশে বিদ্যাসাগরের প্রকৃত পরিচয় তাঁহার 'দয়ার সাগর' নামে। বিদ্যাসাগরের দয়ার তুলনা নাই। তাঁহার এই সীমাহীন দয়ার মূলে ছিল গভীর মানবতাবোধ ও পরদুঃখকাতরতা। জননী ভগবতী দেবীর নিকট হইতে তিনি এই গুণগুলি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার মাতৃভক্তি একটি প্রবাদের মর্যাদা লাভ করিয়াছে এবং এই মাতৃভক্তিই তাঁহাকে সকল বাধা-বিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া পরের দুঃখ-মোচনের প্রেরণা দান করিয়াছে।

দয়ার সাগর ও মাতৃভক্তি

বাংলা সাহিত্যও বিদ্যাসাগরের প্রতিভার নিকট গভীরভাবে ঋণী। 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি', 'বর্ণ পরিচয়', 'সীতার বনবাস', 'শকুন্তলা', 'ভ্রান্তিবিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থ কেবল প্রবহমান স্বতঃস্ফূর্ত গদ্যের দৃষ্টান্ত হিসাবেই নয়, শিল্প-সৌকর্যমণ্ডিত প্রাণোচ্ছল গদ্য-রূপেও সকলের হৃদয় হরণ করে। বর্ণ পরিচয়ের 'জল পড়ে পাতা নড়ে' [জল পড়িতেছে, পাতা নড়িতেছে ?]—রবীন্দ্রনাথের শৈশবের মেঘদূত; সীতার বনবাসের আলেখ্যদর্শন বর্ণনার চমৎকারিত্বে উজ্জ্বল: 'এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণগিরি। এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত সঞ্চরমান জলধরমণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত; অধিত্যকা প্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়।'

সাহিত্য-কীর্তি

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতো এমন দৃঢ় পুরুষকার চরিত্র, এমন সংগ্রামী বলিষ্ঠ চেতনা, যাহা কেবল পাশ্চাত্য দেশেই সম্ভব, তাহা এদেশে কিরূপে সম্ভব হইল, তাহা সত্যই বিস্ময়ের বিষয়। অথচ 'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন চরিতের প্রতি পাতাতেই দেখা যায় যে বিদ্যাসাগর কাঁদিতেছেন।' অর্থাৎ, তাঁহার মধ্যে কঠোরতা ও কোমলতার হইয়াছিল অপূর্ব ভাব-সম্মিলন।

চরিত্র-বৈভব

১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে জুলাই এই অজেয় পৌরুষ-শিখা চির-নির্বাপিত হইল। তাঁহার নির্ভীক চরিত্রের মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় ঋষির অভ্রান্ত প্রজ্ঞা, ইংরেজ সৈনিকের দুর্বার তেজস্বিতা এবং বাঙ্গালী জননীর স্নেহ-সুকোমল হৃদয়ের অপূর্ব সম্মিলন ঘটিয়াছিল। তিনি ছিলেন দরিদ্রের পরম বন্ধু, মানবতার মহান্ পুরোহিত। সমাজের অর্থহীন কুসংস্কার তাঁহাকে ব্যথিত করিয়াছিল। তাই শিক্ষা-প্রসার ছিল তাঁহার জীবনের মূল ব্রত। যাঁহার সমুচ্চ জীবনাদর্শ এই অধঃপতিত জাতিকে চরম অপমানের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল, যাঁহার বিলাসিতাহীন সরল জীবন এই শুষ্ক, হৃদয়হীন দেশে করুণার প্লাবন বহাইয়া দিয়াছিল, যাঁহার জ্ঞান-গভীরতা, তেজস্বিতা ও পরদুঃখ-কাতরতায় বাঙ্গালী-সমাজে নবজীবনের আলোক-রশ্মি বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িয়াছিল, তিনি যে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ—সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, তাহা সর্বজনস্বীকৃত॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- একজন অবিস্মরণীয় বাঙ্গালী: বিদ্যাসাগর
- দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর, পো. প্রা. '৮১
- সমাজ-সংস্কারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
- একজন শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী

প্রবন্ধ-সূত্র ঃ সূচনা ॥ পরিবেশ ও আবির্ভাব ॥ শৈশব-শিক্ষা ॥ কবি-কিশোরের কাব্য-চর্চা ॥ সাহিত্য-সাধনা ॥ নোবেল পুরস্কার ॥ রবীন্দ্র-সংগীত ॥ নাটক ও অভিনয় ॥ স্বদেশ ও সমাজ ॥ বিশ্ব-ভ্রমণ ॥ শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন ॥ মহাপ্রয়াণ ॥ উপসংহার ॥

৩৯.

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

সূচনা

কবি-শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ বর্তমান বিশ্বের একটি বিরাট বিস্ময়। সর্বকালের সর্বদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি তিনি। কেবল কবি-শ্রেষ্ঠ হিসাবেই নয়, সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদরূপেও তিনি সারা বিশ্বে সম্মানিত। মানব-জীবনের এমন কোন ক্ষেত্র নাই, এমন কোন চিন্তা নাই, এমন কোন ভাব নাই, যেখানে তিনি বিচরণ করেন নাই। তিনি মানুষের চিরন্তন সুখ-দুঃখ, মিলন-বিরহ ও আনন্দ-বেদনার পৌষ-ফাল্গুনের পালাগান রচনা করিয়া বিদায় লইয়াছেন। তাঁহার কাব্যে ব্যথাহত পাইবে ব্যথা-বিজয়ের প্রেরণা, দার্শনিক পাইবেন প্রকৃত সত্যের সন্ধান, রাজনৈতিক পাইবেন নির্ভুল পথের নির্দেশ, মৃত্যুপথযাত্রী পাইবেন মৃত্যুঞ্জয়ী সান্ত্বনা। এক কথায়, রবীন্দ্রনাথই আমাদের একমাত্র কল্পবৃক্ষ; ব্যথা, বেদনা ও হতাশাময় এই পৃথিবীতে রবীন্দ্রনাথই আমাদের একমাত্র আশা-ভরসা। আমরা রবীন্দ্রনাথের ভাবতরঙ্গে অবগাহন করি, তাঁহার চিন্তাধারায় চিন্তা করি, তাঁহার সুরে গান গাই, তাঁহার ভাষায় কথা বলি। আমরা রবীন্দ্রনাথে মরি ও বাঁচি।

পরিবেশ ও আবির্ভাব

কলিকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবার। উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য ও সংস্কৃতির পীঠস্থান। কাব্য-কবিতা ও শিল্প-সংস্কৃতি-চর্চা হইতে আরম্ভ করিয়া জাতীয় জাগৃতির উদ্বোধন পর্যন্ত এই পরিবারের অবদানের কথা সমগ্র ভারত চিরকাল শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে। সেই সঙ্গে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যোতির্ময় ঔপনিষদিক সাধনা, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অভূতপূর্ব যোগফল এবং নবোন্মেষিত স্বাদেশিকতা এই পরিবারে যে একটি অভিনব পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহারই মধ্যে ভূমিষ্ঠ হইলেন এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও মহামনীষী রবীন্দ্রনাথ।

শৈশব-শিক্ষা

ঠাকুর-পরিবারের উন্নত শিক্ষা-দীক্ষা, মার্জিত সাংস্কৃতিক চেতনা এবং পিতার আলোকিত ধর্ম-বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বিস্ময়কররূপে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। প্রেম, প্রকৃতি, সৌন্দর্য ও স্বদেশ—রবীন্দ্র-কাব্যের এই চারি দিগন্তে পড়িয়াছিল তাহার জ্যোতির্ময় প্রভাব। শৈশবে কিছুকাল ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে ও কিছুকাল নর্ম্যাল স্কুলে তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু মর্মের গভীরে বিশ্ব-প্রকৃতির উদার আহ্বান তাঁহাকে স্কুলের গণ্ডীবদ্ধ বন্দী-জীবন বেশীদিন সহ্য করিতে দিল না। অগত্যা দেবেন্দ্রনাথ গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। স্কুল-কলেজের কুণ্ঠিত বিদ্যা তাঁহার জুটিল না সত্য, কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যার সকল দুয়ার তাঁহার সম্মুখে উন্মুক্ত হইয়া গেল।

…ার কবি-কিশোরের শুরু হইল নিরবচ্ছিন্ন কাব্য-চর্চা। তেরো বৎসর বয়সে রচিত তাঁহার প্রথম কবিতা প্রকাশিত হইল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়। তাহার পর তাঁহার কাব্যোদ্যানে শুরু হইয়া গেল কাব্য-কুসুমের বসন্ত-উৎসব। সতেরো বৎসর বয়সে অধ্যয়নের জন্য তাঁহাকে বিলাতে যাইতে হইল। কয়েক বৎসর পরে পাশ্চাত্য জীবনাচরণ, সাহিত্য-সংস্কৃতির নিবিড় পরিচয় এবং সেই সঙ্গে হৃদয়ের বীণাতন্ত্রীতে পাশ্চাত্য সংগীতের সুর-মূর্ছনা লইয়া তিনি বাংলাদেশে ফিরিয়া আসিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রেরণায় এইবার প্রাণে আসিল গানের অভূতপূর্ব জোয়ার, রচিত হইল প্রথম অনবদ্য গীতিনাট্য 'বাল্মীকি প্রতিভা'। তাঁহার 'বাল্মীকি প্রতিভা' প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সংগীত-চর্চার আশ্চর্য ফসল।

কবি-কিশোরের কাব্য-চর্চা

বাংলা কাব্যের প্রথম রূপশিল্পী তিনি।—প্রাণের আকুল উচ্ছ্বাসে পৃথিবীর মানুষের সুখ-দুঃখ ও আনন্দ-বেদনার ভাষায় হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতিগুলিকে তিনি রূপ দিয়াছেন। যৌবনের প্রথম প্রভাতে তাঁহার হৃদয়ের নিবিড় বেদনায় সংগীতের যে উৎসমুখ খুলিয়া গিয়াছিল, তাহার মর্মর কলতান ঝংকৃত হইয়া উঠিল সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাত সংগীত, ছবি ও গান, কড়ি ও কোমল, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, মানসী ও সোনার তরীতে। এইবার সোনার তরীর পালে লাগিল সৌন্দর্যের হাওয়া। চিত্রা, চৈতালী, কণিকা, কল্পনা, কথা ও কাহিনী, নৈবেদ্য, খেয়া এবং গীতাঞ্জলি-গীতালি-গীতিমাল্যের সোনার ফসলে সেই সোনার তরী বোঝাই হইল। তারপর 'হেথা নয়, হোথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।' বলাকা, পলাতকা, পূরবী, বনবাণী, মহুয়া, পরিশেষ, পুনশ্চ, শেষ সপ্তক, পত্রপুট ও শ্যামলীর ধারা বাহিয়া তাঁহার কাব্যতরী নবজাতক, সানাই, জন্মদিনে ও শেষ লেখার মধ্য দিয়া দিগন্তের অন্তরালে উধাও হইয়া গিয়াছে। শুধু কাব্যেই নয়, নাটক, প্রবন্ধ, রস-রচনা, সমালোচনা, রূপক-নাট্য, উপন্যাস, ছোট গল্প, শিশু-সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজ-তত্ত্ব, শিক্ষা-তত্ত্ব, সংগীত, স্কুলপাঠ্য পুস্তক, ভ্রমণ-কাহিনী—সাহিত্য ও জ্ঞানের প্রায় সর্ববিভাগেই তাঁহার স্বচ্ছন্দ বিহারের যোগফল হইল বাংলা সাহিত্যের বর্তমান চরম সমুন্নতি। ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার রচিত গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদের জন্য তিনি সাহিত্যে 'নোবেল পুরস্কার' লাভ করেন। বাংলার কবি হইলেন বিশ্বকবি।

সাহিত্য-সাধনা

নোবেল পুরস্কার

সংগীতে ছিল তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা। নিজের সংগীতে তিনি নিজেই সুর সংযোজনা করিয়া সংগীতের যে একটি বিশেষ ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়া যান, তাহা 'রবীন্দ্র-সংগীত' নামে পরিচিত। সেই সংগীতের সংখ্যা যেমন বিপুল, তেমনি বৈচিত্র্যময়। আবৃত্তি ও অভিনয়েও তাঁহার প্রতিভা আশ্চর্য দক্ষতার স্বাক্ষর রাখিয়াছে। স্বরচিত নাটকে তিনি নিজেই বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া মঞ্চজগতে চমকপ্রদ অভিনয়ের নূতন ঐতিহ্য-ধারা সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, পরিণত বয়সে চিত্র-শিল্পেও তিনি বিশ্বকে বিস্মিত করিয়া দেন। তিনি ছিলেন প্রকৃতির পূজারী প্রকৃতির মর্মবাণী তাঁহার কাব্যে বিস্ময়করভাবে রূপলাভ করিয়াছে।

রবীন্দ্র-সংগীত

নাটক ও অভিনয়

স্বাধীনতা-আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান না করিলেও কবিতা, প্রবন্ধ ও সংগীতের মধ্য দিয়া তিনি জাতিকে স্বাধীনতা-সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'জনগণ-মন-অধিনায়ক' গানটি স্বাধীন ভারতের জাতীয় সংগীত। ভারতের মহিমা-কীর্তন, অন্তর্নিহিত আত্মার অমরতা, নির্ভীকতা, তেজস্বিতা, আত্মশক্তি-নির্ভরতা ইত্যাদি মহৎ ভাবগুলি অপূর্ব প্রেরণাময়ী ভাষায় ও সুরে তাঁহার কাব্যে বাণীময় হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে তিনি তাঁহার কাব্য-সাধনার অপূর্ব আলোকে জাতির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে প্রোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তাঁহার সোচ্চার প্রতিবাদ এবং 'স্যার' উপাধি ত্যাগ তো একটি ঐতিহাসিক ঘটনা।

স্বদেশ ও সমাজ

তিনি চীন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, আমেরিকা, ইউরোপ, পারস্য, রাশিয়া প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়া তথায় ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং বাংলা ভাষার প্রতি বিশ্বের শ্রদ্ধাশীল দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন। বিশ্বের যেখানে তিনি গিয়াছেন, সেখানেই লাভ করিয়াছেন বিশ্বকবির উপযুক্ত সম্মান।

বিশ্ব-ভ্রমণ

গঠনমূলক কার্যেও রবীন্দ্র-প্রতিভা বিস্ময়কর কৃতিত্বের অধিকারী। বীরভূম জেলার বোলপুরে ভারতীয় আদর্শে তিনি 'শান্তিনিকেতন' নামে একটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিয়া তথায় নিজে শিক্ষা দান করিতে থাকেন এবং কালক্রমে তথায় 'বিশ্বভারতী' নামে বিরাট্ বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা ব্যতীত শান্তিনিকেতনের অনতিদূরে দেশীয় কৃষি ও শিল্পের উন্নতিবিধানের জন্য তিনি 'শ্রীনিকেতন' নামে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া যান। অবশেষে ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের ৭ই আগস্ট এই মহামনীষী, কবি ও কর্মবীরের জীবনাবসান হয়। ২৫শে বৈশাখের সূর্য অস্তমিত হইল ২২শে শ্রাবণের নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়।

শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন

মহাপ্রয়াণ

রবীন্দ্রনাথ যেন ভারত-আত্মার মূর্ত প্রতীক। বৈদিক ঋষির ন্যায় ছিল তাঁহার প্রজ্ঞা-দৃষ্টি, বাল্মীকি-বেদব্যাস-কালিদাসের ন্যায় ছিল তাঁহার কবি-হৃদয়, আর ছিল গ্যেটে-টলস্টয়ের ন্যায় তাঁহার সুগভীর সমাজ-চেতনা। সুন্দরের আরাধনায়, মানবতার পূজায় তিনি তাঁহার পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়া যেন আরতি করিয়া গিয়াছেন। যে গভীর স্পর্শকাতরতা, যে নিবিড় বিশ্বাত্মবোধ এবং যে স্থির ঈশ্বর-চেতনা তাঁহার কাব্য-কবিতাকে ত্রিবেণী সঙ্গমে স্থাপন করিয়াছে, তাহার নিবিড় অনুষঙ্গ পাইতে হইলে আমাদিগকে সেই রবীন্দ্র-তীর্থে যাত্রা করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ সকল দেশের, সকল কালের সকল মানুষের তীর্থভূমি॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- **কবি-শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ**
- **কবি-সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ**
- **বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ**

প্রবন্ধ-সূত্র : সূচনা ॥ জন্ম ও পিতৃ-পরিচয় ॥ ঘটনাবহুল ছাত্রজীবন ॥ সিভিল সার্ভিস প্রত্যাখ্যান ও জাতীয় আন্দোলনে যোগদান ॥ ঘটনাবহুল জীবন : কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ॥ কংগ্রেসের সভাপতি ও কংগ্রেস ত্যাগ : নিরুদ্দেশ ও সিঙ্গাপুরে মুক্তিফৌজ গঠন ॥ নেতাজীর ডাক—ভারত-আক্রমণ ও পরাজয় ॥ উপসংহার ॥

৪০. নেতাজী সুভাষচন্দ্র

'আমার জীবনে লভিয়া জনম জাগোরে সকল দেশ।'

ইহা যেন শিখগুরু গোবিন্দ সিংহেরই বাণী নয়, ইহা যেন বাংলা-মায়ের দামাল ছেলে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জাগ্রত আত্মার সোচ্চার ঘোষণা। মুক্তি-কামী ভারতের বিক্ষুব্ধ প্রাণসত্তা যেন নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মধ্যে মূর্ত হইয়াছিল। তাঁহার জীবন ত্যাগে শুভ্র, বৈরাগ্যে গৈরিক, দাসত্বের শৃঙ্খল-মোচনে উৎসর্গীকৃত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর সকল শক্তি স্বাধীনতার এই অনির্বাণ প্রদীপ-শিখাটিকে কণ্ঠরোধ করিয়া হত্যা করিবার জন্য নিয়োজত হইয়াছিল। কিন্তু ব্রিটিশ জাতির সকল দুরভিসন্ধিকে পরাস্ত করিয়া, সকল চক্রান্ত ছিন্নভিন্ন করিয়া তাঁহার উদাত্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল বার্লিনে-সিঙ্গাপুরে, শোনা গেল ভারতের পূর্ব-সীমান্তে ইম্ফলে। সুভাষচন্দ্র হইলেন ভারতের জনগণ-মন-অধিনায়ক, নেতৃত্বের চির-জাগ্রত বিজয়-রুদ্র, ভারতের মুক্তি-সাধনার বিজয়-পথিক, ভারতবাসীর চির-আকাঙ্ক্ষিত প্রিয় নেতাজী।

সূচনা

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী। ওড়িশার কটক শহরে ভারত-জননীর বিদ্রোহের এই অগ্নি-শিশু ভূমিষ্ঠ হইলেন। পিতা—প্রখ্যাত সরকারী উকিল জানকীনাথ বসু, মাতা—প্রভাবতী দেবী। জানকীনাথের পৈতৃক নিবাস ছিল চব্বিশ পরগনা জেলার কোদালিয়া গ্রামে। বিদ্রোহের এই অগ্নি-শিশুর জন্মক্ষণে নবজাতকের ক্রন্দন-ধ্বনিতে যে প্রথম বিদ্রোহ বিঘোষিত হইয়াছিল, কে বলিতে পারে যে, তাহাতে 'দিল্লী চলো'—এই উদাত্ত আহ্বান ধ্বনিত হইয়াছিল কিনা?—কে বলিতে পারে তাঁহার জন্মলগ্নে পুরনারীগণ যে শঙ্খধ্বনি করিয়াছিলেন, তাহাতে মুহুর্মুহুঃ কামানের ধ্বনি শোনা গিয়াছিল কিনা?—সেই নবজাত শিশুর মুষ্টিবদ্ধ হাতে কে বলিতে পারে ভারতের চির-আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা বাঁধা পড়িয়াছিল কিনা? তাঁহার জন্মের মধ্যে যেন বিদ্রোহের নবজন্ম হইল, যেন ভারতের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার নবজন্ম হইল।

জন্ম ও পিতৃ-পরিচয়

সুভাষচন্দ্রের শৈশবের শিক্ষারম্ভ হইয়াছিল কটকের মিশনারী স্কুলে। পরে র‍্যাভেন্‌শ' কলেজিয়েট স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান লাভ করিলেন। সেই সময় মুক্তি-পথের সন্ধানে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের বীরবাণীর প্রেরণায় তিনি গৃহত্যাগ করিয়া হিমালয়ে করিলেন গভীর সাধনা। কিছুকাল পরে তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া উচ্চ-শিক্ষার জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হইলেন। তীব্র

ঘটনাবহুল ছাত্রজীবন

দেশাত্মবোধ ছিল তাঁহার অন্তরের চালক-শক্তি। তাই বিজাতীয় অধ্যাপক ওটেনের ভারতীয়দের প্রতি অসম্মানকর উক্তির তীব্র প্রতিবাদে তাঁহার অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। পরিণামে তাঁহাকে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বহিষ্কৃত হইতে হয়; কিন্তু পরে স্যার আশুতোষের চেষ্টায় স্কটিশ চার্চ কলেজে তিনি স্থানলাভ করিলেন এবং দর্শন-শাস্ত্রে অনার্স সহ বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এম. এ. পড়িতে থাকেন। পরীক্ষার পূর্বেই ১৯১৯ সালে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন এবং ১৯২০ সালে আই. সি. এস. পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান লাভ করিয়া সগৌরবে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এদিকে আসিতে লাগিল সরকারী চাকরির নানা প্রলোভন। কিন্তু গোলামির সমস্ত প্রলোভন ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিয়া তিনি দেশবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীরূপে যোগদান করিলেন ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে। এবার ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে সংযোজিত হইল এক নূতন অধ্যায়।

সিভিল সার্ভিস প্রত্যাখ্যান ও জাতীয় আন্দোলনে যোগদান

সুভাষচন্দ্রের কর্ম-জীবন যেমন ঘটনাবহুল, তেমনি রূপকথার কাহিনীর ন্যায় রোমাঞ্চকর। দেশবন্ধুর নির্দেশে তিনি জাতীয় শিক্ষালয়ের অধ্যক্ষ-পদ গ্রহণ করিলেন। সেই সঙ্গে রহিলেন কংগ্রেস কমিটির প্রচার-সচিব। অতঃপর ইংলণ্ডের যুবরাজের ভারত-আগমন উপলক্ষে পূর্ণ হরতালের আহ্বায়করূপে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কারামুক্তির পর তিনি হইলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক। এই সময় উত্তরবঙ্গের বন্যায় ত্রাণকার্যে তিনি যে গৌরবময় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের জাতীয় ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছে। তারপর তিনি হইলেন 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক এবং নির্বাচিত হইলেন কলিকাতা পৌর নিগমের প্রধান কর্মকর্তা। কিন্তু সরকার-বিরোধী মনোভাবের জন্য তাঁহাকে অচিরকালের মধ্যেই কারাবরণ করিতে হইল। ১৯২৭ সালে তাঁহার কারামুক্তি ঘটিলেও পুনরায় তাঁহাকে কারাবরণ করিতে হয়। তিনি যতদিন কারা-প্রাচীরের বাহিরে রহিয়াছিলেন, বিদেশী স্বৈরাচারী শাসকের ততদিন মানসিক স্বস্তি ছিল না। ফলে, স্বাধীনতার অদম্য সৈনিক সুভাষচন্দ্রকে জীবনের অধিকাংশ সময় কাটাইতে হইয়াছে কারান্তরালের অন্ধকারে।

ঘটনাবহুল জীবন : কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র

দীর্ঘকাল কারাবাসের ফলে তাঁহার স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটে এবং ভগ্ন-স্বাস্থ্য সুভাষচন্দ্রকে চিকিৎসার জন্য য়ুরোপ যাত্রা করিতে হয়। স্বাস্থ্যোদ্ধারের পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাকে আবার অন্তরীণ করা হইল। যাহা হউক, ১৯৩৭ সালে কর্তৃপক্ষ সুভাষচন্দ্রকে মুক্তি দিলেন। তারপর ১৯৩৯ সালে তিনি হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। ১৯৪০ সালে নির্বাচিত হইলেন ত্রিপুরী অধিবেশনের সভাপতি। কিন্তু ইতিমধ্যে কংগ্রেসের চরম ও নরম পন্থীদের মধ্যে সংঘাত অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল। সুভাষচন্দ্র ছিলেন চরমপন্থীদের অগ্রনায়ক। তাঁহার সভাপতি পদ-লাভে নরমপন্থীরা ক্ষুব্ধ হইলে সুভাষচন্দ্র বিরক্ত হইয়া কংগ্রেস ত্যাগ করিলেন।

কংগ্রেসের সভাপতি ও কংগ্রেস ত্যাগ

এদিকে পৃথিবীতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। সুভাষচন্দ্র ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে তাহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন। ফলে, নরমপন্থীরা তাঁহাকে ভুল বুঝিল। বিদেশী সরকারও তাঁহাকে অধিক দিন জনগণের মধ্যে থাকিতে দিল না। ১৯৪০ সালেই তাঁহাকে আবার গ্রেপ্তার করা হইল। কিন্তু ভগ্ন-স্বাস্থ্যের জন্য স্বগৃহে অন্তরীণ করিয়া রাখা হইল। ১৯৪১ সালের ২৬শে জানুয়ারী। সংবাদ রটিল—সুভাষচন্দ্রকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না, সুভাষচন্দ্র নিরুদ্দেশ। এদিকে তিনি জিয়াউদ্দিনের ছদ্মবেশে পুলিশের চোখে ধুলি দিয়া রহস্যজনকভাবে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চলিয়াছেন একক পথিক—স্বদেশের মুক্তি-পূজারী। কাবুল—বার্লিন—সিঙ্গাপুর। অসুস্থ দেহেও তিনি এক প্রচণ্ড আগ্নেয় ঝড়ের মতো ছুটিয়া গিয়াছেন। সিঙ্গাপুরে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে গঠিত হইয়াছিল মুক্তিবাহিনী—আজাদ হিন্দ্ ফৌজ। বাংলার সুভাষচন্দ্র হইলেন তাহার সর্বাধিনায়ক, হইলেন রূপকথার রাজপুত্র—ভারতের প্রিয় নেতাজী।

নিরুদ্দেশ ও সিঙ্গাপুরে মুক্তিফৌজ গঠন

সিঙ্গাপুরে সেদিন আসিল এক অভূতপূর্ব প্রাণের জোয়ার—স্বাধীনতার জোয়ার। নেতাজী উদাত্ত কণ্ঠে ডাকিয়া বলিলেন—'Give me blood, I promise you freedom'—'তুমি আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাকে স্বাধীনতা দিব।' সঙ্গে সঙ্গে 'আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান'—তাহার জন্য দেখা দিল প্রবল উত্তেজনা। সেদিন কোথায় ছিল সাম্প্রদায়িকতা? কোথায় গেল প্রাদেশিকতা? সে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। অতঃপর আজাদ হিন্দ্ সরকার গঠিত হইল। ১৯৪৩ সালে এই সরকার ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিরুদ্ধে একযোগে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ১৯৪৫ সালের ১৮ই মার্চ। ভারতের জাতীয় জীবনের একটি স্মরণীয় দিবস। ঐ দিন আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ভারতের মৃত্তিকায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিল। নেতাজী ডাক দিলেন, 'দিল্লী চলো—'। শুরু হইল দিল্লী-অভিযান। স্বাধীনতার অদম্য আকাঙ্ক্ষার জয় হইল। কিন্তু কালক্রমে ইংরেজ-বাহিনী ব্রহ্মদেশ পুনর্দখল করায় এবং জাপান তাহার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করায় সাহায্যের অভাবে আজাদ হিন্দ্ সরকারের পতন হইল। দুঃসহ পরাজয়ের বেদনা লইয়া নেতাজী বিমানে জাপান যাত্রা করিলেন। সংবাদে প্রকাশ, তিনি পথিমধ্যে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন।

নেতাজীর ডাক—ভারত-আক্রমণ ও পরাজয়

দেশবাসী তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ বিশ্বাস করে না। ভারতের প্রিয় নেতাজী মরণ-বিজয়ী গৌরবে ভারতবাসীর হৃদয়ে রহিয়াছেন চির-প্রতিষ্ঠিত। তাহারা আজিও নেতাজীর প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যাকুল, প্রতীক্ষা-কাতর। বরণমাল্য রচনা করিয়া ভারতের সাট কোটি নরনারী বিজয়ী বীরকে অভিনন্দন জানাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত। 'তোমার আসন শূন্য আজি, হে বীর, পূর্ণ করো॥'

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

একজন শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী

তোমার প্রিয় নেতা

৪৯

আমার প্রিয় গ্রন্থকার ঃ বঙ্কিমচন্দ্র

উ. মা. '৬১

প্রবন্ধ-সূত্র ঃ সূচনা ॥ বঙ্গ-সরস্বতীর পূজারী বঙ্কিমচন্দ্র ॥ বাংলা সাহিত্যে যুগান্তর ॥ প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ভাব-সমন্বয় ॥ কেন প্রিয় গ্রন্থকার ? ॥ বঙ্কিম-রচনাবলীর বৈশিষ্ট্য ॥ স্বাদেশিকতার প্রথম উদ্গাতা ॥ উপসংহার ॥

'আমরা আমাদের ঘরের মেয়েকে সূর্যমুখী-কমলমণি-রূপে দেখিলাম, চন্দ্রশেখর এবং প্রতাপ বাঙালি পুরুষকে একটা উচ্চতর ভাবলোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। আমাদের প্রতিদিনের ক্ষুদ্র জীবনের উপরে একটি মহিম রশ্মি নিপতিত হইল।'
—রবীন্দ্রনাথ

সূচনা

যখন বাংলার কোন সাহিত্যাদর্শ ছিল না, তাহার সাহিত্যে ছিল না কোন মহান্ ভাবের স্ফুরণ, অবহেলায় অনাদরে যখন বাংলা সাহিত্য নিমজ্জিত-প্রায়, তখনই যিনি রূপকথার রাজপুত্রের মতো বাংলার সাহিত্যকে, বাঙ্গালীর ভাষাকে সেই চরম অধঃপতন ও অবমাননার হাত হইতে উদ্ধার করিলেন, তিনিই আমার প্রিয় গ্রন্থকার—বঙ্কিমচন্দ্র। সেদিন ছিল সত্যই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ঘোর দুর্দিন। একদিকে, ইংরেজি শিক্ষিতদের চক্ষে বাংলা ভাষা ছিল বর্বরের ভাষা ; অন্যদিকে, সংস্কৃতজ্ঞদের দৃষ্টিতে তাহা ছিল চণ্ডালের ভাষা। সমাজের উভয় শ্রেণীর এই অপমান ও অনাদর মাথায় বহন করিয়া আমাদের প্রিয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চলিয়াছিল দীনা হীনা অবমানিতার বেশে। তাহার কোলের সন্তানেরা তাহাকে ত্যাগ করিয়াছিল। তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া 'পরধন-লোভে মত্ত' হইয়া যখন তাহারা 'কুক্ষণে ভিক্ষাবৃত্তি আচরণ' করিয়া ফিরিতেছিল, তৎকালীন শিক্ষিত-শ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র তখন বঙ্গ-সরস্বতীর পদতলে দাঁড়াইয়া ভক্তি-নম্র শিরে যেন মিনতি-ভরা কণ্ঠে বলিলেন—'যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়বো না, মা—'

বঙ্গ-সরস্বতীর পূজারী বঙ্কিমচন্দ্র

তখন চারিদিক হইতে তাঁহার প্রতি ঘৃণা ও বিদ্রূপ বর্ষিত হইতে লাগিল। কিন্তু দৃঢ়চেতা বঙ্কিম তাহা উপেক্ষা করিয়া তাঁহার পূজা-নিবেদনের অর্ঘ্য রচনা করিয়া বলিষ্ঠ পদ-বিক্ষেপে বঙ্গ-সরস্বতীর মন্দিরে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে প্রবেশ করিলেন। তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে কৃপা প্রদর্শন করিতে আসেন নাই ; প্রকৃত পূজারীর মতো, শ্রদ্ধাশীল ভক্তের মতো তিনি প্রতিভার নৈবেদ্য সাজাইয়া আনিলেন। বঙ্গ-সরস্বতীর মুখে হাসি ফুটিল, সাহিত্যের নানা উপচার যেন আশীর্বাদের মতো ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

বাংলা সাহিত্যে যুগান্তর

'বঙ্কিম বঙ্গ-সাহিত্যে প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃৎপদ্ম সেই প্রথম উদ্‌ঘাটিত হইল। পূর্বে কী ছিল এবং পরে কী পাইলাম, তাহা দুই কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই বিজয়বসন্ত, সেই গোলেবকাওলি, সেই বালক-ভুলানো কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সংগীত, এত বৈচিত্র্য !··· বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।'

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সাহিত্যের সংঘাতে উনবিংশ শতাব্দীতে ভাবের যে বিপুল তরঙ্গোচ্ছ্বাস উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে অপূর্ব বাণীমূর্তি দান করিলেন। তিনি ঋষি অগস্ত্যের মতো পাশ্চাত্য সাহিত্য-সমুদ্রের অফুরন্ত জলরাশিকে যেন এক গণ্ডূষে পান করিয়া আত্মস্থ করিয়াছিলেন এবং পশ্চিম-বাহিনী সকল নদীকে পূর্ববাহিনী করিয়া বাংলা সাহিত্যের দৈন্যদশা স্বহস্তে মোচন করিলেন। নব-নব সৃষ্টির উল্লাসে বাংলা সাহিত্যে যেন ফসলের জোয়ার আসিল, বাংলা ভাষা উর্বরা শস্য-শ্যামলা হইয়া উঠিল, বাসভূমি হইল যথার্থ মাতৃভূমি। এখন আমাদের মনের খাদ্য প্রায় ঘরের দ্বারেই ফলিয়া উঠিতেছে। ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয়।

প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ভাব-সমন্বয়

কেবল এইজন্যই যে বঙ্কিমচন্দ্র আমার প্রিয় গ্রন্থকার, তাহা নহে। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে আমাদের সুপ্ত চেতনার প্রথম জাগৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম—আমাদের বন্দিনী ভাবনাসমূহের প্রথম মুক্তি দেখিয়াছিলাম। কল্পনার অবাধ বিস্তার এবং হৃদয়ের অবারিত প্রসার সেই প্রথম সম্ভব হইল। সেই সঙ্গে সমাজকে, স্বদেশকে এবং স্বদেশের চিরন্তন মানুষ—হাসিম শেখ ও রামা কৈবর্তকে আমরা ভালোবাসিতে শিখিলাম। সেই ভালোবাসা অন্ধের ভালোবাসা নয়, চক্ষুষ্মানের জাগ্রত প্রীতি। বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের চিত্তের উদ্বোধন ঘটাইয়া আমাদের হৃদয়ে দেশ-প্রীতির জোয়ার বহাইয়া দিলেন। বঙ্কিমের উপন্যাসে, তাঁহার প্রবন্ধাবলীতে, তাঁহার কমলাকান্তে, তাঁহার মুচিরাম গুড়ের জীবনকাহিনীতে আমাদের কেবল চিত্ত-মুক্তি ঘটিল না, আমাদের আত্মদর্শন ঘটিল। আমরা নিজেদের চিনিতে পারিলাম।

কেন প্রিয় গ্রন্থকার ?

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' আমাদের মনোহরণ করিয়াছিল। দুর্গেশনন্দিনীর জগৎসিংহের মতো তিনিও যেন বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে দুর্বার অশ্বারোহণে আসিলেন। গড় মান্দারণের কেবল শৈলেশ্বর মন্দিরেই নয়, বাংলা সাহিত্যের মন্দির-দ্বারেও পড়িল দুর্জয় করাঘাত—দ্বার খোল, খোল দ্বার! শেক্সপীয়ারের জুলিয়াস সীজারের মতো তিনিও বলিতে পারিতেন—'I came, I saw, I conquered.' কবিত্বময় ভাষার অনবদ্য সুষমায়, বর্ণনার চমৎকারিত্বে, ঘটনার উপস্থাপনায়, রোমান্সের বর্ণাঢ্য আলোকসম্পাতে দুর্গেশনন্দিনী প্রথম দর্শনেই আমাদের চিত্ত জয় করিয়া লইল। তারপর আসিল কপালকুণ্ডলা। তরঙ্গমুখর নির্জন সমুদ্রতীরের প্রেক্ষাপটে বন-বালিকা কপালকুণ্ডলার যে বাণী-বিগ্রহ বঙ্কিম রচনা করিলেন, তাহা অনবদ্য। তারপর অপূর্ব তরঙ্গ বিস্তার করিয়া আসিল বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণকান্তের উইল, মৃণালিনী, রজনী, ইন্দিরা, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম। আসিল কমলাকান্ত, আসিল মুচিরাম গুড়, আসিল শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র। তাঁহার কমলাকান্ত চির-নূতন এবং তাঁহার আনন্দমঠ দেশাত্মবোধ উদ্বোধনের প্রথম বেদগ্রন্থ। 'বন্দে মাতরম্' সংগীত দেশ-মাতৃকার পূজার অপূর্ব বেদমন্ত্র।

বঙ্কিম-রচনাবলীর বৈশিষ্ট্য

ইতিপূর্বে হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কাব্যে-কবিতায় এবং ভাবে-চিন্তায় আমাদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার ধীর-মন্থর উন্মেষ ঘটিতেছিল। কিন্তু স্বদেশের ছিল

না কোন রূপমূর্তি, ছিল না মাতৃ-প্রতিমার স্বরূপ। বঙ্কিম মানবী-জননী, দেশ-জননী এবং দেবী-জননীর সমাহারে দেশমাতৃকার এক অনবদ্য বাণী-বিগ্রহ রচনা করিয়া দেশবাসীর হাতে তুলিয়া দিলেন। আনন্দমঠের সন্তানগণই যে একমাত্র সন্তান, তাহা নহে; বঙ্কিমচন্দ্র ভারতের তেত্রিশ কোটি নরনারীকে যেন ত্যাগ-সমুজ্জ্বল সন্তান-ধর্মে দীক্ষিত করিলেন। তাহা ছাড়া, সেদিন সমগ্র জাতিকে তিনি 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া দেশমাতৃকার শৃঙ্খল-মোচনের মহালগ্নকে ত্বরান্বিত করিয়া গিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে; জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমাহারে তিনি তাঁহার 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে যে নবযুগের মাতৃ-সাধনার সার্থক রূপ তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, তাহা জাতির জীবনে ব্যর্থ হয় নাই। তিনি জাতির হাতে যে মাতৃ-বিগ্রহ তুলিয়া দিয়া গিয়াছেন, তাহার মধ্য দিয়া জাতির মুক্তির আকাঙ্ক্ষার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এতদিন জাতির হৃদয়-মন্দিরে ছিল না মাতৃ-বিগ্রহ, শূন্য পড়িয়াছিল পূজা-বেদী। বঙ্কিম সেই শূন্য আসনে দেশমাতৃকার নিরুপম মূর্তি স্থাপন করিয়া আমাদের মাতৃ-পূজার আয়োজন করিলেন। দেখিতে দেখিতে হৃদয়ের মন্দিরে মন্দিরে সেই প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হইয়া পূজিত হইতে লাগিল। মাতৃ-পূজার হইল শুভ উদ্বোধন। বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের স্বাদেশিকতার প্রথম যথার্থ রূপকার, মাতৃ-পূজার বোধন-মন্ত্রের প্রথম বৈদিক ঋষি।

স্বাদেশিকতার প্রথম উদ্গাতা

সামগ্রিকতার বিচারে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের ভগীরথ। তাঁহার আবির্ভাবের পূর্বে বাংলা সাহিত্যের সকল ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা যেন ষাট সহস্র সগর-সন্তানের মতো ভস্মীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। কোথাও ছিল না প্রাণের স্পন্দন, কোথাও ছিল না শ্যামলতার আভাস। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রতিভাবলে ভাব-মন্দাকিনীর ধারাস্রোত বাংলা সাহিত্যের ধূসর ঊষর প্রান্তরে বহন করিয়া আনিলেন। বাংলা সাহিত্যের মৃত এবং ভস্মীভূত ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহ পুনর্জীবন লাভ করিল এবং সোনালী ফসলের আকারে থরে থরে আত্মপ্রকাশ করিল। পতিত, বন্ধ্যা সাহিত্য-প্রান্তরে এবার ফলিল সোনার ধান। পরবর্তীকালের শ্রেষ্ঠশিল্পী রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' সেই ধানে বোঝাই হইল, বাংলা ভাষার চরণতীর্থে সমগ্র জগৎ যাওয়া-আসা শুরু করিল। বাংলা সাহিত্যের এই চরম সমুন্নতির দিনে বঙ্কিমের নিকট আমরা কতখানি ঋণী, তাহা স্বীকার না করিলে আমাদের জাতীয় জীবনের হইবে চরম অকৃতজ্ঞতা। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম সাহিত্য-পুরুষ বঙ্কিমচন্দ্রকে আত্ম-বিস্মৃত বাঙ্গালী যেন ভুলিয়া না যায়॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- **ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র**
- **আমার প্রিয় সাহিত্যিক ও তাঁহার গুণাবলী, উ. মা. '৭১**
- **তোমার প্রিয় লেখক**
- **তোমার প্রিয় গ্রন্থ ও গ্রন্থকার**

[এই সঙ্গে 'আমার প্রিয় উপন্যাস : পথের পাঁচালী' প্রবন্ধ-সংকেত দ্রষ্টব্য]

প্রবন্ধ-সূত্র : সূচনা। আবির্ভাব ও বাংলা কাব্যে প্রতিষ্ঠালাভ। কৈশোর ও প্রথম যৌবন। নজরুল-প্রতিভার প্রেরণা-উৎস। বিদ্রোহী যৌবনের কবি। নজরুলের বিদ্রোহাত্মক কবিতার সৌন্দর্য। হিন্দু-মুসলমানের মিলন-তীর্থ। উপসংহার।

আমার প্রিয় কবি : নজরুল ইসলাম

যে কবির কাব্যে মৃত্যুঞ্জয়ী চির-যৌবনের জয়ধ্বনি শুনিয়াছিলাম, শুনিয়াছিলাম অগ্নিবীণার সুর-ঝঙ্কার, যিনি ধীর স্থির অচঞ্চল বাংলা কাব্যে বহিয়া আনিয়াছিলেন দুর্বার কালবৈশাখীর ঝড়, সেই বিদ্রোহী-কবি কাজী নজরুল ইসলামই আমার প্রিয় কবি। এই পরাধীন জড়তাগ্রস্ত সমাজের বুকে তিনিই তো সঞ্চারিত করিয়াছিলেন নব-যৌবনের শোণিত-ধারা। তাঁহার কবিতাগুলি নব-ভারতের সঞ্জীবনী মন্ত্র, তাঁহার সংগীত সর্বহারার কান্নার বাণী। তাঁহার সংগীত ও কবিতায় সেদিন 'হিমাচল-চাপা প্রাচী' 'নব-যৌবন-জলতরঙ্গে' নাচিয়া উঠিয়াছিল। আজ সেকথা সকলে ভুলিতে পারে, কিন্তু আমি ভুলিব না।

সূচনা

বিদ্রোহের জয়ধ্বজা উড়াইয়া ধূমকেতুর মতো নজরুল ইসলাম দুর্বার পদ-বিক্ষেপে রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠাভূমিতে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার 'বিদ্রোহী' কবিতাটিই প্রকৃতপক্ষে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে তাঁহার ছাড়পত্র-স্বরূপ। উদাত্তকণ্ঠে তিনি ঘোষণা করিলেন—

আবির্ভাব ও বাংলা কাব্যে প্রতিষ্ঠালাভ

"বল বীর—
বল, উন্নত মম শির
শির নেহারি, আমারি নত-শির ঐ শিখর হিমাদ্রির
বল বিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি'
চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা ছাড়ি'
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাত্রীর।"

কেবলমাত্র এই 'বিদ্রোহী' কবিতাতেই বাংলা কবিতার আসরে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। কবি নজরুল হইলেন বাংলার বিদ্রোহী কবি।

বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রাম। বাল্য-নাম দুখু মিঞা। ধর্মপ্রাণ দরিদ্র পিতা ঐ নামই রাখিয়াছিলেন। পিতৃ-বিয়োগের পর কবি-কিশোর নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে পড়েন এবং অভিভাবকহীনতার জন্য চরম উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়েন। এই সময়ে লেটো গানের দলে গীত রচনা ও সুর-সংযোজনা করার প্রয়াসের মধ্যে নজরুল-প্রতিভার প্রথম বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। পরে মাংসের দোকানে চাকরি ও সিয়ারশোল উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি—এ সমস্ত নজরুলের জীবনের চমকপ্রদ ঘটনা। তদপেক্ষা চমকপ্রদ ঘটনা হইল তাঁহার বাঙ্গালী-পল্টনে যোগদান। কাহারও মতে, তিনি করাচী পর্যন্ত গিয়াছিলেন, কাহারও মতে, মেসোপটেমিয়ায়। সে যাহাই হউক, সেনাবাহিনীতে যোগ্যতার পরিচয় দিয়া তিনি 'হাবিলদার' পদে উন্নীত হন।

কৈশোর ও প্রথম যৌবন

প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান হইল। ছাঁটাইয়ের খাতায় নাম উঠিল নজরুলের। মহাযুদ্ধের স্মৃতি এবং পরাধীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের দাবাগ্নি জ্বালিয়া দুদ্দাড় আবেগে বাংলাদেশের মাটিতে ফিরিয়া আসিলেন বাংলার অখ্যাত হাবিলদার কবি। যুদ্ধক্ষেত্রের ট্রেঞ্চে বসিয়া রচিত তাঁহার কবিতা 'মুক্তি' ইতিমধ্যে বাংলা দেশের একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এবার তিনি বিদ্রোহের বহ্নিচ্ছটা লইয়া বাংলা কবিতার আসরে অবতীর্ণ হইলেন। পুরাণ-কোরান-গীতা-মহাভারতের গভীর জ্ঞান এবং আরবী-ফারসী-সংস্কৃত-বাংলার শব্দ-ভাণ্ডারের দুর্লভ চাবিকাঠি ছিল তাঁহার হাতে। আর ছিল উদাত্ত কণ্ঠ এবং রাগ-রাগিণীর জ্ঞানের সঙ্গে বাংলার কীর্তন-বাউল-সারি-ভাটিয়ালির প্রতি প্রাণের টান ও সেই সঙ্গে পার্শী-গজলের প্রাণ-মাতানো সুর-বাহার।

নজরুল-প্রতিভার প্রেরণা-উৎস

নজরুল চির-যৌবনের কবি। প্রাণ-প্রাচুর্যই যৌবনের নিশ্চিত প্রাণ-লক্ষণ। প্রথম মহাযুদ্ধের পর আশাভঙ্গ-হেতু সেই যৌবন বিদ্রোহ-ধর্মী। সর্বপ্রকার শোষণ-শাসন-শৃঙ্খলা সবলে ভাঙ্গিবার দুর্জয় সাধনায় সে ব্রতচারী। নজরুলের কাব্যে শোনা গেল সেই বিদ্রোহী যৌবনের নির্বাধ পদধ্বনি। রবীন্দ্রনাথও বিস্মিত স্নেহে নজরুলকে স্বীকার করিয়া লইলেন।

বিদ্রোহী যৌবনের কবি

বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া নজরুল দেখিলেন, দেশব্যাপী পরাধীনতার নীরন্ধ্র অন্ধকারে, ধনিক শ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদীদের নির্লজ্জ শোষণে সমগ্র সমাজে রচিত হইয়াছে কংকাল-পরিকীর্ণ এক বিশাল শ্মশান-ভূমি; তিনি উদ্ধত কাপালিকের মতো সেই শ্মশান-ভূমিতে উচ্চারণ করিলেন শব-সাধনার ভৈরবী মন্ত্র—

নজরুলের বিদ্রোহাত্মক কবিতার সৌন্দর্য

"কারার ঐ লৌহকপাট
ভেঙে ফেল কর্ রে লোপাট
রক্ত-জমাট শিকল-পূজার পাষাণ-বেদী।" —ভাঙার গান

বজ্র-গম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করিলেন—

"আমি বেদুয়িন, আমি চেঙ্গিস্
আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ।" —বিদ্রোহী

কারণ 'সোঽহং'—আমিই সেই। আমার ললাটে ঈশ্বরের আশীর্বাদের জয়-ললাটিকা আমি কাহারও নিকট মস্তক অবনত করিতে পারি না। মানুষ যতদিন অজ্ঞতার অন্ধকারে থাকে, ততদিন সে নিজেকে চিনিতে পারে না, সন্ধান পায় না নিজের শক্তির। কবি তাই বলিলেন—'আমি সহসা আমারে চিনিয়া ফেলেছি, আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ। আমি উন্মাদ! আমি উন্মাদ!' আত্মশক্তির সন্ধান লাভ করিলে পরাধীনতার বন্ধন আর স্থায়ী হয় না। কবির বিদ্রোহ যেমন পরাধীনতার বিরুদ্ধে, তেমনি তাঁহার বিদ্রোহ সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধেও। তাঁহার দৃষ্টিতে সমস্ত সামাজিক ভেদাভেদই কৃত্রিম এবং মিথ্যা। তিনি বলিলেন—

'ও কি চণ্ডাল! চমকাও কেন? নহে ও ঘৃণ্য জীব—
ওই হতে পারে হরিশ্চন্দ্র, ওই শ্মশানের শিব!' —সাম্যবাদী

সামাজিক জড়তা ও ক্লান্তিকর নৈষ্কর্ম্যের মধ্যে কালবৈশাখীর ঝড়ের মতো তিনি আবেগ-খিন্ন কণ্ঠে গাহিলেন—

'মেনে শত বাধা টিকটিকি হাঁচি
টিকি দাড়ি নিয়ে আজো বেঁচে আছি
বাঁচিতে বাঁচিতে প্রায় মরিয়াছি, এবার সব্যসাচী,
যা হোক একটা তুলে দাও হাতে, একবার মরে বাঁচি।' —সব্যসাচী

তাঁহার 'অগ্নিবীণা,' 'বিষের বাঁশী,' 'সর্বহারা', 'ফণি-মনসা' প্রভৃতি কাব্যগুলির মধ্যে বিদ্রোহেরই সোচ্চার জয়ধ্বনি :

দেশে তখন একদিকে স্বাধীনতার আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি বিদেশীর চক্রান্তে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা মাথা তুলিয়া উঠিতেছে। স্বাধীনতা-সংগ্রামের কাণ্ডারীকে ডাকিয়া তিনি আদেশ করিলেন—

হিন্দু-মুসলমানের মিলন-তীর্থ

"হিন্দু না ওরা মুসলিম ?—ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন ?
কাণ্ডারী, বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার।" —কাণ্ডারী হুঁশিয়ার

এইভাবে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতির মিলন-মন্ত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন তিনি। নজরুলের কাব্য তাই হিন্দু-মুসলমানের মিলন-তীর্থ।

অন্যদিকে, সাম্রাজ্যবাদীর নিষ্ঠুর শোষণের বিরুদ্ধে তাঁহার লেখনী অগ্নি উদ্গার করিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদীর পেষণ-চক্রতলে নিষ্পিষ্ট মানব-আত্মার আকুল ক্রন্দন-ধ্বনি তিনি শুনিয়াছেন। তাই তিনি ব্যথাহত কণ্ঠে উচ্চারণ করিয়াছেন—

উপসংহার

"বন্ধু গো, আর বলিতে পারি না, বড় বিষ-জ্বালা এই বুকে,
দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে।
রক্ত ঝরাতে পারি না তো একা
তাই লিখে যাই এ রক্ত-লেখা—
প্রার্থনা করো, যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস,
যেন লেখা থাকে আমার রক্ত-লেখায় তাদের সর্বনাশ।" —আমার কৈফিয়ৎ

নজরুল সেই রক্ত-লেখার কবি, সেই ব্যথিত মানবাত্মার কবি, আমার প্রিয় কবি। তিনি তো বিদ্রোহী যৌবনের কপালে জয়-তিলক আঁকিয়া দিয়া তাহাকে 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার' উত্তরণের মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছেন। সমগ্র জাতি নজরুলের কবি-প্রতিভার কাছে তাই অসীম ঋণে ঋণী॥

"মোরা একই বৃন্তে দুইটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান।
মুসলিম তার নয়নমণি হিন্দু তাহার প্রাণ॥"
— নজরুল

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- বিদ্রোহী-কবি নজরুল ইসলাম
- নজরুল-প্রতিভা

১৬.

প্রবন্ধ-সূত্র : সূচনা ॥ জন্ম ও বংশ-পরিচয় ॥ শিক্ষা-জীবন ॥ কর্ম-জীবন ॥ কৃতিত্ব ॥ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অবদান ॥ জীবনের অন্যান্য দিক্-দিগন্ত ॥ উপসংহার ॥

বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু

আচার্য জগদীশচন্দ্র ভারতে বিজ্ঞান-চর্চার যে অনুকূল পরিমণ্ডল রচনা করিয়া গিয়াছেন, বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথের আবির্ভাব তাহার মধ্যেই। বিজ্ঞানের সেবায় উৎসর্গীকৃত-প্রাণ এই মহাতাপস তাঁহার অক্লান্ত সাধনায় পরমাণু-কেন্দ্রের রহস্যের আবরণ উন্মোচন করিয়া বিশ্ব-বিজ্ঞানের এক অন্ধকার দিগন্তকে আলোকিত করিয়া গিয়াছেন। বিশ্ব-বিশ্রুত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের আপেক্ষিক-তত্ত্বে এমন কতকগুলি জটিল সমীকরণ ছিল, যাহার পূর্ণ সমাধান অসম্ভব। সত্যেন্দ্রনাথ সেই রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করিলেন; আর সঙ্গে সঙ্গেই সেই রহস্য-নিকেতনের দ্বার খুলিয়া গেল। তাঁহার হাতেই অসম্ভব সম্ভব হইয়া উঠিল। এবং সত্যেন্দ্রনাথই হইলেন বিশ্বের একমাত্র সেই বিজ্ঞানী, আইনস্টাইনের নামের সঙ্গে যাঁহার নাম সগৌরবে যুক্ত!

সূচনা

জন্ম ১৮৯৪ সালের ১লা জানুয়ারী। পিতার নাম সুরেন্দ্রনাথ বসু, মাতার নাম আমোদিনী। সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন রেলের একজন কর্মচারী। রোজগারপত্র সীমিত; সেই কারণে সংসারও খুব অসচ্ছল। সাংসারিক সেই অসচ্ছলতার মধ্যেই একালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথের জন্ম।

জন্ম ও বংশ-পরিচয়

সত্যেন্দ্রনাথের শিক্ষা-জীবন অতি-সাধারণভাবেই সূচিত হয়। সূচনায় দুই-একটি স্কুলে বিদ্যাশিক্ষার পর তিনি হিন্দু স্কুলে ভর্তি হন। ১৯০৯ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হইলেন। ১৯১১ সালে এফ. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান এবং ১৯১৩ সালে গণিতে অনার্স সহ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া স্বীয় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখিলেন। তারপর ১৯১৫ সালে মিশ্র-গণিতে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ করিলেন।

শিক্ষা-জীবন

কর্ম-জীবনে প্রবেশের সূচনায় তাঁহাকে স্যার আশুতোষ বিজ্ঞান-কলেজে নব-গঠিত পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগে যোগদানের জন্য আহ্বান করেন। সত্যেন্দ্রনাথও সেই আহ্বানে সাড়া দিয়া পাঁচ বছর বিজ্ঞান-কলেজের পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগে থাকিয়া যান। এমন-কি, এই বিভাগের গবেষণাগার ইত্যাদির বিন্যাস ও স্থান-বণ্টনে ছিল তাঁহার সুচিন্তিত দূরদর্শিতার স্পর্শ। তারপর ১৯২১ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ-বিজ্ঞানের রীডার পদে যোগদান করিলেন। সেখানে ক্রমশঃ তিনি পদার্থ-বিজ্ঞানের বিভাগীয় প্রধান পদে বৃত হন। এইভাবে ঢাকায় বহুদিন কাটাইয়া অবশেষে ১৯৪৫ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানের

কর্ম-জীবন

বিভাগীয় প্রধান হইয়া আসেন। ১৯৪৪ সালেই তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯৪৮-৫০ সালে তিনি ভারতের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব্ সায়েন্সের চেয়ারম্যান্ পদে বৃত হন। ১৯৫১ সালে ইউনেস্কোর একটি জরুরী কমিটির বৈঠকে যোগদান করেন। ১৯৫৪ সালে ভারত সরকার বিজ্ঞানে তাঁহার কৃতিত্বের স্মারকরূপে তাঁহাকে 'পদ্মবিভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন। তারপর ১৯৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৯৫৮ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে 'ডক্টরেট' উপাধি দিয়া সম্মানিত করেন। ইতিপূর্বে ১৯৫৬ সাল হইতে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কার্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইবার ১৯৫৮ সালে ভারত সরকার তাঁহাকে জাতীয় অধ্যাপক পদে বরণ করেন। ১৯৭৪ সালের ৪ঠা জানুয়ারী তাঁহার পরলোকগমনের দিন পর্যন্ত তিনি ঐ পদে বৃত ছিলেন।

দীর্ঘদিন ধরিয়া বিশ্ব-বিশ্রুত বৈজ্ঞানিকরা পরমাণু-বিজ্ঞানের রুদ্ধদ্বারে করাঘাত হানিতেছিলেন, কিন্তু সেই দুর্ভেদ্য দ্বার খুলিতে সক্ষম হন নাই। জার্মানীর বৈজ্ঞানিক ম্যাক্স্ প্লাঙ্ক ও আইনস্টাইন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ১৯০০ সালে ম্যাক্স্ প্লাঙ্ক যে সূত্রের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহাতে বিশ্বের বৈজ্ঞানিকগণের মনের সংশয় দূর হয় নাই। ১৯২৪ সালে ত্রিশ বৎসর বয়স্ক তরুণ অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ একটি ছয় পৃষ্ঠার প্রবন্ধে পরমাণু-বিজ্ঞানের সেই রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন বসু-সূত্রের সত্যতাকে স্বীকৃতি জানাইলেন, তরুণ অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে তাঁহার গবেষণার সাফল্যের জন্য অভিনন্দিত করিলেন। ১৯০০ সালে ম্যাক্স্ প্লাঙ্ক যাহা শুরু করিয়াছিলেন, তরুণ বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথের হাতে তাহা পূর্ণতা লাভ করিল। বসু-সূত্রের পথ ধরিয়া আইনস্টাইন আরও অগ্রসর হইয়া গেলেন। পরবর্তীকালে আইনস্টাইন-সূত্রের নামকরণ করা হইল বসু-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন-সূত্র।

কৃতিত্ব

কেবল পদার্থ-বিজ্ঞানের পরমাণু-তত্ত্বের ক্ষেত্রেই নয়, বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা-প্রশাখায়ও আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের কৃতিত্বের অবদান অবিস্মরণীয়। বসু-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন-সূত্রের জ্যোতির জলুসে তাঁহার সেই অবদানগুলি ঢাকা পড়িয়া গেলেও সেগুলিকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ১৯৪৫ সালে আইনস্টাইন যে নূতন ক্ষেত্র-তত্ত্বের অবতারণা করেন, দীর্ঘদিন পর্যন্ত কেহই তাহাকে সম্পূর্ণতা দান করিতে পারেন নাই। ১৯৫২ সালে সত্যেন্দ্রনাথ অতি সহজ পদ্ধতিতে তাহাকে সম্পূর্ণতা দান করিবার এক ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। রসায়ন-বিজ্ঞানে—এমন-কি, উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানেও সত্যেন্দ্রনাথের অবদান অনস্বীকার্য। স্বনামধন্য উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানী অধ্যাপক হৃদয়রাম বসু স্বীকার করিয়াছেন যে, আচার্য বসুর মতামত এই বিষয়গুলির বহু অন্ধকার দিগন্তে আলোকপাতে সমর্থ হইয়াছে।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অবদান

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ছিল আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের অগাধ প্রীতি। প্রমথ চৌধুরী-পরিচালিত 'সবুজ-পত্র' গোষ্ঠীর তিনি ছিলেন একজন সক্রিয় সদস্য। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার তিনি ছিলেন প্রেরণার এক সুমহান্ উৎস। তিনি একবার বলিয়াছিলেন, আমাদের পার্থিব জীবনের এমন কোন ভাব, এমন কোন ভাবনা নাই, যাহাকে বাংলা ভাষায় রূপ দান করা যায় না। বাংলা ভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন সম্ভব—ইহা তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত। তাঁহার এই অকৃত্রিম ভাষা ও সাহিত্য-প্রীতির জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে তাঁহার 'বিশ্ব-পরিচয়' গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন। সংগীত এবং বৈঠকী আলোচনায় ছিল তাঁহার সমান আগ্রহ। নিজে এস্রাজ বাজাইয়া তিনি তাঁহার অবসর বিনোদন করিতেন। পশুপাখিদের প্রতিও ছিল তাঁহার সুগভীর প্রীতি।

জীবনের অন্যান্য দিক্-দিগন্ত

বিভিন্ন দিক দিয়া বিশ্ব-বিশ্রুত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের সঙ্গে তাঁহার ছিল গভীর সাদৃশ্য। সেইজন্য তাঁহাকে 'বাংলার আইনস্টাইন' বলা হয়। বিশ্ব-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরমাণুর মৌল কণিকাগুলির একশ্রেণীকে তাঁহার কৃতিত্বের সম্মানে তাঁহারই নামে নামাঙ্কিত করা হইয়াছে—'বোসন'। এই 'বোসন'গুলি অবিনশ্বর। বিশ্ব-বিজ্ঞানের ইতিহাসে বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অবদানও তেমনি অবিনশ্বর। যতদিন বিশ্বে 'বোসন' থাকিবে, বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নামও ততদিন উজ্জ্বল মহিমায় বিরাজিত থাকিবে॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী
- বিজ্ঞানে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অবদান
- আইনষ্টাইন ও আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু

কুটির-শিল্প

প্রবন্ধ-সূত্র : সূচনা ॥ ভারতের কুটির-শিল্পের পরাভব ও তার কারণ ॥ বৈচিত্র্য-বিলসিত ভারতের কুটির-শিল্পের বিপুল আয়োজন ॥ ভারতের কুটির-শিল্পের চরম সংকট ॥ ভারতের কুটির-শিল্পের নব-জীবনায়ন ॥ কুটির-শিল্পের উন্নয়ন-প্রয়াস ॥ উপসংহার ॥

অতি প্রাচীনকালেই ভারতের কুটির-শিল্প লাভ করেছিল বিশ্ববিশ্রুত মর্যাদা। ভারতের কুটির-শিল্পজাত পণ্যসম্ভার কিনবার জন্যে পৃথিবীর অভিজাত বিলাসী জাতিরা হাতে কড়ি নিয়ে ভারতীয় পণ্য-সম্ভারের পথ চেয়ে বসে থাকতো। এইভাবে বিশ্বের অপর্যাপ্ত ধন-সম্পদ কুটির-শিল্পের মাধ্যমে এদেশে প্রবাহিত হয়ে আসতো। আসতো ভারতের সুখ, আসতো ভারতের সমৃদ্ধি। অতি প্রাচীনকালেই ভারত 'সোনার ভারত' নামে তার পরিচিতি অর্জন করেছিল। আর, 'সোনার ভারত' নামে এই-যে ভারতের পরিচিতি, তার পেছনে সোনার খনির অবদান ছিল নগণ্য। সোনার খনি ছিল তার উর্বর শস্য-প্রান্তরে, ছিল চরকায়-চরকায়, তাঁতে-তাঁতে, কুটির-শিল্পীদের শিল্পের উপকরণগুলিতে। আজ কোথায় গেল তার ঢাকাই মসলিন? কোথায় গেল তার চন্দ্রকোণা? অতীতের ইতিহাসের পাতায় তারা গেছে নির্মমভাবে হারিয়ে। স্বদেশ-প্রেমিক কবি তাই পরম বেদনায় তার গৌরবময় স্মৃতিকে অশ্রুসিক্ত করে গাইলেন :

সূচনা

'বাংলার মসলিন বোগদাদ রোম চীন
কাঞ্চন তৌলেই কিনতেন একদিন।'

সেদিন আজ আর ভারতের নেই; কলাকুশলী ভারতীয় তাঁতীরা আজ আর বিশ্ব-মানবকে ঢাকাই মসলিনে কিংবা বিখ্যাত চন্দ্রকোণায় সাজায় না। কাশ্মীরের সৌন্দর্য-বিলসিত শাল, দিল্লীর কারুকার্যময় রেশমী বস্ত্র আজ লুপ্তগৌরব। আর পরম বেদনার বিষয়, ভারতের যখন কুটির-শিল্পের স্বর্ণযুগ, তখন ইংরেজদের পূর্বপুরুষেরা ছিল 'চিত্রিত বর্বর' [Painted Savages]। কিন্তু শিল্প-সংঘাতে ভারত পরবর্তীকালে সেই বর্বরদের উত্তর-পুরুষদের হাতে পরাজিত হলো, পদানত হলো তাদের কাছে।

ভারতের এই পরাজয়ের কারণ—সে কোনদিন শক্তিচর্চা করেনি, করেছে শিল্প ও সৌন্দর্য-সাধনা। তাই সে শিল্প-বিপ্লবের আশীর্বাদ-পুষ্ট জাতিগুলির হাতে নির্মমভাবে পরাজিত হলো। তাদের কলকারখানাজাত দ্রব্য-সামগ্রীর কাছে ভারতের কুটির-শিল্পের ঘটলো পরাভব। ঢাকার মসলিন-শিল্পীদের এবং চন্দ্রকোণার তন্তুবায়দের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ-ছেদনের কাহিনী এই ঐতিহাসিক সত্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। রাজনৈতিক বিজয় ইংরেজদের অর্থনৈতিক সিদ্ধি এনে দিয়েছিল; আর ভারতের ভাগ্যে এনে দিয়েছিল শিল্প-বিপ্লবের চরমতম অভিশাপ।

ভারতের কুটির-শিল্পের পরাভব ও তার কারণ

বিদেশী শক্তির আবির্ভাবের পূর্বে ভারতের কুটির-শিল্প ছিল সুপ্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত এবং বৈচিত্র্য-বিলসিত। রেশম ও পশম-শিল্প, তন্তুবয়ন-শিল্প, দুগ্ধজাত পণ্যশিল্প, চর্মশিল্প,

কর্মকৃতি, কুম্ভকৃতি, শঙ্খকৃতি, বেত্র-শিল্প, কাগজ-শিল্প, অলংকার-শিল্প, কার্পেট, সূচী-শিল্প, কাষ্ঠ-শিল্প, ভাস্কর্য-শিল্প, মৃৎ-শিল্প, কাঁচের চুড়ি, ঝিনুক-নির্মিত দ্রব্য, চীনামাটির বাসনপত্র, কাংস্য-শিল্প, চিত্র-শিল্প, মিষ্টান্ন-শিল্প, গন্ধ-দ্রব্য, রঞ্জন-শিল্প ও প্রসাধন-সামগ্রী ইত্যাদি ছিল ভারতের কুটির-শিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। তারপর বিদেশী শক্তির আবির্ভাবে ভারতের কুটির-শিল্পের সেই গৌরব-সূর্য হলো অস্তমিত।

বৈচিত্র্য-বিলসিত ভারতের কুটির-শিল্পের বিপুল আয়োজন

কুটির-শিল্পের গৌরবময় দিনে ভারতের জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশের জীবিকার্জনের সংস্থান করে দিত কুটির-শিল্প। কুটির-শিল্পের শ্রমিক-সংখ্যা ছিল প্রায় দু' কোটি, অর্থাৎ ভারতের জনসংখ্যার প্রায় পনেরো ভাগ। বিলেতের কাপড়ের কলের আক্রমণে একমাত্র তাঁতশিল্পেই প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লোক বেকার হয়ে যায়। বিদেশী শিল্পের সঙ্গে প্রবল সংঘাতে ভারতের কুটির-শিল্পের গৌরব পরিণত হলো ইতিহাসের এক বিস্মৃততম অধ্যায়ে। দীর্ঘকাল চর্চার অভাবে লুপ্ত হলো অতীতের কারিগরী দক্ষতা, শিল্প-প্রকর্ষ ও উৎপাদন-নৈপুণ্য। এদিকে, বেকার-শিল্পীরা জীবিকার প্রত্যাশায় এসে ভিড় করলো কৃষির দুয়ারে। অতিভারগ্রস্ত হয়ে পড়লো ভারতীয় কৃষি। তার উর্বরতা-শক্তি হলো অবক্ষয়িত। ঋণগ্রস্ত, অর্ধভুক্ত, রোগজীর্ণ, স্বাস্থ্যহীন গ্রামীণ শিল্পীরা প্রতি মুহূর্তে শুনেছে মৃত্যুর পদশব্দ। নতুন যুগের সঙ্গে মোকাবিলা করবার মতো তাদের উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি নেই, উৎকৃষ্ট কাঁচামাল নেই, শৈল্পিক দক্ষতা নেই, মূলধন নেই, নতুন আবিষ্কারের জন্যে নেই গবেষণা, পণ্য বিক্রয়ের জন্যে নেই কোন বৈজ্ঞানিক বাজার-পদ্ধতি। এই দুর্দশা থেকে একমাত্র সমবায়ই কুটির-শিল্পকে বাঁচাতে পারে। কিন্তু আজ অধিকাংশ তাঁত-সমবায়ই পরিবারিক ব্যবসায়। ভুয়া নামে অর্থগ্রহণ, তহবিল-তছরুপ ও নানা দুর্নীতিপূর্ণ কার্যকলাপের ফলে কুটির-শিল্পের সর্বনাশ সাধিত হচ্ছে।

ভারতের কুটির-শিল্পের চরম সংকট

কুটির-শিল্পের এই নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি নিয়ে ভারত স্বাধীন হলো। এলো পরিকল্পনার যুগ। শিল্পায়নের আয়োজন চলতে লাগলো দিকে দিকে। কিন্তু কুটির-শিল্প? ভারতের সেই বহু-ঐতিহ্যমণ্ডিত কুটির-শিল্প? ১৯৫৫ সালে হার্ভে কমিটি কুটির-শিল্প ও ক্ষুদ্র-শিল্পের দুর্গতি-মোচনের দিকে অঙ্গুলি-সংকেত করলো। ভারতের অর্থনীতিতে কুটির-শিল্প যাতে তার গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে, তার জন্যে সরকার ও পরিকল্পনা কমিশন সজাগ রয়েছেন। প্রথম পরিকল্পনায় একটি সর্বভারতীয় বোর্ড গঠিত হয়। তা ভারতের ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অন্যদিকে, তাঁত-শিল্প, রেশম-শিল্প, খাদি ও গ্রামোদ্যোগ-শিল্প, ক্ষুদ্রশিল্প, নারিকেল-ছোবড়া শিল্প, হ্যাণ্ডিক্রাফ্‌ট—এই বোর্ডগুলি সমবায় আন্দোলন থেকে প্রাণপ্রবাহ সংগ্রহ করে নবজীবনের পথে চলেছে এগিয়ে। ঋণদান, কারিগরী প্রশিক্ষণ, আধুনিকতম যন্ত্রপাতি-সরবরাহ, উপযুক্ত পণ্য-বিক্রয় ব্যবস্থা ইত্যাদির মাধ্যমে চলেছে কুটির-শিল্পের নব-জীবনায়নের আধুনিক আয়োজন।

ভারতের কুটির-শিল্পের নব-জীবনায়ন

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় বৃহৎ ও ক্ষুদ্র-শিল্পের মধ্যে সুষম ভারসাম্যের গাঁটছড়া বেঁধে দিয়ে ভারতের বৈষয়িক সমৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন ভারত সরকার। কিন্তু বৃহৎ-শিল্পের আগ্রাসী অভিযানে ক্ষুদ্র-শিল্প ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। বৃহৎ-শিল্প ও ক্ষুদ্র-শিল্প যাতে পরস্পরের পরিপূরকরূপে গড়ে ওঠে, সে জন্যে পরিকল্পনা কমিশন সুপারিশ করেছেন: এক. উৎপাদন-বৃদ্ধি ও উৎপাদন-ব্যয়-হ্রাস করবার জন্যে শৈল্পিক দক্ষতা বৃদ্ধি, কারিগরী পরামর্শ দান, উন্নত যন্ত্রপাতি ও ঋণ-সরবরাহ; দুই. বিক্রয়-ব্যবস্থায় উৎসাহ সৃষ্টির জন্যে রিবেট্ দান ও সংরক্ষিত বাজারের ব্যবস্থা; তিন. ক্ষুদ্র শহর ও গ্রামাঞ্চলে কুটির-শিল্পের সম্প্রসারণ; এবং চার. শিল্পীদের মধ্যে সমবায়-প্রথার বহুল প্রচলন। তাছাড়া, ব্যাঙ্ক-রাষ্ট্রায়ত্তকরণ ক্ষুদ্র ও কুটির-শিল্পের খুবই সহায়ক হয়েছে।

কুটির-শিল্পের উন্নয়ন-প্রয়াস

ভারতের কুটির-শিল্পসমূহের পুনরুজ্জীবন শুরু হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় ধান-ভাঙা, তৈল-উৎপাদন, চর্মশোধন, দিয়াশলাই, গুড়, মক্ষিকা-পালন, তালগুড়, হস্ত-নির্মিত সাবান, সুতা ইত্যাদি উৎপাদনের দিকে মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল, এবং তাতে সুফলও লাভ করা গেছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় ক্ষুদ্রশিল্প-উন্নয়ন সাতাশ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে, উৎপাদন করেছে চব্বিশ হাজার কোটি টাকা মূল্যের পণ্য। চতুর্থ পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র ও কুটির-শিল্পের খাতে ব্যয়িত হয়েছে দুশো নব্বই কোটি টাকা। কিন্তু কেবল ঐগুলিই ভারতের কুটির-শিল্পের শেষ কথা নয়। ভারতের অবলুপ্ত কিংবা লুপ্তপ্রায়—অথচ একদা-বিখ্যাত—কুটির-শিল্পের সেই অনবদ্য সৃষ্টিগুলিকে আজ আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। সেজন্য উৎপাদন-উৎকর্ষের সাধনা সম্প্রতি শুরু করেছে ভারতের কুটির-শিল্প। ভারতে ভোগপণ্যের যে বাজার আছে, তা জয় করে বিদেশের বাজারও আজ দখল করতে হবে। তার জন্যে ভারত সরকারের শিল্প-বিভাগ উপযুক্ত বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করেছেন। এই উৎপাদন-বৈচিত্র্য ও উৎপাদন-উৎকর্ষ সম্পাদনের জন্যে আধুনিকতম উপকরণ ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করবার প্রয়াস সূচিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এখন পৃথিবীতে ভারতের কুটির-শিল্পের হারানো বাজার পুনরধিকার করবার জন্যেও সরকার উদ্যোগী হয়েছেন। এ বড়ো আশার কথা। ভারতের অর্থনীতির এই মরাগাঙে আজ বহুদিন পরে আবার জোয়ারের নতুন আবেগ সঞ্চারিত হচ্ছে। কুটির-শিল্পের সমবায়ী নৌকার পালে আজ লেগেছে নতুন যুগের হাওয়া। অভূতপূর্ব গতির প্রেরণায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে কুটির ও গ্রামীণ-শিল্প। বহু শতাব্দীর জড়তা থেকে ভারতের গ্রামীণ-শিল্পের এই নব-জাগরণ ভারতবাসীর জীবনে সত্য হোক, সফল হোক॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- ভারতের কুটির-শিল্প
- বাংলার কুটির-শিল্প
- বাঙ্গালীর শিল্প-সাধনা

প্রবন্ধ-সূত্র : সূচনা ॥ ভারতের মর্মবাণী : মানব-সেবা ॥ মানুষের সেবাই ভগবানের শ্রেষ্ঠ সেবা ॥ মানুষই বড়, শাস্ত্র বড় নয় ॥ অতিথি-সেবা ও দরিদ্র-নারায়ণের সেবা ॥ দুঃস্থের সেবাই শ্রেষ্ঠ মানব-সেবা ॥ উপসংহার ॥

বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?

মা. '৬২, '৬৮

সুদূর গিরি-কন্দরে কিংবা দুর্ভেদ্য অরণ্য-কান্তারে গিয়া মানুষ করে তাহার নির্জন ঈশ্বর-সাধনা। স্বর্গের দেবতার জন্য সে ষোড়শোপচারে সাজায় তাহার পূজার নৈবেদ্য। অথচ তাহার দুয়ার হইতে কত ক্ষুধার্ত ভগবান নিত্য কাঁদিয়া যাইতেছে, সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। সে মানুষকে ঘৃণা করিয়া দেবতার করে পূজা। মানুষের স্পর্শ হইতে দেবতার শুচিতা রক্ষার জন্য নির্মিত হয় গগন-চুম্বী মন্দির। পাষাণ প্রাচীরের দুর্ভেদ্য অন্তরালে দেবতাকে সকল মানুষের সান্নিধ্য হইতে দূরে সরাইয়া আনিয়া স্বার্থপর মানুষেরা তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখে। কিন্তু ঈশ্বর তো কোন একজন মানুষের কিংবা সম্প্রদায়ের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়।

সূচনা

ফলে, তাহাতে সে মানুষকে ত হারায়ই, দেবতার করুণালাভেও হয় বঞ্চিত। এইখানেই তাহার ট্র্যাজেডি। বর্তমান যুগে স্বার্থপর মানুষ অপরের কথা ভাবে না, অপরের দুঃখে তাহার হৃদয় গলে না, অপরের শোচনীয় দুর্দশায় সে সহানুভূতি দেখায় না। মনুষ্যত্বের গৌরব হারাইয়া মানুষের এই অমানুষিকতায় শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ হৃদয়ে অনুভব করিতেন দুঃসহ ব্যথা। মানুষের অন্তরে শ্রীভগবানের বাস। মানুষকে ভালোবাসার অর্থ মানুষের অন্তরবাসী শ্রীভগবানকে ভালোবাসা। মানুষকে ঘৃণা করার অর্থ মানুষের অন্তরচারী শ্রীভগবানকে ঘৃণা করা। তাই বিবেকানন্দ বলিয়াছেন :

'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

ইহা ভারতেরই মর্মবাণী। মানুষের দেহই তো জাগ্রত ভগবানের বাস-মন্দির। মানুষকে ভালোবাসিয়া, মানুষের সেবা করিয়া আমরা আমাদের পরম প্রার্থিত ভগবানের সন্নিহিত হই।

গৌতম বুদ্ধ জীবহিংসা পরিত্যাগ করিয়া সর্বভূতে প্রেম ও মানুষের মধ্যে মৈত্রী স্থাপনের উপদেশ দিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের বাণীও প্রেম, মৈত্রী ও সহিষ্ণুতার বাণী। আর শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী,—সেবার বাণী, মানবতার বাণী। তিনি উপদেশ দিয়াছেন জীবকে শিবজ্ঞানে পূজা ও সেবা করিতে। যে যুগে মানুষ পরস্পর হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতায় কাতর—স্বার্থপরতার কুৎসিত সংকীর্ণতায় মানুষ যখন আপনার স্বজনকে পর্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছে—সেই যুগে মানুষকে দেবতা-জ্ঞান কি সহজে আসে? কিন্তু একবার এই অনুভূতি হৃদয়-মন্দিরে স্থান পাইলে আর মানুষ স্থির থাকিতে পারে না। একদিন বিবেকানন্দ মানব-প্রেমে উদ্বেল হৃদয়ে বলিয়াছিলেন, 'যতদিন ভারতবর্ষে একটি লোকও বুভুক্ষু থাকিবে, ততদিন আমি আমার মুক্তি চাই না।' ইহাই উদার মানব-প্রেম।

ভারতের মর্মবাণী : মানব-সেবা

কেবলমাত্র মন্দিরেই ভগবানের অধিষ্ঠান নয়। বিশ্ব-জোড়া তাঁহার মন্দির। তিনি বিশ্বের স্বার্থপরদের পাষাণ-প্রাচীরের মধ্যে বন্দী না থাকিয়া বিশ্ব-মানবের মধ্যে নামিয়া আসিয়াছেন। সেইখানে অগণিত মানুষের অবারিত বিশ্ব-দেবালয়ে আজ ঘটিয়াছে তাঁহার অধিষ্ঠান। এই বিচিত্র ভুবনে ভগবান অসংখ্য জীবের মধ্যে নানাবেশে আমাদের সেবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। কবি-শ্রেষ্ঠের ভাষায়—

মানুষের সেবাই ভগবানের শ্রেষ্ঠ সেবা

'তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করছে চাষা চাষ—
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ,
খাটছে বারো মাস।'

ভগবান আছেন 'সবার পিছে, সবার নিচে, সবহারাদের মাঝে।' বঞ্চিত, বুভুক্ষু, পীড়িত, আর্ত, আশাহীন, ভাষাহীন সেই সব মানুষের সেবাই ভগবানের শ্রেষ্ঠ পূজা। বিদ্রোহী-কবি নজরুলের কণ্ঠেও এই বাণী—এই যুগবাণী ধ্বনিত হইয়াছে :

মানুষই বড়, শাস্ত্র বড় নয়

'মানুষেরে ঘৃণা করি
ও কারা কোরান, বাইবেল, হায়, চুম্বিছে মরি মরি!
ও মুখ হইতে কেতাব-গ্রন্থ নাও জোর করে কেড়ে।
যাহারা আনিল গ্রন্থ-কেতাব সেই মানুষেরে মেরে
পূজিছে গ্রন্থ ভণ্ডের দল।'

শাস্ত্র মানুষেরই সৃষ্টি। কিন্তু যাহারা শাস্ত্রকে মানুষের উপরে স্থান দিয়া মানুষকে নির্যাতনের যন্ত্রে নিষ্পেষিত করে, তাহারা ধার্মিকের ছদ্মবেশে ভণ্ডের দল। তাহারা মানুষকে ঘৃণা করিয়া করে শাস্ত্রের পূজা। মানুষের স্পর্শকে তাহারা দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়া অর্থহীন সামাজিক রীতি ও সংস্কারের করে আরাধনা। ইহাতে তাহারা প্রকারান্তরে ঈশ্বরের স্পর্শকেই দূরে সরাইয়া রাখে। অদৃষ্টের কী নির্মম পরিহাস!

প্রাচীন ভারতে অতিথি-সেবা ছিল গৃহস্থের পরম ধর্ম। প্রত্যেক পরিবারেই সেকালে একটি করিয়া থাকিত অতিথিশালা। তাহা ছাড়া, দরিদ্রদের সেবার নাম দেওয়া হইয়াছিল দরিদ্র-নারায়ণের সেবা। নরের মধ্যে যিনি আবির্ভূত হন, তিনিই তো নারায়ণ! প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই তাঁহার আলোকিত আবির্ভাব। দীন-দুঃখীর বেশে তিনি সর্বদাই আমাদের হৃদয়ের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, প্রবেশের পথ খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। আমরা কি তাঁহাকে আমাদের হৃদয়ে প্রবেশাধিকার দিব না? পৃথিবীর মানুষের অজস্র দুঃখ। প্রাকৃতিক কারণে সেই দুঃখ অন্তহীন। ঝড়-ঝঞ্ঝা-বন্যা-অগ্ন্যুৎপাত এবং রোগ-শোক-জরা-ব্যাধি পৃথিবীর মানুষকে বেষ্টন করিয়া নিত্য শ্মশান-নৃত্যে মাতিয়া রহিয়াছে। তাহাতে পীড়িতরাই তো আমাদের পীড়িত ঈশ্বর! তাহাদের সেবার মধ্য দিয়া অন্তরে যে অনাবিল তৃপ্তি ও আলোকিত আনন্দের উল্লাস ঘটে, তাহাই তো ঈশ্বরের আবির্ভাব। আমাদের চারিদিকে কাঁদিতেছেন কত ক্ষুধার্ত ভগবান, কত পীড়িত ভগবান, আমরা তাঁহাদের উপেক্ষা করি। দীন-দরিদ্রকে নারায়ণ-জ্ঞানে সেবা করার আদর্শটি

নারায়ণের সেবা

অতি মহৎ। ইহাতে আছে সেবার ঐকান্তিকতা ও নিষ্ঠা—আছে মানুষের মনের উদারতা ও প্রসারতা। ভগবান বুদ্ধ ছিলেন প্রেমের অবতার। তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মের মধ্য দিয়াই বৌদ্ধযুগে জনসেবার জন্য গড়িয়া উঠিয়াছিল নানা প্রতিষ্ঠান। তারপর অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতে ইংরেজদের আগমনের পর খ্রীস্টান মিশনারীদের উদ্যোগে জনসেবার আয়োজন দেখা দেয়। তাহার প্রায় এক শতাব্দী পরে ভারতে গড়িয়া উঠে রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম ইত্যাদি নানা জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান। গান্ধীজীও জনসেবার আদর্শে আত্মনিয়োগ করেন হরিজন-সেবায়।

দুঃস্থের সেবাই শ্রেষ্ঠ মানব-সেবা।

সমাজবদ্ধ মানুষের মধ্যে আর্ত ও পীড়িতের প্রতি কর্তব্য-বোধ স্বাভাবিক। সকল দেশেই দুঃস্থ, পীড়িত, বিকলাঙ্গ, বৃদ্ধ, অসমর্থদের সেবার জন্য প্রতিষ্ঠান আছে। এই সব দুঃস্থ ব্যক্তি সমাজেরই অন্তর্গত। কাজেই, ইহাদের জন্য সমাজের যে কর্তব্য রহিয়াছে, তাহা অনস্বীকার্য। 'আন্তর্জাতিক রেড্ক্রশ' প্রতিষ্ঠান এইরূপ একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। এছাড়া, প্রত্যেক দেশেই দাতব্য চিকিৎসালয়, অনাথাশ্রম, ধর্মশালা, গরীবখানা ইত্যাদি আছে। মানুষ যে সেবার মহৎ আদর্শটি ভুলে নাই, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় কোন আকস্মিক বিপৎপাতের সময়। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি সংঘটিত হইলে দেশের মধ্য হইতেই প্রধানতঃ সেবকদল বাহির হইয়া আর্তদের সেবায় লাগিয়া যায়—বিদেশ হইতে বহু প্রতিষ্ঠান মারফত আসে নানা সাহায্য। এইসব স্বতঃস্ফূর্ত সেবার দৃষ্টান্ত দেখিলে মনে আশার সঞ্চার হয়। মানুষ যে জনসেবার আদর্শ হইতে বিচ্যুত হয় নাই, তাহা দেখিয়া সত্যই মানুষের মহত্ত্বে বিশ্বাস ফিরিয়া আসে।

উপসংহার

জনসেবাই ঈশ্বর-সেবা। সেই সেবার পশ্চাতে কোন প্রত্যাশা কিংবা অভিসন্ধি থাকা উচিত নয়। প্রত্যাশাবিহীন এবং স্বার্থবিমুক্ত জনসেবার মাধ্যমে দেবসেবার ন্যায় এক অনাবিল স্বর্গীয় আনন্দের প্রসাদ অন্তরে লাভ করা যায়। তাহাই প্রকৃত জনসেবকের চরম এবং পরম প্রাপ্তি। জনসেবার আছে বহু দিক। প্রকৃত জনসেবক শুদ্ধ মনে কাজ করিয়া গেলে সেবার মধ্য দিয়া প্রচুর আনন্দ লাভ করিতে পারেন। অনেক ভণ্ড সেবক আত্ম-স্বার্থ সিদ্ধ করিবার জন্য পরোপকারের মুখোস পরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহারা সমাজের কলঙ্ক-স্বরূপ। তাহারা ক্ষুধিতের অন্ন চুরি করে, দুঃস্থের ত্রাণ-ব্যবস্থায় ভাগ বসায়, আত্মসাৎ করে দাতব্য চিকিৎসালয়ের ঔষধপত্রের বহুলাংশ। তাহাদের ন্যায় পাপাত্মা আর কে আছে?

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- জনসেবা, মা. '৬২
- সেবাধর্ম
- অস্পৃশ্যতা নিবারণ
- রোগীর সেবা
- 'জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর', মা. '৬৮

প্রবন্ধ-সূত্র॥ সূচনা॥ পৌরুষ ও দৈব-নির্ভরতা॥ আত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তি॥ সংগ্রামময় পৃথিবী॥ মনুষ্যত্বের বিজয়॥ মানুষের শত্রু : ভয়॥ আত্মশক্তির পুরস্কার॥ উপসংহার॥

সংগ্রামই জীবন

উ. মা. '৭১, '৭৮

'আমি ভয় করব না, ভয় করব না
দুবেলা মরার আগে মরব না, ভাই, মরব না।' —রবীন্দ্রনাথ

এই সংগ্রামময় পৃথিবীতে বাঁচিতে গেলে আসে বহু বিপদ, আসে মৃত্যুর বিভীষিকাময় ভয়াল হাতছানি। আর, চিরকালের সংগ্রামী মানুষ দুর্নিবার বিপদ ও মৃত্যুর কুটিল বিভীষিকাকে উপেক্ষা করিয়া জীবনের বিজয়-সংগীত রচনা করিয়া চলিয়াছে। পৃথিবীর চারিদিকে কত সংঘাত, কত হিংসা এবং মৃত্যুর কত গোপন চক্রান্ত। পদে পদে হিংসার উন্মত্ততা, দিকে দিকে পশু-শক্তির নির্লজ্জ আস্ফালন। সেই সব বিপদ এক চরম ক্ষণে মৃত্যুর দূত-রূপে আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়, কিন্তু বিপদের আগমনে ভীত, সন্ত্রস্ত হইয়া ভয়ের অন্ধকার কোটরে আত্মগোপন করিলে বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। সহসা বিপৎপাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বিপদের সহিত পাঞ্জা লড়িয়া মানুষকে মৃত্যুর উপরে জয়ী হইতে হইবে। তাহাতেই মনুষ্যত্বের গৌরব, তাহাতেই মনুষ্যত্বের মহিমা। তাই মৃত্যুভয়ে ভীত, সন্ত্রস্ত মানুষকে কবি মৃত্যুঞ্জয়ী মন্ত্রে দীক্ষা দিয়া বলেন—'মৃত্যু যারা বুক পেতে লয় বাঁচতে তারাই জানে।'

সূচনা

মৃত্যুর ঘোর-কুটিল চক্রান্ত পদদলিত করিয়া বাঁচার নামই প্রকৃত বাঁচা। বিপদের মুহূর্তে মানুষ অন্তরে অন্তরে বড় দুর্বল হইয়া পড়ে। 'রক্ষা করো, রক্ষা করো'—বলিয়া ঈশ্বরের নিকটে করে কাতর প্রার্থনা। ভগবান তাঁহার পরম নিশ্চিন্ত হাত প্রসারিত করিয়া দিয়া মানুষকে বিপন্মুক্ত করিতে পারেন। কিন্তু তাহাতে মানুষের আত্মশক্তি ও পৌরুষের ঘটে পরাজয়। মানুষের মধ্যেই রহিয়াছে পৌরুষের দুর্জয় শক্তি—সেই শক্তি দ্বারা সে আত্মরক্ষা করিতে পারে, সকল বিপদ-বাধা উত্তীর্ণ হইয়া সে অসাধ্য সাধন করিতে পারে। কিন্তু দৈব-নির্ভরতা দুর্বলতারই পরিচায়ক। দৈব-নির্ভরতা মানুষের পৌরুষকে খর্ব করে, মানুষের অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্ব-শক্তির করে অপমান। যুগে যুগে দৈব-নির্ভর মানুষ শক্তি-হীন হইয়া মদমত্ত শক্তির নিকট পরাজিত হইয়াছে। তাহার স্বাধীনতা বিপন্ন হইয়াছে, তাহার ব্যক্তিত্ব, ধর্মাচরণ, জীবন-যাত্রা বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইতিহাসে রহিয়াছে তাহার কলঙ্কময় সাক্ষ্য। আসল কথা হইল, মৃত্যু জীবনের বিজয়পত্র হাতে লইয়া মানুষের দুয়ারে করাঘাত করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহার হাত হইতে সেই বিজয়পত্র ছিনাইয়া লইতে হইবে। দুঃখ তাহার ছায়া-অনুচর। সেই দুঃখের আগুনে পরিশুদ্ধ হইয়া বাঁচিতে হইবে। পৃথিবীকে খাঁটি সোনা করাই তাহার অভিপ্রায়।

পৌরুষ ও দৈব-নির্ভরতা

তাই দেখা গিয়াছে, সে সব মানুষ আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান্ হইয়া বিপদ-বাধাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছেন, আপন পৌরুষের বলবীর্যে সকল মদগর্বী অহংকারকে পরাজিত করিয়া

মনুষ্যত্বের বিজয়-পতাকা উড়াইয়া দিয়াছেন, তাঁহারা মনুষ্য-সমাজে হইয়াছেন সম্মানিত। ইতিহাস কেবল তাঁহাদেরই নাম এবং তাঁহাদেরই গৌরবোজ্জ্বল কীর্তি-কাহিনী মনে করিয়া রাখে। উত্তরকালও তাঁহাদের জন্তে রচনা করে বিজয়-অর্ঘ্য, সাজায় বরণডালা। তাঁহারা চিরকালের স্মরণীয় ও বরণীয়। প্রাচীন ভারতের ঋষিকণ্ঠ হইতে তাই উচ্চারিত হইয়াছে: 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।' আত্মাকে বলহীন ব্যক্তিরা লাভ করিতে পারে না। তাহার জন্ম চাই শক্তি, চাই পৌরুষ, চাই দুর্জয় সংগ্রামী শক্তি।

আত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তি

এই পৃথিবী সংগ্রাম-মুখর। এখানে বাঁচিতে হইলে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করিতে হইবে। বিরুদ্ধ প্রাকৃতিক শক্তি ভয়াল কুটিল রূপ ধারণ করিয়া মানুষের অস্তিত্বকে বিলুপ্ত করিবার জন্ম অহরহ করিতেছে ঘোর চক্রান্ত। সেই চক্রান্তের উর্ধ্বে উঠিয়া মানুষকে তাহার স্বীয় অস্তিত্ব বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। দুর্বার মরণ-পণ সংগ্রামের মধ্য দিয়া জয়ী হইয়া যদি সে স্বীয় অস্তিত্বকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে, তাহাতেই তাহার চরম গৌরব। এই পৃথিবীতে শক্তিমানেরাই বাঁচিয়া থাকে। আপন অস্তিত্ব রক্ষার জন্ম মানুষের এই-যে সংগ্রাম, ইহার সূচনা হইয়াছে সৃষ্টির সেই আদিম প্রভাত হইতে। চারিদিকে হিংস্র শ্বাপদ, চারিদিকেই ভয়াল মৃত্যুর করাল গ্রাস। পদে পদে তাহার অস্তিত্বকে গলা টিপিয়া হত্যা করিবার জন্ম মৃত্যুর গোপন চক্রান্ত। মানুষ সর্বশক্তি দিয়া তাহার সহিত সংগ্রাম করিয়াছে এবং অবশেষে জয়লাভ করিয়া স্বীয় অস্তিত্বকে বাঁচাইতে সক্ষম হইয়াছে। সেই যুদ্ধই হইল তাহার জীবন-যুদ্ধ—'Struggle for Existence.' ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়, কত বিপদ-বাধা, ঝড়-ঝঞ্ঝা, কত অন্তায়-অবিচার জয় করিয়া সৃষ্টির প্রথম দিনের সেই মানুষ আজও বাঁচিয়া আছে। কিন্তু কোন্ শক্তিবলে তাহার এই বিজয়-অভিযান? কোন্ শক্তির তেজে সে ললাটে পরিয়াছে বিজয়-ললাটিকা? তাহা আর কিছুই নয়; তাহা তাহার মৃত্যু-তারণ দুঃখ-হরণ দুর্জয় আত্মশক্তি।

সংগ্রামময় পৃথিবী

যাহারা দুর্বল-হৃদয় কিংবা ন্যুব্জ-পৃষ্ঠ, কুব্জ-দেহ এবং সদা-শঙ্কিত ও পরমুখাপেক্ষী, তাহারা সেই দুর্জয় আত্মশক্তির সন্ধান রাখে না; পৃথিবী তাহাদের প্রতি চিরকালই বিমুখ। ঈশ্বরের অনুকম্পা প্রার্থনা করিয়া তাহারা দেবতার দেউলে মাথা কুটিয়া মরে, আসন্ন বিপদের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া তাহারা প্রার্থনা করে অলক্ষিত দেবতার বরাভয়। তখন তাহারা ভুলিয়া যায় যে, তাহারাও মানুষ, তাহাদেরও প্রাণ আছে, বাহুতে আছে অমিত শক্তি, অন্তরে রহিয়াছে অপরাজেয় পৌরুষ। ভুলিয়া যায় বলিয়াই তাহারা হয় বিপদের বলি। দুই-বেলা তাহারা তাই মরিয়া বাঁচিয়া থাকে। কিন্তু সেইভাবে মরিয়া বাঁচিয়া থাকার সার্থকতা কোথায়? অন্তরের অপরাজেয় পৌরুষের দ্বারা বিপদ-বাধা জয় করিয়া মনুষ্যত্বের মহিমা প্রচার করিতে হইবে। যুগ যুগ ধরিয়া যে জীবন-ধারা নানা বাধা-বিপত্তি কাটাইয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে, মনুষ্যত্বের বিজয়-গৌরবে তাহা সার্থকতা লাভ করিবে।

মনুষ্যত্বের বিজয়

ভয় মানুষের অবধারিত শত্রু। সে তাহার আত্মশক্তির সুদৃঢ় ভিত্তিকে দুর্বল করিয়া দিয়া সাধন করে তাহার চরম সর্বনাশ। ভয়হীনতাই শক্তি। আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী হইয়া ভয়কে জয় করিতে হইবে এবং পৌরুষে আস্থাশীল হইতে হইবে। 'শক্তি মরে ভীতির কবলে।' সেই শক্তিকে ভীতির কবলমুক্ত করিয়া, ভয়কে পদদলিত করিয়া, ঋজু মেরুদণ্ড লইয়া এই পৃথিবীতে যথার্থ মানুষের মত বাঁচিতে হইবে। নিশ্চেষ্ট ও পর-নির্ভর হইয়া বাঁচিয়া থাকার চেয়ে মৃত্যুও শ্রেয়। সেই মৃত্যুতেও আছে গৌরব। অথচ দুর্বল ও ভগবৎ-নির্ভর হইয়া বাঁচিয়া থাকা চরম অবমাননাকর। যাহারা ভীরু, ভয়ের গুহায় যাহারা সারা জীবন আত্মগোপন করিয়া থাকে, যাহারা মৃত্যুর পূর্বে বহুবার মরে, তাহারা মানবতার কলঙ্ক। মানুষ তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধাহীন, ইতিহাস তাহাদের সম্পর্কে কঠিনভাবে নীরব। ঘৃণ্য ধিকৃত জীবনই তাহাদের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

মানুষের শত্রু : ভয়

আত্মশক্তির আছে মহত্ত্ব, আছে গৌরবময় পুরস্কার। আত্মশক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া যাহারা বিপদের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া জয়ী হয়, তাহারা সসম্মানে বাঁচিতে পারে, মনুষ্যত্বের গৌরবে তাহারা হয় গৌরবান্বিত। কিন্তু পর-নির্ভর, পরমুখাপেক্ষী হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে গেলে আত্ম-ধিক্কারে তিলে তিলে দগ্ধ হইয়া মরিতে হয় মানুষকে। দৈবানুগৃহীত জীবনও অনুরূপভাবে বেদনাদায়ক ও গ্লানিময়।

আত্মশক্তির পুরস্কার

এই পৃথিবীতে বাস করিতে গেলে আছে বিপদ-মৃত্যু, আছে দুঃখ-যন্ত্রণা, আছে ব্যথা ও বেদনা। কিন্তু ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া অন্ধকার গুহায় আত্মগোপন করার মতো অপমান আর নাই। যাহারা বিপদকে ভয় করে, বিপদ তাহাদেরই বেশী করিয়া গ্রাস করে, তাহারাই বেশী করিয়া বিপন্ন হয়। ভয়ের নিকট হইতে পলায়ন করিয়া তাহারা নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান করে। কিন্তু যে আশ্রয়কে তাহারা নিরাপদ মনে করে, তাহাই বিভীষিকার ভয়াল মূর্তি ধরিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়। কাজেই, ভয়ের নিকট নতি-স্বীকার নয়, ভয়কে আপন শক্তি ও সাহসের দ্বারা জয় করিতে হইবে। ভীরুতা, কাপুরুষতা ও ক্লীবতা পরিহার করিয়া নির্ভীক পুরুষকারের শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে। উঠো, জাগো, আত্মার ভাস্বর তেজে তেজস্বী হইয়া জাগিয়া উঠো। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।' কারণ দুঃখ ব্যতীত সুখ পাওয়া যায় না। তাই কবি বলেন—'দুবেলা মরার আগে মরব না, ভাই, মরব না।' আসুক বাধা, আসুক বিপদ, আসুক মৃত্যু। ভীত পলাতকের মতো ঘরের কোণকে আশ্রয় করিয়া কিছুতেই আমরা মরিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারিব না। ভাগ্যকে ডাক দিয়া বলিব : 'পূজা দিয়া পদ করি না ভিক্ষা, বসিয়া করি না তব প্রতীক্ষা, কে কারে জিনিবে হবে পরীক্ষা—আনিব তোমারে বাঁধিয়া।'

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- 'দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?' উ. মা. '৬১
- 'বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা/বিপদে আমি না যেন করি ভয়'

৪৭. যে শুইয়া থাকে তাহার ভাগ্যও শুইয়া থাকে

প্রবন্ধ-সূত্র : সূচনা। মানুষের মধ্যে সম্ভাবনা ও তাহার বিকাশ-প্রয়াস। মানুষের দুঃখের জন্য মানুষ নিজেই দায়ী। পৃথিবী কর্মময়, কর্মেই মানুষের পরিচয়। উপসংহার।

মা. '৫২ ; উ. মা.' ৬১, '৬৭

মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য-নিয়ন্তা। মানুষের আকাঙ্ক্ষা যেমন অসীম, তাহার রূপদানের ক্ষমতাও তেমনি প্রচুর। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আছে শক্তির স্ফুলিঙ্গ। কিন্তু সেই স্ফুলিঙ্গ থাকে ভস্মাবৃত। চেষ্টা কিংবা পরিশ্রমের জোরে সেই ভস্মরাশি অপসারিত হইলে মানুষের অন্তর্লীন অগ্নিশিখা স্ব-মহিমায় ভাস্বর হইয়া উঠিবে। মানুষের অন্তর-শায়ী সুপ্তিময় চেতনার উদ্বোধনে ব্যক্তি-জীবন আলোকিত হইয়া উঠে। চাই কেবল সুপ্তি-ভঙ্গের আয়োজন, চাই কর্মনিষ্ঠা, চাই আত্মবিশ্বাস। মানুষ যখন জড়তাগ্রস্ত থাকে, যখন তাহার চেতনাশক্তি থাকে অন্ধ তামসিকতায় আচ্ছন্ন, তখন সে ভীত, দুর্বল এবং পরমুখাপেক্ষী। সেই অবস্থায় সে তাহার দুর্জয় আত্মশক্তির সন্ধান পায় না। তাই সে তখন অসহায় শিশুর মতো সভয়ে আর্তনাদ করিয়া উঠে। বিচার-বিবেচনাহীন ভাগ্যের হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া খোঁজে জীবনের ঠিকানা। তখন সে শক্তিহীন; বিশ্বের সকল কর্মের অযোগ্য এবং সকলের কৃপার পাত্র। কিন্তু যখন মানুষ স্ব-বলে সেই জড়তা-মোচন করে, যখন ছিন্ন করে তাহার মোহাবরণ, তখন জাগ্রত চেতনার প্রখর সূর্যালোকে ঘটে তাহার আত্মোপলব্ধি। সেই আত্মোপলব্ধি তাহার জীবনের সকল সম্ভাবনার দুয়ার খুলিয়া দেয়।

সূচনা

মানুষের মধ্যে সুপ্ত রহিয়াছে তাহার বিপুল সম্ভাবনা। সেই সম্ভাবনার সীমানা তাহার জানা নাই। গভীর আত্মানুসন্ধান ব্যতীত সেই সম্ভাবনার পরিচয় লাভও অসম্ভব। মানুষ যখন নিজেকে জানিতে পারে, যখন চিনিতে পারে তাহার গভীর সম্ভাবনার স্বরূপ, তখন সে শক্তির উল্লাসে উল্লসিত হইয়া উঠে, সে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে নব নব কর্ম-প্রেরণায়। তখন তাহার চারিদিকে জড়তা ও নৈষ্কর্ম্যের পাষাণ-প্রাচীর ধূলিসাৎ হইয়া যায়। এক বিশাল কর্ম-প্রভাত তাহার সম্মুখে ফাটিয়া পড়ে। তরুণ গরুড়ের মতো তাহার কর্ম-ক্ষুধা বিশ্বগ্রাস করিতে চায়। প্রাণোন্মাদনায় সে তখন বলিয়া উঠে :

মানুষের মধ্যে সম্ভাবনা ও তাহার বিকাশ-প্রয়াস

'আমি উন্মাদ, আমি উন্মাদ !
আমি সহসা আমারে চিনিয়া ফেলেছি,
আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ।'

মানুষ যখন আত্ম-পরিচয় লাভ করে, তখন তাহার সকল বাঁধনই খুলিয়া যায়, খুলিয়া যায় তাহার আত্ম-বিকাশের সিংহদ্বার। দিয়াশলাইর বাক্সে ক্ষুদ্র কাঠিগুলি সামান্য বারুদ-লিপ্ত হইয়া সুপ্তিমগ্ন থাকে। তাহার মধ্যে যে কী প্রচণ্ড বিস্ফোরণ লুকায়িত রহিয়াছে, সুপ্ত রহিয়াছে কী বিপুল দাবানল, তাহা সে জানে না। অল্প ঘর্ষণেই সে এক প্রলয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড বাধাইয়া দিতে পারে।

বলিয়া সকলেই তাহার কথা উড়াইয়া দেয়। কিন্তু আলোর আহ্বানে যাহার প্রাণে জাগরণের বাণী পৌছিয়াছে, মুক্তির আনন্দে যাহার হৃদয় নাচিয়া উঠিয়াছে, যাহার প্রাণ জাগিয়া উঠিয়াছে, সে কখনও বিরুদ্ধ সমালোচনায় কাতর হয় না। সকলের উপহাস, বিদ্রূপ ও ষড়যন্ত্রকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া সে বাহির হইয়া পড়ে মহামুক্তির ঠিকানার অন্বেষণে। সমালোচনার সকল ঝড়-ঝঞ্ঝা পদদলিত করিয়া সে ছুটিয়া চলে সত্যের অমোঘ আহ্বানে।

প্রাণের জাগরণ

এইভাবে এই দ্বন্দ্ব-কুটিল পৃথিবীতে যীশু খ্রীস্ট, ভগবান বুদ্ধ ও শ্রীচৈতন্যের যুগ-নির্দিষ্ট জ্যোতির্ময় আবির্ভাব ঘটিয়াছে। অজ্ঞানতার ঘোর-কুটিল অন্ধকারে আলোর প্রথম রশ্মি তাঁহাদের হৃদয়ে অনিবার্যভাবে প্রবেশ করিয়াছিল এবং তাহার ফলে আত্মসুখ, আত্মসর্বস্বতার বন্ধন তাঁহাদের বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। যে প্রাণ জাগিয়াছে, যে প্রাণে আলোকের বাণী পৌছিয়াছে, সে প্রাণ সংসারের স্বার্থমগ্নতার মধ্যে বসিয়া থাকিতে পারে না। বুদ্ধ-যীশু-শ্রীচৈতন্য মহামানবতার উদার প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া মহাজীবনের উদাত্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন। প্রথমে তাঁহাদের অমৃতময় বাণী কেহ শোনে নাই। উপহাস ও বিদ্রূপের বিষ-বাণে তাঁহাদের হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ পাগল বলিয়া উপহসিত হইয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যের অনুচর নিত্যানন্দের কপালে জুটিয়াছে কলসীর কানা, ক্রুশে প্রাণ দিতে হইয়াছে ভগবান যীশুকে। অন্ধকারের অধিবাসীরা আলোকতীর্থের বলাকাদের কণ্ঠ-সংগীত উপলব্ধি করিতে পারে নাই। কিন্তু তাহাতে বিলুপ্ত হয় না মহাজীবনের সত্য-স্বরূপ। কালক্রমে অন্ধকার অপসারিত হয়। মহাজীবনের সত্য-স্বরূপ প্রখর সূর্যালোকের মতো একদিন সারা পৃথিবীতে ফাটিয়া পড়ে। বিশ্বের মূঢ়দের তখন নতজানু হইয়া ক্ষমা-ভিক্ষা করিতে হয়।

আলোর প্রথম রশ্মি

কিন্তু বিশ্বপথের পথিক যে, সে 'মিথ্যা আপনার সুখ, মিথ্যা আপনার দুঃখ' বলিয়া প্রথম প্রভাতে বাহির হইয়া পড়ে। স্বার্থমগ্নতার সংকীর্ণ সীমাবেষ্টনী অবলীলায় অতিক্রম করিয়া, ক্ষুদ্র সংসারের সকল মায়া-মোহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া যাত্রার জন্য সে উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়ে। মানুষের দুঃখ-বেদনা দূর করিবার দুশ্চর ব্রত গ্রহণ করিয়াছে সে। আপনার তুচ্ছ সুখ-দুঃখের কথা চিন্তা করিবার সময় তাহার কোথায়? কবি সেই ঘরছাড়াদের উদ্দেশে আশীর্বাদ-বাণী পাঠাইলেন :

যাত্রা-শুরু

'ঘরের মঙ্গল-শঙ্খ নহে তোর তরে
নহে রে সন্ধ্যার দীপালোক,
... ...
পথে পথে অপেক্ষিছে কালবৈশাখীর আশীর্বাদ
সেই তোর রুদ্রের প্রসাদ।'

সম্মুখে ক্ষুরধার-নিশিত দুর্গম পথ। সেই পথে তাহাকে অগ্রসর হইয়া চলিতে হইবে। অন্ধকার ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ রাত্রি। সেই ঘোর অমানিশার বুকে চলিবে তাহার দুঃখময় রাত্রির তপস্যা। তাহার তপস্যার সিদ্ধিরূপে পূর্ব-দিগঞ্চলে দেখা দিবে নূতন অরুণোদয়। অন্ধকারের বন্ধুর যাত্রা-পথে চলিবার সময় সে খুঁজিবে পথের সাথী, উদাত্ত

কণ্ঠে ডাক দিবে অন্ধকারের কোটর হইতে বাহির হইয়া আসিবার জন্য। কিন্তু কেহ সাড়া দিবে না। তমসাময়ী ঝটিকা-মুখর রাত্রিতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া সকলেই ঘুমাইবে। কিন্তু যে ঝড়ের পথিক, সে তাহাতে উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হইবে না। সে ঝড়কেই করিবে তাহার পথের সাথী। তাহার চরণ-যুগল হইতে রুধির-স্রোত ছুটিবে, পদে-পদে বিপদ-বাধা আসিয়া তাহার অগ্রগমনের পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইবে। রক্তাক্ত পদতলে সেই বাধাবহুল, কণ্টকাকীর্ণ পথরেখা দলিত করিয়া আলোকের বাণী, মুক্তির বাণী আনিবার জন্য ছুটিয়া চলিবে নিঃসঙ্গ, একাকী পথিক। অন্ধকারে পথ দেখা যাইবে না। তাহার অন্ধকারাবৃত পথ আলোকিত করিবার জন্য কেহ আলো ধরিবে না। নিরালোক অন্ধকারে সে আপনার অন্তরের অনির্বাণ আলোতে নির্ভীক প্রাণে চলিতে থাকিবে। ঝড়-ঝঞ্ঝা-বজ্রপাতে সে অন্তরের সেই পবিত্র আলোক-শিখাকে নির্বাপিত হইতে দিবে না। সুমহান্ আদর্শের সেই আলোক-শিখায় বক্ষের পঞ্জর জ্বালাইয়া ধরিয়া সে চলিতে থাকিবে উদয়-দিগন্তে। 'যদি মৃত্যুর মাঝে নিয়ে যায় পথ সুখ আছে সেই মরণে।'

পথের সাথী

নিঃসঙ্গতা

পৃথিবীতে যত মহান্ আদর্শের উদ্‌যাপন এইভাবেই সম্ভব হইয়াছে। এইভাবেই যুগে যুগে মানুষের দুয়ারে আবির্ভূত হইয়াছে আলোকোজ্জ্বল নব-প্রভাত। আদর্শের উদ্‌যাপনে জীবন তুচ্ছ করিয়া ক্ষুরধার-নিশিত দুর্গম পথে উদ্দাম পথিক ছুটিয়া গিয়াছে। দুঃখের রাত্রির বজ্রাগ্নি-শিখায় তাহার আদর্শের চরম অগ্নিপরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। সেখানে মৃত্যু তাহার সকল ভয়াবহতা হারাইয়া মোহন-সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। মৃত্যুর হাতে জীবন তুলিয়া দিয়া আদর্শের জয়গান গাহিয়া কত মহাপ্রাণ এইভাবে মানুষের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন।

সফলতা

জড়তাগ্রস্ত, তন্দ্রাচ্ছন্ন সমাজের বুকে নূতন প্রাণ-চেতনা আনিবার জন্য এইভাবে কত একক, নিঃসঙ্গ পথিক দুর্বার বেগে ছুটিয়া গিয়াছে। আদর্শহীন, নৈতিক মনোবলহীন সমাজ যখন জড়তার অন্ধকারে ও নীতিভ্রষ্টতার পাপে ডুবিয়া থাকে, তখন মহান্ আদর্শ ও নীতির আলোক-বর্তিকা হাতে ধরিয়া সঙ্গীহীন পথিক ঘরের বাহির হইয়া পড়ে। কেহ তাহার হাত ধরে না, কেহ তাহার সঙ্গে চলে না। তাহাতে তাহার আক্ষেপ নাই। সে একাকী পথ চলে। সে সমগ্র সমাজে আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়া মানব-মুক্তির স্বপ্নকে সফল করিয়া তোলে। এইভাবে যুগে যুগে সেই ঘরছাড়ার দল সমাজে সূর্যোদয়ের বাণীকে সফল করিয়া তুলিয়াছে। তাহাদের স্বপ্ন ও সাধনায় সমাজে আসিয়াছে নূতন যুগ, নূতন চেতনা। তাহাদেরই চলার বেগে গতিচঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে সকল দেশের, সকল কালের গতিহীন, স্থবির সমাজ॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- আদর্শ ও তাহার রূপায়ণ
- 'রইল যারা পিছুর টানে কাঁদবে তারা কাঁদবে।'
- 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে।'
- জীবনের মূল্য আয়ুতে নহে, কল্যাণপূত কর্মে।

ভারতের বেকার-সমস্যা ও তাহার প্রতিকার

প্রবন্ধ-সূত্র ঃ সূচনা। বেকারত্বে শক্তির অপচয়। শিল্প-প্রসার ও বেকার-সমস্যা। পল্লী-অর্থনীতির দুর্বলতাঃ কৃষি ও কুটির-শিল্প। স্বাধীন ভারতে শিল্পে বেকারত্ব। বেকার-সমস্যার সমাধান ঃ শিক্ষার সংস্কার ও সুযোগ-সৃষ্টি। পরিকল্পনাকালীন নিয়োগ-সমস্যা। পশ্চিমবঙ্গের বেকার-সমস্যার রূপ-চিত্র। প্রতিকার ও প্রতিরোধ। উপসংহার।

আজ বেকার-সমস্যার নিদারুণ অভিসম্পাত ছড়িয়ে পড়েছে সমগ্র ভারতে। স্বাধীনতালাভের পর ভারতের যুব-সমাজ স্বপ্ন দেখেছিল এক নয়া সমাজের, যেখানে অর্থ-সংকট থাকবে না, থাকবে না সর্বনাশা বেকার-সমস্যা। কিন্তু সে স্বপ্ন ভেঙে গেছে। ভারতের কর্মহীন বেকার যুব-সমাজ নিদারুণ অপচয়ে আজ দেউলে, সর্বস্বান্ত। সৃজনশীল যে কর্মশক্তি সৃষ্টির নব-নব প্রেরণায় মেতে উঠতো, আজ তা অপচয় ও অবক্ষয়ের শোচনীয় পরিণামে ক্লান্ত, অবসন্ন ও দিশাহারা।

সূচনা

অথচ প্রাণশক্তির অফুরন্ত উৎস এই যুব-সমাজ কত ব্যর্থ সাধনাকেই না সার্থক করে তুলতে পারতো। দ্বি-শতাব্দীর বিদেশী শাসনে ক্লান্ত, অবসন্ন ভারতকে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আঘাতে সর্বস্বান্ত ভারতকে, স্বাধীনতার অভিশাপে দ্বিখণ্ডিত ভারতকে ইংরেজ 'লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনা-স্তূপ'রূপে পরিত্যাগ করে চলে গেল। আর, ভারতবাসীর হাতে উপঢৌকন দিয়ে গেল শতাব্দী-লালিত বেকার-সমস্যা।

বেকারত্বে শক্তির অপচয়

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সস্তায় শ্রমিক সহজলভ্য করে রাখার জন্যে ইংরেজ এদেশে কৃত্রিম বেকার-সমস্যা সৃষ্টি করে তাকে জীইয়ে রেখেছিল গত দু'শতাব্দী ধরে। তারপর মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসস্তূপের ওপর গড়ে উঠলো ধনতন্ত্রের ইমারত। সমাজ-ব্যবস্থার হাতিয়ার এলো ধনিক-শ্রেণীর হাতে। কল-কারখানা ইত্যাদি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে ধনপতি-গোষ্ঠী মুনাফার অঙ্ক বাড়াবার জন্যে যন্ত্রশক্তির ব্যবহারের দিকে মন দিল। যন্ত্র এসে মানুষের হাতের কাজ কেড়ে নিল, হরণ করে নিল তার জীয়ন-কাঠি। কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হলো একটা, শত-শত তাঁতীর তাঁত বন্ধ হয়ে গেল, বেকার তাঁতী হলো মৃত্যু-পথযাত্রী। তেলের কল কেড়ে নিল শত-শত কলুর হাতের কাজ, ধানের কল বেকার করে দিল অসংখ্য ধান-ভাঙানী গ্রামীণ মেয়েদের।

শিল্প-প্রসার ও বেকার-সমস্যা

শহরগুলিতে বেকার-সমস্যা শিল্পগত, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে তা বিশেষভাবে কৃষিগত। চাষাবাদ এদেশের ঋতুগত পেশা। তাই চাষাবাদের কাজ মিটে গেলে বছরের অর্ধেক সময় ওদের বেকার হয়ে বসে থাকতে হয়। ভারতের ঐতিহ্যময় কুটির-শিল্প বিধ্বস্ত হওয়ায় এবং শস্যাবর্তন ও অনুপূরক জীবিকান্তরের ব্যবস্থা না থাকায় তাদের আলস্যে দীর্ঘ সময় কাটাতে হয়। আবার, চাষাবাদের যে কাজ স্বল্প-সংখ্যক কৃষকদের দ্বারা

সম্পন্ন হয়ে যায়, তা অধিকসংখ্যক কৃষকের হাতে অল্প সময়ে সম্পন্ন হয়। ফলে, কর্মহীনতার কাল-পরিমাণ যায় বেড়ে। কাজেই, পল্লী-অঞ্চলের বেকারত্বের স্বরূপ হলো কর্মাভাব। এই প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের অভিশাপ শহর ও শিল্পাঞ্চলকে স্পর্শ করে। কর্মহীন কৃষক এবং কৃষি-শ্রমিক কর্মের সন্ধানে শিল্পাঞ্চলে এসে ভিড় করে। শিল্পাঞ্চলে আবার বেকার-সমস্যা তীব্ররূপ ধারণ করলে শিল্প-শ্রমিকেরা দল বেঁধে প্রত্যাবর্তন করে কৃষিতে। গ্রামাঞ্চলের এই অর্ধনিয়োগ-সমস্যা ও প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের মৌল কারণ হলো: গ্রামাঞ্চলে দ্রুতহারে জনবৃদ্ধি এবং কৃষির অনগ্রসরতা। সেজন্যে পল্লী-অঞ্চলে জন্ম-শাসন প্রবর্তন আশু প্রয়োজন। সেইসঙ্গে গ্রামীণ কুটির-শিল্পের পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে অনুপূরক জীবিকার সংস্থান থাকা চাই। সেজন্যে কৃষি ও কুটির-শিল্পকে ঢেলে সাজাতে হবে।

পল্লী-অর্থনীতির দুর্বলতা: কৃষি ও কুটির-শিল্প

ভারতের স্বাধীনতা-লাভের পর বহু বিদেশী শিল্পপতি এদেশ থেকে ব্যবসা গুটিয়ে নিয়ে চলে যায় এবং দেশ-বিভাগের ফলে পাট-এলাকা পূর্ববঙ্গ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় ভারতের চটকলগুলির ভাগ্যে চরম দুর্দিন ঘনিয়ে আসে। ফলে, অসংখ্য চটকল-শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়ে। আবার, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় যোজনায় বিশেষ বিশেষ শিল্পের সুসংবদ্ধ সংস্কারের ফলে এবং বিকল্প নিয়োগ-ব্যবস্থার অভাবের দরুন বেকারত্ব অনিবার্যরূপে দেখা দেয়।

স্বাধীন ভারতে শিল্পে বেকারত্ব

বর্তমান ভারতে শিক্ষিত বেকারের কর্মসংস্থান-সমস্যা আরো ভয়াবহ। বিজাতীয় শাসকগোষ্ঠী এদেশে বাণিজ্য আর শাসনযন্ত্রের চাকা সচল রাখবার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি দিয়ে একদল দক্ষ কেরানী গড়ে তুলতে চেয়েছিল। এবং আমরাও চুয়াল্লিশ কোটি জনগণের ভেতর থেকে মাত্র হাজার কয়েক শিক্ষিত ব্যক্তি পেয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছি। পূর্বে শ'-পিছু শিক্ষিত ছিল দশজন; এখন হয়েছে ত্রিশ। হাজারে-হাজারে শিক্ষিত তো সৃষ্টি হচ্ছে; কিন্তু তাদের কর্মসংস্থান হবে কোথায়? কেবল শিক্ষার পুনর্বিন্যাসেই সমস্যা মিটবে না, সমস্যার প্রকৃত সমাধান নিহিত রয়েছে দেশের শিল্প-প্রগতি ও পর্যাপ্ত-সংখ্যক সুযোগ-সৃষ্টির মধ্যে। দেশে যে-হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে, দেশের শিল্পায়নের গতি তার তুলনায় অতি মন্থর। দেশে যদি দ্রুতগতিতে শিল্পোন্নয়ন সংঘটিত হয়, তবে আরো অধিক-সংখ্যক কর্ম তথা সুযোগ সৃষ্টি হবে। কিন্তু সাম্প্রতিক ভারতের জনসংখ্যা প্রায় ৫৬ কোটি। সেই তুলনায় ভারতের শিল্প-সম্প্রসারণ হয়েছে কতটুকু?

বেকার-সমস্যার সমাধান: শিক্ষার সংস্কার ও সুযোগ-সৃষ্টি

সরকারী হিসেব-মতে, তৃতীয় যোজনান্তে প্রায় ৩ কোটি ১৮ লক্ষ কর্মপ্রার্থী কর্মহীন ছিল। তার মধ্যে কর্মসংস্থান হয় মাত্র ৫১ লক্ষের। কাজেই, ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত ভারতের হাতে ছিল অতিরিক্ত ২ কোটি ৬৭ লক্ষ লোকের নিয়োগ-দায়িত্ব। এদিকে পরিকল্পনা স্থগিত রাখায় ও ব্যবসায়-মন্দা-জনিত ছাঁটাইয়ের পরিণামে এবং তার উপর নবাগত কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা যুক্ত হওয়ায় এখন বেকারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫ কোটির মতো তাছাড়া, অবনিয়োগ-সমস্যার সমাধান-চিন্তা তো আছেই।

পরিকল্পনাকালীন নিয়োগ-সমস্যা

পশ্চিমবঙ্গের বেকার-সমস্যা আরো তীব্র। যুদ্ধোত্তরকালীন ছাঁটাই, দেশবিভাগ-জনিত উদ্বাস্তু-সমস্যা, চটকলগুলির দুরবস্থা, জমিদারী-উচ্ছেদ এবং খাদ্য ও দুরভাষ [telephone]-বিভাগে ছাঁটাইয়ের ফলে অসংখ্য কর্মচারী হলো অন্নের তাগিদে পথের কাঙাল। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু কৃষক পশ্চিমবঙ্গে এসে কৃষি-জমির অভাবে হলো বেকার। তাছাড়া, পাট-সমৃদ্ধ পূর্ববঙ্গ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের ভাগীরথী-তীরের চটকলগুলি কাঁচা-পাটের অভাবে হলো কর্মহীন। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতী, সাক্ষর গৃহস্থ-বধূরা পর্যন্ত আজ পারিবারিক অসচ্ছলতার সমাধানকল্পে কর্ম-প্রার্থিনী। পশ্চিমবঙ্গের পল্লী-অঞ্চলের চিত্র আরো ভয়াবহ। কর্মাভাবে ও খাদ্যাভাবে সম্ভাবনাপূর্ণ বহু পরিবার বেছে নেয় মর্মান্তিক আত্মহননের পথ। পশ্চিমবঙ্গের ন্যায় বেকার-সমস্যা ভারতের কোথাও এত ভয়াবহ নয়।

পশ্চিমবঙ্গের বেকার-সমস্যার রূপচিত্র

বেকার-সমস্যার অর্থ হলো, দেশের বিপুল সম্ভাবনার অপমৃত্যু। মানুষের যে শক্তি ও সামর্থ্য দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ-ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজের সম্পদ-বৃদ্ধিতে নিয়োজিত হতে পারতো, তার অব্যবহারেই বেকারের উদ্ভব। বেকার ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত ভীতিপ্রদ। বেকারত্ব কর্মহীন ব্যক্তির উৎপাদন-নৈপুণ্যকে বিনষ্ট করে এনে দেয় জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে এক গভীর নৈরাশ্যবোধ। বর্তমান ভারতে প্রকৃতপক্ষে তাই হয়েছে। আজ ভারতের দিকে দিকে যে বিক্ষোভ মাথা চাড়া দিয়ে জেগে উঠছে, তার মূল কারণ হলো এই নৈরাশ্যবোধ। বেকাররূপে আজ আলস্যে কিংবা নানা সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে যারা সামাজিক সম্পদ বিনষ্ট করছে, উপযুক্ত কর্মের সুযোগ পেলে তাহাদের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসতে পারতো কতো দক্ষ কর্মী, যারা সম্পদ-সৃষ্টির মাধ্যমে সামাজিক সমৃদ্ধিকে সম্ভব করে তুলতো। মানব-সম্পদ হলো শ্রেষ্ঠ সামাজিক সম্পদ। তার সদ্ব্যবহারে সামাজিক সমৃদ্ধির বান ডাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা তার সদ্ব্যবহার করতে পারিনি। এটা আমাদের সামাজিক ব্যর্থতা। তাই ভারতে আজ বিক্ষুব্ধ, অথচ সম্ভাবনাময় লক্ষ-কোটি মানুষ আত্মঘাতী আক্রোশে সামাজিক সম্পদ ধ্বংস করবার উল্লাসে মেতে উঠেছে।

প্রতিকার ও প্রতিরোধ

কাজেই, বেকার-সমস্যার সমাধানের প্রয়াস ত্বরান্বিত না হলে জাতীয় জীবন পঙ্গু ও স্থাণু হয়ে পড়বে। সমাজের সতেজ শক্তির এই দুঃসহ অপচয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে অনুপস্থিত। সমাজের সকল ব্যক্তির কর্মসংস্থান সেখানে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। ভারতে যদি বিশদকা কর্মসূচী সফল হয়, তবে এই কর্মহীনতা ও দুঃখ-দুর্দশার দুঃসহ নিশার অবসানে এক বিশাল প্রাণ জন্মলাভ করবে। প্রাণশক্তির সেই স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশে সমৃদ্ধিময় ভারত-রচনার স্বপ্ন সার্থক হবে।

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- পশ্চিমবঙ্গের বেকার-সমস্যার কারণ ও প্রতিকার
- পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত বেকার-সমস্যা
- সামাজিক বিশৃঙ্খলার মূল কারণ

প্রবন্ধ-সূত্র : সূচনা। অমাবস্যার রাত্রি : ঝড়ের সূত্রপাত। সন্ধ্যায় ঝড়। অধিক রাত্রে ঝড়। ঝড়ের নূতন অভিজ্ঞতা। সকালের দৃশ্য। স্মরণীয় কেন ?। উপসংহার।

একটি স্মরণীয় ঘটনা

ক. প্রা. '৬২

সেই ভয়াবহ ঝড়ের রাত্রির কথা আমি জীবনেও ভুলিতে পারিব না। এমন ভয়ঙ্কর ঝড় আমি আর কখনও দেখি নাই। জীবনে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার সহিত মানুষের পরিচয় ঘটে। সকল কথা সব সময় মনে থাকে না। কিন্তু এমন এক-একটি ঘটনা মানুষের জীবনে ঘটে, যাহার কথা মানুষ শত চেষ্টা করিয়াও কোনদিন ভুলিতে পারে না। হৃদয়-পটে সেই ঘটনার চিত্র যেন স্থায়িরূপে মুদ্রিত হইয়া যায়।

সূচনা

আমার ক্ষুদ্র জীবনের অভিজ্ঞতাও অল্প। তথাপি সেই ঝড়ের রাত্রির অভিজ্ঞতা আমার মনের মণি-কোঠায় চিরদিনের জন্য সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। যখন কোন নিঃসঙ্গ মুহূর্তে একাকী থাকি, তখন সেই ঝড়ের রাত্রি যেন তাহার বিভীষিকাময়ী মূর্তি লইয়া আমার মানস-চক্ষুর সম্মুখে আবির্ভূত হয়। মনে মনে তাহার ঘোর তমসাময় ভয়ঙ্কর রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া শিহরিয়া উঠি।

সেদিন ছিল অমাবস্যার রাত্রি। সকাল হইতে আকাশে মেঘ জমিতেছিল। কালো-কালো পুঞ্জীভূত মেঘ স্তবকে-স্তবকে পরিগ্রহ করিতেছিল ঘনঘোর রূপ। সারাদিন আকাশ তোলপাড় করিয়া ঝড়ো হাওয়া বহিতেছিল এবং গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির বিরাম ছিল না। এক অজ্ঞাত দুর্যোগের আশঙ্কায় পথ ছিল জনবিরল। পশ্চিমবঙ্গের মফঃস্বলের একটি অখ্যাত শহর। সেই দমকা বাতাস এবং অবিশ্রান্ত বৃষ্টির জন্য পথে লোক-চলাচল প্রায় ছিল না। উন্মত্ত বাতাস ও বৃষ্টির প্রতিযোগিতায় সমস্ত শহর জলসিক্ত হইয়া গিয়াছিল। তাহার মধ্যে কেহ জানে না, কখন সূর্যদেব অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। সারাদিন কেহ সূর্যের মুখ দেখে নাই। কৃষ্ণমেঘাচ্ছন্ন সারাটা দিন রাত্রির মতো প্রতিভাত হইতেছিল। সেদিন ভোরে বাড়ির সবাই কৃষ্ণনগরে মামার বাড়ি চলিয়া গিয়াছে। আমারও যাইবার কথা ছিল। কিন্তু সামনে পরীক্ষা; তাই আমার যাওয়া হইল না। স্থির হইয়াছিল যে,

অমাবস্যার রাত্রি : ঝড়ের সূত্রপাত

সেই কয়টা দিন আমি আমার সহপাঠী বন্ধু রতনের বাড়িতে খাইব এবং ঘরে আসিয়া পড়াশুনা করিব। পরীক্ষা হইয়া গেলে আমিও মামার বাড়ি চলিয়া যাইব। কথা ছিল, পাছে আমি ভয় পাই, তাই রতনও আমার ঘরে ঘুমাইবে। দুপুরে আমি অতিকষ্টে রতনের বাড়ি গিয়া খাইয়া আসিয়াছিলাম। কিন্তু সেদিন ঝড় ও বৃষ্টির বেগ যেভাবে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তাহাতে রাত্রে রতনের বাড়িতে খাইতে যাইবার আশা পরিত্যাগ করিলাম। একটি রাত্রি না খাইয়া কাটাইতে পারি; কিন্তু রাত্রে কি করিয়া একা ঘরে থাকিব? সত্যই সেদিন রতন আসিল না। অন্ধকার ঘরের বাহিরে যখন ঝড়ের প্রচণ্ড তাণ্ডব চলিয়াছে, তখন ঘরের ভিতরে একা বসিয়া আমি প্রতি মুহূর্তে ভয়ের সহিত লড়াই করিতে লাগিলাম।

সূর্যাস্তের পর শহরের বুকে যেন গভীর রাত্রির গাঢ় অন্ধকার গড়াইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের দুর্বার বেগ বাড়িতে লাগিল। শহরের বুকের উপরের গাছগুলো শোঁ শোঁ শব্দ করিয়া সেই দুর্জয় বাতাসের সহিত যেন যুদ্ধ করিয়া টিকিয়া থাকিতে চেষ্টা করিতেছিল। তাহার পর শুরু হইল মুষলধারে বৃষ্টি। ক্রমে দুর্যোগময়ী রাত্রি বাড়িতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে ঝড় এবং বৃষ্টির বেগও ক্রমাগত বাড়িয়া চলিল। কিছু শোনা যায় না, কিছুই দেখা যায় না। ঝড়ের প্রচণ্ড বেগে যেন পৃথিবী দুলিয়া উঠিতেছে। কেবল ঝড়ের গর্জন এবং তাহার মধ্যে বজ্রপাতের গগনবিদারী শব্দ। পৃথিবী যেন সূচীভেদ্য অন্ধকারে ভয়ে আত্মগোপন করিয়া আছে। অন্ধকারের এমন ভয়াল রূপ আমি কখনও দেখি নাই। মাঝে মাঝে অন্ধকারের বুক বিদীর্ণ করিয়া অগ্নিময় সর্পের মতো বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। সেই অন্ধকারের বর্ণনা করিবার মতো শক্তি আমার নাই।

সন্ধ্যায় ঝড়

ঝড়ের বেগ আরও বাড়িতে লাগিল। ভাবিলাম, পৃথিবীর বুঝি অন্তিম দশা উপস্থিত। আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সে এক ধ্বংসের অতলে তলাইয়া যাইবে। দরজা-জানলায় ঝটিকার ভীষণ উদ্ধত পদাঘাত অনুভব করিতে লাগিলাম। এক সময়ে হঠাৎ একটি জানলার কপাট খুলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের প্রচণ্ড তাণ্ডবে ঘরের ভিতরকার সমস্ত কিছু ভিজিয়া ও উড়িয়া গিয়া তছনছ হইয়া গেল। জানালা বন্ধ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ঝড়ের দুর্বার বিক্রমের সহিত যেন আমি মরণ-পণ করিয়া পাঞ্জা লড়িতেছি—এইরূপ শক্তিতে আমি জানলাটা অতিকষ্টে বন্ধ করিলাম। জানলাটা বন্ধ করিলাম বটে, ওদিকে দরজাটা সশব্দে খুলিয়া গেল। এখন কোন্‌দিক সামলাই? এদিকে ঝড় হা-হা করিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া আমাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল। সমস্ত শক্তি দিয়া দরজাও বন্ধ করিয়া শক্ত করিয়া খিল তুলিয়া দিলাম। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, সমস্ত ঘর জলময় হইয়া গিয়াছে। বৃষ্টির জলে আমিও ভিজিয়া গিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে ঝড় অট্টহাস্যে আকাশ ফাটাইয়া গর্জন করিয়া উঠিল। জানলার সামান্য ফাঁক দিয়া তাহার চকিত আলোর চাবুক ঘরের মধ্যে খেলিয়া যাইতেছে। তাহার পর আবার এক সীমাহীন অন্ধকার।

অধিক রাত্রে ঝড়

এখন শীত করিতে লাগিল। উন্মুক্ত জানলা ও দরজার মধ্য দিয়া বাহিরের ঝড়ের যে ভয়ানক রূপ দেখিয়াছিলাম, তাহাতে আমার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গিয়াছিল। বাহিরে ঝড় সমানে চলিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে দরজার বাহিরে ভয়ার্ত করাঘাত শুনিতে পাইলাম। প্রথমে খুলিব কি খুলিব না, ভাবিয়া পাইলাম না। পরে বহু মানব-কণ্ঠের আর্ত চিৎকারে ছুটিয়া গিয়া দরজা উন্মুক্ত করিয়া দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের বেগে ঘরের ভিতর আসিয়া ঢুকিল কুড়ি-পঁচিশটি জল-সিক্ত অসহায় মানুষ। ইহারা আমাদের বাড়ির একটু দূরে কুঁড়েঘরগুলিতে বাস করে। তাহাদের ঘরগুলি খড় আর গোলপাতায় ছাওয়া। সেই খড়-আর-গোল-পাতায়-ছাওয়া দুর্বল চালাগুলি আর কতক্ষণ ঝড়ের সহিত যুঝিতে পারে? ঝড়

ঝড়ের নূতন অভিজ্ঞতা

তাহার প্রচণ্ড তাণ্ডবে কখন তাহাদের উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। তখন নিরুপায় হইয়া সেই নিরাশ্রয় মানুষগুলি আশ্রয়ের প্রত্যাশায় ঝড় আর অন্ধকারের বক্ষ ভেদ করিয়া আমার ঘরের দিকে ছুটিয়া আসিয়াছে।

তাহারা প্রায় ঠাসাঠাসি হইয়া বসিয়া আমার ক্ষুদ্র ঘরে সেই ভয়ঙ্কর রাত্রির অবসান কামনা করিতে লাগিল। কয়েকটি শিশু চিৎকার করিয়া কাঁদিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে ঝড়ের ভয়ঙ্কর তাণ্ডবে ভীত হইয়া তাহারা কাঁদিতেও ভুলিয়া গেল। জলময় আমার ঘর। তাহারাও জল-সিক্ত। শীতে অসহায়ভাবে সকলে কাঁপিতেছিল। অথচ আমার করিবার কিছুই ছিল না। উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় সেই ঘোর তমসাময়ী ঝটিকামুখর রাত্রির অবসান হইল। পূর্ব-দিগন্ত আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। বাহিরে আসিয়া পৃথিবীর যে চেহারা দেখিলাম, তাহাতে মনে হইল, যেন কাল রাত্রে ধ্বংসের দেবতা তাণ্ডবে মাতিয়া পৃথিবীর বুকের উপর একটি মহাশ্মশান সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। কত গাছপালা ভাঙিয়াছে, কত কুঁড়েঘর নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। কত মানুষ মরিয়াছে, পশু যে কত মরিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই।

সকালের দৃশ্য

কেন জানি না, সেই ঝটিকাবিক্ষুব্ধ রাত্রির স্মৃতিকে আমার মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারি না। তবে মনে হয়, সেই রাত্রির যে ভয়াবহ মৃত্যুময় রূপ দেখিয়াছি, সেইজন্যই তাহাকে ভুলিতে পারি না। সেই সঙ্গে অসহায় মানুষগুলির আমার ঘরে আশ্রয় গ্রহণ সেই ভয়াবহতাকে আরও বাড়াইয়া দিয়াছিল। সকালে রাত্রির ঝড়ের যে ধ্বংসাত্মক রূপ দেখিতে পাইলাম, তাহাতে আমার অন্তরাত্মাও কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। পরের দিন সকালে রতন আসিয়া বলিল: 'কাল রাতে আমি আসতে পারিনি বলে তুই একা ভয় পাস নি তো?' মনে মনে রতনের উপর ভারী রাগ হইয়াছিল। কিন্তু রতন সেদিন আসে নাই বলিয়াই তো আমি সেই ভয়াবহ ঝড়ের এমন দুর্লভ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিয়াছিলাম।

স্মরণীয় কেন?

বাস্তবিকই, ঝড়ের এমন দুর্লভ অভিজ্ঞতা আমার আর কখনও হয় নাই। ঝড়ের রাত্রির সেই নিদারুণ অভিজ্ঞতায় আমি বুঝিতে শিখিয়াছি যে, প্রকৃতির মধ্যে যেমন শান্তির প্রলেপ আছে, তেমনি আছে ধ্বংসের তাণ্ডব নৃত্য। শুভ্র জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনী দেখিয়া কখনও ভাবিতে পারি না যে, তাহার অন্তরালে অন্ধ তমসাময়ী ঝটিকা-সংক্ষুব্ধা রাত্রি লুকানো রহিয়াছে। ইহারা প্রকৃতিরই দুইটি রূপ। সেই ঝড়ের রাত্রির নিদারুণ অভিজ্ঞতা আমি জীবনে ভুলিব না॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- তোমার জীবনের স্মরণীয় ঘটনা
- একটি ঝড়ের অভিজ্ঞতা
- একটি ঝড়ের বর্ণনা
- তোমার বাল্যস্মৃতি, ক. প্রা. '৬২

প্রবন্ধ-সূত্র ঃ সূচনা। জীবনের লক্ষ্য স্থির করিবার প্রয়োজন কি? আমার লক্ষ্য কি?। এইরূপ লক্ষ্য স্থির করিবার কারণ। দেশের অবস্থার সহিত আমার লক্ষ্যের যোগ। সার্থকতা। সংকল্পের সাধনা। উপসংহার।

লক্ষ্যহীন জীবন নোঙরহীন নৌকার মতো

শৈশবে বা কৈশোরে মানুষ যে স্বপ্ন দেখে, তাহা কি কখনও সার্থক হয়? কাহারও হয়, কাহারও হয় না। সকলেই জীবনে সফলতা লাভ করিতে পারে না। তবু বড় হইবার জন্য সকল মানুষেরই স্বপ্ন থাকা দরকার। শৈশব হইতেই জীবনের একটি লক্ষ্য থাকা উচিত। মহাসমুদ্রে নাবিক ধ্রুব-নক্ষত্রে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া অকূল বারিধিবক্ষে দিক্-নির্ণয় করিতে পারে। ফলে, সে দিক্-ভ্রষ্ট হইয়া অজানা উপকূলে গিয়া পড়ে না। তেমনি শৈশবেই জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়া, সেই লক্ষ্যকে জীবনের ধ্রুব-তারা করিয়া জীবন-সমুদ্রে পাড়ি দিলে দিক্‌ভ্রষ্ট হইয়া বিপথগামী হইবার কোন আশংকা থাকে না। তবেই জীবনে প্রতিষ্ঠা আসে।

সূচনা

সেই সংকল্পের অভাবে এই সীমাহীন পৃথিবীতে কাণ্ডারীহীন তরণীর মতো কত জীবন ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। জীবনের সার্থকতা লাভ করিতে হইলে একটি দৃঢ় সংকল্প চাই। সেই সংকল্পই হইবে জীবন-তরণীর সদা-জাগ্রত কাণ্ডারী, জীবন-পথের ক্লান্তিহীন অভিভাবক। কবি গাহিয়াছেন—

'মনরে, কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব-জমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফলতো সোনা।'

মানব-জমিনে সোনা ফলাইতে হইবে এবং তাহার জন্য যথাসময়ে বীজ-বপন এবং আনুষঙ্গিক পরিশ্রম ও সাধনার দরকার। তেমনি জীবনের স্বপ্নকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে প্রয়োজন সাধনা, প্রয়োজন ব্রতানুষ্ঠান। জীবনের ধ্রুব-লক্ষ্যে উপনীত হইবার পথে বহু বাধা, বহু বিঘ্ন। কিন্তু তাহাতে পশ্চাৎপদ না হইয়া সম্মুখের স্থির-লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইয়া চলিতে হইবে। তাই জীবনের চলার পথে চাই নির্দিষ্ট এবং সুপরিকল্পিত পথ-রেখা। সেই পথ-রেখাই সফলতার তোরণ দুয়ারে আমাকে উপনীত করিয়া দিবে। সেইজন্যই জীবনের সূচনাতেই লক্ষ্য স্থিরীকৃত হওয়া উচিত।

জীবনের লক্ষ্য স্থির করিবার প্রয়োজন কি?

আমি একজন সুদক্ষ কৃষক হইব। অনেকে হয়ত হাসিবে, হয়ত উপহাস করিবে। কিন্তু আমার জীবনের স্থির লক্ষ্যই হইল কৃষক-বৃত্তি। আমার লক্ষ্যকে অনেকে সামান্য এবং দীন মনে করিতে পারে। যাহারা এইরূপ মনে করে, আমি তাহাদের দোষ দিই না; কারণ দোষ তাহাদের নয়, দোষ তাহাদের দৃষ্টির সংকীর্ণতার। কৃষক বলিলে সকলে আমাদের দেশের গতানুগতিক ধারার মান্ধাতার আমলের সেই কৃষক, যাহাদের শিক্ষা নাই, স্বাস্থ্য নাই, দুই বেলা

আমার লক্ষ্য কি?

দুই মুঠা পেট ভরিয়া খাইবারও সংস্থান নাই, তাহাদের কথা ভাবিয়া থাকে। আমি সেইরূপ কৃষক হইতে চাই না। আমি আধুনিক যুগের শিক্ষিত, সুদক্ষ, বিজ্ঞান-নির্ভর প্রগতিশীল কৃষক হইতে চাই।

প্রাচীন ভারতে কৃষিকে লক্ষ্মী মনে করা হইত। তাই কৃষি সেদিন জনসাধারণের নিকট ভগবতীরূপে পূজিত হইত। কিন্তু বর্তমানকালে সেই দৃষ্টিভঙ্গি আর নাই। আমার বন্ধুদের মধ্যে কেহ হইতে চায় ডাক্তার, কেহ ইঞ্জিনিয়ার, কেহ ম্যাজিস্ট্রেট, কেহ বা মুন্সেফ। সকলে চাকরিকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্যরূপে স্থির করিয়াছে। ভারতে এই চাকরি-প্রিয়তা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, তাহার ফলে সমগ্র দেশে কৃষি-বিমুখতা দেখা দিয়াছে। আমাদের দেশ আর কৃষির উপাসনা করে না। তাই দারিদ্র্য হইয়াছে তাহার নিত্য-সঙ্গী। যে কৃষি আমাদের দেশের অর্থনীতির মূল উৎস এবং যে কৃষি নানা উপায়ে আমাদের দেশের লোকসংখ্যার অধিকাংশের জীবিকার আয়োজন করিয়া দেয়, তাহার পরিচালন-দায়িত্ব মুষ্টিমেয় নিরক্ষর, রুগ্ণ, পরিবর্তন-বিমুখ, দরিদ্র কৃষকদের হাতে তুলিয়া দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছি। ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। কৃষিক্ষেত্র অহল্যার মতো কিছু নূতনের আবির্ভাব-প্রত্যাশায় পথ চাহিয়া বসিয়া আছে। আমাদের শিক্ষিত যুব-সমাজের কেহ কি সেই মাটির ডাকে সাড়া দিবে না? বাস্তবিক পক্ষে, আমার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পশ্চাতে আছে কবিগুরুর একটি গানের সুমহান্ প্রেরণা। তাহা হইল—

এইরূপ লক্ষ্য স্থির করিবার কারণ

'ফিরে চল্ মাটির টানে।'

আমি কবিগুরুর বাণীর নির্দেশে মাটির কোলেই ফিরিয়া যাইতে চাই।

ইংরেজরা ভারতের যাহা কিছু ছিল, সমস্ত শোষণ করিয়া দেশটাকে দীনতার আবর্জনা-স্তূপরূপে ফেলিয়া গিয়াছে। আজ তাহার শিল্প বিধ্বস্ত, তাহার কৃষি অতি-ভারগ্রস্ত। দিনের পর দিন শোষক-শাসকেরা তাহাকে কামধেনুর মত দোহন করিয়া লইয়া গিয়াছে। ক্ষমতার অতিরিক্ত উৎপাদন করিয়া ভারতের কৃষি আজ সর্বস্বান্ত। অথচ স্বাধীনতা-লাভের পর ভারত-গঠনের বিপুল আয়োজন করা হইয়াছে, বহু ব্যয়ও করা হইতেছে। কিন্তু ভারতের কৃষির অবস্থা 'যথা পূর্বম্'। যাহা হইয়াছে, তাহা কাগজে-কলমে, হালে-লাঙলে নয়।

দেশের অবস্থার সহিত আমার লক্ষ্যের যোগ

কৃষিক্ষেত্রের দিকে চাহিয়া দেখি, আজও ভারতের সেই চির-পরিচিত হাসিম শেখ ও রামা কৈবর্তের দল তাহাদের চিরাচরিত পদ্ধতিতে চাষাবাদ করিয়া চলিয়াছে। ভোঁতা লাঙল, রুগ্ণ হালবলদ, নিকৃষ্ট বীজ লইয়া তাহারা সারহীন জমিতে যথাসম্ভব স্বল্প-পরিমাণ ফসল ফলাইয়া চলিয়াছে। সেচের জল তাহারা পায় না। চোখের জলে আর ঘামে মাটি ভিজিয়া উঠে, তথাপি নদী-পরিকল্পনার জল আসিয়া তাহাদের জমিতে পৌঁছায় না। আমি আবার বুক বাঁধিয়া মাথা উঁচু করিয়া সেই হতাশাক্লিষ্ট কৃষকদের পাশে দাঁড়াইতে চাই। আমার কৃষি-সেবার মাধ্যমে যতটুকু সাধ্য দেশ-সেবা করিয়া যাইব। ইহাই আমার জীবনের স্বপ্ন।

সার্থকতা

স্বপ্নের সিদ্ধির জন্য চাই সাধনা। তাই আমি বিজ্ঞান পড়িতে মনস্থ করিয়াছি। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান নয়, কৃষি-বিজ্ঞানই আমার পাঠ্য। কৃষি-বিজ্ঞান লইয়া স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আমি আমাদের কৃষিক্ষেত্রে নামিয়া পড়িব। আমাদের যেটুকু জমি বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছে, সন্নিহিত জমির মালিকদের সহিত বিনিময়ের মাধ্যমে তাহাদের একজোট করিবার চেষ্টা করিব। আমার সেই চেষ্টা সফল হইলে উঁচু বাঁধ দিয়া মধ্যবর্তী সকল আলবাঁধ অপসারিত করিয়া ফেলিব। তারপর আমাদের সামান্য যে পুঁজি আছে, তাহা দিয়া একটা ট্রাক্টর কিনিবার ব্যবস্থা করিব। আমি নিজেই উহা চালনা করিবার কৌশল শিখিয়া লইব। একটা অগভীর নলকূপ বসাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে একটু উঁচু করিয়া একটি মাপসই জলাধার নির্মাণ করিয়া লইতে হইবে। নলকূপ হইতে উত্তোলিত জল উহাতে সঞ্চিত থাকিবে এবং প্রয়োজনমতো ব্যয় করা হইবে। আমি উৎকৃষ্ট বীজ ও সার ক্রয় করিয়া আনিব এবং ফসলের রকমফেরের ব্যবস্থাও করিব। অর্থাৎ, একই ফসল বারবার উৎপাদন না করিয়া মাটির গুণাগুণ বিবেচনা করিয়া নানা প্রকার ফসলের উৎপাদনের ব্যবস্থা করিব। ইহাতে জমির ক্ষয় দূরীভূত হইবে এবং উর্বরতা-শক্তিও বৃদ্ধি পাইবে। আসল কথা, আমি আমাদের এলাকার কৃষকদের সম্মুখে কৃষি-উৎপাদন-পদ্ধতির একটা উজ্জ্বল ও আশাপ্রদ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিব। তাহারা আমার পদ্ধতি অনুসরণ করিলে তাহাদের সম্মুখে রাখিব সমবায়-কৃষি খামারের প্রস্তাব; আমি তাহাদের সকলের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া বাঁচিতে চাই। ইহাতে তাহাদের কল্যাণ হইবে, দেশেরও কল্যাণ হইবে।

সংকল্পের সাধনা

আমার সাধনা তাই কৃষির সাধনা। কারণ কৃষি-সাধনাই দেশের সমৃদ্ধি-সাধনার মূল চাবিকাঠি। কৃষিই দেশের সকল উন্নয়নের রুদ্ধদ্বার খুলিয়া দিবে। কৃষি-লক্ষ্মীর আশীর্বাদে দেশের সকল মানুষের মুখে হাসি ফুটিবে, বুকে জাগিয়া উঠিবে নব নব আকাঙ্ক্ষা। আমার বিশ্বাস, যদি আমার চেষ্টায় কোন ত্রুটি না থাকে এবং মনের একাগ্রতা অটুট থাকে, তবে আমি এ বিষয়ে নিশ্চয়ই সফলতা লাভ করিব। কবি বলিয়া গিয়াছেন—'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।' এই শপথ-বাক্য আমাকে সাফল্যের সিংহদ্বারে পৌঁছাইয়া দিবে, আমার প্রাণে নূতন উদ্যম ও নূতন প্রেরণা জোগাইবে। আর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিব—

উপসংহার

'তোমার পতাকা যারে দাও
তারে বহিবারে দাও শকতি।'

আমাকে শক্তি দাও, সামর্থ্য দাও; প্রাণে আর মনে দাও স্বপ্ন-সাধনার উৎসাহ॥

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- জীবনের লক্ষ্য
- আমার জীবনের লক্ষ্য
- তোমার জীবনের লক্ষ্য
- তোমার জীবনের প্রধান আকাঙ্ক্ষা ও তাহা সফল করিবার উপায়, উ. মা. '৬৪

প্রবন্ধ-সূত্র: সূচনা। সভার সময় ও উদ্দেশ্য। পুরস্কার-দানের উপকারিতা। অপকারিতা। প্রস্তুতি। সভাপতি ও প্রধান অতিথি। উৎসব-বর্ণনা। প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের ভাষণ। সভাপতি মহাশয়ের ভাষণ। সমাপ্তি। উপসংহার।

৫২. স্কুলের পুরস্কার-বিতরণী সভা

উ. মা. '৬৪ ; ক. প্র., '৬১

আনন্দ ও আবেগ আর কোন বাধা মানিতেছিল না। দিনরাত কেবল চিন্তা।—কেমন করিয়া সভাপতি মহাশয়ের হাত হইতে শ্রেষ্ঠ পুরস্কারগুলি ছিনাইয়া আনিব।—কেমন করিয়া দর্শকবৃন্দের সপ্রশংস করতালি জয় করিব।—কেমন করিয়া নিজের কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া সকলের প্রীতি ও আশীর্বাদ কুড়াইব! ভাবিতে ভাবিতে রাত্রির নিদ্রা তিরোহিত হইল, দিনের বেলায়ও স্বস্তি নাই। আমাদের স্কুলের পুরস্কার-বিতরণী সভাটিকে ঘিরিয়া এইভাবে আমাদের কত স্বপ্ন, কত কল্পনাই না মুকুলিত হইতেছিল।

সূচনা

মাসাধিক কাল হইতে প্রত্যহ পাঠান্তে শিক্ষক মহাশয়গণের পরিচালনায় বিদ্যালয়ের কক্ষে কক্ষে চলিতে লাগিল সংগীত, আবৃত্তি ও নাটকের অক্লান্ত মহড়া। কয়টা দিন আমরা ঠিকমতো পড়াশুনায় মন দিতে পারি নাই। আহার-নিদ্রারও ছুটি। কিভাবে সভামঞ্চ সাজানো হইবে, কিভাবে স্টেজ নির্মিত হইবে এবং আমাদের অংশ-গ্রহণ কিভাবে ও কতখানি সাফল্যমণ্ডিত হইবে—ইত্যাদি চিন্তা আমাদের মনকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল। উৎসাহ-উদ্দীপনা-সহকারে প্রস্তুতি তো হইল। এখন কবে আসিবে আমাদের স্কুলের পুরস্কার-বিতরণ দিবস? সে আর কত দেরী?

প্রতি বৎসর পূজাবকাশের পূর্বে আমাদের স্কুলের বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলের উপরই এই পারিতোষিক দেওয়া হয়।

সভার সময় ও উদ্দেশ্য

শ্রেণীর প্রথম তিনজন একটি করিয়া পুরস্কার পায়। তাহা ছাড়া, কয়েকটি বিষয়ে কৃতিত্বের জন্যও কয়েকটি পুরস্কার আছে। এ ছাড়া নিয়মিত উপস্থিতির জন্য পুরস্কার, উত্তম স্বাস্থ্যের জন্য পুরস্কার, ভাল 'মনিটরে'র জন্য পুরস্কার এবং ঐ দিনের অভিনয় ও আবৃত্তির উপর কয়েকটি পুরস্কার দেওয়া হয়।

কাজ করিবার একটি আনন্দ আছে। কিন্তু কাজে উৎসাহ দিলে, উপযুক্ত প্রেরণা দিলে, কৃতিত্বের পুরস্কার দিলে কর্মোদ্যম দ্বিগুণিত হয়। তাহা ছাড়া, কোন পুরস্কার

পুরস্কার-দানের উপকারিতা

ঘোষণা করা হইলে সকলের মধ্যে যে একটা সুস্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়, তাহাতে সকলের অন্তর্নিহিত কর্মশক্তি উৎকর্ষ লাভ করে। সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়া স্কুলে পারিতোষিক দেওয়ার প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে। পুরস্কার মানুষের কর্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে, কর্মে অনুপ্রাণিত করে, অংশ-গ্রহণকারীকে প্রতিযোগিতাপূর্ণ জীবনের যোগ্য করে।

অনেকের মতে, পুরস্কার-দানের একটি কুফলও আছে। যাহারা পুরস্কার-লাভে বঞ্চিত হয়, তাহাদের মনে ইহাতে লাগে একটা পরাজয়ের গ্লানি। তাহার ফল তাহার

জীবনে ভাল হয় না। আত্মধিকার এবং নৈরাশ্যবোধ তাহার জীবনকে অর্থহীন করিয়া তোলে। কিন্তু তাই বলিয়া শ্রেষ্ঠত্বের জন্য মানুষ পুরস্কৃত হইবে না, কৃতিত্বের স্বীকৃতি পাইবে না—ইহা অনুচিত। আমাদের অভিজ্ঞতা হইল, পুরস্কৃত হইবার ফল আমাদের মধ্যে ভালই হয়—আমরা নূতন উদ্যমে কোমর বাঁধিয়া কাজে লাগি এবং পুরস্কার-প্রাপ্ত বালকদের আদর্শে পড়াশুনা করিবার অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া থাকি।

উপকারিতা

দেখিতে দেখিতে আমাদের স্কুলের পারিতোষিক-বিতরণ উৎসবের দিন আসিয়া পড়িল। দুই সপ্তাহ পূর্বে প্রধান শিক্ষক মহাশয় ঘোষণা করিলেন যে, বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরেজি তিন রকম আবৃত্তির জন্য ছাত্রদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হইবে। দশম শ্রেণীতে একটি ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি এবং নবম শ্রেণীর বালকদের জন্য একটি নাটকাংশের কথোপকথনের প্রতিযোগিতা হইবে। প্রতিদিন স্কুলের ছুটির পর পূর্ণোদ্যমে মহড়া চলিতে লাগিল।

প্রস্তুতি

পারিতোষিক-বিতরণ উৎসবের দিনে একজন বিশিষ্ট দেশ-হিতৈষীকে সভাপতি করা হইল। প্রধান অতিথি হইলেন কলিকাতা হাইকোর্টের একজন প্রখ্যাত ব্যারিস্টার। পুরস্কার বিতরণ করিবেন ঐ ব্যারিস্টার মহোদয়ের পত্নী। সেদিন স্কুলের হলঘরে নিমন্ত্রিত বহু গণ্যমান্য লোকের ভিড়। স্কুলের কার্যনির্বাহক সমিতির সম্পাদক, সভাপতি প্রমুখ আসিলেন। আমরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিয়া সেদিন স্কুলে গিয়াছিলাম। সামনে সারিবদ্ধ-ভাবে স্কুলের ছাত্ররা এবং তাহাদের পাশাপাশি অন্যান্য স্কুলের নিমন্ত্রিত ছাত্ররা আসন গ্রহণ করিল। সামনে মঞ্চের উপরে বসিলেন সভাপতি, প্রধান অতিথি এবং তাঁহার পত্নী। যবনিকা উত্তোলিত হইল। সহসা দর্শকগণের কোলাহল স্তব্ধ হইয়া গেল।

সভাপতি ও প্রধান অতিথি

প্রথমে মালা ও চন্দনের ফোঁটা দিয়া সভাপতি ও প্রধান অতিথিকে বরণ করিয়া লওয়া হইল। তারপর উদ্বোধনী সংগীত। উদ্বোধনী সংগীতের পর প্রধান শিক্ষক মহাশয় স্কুলের বিবরণী পাঠ করিলেন। তারপর আবৃত্তির পালা। হলঘরটি সুন্দর করিয়া সাজানো হইয়াছে—আমরা মঞ্চের উপর নির্দিষ্ট স্থানে একে একে গিয়া আবৃত্তি শুরু করিলাম। আবৃত্তি প্রতিযোগিতার জন্য চারজন বিচারক আমাদের দিকে শ্যেনদৃষ্টি মেলিয়া বসিয়াছিলেন। আমার পালা দুইবার আসিল—সংস্কৃত স্তোত্র ও ইংরেজি কবিতা। উভয় আবৃত্তির শেষে আমার ভাগ্যে প্রচুর হাততালি জুটিয়াছিল। ক্রমে সব আবৃত্তি শেষ হইল। তারপর পুরস্কার গ্রহণের জন্য আমরা প্রস্তুত হইলাম। একে একে শ্রেণীগুলির সাধারণ পুরস্কার দেওয়া হইতে লাগিল। আমি দ্বিতীয় পুরস্কার পাইয়া তেমন উল্লসিত হই নাই। কিন্তু যখন সংস্কৃত ও ইংরেজি আবৃত্তিতে প্রথম পুরস্কার পাইলাম, তখন মনের সব গ্লানি কাটিয়া গেল। অন্য ছেলেরাও অনেক পুরস্কার পাইল। সবশেষে প্রধান অতিথি মহোদয় সর্বশ্রেষ্ঠ আবৃত্তির জন্য আমাকে যখন একটি স্বর্ণপদক দিবার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করিলেন এবং আমাকে কাছে ডাকিলেন, তখন আমার বালক-হৃদয় এক গভীর আনন্দে ও

উৎসব-বর্ণনা

বিশ্বাসে দুলিয়া উঠিতে লাগিল। আমি মঞ্চের একধারে গিয়া দাঁড়াইলাম এবং ভয়ে ভয়ে তাঁহার সহিত পরিচিত হইলাম।

তারপর প্রধান অতিথি মহোদয় আমাদের উদ্দেশ্যে একটি সুন্দর বক্তৃতা দিলেন। তিনি আমাদের সকলের প্রাণে এক বিপুল আশা ও বিশ্বাসের বাণী শুনাইলেন। করতালি দিয়া আমরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলাম। প্রধান শিক্ষক মহাশয়ও একটি সুন্দর নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। সবশেষে স্কুলের কার্যনির্বাহক সমিতির সম্পাদক মহাশয় আমাদের স্কুল প্রতিষ্ঠার ইতিহাস এবং তাঁহার ছাত্র-জীবনের কয়েকটি মজার গল্প বলিলেন।

প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের ভাষণ

পরিশেষে, সভাপতি মহাশয়ের ভাষণ। তিনি সকলকে দেশ-সেবক ও সমাজ-সেবক হইতে উপদেশ দিলেন। তিনি তাঁহার উদ্দীপনাময় ভঙ্গীতে আমাদের তরুণ প্রাণে দেশভক্তির এক বিপুল প্লাবন বহাইয়া দিলেন। তাঁহার খদ্দর-পরিহিত সাধারণ বেশ এবং অনাড়ম্বর বাক্যমালা আমাদিগকে অভিভূত করিয়া দিল। অবশেষে তিনি যখন স্বামী বিবেকানন্দের বাণী উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন, 'ভুলিও না, তুমি মায়ের জন্য বলি-প্রদত্ত,' তখন সত্যই আমাদের দেহ ও মন রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। সবশেষে সমাপ্তি-সংগীত।

সভাপতি মহাশয়ের ভাষণ

সভান্তে প্রধান শিক্ষক মহাশয় সভাপতিকে ধন্যবাদ দিলেন। সভা শেষ হইল। আমরা বিপুল কলরব করিতে করিতে যে যাহার পুরস্কার লইয়া বাড়ির পথ ধরিলাম। এই পুরস্কার-বিতরণ উৎসবটির কথা আমার স্মৃতিপটে চির-উজ্জ্বল হইয়া আছে। এই জাতীয় উৎসব আমাদের মনে বড় হইবার আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দিয়া সত্যই আমাদের চরিত্র-গঠনে সাহায্য করে, আমাদের মনের মধ্যে আদর্শবাদের দীপ-বর্তিকা জ্বালাইয়া ধরে।

সমাপ্তি

পুরস্কার-বিতরণী সভা সমাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহা আমাদের জীবনে ব্যর্থ হয় নাই। পুরস্কার-লাভের জন্য ছাত্রদের মধ্যে চলিয়াছে কঠোর প্রস্তুতি, তীব্র প্রতিযোগিতা। কেবল লেখাপড়াতেই নয়, খেলাধূলায়, নিয়মিত উপস্থিতিতে, সদ্ব্যবহারে—সর্ব বিষয়ে প্রস্তুতি চলিতে লাগিল। ইহাতে ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত হইল এক প্রাণোচ্ছল উৎসাহ-উদ্দীপনা, যাহা আমাদের গতানুগতিক স্কুল-জীবনে ছিল অভূতপূর্ব। পুরস্কার-বিতরণী সভার মধ্য দিয়া আমাদের স্কুলে যেন নূতন প্রাণোচ্ছলতা, নূতন জীবনী-শক্তি ফিরিয়া আসিল। এবং তাহা যে আমাদের জীবনে ব্যর্থ হয় নাই, তাহা পরবর্তীকালে প্রমাণিত হইয়াছে।

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- তোমার জীবনের একটি আনন্দময় অভিজ্ঞতা বা স্মৃতি
- একটি সভার অনুষ্ঠান, ক. প্রা. '৬১
- তোমার স্কুলের যে কোনও একটি উৎসবের বিবরণ, উ. মা. '৬৪
- একটি স্মরণীয় উৎসব
- একটি উৎসবের দিন
- উৎসবমুখর একটি দিনের স্মৃতি

প্রবন্ধ-সূত্র : সূচনা। বিস্ফোরণ : ১৮ই মে, ১৯৭৪। বিস্ফোরণের বৈজ্ঞানিক ফলাফল। সাফল্যের সাধনা। আন্তর্জাতিক ফলাফল। অর্থনৈতিক ফলাফল। উপসংহার।

ভারতের প্রথম পরমাণু-বোমা

এতদিনে ভারত সাফল্যের সহিত তাহার প্রথম পরমাণু-বোমাটির বিস্ফোরণ ঘটাইল। সে পরমাণু-বোমার ধ্বংসাত্মক ভূমিকার সহিত সম্যক্ পরিচিত। শান্তির একনিষ্ঠ পূজারী ভারত তাই পরমাণু-বোমার নির্মাণ হইতে এতদিন বিরত ছিল এবং বিশ্বের পরমাণু-শক্তিধর রাষ্ট্রগুলিকে পরমাণু-বোমার নির্মাণ হইতে বিরত থাকিবার জন্য বহু অনুরোধ-উপরোধ করিয়াছে। সে পরমাণু-বোমার ধ্বংসাত্মক লীলার হাত হইতে বিশ্বকে, বিশ্বের মানব-জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের নিকট নিরস্ত্রীকরণ-চুক্তির প্রস্তাব উপস্থাপন করিয়াছে। কিন্তু পরমাণু-বোমার শক্তিতে গর্বান্ধ রাষ্ট্রগুলি তাহার প্রস্তাবকে দুর্বলের প্রলাপ বলিয়া হেলাভরে উপেক্ষা করিয়াছে। বিশ্বের মানব-জাতির কল্যাণ ও বিশ্ব-শান্তির মুখের দিকে চাহিয়া ভারত এতকাল পরমাণু-বোমার নির্মাণ হইতে বিরত ছিল। কিন্তু এবার তাহার সেই বৈরাগ্যের অবসান হইল। সে পরমাণু-বোমার বিস্ফোরণ ঘটাইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও চীন—বিশ্বের পরমাণু-শক্তিধর এই রাষ্ট্রগুলির পাশে নিজের আসনটি আদায় করিয়া লইল।

সূচনা

১৮ই মে, ১৯৭৪। সময় : সকাল ৮টা ৫মি.। রাজস্থানের মরুভূমির ভূগর্ভে ভারতের প্রথম পরমাণু-বোমার বিস্ফোরণের স্বাক্ষর সাফল্যের সহিত মুদ্রিত হইল। এই বিস্ফোরণের জন্য মরুভূমির বুকে ১০০ মিটার গভীর একটি গর্ত খনন করিয়া রাখা হইয়াছিল। গর্তটির আকৃতি ছিল ইংরেজি 'এল' হরফের মতো। গর্তটির বাঁকের মুখে বোমাটি রাখা হইয়াছিল। ঘটনাস্থলের চার কিলোমিটার দূরে নির্মিত হয় একটি উচ্চ পর্যবেক্ষণ-মঞ্চ। পর্যবেক্ষণরত বিজ্ঞানীদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন্য টেলিফোনের ব্যবস্থা রাখা হয়। অত্যন্ত শক্তিশালী টেলিভিশন-ক্যামেরা ছাড়া ভূকম্পন-মাপক যন্ত্র, তাপমান-মাপক যন্ত্র ইত্যাদি পরিকল্পনা অনুসারে বসানো হইয়াছিল। নির্দিষ্ট সময়সূচী ছিল ৮টা ১৫ মি.। কিন্তু আবহাওয়া-বিজ্ঞানীর নিকট হইতে আবহাওয়ার সবুজ-সংকেত পাইয়া চরম মুহূর্তটিকে দশ মিনিট আগাইয়া আনা হইল। ইংরেজি ১৮ই মে, ১৯৭৪ সাল; ভারতীয় সময় সকাল ৮টা ৫ মিনিটে ভারত নূতন যুগে পদার্পণ করিল। নূতন অস্ত্র, নূতন শক্তি ও নূতন সম্মানের অধিকারী হইল সে। সেই নূতন যুগের নাম পারমাণবিক যুগ। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের পরমাণু-শক্তির একচেটিয়া দম্ভের প্রাচীর ভাঙিয়া পড়িল।

বিস্ফোরণ : ১৮ই মে, ১৯৭৪

ভূমিকম্পের প্রচণ্ড আবেগে চার কিলোমিটার দূরের পর্যবেক্ষণ-মঞ্চটি দুলিয়া উঠিল। ঘটনাস্থলের ভূগর্ভ হইতে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইল রাশি রাশি ধূলি, মাটি এবং পাথরের

খণ্ড। সেখানে একটি বিরাট গর্ত সৃষ্টি হইয়া ভূগর্ভের কিয়দংশ একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের আকারে উপরে ঠেলিয়া উঠিয়া আসিল। ভূকম্পন-মাপক যন্ত্রে ভূকম্পনের মাত্রা ধরা পড়িল ৪.৮। সঙ্গে সঙ্গে স্থানটির তেজস্ক্রিয়তা প্রায় দশ কোটি সেন্টিমিটারে উঠিয়া যায়। তাহার ফলে ভূগর্ভের সমস্ত বস্তু গলিয়া গিয়া ও পরে শীতল হইয়া একটি কঠিন আবরণের সৃষ্টি করে। এই প্রচণ্ড তেজস্ক্রিয়তার ফলে রাজস্থানের মরুভূমির ঐ স্থানের বালিকণাগুলি স্ফটিকে পরিণত হইয়াছে।

বিস্ফোরণের বৈজ্ঞানিক ফলাফল

এই সাফল্যের কারিগর হইলেন ভারতীয় পরমাণু-বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদেরা। ইহার উপাদান-উপকরণের সমস্তই ভারতীয়, নির্মাণ-কৌশলও সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়। এই সাফল্যের পশ্চাতে রহিয়াছে দীর্ঘ পঁচিশ বছরের প্রস্তুতি। সীমিত সামর্থ্য ও সংক্ষিপ্ত কার্যসূচী লইয়া ১৯৫৬ সালে ট্রম্বেতে চালু হইয়াছিল প্রথম পারমাণবিক চুল্লী—অপ্সরা। তারপর চালু হইয়াছে সাইরাস, জারলিনা এবং পূর্ণিমা পারমাণবিক চুল্লী। অপ্সরার ক্ষেত্রে বিদেশী সাহায্য ছিল। কিন্তু অন্যান্যগুলির ক্ষেত্রে বিদেশী সাহায্যের পরিমাণ নামমাত্র। এই পারমাণবিক চুল্লীগুলিতে এতদিন চিকিৎসা ও কৃষি-বিজ্ঞানের জন্য নানা আইসোটোপ তৈয়ারী হইয়াছে। কিন্তু ১৯৭৪ সালের ১৮ই মে রাজস্থানের মরুপ্রান্তরে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা ভারতীয় বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্‌দের সুদীর্ঘ এক সাধনার বিস্ময়কর সাফল্য।

সাফল্যের সাধনা

ভারতের প্রথম পরমাণু-বোমার বিস্ফোরণ রাজস্থানের মরুভূমিতে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইয়াছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে। সোভিয়েট রাশিয়া ও ফ্রান্স ভারতের এই ঘটনাকে মোটামুটি সমর্থন করিলেও ব্রিটেন সমালোচনা করিয়াছে। কানাডা চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ আনিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কঠোর সমালোচনা করিয়াছে। চীন অবশ্য কোন রকম আমলই দেয় নাই। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বেশী হৈ-চৈ করিয়াছে পাকিস্তান। তাহার আশঙ্কা, ভারতের পরমাণু-বোমার লক্ষ্যস্থল হইল পাকিস্তানের হৃৎপিণ্ড। কিন্তু ভারতের পক্ষ হইতে জানানো হইয়াছে যে, সেই আশঙ্কা অমূলক। চীনের পরমাণু-বোমা বিস্ফোরণে যে পাকিস্তান আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছিল, ভারতের সাফল্যে তাহার এই আর্তনাদ অবশ্যই অভিসন্ধিমূলক। অন্যান্য সমালোচকদের কেউ কেউ বলেন, ভারত পরমাণু-বোমা আবিষ্কার করিলেও লক্ষ্য-ভূমিতে তাহা বহন করিবার সামর্থ্য তাহার নাই। কেউ কেউ বলেন, ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক দৈন্যদশার মধ্যে পরমাণু-বোমা নির্মাণ এক ধরনের বিলাসিতা। কেউ কেউ আবার বলেন, ভারতের এই সাফল্য নিতান্তই তুচ্ছ। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ভারতের এই তুচ্ছ সাফল্যকে সমালোচকেরা উপেক্ষা করিলেই তো পারেন্। কিন্তু আসল কথা হইল, যাঁহাদের ঘরে পরমাণু-বোমা আছে, তাঁহাদের একচেটিয়া পারমাণবিক মাতব্বরিতে আজ ভারতের পরমাণু-বোমার তেজস্ক্রিয়তার আঁচ লাগিয়াছে। তাই আজ তাঁহারা বেসামাল হইয়া উঠিয়াছেন।

আন্তর্জাতিক ফলাফল

সত্যকথা, ভারতে পণ্যমূল্য অর্থনীতির কোন নিয়ম না মানিয়া দ্রুত বাড়িয়া যাইতেছিল। তাহাতে অনেকের মনে এই ধারণা হইয়াছিল যে, ব্যয়বহুল পরমাণু-বোমার বিস্ফোরণই বুঝি বা ইহার জন্ম দায়ী। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ঘোষণা করেন যে, ইহাতে ৩২ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ইহার জন্ম কোন বিশেষ ব্যয়বরাদ্দও করা হয় নাই। কাজেই, পরমাণু-বোমার বিস্ফোরণ পণ্যমূল্য-বৃদ্ধির জন্ম দায়ী—এ অভিযোগ মিথ্যা। পরমাণু-বোমার বিস্ফোরণ ছাড়াই পণ্যমূল্যের বিস্ফোরণ যে অনিবার্যরূপে দেখা যাইত, তাহাতেও সন্দেহ নাই।

অর্থনৈতিক ফলাফল

সে যাহাই হউক, এই বৈজ্ঞানিক যুগে বিজ্ঞানকে প্রত্যাখ্যান করিয়া অধিক দূর অগ্রসর হওয়া যায় না। বিশেষতঃ, পৃথিবীর অন্যান্য শক্তিমান্ জাতিগুলি যখন পরমাণু-বোমা করতলগত করিয়া দুর্বলতর জাতিগুলিকে পদানত করিবার চক্রান্তে লিপ্ত, তখন ভারতের পক্ষে মান্ধাতার আমলের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিয়া বসিয়া থাকা এক ধরনের মূঢ়তা। আধুনিক সমরাস্ত্রের অভাবে পূর্বে ভারতকে বহু খেসারত দিতে হইয়াছে। ভারত আর সে ভুল করিবে না। বিধ্বংসী পারমাণবিক অস্ত্র যদি ত্যাগ করিতেই হয়, তবে সকল রাষ্ট্রকেই তাহা একসঙ্গে করিতে হইবে। কিন্তু ভারতের নিরস্ত্রীকরণ-প্রস্তাব সকলেই উপেক্ষা করিয়াছে। ভারতকে তাই আজ অন্য পথ ধরিতে হইয়াছে। তবুও ধ্বংসাত্মক কর্মে ব্যবহার না করিয়া পরমাণু-বোমাকে শান্তিপূর্ণ সংগঠনমূলক কার্যে ব্যবহার করিয়া সে আজ বিশ্বের সম্মুখে নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে চলিয়াছে। ইহার দ্বারা খনির বিস্ফোরণ, কৃত্রিম জলাধার বা পোতাশ্রয় নির্মাণ অথবা বড় বড় নদীর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা যাইতে পারে। তাহা ছাড়া, ইহার দ্বারা ভারত যে আত্মবিশ্বাস ও আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করিয়াছে, তাহার মূল্য অপরিসীম। আজ বিশ্বের অনুন্নত জাতিগুলি এই বিশ্বাস অর্জন করিয়াছে যে, চরম দুর্দিনে আজ তাহাদের পাশে কেহ না থাকুক, পরমাণু-শক্তিতে শক্তিধর ভারত নিশ্চয়ই আছে॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- ভারতের সাম্প্রতিক একটি বৈজ্ঞানিক সাফল্য
- ভারতের পরমাণু-বোমা নির্মাণ করা উচিত হইয়াছে কিনা ?
- পরমাণু-বোমা নির্মাণ করিয়া ভারতের কি লাভ হইয়াছে ?

১.

বর্ষার বাংলাদেশ

ক. প্রা. '৬২

সূচনা ॥ গ্রীষ্মের জ্বালাময় হোম-হুতাশনের পর 'অতি ভৈরব হরষে' সজল সঘন নব-বর্ষার আবির্ভাব। সে বাংলাদেশের আকাশে ও মাটিতে আনে রং ও রসের অফুরন্ত উপহার। **বর্ষার আবির্ভাব ॥** বাংলাদেশে বর্ষার আগমন রাজসিক। 'শুষ্ক তাপের দৈত্যপুরের দ্বার ভাঙিবে বলিয়া সে রূপকথার রাজপুত্রের মতো ছুটিয়া আসে।' তাহার রথের ঘর্ঘরধ্বনি শোনা যায়, তাহার বাঁকা তলোয়ার ঝলসিয়া উঠে। **রূপবিস্তার ॥** মাঠঘাট, পথ-প্রান্তর, নদীনালা, খালবিল জলপূর্ণ হইয়া উঠে। পৃথিবীর খরতপ্ত দিনের হয় অবসান। মাটির কঠিন বাধা ছিন্ন করিয়া শস্যশিশুর দল আবির্ভূত হয়। তাহাদের হাতে নব-অঙ্কুরের জয়পতাকা। আসে পুষ্প-বিকাশের লগ্ন। কদম্ব-কেতকী-যূথিকা-গন্ধরাজ-হাস্নাহানার গন্ধবাহারে বর্ষা-প্রকৃতির অনির্বচনীয় প্রকাশ। **গ্রাম-বাংলার রূপশ্রী ॥** দূরে শ্যামায়মান গ্রাম-রেখা, আদিগন্ত জলবিস্তারে শস্যশিশুর নৃত্য, আকাশে কৃষ্ণধূসর মেঘ-বিন্যাস, দিগন্ত-বিলাসী বক-পঙ্ক্তির নিরুদ্দেশ-যাত্রা। শস্য-বিচিত্রা পৃথিবীর জ্বালাময় প্রান্তরে কৃষকদের সংগীতমুখরতা। **বাঙ্গালীর অর্থ নৈতিক জীবনে বর্ষা ॥** বাংলার কৃষক এই ঋতুতে বীজ বোনে, চারাগাছ তোলে এবং রোপণ করে। হেমন্তের খামারে যে রাশি রাশি সোনার ধান উঠিবে, এখন চলে তাহার প্রস্তুতি। বর্ষাই বাংলাকে করিয়াছে শস্যশ্যামলা। বাংলার অন্নবস্ত্র—তাহার সমস্ত ঐশ্বর্য বর্ষার দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভরশীল। **সাংস্কৃতিক জীবনে ॥** বর্ষা বাঙ্গালীর মনোভূমিকে করিয়াছে সরস ও কাব্যময়। অর্থ নৈতিক জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিয়া সে তাহার সাংস্কৃতিক জীবনকে মুক্ত করিয়া দিয়াছে। মেঘকজ্জল বর্ষার সজল পটভূমিকায় রথযাত্রা, জন্মাষ্টমী, ঝুলন, রাখীবন্ধন, বর্ষামঙ্গল, বৃক্ষরোপণ, শেষবর্ষণ অনবদ্য সৌন্দর্যমণ্ডিত হইয়া উঠে। **তাহার কাব্যে ॥** কবি জয়দেব হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাঙ্গালী কবির কণ্ঠ বর্ষার সংগীতে মুখর। আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে মেঘোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার কবিচিত্তে লাগে জলসিক্ত পূবালি হাওয়া। বর্ষা বাংলার কাব্য-সাহিত্যকে করিয়াছে সমৃদ্ধ, তাহার সংগীতকে করিয়াছে অপূর্ব লাস্যময়। **উপসংহার ॥** বর্ষার মায়ামন্ত্রবলে পাষাণ গলিয়া ফসল ফলে। মরুবিজয়ের কেতন উড়াইয়া, মেঘের গুরুগুরু মাদল বাজাইয়া সে আসে। তাহার দক্ষিণ কর হইতে ঝরিয়া পড়ে বরাভয়, বাম কর হইতে নামিয়া আসে মরণ-ঢালা ভয়ঙ্করী বন্যা। তবু বর্ষা বাংলার প্রিয় ঋতু, বাঙ্গালীর প্রাণের ঋতু॥

বর্ষায় বাংলার শোভা

বাংলায় বর্ষার রূপ

২.

বঙ্গে শীত

উ. মা. '৮২

সূচনা ॥ 'এল যে শীতের বেলা বরষ পরে। এবার ফসল কাটো, লওগো ঘরে ॥ করো ত্বরা, করো ত্বরা, কাজ আছে মাঠ-ভরা—' শীত কর্মী ঋতু। কিন্তু সে সর্বদেশে কাব্যে উপেক্ষিত, জীবনে উপেক্ষিত, ঋতুর সমাজেও উপেক্ষিত। তাহার সর্বাঙ্গে বার্ধক্যের স্থবিরতা, নিষ্করুণ বৈরাগ্য। মুখে শুষ্ক কাঠিন্য, চোখে ধূমল কুজ্ঝটিকা, শীতল নীরক্ত দুই হাতে সুদূর রিক্ততা। সেই রিক্ততা কৃপণের রিক্ততা নয়, সমস্ত বিলাইয়া দিবার রিক্ততা—ঐশ্বর্যের রিক্ততা। **শীতের বিরল-বর্ণ সৌন্দর্য ॥** শীতের প্রাণোচ্ছল রূপমাধুরী নাই। ধ্যানমগ্ন ধূর্জটির মতো তাহার অসীম বৈরাগ্য। মহাধ্যানী মহাতাপস যেন তাঁহার সকল আবেগ ও উচ্ছ্বাস সংহরণ করিয়া তপস্যায় বসিয়াছেন। কোথাও তারুণ্যের চঞ্চলতা নাই, কৈশোরের বিক্ষোভ নাই, যৌবনের প্রগল্‌ভতা নাই; আছে বার্ধক্যের পরিপূর্ণতার বিরল-বর্ণ সুষমা। সে পাকা ফসল ধরিত্রীর ভাণ্ডারে তুলিয়া দিয়া নিজেকে নিঃস্ব, সর্বরিক্ত করিয়া দেয়। **শীতের কর্ম-ব্যস্ততা ॥** 'পৃথিবীর ডালাটি পাকা ফসলে পূর্ণ করিয়া দিবার জন্য সে ব্যস্ত। তাহার পাকাধান কাটাই-মাড়াইয়ের আয়োজনে চারিটি প্রহর ব্যস্ত, কলাই যব ছোলার প্রচুর আশ্বাসে ধরণীর ডালা পরিপূর্ণ। প্রাঙ্গণে ডালা ভরিয়া উঠিয়াছে,...ঘাটে ঘাটে নৌকা বোঝাই হইল, পথে পথে ভারে মন্থর হইয়া গাড়ি চলিয়াছে; আর ঘরে ঘরে নবান্ন এবং পিঠাপার্বণের উদ্যোগে ঢেঁকিশালা মুখরিত।'—রবীন্দ্রনাথ। **শীতের বৈরাগ্য-ধূসরতা ॥** উত্তরের নির্মম হিমগর্ভ বাতাস গাছের ডালে ডালে পাতা ঝরাইয়া দিল। বনশ্রেণী রিক্ত, নিষ্পত্র। ধরিত্রীর বুকের উপর মৃত পত্রের মৃত্যুশয্যা রচিত হইল। ধানকাটা প্রান্তরে নিরাভরণা প্রকৃতির বৈধব্যের কী করুণ মূর্তি! **শীত নববসন্তের অগ্রদূত ॥** শীত-প্রকৃতির এই মৃত্যু-যন্ত্রণার মধ্যে আছে ঋতুচক্রের জীর্ণ পুরাতনকে অপসারিত করিয়া নববসন্তের অর্ঘ্য-রচনা করিবার এক সুগভীর চক্রান্ত। শীত বসন্তের অগ্রদূত। **শীত নিজে রিক্ত, কিন্তু তাহার ডালি রিক্ত নয় ॥** তাহার ফুলের ডালিতে আছে ডালিয়া, গাঁদা, কুন্দ ও নানা মরশুমী ফুল; আছে আম্রমুকুলের সমাহার। তাহার উৎসবের ডালিতে নবান্ন উৎসব, পৌষ-পার্বণের পিঠাপুলি, লক্ষ্মী ও সরস্বতী পূজা; আর আছে মকর-সংক্রান্তির পুণ্যস্নান। পৌষলক্ষ্মী সমৃদ্ধির ধাত্রী অন্নপূর্ণার মতো ঘরে ঘরে সোনার ধান বিলাইয়া দিয়া প্রস্তুত হয় বিদায়ের জন্য। ধানের পাতায় পাতায় বাজে তাহার সোনার মঞ্জীর, পাকা ধানের মঞ্জরীতে উপচিয়া পড়ে তাহার মুখের হাসি। উত্তুরে বাতাসের একতারায় বাজে তাহার বিদায়-সংগীত। **উপসংহার ॥** বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি রচনায় শীতের অবদান অসীম। তাহার বার্ধক্যের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে এক স্নেহশীলা জননীর ত্যাগতন্ত্র হৃদয়ের মহিমময় প্রকাশ। বাঙালীর কাছে শীতঋতু তাই প্রাচুর্যের ঋতু, দারিদ্র্য-মোচনের ঋতু ॥

● শীতকালের বাংলাদেশ

● শীতের অবদান

একটি বর্ষণমুখর সন্ধ্যা

সূচনা ॥ আজ সারাদিন ধরিয়া চলিয়াছে অবিশ্রান্ত বৃষ্টির উৎসব। মেঘাবৃত আকাশের রঙ জলসিক্ত মহিষের গায়ের রঙের মতো— বিষণ্ণ, স্ফয়াল। মেঘের গুরুগর্জনে ও বিদ্যুৎ-বিকাশের মধ্য দিয়া কখন সূর্যদেবতা অস্ত গেলেন। **প্রকৃতির বিষণ্ণতা ॥** শ্রাবণ-সন্ধ্যার দুর্যোগপূর্ণ অন্ধকারে কেহ পথে বাহির হয় নাই। গ্রামান্তের পথ নির্জন। বাদল-বাতাসের দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে বোবা-প্রকৃতির চোখের জল ঝরিয়া পড়িতেছে। **বৃষ্টি-পতন ধ্বনির ভাষা ॥** ভাষাহীন অন্ধকারে বৃষ্টিপাতের অবিরাম শব্দ যেন বোবা-প্রকৃতির বহুদিনের সংগীতমুখর অব্যক্ত ভাষা। **মেঘদূত-পাঠের স্মৃতি ॥** একবার এক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের কণ্ঠে মেঘদূতের আবৃত্তি শুনিয়াছিলাম; আজ এই বর্ষণ-ক্লান্ত সন্ধ্যায় তাঁহার সেই ধীর-গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠস্বর যেন শুনিতে পাইতেছি। **মেঘদূতের সৌন্দর্য-চিন্তা ॥** মেঘমেদুর নববর্ষা আমাকে রামগিরি আশ্রমের জনশূন্য শৈলশৃঙ্গের শিলাতলে সঙ্গীহীন করিয়া ছাড়িয়া দেয়। 'হৃদয় সেই পৃথিবীতে বনে বনে গ্রামে গ্রামে শৃঙ্গে শৃঙ্গে নদীর কূলে কূলে ফিরিতে ফিরিতে অপরিচিত সুন্দরের পরিচয় লইতে লইতে দীর্ঘ বিরহের শেষ মোক্ষধামে যাইবার জন্য মানসোৎক হংসের ন্যায় উৎসুক হইয়া উঠে।' **পথের নিঃসঙ্গ গোরুর গাড়ি ॥** বৃষ্টি-বিষণ্ণ নির্জন পথে চাকার তীব্র আর্ত হাহাকার ছড়াইয়া একটি গোরুর গাড়ি চলিয়া গেল। দূরে ক্লান্ত চাকার আর্তধ্বনি বৃষ্টি-মুখরতার মধ্যে মিলাইয়া গেল। পথের পাশে ডোবার ধারে ব্যাঙ ডাকিতেছে। ব্যাঙের ডাক যেন এই শ্রাবণ-সন্ধ্যার হৃদয়ের ব্যথিত সংগীত। **বর্ষণমুখর অন্ধকারের সৌন্দর্য-উপভোগ ॥** আজ এই শ্রাবণ-সন্ধ্যায় প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা' লইয়া বর্ষার কবিতাগুলি পড়িতে ইচ্ছা করিতেছে। 'গৃহত্যাগী মন মুক্তগতি মেঘপৃষ্ঠে লয়েছে আসন।' আমার ছিন্নবাধা পলাতক মন লঘুপক্ষ হংস-বলাকার মতো মেঘের সঙ্গী হইয়া দিক্ হইতে দিগন্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়। কোথাও বা প্রস্ফুটিত কেতকীর বেড়া-দিয়া ঘেরা বর্ষণসিক্ত দশার্ণ গ্রাম, কোথাও-বা পরিণতফলশ্যাম জম্বুবন, কোথাও-বা বৃষ্টি-স্নাত শ্যামলী-ধবলী গোহালে প্রত্যাগমনরত, কোথাও-বা নিঃসঙ্গ পথিক পারে যাইবে বলিয়া বর্ষণ-স্ফীত নদীতীরে মাঝিকে ঘন ঘন ডাকিতেছে। **উপসংহার ॥** কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে ক্লান্তিতে ঘুম পায়। মনে পড়ে, পরীক্ষার আর বেশী দেরী নাই। মনের সকল ক্লান্তি, সকল অবসাদ মুছিয়া ফেলিয়া আলো জ্বালিয়া পড়িতে বসি। বাহিরে অবিশ্রান্ত পত্র-মর্মরে বাদল-বাতাস হা-হুতাশ করিয়া কাঁদিয়া যায়। আম-কাঁঠাল ও দীর্ঘ সুপারির সারি এবং ক্রন্দনাতুর বাঁশের বন বুকফাটা আর্তনাদে হাহাকার করিতে থাকে।

● বর্ষার একটি সন্ধ্যা

বাংলার বিচিত্র ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব

সূচনা ॥ বাংলাদেশ উৎসব-প্রাচুর্যের দেশ। তাহার অতিরিক্ত উৎসব-প্রিয়তার পশ্চাতে আছে তাহার অফুরন্ত প্রাণ-প্রাচুর্য, বঙ্গ-প্রকৃতির অনুপম রূপশ্রী; আর আছে তাহার অর্থনৈতিক সচ্ছলতা। ঋতুর পর ঋতু আসে; তাহার সুরে সুর মিলাইয়া বাঙ্গালী মাতিয়া উঠে 'বারো মাসে তেরো পার্বণ' রচনায়। 'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশে তবু রঙ্গভরা।' কত বন্যা-দুর্ভিক্ষ-মহামারীতে, কত দৈব-দুর্বিপাকে, কত রাজনৈতিক ঝড়ঝঞ্ঝায় বাঙ্গালীর ঘর ভাঙ্গিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালী তাহার ধ্বংসস্তুপের উপর আবার রচনা করিয়াছে তাহার উৎসবের নিত্য-নূতন পরিকল্পনা। **বাঙ্গালীর উৎসব একটি সুষম জীবনের অভিব্যক্তি ॥** সুজলা-সুফলা বাংলার ঘরে ঘরে তখন ছিল শস্য-প্রাচুর্য; মৃত্তিকার স্বাভাবিক উর্বরতায় জীবন-সংগ্রামের তীব্রতা ছিল অনুপস্থিত। উৎসবগুলি ছিল তাহারই উদ্বৃত্ত অবকাশের সজীব অভিব্যক্তি। **প্রাচীন বাংলার প্রাণবন্ত উৎসব-চিত্র ॥** পূর্বে উৎসব-উপলক্ষে কুম্ভকার-পত্নী আনিত নূতন বরণডালা, মালিনী আনিত ফুল ও ফুলসজ্জার ফুলের গহনা, তাঁতিনী নীলাম্বরী ও বিবিধ বর্ণের শাড়ি। নাপিতানী বধূদিগের পায়ে আলতা পরাইয়া দিত, ব্রাহ্মণ-ঠাকুরাণী কয় গাছি পৈতার সুতা আনিয়া গল্প শুনাইয়া যাইত। এইভাবে প্রাচীন বাংলায় উৎসবের মধ্যস্থতায় পারস্পরিক শুভ-কামনা বড় হইয়া উঠিত। **বাংলার ধর্মীয় উৎসব ॥** বাংলার উৎসবগুলি চার শ্রেণীতে বিন্যস্ত: ধর্মীয় উৎসব, ঋতু-উৎসব, সামাজিক উৎসব এবং জাতীয় উৎসব। হিন্দুধর্মে সিদ্ধিদাতা গণেশের পূজা, দশহরা, রথযাত্রা, রাখী-পূর্ণিমা, মনসা-পূজা, বিশ্বকর্মা-পূজার পর আসে বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা। তারপর আসে লক্ষ্মীপূজা ও শ্যামাপূজা। ঐদিন বাঙ্গালীর দীপান্বিতা উৎসব। কার্তিক পূজা ও জগদ্ধাত্রী পূজার পর মাঘ মাসে আসে সরস্বতী পূজা ও চড়ক উৎসব। মুসলমান-সমাজের মহরম, ইদল-ফেতর, শবেবরাৎ ইত্যাদি প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠান। বুদ্ধ-পূর্ণিমা বৌদ্ধদের প্রধান উৎসব. খ্রীস্টানদের বড় উৎসব হইল বড়দিন, ইস্টার স্যাটার ডে, গুড্ ফ্রাই ডে ইত্যাদি। **বাংলার ঋতু-উৎসব ॥** প্রকৃতির পটভূমিকায় ঋতু-উৎসবগুলি বাংলায় বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। বর্ষা-সমাগমের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হইত বীজবপন, ধান্যরোপণ ও বৃক্ষরোপণ উৎসব। বর্ষামঙ্গল, শেষ-বর্ষণ ইত্যাদি আধুনিক সংযোজন। শারদীয় উৎসব বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ ঋতু-উৎসব। অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন উৎসব, পৌষ মাসে পৌষ-মেলা, পিঠা-পার্বণ, তুষ-তুষালি উৎসব। ফাল্গুন মাসে প্রকৃতির বর্ণাঢ্য রূপসজ্জায় আসে হোলি। তারপর চৈত্রের শূন্য প্রান্তরে গাজনের বাজনা বাজাইয়া পুরাতন বৎসর বিদায় গ্রহণ করে। **সামাজিক উৎসব।** সামাজিক উৎসবের বৈচিত্র্য বাঙ্গালীর প্রাণ-প্রাচুর্যেরই প্রতিচ্ছবি। অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ-শান্তি, জামাই-ষষ্ঠী, ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া ইত্যাদিতে সেই অনাবিল প্রাণ-শক্তিরই

প্রকাশ। জন্মগ্রহণে উৎসব, মৃত্যুতে উৎসব, উৎসব জীবনের প্রতি পদক্ষেপে। প্রতিটি উৎসবের জন্য স্বতন্ত্র সংগীত। এইখানেই সর্ব-ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা হইতে বঙ্গ-সংস্কৃতির ধারা পৃথক্। **জাতীয়-উৎসব ॥** সাম্প্রতিক কালে তাহার কতকগুলি নবাগত উৎসব জাতীয় মর্যাদা লাভ করিয়াছে। তাহারা হইল—পনেরই আগস্ট, ছাব্বিশে জানুয়ারী, পঁচিশে বৈশাখ এবং তেইশে জানুয়ারী। **উপসংহার ॥** বাংলার এই উৎসবময়তার পশ্চাতে ছিল প্রাচীন বাংলার অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য। আজ আর সেদিনের বাংলা নাই। আজও বাঙ্গালীর ঘরে উৎসবের আহ্বান আসে। শুষ্ক নীরস প্রাণহীন উৎসবে মাইক্রোফোনে হিন্দী গান বাজান হয়, ঘটা করিয়া মণ্ডপসজ্জা এবং আলোকসজ্জাও হয়। কিন্তু বহিরঙ্গ বিলাসে উৎসবের আত্মা আজ যেন হারাইয়া গিয়াছে।

> 'যেখানে শুকায় পদ্ম—বহুদিন বিশালাক্ষী যেখানে নীরব ;
> যেইখানে একদিন শঙ্খমালা চন্দ্রমালা মানিকমালার
> কাঁকন বাজিত, আহা, কোনদিন বাজিবে কি আর !'

বারো মাসে তেরো পার্বণ
'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা'
বাংলার উৎসব
বাংলার সামাজিক উৎসব

৫

নববর্ষ উৎসব

সূচনা ॥ 'পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি'র অবসানে উদয়-দিগন্তে নববর্ষের উদার অভ্যুদয়। আজ আকাশ কী মহিমময়! **নববর্ষের দার্শনিক তাৎপর্য ॥** নৃত্যে মাতিয়াছেন নটরাজ। দুই হাতে তাঁহার বাজিতেছে কালের মন্দিরা। তাঁহার এক পদপাতে ধ্বংস, অন্য পদপাতে সৃষ্টি। এক পদপাতে আবরণ, অন্য পদপাতে উন্মোচন। পুরাতন বৎসরকে বিদায় দিয়া তিনি আমাদের জীবনে নূতন বৎসরকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। নৃত্যরত মহাকালের দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলির অগ্রভাগ বাহিয়া একটি বৎসর বিপুল অন্ধকারের 'কাল-সিন্ধুনীরে' খসিয়া পড়িল। তাঁহার করধৃত রুদ্রাক্ষের মালা একবার ঘুরিয়া গেল। **নববর্ষের বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য ॥** 'গমন করে' বলিয়াই পৃথিবীর আর-এক নাম 'জগৎ'। আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতির ছন্দে পৃথিবী তাহার সূর্য-প্রদক্ষিণ-ব্রত একবার সমাপ্ত করিল। প্রাচীন ভারতে অগ্রহায়ণ মাসকেই বর্ষারম্ভ বলা হইত। 'অগ্র' অর্থাৎ প্রথম, 'হায়ন' অর্থাৎ বৎসর। কিন্তু এ দেশের দরিদ্র কৃষক-সমাজের মহাজনের দেনা-পাওনা মিটাইতে বৈশাখ মাস আসিয়া

পড়িত। মহাজনেরাও তাই এই মাসটিকে ধরিয়া লইলেন বর্ষারম্ভ—তথা হালখাতা। **মানসিক তাৎপর্য ॥** সূর্য প্রতিদিনই উঠে। নববর্ষের দিনটিও প্রতিদিনের মতো একটি সাধারণ দিন মাত্র। মানুষ তাহার 'আপন মনের মাধুরী' মিশাইয়া এই দিনটিকে স্বতন্ত্ররূপে রচনা করিয়া লইয়াছে। **নববর্ষের প্রতিশ্রুতি ॥** সারা বৎসর ধরিয়া আমরা নিজেদের প্রয়োজন-বোধের সীমিত পরিসরের মধ্যে ক্ষুদ্র 'অহং'-এর পূজা করিয়াছি। নববর্ষের পুণ্য প্রভাতে আমরা মহাজীবনের উদার সান্নিধ্য অনুভব করিব। 'তুমি আজ আমাদিগকে আহ্বান কর!—বৃহৎ মনুষ্যত্বের মধ্যে আহ্বান কর। আজ উৎসবের দিন, আজ বৃহৎ সম্মিলনের মধ্যে শক্তি-উপলব্ধির দিন, শক্তি-সংগ্রহের দিন। **নববর্ষ উদ্‌যাপন: পল্লী-অঞ্চলে ও শহরাঞ্চলে ॥** বাংলার পল্লী-অঞ্চলে কোথাও কোথাও নববর্ষে বেশ বর্ণাঢ্য মেলা বসে। নানা বিক্রয়-প্রতিষ্ঠানে হালখাতার শুভ-মহরৎ উপলক্ষে সিদ্ধিদাতা গণেশের পূজা। মিষ্টান্নসহযোগে সূচিত হয় নববর্ষের শুভ বিক্রয়ারম্ভ। তাহা ছাড়া দরিদ্র-ভোজনে, নৃত্য-গীতে শোভাযাত্রায়, সভাসমিতিতে, খেলাধুলায়, আনন্দ-অনুষ্ঠানে ও প্রমোদ-উৎসবে দিনটি অনবদ্য হইয়া উঠে। শহরাঞ্চলে গীত-বাদ্যযোগে প্রভাত-ফেরীর মধ্য দিয়া দিনটির শুভ সূচনা হয়। পল্লীতে পল্লীতে রচিত হয় উৎসব-মণ্ডপ। অপরাহ্নে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও অভিবাদন। তাহা ছাড়া, চড়ুইভাতির আমন্ত্রণ তো আছেই। **উপসংহার ॥** আধুনিক যান্ত্রিকতার বিষ-নিঃশ্বাস হইতে নববর্ষ-অনুষ্ঠানটিও মুক্তি পায় নাই। নববর্ষের অরুণোদয়ের পূর্বেই বিকট যান্ত্রিক আওয়াজে 'লাউড-স্পীকারে' বাজিতে থাকে চটকদার সিনেমার গান। আমরা যে অন্তরে অন্তরে এমন দেউলিয়া হইয়া পড়িয়াছি, তাহা আগে কে জানিত?

বছরের প্রথম দিন

৬.

শহর ও পল্লীর ব্যবধান অপসারণ

সূচনা ॥ যাযাবর আর্যজাতির মানুষেরা একদা ভারতবর্ষে আসিয়া রচনা করিল 'ছায়া-সুনিবিড়, শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি'। **ভারতে পল্লী ও নগরের বিকাশ ॥** ঈশ্বরের হাতে রচিত হইয়াছিল প্রথম ভুবন। মানুষের হাতে গ্রাম, তাহা দ্বিতীয় ভুবন। সুসভ্য মানুষ রচনা করিল নগর—তাহা হইল তৃতীয় ভুবন। আজ নগর তাহার শুষ্ক মরু-রসনা বুলাইয়া গ্রামগুলির প্রাণরস শোষণ করিয়া তাহাদের নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে। কিন্তু ভারতের জনসংখ্যার আশি-শতাংশ বাস করে গ্রামে। কাজেই, সেখানে বৈষয়িক উন্নয়নের কাজ অবিলম্বে শুরু করিতে হইবে। **গ্রাম ভারতের গঠন-বৈশিষ্ট্য ॥** জোত-জমি, খেত-খামার এবং সংলগ্ন বিস্তীর্ণ জমির কেন্দ্রস্থলে মাটির দেওয়াল ও খড়ের চাল দিয়া তৈয়ারী ছোট ছোট কুটির,

সান্নিধ্যে স্নেহশালিনী নদী, তাহার কলতানে পল্লীর শ্যামল বক্ষ সংগীত-মুখরিত। গ্রামগুলিতে বিভিন্ন বৃত্তির মানুষের বাস। সেদিন পল্লী-ভারতের বৈশিষ্ট্যই ছিল প্রাচুর্য ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা। **গ্রাম-ভারতের ভাঙনের চিত্র ॥** তারপর আসিল পরস্বাপহারী সাম্রাজ্যবাদীর দল। সর্বগ্রাসী পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের পঞ্চবটী-ছায়াচ্ছন্ন গ্রামগুলিকে ধ্বংস করিল। পল্লী-ভারতের হৃৎস্পন্দন স্তিমিত হইয়া আসিল। **ভাঙনের পরিণতি ॥** তাহার সমৃদ্ধ জনপদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইল, পথঘাট জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া উঠিল, আর সেই দিগন্তশায়ী শ্যামল শস্য-প্রান্তর বন্ধ্যা, পতিত, অনাবাদী হইয়া পড়িয়া রহিল। কোথায় গেল তাহার সেই কুটির-শিল্প? কোথায় গেল তাহার সেই সার্বিক আর্থিক সচ্ছলতা? অনশন, অর্ধাশন, স্বাস্থ্যহীনতা, অকালমৃত্যু, অশিক্ষা ও কুশিক্ষা তাহার নিত্য-সহচর। গ্রামের লোক বলিতে হতভাগ্য, নিরক্ষর 'চাষা' এবং শহরের লোক বলিতে সভ্যতাভিমানী 'বাবু'। পল্লীর প্রাণরসে উজ্জীবিত শহরগুলি আজ পল্লীগুলিকে করে নির্লজ্জ ঘৃণা। **গ্রাম ও নগরের সংঘাত ॥** নগরে জলুস্ বেশী, আমোদ-প্রমোদের আয়োজন অফুরন্ত। কিন্তু নাগরিক সভ্যতা মানুষকে পশুত্বের পর্যায়ে নামাইয়া আনিয়াছে। তাই রবীন্দ্রনাথ নগরের শুষ্কতার প্রতি ধিক্কার জানাইয়া বলিয়াছিলেন—'দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর।' **গ্রাম ও নগরের ব্যবধান অপসারণ ॥** আজ গ্রাম ও শহরের মাঝখানের বৈষম্য ও ঘৃণা দূর করিয়া গ্রামগুলিকে বাসযোগ্য করিয়া তুলিতে হইবে। সেখানে আজ 'অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্তবায়ু, চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট।' **উপসংহার ॥** এতদিন গ্রাম-দেবতাকে অবহেলা করিয়া আমরা যে পাপ করিয়াছি, আজ তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিবার পালা। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার 'India of My Dreams' গ্রন্থে যে বলিষ্ঠ গ্রাম-ভারতের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, ১৯৫২ সালের ২রা অক্টোবর হইতে শুরু হইয়াছে তাহার রচনার কাজ। আজ ঘুম ভাঙিতেছে ভারতের সুপ্তিমগ্ন পঞ্চাশ লক্ষ গ্রামের ॥

● গ্রাম-উন্নয়ন

৭.

একটি গ্রাম্য মেলা

সূচনা ॥ 'যেমন আকাশের জলে জলাশয় পূর্ণ করিবার সময় বর্ষাগম, তেমনি বিশ্বের ভাবে পল্লীর হৃদয়কে ভরিয়া দিবার উপযুক্ত অবসর মেলা। মেলা ভারতের পল্লীর সার্বজনীন উৎসব। কোন উৎসব-প্রাঙ্গণের মুক্ত অঙ্গনে সরল গ্রামবাসীর মনের উচ্ছ্বসিত মিলনস্থল হইল মেলা।' 'মেলার' আক্ষরিক অর্থ মিলন। প্রাচীনকাল হইতে মেলার গুরুত্ব ভারতে তাই অসীম। কোন দেব-মন্দিরে কিংবা নদী কিংবা সমুদ্রোপকূলের কোন তীর্থস্থানে কিংবা গ্রামের কোন বিশিষ্ট জায়গায় কোন উৎসব উপলক্ষে মিলিত হয় অগণিত জনতা। **মেলার তাৎপর্য দুইটি : মনস্তাত্ত্বিক ও**

অর্থনৈতিক ॥ মেলার আছে দুইটি দিক: মনস্তাত্ত্বিক ও অর্থনৈতিক। মনস্তাত্ত্বিক বলিতে ভাবের আদান-প্রদান, পারস্পরিক চিন্তা-বিনিময়। অর্থনৈতিক দিকটি হইল পণ্য-বিকিকিনি। **শান্তিনিকেতনের পৌষ-মেলায় যাত্রার প্রস্তুতি ॥** শান্তি-নিকেতনের পৌষ-মেলার অমূল্য স্মৃতি আমার মনের মণিকোঠায় অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। ৭ই পৌষ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাধন-জীবনের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। ঐ দিবসে শান্তিনিকেতনে বসে পৌষ-মেলা এবং সেই সঙ্গে শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে অনুষ্ঠিত হয় বিশ্বভারতীর বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব। পৌষ-মেলা, কবিগুরুর স্মৃতি-বিজড়িত শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব দেখিব বলিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। **যাত্রা ॥** রাত্রি বারোটার সময় ট্রেন বোলপুর স্টেশনে পৌঁছিল। প্রচণ্ড শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে আমরা সকলে স্টেশনের বাহিরে আসিলাম। সুরুলে বন্ধুর বাড়ি। কয় বন্ধুতে আমরা ভূতের গল্প করিতে করিতে অবশেষে বন্ধুর বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। **মেলার পথে ॥** পরদিন হইতে মেলা—মেলা চলিবে তিন দিন। রাত্রি প্রভাত হইল। চা-খাবার ইত্যাদি খাইয়া আমরা শান্তিনিকেতনের পথে বাহির হইয়া পড়িলাম। বিশাল প্রান্তরের মধ্য দিয়া রাঙা ধূলির পথ আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে। ধোপদুরস্ত জামাকাপড় অল্পক্ষণের মধ্যেই গৈরিক হইয়া উঠিল। আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল এক বাউলের। আমাদের দেখিয়া সে প্রশ্ন করিল: 'কি গো, কোথায় চলেছ তোমরা? রবি বাউলের মেলায়?' বলিলাম: 'হ্যাঁ গোসাঞি।' **মেলার নিকটে ॥** মেলার দূরাগত গুঞ্জন। দূর হইতে তেলেভাজার গন্ধ। পিপীলিকার ন্যায় মানুষের দল মেলার উদ্দেশে দিক্-দিগন্তর হইতে আসিতেছে। মাঝে-মধ্যে বাঁকা-মাথায় বেপারী। **মেলার বর্ণনা ॥** শান্তিনিকেতনের সংলগ্ন প্রান্তরে বৃত্তাকারে মেলার পরিকল্পনা। বৃত্তাকারে দোকানের সারি। মাঝখানে কবি-গান ও যাত্রাগানের আসর। শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীরা গলায় হলুদ রুমাল বাঁধিয়া ভিড় নিয়ন্ত্রণে ব্যস্ত। সকলের মতো আমরাও ছড়ি ও তালপাতার টুপি কিনিলাম। সমাবর্তনে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ। **মেলার অভিজ্ঞতা ॥** মেলায় ধোপদুরস্ত শহরে বাবুরা আসিয়াছেন, আসিয়াছে সাঁওতালী দম্পতিরা। যাত্রা-গান ও কবি-গান শুনিলাম, দেখিলাম সাঁওতালী নৃত্য। কিন্তু বাউল গানের বুঝি তুলনা নাই। পায়ে ঘুঙুর, কোমরে ডুগডুগি, হাতে একতারা, গায়ে রঙ-বেরঙের আলখাল্লা—বাউল ঠাকুর নাচিয়া নাচিয়া গান গাহিতেছেন: 'কে বেঁধেছে এমন ঘর দক্ষ কারিগর। ঘরের মাপ চৌদ্দপোয়া চৌদ্দ ভুবন তার ভিতর।' **উপসংহার ॥** মেলার স্মৃতি মনের মণিকোঠায় লইয়া ফিরিয়া আসিলাম। মনে এখনও বাজে বাউল-ঠাকুরের গান: 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়।' আজও আমার মনের ভিতর 'অচিন পাখি'র নিত্য যাওয়া-আসা চলে।

একটি গ্রাম্য মেলার বর্ণনা

৮. নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

সূচনা ॥ নাগরিকই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-কাঠামোর কেন্দ্র-বিন্দু। নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্যের উপর দাঁড়াইয়া থাকে রাষ্ট্রীয় ইমারৎ। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রমাত্রেই নাগরিকদের রহিয়াছে কতকগুলি পবিত্র ও মূল্যবান অধিকার। সেই সমস্ত অধিকার সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্রের হইল সদা-জাগ্রত প্রহরীর ভূমিকা এবং সংবিধান হইল তাহার পবিত্র সংহিতা। **রাষ্ট্রীয় অধিকার : পৌর অধিকার ও রাজনৈতিক অধিকার ॥** রাষ্ট্রস্বীকৃত অধিকারগুলি দুইভাগে বিন্যস্ত : পৌর অধিকার এবং রাজনৈতিক অধিকার। পৌর অধিকারগুলি হইল : জীবন-রক্ষণের অধিকার, সম্পত্তি-গঠন ও সম্পত্তি-সংরক্ষণের অধিকার, ভাষা ও সংস্কৃতি-চর্চার অধিকার, ধর্মাচরণ, মতপ্রকাশ, কর্তব্য-সম্পাদন এবং শিক্ষা-লাভের স্বাধীনতা। রাজনৈতিক অধিকার হইল : ভোট-প্রদানের অধিকার, সরকারী চাকরী-লাভের অধিকার, সরকারের নিকট আবেদন করিবার অধিকার ইত্যাদি। **অধিকার এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য পরস্পর-সম্পর্কযুক্ত ॥** অধিকার-ভোগ এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। নিজের ব্যক্তি-স্বাধীনতা ভোগের প্রতিদানে নাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হইল অন্য নাগরিকের ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখা। বিনা প্রতিদানে কোন অধিকার ভোগ করা যায় না। **কর্তব্য : রাষ্ট্রীয় আনুগত্য, দেশরক্ষা, আইনরক্ষা ও করপ্রদান ॥** রাষ্ট্রের প্রতি দ্বিধাহীন আনুগত্য প্রত্যেক নাগরিকেরই প্রধান কর্তব্য। বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা, সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলার স্বার্থে রাষ্ট্রীয় আইন মানিয়া চলা এবং কর-প্রদানও নাগরিকদের কর্তব্য। **ভোটাধিকার :** আধুনিক সুসভ্য রাষ্ট্রের ভোটাধিকার একটি পবিত্র অধিকার। তাই বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া নাগরিক তাহার বাঞ্ছিততম ব্যক্তিকেই শাসন-ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করিবে, ইহাই কাম্য। **ব্যক্তিস্বার্থ বনাম রাষ্ট্রস্বার্থ ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা ॥** সকল নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের কেন্দ্রস্থলে থাকিবে জনসেবা, দেশসেবা ও রাষ্ট্রসেবা। রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ-সাধনের মধ্য দিয়া ব্যক্তির কল্যাণও সংসাধিত হয়। কাজেই, ব্যক্তিস্বার্থ নয়, সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রীয় কল্যাণই প্রত্যেক নাগরিকের অবশ্য কাম্য। **উপসংহার ॥** দুই শতাব্দীর পরাধীনতার অবসানে ভারতে এখন চাই সচেতন নাগরিকতা। দারিদ্র্য ও অশিক্ষা তাহার মর্মমূলে বাসা বাঁধিয়া আছে। তাহাদের দূরীকরণের জন্য এখন সদা-জাগ্রত নাগরিকতার বিকাশ জরুরী প্রয়োজন ॥

- সৎ নাগরিক হইবার উপায়
- দায়িত্বশীল নাগরিকের গুণাবলী

জনমত গঠন ও প্রকাশ

সূচনা ॥ জনমত হইল জনমানসের নির্বাধ অভিব্যক্তি। ইতিহাসের নির্মম বিধানে জনগণই আজ নিজেদের ভাগ্য-নিয়ন্তা। সেই কষ্টার্জিত, দুঃখ-লব্ধ গণতন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় জনমতের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। সাম্প্রতিক জগতে সুগঠিত জনমতই গণতন্ত্রের প্রকৃত নিয়ামক শক্তি। **জনমতের কার্যকারিতা: গণতন্ত্রে ও স্বৈরতন্ত্রে ॥** প্রত্যেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই জনমত গঠন ও প্রকাশের অধিকার সংবিধান-স্বীকৃত। তাহার ফলেই গণতন্ত্রের পবিত্রতা সংরক্ষিত থাকে। গণমানসের সচেতন এবং সোচ্চার অভিব্যক্তিতে গণতন্ত্র স্বৈরতন্ত্রের পঙ্কিল আবর্তে তাহার ধারা হারাইয়া ফেলিতে পারে না। **জনমত গঠন ও প্রকাশের উপায়: বক্তৃতা-মঞ্চ ॥** জনমত গঠন ও প্রকাশের কতকগুলি বিশেষ মাধ্যম আছে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সেই মাধ্যমগুলিকে আরও ব্যাপক ও কার্যকর করিয়া তুলিয়াছে। সভ্যতার শৈশবাবস্থায় জনমত গঠন ও প্রকাশের ব্যবস্থা ছিল কেবল বক্তৃতা-মঞ্চ। সভা-সমিতিতে আজও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ নানা সমস্যা ও তাহার সমাধানের বিষয়ে আলোচনা করেন। গণমত তাহাতে সংগঠিত ও প্রচারিত হয়। **মুদ্রণ-যন্ত্র ॥** পূর্বে মানুষ শিলালিপিতে, প্রস্তর-ফলকে আপন চিন্তাকে ব্যক্ত করিত। মুদ্রণ-যন্ত্রের কল্যাণে ইস্তাহার, প্রচার-পত্র, প্রচার-পুস্তিকা, প্রাচীর-পত্র ইত্যাদি সেই ধারা বহন করিয়া চলিয়াছে। সেই ধারার নিয়মিত এবং সম্প্রসারিত রূপ হইল সংবাদপত্র। 'It is the people's Parliament always in session'. সত্যই সংবাদপত্র বিশ্বের সদাজাগ্রত 'লোকসভা'। ভারতে নিরক্ষরের সংখ্যা অত্যধিক। কাজেই, নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য দেশে দ্রুত শিক্ষা-প্রসার একান্ত প্রয়োজন। **শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ॥** শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিও জনমত গঠনের প্রকৃষ্ট স্থান। ছাত্র-জীবনে শিক্ষক-অধ্যাপকবৃন্দ ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট যে সকল মতামত ব্যক্ত করেন, তাহার মূল যেমন সুগভীরভাবে প্রোথিত হয়, তেমনি হয় দীর্ঘস্থায়ী। পরবর্তী জীবনে নিজস্ব অভিমত গঠনে সেই শিক্ষালব্ধ মতামত ও বিভিন্ন গ্রন্থ-কেতাবের মধ্যস্থতায় বিশিষ্ট চিন্তাবিদদের মতামত বিশেষ কার্যকরী হয়। **বেতার, চলচ্চিত্র, টেলিভিশন, যাত্রা, কথকতা ইত্যাদি ॥** জনমত গঠন ও প্রকাশের অন্যান্য মাধ্যমগুলির মধ্যে বেতার, চলচ্চিত্র, রঙ্গমঞ্চ, ম্যাজিক লণ্ঠন, টেলিভিশন, আইনসভা, যাত্রা, কথকতা ইত্যাদি অন্যতম। **উপসংহার ॥** গণদেবতার বিচারশালায় জনগণই অবিচারের নির্মম বিচারক। পরিচ্ছন্ন বিবেক ও বুদ্ধি-দীপ্ত মনীষার আলোকেই তাহারা নিজেরাই নিজেদের ভাগ্যের নিয়ামক। তাহাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রয়োজনে তাই প্রথমেই চাই শিক্ষার অবাধ সম্প্রসারণ এবং জনমত সংগঠনের অকুণ্ঠ স্বাধীনতা।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমত গঠন ও প্রকাশের উপায়

১০.

শিষ্টাচার ও সৌজন্যবোধ

সূচনা ॥ 'Courtesy costs nothing'. দেহের সৌন্দর্য অলংকার, আত্মার সৌন্দর্য শিষ্টাচার। সমাজের প্রয়োজনে শিষ্টাচারের জন্ম। শিষ্টাচার বা সৌজন্যবোধ সমাজ-সরসীর বিকশিত শতদল। **আত্মীয়তা ও সামাজিকতার সেতু ॥** 'ভদ্রতা আত্মীয়তার চেয়ে কিছু কম এবং সামাজিকতার চেয়ে কিছু বেশী। আত্মীয়তা আন্তরিক, সামাজিকতা আনুষ্ঠানিক। ভদ্রতা উভয়ের মধ্যে সেতু-স্বরূপ, এবং উভচর।' **সামাজিক রীতি ও শিষ্টাচার ॥** শিষ্টাচার সভ্যতার অবদান। ইহা যুগ যুগ ধরিয়া অনুশীলিত মানব-সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সম্পদের ক্রমপুঞ্জিত যোগফল—মানুষের অন্তর-সমুদ্র-মন্থন-সঞ্জাত দুর্লভ অমৃত ফল। **স্পষ্টবাদিতা ও শিষ্টাচার ॥** আশৈশব আত্ম-সংযম ও মার্জিত প্রকাশভঙ্গির অনুশীলনের ফল হইল শিষ্টাচার। কিন্তু স্পষ্টবাদিতার সঙ্গে ইহার মৌলিক গরমিল। অপ্রিয় সত্যভাষণে নিজেকে জাহির করিবার প্রয়াস প্রচ্ছন্ন থাকে। **শিষ্টাচার ও চাটুকার-বৃত্তি ॥** আবার শিষ্টাচার ও চাটুকার-বৃত্তিও এক নয়। চাটুকার-বৃত্তির পশ্চাতে থাকে স্বার্থসিদ্ধির কূট অভিসন্ধি। **চক্ষুলজ্জা ও শিষ্টাচার ॥** চক্ষুলজ্জা একটা সামাজিক ব্যাধি; এবং তাহার সঙ্গেও শিষ্টাচারের বিরোধ। শিষ্টাচারই সেই ব্যাধির একমাত্র চিকিৎসা। **উপসংহার ॥** বিংশ শতাব্দীর অপরাহ্নে সভ্যতা একেবারে দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে। সমাজের দুর্বিনীত দুর্মুখের দল আজ পূজিত হইতেছে। শিষ্টাচার ও সৌজন্যবোধ আজ উপহাসের বিষয়। শিষ্টাচার ও সৌজন্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সার্থক হউক মানব-সভ্যতা ॥

ভদ্রতা।

১১.

ইতিহাস-পাঠের প্রয়োজনীয়তা

সূচনা ॥ সাধারণ ধারণা, ইতিহাস মৃত, ইতিহাস মূক। কিন্তু ইতিহাস হইল মানব-সভ্যতার ক্রমাগ্রগতির জীবন্ত কাহিনী। সে যুগ-যুগান্তরের ঘটনাপুঞ্জের নীরব সাক্ষী। **ইতিহাস কি ? ॥** ইতিহাস অতীতের নিছক ঘটনাপঞ্জী নয়। ইহা কেবল রাজা-মহারাজাদের বংশলতিকার স্তূপীকৃত বিবরণ নয়, যুদ্ধবিগ্রহ ও সাম্রাজ্য-বিস্তারের রোমাঞ্চকর কাহিনীও নয়; ইহা চলমান সভ্যতার ক্রমাভিব্যক্তির সামগ্রিক বাণী-বিগ্রহ। রাজ্য ভাঙ্গাগড়া বা সাল-তারিখ-কণ্টকিত তথ্যপুঞ্জের কংকাল-স্তূপ ইতিহাস নয়, ইহা সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারাবাহিক স্বর্ণসূত্র। **'শব হতে উৎসারিত স্বর্গের বিস্ময়' ॥** ইতিহাসের স্বর্ণ-তরণীতে মিথ্যা ও অর্থহীনের স্থান নাই। মহৎ, সুন্দর ও শাশ্বতকে ইতিহাস গ্রহণ করে, আর সভ্যতার ঘাটে ঘাটে কুশ্রীতার জঞ্জালভার নামাইতে নামাইতে সেই তরণীর অগ্রগতি। **ইতিহাসের উপজীব্য বিষয় ॥** জনজীবনের

কাহিনীই প্রকৃত ইতিহাস। সুখী ও সচ্ছল সমাজ-প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষের সংগ্রামের কাহিনীই তাহার মূল উপজীব্য বিষয়। **ইতিহাস-পাঠের সার্থকতা ॥** ইতিহাস মানুষ ও সমাজ-গঠনের সুযোগ্য শিক্ষক। ইহা ভবিষ্যতের অভ্রান্ত পথ-প্রদর্শক। **ইতিহাস-রচনার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ॥** ভারতের ইতিহাস নাই। সেজন্য বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীদের ক্ষোভ। বিদেশী-হস্তে ভারতের বিকৃত ইতিহাস। বর্তমানে স্বদেশীয় ঐতিহাসিকদের হাতে ভারতের প্রকৃত ইতিহাস রচিত হইতেছে। **উপসংহার ॥** ইতিহাস মানুষের সুন্দরতর জীবন রচনার স্বপ্নকে একদিন সার্থক করিয়া তুলিবে ॥

ইতিহাস-পাঠের উপকারিতা

১২.

বিতর্ক-সভা

সূচনা ॥ বিশ্বের সকল দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মূলে রহিয়াছে মানুষের বিচিত্র ভ্রান্তি-বিলাস। সংকীর্ণ দৃষ্টি এবং সীমাবদ্ধ জ্ঞান-অভিজ্ঞতার জন্য মানুষ নিজের অন্তরালে নির্বোধের স্বর্গলোক রচনা করিয়া তথায় বাস করে। **বাদ-প্রতিবাদ ও সমন্বয়ী-সিদ্ধান্ত ॥** মানুষকে সেই ভুলের স্বর্গ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বিভিন্ন মতবাদ ও যুক্তিতর্কের ঘর্ষণে নিজস্ব মতবাদের মূল্য নিরূপণ করিতে হয়, বাদ-প্রতিবাদের মধ্য দিয়া সমন্বয়ী সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। বিতর্ক-সভা সেই প্রক্রিয়ারই অনুশীলন-সভা। **দ্বন্দ্ব-সংঘাত পরিহারের আধুনিক রীতি ॥** বিতর্ক-সভার মধ্যস্থতায় বহু রক্ত-পিচ্ছিল দ্বন্দ্ব-সংঘাত পরিহার করা সম্ভব হয়। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে বিতর্ক-সভা তাই অত্যন্ত সংগতিপূর্ণ। **বিতর্ক-সভার অনুষ্ঠান ॥** স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, ক্লাবে ও লাইব্রেরীতে বিতর্ক-সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিতর্ক-সভায় থাকেন সভাপতি ও বিচারকমণ্ডলী। বিষয় থাকে পূর্ব-নির্ধারিত। সপক্ষে বা বিপক্ষে যোগদান। প্রত্যেক দলে থাকে দলপতি। সভাপতির প্রস্তাব অনুযায়ী উভয় পক্ষের দলপতিই বিতর্কের সূচনা করে। অবশেষে তাহারাই করে উপসংহার। বিচারকমণ্ডলীর রায় বা শ্রোতাদের মতামতই এ বিষয়ে চূড়ান্ত। **নিয়মাবলী ॥** যুক্তিনিষ্ঠ উপায়ে নাতি-সংক্ষিপ্ত, নাতিদীর্ঘ ভাষণে শ্রোতা ও বিচারকমণ্ডলীর উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিতে পারা চাই। ক্রোধ, কটূক্তি ও ব্যক্তিগত আক্রমণ অবৈধ। প্রকাশ-ভঙ্গিতে চাই মার্জিত রুচি। **উপকারিতা ॥** বাক্-পটুতা, যুক্তিনিষ্ঠতা ও মার্জিত রুচির বিকাশ হয়। বিষয়টি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান জন্মে। আগামীকালের রাজনীতিক, শিক্ষক-অধ্যাপক-আইন-ব্যবসায়ীর ন্যায় বাক্য-ব্যবসায়ীর সাক্ষাৎ মেলে। **উপসংহার ॥** এই গণতান্ত্রিক যুগে বিপক্ষীয় যুক্তিতর্ক ও মতবাদের কষ্টিপাথরে স্বমতের মূল্য যাচাই করা প্রয়োজন। বিতর্ক-সভা তাই পারস্পরিক বোঝাপড়ার যথার্থ বিচারালয় ॥

● বিতর্ক-সভার প্রয়োজনীয়তা

১৩.

কর্তব্যপরায়ণতা

সূচনা ॥ 'বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে/একা আমি বসে রব কর্ম-সমাধিতে।' কর্ম-নিষ্ঠার মধ্যে মানুষ নিজেকে খুঁজিয়া পায়, কর্তব্যপরায়ণতার মধ্যে মানুষ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। **কর্তব্যপরায়ণতার মূল কথা ॥** পৃথিবীর অলস ও কর্ম-বিমুখেরা কর্ম-পাগল মানুষদের উপহাস করে। কিন্তু কর্ম-পাগল তথা কর্তব্য-পরায়ণেরাই জানেন, এই পৃথিবী বিশাল কর্মশালা। এখানে প্রত্যেকের যথানির্দিষ্ট কাজ আছে; প্রত্যেককে সেই কর্ম-সম্পাদন করিয়া যাইতে হইবে। তাহার সাফল্যেই জীবনের সার্থকতা। **কাজ বা কর্তব্য কি ? ॥** প্রত্যেক মানুষকেই কিছু-না-কিছু কাজ করিতে হইবে। এই পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য কাজ করিতে হয়। কিন্তু সমস্ত কাজই বিশ্বদেবতার কাজ। নিজ নিজ কর্তব্য-সমাপনের মধ্যে বিশ্বদেবতার কাজ তথা বিশ্বদেবতার সেবা করিবার সুযোগ লাভ। তাহাই বিশ্বদেবতার পূজা। **কর্তব্য-পরায়ণতার মূল্য ॥** যথানির্দিষ্ট কর্মে নিষ্ঠাই কর্তব্যপরায়ণতা। মানুষের উপরে যে কর্মভার ন্যস্ত থাকে, তাহা তাহাকে নির্দিষ্ট সময়ে সমাধা করিতে হইবে। কর্তব্য-কর্ম পরিত্যাগ করিয়া আলস্যে যাহারা কালাতিপাত করে, তাহারা অপদার্থ। **উপসংহার ॥** বিশ্বদেবতার কর্মের মহাযজ্ঞশালায় কর্তব্য-সম্পাদনেই মানুষের জীবনের সার্থকতা ॥

কর্মই জীবন

১৪.

অধ্যবসায়

সূচনা ॥ সংগ্রামই জীবনের মর্মবাণী। অন্তহীন সংগ্রামের ইতিহাসই জীবনের ইতিহাস। **জীবনের চিরায়ত সংগ্রামী শক্তি ॥** জীবনের বিকাশের মূলে রহিয়াছে যে অভিব্যক্তিবাদ বা বিবর্তনবাদ, তাহা সেই সংগ্রামেরই কাহিনী। নানা বিরুদ্ধ-শক্তির চক্রান্তকে ব্যর্থ করিয়া আদিম এককোষী জীব আজ বহুকোষীতে পরিণত হইয়াছে এবং তাহা সম্ভব হইয়াছে জীবনের চিরায়ত সংগ্রামী শক্তির দ্বারা। **সংগ্রাম ও সভ্যতার ক্রমাভিব্যক্তি ॥** মানব-সভ্যতার ক্রমাভিব্যক্তির মূলেও আছে এই দ্বান্দ্বিক ইতিহাস। সেই সংগ্রাম তাহার আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মবিকাশের সংগ্রাম। অধ্যবসায়ই সেই সংগ্রামের মৌল প্রেরণা। **ব্যর্থতাই সাফল্যের জননী ॥** সংগ্রামে জয় আছে, আছে পরাজয়। কিন্তু পরাজয়ই শেষ কথা নয়, তাহা নূতনতর জয়েরই পথিকৃৎ। অতএব 'ধৈর্য ধরো, ধৈর্য ধরো, বাঁধো বাঁধো বুক।' **অধ্যবসায় ঃ**

রবার্ট ব্রুস ॥ অধ্যবসায় সাহস, সহিষ্ণুতা ও আত্মবিশ্বাসের ভিত্তিভূমি। স্কটল্যাণ্ডের স্বাধীনতার মহা-সৈনিক রবার্ট ব্রুস ইংরেজ-হস্তে বহুবার পরাজিত হইবার পর গিরিগুহায় একটি মাকড়সার অধ্যবসায়ের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া ইংরেজদের হাত হইতে স্বদেশের স্বাধীনতা ছিনাইয়া আনিয়াছিলেন। **অধ্যবসায় : নেপোলিয়ন ॥** পুরুষকারের মূর্ত প্রতীক নেপোলিয়ন 'মূর্খদের অভিধান' হইতে 'অসম্ভব' শব্দটি তুলিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। আল্পস্ পর্বতের দুর্লঙ্ঘ্যতা ? 'There will be no Alps'. **উপসংহার ॥** অতএব অধ্যবসায়ই শক্তি। 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন ॥'

- 'ধৈর্য ধরো, ধৈর্য ধরো, বাঁধো বাঁধো বুক'
- ব্যর্থতাই সাফল্যের জননী
- মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন

১৫.

মিতব্যয়িতা

সূচনা ॥ সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনই আদর্শ জীবন। সেই সামঞ্জস্য আয়ের সহিত ব্যয়ের সামঞ্জস্য, বর্তমানের সহিত ভবিষ্যতের সামঞ্জস্য। মিতব্যয়িতাই সেই সামঞ্জস্য-পূর্ণ জীবনের পথিকৃৎ। আবাল্য-অনুশীলিত মিতব্যয়িতাই জীবনে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির বনিয়াদ রচনা করিয়া দেয়। **জীবনের দুঃখের জন্য দায়ী কে ? ॥** জীবনে দুঃখের জন্য দায়ী মানুষ নিজেই। তাহার অভাববোধ কোনদিনই পূর্ণ হইবার নয়। আয়ের সহিত ব্যয়ের, বর্তমানের সহিত ভবিষ্যতের সংগতি স্থাপন করিতে পারে না বলিয়াই চিরজীবন সে দুঃখ পায়। **মিতব্যয়িতার মূলে জীবন-বৈশিষ্ট্য ॥** অনিশ্চয়তায় পূর্ণ মানব-জীবন, তাহার ভবিষ্যৎ তিমিরাবৃত। তাই সে তাহার উপার্জিত রুজি-রোজগারের সমস্তটাই বর্তমানের গহ্বরে নিক্ষেপ না করিয়া তাহার কিয়দংশ ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখে। **মিতব্যয়িতার অর্থ ॥** মিতব্যয়িতার অর্থ আয় বুঝিয়া ব্যয় করা। আয়ের অপেক্ষা ব্যয় বেশী করিলে অচিরেই ঋণজালে জড়াইয়া পড়িতে হয় ; ব্যয় কম করিলে ভবিষ্যতের জন্য কিছুটা সাশ্রয় হয়। **লক্ষ্মী ও কুবের ॥** কিন্তু মিতব্যয়িতার অর্থ কার্পণ্য নয়। কৃপণেরা কুবেরের মতো নিজে না খাইয়া, পরিবার-পরিজনকে উপবাসী রাখিয়া সঞ্চয়ের নেশায় মাতিয়া উঠে। তাহাতে সুখ নাই, শ্রী নাই। লক্ষ্মীই ধনাধিষ্ঠাত্রী দেবী ; লক্ষ্মীর অন্তরের কথা হইল কল্যাণশ্রী। **অমিতব্যয়িতার পরিণাম ॥** অমিতব্যয়িতার পরিণাম বিষময়। মিতব্যয়িতার অভাবে বহু চন্দন-তরু বিষবৃক্ষে পরিণত হয়। দুঃখ-লাঞ্ছনা হয় অমিতব্যয়ীর জীবনের ভাগ্যলিপি। **উপসংহার ॥** শৈশবকাল হইতে মিতব্যয়িতার অনুশীলনের ফলে শুধু হাতেই সোনা জমে না, জীবনের ক্ষেত্রেও সোনা ফলে ॥

১৬.

খেয়াল-খুশির মূল্য

সূচনা ॥ প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আছে একটি আত্মভোলা চিরশিশু। সে চির নবীন, চিরকালের অনিয়ম। বয়স ও গুরুগম্ভীর জীবনের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সে শুষ্ক সাংসারিকতার জলহীন, ছায়াহীন মরুপ্রান্তরকে শ্যামল সরস করিয়া রাখিয়াছে। **মানব-অন্তরের চিরশিশু ॥** দৈনন্দিন কর্মক্লান্ত, ধূলিম্লান জীবনের অন্ধ আবর্তে প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে। সে চায় ছুটি, চায় বিশ্রাম। মানব-অন্তরের চিরশিশুটি সেই বিশ্রামের অবকাশটিকে খেয়াল-খুশির সৌন্দর্যে ও মাধুর্যে পূর্ণ করিয়া দেয়। **অবকাশ ও বিমল আনন্দের আয়োজন ॥** কর্মময় জীবনে দক্ষিণের এক ঝলক বাতাসের মতো আসে অবকাশ। তখন অপরকে আহত না করিয়া সে বিমল আনন্দের আয়োজনে মাতিয়া উঠে। **অবকাশ-যাপনের বিচিত্র আয়োজন ॥** মানবের অন্তরচারী সেই চিরশিশুর খেয়ালের অন্ত নাই। সে ক্যামেরায় তোলে ছবি, বই পড়ে, ছবি আঁকে, বাগান রচনা করে, ডাকটিকিট জমায়, তাস খেলে, গল্প-কবিতা লেখে, নাটক মঞ্চস্থ করে, সাজায় পুতুলের ঘর। কখনও-বা সে দল বাঁধিয়া বাহির হইয়া পড়ে দেশভ্রমণে। **নব নব সৃষ্টির আনন্দ ॥** এই সব খেয়াল-খুশির মধ্যে সৃষ্টির অনাবিল আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। ইহা কেবল অলস প্রমোদ নয়, সৃষ্টির একনিষ্ঠ কারিগরও। **প্রয়োজনীয়তা ॥** খেয়াল-খুশি যান্ত্রিক ধূসর জীবনকে শ্যামল-সরস করিয়া তোলে, সৃষ্টির নব নব দ্বার উদ্ঘাটিত করে। **উপসংহার ॥** জীবন মধুময় হয়। খেয়াল-খুশি তাই আত্মিক বিকাশ ও আনন্দ-যজ্ঞের হোম-উপচার ॥

- অবকাশ-যাপনের উপায়
- ছুটির সদ্ব্যবহার

১৭.

ধর্মঘট

সূচনা ॥ শ্রমিক-সাধারণই বিশ্বের বিশাল কর্মযজ্ঞের পুরোহিত। যাদের মাংসপেশীর জোরে কল-কারখানার চাকা ঘোরে, সভ্যতার রথ ছুটে চলে, তাদের অন্নবস্ত্র আর বাসগৃহের সংকট কোনকালেই ঘোচেনি। তাদের সেই সংকট-মোচনের জন্যে একদিন এলো ধর্মঘটের ডাক। শোষিত, সর্বহারা শ্রমিকের দল সেই ধর্মঘটকে করলো হাতিয়ার। **শ্রেণী-সংঘাত ও ধর্মঘট ॥** ধনতান্ত্রিক সমাজে ধনপতি-গোষ্ঠীর স্বার্থকে কেন্দ্র করে আর্থিক জগতের চাকা ঘোরে। শ্রমিক-স্বার্থ চিরকাল অবহেলিত। একদিকে শোষণের উল্লাস, অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ ও বিক্ষোভ। এই হলো

শ্রেণী-সংঘাতের গোড়ার কথা। আজ নব-জাগ্রত শ্রমিক-শ্রেণী চিনে নিতে পেরেছে তার সংঘশক্তিকে। ধর্মঘট সেই সংঘশক্তির দুর্জয় প্রকাশ। **শিল্প-বিপ্লব ও ধর্মঘট॥** য়ুরোপের শিল্প-বিপ্লব যেদিন কুটির-শিল্পের স্বাধীন কারিগরদের হাতের কাজ কেড়ে নিয়ে তাদের বাধ্য করলো কলকারখানার শ্রমিক-জীবন গ্রহণে, সেদিন থেকেই শুরু হলো দুই পরস্পর-বিরোধী স্বার্থের সংঘাত। সেই পশ্চিমা ঝড় একদিন এদেশের মাটি স্পর্শ করলো। **ধর্মঘট ও প্রতিক্রিয়াপন্থী॥** ধর্মঘটে উৎপাদন ব্যাহত হয়। তাই ধনপতিগোষ্ঠী শ্রমিক-ঐক্যে ফাটল ধরাবার জন্যে তৎপর হয়ে ওঠে। তাতে ধর্মঘট বানচাল হয়ে যায়। **ধর্মঘট অবাঞ্ছিত॥** ধর্মঘটে শুধু মালিক-পক্ষেরই ক্ষতি হয় না, সামাজিক সম্পদ-বৃদ্ধিও ব্যাহত হয়—জনজীবনের দুঃখকষ্ট বৃদ্ধি পায়। **উপসংহার॥** কিন্তু শ্রমিক-স্বার্থ পদদলিত হোক, তাও কাম্য নয়। মালিক-শ্রেণী ও সরকার প্রকৃত সংবেদনশীল হলে এই উপসর্গকে এড়িয়ে যাওয়া যায়॥

● শ্রমিক-অশান্তি ও শ্রমিক-সংঘ আন্দোলন

১৮.

একটি নদীর আত্মকথা

সূচনা॥ আমি একটি নদী। গঙ্গা আমার নাম। অবশ্য তোমরা ভালোবেসে আমাকে নানা নামে ডাকো—জাহ্নবী, সুরধুনী, ভাগীরথী। **জন্মকাহিনী॥** আমি তোমাদের ঘরের পাশ দিয়ে কুলুকুলু শব্দে গান গাইতে গাইতে ছুটে যাই। আমার গানে আমি আমার জন্মকাহিনী শোনাই। **পৌরাণিক কাহিনী॥** আমি ছিলাম স্বর্গের সুরধুনী। ভস্মীভূত সগর-সন্তানদের উদ্ধার করতে আমাকে মর্ত্যে আনবার জন্যে ভগীরথের কঠোর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে মর্ত্যাবতরণের জন্যে প্রস্তুত হই। ভগীরথের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে মহাদেব তাঁর জটাবন্ধনে আমাকে অবতরণের স্থান করে দিলেন। তারপর মদমত্ত ঐরাবতকে ভাসিয়ে জহ্নুমুনির পাশ দিয়ে ছুটে যাবো, এমন সময় জহ্নুমুনি আমাকে পান করে ফেললেন। পরে অবশ্য ভগীরথের বন্দনায় তুষ্ট হয়ে মুনিবর আমাকে দিলেন মুক্তি। আমি বহু পাপী-তাপীকে মুক্তি দান করে সগর-সন্তানদের পুনর্জীবন দান করলাম। আমার নাম তাই হলো ভাগীরথী। **প্রকৃত কাহিনী॥** আসলে হিমালয়ের কোলে গোমুখী হিমবাহ থেকে আমার জন্ম। হরিদ্বারের কাছে আমি সমভূমিতে অবতরণ করি। তারপর সমগ্র উত্তর-ভারতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হই। **তীর্থস্থান॥** আমার কূলে কূলে কত তীর্থক্ষেত্র। আর বাংলাদেশ—সে তো আমার স্বহস্তে তৈরী। **উপসংহার॥** তোমাদের ভালোবাসার বিনিময়ে আমি তোমাদের জোগাই অন্নজল, দান করি মুক্তি।

গঙ্গানদীর আত্মকাহিনী

১৯.

ভগবান বুদ্ধ

সূচনা ॥ ভারতে বৈদিক যুগের শেষে ধর্মের অনাচার দূর করিয়া রক্তাক্ত পৃথিবীকে কলঙ্কশূন্য করিবার জন্য উদার অভ্যুদয় ঘটিল ভগবান বুদ্ধের। **জন্ম ও বংশ-পরিচয় ॥** হিমালয়ের পাদদেশে কপিলবাস্তু নগর। পিতা রাজা শুদ্ধোদন, মাতা মায়াদেবী। মাতার মৃত্যুর পর পিতৃষসা গৌতমী প্রতিপালন করেন ; তাই আর এক নাম গৌতম। পুত্র-লাভের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ায় শুদ্ধোদন পুত্রের নাম রাখেন সিদ্ধার্থ। **কৈশোর ও যৌবন ॥** সিদ্ধার্থ কৈশোরে অত্যন্ত ভাবুক ও স্বল্পভাষী ছিলেন। অল্পবয়সে যশোধরা নামে এক সুন্দরী কন্যার সহিত বিবাহ হয়। একটি পুত্রসন্তান জন্মলাভ করিল—নাম রাহুল। সিদ্ধার্থ এবার মায়াবন্ধন ছিন্ন করিতে উদ্যত হইলেন। **বৈরাগ্যের উন্মেষ ॥** কথিত আছে, তিনি ভ্রমণে গিয়া প্রথম দিনে এক জরাজীর্ণ বৃদ্ধ, দ্বিতীয় দিনে এক ব্যাধিগ্রস্ত মুমূর্ষু, তৃতীয় দিনে একটি শবদেহ এবং চতুর্থ দিনে এক সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী দেখিয়া সন্ন্যাস-গ্রহণকেই মুক্তির উপায় বলিয়া মনে করিলেন। **সন্ন্যাস-গ্রহণ ॥** তিনি মস্তক মুণ্ডন করিয়া গৈরিক বসন পরিধান করিয়া একাকী চলিলেন মুক্তির সন্ধানে। **সিদ্ধিলাভ ॥** বৈশালীতে এক ব্রাহ্মণের গৃহে, তারপর রাজগৃহে অপর এক ব্রাহ্মণের গৃহে চলিল তাঁহার দর্শন অধ্যয়ন। অবশেষে এক ব্রাহ্মণের নির্দেশে নিরঞ্জনা নদীতীরে বোধিদ্রুমতলে লাভ করিলেন জ্যোতির্ময় সিদ্ধি। সিদ্ধার্থ হইলেন ভগবান বুদ্ধ। **বুদ্ধের বাণী ॥** অবিদ্যাই দুঃখের মূল। অবিদ্যা জয় করিতে হইবে। **প্রার্থনা সংগীত ॥** 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। ধম্মং শরণং গচ্ছামি। সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।' **দেহত্যাগ ॥** আশি বৎসর বয়সে এই মহাতাপস কুশীনগরে দেহত্যাগ করিলেন। **বৌদ্ধতীর্থ ॥** কপিলবাস্তু, বুদ্ধগয়া, সারনাথ এবং কুশীনগর বৌদ্ধদের পরম তীর্থক্ষেত্র। **বৌদ্ধগ্রন্থ ॥** বুদ্ধের দেহাবসানের পর 'ত্রিপিটক' রচিত হয়—সুত্ত, বিনয় ও অভিধর্ম। **উপসংহার ॥** তিব্বত, চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ, সিংহল প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্ম বিস্তৃত।—'আজিও জুড়িয়া অর্ধজগৎ ভক্তি প্রণত চরণে যাঁর ॥'

বুদ্ধের জীবন ও বাণী

২০.

বীর-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ

সূচনা ॥ পরাধীন জাতিকে পরানুকরণ ত্যাগ করিয়া আত্মসন্ধানে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য কে তাহাকে বজ্রগর্ভ অগ্নিমন্ত্রে উজ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছিলেন? তিনি মহা-সন্ন্যাসী বীরেশ্বর বিবেকানন্দ। **জন্ম ও বংশ-পরিচয় ॥** ১৮৬৩। কলিকাতার সিমলার দত্ত-পরিবার। পিতা—বিশ্বনাথ দত্ত। মাতা—ভুবনেশ্বরী। বাল্যনাম—নরেন্দ্রনাথ। বীরেশ্বরের কৃপালব্ধ নরেন্দ্রনাথের অন্য নাম বীরেশ্বর ; ডাক নাম—'বিলে'। **শৈশব ও বিদ্যাশিক্ষা ॥** শৈশবে নরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন। 'শিব'নাম উচ্চারণে শান্ত

হইতেন। ধ্যানের নেশা। মেট্রোপলিটন স্কুল হইতে প্রবেশিকা এবং জেনারেল এসেম্‌ব্লিজ হইতে বি. এ. পাস। আবাল্য ব্যায়াম, খেলাধুলা এবং সংগীত-চর্চার প্রতি ছিল বিশেষ আকর্ষণ। **শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শন ও শিষ্যত্ব লাভ॥** আকস্মিকভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার এক ভক্তগৃহে নরেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার দিব্য সান্নিধ্যে আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ। **বিবেক-বাণী॥** তিনি জীবন্মৃত জাতিকে 'অভীঃ' মন্ত্রে জাগাইয়া তুলিলেন। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকায় অনুষ্ঠিত ধর্ম-মহাসম্মেলনে হিন্দুধর্মের বিজয়-পতাকা উড়াইয়া দিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। বহু বিদেশী গুণী ব্যক্তির তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ। **রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা॥** ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা। ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে মাত্র উনচল্লিশ বৎসর বয়সে পরলোক গমন। **বলিষ্ঠ ভারত-গঠন॥** জাতিভেদহীন বলিষ্ঠ ভারত-গঠনই ছিল তাঁহার ব্রত। **উপসংহার॥** আমরা যেন তাঁহার বীরবাণী না ভুলি—'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য'॥

একজন স্মরণীয় সাধকের জীবন-কাহিনী

২১.

ভগিনী নিবেদিতা

সূচনা॥ ভারতে লাঞ্ছিত মানবতার পূজায় আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। **জন্ম ও বংশ-পরিচয়॥** ২৮শে অক্টোবর, ১৮৬৭। আয়র্লণ্ডের ডানগ্যানন শহর। পিতা স্যামুয়েল রিচমণ্ড, মাতা মেরী ইজাবেল হ্যামিলটন। পিতামহ ছিলেন আয়র্লণ্ড মুক্তি-সংগ্রামের সৈনিক। **বাল্য-জীবন ও শিক্ষা॥** বাল্যনাম মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্‌ল্। শৈশব কাটে পিতামহীর নিকট। পিতামহী ও পিতার মৃত্যু। নিদারুণ দারিদ্র্য। মাতামহ হ্যামিলটনের বাড়িতে থাকিয়া স্কুল ও কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া শিক্ষাদান ব্রত গ্রহণ করেন। **ভারত-আগমন॥** সংসারের নানা আঘাতে মার্গারেটের হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। এমন সময়ে ইংলণ্ড আসিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি মার্গারেটকে আলো দেখাইলেন। ভারতে লাঞ্ছিত মানবতার পূজায় আত্মনিবেদনের জন্য মার্গারেট ভারতে আসিলেন। **'ভগিনী-নিবেদিতা'॥** তাঁহার 'ভগিনী-নিবেদিতা' নাম সার্থক হইল। **কর্ম-জীবন॥** ত্যাগ ও সেবাধর্মই তাঁহাকে দেশত্যাগী করিয়াছিল। ভারতের নারীজাতির মুক্তির দূতী। নারীশিক্ষার পথ-প্রদর্শিকা। এ দেশের শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, স্বদেশসেবক—সকলেই তাঁহার নিকট ঋণী। **উপসংহার॥** তাঁহার রচিত গ্রন্থ—'The Master as I saw Him' এবং 'Notes on Some Wanderings with the Swami Vivekananda.' ১৯১১ সালের ১১ই অক্টোবর পরলোক গমন। আমরণ তিনি ভারতকেই স্বদেশ মনে করিয়াছেন। বিদেশিনী ভগিনী আজ আমাদের ঘরের ভগিনী॥

একজন মহীয়সী মহিলা

২২.

আচার্য জগদীশচন্দ্র

সূচনা ॥ প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান-সাধনার রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত করিবার জন্ম উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগৃতি-লগ্নে বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রের আবির্ভাব। তাঁহার সাধনায় প্রাচ্যের দর্শন এবং পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানের সেতু-বন্ধন। **জন্ম, পিতৃ-পরিচয় ও বাল্যজীবন ॥** ১৮৫৮ সাল, ৩০শে নভেম্বর। ঢাকার রাড়িখাল। পিতা ফরিদপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ভগবানচন্দ্র বসু। পিতার স্বদেশানুরাগ ও শিল্পোৎসাহ, মাতার রামায়ণ-মহাভারত-প্রীতি এবং সাধারণ মানুষের শিশু-সন্তানদের সখ্যতা তাঁহার জীবনে ব্যর্থ হয় নাই। **উচ্চশিক্ষা লাভ ॥** হেয়ার স্কুল ও সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুল। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ হইতে বি. এ. পাস। বিলাত-যাত্রা। প্রাণিবিদ্যা ও উদ্ভিদ্‌-বিদ্যায় পাঠ-গ্রহণ; কিন্তু অসুস্থতার জন্ম পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন-বিদ্যা ও উদ্ভিদ্‌-বিদ্যায় ট্রাইপোস্‌ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এস্‌-সি. উপাধি লাভ। **অধ্যাপনা-জীবন ॥** প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা ও গবেষণা। শ্বেতাঙ্গ ও ভারতীয় অধ্যাপকদের বেতন-বৈষম্যের প্রতিবাদ। **পদার্থ-বিদ্যায় আবিষ্কার ॥** বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বিষয়ে আবিষ্কারের জন্ম লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এস্‌-সি. উপাধি লাভ। বেতার-যন্ত্র আবিষ্কারের সম্ভাব্যতার বিষয়ে বক্তৃতা দান। রবীন্দ্রনাথের শুভেচ্ছা-বাণী—'আজি মাতা পাঠাইছে অশ্রুসিক্ত বাণী আশীর্বাদধ্বনি।' জগদীশচন্দ্রের ব্যথিত অভিজ্ঞতা—'যাঁহারা আমার বিরুদ্ধপক্ষ ছিলেন, তাঁহাদেরই একজন আমার আবিষ্কার পরে নিজের বলিয়া প্রকাশ করেন।' **উদ্ভিদ্‌-বিদ্যায় আবিষ্কার ॥** পদার্থ-বিদ্যার গবেষণা ত্যাগ ও উদ্ভিদ্‌-বিদ্যায় মনোনিবেশ। আবিষ্কার— জড় ও চেতনের সর্বত্র প্রাণের নির্বাধ প্রকাশ। **সাহিত্য-চর্চা ॥** তিনি একাধারে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও সাহিত্যিক। 'অব্যক্ত' গ্রন্থে তাহার স্বাক্ষর আছে। **বসু-বিজ্ঞান মন্দির ॥** ১৯১৭ সালের ৩০শে নভেম্বর বসু-বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠা। ১৯৩৭ সালের ২৩শে নভেম্বর পরলোক গমন। **উপসংহার ॥** ভারতে বিজ্ঞান-সাধনার অনুকূল পরিবেশ রচনা ছিল তাঁহার অন্যতম সাধনা। সেখানে মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের আবির্ভাব। জগদীশচন্দ্রের দুঃখের সাধনা জাতির স্বপ্নের মধ্যে সফলতা লাভ করুক ॥

ভারতের একজন বিজ্ঞান-সাধকের জীবনী

২৩.

মহাত্মা গান্ধী

সূচনা ॥ মহাত্মা গান্ধী সত্য, স্বাধীনতা ও অহিংসার প্রতিমূর্তি। **জন্ম ও বংশ-পরিচয় ॥** ২রা অক্টোবর, ১৮৬৯। গুজরাটের পোরবন্দরের এক বণিক-বংশ। পিতা—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। মাতা—পুতলী বাঈ। সত্যানুরাগ, তেজস্বিতা, ধর্মানুরাগ, দয়া, ক্ষমা—এই সব ছিল তাঁহার উত্তরাধিকার। **শিক্ষা ॥** প্রবেশিকা

পরীক্ষায় পাস করিয়া বিলাতে যান এবং ব্যারিস্টার হইয়া আসেন। **কর্ম-জীবন ॥** বোম্বাই হাইকোর্টে আইনের ব্যবসায়ের শুরু। কয়েকজন ভারতীয় ব্যবসায়ীর আমন্ত্রণে নাটালে যাত্রা। সেখানে ভারতীয় ব্যবসায়ী ও শ্রমিকদের উপর নাটাল সরকারের অমানুষিক জুলুমের প্রতিবাদ। সত্যাগ্রহ-সংগ্রামের সূচনা। জয়লাভ। একুশ বছর পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। সবরমতী আশ্রম প্রতিষ্ঠা। কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ। অহিংস সংগ্রাম। হরিজন-আন্দোলন। লবণ-সত্যাগ্রহ—'ডাণ্ডি অভিযান'। 'ভারত ছাড়' আন্দোলন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় শান্তি পদযাত্রা। ভারতের স্বাধীনতা-লাভ। ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৪৮ নাথুরাম বিনায়ক গডসের পিস্তলের গুলিতে প্রাণত্যাগ। **উপসংহার ॥** তিনিই নবভারতের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা। 'একজাতি, একপ্রাণ, একতা'র পুরোহিত।

● ভারত-গঠনে মহাত্মা গান্ধী

২৪.

শান্তির দূত জওহরলাল

সূচনা ॥ নেহরু ভারত আত্মার মূর্ত বিগ্রহ। স্বাধীনতা-আন্দোলনে এবং স্বাধীন ভারত দেশগঠনে তিনি দিয়াছেন তাঁহার সদা-জাগ্রত নেতৃত্ব। **শৈশব ও শিক্ষা ॥** জন্ম ১৮৮৯ সালের ১৪ই নভেম্বর। এলাহাবাদে। পিতা মতিলাল নেহরু, মাতা স্বরূপরাণী। পনেরো বৎসর বয়সে অধ্যয়নের জন্য বিলাত যাত্রা। ১৯১০ সালে রসায়ন, ভূতত্ত্ব ও উদ্ভিদ-বিদ্যায় অনার্সসহ ডিগ্রি লাভ। ফ্রান্স ও জার্মানী পরিভ্রমণ। ১৯১২ সালে ব্যারিস্টারি পাস করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। **কর্মময় জীবন ॥** এলাহাবাদ কোর্টে আইন-ব্যবসায় শুরু। কংগ্রেসের স্বাধীনতা-সংগ্রামে তিনি গ্রহণ করিলেন বীর সৈনিকের ভূমিকা। **জাতীয় কংগ্রেস ও নেহরু ॥** ১৯১৬ সালে কমলা কাউলের সহিত বিবাহ। মহাত্মা গান্ধীর সহিত প্রথম সাক্ষাৎ। যৌবনের সহিত মিলন হইল সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের, নিষ্ঠার সহিত আবেগের। **স্বাধীনতা-সংগ্রামে নেহরু ॥** ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের তথ্য-সংগ্রহে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে সাহায্য। ১৯২১ সালে প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের ভারত-আগমন উপলক্ষে প্রথম কারাদণ্ড ভোগ। মুক্তিলাভ করিলেও তাঁহাকে জীবনে ১২ বৎসরেরও অধিক কারান্তরালে কাটাইতে হয়। ১৯৪৫ সালে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের ঐতিহাসিক বিচারে আইনজীবী হিসাবে তাঁহাদের পক্ষাবলম্বন করিয়া স্বদেশপ্রেমের এক বলিষ্ঠ দৃষ্টান্ত স্থাপন। **প্রধানমন্ত্রী নেহরু ॥** ১৯৪৭ সালে স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। সেই হাল তিনি ধরিয়াছিলেন আমরণ—দীর্ঘ সতেরো বৎসর। ১৯৬৪ সালের ২৭শে মে এই ভাস্বর ভারত-সূর্য অস্তমিত হইলেন। **কংগ্রেস ও নেহরু ॥** ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সহিত নেহরুর সম্পর্ক ছিল যেমন সুদীর্ঘ, তেমনি

নিবিড়। তিনি জীবনে মোট পাঁচবার কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। নেহরুই কংগ্রেসের স্থবিরতার চোখে আনিয়া দিলেন সমাজতন্ত্র, তথা প্রগতিশীলতার স্বপ্ন। **সাহিত্য-কীর্তি, ইতিহাস-চেতনা ও দার্শনিকতা ॥** ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডিসরেলি, উইনস্টন চার্চিলের মতো তিনি ছিলেন অসাধারণ সাহিত্যিক-প্রতিভার অধিকারী। কারান্তরালে রচিত তাঁহার 'লেটার ফ্রম ফাদার টু হিজ্ ডটার', 'গ্লীম্প্‌সেস্ অব্ ওয়ার্লড্ হিস্ট্রি', 'আত্মজীবনী' এবং 'ডিসকভারি অব্ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থগুলি তাঁহার সাহিত্য-কীর্তি, ইতিহাস-চেতনা ও দার্শনিকতার অবদান-রূপে ভাস্বর হইয়া আছে। **হুশিয়ার কাণ্ডারী ॥** তিনি ছিলেন উত্তাল জন সমুদ্রের হুঁশিয়ার কাণ্ডারী। তাহা ছাড়া, এমন সুনিপুণ বাগ্মিতাও বিশ্ব-রাজনীতির ক্ষেত্রে বিরল-দৃষ্ট। **বিশ্ব-শান্তির মহান্ প্রবক্তা ॥** বিশ্ব-শান্তির সুমহান্ প্রবক্তা নেহরু বলিয়াছিলেন—'লজ্জার কথা। এতদূর এগিয়ে এসেও আমরা মাটির নিচে ঘর খুঁজছি, বিষবাষ্প থেকে বাঁচার জন্যে ইঁদুরের মতো আশ্রয় গড়ছি।' নেহরুকে আলিঙ্গন করিয়া স্থিতপ্রজ্ঞ আইনস্টাইন বলিয়াছিলেন—'আমাদের একমাত্র ভরসা তুমিই। তোমার পদচিহ্ন আগামী কালের পৃথিবীর কক্ষপথ।' **উপসংহার ॥** নেহরুর সেই পদচিহ্ন যেন আগামীকালের পৃথিবী মুছিয়া না ফেলে।

ভারতের একজন সুখ্যাত প্রধানমন্ত্রী

২৫.

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

সূচনা ॥ পরাধীন ভারতের জাতির পুরোধা হইয়া যিনি তাহাদের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য পরিচালিত করিয়াছিলেন, তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। ফলে, পরাধীনতার বন্ধন-মোচনের লগ্ন হইল সমাগত। **আবির্ভাব ॥** চিত্তরঞ্জনের আবির্ভাবের প্রাক্কালে বিক্ষুব্ধ যুবশক্তি ধরিয়াছিল নৈরাজ্যবাদের পথ। এমন সময় আসিলেন চিত্তরঞ্জন, নেতৃত্বে ধরিলেন দেশের হাল, পথহারা যুব সম্প্রদায়কে দিলেন সুনির্দিষ্ট পথ-নির্দেশ। **বংশ-পরিচয় ॥** জন্ম ১৮৭০ সালের ৫ই নভেম্বর। পিতা ভুবনমোহন দাশ, মাতা নিস্তারিণী দেবী। প্রাথমিক শিক্ষার পর চিত্তরঞ্জন ভবানীপুরে লণ্ডন মিশনারী স্কুলে ভর্তি হইলেন। ১৮৮৬ সালে এন্ট্রান্স পাস। ১৮৯০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক হইয়া তিনি বিলাতে যান। কিন্তু রাজনৈতিক মতবাদের জন্য আই. সি. এস. পরীক্ষা দিবার অনুমতি না পাইয়া তিনি ১৮৯৪ সালে ব্যারিস্টারি পাস করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং কলিকাতা হাইকোর্টে আইনের ব্যবসায় শুরু করিলেন। **ছাত্র-জীবনে কৃতিত্ব ॥** ছাত্র-জীবনেই চিত্তরঞ্জন অসাধারণ বাগ্মিতায় এবং সাংগঠনিক প্রতিভায় ছিলেন অনন্য। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সদস্য-পদপ্রার্থী দাদাভাই নৌরজী সম্পর্কে পার্লামেন্ট-সদস্য জন ম্যাকলীনের ঘৃণ্য মন্তব্যের প্রতিবাদে তিনি

তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মিঃ গ্ল্যাডস্টোনকে সভাপতি করিয়া বিলাতে যে স্মরণীয় সভার আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহাতে সমগ্র ব্রিটিশ জাতি স্তম্ভিত হইয়া যায়। **কর্ম-জীবনে কৃতিত্ব ॥** তাঁহার ব্যারিস্টারিতে মুরারিপুকুরের বোমার মামলায় শ্রীঅরবিন্দ নির্দোষ প্রমাণিত হইয়া মুক্তিলাভ করেন। **দেশ সেবায় চিত্তরঞ্জন ॥** চিত্তরঞ্জন এবার তাঁহার খ্যাতি, প্রতিপত্তি এবং ঐশ্বর্য—সমস্ত ত্যাগ করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িলেন গান্ধীজী-প্রবর্তিত অহিংস আন্দোলনে। চিত্তরঞ্জন হইলেন জনগণের মনের অধিনায়ক—সকলের প্রিয় 'দেশবন্ধু'। এই সময় বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলেন দেশ-গৌরব সুভাষচন্দ্র। দেশবন্ধু ও দেশ-গৌরবের মিলন হইল। এমন সময় স্বৈরাচারী শাসক দেশবন্ধুকে গ্রেপ্তার করিল। কারামুক্তির পর কংগ্রেসে মতান্তর উপস্থিত হওয়ায় তিনি গঠন করিলেন 'স্বরাজ্য দল'। তাঁহার সম্পাদিত 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকায় ইংরেজদের স্বৈর-শাসনের বিরুদ্ধে গর্জন করিয়া উঠিল তাঁহার লেখনী। ১৯২৪ সালে 'ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট' বিধিবদ্ধ হয়। চিত্তরঞ্জন প্রথম মেয়র নির্বাচিত হইলেন। ১৯২৫ সালে হইলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি। **মহাপ্রয়াণ ॥** অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তিনি গুরুতররূপে অসুস্থ হইয়া পড়েন। ১৯২৫ সালের ১৬ই জুন শৈল-শহর দার্জিলিং-এ তিনি পরলোক গমন করেন। **কাব্য-সাধনায় চিত্তরঞ্জন ॥** বাংলা কাব্যেও চিত্তরঞ্জন প্রতিভার অম্লান স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কাব্যগ্রন্থ : 'মালঞ্চ', 'মালা', 'অন্তর্যামী', 'কিশোর কিশোরী' ও 'সাগর সংগীত'। কাব্য-কীর্তির স্বীকৃতি-স্বরূপ ১৯১৫ সালে তিনি বাঁকিপুর বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে লাভ করেন সভাপতির পদ। **উপসংহার ॥** দেশকে ভালোবাসিয়া এই মহত্যাগী মহানায়ক সমস্তই দান করিয়াছিলেন, অবশিষ্ট ছিল তাঁহার প্রাণ। মৃত্যুতে শোকবিহ্বল রবীন্দ্রনাথ তাই শোক নিবেদন করিলেন :

'এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ।
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান॥'

২৬.

ঋষি অরবিন্দ

সূচনা ॥ মহাতাপস শ্রীঅরবিন্দ ভারতের আধ্যাত্মিক সাধনার মূর্ত বিগ্রহ। শ্রীঅরবিন্দের সাধনায় ভারতভূমি গৌরবান্বিত। **জন্ম ও বংশ-পরিচয় ॥** ১৫ই আগস্ট, ১৮৭২। পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ, মাতা রাজনারায়ণ বসুর কন্যা স্বর্ণলতা দেবী। **শিক্ষা-জীবন ॥** সাত বছর বয়সে শিক্ষালাভার্থে বিলাতযাত্রা। সেখানে উচ্চ-শিক্ষা সম্পন্ন করিয়া আই সি. এস. পরীক্ষায় সাফল্য, কিন্তু অশ্বারোহণ-পরীক্ষায় অনুপস্থিতির জন্য সরকারী চাকরি লাভে ব্যর্থ। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। **কর্ম-জীবন ॥**

১৮৯৩ সালে বরোদা রাজ্যের শিক্ষাবিভাগে কর্মগ্রহণ। কলিকাতায় আগমন। 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা সম্পাদনা। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পটভূমিকায় বিপ্লব-বাদের মন্ত্রোচ্চারণ। **কারাবরণ ॥** মুরারিপুকুর বোমা মামলার প্রধান আসামী। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ব্যারিস্টারিতে নির্দোষ প্রমাণিত। পুলিশের তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি এড়াইয়া ব্রিটিশ-শাসিত ভারতের মৃত্তিকা হইতে অন্তর্ধান। **নূতন সাধনা ॥** তদানীন্তন ফরাসী উপনিবেশ পণ্ডীচেরীতে ভারতের মুক্তির জন্য আধ্যাত্মিক সাধনা। দেশ বিদেশের বহু সাধকের আগমন। পণ্ডীচেরীতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা ও দেহাবসান। **উপসংহার ॥** শ্রীঅরবিন্দ ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধনার মূর্ত বিগ্রহ। তাঁহার সাধনাকে রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতি দান—'অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহো নমস্কার।'

● ঋষি শ্রীঅরবিন্দ

২৭.

আমার প্রিয় উপন্যাস : পথের পাঁচালী

সূচনা ॥ আমার প্রিয় উপন্যাস বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী'। উপন্যাসখানি ভাবের কোমল সুষমায় এবং ভাষার অপরূপ মাধুর্যে আমার মনোহরণ করিয়াছে। **প্রিয় হইবার কারণ : কাহিনী ॥** 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের কাহিনীর সৌন্দর্য তুলনারহিত। একটি শিশুর জীবনে তাহার পারিপার্শ্ব কল্পনার রঙে রঙীন হইয়া দেখা দিয়াছে। পল্লী-প্রকৃতির স্নিগ্ধছায়ায় অবগাহন করিয়া কল্পনার রঙে বিচিত্র সুষমায় মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে ইহার অনবদ্য কাহিনী। **চরিত্র ॥** অতীত স্মৃতির বেদনার্তির মতো ইন্দির ঠাকরুণ, হরিহরের প্রথম যৌবনে যে তাহার বাস্তুভিটা যক্ষের মতো আগলাইয়া বসিয়াছিল, সর্বজয়ার আগমনের পর তাহার আর মাথা গুঁজিবার মতো স্থান রহিল না। হরিহর সংসারী হইয়াও তাহার বিষয়-বুদ্ধিহীনতা এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাহার কল্পনা প্রবণতা, সর্বজয়ার অতিরিক্ত সাংসারিকতা—এই পটভূমিতে দুর্গা যেন নিশ্চিন্দপুরের পল্লী-প্রকৃতিরই একটি অনবদ্য প্রকাশ। আর অপু তাহার কৌতূহলী দুইটি চোখ মেলিয়া দুর্ভিক্ষের ক্ষুধার আগ্রহে চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছে, পরম বিস্ময়ে মুগ্ধ হইয়াছে। শেষে তাহার সেই কল্পনার সাম্রাজ্য হইতে তাহাকে চলিয়া যাইতে হইয়াছে। সকলেই চলিয়া গেল, যাইতে পারিল না শুধু দুর্গা। অপু তাহাকে বড় হইয়া রেলগাড়ি দেখাইবে কথা দিয়াছিল। তাহার সেকথা সে রাখিতে পারে নাই। তাহার পূর্বেই দুর্গা পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল। **উপসংহার ॥** কিন্তু 'পথের পাঁচালী'র সৌন্দর্য লুকানো রহিয়াছে নিশ্চিন্দিপুরের স্নিগ্ধ শীতল আকাশে, শ্যামল পল্লী প্রকৃতির গোপন মণিকোঠায়।

● তোমার পড়া কোন বিখ্যাত লেখকের বই
● তোমার প্রিয় গ্রন্থ

২৮.

বাংলার লোক-সাহিত্য

সূচনা ॥ লোক-সাহিত্যেই পাওয়া যায় জাতির হৃদয়ের অন্তরতম পরিচয়। বাংলার লোক-মানসের সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনার অপরূপ পসরায় সাজান হইয়াছে তাহার লোক-সাহিত্যের সোনার তরী। শত উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া পদ্মা-মেঘনা-ভাগীরথী-মহানন্দা-ইছামতীর স্রোত বাহিয়া সেই সোনার তরী আসিয়া ভিড়িয়াছে বর্তমানের উপকূলে। **বাংলার লোক-সাহিত্যের পরিচয় ॥** তাহার শিবায়ন-মঙ্গলকাব্যে, যাত্রা-পাঁচালী ও কবিগানে, বাউল-ভাটিয়ালি-জারি-সারি-মুর্শিদা ও কীর্তনের গানে বাঁচিয়া রহিয়াছে ফুল্লরা-খুল্লনা, বেহুলা-লখীন্দর, কালু-লখ্যা, মেনকা-উমা, মহুয়া-মলুয়া, লীলা-কঙ্ক, সোনাই-কাজলরেখা এবং রাধা ও কৃষ্ণ। ইহাদের আশ্রয় করিয়া বাঙ্গালী যত কাঁদিয়াছে, কোথাও তাহার তুলনা নাই। সেই রূপসৃষ্টির মায়া-কাজলে অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে তাহার ব্রতকথা, রূপকথা ও ছেলে-ভুলানো ছড়াগুলি। **শ্রেণী-বিভাগ ॥** বাংলার লোক-সাহিত্যকে অন্ততঃ সাত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: শিশুসাহিত্য, মেয়েলি ব্রতকথা, ধর্ম-সাহিত্য, পল্লী-সাহিত্য, সভা-সাহিত্য, ইতিবৃত্তমূলক সাহিত্য ও প্রবচন-সাহিত্য। **উপসংহার ॥** বাংলার লোক-সাহিত্য হিন্দু-মুসলমানের যৌথ সম্পত্তি। কৃত্রিম দেশ-বিভাগের ফলে সেই লোক-সাহিত্যও আজ দ্বিখণ্ডিত। এপারে কাঁদিতেছে ফুল্লরা-খুল্লনা, ওপারে কাঁদিতেছে মহুয়া-মলুয়া-কাজলরেখার দল।

বাংলার পল্লী-সাহিত্য

২৯.

বিজ্ঞান-সাধনায় বাঙ্গালী

সূচনা ॥ বাংলাদেশ ভাব-প্রবণতার দেশ, অন্ধ-বিশ্বাসের দেশ। এতদিন তাহার বিজ্ঞান-চর্চা ছিল কুণ্ঠিত। **আধুনিক যুগ: বাঙ্গালীর বিজ্ঞান-সাধনা ॥** বিজ্ঞান-ব্রতী য়ুরোপের সংস্পর্শে তাহার বিজ্ঞানের অচলায়তনের রুদ্ধদ্বার ভাঙ্গিয়া গেল। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানচর্চার অনুকূল মানসিকতা গড়িয়া উঠিল। **আচার্য জগদীশচন্দ্র ॥** বিজ্ঞানের অনড় সিংহদ্বারে প্রথম করাঘাত হানিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র। জড় ও চেতনের স্পর্শকাতরতা, উদ্ভিদের প্রাণ-স্পন্দন এবং বিনাতারে বার্তা-প্রেরণের সম্ভাব্যতা তাঁহারই আবিষ্কার। **বসু-বিজ্ঞান মন্দির ॥** তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বসু-বিজ্ঞান মন্দির হইল বাঙ্গালীর বিজ্ঞান-সাধনার শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান। **আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ॥** আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র আবিষ্কার করিলেন মার্কুরিয়াস নাইট্রেট। **সত্যেন্দ্রনাথ**

বসু, মেঘনাদ সাহা ও অন্যান্য বিজ্ঞানীগণ ॥ আচার্য জগদীশচন্দ্রের শিষ্যদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও মেঘনাদ সাহার নাম সর্ববিদিত। সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নাম আইনস্টাইনের নামের সহিত যুক্ত। পরমাণু-গবেষণায় মেঘনাদ সাহার অবদান স্মরণীয়। অন্যান্য বাঙ্গালী বিজ্ঞানীদের মধ্যে বি. ডি. নাগচৌধুরী, দেবেন্দ্রনাথ বসু, সহায়রাম বসু, বিভা চৌধুরীর নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। **উপসংহার ॥** স্বাধীন ভারতে বাঙ্গালী বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের নূতন নূতন দ্বারোদ্ঘাটনের সাধনায় আজ নিমগ্ন ॥

বাঙ্গালীর বিজ্ঞান-সাধনা

৩০.

বাঙ্গালীর বাণিজ্য-সাধনা

সূচনা ॥ বাংলাদেশ শিল্প ও বাণিজ্য-সম্ভাবনাময়। তাহার কৃষি-প্রান্তরে, লৌহ ও কয়লাখনিতে সম্পদের প্রাচুর্য, নদীগুলিতে জলবিদ্যুতের প্রচুর সম্ভাবনা। তবুও বাঙ্গালী শিল্প-বাণিজ্যে অনগ্রসর জাতি। **বাঙ্গালীর শিল্প-বাণিজ্যের ইতিহাস : প্রাচীন যুগ ॥** ইতিহাস সাক্ষী, ধনপতি-চাঁদসদাগর-শ্রীমন্ত সদাগর-বিহারী দত্তের বাংলাদেশ কোনকালেই শিল্প-বাণিজ্যে পশ্চাৎপদ ছিল না। অতি প্রাচীনকালে তাহার বাণিজ্য-সাধনার শ্রেষ্ঠ বন্দর তাম্রলিপ্ত গড়িয়া উঠিয়াছিল। **আধুনিক যুগ ॥** তারপর সপ্তগ্রাম, সপ্তগ্রামের পর হুগলী, হুগলীর পর কলকাতা। য়ুরোপীয়, পার্শী, মাড়োয়ারী, চীনা, পাঞ্জাবী ব্যবসায়ীদের কাছে বাঙ্গালী আজ পরাজিত—নিজভূমে পরবাসী। **পরাভবের কারণ ॥** বাঙ্গালীর ব্যবসা-বুদ্ধির অভাব, শ্রমবিমুখতা এবং শিক্ষার ত্রুটি। কৃষি ও শিল্পের অবনতি, বিজ্ঞান-চর্চার অভাব, দুঃসাহসিকতার অভাব, মূলধনের অভাব, স্বাস্থ্যহীনতা ও অতিরিক্ত ভাব-প্রবণতা। **ত্রুটি-মোচন ॥** শিক্ষার সংস্কার ও সমবায়ের মাধ্যমে পুঁজি সংগঠন চাই। অতিরিক্ত উৎসব-উচ্ছ্বাস নয়, ভাব-প্রবণতা নয়, চাই উপযুক্ত বৈষয়িক শিক্ষা। **বাঙ্গালীর নব-জাগরণ ॥** দেশবিভাগের পর জীবন-সংগ্রামের মধ্য দিয়া বাঙ্গালীর নব-জাগরণ সম্ভব হইয়াছে। ঘরছাড়া বাঙ্গালী আজ শ্রমবিমুখতা পরিহার করিয়া বাণিজ্যে দুঃসাহসিকতা অর্জন করিয়াছে। **উপসংহার ॥** আজ বাঙ্গালী তাহার বহুকালের পরিত্যক্ত মধুকর-সপ্তডিঙাকে নবযুগের পণ্যসম্ভারে সাজাইবে। সে দেশ-দেশান্তরে পূর্ব-পরিচয়ের সূত্র ধরিয়া গিয়া প্রশ্ন করিবে—'দেখো তো চেয়ে আমারে তুমি চিনিতে পারো কিনা?'

- বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
- বাণিজ্যে লক্ষ্মীলাভ

৩১.

বাঙালী মধ্যবিত্তের জীবন-সংকট

সূচনা ॥ ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে মধ্যবিত্ত সমাজের জ্ঞান-সাধনা, কর্ম-সাধনা ও ভাব-সাধনায় রচিত হইয়াছে ভারতের উজ্জ্বল ইতিহাস। আজ নিয়তির নির্মম পরিহাসে তাহারা চরম সংকটের সম্মুখীন। **মধ্যবিত্ত সমাজের ইতিহাস : উদ্ভব ও ক্রমপরিণাম ॥** মধ্যবিত্ত সমাজ ব্রিটিশ শাসনযন্ত্রের সৃষ্টি, বিদেশী শিক্ষা ও সভ্যতার জলুসে আকৃষ্ট হইয়া ইহারা স্বদেশ ও সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছিল এবং ইংরেজ-আনুগত্যকেই সর্বস্ব মনে করিয়াছিল। পরে মনস্তাপে ইহারা উচ্চারণ করিল—'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়, তাই ভাবি মনে।' **সমাজের নব-বিন্যাস ও মধ্যবিত্ত সমাজ ॥** কালক্রমে ইংরেজ বিদায় গ্রহণ করিল। নূতন সমাজ-বিন্যাসে ইহাদের জীবন-সংকট মৃত্যু-যন্ত্রণার রূপ পরিগ্রহ করিল। ধনিক-শ্রেণী ও শ্রমিক-শ্রেণী—এই শ্রেণী-বিন্যাসে শ্রমিক-শ্রেণীর দিকেই তাহাদের সমর্থন প্রসারিত। তবু ইহারা ঠিক শ্রমজীবী নয়, বুদ্ধিজীবী-সম্প্রদায়। **সংকটের রূপ ॥** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পঞ্চাশের মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশবিভাগ তাহাদের মেরুদণ্ড ভাঙিয়া দিয়াছে। কিন্তু স্বাধীনতার কাছে তাহারা সর্বাধিক প্রতারিত। ইহারাই ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোহিত। কিন্তু স্বাধীন ভারতের সমাজ-মন্থনের সমস্ত বিষ পান করিয়া আজ তাহারা নীলকণ্ঠ। ডাক্তার, শিক্ষক, আইনজীবী, ইঞ্জিনিয়ার, সাধারণ ব্যবসায়ী, দোকানদার—সকলেই সমাজের উপেক্ষার পাত্র। **সংকট-মুক্তির উপায় ॥** অর্থভিত্তিক সমাজে অর্থ-সংকটকে জয় করিবার জন্য মধ্যবিত্ত-সমাজকে প্রয়াস চালাইতে হইবে। সাধারণ শিক্ষার মোহ ও জীর্ণ সামাজিকতা বর্জন করিয়া সমবায়িক প্রয়াস, নারী-প্রগতি, সরকারী আনুকূল্য ইত্যাদির মাধ্যমে এই সমাজের সংকট-মুক্তি সম্ভব। **উপসংহার ॥** মধ্যবিত্ত সমাজ বাঁচার জন্য আজ প্রকৃতই সংগ্রামশীল। সকল সংগ্রামে সে জয়ী হইয়াছে। এই সংগ্রামেও তাহাকে জয়লাভ করিতে হইবে॥

● মধ্যবিত্তের সমস্যা

৩২.

জগৎ জুড়িয়া একজাতি শুধু সে জাতির নাম মানুষ-জাতি

সূচনা ॥ মানুষ মানুষই। তাহাদের কোন জাতিভেদ নাই। **মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্টি, জাতি মানুষের ॥** রাষ্ট্রীয় ও ভৌগোলিক সীমানা বা শাদা-কালো-হলুদ গায়ের রঙের ভিত্তিতে পৃথিবীতে কত জাতি-ভেদ। কিন্তু মানুষ বিধাতার সন্তান। কাজেই, বাহিরের এই ভেদাভেদ মিথ্যা। 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' **বিদ্বেষের পরিণাম ॥** কৃত্রিম ভেদাভেদের প্রাচীর নির্মাণ করিয়া মানুষ আজ আত্ম

জাতি-বিদ্বেষের ব্যাধিতে ভুগিতেছে। মানুষ আজ মানুষের রক্ত লইয়া হোলি খেলিতেছে। **তাহার এতদিনের সভ্যতার বুকে ছুরিকাঘাত করিয়া সে ছিন্নমস্তার মতো আজ আপন রুধির-পানে উন্মত্ত।** জাতি-বিদ্বেষ, ধর্ম-বিদ্বেষ ও বর্ণ-বিদ্বেষের নির্লজ্জ প্রকাশে আজ মানুষ তাহার মনুষ্যত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে। ভারতের জাতি-ভেদ প্রথার বিরুদ্ধে অপমানের ধূলিশয্যা হইতে লাঞ্ছিত মানবতা আজ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে আমেরিকা ও দক্ষিণ-আফ্রিকার অশ্বেতকায়রা। **উপসংহার॥** জানি না, আজ আমেরিকা ও দক্ষিণ-আফ্রিকা ইতিহাসের বিচারশালায় কি জবাব দিবে। তবে একদিন এই অবমানিত মানবতার কাছে নতজানু হইয়া ক্ষমাভিক্ষা করিতে হইবে মানবতার শত্রু এই বর্ণ-বিদ্বেষীদের। সেদিন তাহাদের স্বীকার করিতে হইবে: 'কালো আর ধলো বাহিরে কেবল ভিতরে সবারই সমান রাঙা॥'

সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।'

৩৬.

ব্যক্তি ও জাতির জীবনে আদর্শের ভূমিকা

সূচনা॥ বিংশ শতাব্দীর অপরাহ্ণ-বেলায় আজ সত্য-সত্যই মানবতার আদর্শের কবরশয্যা রচিত হইতে চলিয়াছে। সমাজের সর্বত্রই আজ আদর্শহীনতা ও অসাধুতার বিজয়-উল্লাস। মানুষের ন্যায়বোধ, নীতিবোধ, আদর্শ ও সততা আজ ধূলিলুণ্ঠিত। সভ্যতার চরম শিখরে আরোহণ করিয়া মানুষ এভাবে দেউলিয়া হইয়া যাইবে, কে ভাবিয়াছিল? **সমাজ-গঠনের মূল উদ্দেশ্য ও সততা॥** মানুষ বড় আশা লইয়া একদিন সমাজবদ্ধ হইয়াছিল। মানুষের সততার উপর আস্থা রাখিয়াই সে সমাজে আসিয়া ঘর বাঁধিয়াছিল। কিন্তু আজ তাহার সেই বিশ্বাস দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে। **অসৎ ব্যক্তিরা সমাজের শত্রু॥** আজ বন্ধুর ছদ্মবেশে মানবতার শত্রুরা বুভুক্ষু ও রোগার্তের হাতে অমৃতের নামে বিষপাত্র তুলিয়া দিতেছে। ইহারা নৃশংসতার দিক হইতে মানবতার নৃশংসতম শত্রু যাহারা, সেই তৈমুরলঙ্গ, চেঙ্গিস খাঁকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। বর্তমানকাল তাহাদের ক্ষমা করিতে পারে, ইতিহাস কোনদিন ক্ষমা করিবে না। **অন্ধকারে আলো॥** মানব-জাতির এই দুর্দিনে আজ কোথায় গেলেন বুদ্ধ, যীশু, শ্রীচৈতন্য? তাঁহারা আজ সভ্যতার এই মধ্যাহ্ন-প্রহরের অন্ধকারে আলো দেখাইয়া মানব-জাতিকে পাপমুক্ত করুন। **উপসংহার॥** স্বার্থান্ধ মানুষ আজ বুঝে না যে, অসৎপথে সাময়িক জয় বা ক্ষুদ্র জয় হয়ত সম্ভব; বৃহত্তর জয় কিছুতেই সম্ভব নয়। আর, অসৎপথে জয়লাভের আত্মধিক্কারের হাত হইতে নিষ্কৃতি কোথায়? অতএব "আবিরাবির্মএধি।" হে আলোর দেবতা, তুমি এসো। পাপমোচন কর এই পঙ্কিল পৃথিবীর॥

● সমাজ-জীবনে সাধুতারই জয়

৩৪.

দশে মিলি করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ

সূচনা ॥ একতাই শক্তি। একক মানুষ বড় একা, দুর্বল এবং অসহায়। একাকী সে কতটুকু কি করিতে পারে? কিন্তু সংঘবদ্ধ হইলে তাহারা অসীম শক্তিধর। তখন তাহারা কত অসাধ্য সাধন করিতে পারে। একতা তাই অসাধ্য-সাধনের হাতিয়ার। **আদিম মানব ও ঐক্য-সাধনা ॥** মানব-সভ্যতার সাধনাই ঐক্যের সাধনা। অরণ্যচারী মানব শ্বাপদ-সংকুলতার মধ্যে যখন একা ছিল, তখন সে ছিল অসহায় ও ভয়ার্ত। কিন্তু মানুষ ক্রমে তাহার ঐক্য-শক্তির সন্ধান লাভ করিল। তখন হইতেই প্রকৃতির রাজ্যে সে দুর্জয় হইয়া উঠিল। **ঐক্য-সাধনা ও মানব-সভ্যতার বিকাশ ॥** আজ বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার গগনচুম্বী ইমারতের দিকে চাহিয়া আমরা বিস্মিত হই। কিন্তু ইহা তো মানুষের সেই ঐক্য-শক্তিরই সমাহৃত যোগফল। মানুষের ঐক্য-শক্তির জোরে আজ পৃথিবী সুন্দর ও বাসযোগ্য হইয়াছে। **'একত্বে বরেণ্য তুমি' ॥** সৃষ্টির সেই আদিম প্রভাতে মানুষ ঐক্যবদ্ধ না হইলে কবে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইত। তাহার সমাজ, রাষ্ট্র ও সভ্যতার বিকাশ কখনই সম্ভব হইত না। তাই কবি মানুষকে শ্রদ্ধা জানাইয়া বলেন—'একত্বে বরেণ্য তুমি, শরণ্য এককে, আত্মার আত্মীয়।' **উপসংহার ॥** সংঘ-শক্তির পরাভবও গৌরবজনক। ইহাতে ব্যক্তির দায়িত্ব থাকে না। তাই আজ পৃথিবীতে নিপীড়িত জনতা সংঘ-শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেছে। এতদিনে সংঘ-শক্তির মধ্যে তাহারা পাইয়াছে দুর্জয় শক্তির সন্ধান। তাহাদের রোধ করা দুঃসাধ্য ॥

'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।'

৩৫.

যে সহে সে রহে

সূচনা ॥ সহিষ্ণুতাই এ জগতে অস্তিত্ব-রক্ষার নির্ভুল উপায়। ধৈর্য-সহকারে যাহারা জগতের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়া টিকিয়া থাকিতে পারে, জয়মাল্য শেষ পর্যন্ত তাহাদের ললাটেই জোটে। ধৈর্য ধারণ করিলে জীবন-যুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব হয়। **দুঃখময় পৃথিবীতে সহিষ্ণুতা ॥** এই সংসারে দুঃখ আছে, বিপদ-বাধা আছে, আছে লাঞ্ছনা ও অপমান। তখনই মানুষের মনে আসে আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব। ইহাতে ভাঙিয়া পড়িলে মানব-জীবনের ঘটে পরাজয়। 'ধৈর্য ধরো, ধৈর্য ধরো, বাঁধো বাঁধো বুক।' **সহনশীলতাই টিকিয়া থাকিবার উপায় ॥** বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক ডারউইনের

বিবর্তনবাদ বা অভিব্যক্তিবাদের সারকথাই হইল সহনশীলতা। এই সহনশীলতার সাহায্যে যে প্রাণী পারিপার্শ্বিকের সহিত অভিযোজন করিতে পারিয়াছে, কেবলমাত্র তাহারাই পৃথিবীতে টিকিয়া থাকিতে পারিয়াছে। অবশিষ্টই ধরাপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। **সহিষ্ণুতার শক্তি ॥** সহিষ্ণুতা জীব-জগতের দুর্জয় অস্ত্র। ইহা শরীরকে করে ঘাতসহ, আত্মাকে করে মহাশক্তিধর। **সহনশীলতা ও জীবন-সংগ্রাম ॥** জীবনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়, সংগ্রামময়। সহনশীলতা সেই সংগ্রাম-জয়ের মহাস্ত্র। **সহনশীলতার জয় ॥** পৃথিবীতে বুদ্ধ, যীশু খ্রীস্ট, মহম্মদ, শ্রীচৈতন্য দুঃখের বারিধি উত্তীর্ণ হইয়া মানুষের জন্য অমৃতের সন্ধান করিয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত সহনশীলতারই জয় হইয়াছে। **উপসংহার ॥** মহাত্মা গান্ধীর অহিংস সংগ্রাম জাতিকে সেই শক্তির সন্ধান দিয়াছে। সমগ্র পৃথিবী সেই শক্তিতে আজ বিশ্বাস অর্জন করিয়াছে ॥

● সহিষ্ণুতা বা সহনশীলতা

৩৬.

এ জগতে হায় সেই বেশী চায় আছে যার ভূরি ভূরি

সূচনা ॥ মানুষের ঐশ্বর্যের আকাঙ্ক্ষা অন্তহীন। যাহার যত আছে, সে তত চায়। কাজেই, নিজের ঘর ঐশ্বর্যে ভরিয়া তুলিতে তাহাকে অপরের ঐশ্বর্যে হাত দিতে হয়। কিন্তু শক্তিমানের ঐশ্বর্যে হাত দিবার শক্তি তাহার নাই। তাই ঐশ্বর্যবানেরা গরীবের সম্পদ বলপূর্বক অপহরণ করিয়া নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধি করে। **ধনিকের ধনবৃদ্ধির উপায় ॥** স্নেহময়ী মাতা ধরিত্রী তাঁহার সন্তানের আগমনের পূর্বেই তাহার খাদ্য-বস্ত্র-বাসভূমির আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সন্তানদের মধ্যে যাহারা শক্তিমান্ ও বুদ্ধিমান্, তাহারা অপরের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া তাহাদের ক্ষুধার মুখে ঠেলিয়া দিয়াছে এবং অপর পক্ষে নিজেদের ঐশ্বর্যের ইমারত গড়িয়া তুলিয়াছে। **দরিদ্রের দারিদ্র্যের কারণ ॥** আজ কে জবাব দিবে, পৃথিবীর বিশাল জনসমষ্টি অভুক্ত কেন ? তাহাদের মুখের গ্রাস কে কাড়িয়া লইয়াছে ? তাহাদের ঘরের সম্পদের খোঁজে ধনিকের অট্টালিকায় প্রবেশ করিতে হইবে। দরিদ্রের সম্পদেই ধনিকের গগনচুম্বী অট্টালিকা ভরিয়া উঠে। **ধন-বৈষম্যের চিত্র ॥** আজ তাই সমাজের এক শ্রেণীর মানুষ প্রাচুর্যে ও বিলাসিতায় ভোগসর্বস্ব পশুতে পরিণত হইয়াছে, অন্য এক শ্রেণী দারিদ্র্যে ও হতাশায় পরিণত হইয়াছে বুভুক্ষা-কাতর আহারান্বেষী জানোয়ারে। **লোভ-সর্বস্বতা ॥** ইহার মূলে রহিয়াছে মানুষের লোভ-সর্বস্বতা। সেই লোভের তাড়নায় 'রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।'

উপসংহার ॥ কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, মানুষ এই পৃথিবীতে বাঁচিবার জন্য আসিয়াছে। 'অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।' সর্বহারাদের কবিও তাই ঘোষণা করেন: 'প্রার্থনা করো, যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস। যেন লেখা থাকে আমার রক্তলেখায় তাদের সর্বনাশ ॥'

'রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি'

৩৭.

ভারতের কৃষি ও কৃষক

সূচনা ॥ স্বার্থান্ধ ইংরেজ-জাতি ভারতের কৃষিকে কামধেনুর মত দোহন করিয়া তাহাকে সর্বস্বান্ত অবস্থায় ফেলিয়া গিয়াছে। ভারতের কৃষিলক্ষ্মী একদিন ক্ষুধার্ত বিশ্বের ক্ষুধাহরণের ব্রত গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু অন্নপূর্ণার দেশে আসিল অন্নাভাব। **কৃষির বিপর্যয়ের কারণ ॥** ভারতের কৃষির সমস্যা মূলতঃ ত্রিবিধ: ভূমি-সমস্যা, কৃষি-সমস্যা ও কৃষক-সমাজের সমস্যা। ভারতের কৃষকদের নিজেদের জমি নাই। তাহারা অন্যের জমিতে চাষ করে। কাজেই, যাহারা জমির মালিক, জমির সহিত তাহাদের সম্পর্ক কেবল অর্থগত। এদিকে, জমির খণ্ড-বিখণ্ডতায় এবং সেচ ও সারের অভাবে উন্নত কৃষি-পদ্ধতির প্রচলন সম্ভব হয় নাই। তাহার উপর দরিদ্র কৃষক-সমাজের হাতে এদেশের কৃষির ভার ছাড়িয়া দিয়া সরকার এতদিন দেশে সমৃদ্ধির স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। কিন্তু জমি কৃষকদের হাতে না আসিলে এবং কৃষকদের দারিদ্র্য দূর না হইলে সেই স্বপ্ন নিষ্ফল হইতে বাধ্য। **প্রতিকার ॥** কৃষির উন্নতির জন্যে অবিলম্বে মাটিতেই হাত লাগাইতে হইবে। বিশদফা কর্মসূচীতে কৃষকদের হাতে জমি তুলিয়া দিয়া উন্নত কৃষি-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইতেছে। **বর্তমান অবস্থা ॥** সম্প্রতি উচ্চ-ফলনশীল বীজের সাহায্যে এবং ব্যাঙ্ক ও সমবায়ের ঋণ-বর্ষণের পরিণামে কৃষির ফলন-বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। তাহার উপর কৃষিপণ্যের মূল্যানুকূল্যের ফলে কৃষিপণ্যের মূল্যবৃদ্ধিও ঘটিয়াছে। কিন্তু তাহার সুফল পাইয়াছে কাহারা? যাহারা জমির মালিক, কেবল তাহারাই লাভবান্ হইয়াছে। **উপসংহার ॥** আর, ভারতের সেই চিরাচরিত দরিদ্র কৃষক-সম্প্রদায়, যাহারা অবর্ণনীয় দারিদ্র্যের মধ্যে কায়ক্লেশে বাঁচিয়া রোদে পুড়িয়া, জলে ভিজিয়া ফসল ফলায়, তাহারা 'যেই তিমিরে সেই তিমিরে'। বিশদফা কর্মসূচী তাহাদের সম্মুখে আশার আলো তুলিয়া ধরিয়াছে ॥

পশ্চিমবাংলার কৃষি ও কৃষক

৩৮.

ভারতের খাদ্য-সংকট

সূচনা ॥ যে দেশ একদা অন্নপূর্ণার মতো সারা পৃথিবীর ক্ষুধাহরণের ব্রত গ্রহণ করিয়াছিল, আজ সেই ভারতবর্ষ ক্ষুধার তাড়নায় অন্যের দুয়ারে ভিক্ষুক। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! **ভারতে খাদ্য-সমস্যার মূলগত রূপ ॥** মানুষের সুস্থ প্রাণ-ধারণের জন্য যে পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করা উচিত, ভারতের মানুষ প্রায়ই তাহার কম পায়। কাজেই, এমনিতেই এদেশের বহু লোক অভুক্ত থাকে। যাহারা ভুক্ত, তাহারা প্রকৃতপক্ষে অর্ধভুক্তই থাকে। **ঐতিহাসিক পটভূমি ॥** বিদেশীর চক্রান্তে খাদ্যশস্যে সমৃদ্ধ ব্রহ্মদেশ, সিংহল [শ্রীলঙ্কা], পূর্ববঙ্গ [বাংলাদেশ] এবং সিন্ধু-উপত্যকা ভারতের অঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভারতে খাদ্য-সংকট ডাকিয়া আনে। **সমাধান ॥** ভারতের খাদ্য-সংকটের চারটি দিগন্ত: কৃষি, শিল্প, পরিবহণ ও জনগণ। এই চার দিগন্তের সমাধানে সংকটের প্রকৃত সমাধান আছে। **কৃষি ॥** ভারতের কৃষি এখনও দৈবাধীন। অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টিজনিত শস্যহানি বার্ষিক ঘটনা। সেচ এবং সার প্রয়োগের দ্বারা উচ্চফলনশীল বীজকে সফল করিয়া তুলিতে পারিলে সোনা ফলিবে। কিন্তু সর্বাগ্রে কৃষককে জমি দিতে হইবে। **শিল্প ॥** শিল্প কৃষি-উৎপাদনবৃদ্ধির যন্ত্রপাতি ও সার ইত্যাদি দিয়া কৃষিকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে পারে। তাছাড়া, শিল্পজাত সামগ্রী বিদেশে রপ্তানি করিয়া বিদেশ হইতে খাদ্য-সংগ্রহও করা যায়। **পরিবহণ ॥** সারা দেশে খাদ্য-চলাচল অব্যাহত রাখার জন্য পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতি প্রয়োজন। **জনগণ ॥** খাদ্য-সংকটের মোকাবিলার জন্য জনগণকে বিকল্প খাদ্য-গ্রহণে প্রস্তুত থাকিতে হইবে এবং জনসংখ্যাবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। **বণ্টন-ব্যবস্থা ॥** ভারতে খাদ্য-সংকট যতটা প্রকৃতির সৃষ্ট, তাহার বেশী মনুষ্য-সৃষ্ট। উৎপন্ন খাদ্যের সবটা বাজারে আসে না; তাহার বিশাল অংশ মজুতদার ও চোরাকারবারীদের অন্ধকার গহ্বরে চলিয়া যায়। ভারতের এই কুখ্যাত বণ্টন-ব্যবস্থার পূর্ণ রাষ্ট্রীয়করণ প্রয়োজন। **উপসংহার ॥** সকলের সদিচ্ছা ও সমবেত চেষ্টায় দূর হইবে ভারতের দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা, বুভুক্ষার হাত হইতে চিরমুক্তি ঘটিবে ভারতের ॥

- আমাদের খাদ্য-সমস্যা ও তাহার সমাধানের উপায়
- দুর্ভিক্ষ ও তাহার প্রতিরোধ

৩৯.

ভারতের খরা ও বন্যা-নিয়ন্ত্রণ

সূচনা ॥ অতিবৃষ্টি এবং অনাবৃষ্টি ভারতে প্রায় বার্ষিক ঘটনা। ফলে, কৃষি-বিপর্যয়জনিত শস্যহানি প্রায় তাহার প্রতিবছরেরই ভাগ্যলিপি। অথচ বন্যাস্ফীত নদীর জলধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া তৃষ্ণার্ত শস্য-প্রান্তরে পৌঁছাইয়া দিতে পারিলে খরা এবং বন্যাকে একই সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। **প্রাচীন ভারতের সেচ-ব্যবস্থা ॥**

প্রাচীন ভারতেরও একটা নিজস্ব সেচ-ব্যবস্থা ছিল। বিশালাকার জলাশয়, কূপ, দীঘি এবং বহু-শাখাপ্রশাখাযুক্ত খাল ছিল তাহার অঙ্গ। কিন্তু ইংরেজ-আমলে সেগুলি অবহেলায় মজিয়া গেল। **ইংরেজ-আমলে সেচ-ব্যবস্থা॥** ইংরেজ-রাজত্বের শেষার্ধে ভারতের সেচ-ব্যবস্থায় হাত লাগানো হয়। কিন্তু দেশবিভাগের ফলে তাহার অধিকাংশই পড়ে পাকিস্তানের ভাগে। **স্বাধীন ভারতে সেচ-ব্যবস্থা॥** বৃষ্টিহীন মরুভূমি এবং বন্যাবিক্ষুব্ধ নদনদী লইয়া ভারত স্বাধীন হইল। খরা এবং বন্যা জয় করিবার জন্য বহুমুখী নদী-প্রকল্পগুলির হইল যাত্রা-শুরু। ভাকরা-নাঙ্গাল, হীরাকুদ বাঁধ, রাজস্থান খাল, দামোদর উপত্যকা, তুঙ্গভদ্রা, চম্বল, কুশী, গণ্ডক-পরিকল্পনা ইত্যাদি তাহার অন্তর্গত। পশ্চিমবঙ্গে ময়ূরাক্ষী, কংসাবতী ও জলঢাকা-প্রকল্প অন্যতম। যেখানে নদনদীর জল পৌঁছাইতে অসুবিধা, সেখানে নলকূপের সাহায্যে ক্ষুদ্র সেচ-প্রকল্পের রূপায়ণে হাত দেওয়া হইয়াছে। **উপসংহার॥** এইভাবে খরাপ্রবণ ও বন্যাপ্রবণ অঞ্চলকে খরা এবং বন্যার কবল হইতে রক্ষা করিয়া ফসলের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিবার জন্য নূতন প্রয়াস সূচিত হইয়াছে। এই সীমিত প্রয়াসকে আরও সম্প্রসারিত করিয়া দিতে হইবে। এইভাবে ভারতের সুখ-সমৃদ্ধির স্বপ্ন সার্থক হোক, সফল হোক ভারতের মৃত্তিকা এবং তাহার নদীসমূহের পুণ্য জলধারা॥

● খরা ও তাহার প্রতিকার

৪০.

ভারতের সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা

সূচনা॥ প্রাচীন ভারতের সমৃদ্ধির উৎস ছিল তাহার স্বয়ংসিদ্ধ গ্রামগুলি। কিন্তু বিদেশী রাজত্বে তাহার গ্রামগুলিকে ধ্বংস করা হইল। তাহার স্বর্ণপ্রসূ শস্যপ্রান্তর, তাহার কুটির-শিল্প রিক্ত, পরিত্যক্ত হইল। স্বাধীন ভারত বৈষয়িক উন্নতির পথে যাত্রা করিয়া প্রথমেই সেই গ্রাম-ভারতে হাত লাগাইয়াছে। **সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার সূত্রপাত॥** তাহার কর্মোদ্দীপনায় ঘুম ভাঙ্গিতেছে ভারত-আত্মার, ঘুম ভাঙিতেছে অবহেলিত গ্রাম-ভারতের। গ্রাম ভারতের সংগঠনের স্বপ্ন ছিল মহাত্মা গান্ধীর। ১৯৫২ সালের ২রা অক্টোবর, মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিবস হইতেই তাঁহার স্বপ্নের মহাভারত রচনার যাত্রা-শুরু, ভারতের সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার সূচনা। **গঠন-বিন্যাস॥** সমগ্র দেশকে সংগঠন-কার্যসূচীর রূপায়ণের সুবিধার জন্য কেন্দ্র হইতে গ্রাম পর্যন্ত কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছে: কেন্দ্রীয় পর্যায়, রাজ্য-পর্যায়, জেলা-পর্যায়, অঞ্চল-পর্যায় ও গ্রাম-পর্যায়। **কার্যাবলী॥** গ্রামই এই পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দু। সেখানে বাস করিবে অন্ততঃ পাঁচশত লোকের একশতটি পরিবার। সেখানে থাকিবে পানীয় জলের সুব্যবস্থা, সেচ-ব্যবস্থা, গৃহনির্মাণের স্থান, গোচারণ-ভূমি, জ্বালানী কাঠের বন, প্রাথমিক বিদ্যালয়, পাকা রাস্তা, কৃষির ব্যবস্থা এবং কৃষি-মজুর, কুটির-শিল্পী, গৃহনির্মাণ-শিল্পী,

বণিক, পরিবহণ-কর্মী, দোকানদার, শিক্ষক, স্বাস্থ্যরক্ষার কর্মী, নাপিত, মুচি, শান্তিরক্ষা-কর্মী ইত্যাদি বিভিন্ন বৃত্তির পরিবার। অঞ্চল-কেন্দ্রে থাকিবে বাজার, বিদ্যালয়, ছোট চিকিৎসা-কেন্দ্র, কৃষি-কার্যালয়, ডাকঘর, পরিবহণ-কেন্দ্র, প্রমোদ-গৃহ, পশু-চিকিৎসালয় ও আদর্শ গোলাঘর। **অর্থের সংস্থান ॥** অর্থের সরবরাহ আসিবে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের নিকট হইতে ৩ : ১ আনুপাতিক দ্বৈত প্রবাহে। সমবায় হইবে এই সংগ্রামের বড় হাতিয়ার। **উপসংহার ॥** এতদিনে ভারতের সুপ্ত গ্রাম-দেবতা জাগিতেছেন। এতদিন আমরা গ্রাম-দেবতাকে অবজ্ঞা করিয়া যে পাপ করিয়াছি, আজ তাহার প্রায়শ্চিত্ত শুরু হইয়াছে। লুপ্ত-গৌরব গ্রামকে আজ তাহার সমস্ত ফিরাইয়া দিতে হইবে। 'অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু' ॥

গ্রামীণ সমাজের উন্নয়ন

৪১.

সাম্প্রতিক পণ্যমূল্য-বৃদ্ধি ও গণ-জীবন

সূচনা ॥ দ্রব্যমূল্য-বৃদ্ধির চাপে আজ জনগণের প্রায় নাভিশ্বাস উঠিয়াছে। একদিকে আকাশস্পর্শী মূল্যরেখা, অন্যদিকে জনগণের ক্রয়শক্তির সীমাবদ্ধতা। উভয়ের মধ্যে সংগতি-স্থাপনের চেষ্টায় হাতে জমিতেছে ব্যর্থতার কালি। **দ্রব্য-মূল্যবৃদ্ধির কারণ ॥** পরিকল্পিত অর্থনীতির গত পঁচিশ বছরে যোজনার প্রয়োজনে করের বোঝা চাপানো হইয়াছে অত্যধিক। পণ্যের উপর চাপানো কর জনগণের কাঁধেই স্থানান্তরিত হয়। তাহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে মুদ্রাস্ফীতি। সরকার নোট ছাপাইয়া ঘাটতি পূরণ করেন। তাহাতে টাকার মূল্য যায় কমিয়া। এদিকে, কি কৃষিতে, কি শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় নাই। অথচ জনসংখ্যা ক্রমাগত উর্ধ্বমুখী। অর্থাৎ, চাহিদা বাড়িয়াছে, কিন্তু যোগান বাড়ে নাই। অবধারিতভাবে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। **অন্যান্য প্রধান কারণ ॥** ভারতে বছরে দুইবার পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পায় : একবার বাজেট ঘোষণার পূর্ব মুহূর্তে ; আর একবার ফসল বুনিবার মরশুমে। কিন্তু বাজেটে যে হারে কর বসানো হয়, তাহার বহুগুণে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। বাজেট-ঘোষণার মাসাধিককাল আগে হইতেই ভোগ্যপণ্য বাজার হইতে উধাও হইয়া মজুতদারের গোপন কক্ষে আশ্রয় নেয়। তেমনি ফসল বোনার মরশুমে মজুতদার ও চোরাকারবারীরা সক্রিয় হইয়া উঠে। বাজারে পণ্যাভাবের হুজুগ তুলিয়া পণ্যমূল্যকে উর্ধ্বমুখী করিয়া তোলে। এ অবস্থায় পণ্য পাওয়া যায়, কিন্তু আশাতিরিক্ত উচ্চমূল্যে। **উপসংহার ॥** সম্প্রতি জরুরী অবস্থা প্রয়োগ করিয়া সরকার মুদ্রাস্ফীতি ও পণ্যমূল্য-বৃদ্ধিকে প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। মজুতদারি ও চোরা-কারবার বন্ধ করিয়া এবং উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটাইয়া সরকার পণ্যমূল্যকে স্থিতিশীল রাখিতে কৃত-সংকল্প।

পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণ ও ফলাফল

৪২.

স্কুল-ম্যাগাজিন

সূচনা ॥ শিশু-হৃদয় অদম্য প্রাণ-প্রেরণার অফুরন্ত নির্ঝর। তাহাদের বুকের মধ্যে মাথা কুটিয়া মরিতেছে কত রবীন্দ্রনাথ, কত নজরুল, কত সুকান্ত। তাহাকে প্রকাশের সুযোগ দিলে 'ধন্য রাজার পুণ্য দেশ।' **প্রকাশের সুযোগ ॥** স্কুল-ম্যাগাজিনেই ছাত্রদের নিজস্ব রচনার হাতে-খড়ি। এখানেই তাহাদের হৃদয়ের দ্বার প্রথম উন্মুক্ত হয়, এখানেই স্বপ্নভঙ্গ হয় সুপ্তিমগ্ন নির্ঝরের। **রচনার বিচিত্রতা ॥** কিশোর-হৃদয় প্রকাশ-ব্যাকুলতায় থাকে উন্মুখ। এই সময় তাহাদের হৃদয়কে সুন্দরতার দিকে অনুপ্রাণিত করিলে তাহাদের জীবনে সোনা ফলিতে পারে। কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, ব্যঙ্গ-কবিতা, ধাঁধা, ছবি, কার্টুন—নানাভাবে তাহারা আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজিয়া পাইবে। **সংগঠনী ও সৃজনী-প্রতিভার বিকাশ ॥** স্কুল-ম্যাগাজিন ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত, সম্পাদিত ও প্রকাশিত হওয়া উচিত। দুই-একজন উৎসাহী শিক্ষক-উপদেষ্টা থাকিলে কাজটি সুশৃঙ্খল হয়। পাক্ষিক বা মাসিক হাতে-লেখা দেওয়াল-পত্রিকা বাহির করিয়া মুদ্রিত আকারে বার্ষিক পত্রিকা বাহির করা ভালো। **বিরুদ্ধ সমালোচনা ॥** অনেকে ইহাকে ছাত্রদের পাকামি মনে করেন। **উপসংহার ॥** কিন্তু ইহা যে শিশু-প্রতিভার প্রস্তুতির আখড়া, ভাবীকালের শিল্পী-সাহিত্যিকের বৈঠকখানা, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

● স্কুল-পত্রিকা
৫ স্কুলের বার্ষিক পত্রিক

৪৩.

পল্লী-সংগঠনে ছাত্র-সমাজের দায়িত্ব

সূচনা ॥ ছাত্ররা সমাজের একটি বলিষ্ঠ অংশ, সর্বাপেক্ষা সজীব অংশ। তাহারা সুসংগঠিত হইয়া অসাধ্য সাধন করিতে পারে। **গঠনমূলক কাজে ছাত্র-সমাজ ॥** কিন্তু এই হতভাগ্য দেশে ছাত্র-সমাজকে মহৎ কর্মে উদ্বুদ্ধ না করার ফলে দেশের এই তরুণ গরুড়ের দল নানা ধ্বংসমূলক কাজে মাতিয়া উঠে। **পল্লী-সংগঠনে ছাত্র-সমাজ ॥** ছাত্র-সমাজকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য রাষ্ট্রকে শিক্ষাখাতে প্রচুর ব্যয় বহন করিতে হয়। বিনিময়ে ছাত্র-সমাজের নিকট হইতে রাষ্ট্র কিছু আশা করে। ভারতের পল্লী-সমাজ উপেক্ষিত। ছাত্রদের গ্রামে গিয়া পল্লী-সংগঠনে আত্মনিয়োগ করা উচিত। পথঘাট-নির্মাণ ও সংস্কার, জলাশয় ও জলনিকাশন-পদ্ধতির সংস্কার,

অস্বাস্থ্যকর জলাভূমি ও ডোবা ইত্যাদির বিলোপসাধন, নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া এবং বয়স্ক-শিক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদির মধ্য দিয়া ছাত্রদের সাহায্যে পল্লী-সংগঠন সম্ভব। **উপসংহার ॥** বয়স্ক শিক্ষার মাধ্যমে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান ও কৃষি-বিজ্ঞানে শিক্ষালাভ করিয়া আমাদের সুস্থ ও সচ্ছল পল্লী-সমাজ ছাত্র-সমাজকে আশীর্বাদ করিবে ॥

- 'গ্রামে ফিরিয়া যাও'
- পল্লী-সমাজ উন্নয়নে ছাত্র-সমাজের কর্তব্য

৪৪.

সমস্যা-জর্জর পশ্চিমবঙ্গ

সূচনা ॥ পশ্চিমবঙ্গই ভারতের সর্বাপেক্ষা সমস্যা-জর্জর রাজ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতে তাহার দুর্ভাগ্যের সূচনা। **দেশবিভাগ ও তাহার প্রতিক্রিয়া ॥** সর্বাপেক্ষা যে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা তাহাকে মর্মান্তিক আঘাত করিয়াছে, তাহা দেশ-বিভাগ। পূর্ববঙ্গ হইতে লক্ষ-লক্ষ মানুষ এপারে চলিয়া আসিল, তাহাদের খাদ্যভাণ্ডার পড়িয়া রহিল পশ্চাতে। ভাগীরথীতীরের চটকলগুলি কর্মহীন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহাদের কাঁচামালও পড়িয়া রহিল ওপারে। **বর্তমান সমস্যার রূপ ॥** পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-উন্নয়ন ব্যর্থ, শিল্প-উন্নয়ন মন্থর। গত আঠারো বছরের মধ্যে এগারো বছরেই এরাজ্যে খরা কিংবা বন্যার উপস্থিতি—অর্থাৎ প্রকৃতিও বিমুখ। জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান—বর্তমানে প্রায় সাড়ে চারকোটি। তাহার বিরাট অংশ বহিরাগত। বেকার-সমস্যা ভয়াবহ। সর্বত্র হতাশা। পরিণামে আইন ও শৃঙ্খলার অবনতি। রাজনৈতিক অস্থিরতা। পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নে কেন্দ্রেরও বিমাতৃসুলভ মনোভাব। **উন্নয়ন প্রয়াস ॥** দুর্গাপুর, হলদিয়া, ফরাক্কা, শিলিগুড়ি ও সাঁওতালডিহিতে উন্নয়নের স্বাক্ষর পড়িয়াছে। কিন্তু গতি অতি মন্থর। **উপসংহার ॥** শুধু মুখের কথাই নয়, কালবিলম্ব না করিয়া অবিলম্বে কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারের পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নে আন্তরিকভাবে হাত লাগানো দরকার। কারণ 'আজ যদি পশ্চিমবঙ্গ ধ্বংস হয়, আগামীকাল ধ্বংস হইবে সমগ্র ভারত ॥'

- পশ্চিমবঙ্গের নানামুখী সমস্যা
- পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের উপায়

৪৫.

কৃষিকার্যে বিজ্ঞান

সূচনা ॥ একদা কৃষি ছিল দৈব-নির্ভর; কৃষিকে বলা হইত কৃষি-লক্ষ্মী। আজ বিজ্ঞান আসিয়া কৃষির দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছে। সেদিন জনসংখ্যা ছিল সীমিত। কৃষি তাহার মুখে খাদ্য যোগাইতে অসমর্থ ছিল না। কিন্তু বর্তমান বিশ্বের জনসংখ্যা

ক্রমবর্ধমান। তাহার মুখে খাদ্য যোগাইবার জন্য বিজ্ঞানের হাতে কৃষিকে তুলিয়া না দিয়া উপায় নাই। **কৃষি-বিজ্ঞান ॥** এই কারণে কৃষি আজ আর মান্ধাতার আমলের চাষবাস মাত্র নাই। উহা আজ কৃষি-বিজ্ঞানে পরিণত। **আবিষ্কার ॥** রসায়ন এবং উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানের নূতন নূতন আবিষ্কার কৃষিকে আজ কৃষি-বিজ্ঞানে উন্নীত করিয়াছে। **কৃষি-বিজ্ঞানে উন্নত দেশ ॥** বিশ্বের কর্ষণযোগ্য সীমিত জমিতে ক্ষুধার্ত মানব-জাতির ক্ষুধা মিটাইবার জন্য বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে উন্নতি না করিয়া উপায় নাই। সীমিত জমির দেশ জাপান সেই উপায়ে তাহার অন্ন-সমস্যার সমাধান করিয়াছে। বর্তমানে আমেরিকা, সোভিয়েট রাশিয়া, ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড এবং য়ুরোপের অন্যান্য দেশগুলি কৃষি-বিজ্ঞানে বিস্ময়কর উন্নতি লাভ করিয়াছে। **ভারত ॥** ভারতও তাহার বিশাল জনসংখ্যার মুখে অন্ন যোগাইবার জন্য সেই পথে যাত্রা করিয়াছে। **উপসংহার ॥** উন্নত কৃষি-যন্ত্রপাতি, জলসেচ, উন্নত সার-প্রয়োগ ও শস্যের চিকিৎসা —এই সব কৃষি-বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয় বিষয়। বিজ্ঞানই আজ ভারতের সবুজ-বিপ্লবের সার্থক কারিগর ॥

- কৃষি-বিজ্ঞান
- ভারতে সবুজ-বিপ্লব

৪৬.

একটি রেল-স্টেশন

সূচনা ॥ সারা ভারতময় রেলপথের যে বিশাল জাল বিস্তৃত, আমাদের রেল-স্টেশন ফুলিয়া যত ছোট স্টেশনই হউক না কেন, উহার অঙ্গীভূত। **বর্ণনা ॥** গ্রামের সঙ্গে স্টেশনের যোগসূত্র বড় রাস্তা। উঁচু রেললাইন, পাশে টেলিগ্রাফের থাম একরাশ তার গলায় জড়াইয়া সারাদিনরাত যেন সেতার বাজায়। দুই পাশে প্লাটফর্ম, লালরঙের স্টেশন-ঘর, যাত্রীদের বিশ্রাম-কক্ষ, একটি অধিসেতু বা ওভারব্রিজ, তাহার একপাশে টিকিট-ঘর, স্টেশন-মাস্টারের অফিস ইত্যাদি। অন্যপাশে চায়ের স্টল। স্টেশনের উভয় প্রান্তে সিগন্যাল—লাল নীল আলোর সংকেত। **কর্ম-ব্যস্ততার রূপ ॥** রাত্রির অন্ধকার অপসৃত হইবার পূর্ব হইতেই যাত্রী-ট্রেন এবং মাল-গাড়ির যাতায়াত শুরু হইয়া যায়। পূর্বে সবই ছিল কয়লার ইঞ্জিন। এখন মালগাড়ি ছাড়া সব ট্রেনই ইলেকট্রিক-বাহিত। বেলা নয়টা-দশটার দিকে ট্রেনের যাতায়াত বাড়ে। আবার, বিকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত অনেকগুলি ট্রেন যাতায়াত করে। মধ্যরাত্রিতে স্টেশন নির্জন হইয়া নিঃসাড়ে ঘুমাইয়া পড়ে। **উপসংহার ॥** কত লোক যায়, কত লোক আসে। আমাদের রেল-স্টেশন শহর ও গ্রামের মধ্যে যাতায়াতের যেন একটি সেতু। এক্স্প্রেস গাড়িগুলি দূরের মানুষ—একটুও থামে না, উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যায়। লোক্যাল ট্রেনগুলি যেন অনেকটা ঘরের মানুষ। আমাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গে জড়িত ॥

- নিকটবর্তী রেল-স্টেশন
- একটি রেল-স্টেশনের বর্ণনা

৪৭.

তোমার একটি রেল-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা

সূচনা ॥ রেলগাড়ি হইল এই গতি-সর্বস্ব যুগের গতির প্রতীক। শৈশব হইতে রেলগাড়িতে চড়িয়া কোথাও যাইবার কল্পনা মনের মধ্যে অত্যন্ত প্রবলভাবে মাথা কুটিত। **সুযোগ ॥** সেবার গরমের ছুটি পড়িতেই বাবা আমাদিগকে রেলে করিয়া মামার বাড়ি লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। প্রস্তাব শুনিয়া আমাদের হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল। আনন্দের উত্তেজনায় রাত্রির নিদ্রা তিরোহিত হইল। **যাত্রা ॥** সেদিন ভোরবেলা ভালো পোশাক-পরিচ্ছদ পরিয়া আমরা সাইকেল-রিক্শায় চড়িয়া স্টেশনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। আলোয় উদ্ভাসিত স্টেশন আমার নিকট অজানার দূত বলিয়া বোধ হইতেছিল। বাবা খবর লইয়া জানিলেন, ট্রেন আসিতে 'লেট' হইবে। বড় রাগ হইল :—ট্রেন এত লেট্ করে কেন? যাহা হউক, ট্রেন আসিল। কত ভয় ছিল, ঠিকমতো উঠিতে পারিব কিনা। কিন্তু আমরা সহজেই উঠিয়া আসন সংগ্রহ করিয়া বসিয়া পড়িলাম। ট্রেন বাঁশি বাজাইয়া চলিতে শুরু করিল। কেমন সুন্দরভাবে দুলিতে দুলিতে, শব্দ করিতে করিতে ট্রেন ছুটিয়া চলিল। দুই ধারের গাছপালা, টেলিগ্রাফের থাম এবং লোকজন ও স্টেশন-ঘরগুলি বিপরীতমুখে ছুটিয়া যাইতেছিল। **উপসংহার ॥** ফেরিওয়ালাদের বিচিত্র বক্তৃতা আর ভিখারীদের গান ভুলিতে পারি না ॥

রেল-ভ্রমণ

৪৮.

একটি ফুটবল-খেলার বর্ণনা

সূচনা ॥ ফুটবল খেলার মতো উত্তেজনাপূর্ণ এবং রোমাঞ্চকর খেলা আর নাই। ইহার প্রতিটি মুহূর্তে আনন্দ ও রোমাঞ্চ। **প্রতিদ্বন্দ্বিতা ॥** রামনগর স্কুলের সঙ্গে আমাদের স্কুলের ফুটবল ম্যাচ্ একটি বার্ষিক অনুষ্ঠান। প্রতি বৎসর এই ম্যাচ্কে কেন্দ্র করিয়া আমাদের কত উৎসাহ, কত উত্তেজনা। **পূর্বসূত্র ॥** গত বৎসর রামনগর স্কুলের নিকট আমরা পাঁচ গোলে পরাজিত হইয়াছিলাম। এ বছর তাহার সমুচিত জবাব দিবার জন্য আমাদের খেলোয়াড়েরা প্রস্তুত। **যাত্রা ॥** একখানা লরীতে খেলোয়াড় এবং অন্যান্য ছাত্ররা। বাসে কয়েকজন শিক্ষক মহাশয় ও বহু ছাত্র। **মাঠের বর্ণনা ॥** এই ফুটবল ম্যাচ্কে কেন্দ্র করিয়া স্থানীয় অঞ্চলে খুব উত্তেজনা দেখা দেয়। মাঠ ছিল লোকে লোকারণ্য। চারদিকে বেঞ্চ পাতা; দাঁড়াইয়াও খেলা দেখিবার সুব্যবস্থা। **আমন্ত্রিত দলের আপ্যায়ন ॥** স্কুলের সেক্রেটারী, প্রধান শিক্ষক, অন্যান্য শিক্ষক মহাশয়গণ এবং ছাত্র-বন্ধুরা আপ্যায়ন করিল। **জার্সির বর্ণনা ॥** রামনগরের লাল-সাদা, আমাদের কালো-হলুদ। **খেলার বর্ণনা ॥**

রেফারির হুইস্‌ল্—খেলার আরম্ভ। প্রথম পাঁচ মিনিটের মাথায় আমাদের দল গোল দিল। তারপর রামনগর স্কুল পর পর দুইটি গোল দেয়। হাফ্-টাইম। পরে আমাদের স্কুল দুইটি গোল দিয়া এক গোলে জয়লাভ করিল। খেলার শেষে কাপ বিতরণ ও জলযোগ। **উপসংহার॥** বিজয়-উল্লাসে সারাপথ সচকিত করিয়া আমরা ফিরিয়া আসিলাম॥

● তোমার দেখা একটি ফুটবল ম্যাচ্
● খেলার মাঠে একদিন

৪৯.

তোমার ভালো-লাগা একটি চলচ্চিত্র

সূচনা॥ চলচ্চিত্র একটি নবাগত শিল্পকর্ম। ছবিই ইহার মাধ্যম। ছবিই ইহার ভাষা। **একটি ছবির খুঁটিনাটি॥** বিশ্বের অন্যতম প্রখ্যাত পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' ছবিটি আমার মনোহরণ করিয়াছে। এরূপ অনবদ্য ছবি কদাচিৎ দেখা যায়। কাহিনী—বাংলার বিখ্যাত সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। **ভালো-লাগার কারণ॥** একটি দরিদ্র গ্রাম্য পরিবারের গ্রামত্যাগের কাহিনী অপূর্বভাবে চিত্রিত। গ্রামের সহজ-সরল জীবনের মধ্যে অপু ও দুর্গার অনাবিল সারল্য এবং অজানাকে জানিবার শিশুসুলভ কৌতূহল। ইন্দির ঠাকরুণের বার বার গৃহত্যাগ ও প্রত্যাবর্তন, সর্বজয়ার গৃহিণীপনা, হরিহরের বাউণ্ডুলে জীবন ও টিকিয়া থাকিবার জন্য জীবন-সংগ্রাম এবং শেষ পর্যন্ত গ্রামত্যাগ—সমস্ত মিলিয়া ছবিখানি এক অপরূপ তাৎপর্যে মণ্ডিত। ইন্দির ঠাকরুণ ও দুর্গার মৃত্যু এবং হরিহরের নিকট সর্বজয়া কর্তৃক দুর্গার মৃত্যু-সংবাদ জ্ঞাপনের দৃশ্যগুলি শিল্পের চরম শিখরে উন্নীত। **উপসংহার॥** দেখিতে দেখিতে মনে হয়, যেন দৃশ্যগুলি নিজস্ব ভাষায় কথা বলিয়া উঠিয়াছে। আর, যাহারা ইহাতে অভিনয় করিয়াছে, তাহারা যেন অভিনয় করে নাই; চরিত্রগুলিকে এমনই স্বাভাবিক ও জীবন্ত মনে হইয়াছে। তাহা ছাড়া, বিশ্ববিখ্যাত সেতার-শিল্পী রবিশংকরের সুরারোপে ছবিখানি অপরূপ সুষমায় মণ্ডিত॥

● তোমার একটি উৎকৃষ্ট চলচ্চিত্র দেখার অভিজ্ঞতা

৫০.

ভারতীয় জীবনে রামায়ণের প্রভাব

সূচনা॥ রামায়ণ ভারতীয় জীবনের কল্পবৃক্ষ। পরিবার, সমাজ ও রাজ্য-গঠনে রামায়ণের সর্বতোমুখী প্রভাব। **জীবন-গঠনে রামায়ণ॥** রামায়ণের শিক্ষা হলো ত্যাগের শিক্ষা. বৈরাগ্যের শিক্ষা। যুগ যুগ ধরে ভারতবাসীকে রামায়ণ সেই শিক্ষাই

দিয়ে এসেছে। **ন্যায় ও সত্যের শিক্ষা॥** ন্যায়ের জয়, অন্যায়ের [illegible] সত্যের প্রতিষ্ঠা, অসত্যের বিলুপ্তি—রামায়ণের রাম-রাবণের যুদ্ধ ও তার পরি[illegible] দিয়ে এই আদর্শই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভারতবাসী ন্যায় ও সত্যের অনুশীলন [illegible] থেকেই দীক্ষা নিয়েছে। **পরিবার-গঠনে রামায়ণ॥** রামায়ণ তো আমাদের পরিবারের কথা বিশাল-আকারে পরিবেশন করেছে। আমাদের পরিবার একান্নবর্তী পরিবার। পিতামাতা, ভ্রাতাভগ্নী, স্বামী-স্ত্রী, দাসদাসী—এই সব নিয়েই আমাদের পরিবার। প্রত্যেকের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ও আচরণের কথা রামায়ণে বর্ণিত। রামায়ণে আমরা পাই আদর্শ পিতামাতা, আদর্শ ভ্রাতা-ভগ্নী, আদর্শ স্বামী-স্ত্রী এবং আদর্শ দাসদাসী। ভারতবাসী যুগ যুগ ধরে সে রকম হয়ে ওঠার জন্যে চেষ্টা করে এসেছে। **সমাজ-গঠনে রামায়ণ॥** আদর্শ পরিবারই আদর্শ সমাজের মূল ভিত্তি। আদর্শ শিক্ষাগুরু, ধর্মগুরু, কাব্যগুরু, বন্ধুবান্ধব—এ সব আমরা রামায়ণে পাই। রামায়ণ শুধু সামাজিক সম্পর্কই নয়, সামাজিক প্রীতি ও ভক্তি শিক্ষা দিয়ে সুন্দর সমাজ-গঠনের সহায়তা করেছে। **রাজ্য-গঠনে রামায়ণ॥** মহাকবি বাল্মীকি যে প্রজাবৎসল রামচন্দ্রকে সৃষ্টি করে গেছেন, তাঁর মতো প্রজাবৎসল রাজাকেই ভারত চিরকাল কামনা করে এসেছে। ভারতীয় রাজা তাই চিরকাল রামচন্দ্রের মতো প্রজাবৎসল হবার জন্যে চেষ্টা করেছেন। **রামায়ণে জীবন-দর্শন॥** জীবনে দুঃখ-কষ্টের প্রয়োজন আছে। রামচন্দ্র 'সুখী রাজপুত্র' ছিলেন না। তাঁকে জটাবল্কল পরে চোদ্দ বছর বনবাসে কাটাতে হয়েছে। দুঃখকে মেনে নিয়ে, তাকে জয় করে রামচন্দ্র 'রামচন্দ্র' হয়ে উঠেছেন। তাছাড়া, 'রাম' মানে তো সুন্দর আর 'রামায়ণ' মানে সুন্দর করে তোলা। রামায়ণ ভারতবাসীর দুঃখ-জয়ের, মৃত্যু-জয়ের বেদগ্রন্থ। **উপসংহার॥** আদর্শ জীবন, আদর্শ পরিবার, আদর্শ সমাজ, আদর্শ রাজ্য-গঠনে যা যা প্রয়োজন, যুগ যুগ ধরে রামায়ণ ভারতবাসীকে তাই দিয়ে এসেছে॥

- রামায়ণের শিক্ষা
- রামায়ণ ও ভারতীয় সমাজ

৫১.

গৃহসজ্জা

সূচনা॥ মানুষের চরিত্রের ওপর তার বাসগৃহের প্রভাব অনস্বীকার্য। **গৃহসজ্জার উপকারিতা॥** সুসজ্জিত গৃহ মানুষের মনকে সুস্থ ও প্রফুল্ল রাখে। গৃহসজ্জা মানুষের রুচির পরিচায়ক। গৃহসজ্জা সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতীক। **মানুষের গৃহসজ্জার ইতিহাস॥** গুহাবাসী মানবও গুহা-প্রাচীর চিত্রিত ও অলংকৃত করতো। তারপর যুগে যুগে মানুষ ছবি ও মূর্তি দিয়ে নানাভাবে তার বাসগৃহকে সুসজ্জিত ও অলংকৃত করে এসেছে। **গৃহসজ্জার বিভিন্নতা॥** মানুষ তরুতলে বাস করলেও সে সেই তরুতলটিকেও সুসজ্জিত করে। কারণ, তার সৌন্দর্য-প্রিয়তা। অট্টালিকাই

হোক বা পর্ণকুটিরই হোক, মানুষ তাকে নিজের মতো করে সাজিয়ে নেয়। **বাঙালীর গৃহসজ্জা ॥** বাংলার নির্মিত কুটিরেরও একটি অনবদ্য সৌন্দর্য আছে। মাটির দেয়ালের গায়ে বিচিত্র অলংকরণ। বর্তমান কালে ছিমছাম বাসগৃহই সৌন্দর্যের প্রতীক্। ঘরে হালকা পর্দা, একটি ফুলদানি, ফুলদানিতে কয়েকটি ফুল এবং একখানা রবীন্দ্রনাথের ছবি যে-কোন বাঙালী গৃহস্থের কাম্য। **উপসংহার ॥** গৃহসজ্জার গুরুত্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। গৃহসজ্জা আজ পঠন-পাঠনের বিষয়। গৃহসজ্জা আজ কোন কোন দেশে ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে॥

● মানুষের মনের উপর বাসগৃহের প্রভাব

৫২.

নগর-সজ্জা

সূচনা ॥ নগর-সজ্জা মানুষের উন্নত রুচি, সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচায়ক। **উপযোগিতা ॥** শহরের সুন্দর পথঘাট, পথের দুধারের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য মানুষের মনকে প্রফুল্ল ও পবিত্র করে। মানুষের ব্যক্তি-জীবনেই শুধু নয়, তার সামাজিক ও জাতীয় জীবনেও তার প্রতিফলন ঘটে। **নগর-সজ্জার ইতিহাস ॥** যুগে যুগে মানুষ যে সব শহরে বাস করেছে, তাকেই সুন্দর করে সাজিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে। গ্রীসের এথেন্স, রোম, ব্যাবিলন নগর-সজ্জার ইতিহাসে কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। **নেপোলিয়নের নগর-সজ্জা ॥** দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়ন সারা য়ুরোপ থেকে সৌন্দর্যের উপকরণ সংগ্রহ করে এনে প্যারিস ও ভার্সাই নগরীকে সাজিয়েছিলেন। **ভারতের নগর-সজ্জা ॥** ভারতের মোগল-সম্রাটেরা বিশেষত আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাজাহান আগ্রা ও ফতেপুরসিক্রিকে যে-ভাবে সাজিয়েছিলেন, তা আজও বিশ্বের সম্ভ্রম উদ্রেক করে। **ভারতের বর্তমান নগর-সজ্জা ॥** জাতীয় সরকার ভারতের বিভিন্ন নগরীর সৌন্দর্য-বৃদ্ধির জন্যে আগ্রহী। পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নতুন দিল্লীকে সাজানো হয়েছে। **কলকাতার সৌন্দর্য-বৃদ্ধি ॥** সম্প্রতি কলকাতা-মহানগরীর সৌন্দর্য-সম্পাদনের জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও সি. এম. ডি. এ. দশ লক্ষ টাকার একটি পরিকল্পনা দ্রুত রূপায়িত করছেন। কলকাতার প্রধান প্রধান রাস্তাগুলির পাশে ও পার্কে-পার্কে ফুলের বাগান সৃষ্টি করা হচ্ছে। সুসজ্জিত বিধান শিশু-উদ্যান নির্মিত হয়েছে। রবীন্দ্র সরোবরের সৌন্দর্য-বৃদ্ধির প্রয়াস সূচিত হয়েছে। **নাগরিকদের কর্তব্য ॥** নগরকে সুন্দর রাখার দায়িত্ব কেবল যে পৌর কর্তৃপক্ষ, ডি. এম. ডি. এ. বা সরকারের, তা নয়; এতে প্রত্যেক নগরবাসীর রয়েছে যৌথ দায়িত্ব। **উপসংহার ॥** সকলের সমবেত প্রয়াসে কলকাতা হয়তো একদিন 'কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে ॥'

● নগরীকে পরিচ্ছন্ন রাখায় নাগরিকদের কর্তব্য

ব্যাকরণ

"আমরা যেমন বিত্যালয়ে ভারতবর্ষের নাম
দিয়া মহম্মদ ঘোরী, বাবর, হুমায়ুনের
ইতিহাস পড়ি, তাহাতে অতি অল্প পরিমাণ
ভারতবর্ষ মিশ্রিত থাকে, তেমনি আমর
বাংলা ব্যাকরণ নাম দিয়া সংস্কৃত ব্যাকর
পড়িয়া থাকি, তাহাতে অতি অল্প পরিমা
বাংলার গন্ধ থাকে মাত্র।" —রবীন্দ্রনা

"বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে যতগুলি উপভাষা প্রচলিত আছে তাহারই তুলনাগত ব্যাকরণই যথার্থ বাংলার বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ।" —রবীন্দ্রনাথ

রচনা বিচিন্তা

ভাষা ও ব্যাকরণ

প্রস্তাবনা

ভাষা জনসমাজের প্রয়োজনেরই সৃষ্টি। সভ্যতার আদিম লগ্নে ভাষাহীন জনগণ তাহাদের দৈনন্দিন জীবনাচরণের প্রয়োজনে পরস্পরের মধ্যে ভাব-বিনিময়ের জন্য কতকগুলি মৌখিক ধ্বনির [Sound] সাহায্য গ্রহণ করে। এই ধ্বনিগুলির সাহায্যে তাহারা তাহাদের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, হর্ষ-ক্রোধ ইত্যাদি মনের ভাবগুলিকে অপরের নিকট প্রকাশ করিত। কিন্তু কল্পনা করা যাক্, কণ্ঠে ভাষা নাই, অথচ মনের মধ্যে ভাব মাথা কুটিয়া মরিতেছে! এই অবস্থাটি বোবাদের অবস্থার সহিত তুলনীয়। কাজেই, কণ্ঠের ধ্বনি হইল নিঃসন্দেহে মানুষের একটি মূল্যবান্ সম্পদ। ধ্বনি-সম্পদ লাভের পূর্বে মানুষ কেবলমাত্র ইশারা-ইঙ্গিত বা সংকেতের দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করিত। ধ্বনি-সম্পদ লাভের পর সে সেই সংকেতকে ধ্বনিতে আরোপ করিল। অর্থাৎ, এক বা একাধিক ধ্বনির সাহায্যে এক-একটি ভাব বা অর্থ সংকেতিত হইতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথের মতে, ভাষায় কেবল এই সংকেতেরই কারবার। আবার, মৌখিক সাংকেতিক ধ্বনি-সমষ্টি হইতেই উত্তরকালে ভাষার উদ্ভব। কাজেই, বাগ্‌যন্ত্রের দ্বারা উচ্চারিত সাংকেতিক ধ্বনি-সমষ্টিই হইল ভাষার আদিমতম রূপ।

আবার, বিশেষ বিশেষ জন-গোষ্ঠী এক-একটি ভাষার স্রষ্টা। বিশেষ ভৌগোলিক পরিবেশে বিশেষ বিশেষ ভাষার উদ্ভব লক্ষণীয়। বিভিন্ন ভৌগোলিক ও সামাজিক প্রতিবেশ ভিন্ন ভিন্ন ভাষাকে লালন করে এবং কালক্রমে সেই ভাষাকে অবলম্বন করিয়া সেই অঞ্চলের সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিকশিত হইয়া উঠে। দেশে দেশে জনগণের কথ্য ভাষাই কালক্রমে সাহিত্যিক ভাষায় রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ, কথ্য ভাষাই সাহিত্যিক ভাষার আদি-জননী। সেইজন্য পৃথিবীতে ভাষার সংখ্যা বহু এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতির সংখ্যাও সেইজন্য অনেক।

কাজেই, মানব-সভ্যতার ন্যায় এক-একটি শব্দও বহু প্রাচীন। এক-একটি শব্দের পিছনে বহু সহস্র বৎসরের ইতিহাস নীরব হইয়া আছে। সেই সব শব্দের আদিমতম রূপ আজ হয়ত বিদ্যমান নাই, কিন্তু তাহার নানা রূপ-রূপান্তরের মধ্যেও সুদূর কোন অতীতের স্পর্শ মিশিয়া রহিয়াছে। গতিই হইল ভাষার জীবনী-শক্তি এবং জনগণই হইল তাহার প্রকৃত ধারক ও বাহক। জনগণের মুখে ভাষা প্রবাহিত হইয়া চলে। কিন্তু কোন কারণে ভাষা যখন জনগণের সহিত তাহার সকল সংযোগ ছিন্ন করিয়া

আভিজাত্যের গর্বে দূরে সরিয়া গিয়াছে, তখনই ঘটিয়াছে তাহার অপমৃত্যু। এইভাবে সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষা আজ ইতিহাসের যাদুঘরে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও সেই ভাষাগুলি একেবারে নিষ্ফলা হইয়া নাই। আজ আধুনিক য়ুরোপীয় এবং ভারতীয় ভাষাগুলির উৎস-সন্ধানে যাত্রা করিলে সেই অধুনা-বিলুপ্ত ভাষাগুলির উপকূলে গিয়া অবশ্যই উপস্থিত হইতে হইবে।

ভাষা মনের ভাব প্রকাশ করে; আর, ব্যাকরণ[১] সেই মনের ভাবকে শুদ্ধরূপে প্রকাশে সাহায্য করে। কাজেই, ভাষা আগে সৃষ্টি হয়, ব্যাকরণ সৃষ্টি হয় পরে। জনসাধারণের মুখে মুখে ভাষা নানা রূপ-রূপান্তরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া চলে। ব্যাকরণ ভাষার সেই মৌল প্রবণতা, সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও উচ্চারণ-পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে নিয়ম রচনা করিয়া ভাষার বিশুদ্ধ প্রয়োগের পথ অঙ্কিত করিয়া দেয়; ভাষা হৃদয়-মনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ এবং ব্যাকরণ তাহার শাসন-শৃঙ্খলা। কাজেই, কোন ভাষা শুদ্ধভাবে লিখিবার জন্য, পড়িবার জন্য, বলিবার জন্য এবং বুঝিবার জন্য সেই ভাষার ব্যাকরণ-পাঠ অবশ্যই প্রয়োজন।

অতএব বাংলা ভাষা শুদ্ধভাবে লিখিবার জন্য, পড়িবার জন্য, বলিবার জন্য এবং বুঝিবার জন্য যে গ্রন্থ পাঠ একান্তভাবে অপরিহার্য, সেই গ্রন্থকে বাংলা ব্যাকরণ[২] বলা হয়। বাংলা ভাষার বয়স হাজার বছরেরও বেশী; কিন্তু তাহার রচিত ব্যাকরণের বয়স মাত্র দুইশত বছর। ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়, বাংলা ব্যাকরণের সূচনা হয় পর্তুগীজ ও ইংরেজদের হাতে। পরবর্তী পথিকৃৎ রাজা রামমোহন রায়।

ভাষা-বিজ্ঞানে ব্যাকরণ তিন প্রকার: এক. বর্ণনামূলক ব্যাকরণ, দুই. ঐতিহাসিক ব্যাকরণ ও তিন. তুলনামূলক ব্যাকরণ। আবার, ভাষা-বিজ্ঞান অনুসারে ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় প্রধানতঃ চারটি: এক. ধ্বনি-বিজ্ঞান [Phonetics], ধ্বনি-বিচার [Phonemics] ও ধ্বনিতত্ত্ব [Phonology], দুই. রূপতত্ত্ব [Morphology]; তিন. পদতত্ত্ব বা বাক্যরীতি [Syntax] এবং চার. শব্দার্থতত্ত্ব [Sematics]।

১. "ব্যাকরণ" একটি সংস্কৃত শব্দ। ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেছে বিশ্লেষণ, বিশেষরূপে এবং সম্যগ্‌রূপে বিশ্লেষণ করা।...ইংরেজী Grammar শব্দটি গ্রীক ভাষা হইতে আসিয়াছে, ইহার অর্থ 'শব্দ-শাস্ত্র'। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে 'ব্যাকরণ' শব্দটি ইংরেজী Grammar-এর অর্থেই প্রযুক্ত হইয়া আসিয়াছে। 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' বলিতে বাংলা ভাষার 'Grammar' বুঝায়, এই অর্থেই চলিয়া আসিতেছে।"

—আচার্য সুনীতিকুমার

২. "সংস্কৃত বা বাংলা ব্যাকরণ ও ইংরাজী Grammar এক জিনিস নয়। Grammar is the art of speaking and writing a language correctly. সংস্কৃত ব্যাকরণের মানে কিন্তু আর কিছু। 'ব্যাক্তিয়ন্তে ব্যুৎপাদ্যন্তে শব্দা অনেন ব্যাকরণং' অর্থাৎ শব্দটি শুদ্ধ করা পর্যন্তই ব্যাকরণের সীমা। ইংরাজীতে গ্রামারের মধ্যে উচ্চারণ পড়ে। উচ্চারণের জন্য সংস্কৃততে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র আছে—তাহার নাম শিক্ষা। ইংরাজীতে গ্রামারে Syntax থাকে— সংস্কৃততে Syntax-এর মোটা মোটা গোটাকতক কথা যা নহিলে ব্যাকরণ চলে না, তাহাই ব্যাকরণে থাকে—বাকীটা বাদার্থশাস্ত্রে গিয়া পড়ে। ইংরাজী গ্রামারে ছন্দের উপর একটা অধ্যায় থাকে, সংস্কৃততে ছন্দশাস্ত্র স্বতন্ত্র। গ্রামারে figure of speech থাকে, সংস্কৃততে অলঙ্কারশাস্ত্র স্বতন্ত্র। সুতরাং, ইংরাজী গ্রামার ও সংস্কৃত ব্যাকরণ এক নহে। ইংরাজী গ্রামারকে শব্দশাস্ত্র বলা যাইতে পারে, সংস্কৃত ব্যাকরণ শুধু পদের আকার লইয়া।"

—মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

বাংলা ভাষা

বাংলা ভাষা আর্যভাষা-সম্ভূত আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির অন্যতম। আর্যভাষা আর্যদের সহিত প্রথমে ভারতে আসিয়াছিল বৈদিক ভাষারূপে। ভারতের জলবায়ুর গুণে এবং ভারতের প্রাগ্-আর্য জাতিগুলির ভাষাসমূহের সহিত অনিবার্য আদান-প্রদানের পরিণামে আর্যভাষার অবনতি ঘটিলে পরবর্তীকালে তাহার সংস্কার সাধনের ফলে যে ভাষার সৃষ্টি হইল, তাহার নাম সংস্কৃত ভাষা। সংস্কৃত ভাষা পরিণত হইল কেতাবী ভাষায়। ইহা হইল সমাজের অভিজাত শ্রেণীর তথা শিক্ষিত শ্রেণীর ভাষা। আবার, বর্ণ-বিভাগের ফলে বেদে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণেরই অধিকার স্বীকৃত ছিল। অর্থাৎ, অব্রাহ্মণের সম্মুখে শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত ছিল না। এইভাবে দেশের জনসাধারণের সম্মুখে সংস্কৃতের দ্বার রুদ্ধ হইল। কিন্তু 'প্রকৃতি' অর্থাৎ লোক-সাধারণের মুখে মুখে নিত্য পরিবর্তিত হইয়া প্রবাহিত হইয়া চলিল কথ্য 'প্রাকৃত' ভাষা [জনসাধারণের ভাষা]। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে উচ্চারণের বৈশিষ্ট ভঙ্গি এবং কথ্য ভাষার রীতি-অনুসারে তাহা ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিল। তাহাদের নাম হইল শৌরসেনী প্রাকৃত, পৈশাচী প্রাকৃত, মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত ও মাগধী প্রাকৃত। কালক্রমে মাগধী প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত হইল মগধী অপভ্রংশ বা মাগধী অবহট্‌ঠ [এই নামটি পণ্ডিত গ্রীয়র্সনের দেওয়া]; এবং এই মাগধী অপভ্রংশ হইতে উদ্ভব হইল বাংলা ভাষার। কাজেই, একপ্রান্তে প্রাচীন ভারতের আর্যভাষা, অন্যপ্রান্তে আধুনিক বাংলা ভাষা; মাঝখানে হাজার হাজার বছরের ইতিহাস।

বাংলা ব্যাকরণ

বাংলা ভাষার উদ্ভব আজ হইতে প্রায় সহস্র বৎসর পূর্বে। কিন্তু বাংলা ব্যাকরণের সৃষ্টি মাত্র দুইশত বৎসর পূর্বে। বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ-রচয়িতা পর্তুগীজ পাদ্রী মানোএল-দ্য-আসুম্প্‌সাম।[১] তারপর ইংরেজ পণ্ডিত হ্যালহেড্ ইংরেজিতে বাংলা ব্যাকরণ[২] রচনা করেন। রামমোহনও[৩] বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন; কিন্তু ইংরেজিতে। তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আধুনিক এবং বাংলায় গ্রন্থটির অনুবাদও হইয়াছিল। তারপর বাংলা ব্যাকরণ রচনায় হাত দিয়াছেন নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ, আচার্য যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বরেণ্য পণ্ডিতগণ। কিন্তু প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে আজও বাংলা ব্যাকরণ রচিত হয় নাই।

---

১ Vocabulario em Idioma Bengalla em Portuguez—পর্তুগীজ-বাংলা ব্যাকরণ ও শব্দকোষ।

২. The Grammar of the Bengali Language : 1778

৩. গৌড়ীয় ব্যাকরণ : ১৮৩৩; রামমোহনের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত।

১. সাধু ও চলিত ভাষা

পৃথিবীর সকল উন্নত ভাষারই আছে দুইটি পৃথক্ রূপ: একটি তাহার সাহিত্যিক [Standard Literary] রূপ, অন্যটি তাহার কথ্য [Standard Colloquial] রূপ। প্রথমটি দিয়া তাহার সমৃদ্ধ সাহিত্য রচিত হয়, দ্বিতীয়টি ফেরে লোকমুখে, ব্যবহৃত হয় দৈনন্দিন জীবনাচরণে। বাংলা ভাষারও আছে তেমনি দুইটি রূপ: সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা। বর্তমানে বাংলা চলিত ভাষাও উৎকৃষ্ট সাহিত্যিক ভাষা।

ভাষা ও উপভাষা: একটি বিশেষ ভৌগোলিক পরিবেশে কোন জনগোষ্ঠীর মুখে মুখে যে ভাষা গড়িয়া উঠে, তাহাকে বলা হয় উপভাষা [Dialect]। সাধারণতঃ প্রাকৃতিক বন্ধুরতার জন্য সন্নিহিত বিভিন্ন উপভাষাগুলির মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। বাংলা দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে এইরূপ বহু উপভাষা গড়িয়া উঠিয়াছে। অঞ্চল-ভেদে বাংলার উপভাষাগুলিকে প্রধানতঃ চারভাগে বিভক্ত করা যায়: রাঢ়ী, বরেন্দ্রী, বঙ্গালী ও কামরূপী। ভৌগোলিক বিচারে সহজেই এই উপভাষাগুলির সীমা নির্দেশ করা যায়। গঙ্গা ও ভাগীরথীবেষ্টিত পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা 'রাঢ়ী', পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রবেষ্টিত উত্তরবঙ্গের উপভাষা 'বরেন্দ্রী', পদ্মা ও ভাগীরথীর দ্বারা বিচ্ছিন্ন পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গের উপভাষা 'বঙ্গালী' এবং ব্রহ্মপুত্রের দ্বারা বিচ্ছিন্ন উত্তর ও পূর্ববঙ্গের উপভাষা 'কামরূপী'।

'ভৌগোলিক, রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি কারণে ভাষা হইতে যেমন উপভাষা উদ্ভব হয়, তেমনি নানা কারণে কোন একটি উপভাষা শক্তিশালী হইয়া অপর ভাষাগুলিকে আওতায় ফেলিয়া বা বিনষ্ট করিয়া ভাষায় পরিণত হইতে পারে।··· যে-যে কারণে একটি বিশেষ উপভাষা উন্নীত হয়, তাহার মধ্যে প্রধান হইতেছে সেই উপভাষায় উন্নত সাহিত্যের সৃষ্টি,···অপর প্রধান কারণ হইতেছে, অঞ্চল-বিশেষের রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি। এমনি করিয়াই পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা বাংলা ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এমনি করিয়াই কলিকাতার উপভাষা আজ সমগ্র শিক্ষিত বাঙালী সমাজের কথ্যভাষা হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন বাংলার অধিকাংশ কবি পশ্চিমবঙ্গের লোক ছিলেন, সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের উপভাষাই বাংলা সাহিত্যে প্রাধান্য লাভ করিয়া পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে সাহিত্যের ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গদ্য রচনার প্রথা প্রচলিত হয় এবং বাংলা আধুনিক সাহিত্যের উদ্ভব হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি-সাহিত্যিকগণ প্রায় সকলেই পশ্চিমবঙ্গের সন্তান, সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা হইতে জাত বাংলা সাহিত্যের ভাষার পক্ষে বাংলা সাধু ভাষায় পরিণত হইতে কোনই বাধা রহিল না।'

উনবিংশ শতাব্দীতে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, ভূদেবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর প্রমুখ খ্যাতিমান্ লেখকদের হাতে বাংলা সাধুভাষা যথেষ্ট সমৃদ্ধি লাভ করে। কিন্তু পরবর্তীকালে উনবিংশ শতাব্দী হইতে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বাংলা

চলিত ভাষা বা কথ্য ভাষায় উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, প্রমথ চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ ও রাজশেখর বসু হইতে শুরু করিয়া অতি আধুনিক লেখকগোষ্ঠী পর্যন্ত সকলেই চলিত ভাষার অনুরাগী। চলিত ভাষার বর্তমান সমৃদ্ধির কাছে সাধুভাষা দিনে দিনে নিষ্প্রভ হইয়া পড়িতেছে।

বাংলা চলিত ভাষার শক্তির সন্ধান করিতে উইলিয়ম কেরী [দৃষ্টান্ত—'কথোপকথন'] খুব সচেষ্ট ছিলেন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারও তাঁহাকে সে বিষয়ে সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু যে কারণেই হউক, চলিত ভাষায় শক্তির সন্ধান তাঁহারা লাভ করিতে পারেন নাই। এ বিষয়ে সাফল্য লাভ করিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। তিনিই প্রথমে বাংলা চলিত ভাষার শক্তির সন্ধান লাভ করেন এবং তাঁহার 'আলালের ঘরের দুলাল' সেই সাফল্যের স্বাক্ষরবাহী। তারপর কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার 'হুতোম পেঁচার নক্‌শা'য় সেই শক্তিরই চর্চা করিলেন। অবশ্য, প্রায় সমসাময়িক কালে মধুসূদন তাঁহার প্রহসন-যুগলে ['বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' ও 'একেই কি বলে সভ্যতা'] বাংলা চলিত ভাষার সার্থক প্রয়োগ করেন। ইহার পর রবীন্দ্রনাথ বাংলা চলিত ভাষার শক্তির সহিত উহার সৌন্দর্যও আবিষ্কার করিলেন। বিবেকানন্দ বাংলা চলিত ভাষার শক্তি সম্পর্কে ছিলেন অত্যন্ত আশাবাদী। তাহাক সপ্রমাণ করিলেন প্রমথ চৌধুরী [বীরবল]। তারপর হইতে অতি-সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বাংলা লেখকগণের সাহিত্য-সাধনা বাংলা চলিত ভাষাকেই অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য : কতকগুলি দিক দিয়া সাধু ও চলিত ভাষার মধ্যে পার্থক্য অতি সুস্পষ্ট। ১. সাধুভাষায় তৎসম শব্দের প্রাধান্য বেশী; পক্ষান্তরে, চলিত ভাষায় তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দের প্রাধান্য অধিক। কিন্তু চলিত ভাষায় স্বরসঙ্গতি, অভিশ্রুতি ও সমীকরণ প্রভৃতি নিয়মানুসারে তৎসম শব্দগুলির অনুবিস্তর পরিবর্তিত রূপই ব্যবহৃত হয়। যেমন: ব্যাঘ্র>বাঘ, ভল্লুক>ভালুক, চন্দ্র>চাঁদ, স্বর্ণ>সোনা, কণ্টক>কাঁটা, পক্ষ>পাখী, দধি>দৈ, দুগ্ধ>দুধ, অদ্য>আজ, কার্য>কাজ, দ্বিপ্রহর>দুপুর, মৃত্তিকা>মাটি, জীবিত>জ্যান্ত, পত্র>পাতা, মক্ষিকা>মাছি ইত্যাদি। [তাছাড়া আরো কিছু তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দের অনুরূপ পরিবর্তন ঘটে—বাহিরে>বাইরে, বাহির>বা'র, বের; উঠান>উঠোন, ভিতর>ভেতর, উনান>উনুন, দেশী>দিশি, বিলাত>বিলিতি, নাই>নেই, কলিকাতা>কলকাতা, বোম্বাই>বোম্বে ইত্যাদি।] ২. সাধুভাষায় পত্র, লেখনী সংবাদ, পুস্তক, বাতায়ন, শয্যা, বিপণি ইত্যাদি তৎসম শব্দের বিদেশী প্রতিশব্দ যথাক্রমে চিঠি, কলম, খবর, বই, জানালা, বিছানা, দোকান, ইত্যাদি চলিত ভাষায় ব্যবহৃত হয়। ৩. সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়াপদে এই পার্থক্য স্পষ্ট। যেমন: সমাপিকা ক্রিয়া—করিতেছে>করছে, করিয়াছি>করেছি, করিয়াছিল>করেছিল, করিলাম>করলাম, করলেম, করলুম; করিতাম>করতাম, করতেম; করিতেছিল>করছিল, করিবে>করবে ইত্যাদি। অসমাপিকা ক্রিয়া—পড়িয়া>পড়ে, চলিতে>চলতে, বলিবার>

বলবার, ধরিবার>ধরবার ইত্যাদি। ৪. ক. যৌগিক বা সংযোগমূলক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে সাধুভাষায় 'ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল,' 'লড়াই করিতে', 'বিক্রয় করিয়া দিল,' 'পাঠ করিতে', 'মৃত্যুমুখে পতিত হইল', 'রোদন করিতে', 'অঙ্কন করিতে', 'দর্শন করিয়া', 'পলায়ন করিল' ইত্যাদি চলিত ভাষায় হইবে যথাক্রমে 'ক্ষেপে উঠলো', 'লড়তে', 'বেচে দিল', 'পড়তে,' 'মারা গেল,' 'কাঁদতে', 'আঁকতে', 'দেখে,' 'পালালো' ইত্যাদি। ৪. সর্বনাম পদেও এই পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। যেমন: তাহারা>তারা, যাহারা>যারা, কাহারা>কারা, তাহার>তার, যাহার>যাঁর, কাহার>কার, তাহা>তা, সেই> সে, এই>এ ইত্যাদি। ৫. অনুসর্গ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তদ্ভব-প্রাধান্য লক্ষণীয়। যেমন: জন্য>জন্যে, হইতে>হতে [থেকে], দ্বারা, দিয়া>দিয়ে, অপেক্ষা>চেয়ে ইত্যাদি। ৬. চলিত বাংলায় সংস্কৃত অব্যয়গুলির তদ্ভব রূপই ব্যবহার করিতে হয়। যেমন: অনন্তর>তারপর, যদ্যপি>যদি, তথাপি>তবুও, বরঞ্চ>বরং, অদ্য>আজ ইত্যাদি। ৭. চলিত বাংলায় ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রাধান্যও যথেষ্ট। যেমন: হন্‌হন্‌, থম্‌থম্‌, গম্‌গম্‌, শোঁ শোঁ ইত্যাদি।

এইগুলি সাধারণ পার্থক্য; কিন্তু ইহা ছাড়া রহিয়াছে আরও বহু সূক্ষ্ম পার্থক্য। যেমন: সাধু ভাষার চাল গুরুগম্ভীর; চলিত ভাষার চাল অপেক্ষাকৃত লঘু। কিন্তু সাধুভাষা অপেক্ষা চলিত ভাষার গতি স্বচ্ছন্দ, সাবলীল এবং সহজবোধ্য। বাংলা গদ্যের উন্মেষ-লগ্নে তাহার ভাগ্য-রচনার কাজ ঐতিহাসিক কারণেই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত-গণের হস্তেই পড়িয়াছিল। ফলে, তাঁহাদের হস্তে সংস্কৃতের প্রাধান্য-বহুল সাধু ভাষার উদ্ভব হয়। পরে প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহের যথাক্রমে 'আলালের ঘরের দুলাল' ও 'হুতোম পেঁচার নকশা' প্রকাশিত হওয়ায় চলিত ভাষার পথ খুলিয়া যায়। উল্লিখিত গ্রন্থ দুইখানি 'কলিকাতা ককনি' বা 'কলিকাতার ঈষৎ নিম্নস্তরে ব্যবহৃত চল্‌তি বুলি'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ লণ্ডন শহরের সাধারণ লোকের কথ্য ভাষা—'London Cockney'র অনুকরণে 'কলিকাতা ককনি' শব্দটি গড়িয়া উঠিয়াছে এবং বাংলা ভাষাতত্ত্বে গৃহীত হইয়াছে।

●**বাংলা সাধু ভাষার দৃষ্টান্ত:** ১. কুরুক্ষেত্রে এক অযাচক বিপ্র ছিলেন। তিনি অযাচিত-প্রাপ্ত অন্নবস্ত্রাদিতে যথাকথঞ্চিদ্রূপে গ্রাসাচ্ছাদন ও পরিবার-পরিচালন করত কালক্ষেপ করেন। দৈবাৎ এই কুরুক্ষেত্রে পঙ্গপাল পক্ষীতে তাবৎ শস্য নষ্ট হওয়াতে অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ হইল, তৎপ্রযুক্ত ঐ অযাচক ব্রাহ্মণের বড় অপ্রতুল হইল এবং পরিবার পরিপোষণে অনির্বাহ হইল। প্রবোধচন্দ্রিকা: মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

২. শতার্ধ বৎসর হইতে অধিককাল এদেশে ইংরেজের অধিকার হইয়াছে তাহাতে প্রথম ত্রিশ বৎসরে তাহাদের বাক্যের ও ব্যবহারের দ্বারা ইহা সর্বত্র বিখ্যাত ছিল যে তাহাদের নিয়ম এই যে কাহারও ধর্মের সহিত বিপক্ষতাচরণ করেন না ও আপনার ধর্ম সকলে করুক ইহাই তাঁহাদের যথার্থ কামনা। : রামমোহন

৩. এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিরি। এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত সঞ্চরমান জলধরমণ্ডলীর যোগে, নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত; অধিত্যকা প্রদেশ ঘন সন্নিবিষ্ট বনপাদপসমূহে স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়, পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবল বেগে গমন করিতেছে।
সীতার বনবাস: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

৪. বাল্মীকির বামপার্শ্বে এক পরম রূপবান যুবাপুরুষ চিত্রিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া বিবিধ বর্ণবিভূষিত কুসুমাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। ঐ আসনের সৌরভে সর্বস্থান আমোদিত হইতেছিল। তিনি

নাকি উজ্জয়িনীনিবাসী নৃপতি-বিশেষের সভাসদ্ থাকিয়া, নৃপতি অপেক্ষা শতগুণে কীর্তিদেবীর প্রিয়পাত্র হইয়াছেন।' স্বপ্নদর্শন : অক্ষয়কুমার দত্ত

৫. জলের ধারে তীরে তীরে, মাঠে মাঠে রাখালেরা গোরু চরাইতেছে, কেহ বা বৃক্ষের তলায় বসিয়া গান করিতেছে, কেহ বা তামাকু খাইতেছে, কেহ বা মারামারি করিতেছে, কেহ বা ভুজা খাইতেছে। কৃষকেরা লাঙ্গল চষিতেছে, গোরু ঠেঙ্গাইতেছে, গোরুকে মানুষের অধিক করিয়া গালি দিতেছে।...ঘাটে ঘাটে কৃষকের মহিষীরাও কলসী, ছেঁড়া কাঁথা, পচা মাদুর, রূপার তাবিজ, নাকছাবি, পিতলের পৈঁছে, দুই মাসের ময়লা পরিধেয় বস্ত্র, মস নিন্দিত গায়ের বর্ণ, রুক্ষ কেশ লইয়া বিরাজ করিতেছেন। বিষবৃক্ষ : বঙ্কিমচন্দ্র

● **বাংলা চলিত ভাষার দৃষ্টান্ত :** ১. আপনি না শুনিলে কহে কে। আমিই যেন মিথ্যা কহিলাম। গ্রামে আর লোক আছে জিজ্ঞাসা করুন না দিকি তাঁহাদিগকে তাঁহারা কি বলেন।

কথোপকথন : উইলিয়ম কেরী

২. মোরা চাষ করিব, ফসল পাবো। রাজস্ব দিয়া যা থাকে তাহাতেই বছর শুদ্ধ অন্ন করিয়া খাবো, ছেলেপিলেগুলি পুষিব।...শাকভাত পেট ভরিয়া যেদিন খাই সেদিন তো জন্মদিন। : মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

৩. বাবুরামবাবু চৌগোঁপ্পা—নাকে তিলক—কস্তাপেড়ে ধুতিপরা—ফুলপুকুরে জুতা পায়—উদরটি গণেশের মত—কোঁচানো চাদরখানি কাঁধে—একগাল পান—ইতস্তত: বেড়াইয়া চাকরকে বলছেন—ওরে হরে। শীঘ্র বালি যাইতে হবে, দুই চার পয়সায় একখানা চল্‌তি পান্‌সি ভাড়া কর তো। বড় মানুষের খানসামারা মধ্যে মধ্যে বেআদপ হয়। হরে বলিল, মোসায়ের যেমন কাণ্ড। ভাত খেতে বসেছিনু—ডাকাডাকিতে ভাত ফেলে রেখে এসেছি।...চল্‌তি পানসি চার পয়সায় ভাড়া করা আমার কম নয়—এ কি থুতকুড়ি দিয়ে ছাতু গোলা? : প্যারীচাঁদ মিত্র

৪. অমাবস্যার রাত্তির—অন্ধকার ঘুরঘুট্টি—গুরগুর করে মেঘ ডাকছে—থেকে থেকে বিদ্যুৎ নলপাচ্চে—গাছের পাতাটি নড়চে না—মাটি থেকে যেন আগুনের ভাপ বেরুচ্ছে—পথিকেরা এক একবার আকাশের পানে চাচ্চেন, আর হন হন করে চলেছেন। কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ কচ্চে—দোকানীরা ঝাঁপতাড়া বন্ধ করে যাবার উজ্জুগ কচ্চে—গুড়ুম করে নটার তোপ পড়ে গ্যালো। : কালীপ্রসন্ন সিংহ

৫. ছুটির রবিবার। আগের সন্ধেবেলায় ঝিঁঝি ডাকছিল বাইরের দক্ষিণের বাগানের ঝোপে, গল্পটা ছিল রঘুডাকাতের। ছায়া-কাঁপা ঘরে মিটমিটে আলোতে বুক করছিল ধুকধুক। পরদিন ছুটির ফাঁকে পাল্কিতে চড়ে বসলুম। সেটা চলতে শুরু করল বিনা চলায়, উড়ো ঠিকানায়, গল্পের জালে জড়ানো মনটাকে ভয়ের পার দেবার জন্যে। : রবীন্দ্রনাথ

৬. এই বেলা গঙ্গামা'র শোভা যা দেখবার দেখে নাও। আর বড় একটা কিছু থাকছে না। দৈত্যদানবের হাতে পড়ে এ সব যাবে। ঐ ঘাসের জায়গায় উঠবেন ইটের পাঁজা, আর নাববেন ইটখোলার গর্ত্তকুল। যেখানে গঙ্গার ছোট ছোট ঢেউগুলি ঘাসের সঙ্গে খেলা করছে, সেখানে দাঁড়াবেন পাটবোঝাই ফ্লাট আর সেই গাধাবোট, আর তালতমাল আমনীচুর রঙ, ঐ নীল আকাশে মেঘের বাহার ও সব কি আর দেখতে পাবে? : স্বামী বিবেকানন্দ

৭. লিখিত ভাষায় আর মুখের ভাষায় মূলে কোন প্রভেদ নাই। ভাষা দুয়েরই এক। শুধু প্রকাশের উপায় ভিন্ন। একদিকে স্বরের সাহায্যে, অপরদিকে অক্ষরের সাহায্যে। বাণীর বসতি রসনায়। শুধু মুখের কথাই জীবন্ত। যতদূর পারা যায়, যে ভাষায় কথা কই সেই ভাষায় লিখতে পারলেই যেন লেখা প্রাণ পায়। : প্রমথ চৌধুরী

৮. পরদিন সকালে ক'জন চাষা দেখতে পেলে, একটি বৃদ্ধ বাঘ পগারের ভেতর ধুঁকছে। চ্যাংদোলা করে নিয়ে গেল ডেপুটি বাবুর বাড়ি। তিনি বললেন—'এমন বাঘ তো দেখিনি, গাধার মতো রং। আহা শেয়ালে কামড়েছে, একটু হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দি'। : রাজশেখর বসু

• সাধু ভাষা হইতে চলিত ভাষায় রূপান্তর :

১. **সাধু ভাষা :** "যখন জলবেগ এমন মন্দীভূত হইয়া আসিল যে, নৌকার গতি সংযত করা যাইতে পারে, তখন যাত্রীরা রসুলপুরের মোহানা অতিক্রম করিয়া অনেক দূরে আসিয়াছিলেন। এখন নবকুমারের জন্য প্রত্যাবর্তন করা যাইবে কি না, এ বিষয়ের মীমাংসা আবশ্যক হইল।" : বঙ্কিমচন্দ্র

চলিত ভাষা : যখন জলের বেগ এমন শান্ত হয়ে এলো যে, নৌকোর গতি সামলানো যেতে পারে, তখন যাত্রীরা রসুলপুরের মোহানা পেরিয়ে অনেকদূর চলে এসেছিলেন। এখন নবকুমারের জন্তে ফেরা যাবে কি না, এ বিষয়ে ঠিক করা দরকার হলো।

২. **সাধু ভাষা :** "পরদিবস প্রাতঃকালে সেই পর্বতশ্রেণীর মধ্যে যে পর্বত বনাকীর্ণ, সেই পর্বতের পথ দিয়া নিম্নে পদব্রজেই আরোহণ করিতে লাগিলাম। পর্বত আরোহণ করিতে যেমন কষ্ট, অবরোহণ করা তেমনি সহজ।" : দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

চলিত ভাষা : পরের দিন ভোরবেলায় সেই পাহাড়ের সারির মধ্যে যে পাহাড় বনে ঢাকা, সেই পাহাড়ের পথ দিয়ে নিচে পায়ে হেঁটেই নামতে লাগলাম। পাহাড়ে ওঠা যেমন কষ্ট, নামা তেমনি সহজ।

চলিত ভাষা হইতে সাধু ভাষায় রূপান্তর :

১. **চলিত ভাষা :** "তখন ভোর হয়েছে, মেলা-শেষে মলিন মুখে যে যার ঘরে ফিরছে, বাপ্পা সেই যাত্রীদের সঙ্গে ঘরে ফিরলেন।" : অবনীন্দ্রনাথ

সাধু ভাষা : তখন প্রভাত হইয়াছে, মেলান্তে মলিন মুখে যে যাহার গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছে, বাপ্পা সেই যাত্রীদের সহিত গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

২. **চলিত ভাষা :** "ছিনাথ কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিল; কিন্তু পিসে-মশায়ের আর রাগ পড়ে না। পিসিমা নিজে উপর হইতে কহিলেন, তোমাদের ভাগ্যি ভালো যে, সত্যিকারের বাঘ-ভালুক বার হয়নি। যে বীরপুরুষ তোমরা, এবং তোমার দারওয়ানরা! ছেড়ে দাও বেচারিকে, আর দূর করে দাও দেউড়ির ঐ খোট্টাগুলোকে। একটা ছোট ছেলের যা সাহস, একবাড়ি লোকের তা নেই।" : শরৎচন্দ্র

সাধু ভাষা : শ্রীনাথ কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিল; কিন্তু পিসামহাশয়ের আর ক্রোধের উপশম হয় না। পিসিমা স্বয়ং উপর হইতে কহিলেন, তোমাদের ভাগ্য প্রসন্ন যে, সত্যকারের ব্যাঘ্র-ভাল্লুক বাহির হয় নাই। যে বীরপুরুষ তোমরা আর তোমার দ্বারবানেরা! ছাড়িয়া দাও বেচারাকে [হতভাগ্যকে], আর দূর করিয়া দাও দেহলীর হিন্দুস্থানীগুলাকে। একটি ক্ষুদ্র বালকের যে সাহস একগৃহ মনুষ্যের তাহা নাই।

●স্মরণ রাখিতে হইবে যে, একই রচনায় সাধু ও চলিত ভাষার সংমিশ্রণ অসংগত, অশিষ্ট ও অশুদ্ধ। বৈয়াকরণেরা সাধু ও চলিত ভাষার এই অশিষ্ট প্রয়োগকে **গুরুচণ্ডাল দোষ** বা **গুরুচণ্ডালী দোষ** নামে অভিহিত করিয়াছেন। যেমন : 'শব দাহ' কিংবা 'মড়া পোড়ান' শুদ্ধ। কিন্তু 'শব পোড়ান' বা 'মড়া দাহ' অশুদ্ধ।

ভাষাগোষ্ঠী : একই ভাষায় যে জনসমষ্টি কথাবার্তা বলে এবং ভাব-বিনিময় করে, সেই জনসমষ্টিকে বলে ভাষাগোষ্ঠী [Speech Community]।

অপভাষা : আবার এক ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ ভালোভাবে না শিখিয়া যদি অন্য ভাষাগোষ্ঠীর ভাষা ব্যবহার করে, তবে তাহার সেই ভাষা ব্যবহার, বলা বাহুল্য, নির্ভুল হইবে না। ভাষার এই বিকৃত ব্যবহারকে বলা হয় অপভাষা।

● খাঁটি বাংলা শব্দের সন্ধি

পরস্পর-সন্নিহিত দুইটি বর্ণের মিলনকে সন্ধি বলা হয়।

উচ্চারণ-প্রকৃতিই সন্ধির মূল। আবার, বাংলা উচ্চারণ-প্রকৃতি সংস্কৃত উচ্চারণ-প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। সেইজন্য বাংলা-সন্ধির বৈশিষ্ট্য সংস্কৃত-সন্ধির বৈশিষ্ট্য হইতে ভিন্ন। তবে তৎসম শব্দগুলি সংস্কৃত হইতে গৃহীত বলিয়া সংস্কৃত-সন্ধির নিয়ম সেই শব্দগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অন্যত্র বাংলার নিজস্ব রীতিতে সন্ধি সংঘটিত হয়।

১. সংস্কৃতে বাক্য-মধ্যস্থিত সন্নিহিত পদগুলি সন্ধিসূত্রে মিলিত হয় ; কিন্তু বাংলায় তাহা হয় না। যেমন : সংস্কৃতে—কুশলম্+ইচ্ছসি=‘কুশলমিচ্ছসি’। কিন্তু বাংলায়—কুশল+ইচ্ছাকর=‘কুশলেচ্ছাকর’ হয় না। ‘কুশল’ অ-কারান্ত হইলেও বাংলায় হসন্তরূপে উচ্চারিত হয়। তাহার সহিত পরস্থিত ‘ই’-র মিলনে বাধা নাই। কিন্তু তাহা হয় না। সন্নিহিত স্বর ও ব্যঞ্জনগুলি এরূপ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ না হইয়া নিজের স্বতন্ত্রতা লইয়া সহাবস্থান করে।

২. সংস্কৃতে সন্ধি উচ্চারণ-জনিত হইলেও লেখায় অসুবিধা নাই ; কিন্তু বাংলায় উচ্চারণ-জনিত সন্ধি সংঘটিত হইলেও লেখা যায় না, লেখা হয়ও না। যেমন : সংস্কৃতে—আনন্দাৎ+হি+এব=‘আনন্দাদ্ধ্যেব’ বলাও যায়, লেখাও যায়। সেইভাবে বাংলায়—হাত+ধরা=হাদ্ধরা বা হাদ্ধরা কিংবা কচু+আলু+আদা=কচ্বাল্বাদা হয়তো বলা যায়, লেখা যায় না। কারণ, তাহা বাংলা ভাষার রীতি-প্রকৃতির বিরোধী।

৩. সংস্কৃতে পদান্ত বিভক্তি ও প্রত্যয়ের সহিত পরবর্তী শব্দের আদিবর্ণের সন্ধিতে কোন বাধা নাই। যেমন : সংস্কৃতে—কর্মণি+এব+অধিকারঃ+তে=‘কর্মণ্যেবাধিকারস্তে’ ব্যাকরণ-সম্মত এবং নির্ভুল। কিন্তু বাংলায়—‘নতুন-দাদার অভিজ্ঞতায় ইন্দ্র ঈষৎ ম্লান হাসিয়া কহিল’ কখনও ‘নতুন-দাদারাভিজ্ঞতায়িন্দ্রীষৎ ম্লান হাসিয়া কহিল’ হইবে না। সংস্কৃতে—ভবামি+অহম্=‘ভবাম্যহম্’ হয়, কিন্তু বাংলায়—হব+আমি=‘হবামি’ হয় না। তবে লৌকিক উচ্চারণের ফলে ‘আর না কালী’=‘আন্নাকালী’ বা ‘যা ইচ্ছে তাই’=‘যাচ্ছেতাই’ হইয়া থাকে। বলাবাহুল্য এইগুলি সমীকরণ-ঘটিত এবং দুর্লভ দৃষ্টান্ত।

৪. সংস্কৃতে সমাসবদ্ধ পদে সম্ভব হইলে সন্ধি সংঘটিত হয়। যেমন : লবণাম্বুরাশেঃ +ধারানিবদ্ধেব=‘লবণাম্বুরাশের্ধারানিবদ্ধেব’। কিন্তু বাংলায় সমাসবদ্ধ পদে এইরূপ হয় না। যেমন : লবণজলরাশির+ধারা=লবণজলরাশির্ধারা হয় না। অবশ্য, যোড়ার

+ডিম='ঘোড়াড্ডিম' হয়। কিন্তু কোন কোন বৈয়াকরণ ইহাকে অশুদ্ধ বলিয়া গণ্য করেন।

সন্ধির প্রকার ভেদ

বাংলায় সন্ধি মূলতঃ দুই প্রকার : স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধি।

স্বরবর্ণের সহিত স্বরবর্ণের মিলনকে **স্বরসন্ধি** বলা হয়। স্বরবর্ণের সহিত ব্যঞ্জনবর্ণের বা ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত ব্যঞ্জনবর্ণের মিলনকে **ব্যঞ্জনসন্ধি** বলা হয়।

খাঁটি বাংলা স্বরসন্ধি

বাংলা ভাষার নিজস্ব প্রকৃতি-অনুযায়ী বাংলা ভাষার সন্ধির নিয়মগুলিও অনেকটা শিথিল। বাংলা সন্ধির নিয়মগুলি মূলতঃ উচ্চারণ-নির্ভর। সমীকরণ, স্বরসঙ্গতি, বর্ণলোপ ইত্যাদি প্রধানতঃ এই সন্ধির মূল ভিত্তি।

ক. বাংলা স্বরসন্ধির কতকগুলি ক্ষেত্রে তৎসম শব্দের নিয়ম অনুসৃত হয়। যেমন : চাষ+আবাদ=চাষাবাদ, জেঠা+আমি=জেঠামি, নষ্ট+আমি=নষ্টামি, দুষ্ট+আমি=দুষ্টামি, ঠাকুর+আলি=ঠাকুরালি, মিতা+আলি=মিতালি, দূত+আলি=দূতালি, ভাঙ্গা+আনি=ভাঙ্গানি, বঙ্গ+আল্=বঙ্গাল।

* স্মরণীয় যে, সংস্কৃত ও অসংস্কৃত শব্দে সন্ধি হয় না। তবে কতকগুলি ক্ষেত্রে এরূপ অশুদ্ধ সন্ধি চলিয়া আসিয়াছে। যেমন : দিল্লী+ঈশ্বর=দিল্লীশ্বর, ঢাকা+ঈশ্বরী=ঢাকেশ্বরী, ইংলণ্ড+অধিপতি=ইংলণ্ডাধিপতি, আইন+অনুসারে=আইনানুসারে, আইন+অনুগ=আইনানুগ, হিসাব+আদি=হিসাবাদি, গ্যাস+আলোক=গ্যাসালোক।

খ. কাছাকাছি, মোটামুটি অর্থে 'এক' প্রত্যয়ের পূর্ববর্তী 'অ'-কার লুপ্ত হয় এবং 'এ' পূর্ববর্ণের সহিত যুক্ত হয়। যেমন : তিল+এক=তিলেক, অর্ধ+এক=অর্ধেক, বার+এক=বারেক, আধ+এক=আধেক, যত+এক=যতেক, দশ+এক=দশেক, শত+এক=শতেক, চার+এক=চারেক, পাঁচ+এক=পাঁচেক।

গ. 'এক' ও 'এর' প্রত্যয়ের পূর্বে 'অ' ভিন্ন স্বরবর্ণ থাকিলে 'এ'-কার লুপ্ত হয়। যেমন : খানি+এক=খানিক, কোটি+এক=কোটিক, গুটি+এক=গুটিক, কুড়ি+এক=কুড়িক, কলকাতা+এর=কলকাতার, দিল্লী+এর=দিল্লীর।

ঘ. 'ই'-কার ও 'ও'-কারের পূর্ববর্তী 'অ'-কার লুপ্ত হয় এবং ই অথবা ও পূর্ববর্ণের সহিত যুক্ত হয়। যেমন : আমার+ই=আমারি, সবার+ই=সবারি, তোমার+ই=তোমারি, যখন+ই=যখনি, তখন+ই=তখনি, এখন+ই=এখনি, আমার+ও=আমারো, তোমার+ও=তোমারো, তখন+ও=তখনো, এখন+ও=এখনো, কখন+ও=কখনো, কোন+ও=কোনো, আর+ও=আরো, কার+ও=কারো।

ঙ. সন্নিহিত দুইটি স্বরবর্ণের পরবর্তী স্বরটি লুপ্ত হয়। যেমন: যা+ইচ্ছে+তাই=যাচ্ছেতাই।

খাঁটি বাংলা ব্যঞ্জনসন্ধি: বাংলার নিজস্ব উচ্চারণ-রীত অনুযায়ী বাংলা ব্যঞ্জনসন্ধি সংঘটিত হয়।

ক. বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ বা য্, র্, ল্, ব্, হ্ পরে থাকিলে বর্গের প্রথম বর্ণের স্থানে **তৃতীয় বর্ণ** হয়। যেমন: ছোট+দি=ছোড়দি, এত+দূর=এদ্দূর, পাঁচ+জন=পাঁজ্‌জন, রাত+দিন=রাদ্দিন, এক+গা=এগ্‌গা, এক+ঘা=এগ্‌ঘা, ডাক+ঘর=ডাগ্‌ঘর, পাপ+ভয়=পাব্‌ভয়, চাক+ভাঙা=চাগ্-ভাঙা, নাত+বউ=নাদ্‌বৌ, ভাত্র[=ভ্রাতৃ]+বধূ=ভাদ্রবধূ, বট+গাছ=বড্‌গাছ, হাত+দেখা=হাদ্দেখা।

খ. বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ পরে থাকিলে তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণের স্থানে সেই বর্গের যথাক্রমে **প্রথম** ও **দ্বিতীয় বর্ণ** হয়। যেমন: বড়+ঠাকুর=বট্‌ঠাকুর, আধ+খানা=আৎখানা, রাগ+করোনো=রাক্‌করোনা, মেঘ+করেছে=মেক্‌করেছে।

গ. শ্, ষ্, স্ পরে থাকিলে চ্ স্থানে 'শ্' হয়। যেমন: পাঁচ+সের=পাঁশ্‌সের, পাঁচ+সিকে=পাঁশ্ সিকে।

ঘ. চ-বর্গ পরে থাকিলে পূর্ববর্তী ত-বর্গ স্থানে 'চ' বর্গ হইয়া যায়। যেমন: নাতি [নাত্]+জামাই=নাজ্জামাই, ভাত+জল=ভাজ্জল, বদ্+জাত=বজ্জাত, সাত+জোড়া=সাজ্জোড়া, হাত+জোড়া=হাজ্জোড়া, দুধ+জাল=দুজ্জাল।

ঙ. চ-বর্গ পরে থাকিলে পূর্ববর্তী স্বর লুপ্ত হয় এবং চ-বর্ণের 'দ্বিত্ব' হয়। যেমন: জুয়া+চোর=জোচ্চোর।

চ. ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্ববর্তী স্বরবর্ণ লুপ্ত হয়। যেমন: কাঁচা+কলা=কাঁচকলা, মিশি+কালো=মিশ্‌কালো, বেশী+কম=বেশকম, সারি+বন্দী=সারবন্দী, টাকা+শাল=টাকশাল, ঘোড়া+দৌড়=ঘোড়দৌড়, ঘোড়া+গাড়ি=ঘোড়গাড়ি, ঘোড়া+সওয়ার=ঘোড়সওয়ার, ভরা+সাঁঝ=ভরসাঁঝ, ভরা+দুপুর=ভরদুপুর, পিসি+শাশুড়ি=পিসশাশুড়ি, বোকা+চন্দ্র=বোকচন্দ্র।

ছ. র্-কারের পর ব্যঞ্জনবর্ণ থাকিলে র্-এর লোপ হয় এবং ব্যঞ্জনবর্ণের 'দ্বিত্ব' হয়। যেমন: ঘর+জামাই=ঘজ্জামাই, ঘোড়ার+ডিম=ঘোড়াড্ডিম, চার+টি=চাট্টি, মার+না=মান্না, কর+তাল=কত্তাল, হর+তাল=হত্তাল, বাপের+জন্মে=বাপেজ্জন্মে, ব্যাটার+ছেলে=ব্যাটাচ্ছেলে, দর+জাল=দজ্জাল [দজ্জাল], দূর+ছাই=দুচ্ছাই, দুর+তোর=দুত্তোর।

জ. ট-বর্গ পরে থাকিলে ত-বর্গ স্থানে 'ট-বর্গ' হয়। যেমন: হাত+টান=হাট্টান, পুরুত+ঠাকুর=পুরুট্‌ঠাকুর, এত+টুকু=এট্‌টুকু।

•ঝ. ত-বর্গের পর 'স' থাকিলে উভয়ে মিলিয়া 'চ্ছ' হয়। যেমন: উৎ+সন্ন=উচ্ছন্ন, বৎ+সর=বচ্ছর, কুৎ+সিত=কুচ্ছিৎ, উৎ+সব=উচ্ছব, মহা+উৎ+সব=মোচ্ছব।

ঞ. 'হ' পরে থাকিলে বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণের স্থানে যথাক্রমে দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ হয়। যেমন: কাত+হও=কাথও, লাজ+হীন=লাঝীন, রাগ+হয়=রাঘয়, বাপ+হারা=বাফারা, সব+হয়=সভয়, ভাত+হয়েছে=ভাথয়েছে।

॥ অনুসরণী ॥

১. সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা কাহাকে বলে? কয়েকটি বাক্যের দৃষ্টান্ত সহযোগে ইহাদের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও। মা. [কম্পার্ট.] '৬১

২. সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার পার্থক্য নির্দেশ কর। মা. '৬৫

৩. চলিত ভাষায় রূপান্তরিত কর:

ক. আমি সায়ংকালে এই নদীর সৌন্দর্যে মোহিত হইয়া একাকী তাহার তীরে বিচরণ করিতেছিলাম, হঠাৎ উপরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি যে 'পর্বতো বহ্নিমান্', পর্বতের উপরে দীপমালা শোভা পাইতেছে। —দেবেন্দ্রনাথ

খ. পিতৃদেবের মুখে এই হৃদয়বিদারণ উপাখ্যান শুনিয়া, আমার অন্তঃকরণে যেমন দুঃসহ দুঃখানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, স্ত্রীজাতির উপর তেমনই প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছিল। —বিদ্যাসাগর

গ. প্রায় দুইশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে একদিন মাঘমাসের রাত্রিশেষে একখানি যাত্রীর নৌকা বঙ্গোপসাগর হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল। —বঙ্কিমচন্দ্র

ঘ. 'আহা কি দেখিলাম! এমন অদ্ভুত স্বপ্ন কখনও দেখি নাই। এমত কলরব-পরিপূর্ণ লোকাকীর্ণ স্থান কোথাও দৃষ্টি করি নাই। এই অসীম ভূমিখণ্ডের মধ্যস্থলে, এক পরম শোভাকর অপূর্ব পর্বত দর্শন করিলাম।'

ঙ. মনুষ্য কতকদূর পশুচরিত্র ত্যাগ করিয়া উন্নতাবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। অনেক সময়ে মনুষ্য ভয়ে ভীত না হইয়াও সৎকর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়।

৪. সাধুভাষায় রূপান্তরিত কর:

ক. কাল এসে পৌঁচেছি শিলং পর্বতে, পথে কত যে বিঘ্ন ঘটল তার ঠিক নেই। মনে আছে বোলপুর থেকে আসবার সময় মা গঙ্গা আমাকে জল-কাদার মধ্যে হিঁচড়ে এনে সাবধান করে দিয়েছিলেন।

খ. তার পরে দু বছর যায়। ইতিমধ্যে বলাইয়ের কাকি গোপনে চোখের জল মোছেন, আর বলাইয়ের জন্ম শোবার ঘরে গিয়ে তার ছেঁড়া একপাটি জুতো, তার রবারের ফাটা গোলা, আর জানোয়ারের ছবির বই নাড়েন চাড়েন। —রবীন্দ্রনাথ

গ. সেজেগুজে বসে থাকলে কি হবে বল? ও টুপি-টাপা মাথায় দিয়ে আর কি হবে বল? যত দোষ হিঁদুর ঘাড়ে ফেলে সাহেবের গা ঘেঁষে দাঁড়াতে গেলে, লাথি ঝাঁটার চোটটা বেশি বই কম পড়বে না। —স্বামী বিবেকানন্দ

ঘ. সকালে পৃথীরাজ সেজেগুজে সঙ্গকে ধরবার জন্য বার হবেন, এমন সময় শিরোহি থেকে পৃথীরাজের ছোট বোন এক পত্র পাঠালেন। —অবনীন্দ্রনাথ

ঙ. কামাল নিরস্ত্র হয়ে বোকার মত দাঁড়িয়ে আছে। তখন ঈশ্বর বললে, 'যে লকড়ি হাতে ধরে রাখতে পারে না, সে আবার খেলবে কি!' উ. মা. '৬৭ [লকড়ি—লাঠি, লগুড়]

চ. যিনি গড়তে জানেন তিনি শিবও গড়তে পারেন, বাঁদরও গড়তে পারেন। আমাদের সঙ্গে বড় বড় শিল্পীদের তফাৎ এটুকু যে, তাঁদের হাতে এক করতে আর হয় না। সম্ভবতঃ এই কারণে কলারাজ্যের মহাপুরুষদের যা খুসি তাই করবার যে অধিকার আছে, ইতর-শিল্পীদের সে অধিকার নেই।

ছ. 'আমরা দক্ষিণপাড়ার ছেলে—যমকে ভয় করিনে তা জানিস? কিন্তু তা বলে ছোটলোকদের dirty পাড়ার মধ্যেও আমরা যাইনে। ব্যাটাদের গায়ের গন্ধ নাকে গেলে আমাদের ব্যামো হয়। উ. মা. '৬৫
[ছোটলোকদের—ইতর ব্যক্তিদের, dirty—জঞ্জালপূর্ণ, ব্যাটা—বৎস, ব্যামো—ব্যাধি]

জ. 'তুমি আজন্ম পাণ্ডবদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে আসছ, কিন্তু তাঁরা তা সয়েছেন। পাণ্ডবেরা যে রাজ্য জয় করেছিলেন, তা এখন তুমি ভোগ করছ।' উ মা. '৬৭
[পাণ্ডবদের—পাণ্ডবগণের, সঙ্গে—সহিত, করে আসছ—করিয়া আসিতেছ, তাঁরা তা সয়েছেন—তাঁহারা তাহা সহ্য করিয়াছেন, পাণ্ডবরা—পাণ্ডবগণ, করেছিলেন—করিয়াছিলেন, তা—তাহা, করছ—করিতেছ।]

৫. গুরুচণ্ডালী দোষ কাহাকে বলে? উদাহরণসহ বুঝাইয়া দাও।

৬. কোন্ কোন্ বিষয়ে সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য নির্ভর করে দৃষ্টান্তসহ আলোচনা কর।

৭. কাহাকে বলে লিখ ও উদাহরণ দাও:
উপভাষা অপভাষা ও ভাষাগোষ্ঠী।

৮. খাঁটি বাংলা সন্ধি কাহাকে বলে? দৃষ্টান্ত দাও।

৯. সন্ধি-বিচ্ছেদ কর: ঠাকুরালি, নষ্টামি, মিতালি, কাঁচকলা, ভাঙ্গানি, বারেক, অর্ধেক, শতেক, খানিক, কলকাতার, ছোড়দি, ভাদ্রবধূ, মান্না, চাট্টি, দুচ্ছাই, নাজ্জামাই, ভাজ্জল, বজ্জাত, হাট্টান, উচ্ছন্ন, মোচ্ছব, কুচ্ছিৎ, দজ্জাল, বেশকম, সারবন্দী, টাকশাল, ঘোড়সওয়ার, ভরসাঁঝ।

১০. সন্ধি কর: কর+তাল, চাষ+আবাদ, দূত+আলি, দিল্লী+এর, ডাক+ঘর, চাক+ভাঙা, পাপ+ভয়, বড+ঠাকুর, আধ+খানা, পাঁচ+জন, মেঘ+করেছে, পাঁচ+সের, নাতি+জামাই, জুয়া+চোর, বাপের জন্মে, দুব+তোর, যা+ইচ্ছে+তাই, হর+তাল, বৎ+সর, মহা+উৎ+সব, পুরুত+ঠাকুর।

১১. সন্ধি কর: ভাত+হয়েছে, নাচ+হবে, রাত+হবে, নাটক+হচ্ছে, আলাপ+হলো, রাগ+হয়েছে, কাজ+হলো।

১২. খাঁটি বাংলা সন্ধির বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে লিখ। সংস্কৃত সন্ধির সহিত তাহার পার্থক্য কোথায়?

২. বর্ণ ও বর্ণের উচ্চারণ

বর্ণ

ধ্বনিই হইল ভাষার মূল উপকরণ। মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনি হইতে ভাষার সৃষ্টি। কাজেই, বহু ধ্বনির সমবায়ে মানুষের মনের এক-একটি ভাব ব্যক্ত হয়। কালক্রমে মানুষ মুখের ভাষাকে দূরে প্রেরণ করিতে বা স্থায়িত্ব দান করিতে চাহিল। সেই তাগিদ হইতে সৃষ্টি হইল লিপির। 'আদিম স্তরে দেখা দিয়াছিল চিত্রাঙ্কন প্রবৃত্তি।' মানুষ ছবি আঁকিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিতে শিখিল।' সেই চিত্রলিপি [pictogram] বিবর্তিত হইতে হইতে ধ্বনিলিপির [alphabetic script] রূপ পরিগ্রহ করিল। তখন তাহার নাম হইল ধ্বনি-চিহ্ন বা বর্ণ [letter]। কাজেই, বর্ণ হইল ধ্বনির প্রতীক বা রূপচিত্র। এক-একটি ধ্বনির জন্য এক-একটি পৃথক্ বর্ণ রচিত হইল। এইভাবে রচিত হইল বর্ণমালা [alphabet]। ভাষাতাত্ত্বিক-গণের মতে, অশোকের ব্রাহ্মীলিপি হইতেই কালক্রমে বাংলা লিপির উদ্ভব। বাগ্‌যন্ত্র ও নিঃশ্বাসবায়ুর সমবায়ে উচ্চারিত বর্ণকে ধ্বনি বলা হয়। আবার, ধ্বনির লিখিত

রূপকেই বলা হয় বর্ণ। ধ্বনি বা বর্ণই শব্দের [word] মূল উপকরণ। কাজেই, উচ্চারিত শব্দসমূহকে বিশ্লেষ করিলে ধ্বনি [sound] বা বর্ণ [letter] পাওয়া যায়।

কাজেই, ধ্বনিকে লিখিত আকারে ব্যক্ত করিবার জন্য যে চিহ্ন বা প্রতীক ব্যবহার করা হয়, তাহাকে বলা হয় **বর্ণ**। ধ্বনি হইল বর্ণের উচ্চারিত রূপ এবং বর্ণ ধ্বনির লিখিত রূপ। যেমন: 'আম' শব্দটি বিশ্লেষ করিলে 'আ' ও 'ম' দুইটি পৃথক্ ধ্বনি বা বর্ণ পাওয়া যায়। তেমনি, 'রবি' শব্দটি র্+অ+ব্+ই—এই চারটি ধ্বনি বা বর্ণের সমবায়ে গঠিত।

বাংলা লিপি মূল ব্রাহ্মীলিপি হইতে জাত। কিন্তু বাংলায় ব্রাহ্মীলিপির রূপ পরিবর্তিত হইয়াছে। অন্যদিকে, কোন কোন সংস্কৃত ধ্বনিও বাংলায় লুপ্ত হইয়াছে। যেমন: ৠ, ৯, ষ ও ণ। বাংলায় সংস্কৃত শব্দের সংখ্যা প্রায় পঞ্চান্ন হাজার। কাজেই, অনাবশ্যক হওয়া সত্ত্বেও ঐ শব্দগুলির জন্য বাংলায় বহু সংস্কৃত বর্ণকে স্বীকৃতি জানাইতে হইয়াছে। সেই হিসাবে বাংলা বর্ণমালায় [alphabet] আছে মোট একান্নটি বর্ণ।

বর্ণ ও অক্ষর

বর্ণ ও অক্ষর দুই স্বতন্ত্র বস্তু। ধ্বনি-নির্দেশক প্রতীক বা চিহ্নকে বলে **বর্ণ**। আর, একটি শব্দের যতখানি অংশ বাগ্‌যন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে একসঙ্গে সহজে উচ্চারিত হয়, তাহাকে বলা হয় **অক্ষর** [Syllable]। স্বরধ্বনি ছাড়া কোন ধ্বনি কিংবা কোন অক্ষর উচ্চারিত হইতে পারে না। কাজেই, অক্ষরের মধ্যে অন্তত একটি স্বরধ্বনি থাকা চাই। ব্যঞ্জনবর্ণ ছাড়া কেবল একটি স্বরবর্ণেই অক্ষর হইতে পারে। কিন্তু স্বরবর্ণ ছাড়া কেবল ব্যঞ্জনবর্ণে কোন অক্ষর হইতে পারে না। যেমন: 'রবি' শব্দের মধ্যে র্+অ+ব্+ই—এই চারিটি বর্ণ আছে; কিন্তু ইহাতে অক্ষর আছে মাত্র দুইটি: 'র' ও 'বি'। কিন্তু লক্ষণীয় যে, প্রতি অক্ষরেই স্বরবর্ণ আছে। অক্ষর দুই প্রকার: **স্বরান্ত** ও **ব্যঞ্জনান্ত** বা **হলন্ত**। যে অক্ষরের অন্তে স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয়, তাহাকে স্বরান্ত অক্ষর বলে। যেমন: থাকো—থা+কো; অক্ষর দুইটির প্রত্যেকটির অন্তে স্বরধ্বনি উচ্চারিত হইতেছে; কাজেই, ইহারা স্বরান্ত অক্ষর [open syllable]। আবার, যে অক্ষরের অন্তে স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয় না, তাহাকে ব্যঞ্জনান্ত বা হলন্ত অক্ষর বলে। যেমন: থাক্—থা+ক্। শেষ অক্ষরটির অন্তে স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয় নাই; কাজেই, ইহা ব্যঞ্জনান্ত বা হলন্ত অক্ষর [closed syllable]। এক-একটি অক্ষরের উচ্চারণ-কালকে বলা হয় **মাত্রা** [mora]।

স্বরবর্ণ

বর্ণ দুই প্রকার: **স্বরবর্ণ** ও **ব্যঞ্জনবর্ণ**।

যে সকল বর্ণ অন্য বর্ণের সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হইতে পারে, তাহাদের **স্বরবর্ণ** বলে। অর্থাৎ, উচ্চারণ-ব্যাপারে স্ব-নির্ভর বর্ণকে বলা হয় স্বরবর্ণ। বাংলায়

প্রচলিত বর্ণমালায় রহিয়াছে—অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, [ঌ], এ, ঐ, ও, ঔ—এই বারোটি স্বরবর্ণ। ইহাদের মধ্যে ঌ-র ব্যবহার বাংলায় নাই। কাজেই, বাংলায় ব্যবহৃত স্বরবর্ণের সংখ্যা এগারো। আবার, ঋ বাংলায় গৃহীত সংস্কৃত শব্দগুলিতেই শুধু ব্যবহৃত হয়। বাংলা উচ্চারণে ঋ-র স্থান লইয়াছে 'রি'।

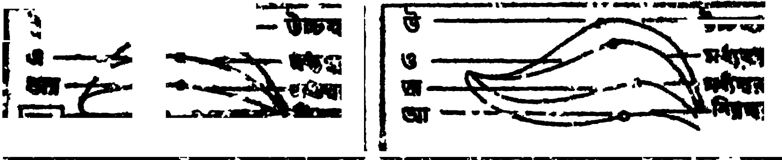
স্বরধ্বনি প্রধানতঃ দুই প্রকার : **হ্রস্বস্বর** ও **দীর্ঘস্বর**। যে সকল স্বরধ্বনি উচ্চারণ করিতে অল্প সময় লাগে, তাহাদিগকে বলে **হ্রস্বস্বর**। সংস্কৃতে হ্রস্বস্বর পাঁচটি : অ, ই, উ, ঋ, ঌ। আর, যে সকল স্বরধ্বনি উচ্চারণ করিতে বেশী সময় লাগে, তাহাদিগকে বলে **দীর্ঘস্বর**। সংস্কৃতে দীর্ঘস্বর আটটি : আ, ঈ, ঊ, ৠ, এ, ঐ, ও, ঔ। বাংলায় ধরা-বাঁধা দীর্ঘস্বর নাই। কিন্তু সংস্কৃতে আছে।

সংস্কৃতে স্বরধ্বনির উচ্চারণের হ্রস্বতা বা দীর্ঘতার উপরে শব্দের অর্থ নির্ভর করে। কিন্তু বাংলায় তাহা নির্ভর করে না। তবু বাংলায় স্বরধ্বনির হ্রস্বতা-দীর্ঘতা সম্পর্কে কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। সাধারণতঃ শব্দের অন্তর্গত অক্ষর [syllable]-সংখ্যার উপর স্বরধ্বনির হ্রস্বতা বা দীর্ঘতা নির্ভর করে। এক-অক্ষর-বিশিষ্ট শব্দের স্বরধ্বনির উচ্চারণ দীর্ঘ। যেমন : এক. 'জল' [জ+ল] শব্দের অ-কার দীর্ঘ, কিন্তু 'জলা' শব্দের অ-কার হ্রস্ব। আবার 'কাক' শব্দের আ-কার দীর্ঘ। কিন্তু 'কাকা' শব্দের আ-কার হ্রস্ব। দুই. 'দিন', 'দীন' ও 'দিন' [দান করুন]—এক-অক্ষর-বিশিষ্ট এই তিনটি শব্দ যখন এককভাবে উচ্চারিত হয়, তখন ইহাদের 'ই' বা 'ঈ' দীর্ঘ। কিন্তু অন্যপদে যুক্ত হইলে বা কোন বাক্যে প্রযুক্ত হইলে ইহাদের উচ্চারণ হয় হ্রস্ব। যেমন : 'দিন'-রাত, 'দীন'-দুনিয়ার মালিক, ওকে বলে 'দিন' তো। তিন. 'গুণ' [quality]-এর 'উ'-কার দীর্ঘ, কিন্তু 'গুণী'-র 'উ'-কার হ্রস্ব। তেমনি—'রূপ'-এর 'উ'-কার দীর্ঘ হইলেও 'রূপা'র 'উ'-কার হ্রস্ব। চার. 'এক' শব্দের উচ্চারণ 'অ্যাক' হওয়ায় এখানে 'এ' দীর্ঘ, কিন্তু 'একটি' শব্দের উচ্চারণ স্বাভাবিক হওয়ায় তাহাতে 'এ'-র উচ্চারণ হ্রস্ব। পাঁচ. 'লোক' শব্দের 'ও'-কার দীর্ঘ; 'লোকটি' শব্দের 'ও'-কার হ্রস্ব। বাংলা স্বরধ্বনির উচ্চারণের ধরা-বাঁধা নিয়ম না থাকায় 'ই' ও 'ঈ' এবং 'উ' ও 'ঊ'-র বানানের ক্ষেত্রে সংস্কৃত নিয়ম-মতে প্রায়ই বিভ্রাট ঘটে। যেমন : দিঘি—দীঘি—দিঘী ; চুন—চূন। [অশুদ্ধি সংশোধন পর্যায় দ্রষ্টব্য]

হ্রস্ব ও দীর্ঘস্বর ছাড়া আর এক প্রকার স্বরধ্বনি আছে, তাহা প্লুতস্বর। কান্নার সময় বা দূর হইতে কাহাকেও ডাকিতে গেলে ডাকের রেশ অনেকক্ষণ ধরিয়া টানিয়া রাখিতে হয়। যেমন : কেষ্টা—আ-আ ; হরে—এ-এ। দূর হইতে ডাকা, কান্না, গান ও আবৃত্তির সময় টানিয়া টানিয়া যে স্বরধ্বনিকে উচ্চারণ করিতে হয়, তাহাকে বলে **প্লুতস্বর**। যেমন : 'হে ভবেশ'—হে-এ-এ ভবেশ, 'এসো হে আর্য'—এসো হে আর্য-অ-অ।

স্বরধ্বনিকে অন্যদিক দিয়া দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : মৌলিক স্বরধ্বনি ও যৌগিক স্বরধ্বনি বা সন্ধ্যক্ষর। যে স্বরধ্বনিগুলিকে আর বিশ্লেষ করা যায় না, তাহাদের বলা হয় **মৌলিক স্বরধ্বনি**। সংস্কৃত ভাষায় স্বরধ্বনির সংখ্যা তেরো। তন্মধ্যে

বাংলা ভাষায় গৃহীত স্বরধ্বনির সংখ্যা এগারো। কিন্তু মৌলিক স্বরধ্বনি আছে মাত্র সাতটি। যেমন: অ, আ, ই, উ, এ, অ্যা, ও। আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক উচ্চারণে এক প্রকারের বিকৃত 'আ' ধ্বনির পরিচয় পাওয়া যায়। উচ্চারণে জিহ্বার অবস্থান অনুসারে ইহাদের দুই শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়। যেমন: সম্মুখস্থ স্বরধ্বনি ও পশ্চাদ্ভাগস্থ স্বরধ্বনি। ই, এ, অ্যা, আ—ইহাদের উচ্চারণে জিহ্বা সম্মুখদিকে প্রসারিত হয়, সেইজন্য ইহাদের বলা হয় **সম্মুখস্থ স্বরধ্বনি** বা **প্রসারিত স্বরধ্বনি** [Refracted vowels]। আবার, উ, ও, অ, অ—ইহাদের উচ্চারণে জিহ্বা পশ্চাদ্ভাগের দিকে আকৃষ্ট হয়, সেইজন্য ইহাদের নাম **পশ্চাদ্ভাগস্থ স্বরধ্বনি**। ইহাদের মধ্যে অ, উ, ও—এই তিনটি স্বরধ্বনি উচ্চারণ করিবার সময় ওষ্ঠদ্বয় কুঞ্চিত হয় বলিয়া ইহাদের বলা হয় **কুঞ্চিত স্বরধ্বনি** [Rounded vowels]। ই, উ—এই স্বরধ্বনি-যুগলের উচ্চারণে মুখবিবর সংবৃত বা সংকুচিত থাকে; তাই ইহাদের বলা হয় **সংবৃত স্বরধ্বনি** [Closed vowels]। অ্যা এবং আ-র উচ্চারণে মুখবিবর বিবৃত বা প্রসারিত হয়, সেজন্য ইহাদের বলা হয় **বিবৃত স্বরধ্বনি** [Open vowels]। সম্মুখস্থ স্বরধ্বনির মধ্যে ই উচ্চস্বর, এ, অ্যা মধ্যস্বর, আ নিম্নস্বর। পশ্চাদ্ভাগস্থ স্বরধ্বনির মধ্যে উ উচ্চস্বর; ও, অ মধ্যস্বর; আ নিম্নস্বর। নিম্নে চিত্রের সাহায্যে বাংলায় মৌলিক স্বরধ্বনিগুলির উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইল:



সম্মুখস্থ স্বরধ্বনি   **পশ্চাদ্ভাগস্থ স্বরধ্বনি**

অপর পক্ষে, ভিন্ন ভিন্ন স্বরের সাহায্যে গঠিত স্বরধ্বনিকে বলা হয় **যৌগিক স্বরধ্বনি** বা **মিশ্র স্বরধ্বনি** বা **সংযুক্তস্বর** বা **সন্ধিস্বর** বা **দ্বিস্বর ধ্বনি** বা **সন্ধ্যক্ষর** [Diphthong]। যেমন: 'ঐ' এবং 'ঔ'। বাংলায় এই দুইটি যৌগিক স্বরের উচ্চারণ যথাক্রমে ও+ই=ওই এবং ও+উ=ওউ। আচার্য সুনীতিকুমার বাংলার দুই স্বরধ্বনির সহাবস্থানে সর্ব-মোট পঁচিশটি যৌগিক স্বর বা সন্ধ্যক্ষরের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। যেমন: অয়্=বয়, ভয়, কয়, নয়; অ আ [অওয়া] =লওয়া; অও=হও, বও; আয়=যায়, খায়, দায়; আই=খাই, ভাই; আউ=ঢাউস, চাউল, বাউল; আও=দাও, নাও; অ্যাও=ম্যাও; ইয়া=নাইয়া, খাইয়া; ইএ, ইয়ে=বিয়ে, টিয়ে; ইউ=শিউলি, বিউলি; ইয়, ইও, ইয়ো=প্রিয়, দিও, নিয়ো; উয়া=ভুয়া, হালুয়া; উই=যুঁই, রুই, গরুই; উয়ে=ভুঁয়ে, রুঁয়ে; উও, উয়ো=কুয়ো, দুও; এয়, অ্যায়=নেয়, দেয় [ন্যায়]; এয়া=দেয়া [মেঘ], খেয়া, কেয়া; এই=যেই, সেই; এও=যেও, সেও, এসো; এউ=ঢেউ, কেউ, কেউ; ওয়=শোয়, দোয়; ওআ, ওয়া=মোয়া, সোয়া; ওউ, অউ=হউক, বউ; ওই=কই, মই, সই।

তাহা ছাড়া, তিন স্বরধ্বনির সহাবস্থান=গিয়েও; চার স্বরধ্বনির সহাবস্থান= আনাইয়াও; পাঁচ স্বরধ্বনির সহাবস্থান=ধোওয়াইয়া; ছয় স্বরধ্বনির সহাবস্থান= খাওয়াইয়াও ইত্যাদি দেখা যায়।

নাসিকার সাহায্যে উচ্চারণের ভিত্তিতে স্বরধ্বনিকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়: সানুনাসিক বা অনুনাসিক স্বরধ্বনি ও নিরনুনাসিক স্বরধ্বনি। নাসিকার সাহায্যে উচ্চার্য স্বরধ্বনিকে **সানুনাসিক** বা **অনুনাসিক স্বরধ্বনি** বলে। যেমন: আঁকা, বাঁকা, ফাঁকা, শাঁখা ইত্যাদি। নাসিকার সাহায্য ব্যতীত উচ্চার্য স্বরধ্বনিকে বলে **নিরনুনাসিক স্বরধ্বনি**। যেমন: শাখা, হাসা, কাদা ইত্যাদি। আবার, শব্দের মধ্যস্থিত কোন বিশেষ অক্ষরের উচ্চারণকালে নিঃশ্বাসবায়ু তীব্রতর বেগে প্রবাহিত হইলে তাহাকে বলা হয় **প্রস্বর, বল, শ্বাসাঘাত** বা **স্বরাঘাত** [Accent]। যেমন: 'এ **কী** করলেন প্রভু!' '**সেই** আমাদের বাংলা দেশ।' স্বরধ্বনির উচ্চারণের এই ঝোঁক বা প্রবলতাকে বলে **অক্ষর-পরিবৃত্তি**।

স্বরবর্ণের উচ্চারণ-স্থান

উচ্চারণ-স্থান অনুযায়ী বিভিন্ন স্বরবর্ণের বিশেষ পরিচয়:

অ, আ: ইহাদের উচ্চারণ-কালে জিহ্বা কণ্ঠের দিকে আকৃষ্ট হয়; সেইজন্য ইহারা **কণ্ঠ্য বর্ণ** [Gutturals]।

ই, ঈ: ইহাদের উচ্চারণ-কালে জিহ্বা তালুর দিকে আকৃষ্ট হয়; সেইজন্য ইহারা **তালব্য বর্ণ** [Palatals]।

উ, ঊ: ইহাদের উচ্চারণ-কালে জিহ্বা ওষ্ঠের দিকে আকৃষ্ট হয়; সেইজন্য ইহারা **ওষ্ঠ্য বর্ণ** [Labials]।

ঋ [ৠ]: ইহাদের উচ্চারণ-কালে জিহ্বা মূর্ধাকে স্পর্শ করে; সেইজন্য ইহারা **মূর্ধন্য বর্ণ** [Cerebrals]।

[ঌ]: ইহার উচ্চারণ-কালে জিহ্বা দন্তকে স্পর্শ করে; সেইজন্য ইহা **দন্ত্য বর্ণ** [Dentals]।

এ, ঐ: ইহারা কণ্ঠ ও তালুর সাহায্যে উচ্চারিত হয়, অর্থাৎ, ইহাদের উচ্চারণ-কালে জিহ্বা তালুর গা ঘেঁষিয়া কণ্ঠের দিকে আকৃষ্ট হয়, সেইজন্য ইহারা **কণ্ঠ্য-তালব্য বর্ণ**।

ও, ঔ: ইহারা কণ্ঠ ও ওষ্ঠের সাহায্যে উচ্চারিত হয়; অর্থাৎ, ইহাদের উচ্চারণ-কালে জিহ্বা ওষ্ঠের গা ঘেঁষিয়া কণ্ঠের দিকে আকৃষ্ট হয়, সেইজন্য ইহারা **কণ্ঠৌষ্ঠ্য বর্ণ**।

ব্যঞ্জনবর্ণ

যে সকল বর্ণ স্বরবর্ণের সাহায্য ছাড়া স্বয়ং উচ্চারিত হইতে পারে না, তাহাদের **ব্যঞ্জনবর্ণ** বলে। অর্থাৎ, উচ্চারণ-ব্যাপারে পর-নির্ভর বর্ণকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলা হয়। **বাংলায় ব্যঞ্জনবর্ণ সাঁইত্রিশটি।**

ক, খ, গ, ঘ, ঙ; চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ; ত, থ, দ, ধ, ন; প, ফ, ব,

ঙ, ম ; য, র, ল, [ব] ; শ, ষ, স, হ ; ড়, ঢ়, য় ; ং, ঃ। ইহাদের মধ্যে 'অন্তঃস্থ-ব'-এর ব্যবহার বাংলায় নাই ; তাই ইহাকে অতিরিক্ত হিসাবে ধরা হয় না।

উচ্চারণ-রীতি অনুসারে বিভিন্ন ব্যঞ্জনবর্ণের বিশেষ বিশেষ পরিচয় :

স্পর্শবর্ণ [Stops] : বাংলা বর্ণমালার ক্ হইতে ম্ পর্যন্ত পঁচিশটি ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণের সময় জিহ্বার অগ্রভাগ, মধ্যভাগ বা মূলভাগ মুখের ভিতরের বিশেষ বিশেষ অংশকে স্পর্শ করে কিংবা ঠোঁটে ঠোঁটে স্পর্শ হয় বলিয়া ইহাদের **স্পর্শবর্ণ** বলা হয়। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের মতে, এইগুলির উচ্চারণ-কালে "কণ্ঠ-তন্ত্রী কাঁপাইয়া কণ্ঠনালী হইতে বায়ু মুখ-কোটরে আসিতেছে, এমন সময়ে ক্ষণেকের মত জিহ্বার গোড়াকে উপরে তুলিয়া কণ্ঠের দুয়ার আটকাইয়া দিলাম, আর ধ্বনি বাহির হইল 'ক' ; জিহ্বামূলের স্পর্শকালে উহার উৎপত্তি ; কাজেই, উহা জিহ্বামূলীয় স্পর্শবর্ণ।"

স্পর্শবর্ণগুলিকে আবার পাঁচটি করিয়া পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়। এই ভাগগুলিকে বলা হয় **বর্গ**। বর্গের আদ্যক্ষর দিয়া বর্গের নামকরণ হয়। যেমন, ক-বর্গ—ক, খ, গ, ঘ, ঙ। চ-বর্গ—চ, ছ, জ, ঝ, ঞ। ট-বর্গ—ট, ঠ, ড, ঢ, ণ। ত-বর্গ—ত, থ, দ, ধ, ন। প-বর্গ—প, ফ, ব, ভ, ম।

উষ্মবর্ণ [Spirants] : শ, ষ, স ও হ—এই বর্ণগুলিকে উচ্চারণ করিবার সময় নিঃশ্বাসবায়ুকে শিস্‌ধ্বনির [sibilant] মতো প্রবাহিত করিতে হয় বলিয়া ইহাদিগকে **উষ্মবর্ণ** বলা হয়। অর্থাৎ, 'শ্বাসবায়ুর প্রাধান্য-যুক্ত বর্ণ চতুষ্টয়'কে উষ্মবর্ণ বলে।

অন্তঃস্থ বর্ণ : স্পর্শবর্ণ ও উষ্মবর্ণের অন্তর্বর্তী য, র, ল, ব—এই বর্ণ-চতুষ্টয়কে **অন্তঃস্থ বর্ণ** বলে। ইহাদের মধ্যে 'য' ও 'ব'-কে **অর্ধস্বর** [Semi-vowels] এবং 'র' ও 'ল'-কে **তরল স্বর** [Liquids] বলা হইয়া থাকে।

অর্ধ-ব্যঞ্জন [Sonant] : ন, ম, র ও ল—ইহারা স্বরধ্বনির মতো একা অথবা ব্যঞ্জনধ্বনির সহিত যুক্ত হইয়া অক্ষর [syllable] গঠন করিতে পারে। আবার, ইহারা এককভাবে ব্যঞ্জনধ্বনির মতো এবং ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে যুক্তভাবে স্বরধ্বনির মতো আচরণ করে বলিয়া ইহাদের **অর্ধ-ব্যঞ্জন** বলা হয়।

অনুনাসিক বর্ণ [Nasals] : বর্গের পঞ্চম বর্ণের বা অন্তিম বর্ণের [অর্থাৎ ঙ, ঞ, ণ, ন, ম] এবং অনুস্বারের [ং] উচ্চারণ-কালে নিঃশ্বাসবায়ু আংশিকভাবে নাসিকার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয় বলিয়া ইহাদের **অনুনাসিক বর্ণ** বা **নাসিক্য** বর্ণ বলা হয়।

মহাপ্রাণ বর্ণ [Aspirate] : কণ্ঠনালীর পেশী আকুঞ্চিত করিয়া অতিরিক্ত বাধা সৃষ্টি করিয়া বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণকে উচ্চারণ করা হয় বলিয়া ইহাদের **মহাপ্রাণ বর্ণ** বলা হয়। 'প্রাণ' কথাটির অর্থ 'নিঃশ্বাস' ; উচ্চারণ-কালে 'হ' জাতীয় ধ্বনিতেই তাহার প্রকাশ। যেমন : ক্+হ=খ, গ্+হ=ঘ, চ্+হ=ছ, জ্+হ=ঝ, ট্+হ=ঠ, ড্+হ=ঢ, ত্+হ=থ, দ্+হ=ধ, প্+হ=ফ, ব্+হ=ভ।

অল্পপ্রাণ বর্ণ [Unaspirated] : বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণের উচ্চারণে 'হ' জাতীয় ধ্বনির আকারে নিঃশ্বাস বা প্রাণ যুক্ত হয় না বলিয়া তাহাদের **অল্পপ্রাণ বর্ণ** বলে। যেমন : ক, গ ; চ, জ ; ট, ড ; ত, দ ; প, ব।

ইহাদের মধ্যে চ [ক্+শ] ও জ [গ্+জ] উচ্চারণের শুরুতে স্পর্শবর্ণের মতো এবং শেষে উষ্মবর্ণের মতো উচ্চারিত হয় ; সেইজন্য ইহাদের **ঘৃষ্টধ্বনি** [Affricate] বলা হয়।

দুইটি ব্যঞ্জনধ্বনি একসঙ্গে উচ্চারিত হইয়া একটি ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ সম্পন্ন হইলে, তাহাকে **দ্বিব্যঞ্জন ধ্বনি** বলা হয়। যেমন : খ=ক্+হ, চ=ক্+শ। অর্থাৎ, মহাপ্রাণ ও ঘৃষ্টধ্বনি মাত্রই **দ্বিব্যঞ্জন ধ্বনি**।

অঘোষ বর্ণ [Unvoiced] : উচ্চারণে বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ মৃদু বা গাম্ভীর্যহীন বলিয়া ইহাদের **অঘোষ বর্ণ** বলা হয়। যেমন : ক, খ ; চ, ছ ; ট, ঠ ; ত, থ ; প, ফ।

ঘোষ বর্ণ [Voiced] : উচ্চারণে বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ গাম্ভীর্যযুক্ত বলিয়া ইহাদের **ঘোষ বর্ণ** বা **নাদ বর্ণ** বলা হয়। যেমন : গ, ঘ, ঙ ; জ, ঝ, ঞ ; ড, ঢ, ণ ; দ, ধ, ন ; ব, ভ, ম।

নিম্নে অঘোষ, ঘোষ, অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ বর্ণের শ্রেণীবদ্ধ তালিকা প্রদত্ত হইল :

	অঘোষ বর্ণ	ঘোষ বর্ণ
অল্পপ্রাণ	ক চ ট ত প	গ জ ড দ ব
মহাপ্রাণ বর্ণ	খ ছ ঠ থ ফ	ঘ ঝ ঢ ধ ভ
অনুনাসিক বর্ণ		ঙ ঞ ণ ন ম

অযোগবাহ বর্ণ : ং এবং ঃ—অন্য বর্ণের সহিত সংযোগ ব্যতীত ইহাদের 'বাহ' বা প্রয়োগ হয় না। সেইজন্য ইহারা **অযোগবাহ** বা **আশ্রয়স্থানভাগী** বর্ণ।

ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ-স্থান

সংস্কৃত বর্ণমালা অত্যন্ত বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে গঠিত। বাংলা বর্ণমালা উত্তরাধিকার-সূত্রে সংস্কৃত বর্ণমালার সেই বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে। মানুষের বাগ্‌যন্ত্র অনুক্রমিকভাবে কণ্ঠ, তালু, মূর্ধা, দন্ত ও ওষ্ঠ লইয়া গঠিত। নিঃশ্বাসবায়ু প্রথমে কণ্ঠদেশে, পরে তালুদেশে, তারপর মূর্ধাদেশে, তারও পরে দন্ত-পঙ্‌ক্তিতে এবং অবশেষে ওষ্ঠদেশে প্রহৃত হইয়া নির্গত হইয়া যায়। বাংলা বর্ণমালাও ঠিক পারম্পর্য রক্ষা করিয়া সংগঠিত।

ক-বর্গ : ক খ গ ঘ ঙ : ইহাদের উচ্চারণ-কালে জিহ্বামূল ও তালুর কোমল অংশের সাহায্যে অবরোধ সৃষ্টির ফলে নিঃশ্বাসবায়ু কণ্ঠদেশে প্রহৃত হয়। সেইজন্য ইহাদের **কণ্ঠ্য বর্ণ** [Gutturals] বলা হয়। ইহাদের জিহ্বামূলের ভূমিকা প্রধান বলিয়া আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ইহাদের **জিহ্বামূলীয় স্পর্শবর্ণ** নামেও অভিহিত করিয়াছেন।

চ-বর্গ : চ ছ জ ঝ ঞ : ইহাদের উচ্চারণ-কালে জিহ্বার মধ্যভাগ তালুর কঠিন

অংশকে স্পর্শ করে এবং ইহাদের উচ্চারণে তালুর ভূমিকা প্রধান বলিয়া ইহাদের **তালব্য বর্ণ** [Palatals] বলা হয়।

ট-বর্গঃ ট ঠ ড ঢ ণঃ ইহাদের উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগ উল্টাইয়া মূর্ধা [তালুর সামনের খাঁজ-কাটা অংশ] স্পর্শ করে এবং তাহাতে মূর্ধার ভূমিকা প্রধান বলিয়া ইহাদের **মূর্ধন্য বর্ণ** [Cerebrals] বলা হয়। ইহাদের **প্রতিবেষ্টিত বর্ণ**ও বলা হয়।

ত-বর্গঃ ত থ দ ধ নঃ ইহাদের উচ্চারণ-কালে জিহ্বার অগ্রভাগ উপরের দাঁতের গোড়ায় ঠোক্কর খায় এবং ইহাতে দাঁতের ভূমিকা প্রধান বলিয়া ইহাদের **দন্ত্যবর্ণ** [Dentals] বলা হয়।

প-বর্গঃ প ফ ব ভ মঃ "দুই ঠোঁট পরস্পর স্পর্শ করিয়া তাহার মধ্য দিয়া জোরে বাতাস ছাড়িয়া দিলাম, অমনি ধ্বনি জন্মিল 'প'।"—আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর। ইহাদের উচ্চারণ-কালে উপরের ওষ্ঠ নিম্নের অধরকে স্পর্শ করে এবং ইহাতে ওষ্ঠের ভূমিকা প্রধান বলিয়া ইহাদের **ওষ্ঠ্যবর্ণ** [Labials] বলা হয়।

ঙ, ঞ, ণ, ন, ম ঃ ইহাদের "উচ্চারণ-কালে মুখের মধ্যকার বাতাস কেবল মুখ দিয়া বাহির না হইয়া, মুখ ও নাক, উভয় পথ দিয়া বাহির হয়।" তাই ইহারা **অনুনাসিক বর্ণ** বা **নাসিক্য বর্ণ** [Nasals]। অনুস্বার এবং চন্দ্রবিন্দু [ँ]-ও অনুনাসিক বর্ণ বা নাসিক্য বর্ণ। কিন্তু উহারা স্বর-সংযোগ ভিন্ন উচ্চারিত হইতে পারে না।

শ, ষ, স, হ ঃ ইহাদের মধ্যে শ=**তালব্য বর্ণ**, ষ=**মূর্ধন্য বর্ণ**, স=**দন্ত্য বর্ণ** এবং হ=**কণ্ঠ্য বর্ণ**।

য, র, ল, ব ঃ ইহারা "না-স্বর, না-ব্যঞ্জন।" ইহাদের মধ্যে য=**তালব্য বর্ণ**, র, ল=**দন্তমূলীয় বর্ণ** এবং ব=**দন্তৌষ্ঠ্য বর্ণ**।

বাংলা বর্ণ-সমূহের উচ্চারণ-স্থান অনুসারে শ্রেণীগত পরিচয়

বর্ণ	উচ্চারণ-স্থান	উচ্চারণ-স্থান অনুযায়ী নাম
অ আ হ	কণ্ঠ	কণ্ঠ্য
ক খ গ ঘ ঙ	জিহ্বামূল	জিহ্বামূলীয়
ই ঈ চ ছ জ ঝ ঞ য শ	তালু	তালব্য
ঋ ট ঠ ড ঢ ণ র ষ	মূর্ধা	মূর্ধন্য
ত থ দ ধ ন ল স	দন্ত	দন্ত্য
উ ঊ প ফ ব ভ ম	ওষ্ঠ	ওষ্ঠ্য
ব [অন্তঃস্থ]	দন্ত ও ওষ্ঠ	দন্তৌষ্ঠ্য
এ ঐ	কণ্ঠ ও তালু	কণ্ঠ-তালব্য
ও ঔ	কণ্ঠ ও ওষ্ঠ	কণ্ঠৌষ্ঠ্য

বাংলা বর্ণের উচ্চারণ-বৈচিত্র্য

বাংলায় উচ্চারণ-প্রকৃতি দ্বিবিধ : সহজ ও বিকৃত। অবিকৃতভাবে কোন বর্ণ উচ্চারিত হইলে তাহা **সহজ উচ্চারণ**। আর, বিকৃতভাবে কোন বর্ণ উচ্চারিত হইলে তাহা **বিকৃত উচ্চারণ**।

অ—বাংলায় অ-এর সহজ উচ্চারণ ফল, জল, অচল, রক্ত, দগ্ধ ইত্যাদি শব্দে লক্ষণীয়। কিন্তু অ-এর বিকৃত উচ্চারণ গুরু [গোরু], মণি [মোণি], বস্তু [বোস্তু], অমিয় [ওমিও] প্রভৃতি শব্দে দেখা যায়। কাজেই, বিকৃত-অ 'ও'-রূপে উচ্চারিত হয়। শব্দের অন্তস্থিত 'অ' আবার অনেক সময় উচ্চারিত হয় না। যেমন : বকুল [বকুল্], মুকুল [মুকুল্], জল [জল্], ফল [ফল্] ইত্যাদি। ইহাকে অ-এর **হসন্ত উচ্চারণ** বলা হয়।

আ—বাংলায় আ-এর সাধারণ উচ্চারণ হ্রস্ব। তবে একাক্ষর শব্দে [monosyllabic word] বা শব্দের প্রথমে আগত আ-এর উচ্চারণ দীর্ঘ হয়। যেমন : মা—, ভা—ত, গা—ন, আ—জীবন, আ—মরণ ইত্যাদি।

ই, ঈ—বাংলায় ই, ঈ-এর উচ্চারণ সাধারণতঃ হ্রস্ব। তবে 'কি' এবং 'কী'-এর উচ্চারণ যথাক্রমে হ্রস্ব ও দীর্ঘ। আর, হলন্ত [ব্যঞ্জনান্ত] অক্ষরের পূর্ববর্তী 'ই' ও 'ঈ'-র উচ্চারণ দীর্ঘ হইয়া থাকে। যেমন : দীপ [দী—প], তিল [তি—ল] ইত্যাদি। কিন্তু 'তিলক'-এর 'ই'-র উচ্চারণ হ্রস্ব, 'গুপী'-র 'ঈ'-ও হ্রস্ব।

উ, ঊ—বাংলায় এই দুই বর্ণের উচ্চারণও সাধারণতঃ হ্রস্ব। কিন্তু ঢ়-এর পূর্বে 'ঊ'-র উচ্চারণ দীর্ঘ। যেমন : গূ—ঢ়, মূ—ঢ়, রূ—ঢ় ইত্যাদি। আবার, হলন্ত অক্ষরের পূর্ববর্তী 'উ', 'ঊ' দীর্ঘ। যেমন : চূ—প, কূ—প ইত্যাদি।

ঋ—বাংলায় 'ঋ'-র উচ্চারণ 'রি'-এর মতো। যেমন : অমৃত [অম্রিত], মৃগয়া [ম্রিগয়া], মসৃণ [মস্রিণ] ইত্যাদি।

ৠ, ঌ—ইহাদের ব্যবহার বাংলায় নাই।

এ—এ-কারের সহজ উচ্চারণ কেশ, দেশ, বেশ, চেনা, শেখা, চেতন ইত্যাদি শব্দে পাওয়া যায়। এ-কারের বিকৃত উচ্চারণ 'অ্যা'র মতো হয়। যেমন : বেলা [সময়] [ব্যালা], বেটা [ব্যাটা], নেড়া [ন্যাড়া], ফেন [ফ্যান], খেলা [খ্যালা], দেখা [দ্যাখা], বেচা [ব্যাচা], এমন [অ্যামন], কেমন [ক্যামন], কেন [ক্যান] ইত্যাদি। 'এক' শব্দের 'এ'-র উচ্চারণ বিকৃত ; কিন্তু একটা, একাকী, একটি, একত্র, একতা ইত্যাদি শব্দের 'এ'-র উচ্চারণ সহজ।

ঐ—ইহা সন্ধ্যক্ষর। বাংলায় ইহার উচ্চারণ 'ওই'-র মতো। যেমন : ঐ দেখ, ঐখানে।

ও—হলন্ত অক্ষরের পূর্ববর্তী 'ও' দীর্ঘ। যেমন : রোগ। কিন্তু স্বরান্ত অক্ষরের পূর্ববর্তী 'ও' হ্রস্ব। যেমন : রোগা।

ঔ—ইহাও সন্ধ্যক্ষর। বাংলায় ইহার উচ্চারণ 'ওউ'-র মতো। যেমন : গৌরব, মৌমাছি, সৌরভ ইত্যাদি।

ঙ—'ঙ'-এর সহজ উচ্চারণ 'উ+অ'-এর মতো। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহা 'ং'-এর মতো উচ্চারিত হয়। ইংরেজি 'ring'-র 'ng'-র মতো। যেমন : রঙ, সঙ, ঢঙ, বাঙলা, ফড়িঙ ইত্যাদি। অনেক স্থলে ঙ্গ [ঙ+গ]-এর পরিবর্তে শুধু 'ঙ' ব্যবহৃত হয়। যেমন : বাঙ্গালী—বাঙালী।

ঞ—'ঞ'-এর সহজ উচ্চারণ 'ই+অঁ' বা 'ই+ওঁ'-র মতো। যেমন : মিঞা—মিআঁ ; মিঞ—মিয়েঁ। কিন্তু চ, ছ, জ, ঝ-এর পূর্বে অবস্থিত 'ঞ' দন্ত্য-'ন'-এর মতো উচ্চারিত হয়। যেমন : পঞ্চ—পন্‌চ, বাঞ্ছা—বান্‌ছা, গঞ্জ—গন্‌জ, ঝঞ্ঝাট—ঝন্‌ঝাট।

ণ, ন—বাংলায় এই দুই বর্ণের উচ্চারণে পার্থক্য নাই।

ম—শব্দের আদিতে অবস্থিত শ বা স-এর সহিত যুক্ত হইলে উহাদের সানুনাসিক উচ্চারণ হয়। যেমন : স্মরণ [শঁরণ], স্মৃতি [স্ঁতি], শ্মশান [শঁশান] ইত্যাদি। পদমধ্যবর্তী 'ম' 'স্'-এর সহিত যুক্ত হইলে দ্বিত্ব হইয়া সানুনাসিক হইয়া যায় : বিস্মরণ [বিশ্‌শঁরণ]। শব্দের শেষে ব্যঞ্জনের সহিত যুক্ত হইলে 'ম'-এর উচ্চারণ কোথাও কোথাও লুপ্ত হয় এবং ব্যঞ্জনটির দ্বিত্ব হয়। যেমন : লক্ষ্মী [লক্‌খী], লক্ষ্মণ [লক্‌খন], পদ্ম [পদ্‌দো], ভস্ম [ভশ্‌শ], ভীষ্ম [ভীশ্‌ শঁ], রশ্মি [রশ্‌শিঁ], আত্মা [আত্‌তাঁ], সূক্ষ্ম [শুক্‌খঁ] ইত্যাদি। অন্যত্র ম-এর উচ্চারণ স্বাভাবিক।

য—বাংলায় 'অন্তঃস্থ-য'-এর উচ্চারণ 'বর্গীয় জ'-র মতো। তবে 'য' ['্য']-ফলার 'য' উচ্চারিত না হইয়া পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণের সংযুক্ত বর্ণের দ্বিত্ব আনে। যেমন : ঐক্য [ঐক্‌ক], মুখ্য [মুখ্‌খ], আলোচ্য [আলোচ্‌চ], বদ্ধ্য [বদ্দি] ইত্যাদি।

র—বাংলায় 'র'-এর উচ্চারণ দন্তমূলীয়। ইহার উচ্চারণ-কালে কম্পমান জিহ্বাগ্র-ভাগ দন্তমূলে প্রহৃত হয়। সেইজন্য ইহাকে কম্পিত ব্যঞ্জন বা কম্পন-জাত ধ্বনি বলা হয়। ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বে 'র' থাকিলে রেফ্ হইয়া ব্যঞ্জনবর্ণের মস্তকে যায়, পরে থাকিলে ইহা র-ফলা হইয়া ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত যুক্ত হয়।

ল—ইহার উচ্চারণে জিহ্বার দুই পাশ দিয়া নিঃশ্বাসবায়ু নির্গত হয়। তাই ইহার নাম **পার্শ্বিক** [Lateral] **ধ্বনি**।

ব—'অন্তঃস্থ-ব'-এর উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগ কম-বেশী কম্পিত হয় ; তাই ইহাকে **কম্পিত** [Trilled] **ব্যঞ্জন** বলা হয়। বাংলায় 'অন্তঃস্থ-ব'-এর উচ্চারণ 'বর্গীয়-ব'-এর মতো। তবে শব্দের আদিতে অবস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত যুক্ত 'অন্তঃস্থ-ব' অনেক সময় 'উয়' বা 'ওয়'-র মতো উচ্চারিত হয়। যেমন : দ্বার—দুয়ার, স্বাদ—সোয়াদ ইত্যাদি। অবশ্য, শব্দের আদিতে ব্যঞ্জনের সহিত যুক্ত ব-ফলা উচ্চারিত হয় না। যেমন : স্বার্থ [শার্থ], স্বভাব [শভাব], স্বত্ব [শত্‌ত], স্বরাজ [শরাজ] ইত্যাদি। কিন্তু শব্দের মধ্যস্থিত বা অন্তস্থিত 'ব' পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব আনে। যেমন : বিদ্বান [বিদ্‌দান], ঈশ্বর [ঈশ্‌শর], ভাস্বর [ভাশ্‌শর], অদ্বয় [অদ্দয়], অন্বয় [অন্নয়], স্বত্ব [শত্‌ত] ইত্যাদি। একাধিক সংযুক্ত ব্যঞ্জনে 'ব'-এর উচ্চারণ লুপ্ত হয়। যেমন : সান্ত্বনা [শান্তনা], উচ্ছ্বাস [উচ্ছাশ], মহত্ত্ব [মহত্‌ত] ; কিন্তু প-বর্গের ক্ষেত্রে এই নিয়ম চলে না। যেমন : অম্বল, কম্বল, সম্বল ইত্যাদি।

শ, ষ, স—'শ' তালব্য এবং উষ্মবর্ণ, 'ষ' মূর্ধন্য এবং উষ্মবর্ণ, 'স' দন্ত্য এবং উষ্মবর্ণ, 'হ' কণ্ঠ্য এবং উষ্মবর্ণ। বাংলায় অবশ্য ষ ও স-এর উচ্চারণ 'শ'-এর মতো। যেমন: স্কুমার—শুকুমার, সুখ—শুখ, কৃষক—কৃশক ইত্যাদি। তবে ষাঁড়ের 'ষ'-এর উচ্চারণ মূর্ধন্য। আবার, ঋ-কার বা র-এর সহিত যুক্ত হইলে 'শ' 'স'-এর মতো উচ্চারিত হয়। যেমন: শৃগাল—স্গাল, মিশ্রণ—মিস্রণ, শ্রমিক—স্রমিক ইত্যাদি।

ড়, ঢ়—সংস্কৃতে ড় ঢ় ছিল না, ছিল ড ঢ। 'পীড়া' ও 'মূঢ়' যথাক্রমে 'পীডা' ও 'মূঢ' রূপে উচ্চারিত হইত। বাংলায় উভয়ের নিম্নে একটি করিয়া বিন্দু যোগ করিয়া লওয়া হইয়াছে। কাজেই, ড় ও ঢ় বাংলায় নূতন। ইহারা উভয়েই স্পর্শবর্ণ। কিন্তু ড় অল্পপ্রাণ, ঢ় মহাপ্রাণ বর্ণ। ইহাদের উচ্চারণে জিহ্বার নিম্নাগ্রভাগ দিয়া আঘাত করিতে হয়। সেইজন্য ইহাদের **তাড়িত** [Flapped] **ব্যঞ্জন** বা **তাড়ন-জাত ধ্বনি** বলা হয়।

ং, ঃ, ँ—স্বরের অন্তে বা পশ্চাতে বসে বলিয়া অনুস্বার নাম। ং এবং ঃ কোন বর্ণের সহিত যুক্ত না হইলে প্রযুক্ত হয় না, তাই ইহাদের অযোগবাহ বর্ণ বলা হয়। ঙ, ঞ, ণ, ন ও ম-এর অপভ্রংশে চন্দ্রবিন্দুর উৎপত্তি। যেমন: শঙ্খ>শাঁখ, সন্ধ্যা >সঞঝা>সাঁঝ, কণ্টক>কাঁটা, দন্ত>দাঁত, স্মরণ>সঁরণ।

বাংলা যুক্তাক্ষরের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য

ক্ষ—এই সংযুক্ত বর্ণের সংস্কৃত উচ্চারণ 'ক্+ষ'। কিন্তু বাংলায় ইহার উচ্চারণ 'ক্+খ'-এর মতো। যেমন: রক্ষা—রক্খা, পক্ষী—পক্খী, শিক্ষা—শিক্খা ইত্যাদি।

জ্ঞ—বাংলায় এই সংযুক্ত বর্ণের উচ্চারণ গ্+গঁ-র মতো। যেমন: যজ্ঞ—যগ্গঁ, বিজ্ঞ—বিগ্গঁ, প্রাজ্ঞ—প্রাগ্গঁ ইত্যাদি।

হ্ন, হ্ন, হ্ম, হ্ল, হ্ব—এই সংযুক্ত বর্ণগুলির উচ্চারণে 'হ' সর্বদাই পরে উচ্চারিত হয়। যেমন: অপরাহ্ণ—অপরান্হ, চিহ্ন—চিন্হ, ব্রাহ্মণ—ব্রাম্হণ, কহ্লার—কল্হার, আহ্বান—আওহান ইত্যাদি।

একই বর্ণের বিভিন্ন ধ্বনি

বাংলায় অ, এ, ঞ, শ, ষ ও স—এই বর্ণগুলির বিভিন্ন প্রকার উচ্চারণ হয়। যেমন:

অ—বাংলায় 'অ'-এর সহজ উচ্চারণ ইংরেজি 'ball' শব্দের 'a'-র মতো। যেমন: অশনি, অবনী, অরণ্য, জনম, মরণ, বসন, অঙ্ক ও বঙ্ক ইত্যাদি। তাছাড়া, ১. 'নঞ্-' অব্যয়জাত 'অ'-এর উচ্চারণ সহজ। যেমন: অচল, অনন্ত, অসীম, অপূর্ণ, অসময়, অমঙ্গল, অসতর্ক ইত্যাদি। ২. সহিত অর্থের 'স'-এর 'অ'-এর উচ্চারণ সহজ। যেমন: সপরিবারে, সহিত, সশরীরে, সজ্ঞানে, সস্ত্রীক, সবিনয় ও সদল ইত্যাদি। ৩. পরে অ বা আ থাকিলে পূর্ববর্তী 'অ'-এর উচ্চারণ সহজ। যেমন: চলন, বলন, সন্তরণ, দর্শন, বর্ষা, বর্শা, অক্কা, অজা ও অজ্ঞতা ইত্যাদি। ৪. দুই-অক্ষর শব্দের 'অ'-এর উচ্চারণ সহজ। যেমন: কর, খল, ঘট, জল, ফল, বট, মঠ ও দল ইত্যাদি। ৫. ধ্বন্যাত্মক শব্দের আদিস্থিত 'অ'-এর উচ্চারণ প্রায়শঃ সহজ। যেমন: কল্কল্, খল্খল্, গল্গল্, টল্টল্, হন্হন্, বন্বন্ ইত্যাদি।

* বাংলায় 'অ'-এর বিকৃত উচ্চারণ সাধারণতঃ 'ও'-এর মতো। যেমন : ১. ই-কারান্ত বা উ-কারান্ত ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্ববর্তী 'অ'-এর উচ্চারণ 'ও' হয় : রবি [রোবি], মতি [মোতি], মণি [মোণি], অতি [ওতি], বহু [বোহু], অমিয় [ওমিও], অমুক [ওমুক], অরিন্দম [ওরিন্দম], অরুণ [ওরুণ], করুণ [কোরুণ], চলিবে [চোলিবে] ইত্যাদি। ২. অপিনিহিতিজাত 'ই' ও 'উ' অভিশ্রুতি লুপ্ত হইলে 'অ'-এর উচ্চারণ 'ও' হয় : বইল্যা>ব'লে [বোলে], কইর‍্যা>ক'রে [কোরে], মইর‍্যা>ম'রে [মোরে], ধইর‍্যা>ধ'রে [ধোরে], গইল্যা>গ'লে [গোলে], দইল্যা>দ'লে [দোলে] ইত্যাদি। ৩. য-ফলা পরে থাকিলে পূর্ববর্তী 'অ'-এর ধ্বনি 'ও' হইয়া যায় : কল্য [কোল্য], দ্রব্য [দ্রোব্য], পথ্য [পোথ্য], গদ্য [গোদ্য], ভব্য [ভোব্য], সভ্য [সোভ্য], সহ্য [সোহ্য] ইত্যাদি।

৪. ঋ-কার-যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী 'অ'-এর ধ্বনি 'ও' হয় : মসৃণ [মোসৃণ], বক্তৃতা [বোক্তৃতা], কর্তৃক [কোর্তৃক], ভর্তৃকা [ভোর্তৃকা], সম্বৃত [সোম্বৃত], সমৃদ্ধি [সোমৃদ্ধি], সম্পৃক্ত [সোম্পৃক্ত] ইত্যাদি। কিন্তু ব্যতিক্রম : যকৃৎ। ৫. শব্দের আদিতে র-ফলার সহিত যুক্ত 'অ'-এর ধ্বনি 'ও' হইয়া থাকে : শ্রম [শ্রোম], ভ্রম [ভ্রোম], ভ্রমর [ভ্রোমর], ভ্রমণ [ভ্রোমণ], শ্রবণ [শ্রোবণ], গ্রহ [গ্রোহ] ইত্যাদি। ৬. ক্ষ এবং জ্ঞ-এর পূর্ববর্তী 'অ'-এর ধ্বনি 'ও' হইয়া যায় : লক্ষ [লোক্ষ], যক্ষ [যোক্ষ], রক্ষ [রোক্ষ], অক্ষর [ওক্ষর], যজ্ঞ [যোজ্ঞ], দৈবজ্ঞ [দৈবোজ্ঞ] ইত্যাদি। ৭. প্র-উপসর্গের 'অ'-এর ধ্বনি 'ও' হয় : প্রভাত [প্রোভাত], প্রগতি [প্রোগতি], প্রহার [প্রোহার], প্রকৃতি [প্রোকৃতি], প্রসঙ্গ [প্রোসঙ্গ], প্রণাম [প্রোণাম], প্রণতি [প্রোণতি], প্রতিমা [প্রোতিমা], প্রকাশ [প্রোকাশ] ইত্যাদি। ৮. একাক্ষর শব্দের অন্ত্য ন-এর পূর্ববর্তী 'অ' 'ও' হয় : মন [মোন], বন [বোন], জন [জোন], ধন [ধোন] ইত্যাদি। ৯. চলিত ভাষায় দুই অক্ষরের বিশেষণের অন্ত্য 'অ' 'ও' হয় : ছোটো, বড়ো, কতো, যতো, মতো, খাটো, কোনো, মেজো, সেজো, কালো, ভালো ইত্যাদি। ১০. তিন-অক্ষর শব্দের মধ্য-'অ' 'ও' হয় : কমল [কমোল], স্বপন [স্বপোন], বপন [বপোন], এমন [এমোন], ধমনী [ধমোনী], অশনি [অশোনি] ইত্যাদি। ১১. সাধু বা চলিত ভাষায় ক্রিয়াপদের অন্ত্য 'অ' 'ও'-এর ধ্বনি প্রাপ্ত হয় : করিতেছিল [করিতেছিলো], বলেছিল [বলেছিলো], আসিত [আসিতো], ডাকত [ডাকতো], বলল [বললো], যাব [যাবো], দেখব [দেখবো], চল [চলো], ইত্যাদি।

তাছাড়া, 'অ'-এর বিভিন্ন ধ্বনি লক্ষণীয় : ১. 'অ'=[যা]। যেমন : ব্যবসায় ব্যাবসায়], ব্যবহার [ব্যাবহার], ব্যয় [ব্যায়], ব্যত্যয় [ব্যাত্যয়], ব্যথা [ব্যাথা], ব্যক্ত [ব্যাক্ত], ব্যর্থ [ব্যার্থ], ব্যসন [ব্যাসন] ইত্যাদি। ২. 'অ'='এ'। যেমন : ব্যক্তি [বেক্তি], ব্যথিত [বেথিত], ব্যতিক্রম [বেতিক্রম], ব্যতীত [বেতীত], ব্যতিহার [বেতিহার], ব্যষ্টি [বেষ্টি], ব্যগ্নিত [বেগ্নিত] ইত্যাদি।

কতকগুলি ক্ষেত্রে আবার 'অ'-এর উচ্চারণ বর্জিত; কতকগুলি ক্ষেত্রে অবর্জিত।

আধুনিক বাংলা উচ্চারণে শব্দান্তের 'অ'-এর উচ্চারণ বর্জন করাই রীতি। যেমন: গোকুল, অতুল, বলুন, আসুন, আকাশ, বাতাস, জল, কালিদাস ইত্যাদি। কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগের উচ্চারণে বাংলা শব্দান্তের 'অ' অবর্জিত ছিল।

তবু কতকগুলি ক্ষেত্রে শব্দান্তের 'অ' উচ্চারিত হয়। যেমন: ১. শব্দান্তের 'হ্' বা যুক্তাক্ষরের ক্ষেত্রে—দেহ, বিদ্রোহ, আরোহ, অবরোহ, অন্ধ, বন্ধ, খণ্ড, সপ্ত, খড়্গ ইত্যাদি। ২. 'ক্ত' বা 'য' প্রত্যয়ান্ত বিশেষণে—নত, রত, বিরত, প্রণত, দেয়, হেয়, বিধেয়, শ্রেয়, প্রেয় ইত্যাদি। ৩. বিশেষণের 'তর' 'তম' প্রত্যয়ে—উচ্চতর, উচ্চতম, মহত্তর, মহত্তম, ক্ষুদ্রতর, ক্ষুদ্রতম, বৃহত্তর, বৃহত্তম ইত্যাদি। ৪. পদের অন্তে ঢ় থাকিলে—গাঢ়, দৃঢ়, নিগূঢ় ইত্যাদি। ৫. অন্ত্য বর্ণের পূর্বে ং বা ঃ থাকিলে—কংস, ধ্বংস, নৃশংস, বংশ, অবতংস, হংস, দুঃখ, দুঃস্থ, নিঃস্ব ইত্যাদি। ৬. দুই-অক্ষর-বিশিষ্ট শব্দের প্রথম অক্ষরে ঋ, ঐ বা ঔ-কার থাকিলে—কৃশ, বৃষ, তৃণ, ঘৃত, বৃত, তৈল, দ্বৈত, শৈল, বৈর, তৌল, মৌন, গৌণ, ধৌত ইত্যাদি। ৭. এগার হইতে আঠার পর্যন্ত সংখ্যাগুলিতে পদান্তের 'অ' উচ্চারিত হয়। ৮. ধ্বন্যাত্মক শব্দের 'অ' প্রত্যয় যুক্ত হইলে 'ও' উচ্চারিত হয়—ছলছল [ছলোছলো], কাঁদকাঁদ [কাঁদোকাঁদো], ঢলঢল [ঢলোঢলো] ইত্যাদি। ৯ অনুজ্ঞায় পদের শেষে 'ও' উচ্চারিত হয়—চল, বল, কর, ধর, দেখ ইত্যাদি। তুচ্ছার্থে বা সম্ভ্রমার্থে 'অ' বা 'ও' উচ্চারিত হয় না।

এ—বাংলায় 'এ'-র উচ্চারণ দুই প্রকার: সহজ ও বিকৃত। 'এ'-র সহজ উচ্চারণে ইংরেজি 'pet'-এর 'e'-র মতো উচ্চারণ: আর, বিকৃত উচ্চারণে ইংরেজি 'pat'-এর 'a'-র মতো উচ্চারণ। 'এ'-র সহজ উচ্চারণ—সে, কে, দেশ, বেশ, কেশ, শেষ, তেজ ইত্যাদি। 'এ'-র বিকৃত উচ্চারণ—খেলা [খ্যালা], দেখা [দ্যাখা], বেচা [ব্যাচা], বেটা [ব্যাটা], পেঁচা [প্যাঁচা], লেজ [ল্যাজ] ইত্যাদি।

'এ'-র সহজ উচ্চারণ: ১. ই ঈ বা উ ঊ-র পূর্ববর্তী 'এ'—দেবী, দেশী, বেশী, ভেরী, বেটি, কেলি, খেলি, পেটুক, সেতু, কেতু, লেবু, ডেঙ্গু ইত্যাদি। ২. শব্দান্তের 'এ'—জলে, স্থলে, মনে, প্রাণে, চোখে, কানে, শেষে ইত্যাদি। ৩. তৎসম শব্দের আদিতে 'এ'—মেঘ, বেগ, প্রেম, হেম, বেদ, ভেদ, ভেক, মেদ, মেদিনী ইত্যাদি। ৪. আ-কারান্ত দুই-অক্ষর ভাববাচক বিশেষ্যের মূল ধাতু 'ই'-যুক্ত হইলে—লিখ্ >লেখা, শিখ্ >শেখা, মিল্ >মেলা, কিন্ >কেনা ইত্যাদি। ৫. একাক্ষর সর্বনাম পদের 'এ'—এ, কে, সে, যে। ৬. 'হ' কিংবা যুক্তাক্ষরের পূর্ববর্তী 'এ' শব্দের আদিতে অবস্থিত হইলে—কেহ, দেহ, গেহ, স্নেহ, লেহন, কেন্দ্র, কেষ্ট, সেদ্ধ ইত্যাদি।

'এ'-র বিকৃত উচ্চারণ: ১. আ-কারান্ত একাক্ষর শব্দের আদিতে 'এ'—একা [অ্যাকা], জেঠা [জ্যাঠা], বেটা [ব্যাটা], পেঁচা [প্যাঁচা], নেকা [ন্যাকা], বেলা [ব্যালা—সময় বুঝাইতে] ইত্যাদি। ২. একাক্ষর তদ্ভব শব্দের শেষে ক, খ, ঙ, চ, ন, প, ম থাকিলে—এক [অ্যাক্], দেখা [দ্যাখা], বেঙ [ব্যাঙ্], ঠেঙ [ঠ্যাঙ্],

পেঁচ [প্যাঁচ], যেন [য্যান], দেয় [ছ্যায়] ইত্যাদি। আ-কারান্ত ভাববাচক বিশেষ্যের আদিস্থিত এ—বেচা [ব্যাচা], দেখা [ছ্যাখা], ঠেলা [ঠ্যালা], হেলা [হ্যালা], ফেলা [ফ্যালা] ইত্যাদি। ৩. শব্দের আদিতে সানুনাসিক এ—খেঁদা [খ্যাঁদা], ছেঁদা [ছ্যাঁদা], নেবা [ন্যাবা] ইত্যাদি।

ঞ—'ঞ'-র উচ্চারণ দুই প্রকারের: 'ই+অঁ' এবং 'ন'। ১. 'ই+অঁ' উচ্চারণ—মিঞা, যাচ্ঞা। ২. ন উচ্চারণ—অঞ্জন [অন্জন], সঞ্চয় [সন্চয়], বঞ্চনা [বন্চনা], বাঞ্ছা [বান্ছা] ইত্যাদি।

শ, ষ, স—বাংলায় শ, ষ ও স-এর উচ্চারণ—'শ' [sh]-এর মতো একই রকম। যেমন: শেষ [শেশ], শোষণ [শোশণ], শাঁস [শাঁশ], শাসন [সাশন]; কিন্তু ঋ, র, ল পরে থাকিলে 'স'-এর উচ্চারণ আসে: শৃগাল [স্গাল], শ্রম [স্রম], শ্রমিক [স্রমিক], শ্রবণ [স্রবণ], প্রশ্ন [প্রস্ন], সৃজন, বৃষ্টি [বৃস্টি] ইত্যাদি।

বিভিন্ন বর্ণের একই ধ্বনি

বাংলায় ই ও ঈ, উ ও ঊ, ঙ ও ং, জ ও য, ণ ও ন এবং বর্গীয়-ব ও অন্তঃস্থ-ব—ইহাদের উচ্চারণ একই রকম।

ই ও ঈ—'ইতর' ও 'ঈগল' শব্দ দুইটিতে ই ও ঈ-র উচ্চারণে কোন পার্থক্য নাই। তবে 'কি' শব্দ জোর দিবার জন্য 'কী' ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

উ ও ঊ—'চুপ' ও 'কূপ' শব্দ দুইটিতে উ ও ঊ-র উচ্চারণে কোন পার্থক্য দেখা যায় না। তবে 'রূপা' শব্দের ঊ হ্রস্ব, রূপ শব্দের ঊ দীর্ঘ।

ঙ ও ং—ইহাদের উচ্চারণ একই রকম। ব্যাঙ [ব্যাং], রঙ [রং], সঙ [সং], ঢঙ [ঢং] ইত্যাদি।

জ ও য—বাংলায় ইহাদের উচ্চারণে কোন পার্থক্য নাই। যেমন: যাজন [জাজন], যজ্ঞ [জজ্ঞ], যাত্রা [জাত্রা] ইত্যাদি।

বর্গীয়-ব ও অন্তঃস্থ-ব—বাংলায় উভয়েরই উচ্চারণ 'b'-এর মতো। তবে অন্তঃস্থ-ব ব্যঞ্জনের সহিত যুক্ত হইলে উহা উচ্চারিত না হইয়া ব্যঞ্জনটি দ্বিত্ব হয়: বিশ্বাস [বিশ্শাস], অদ্বয় [অদ্দয়] ইত্যাদি।

ধ্বনি-বিলোপ

ধ্বনির সৃষ্টি বাগ্‌যন্ত্র হইতে। শক্ত উচ্চারণকে বাগ্‌যন্ত্র সব সময় সহজ করিয়া উচ্চারণ করিতে চায়। তাহাতে কখনও কখনও ধ্বনির বিলোপ ঘটে।

স্বরধ্বনির বিলোপ: উচ্চারণের সময় শব্দের অন্তর্গত কোন বর্ণের উপর অধিক পক্ষপাতহেতু বিশেষ জোর আরোপিত হইলে অনাদৃত কোন স্বরধ্বনি লুপ্ত হয়; তাহাকে **স্বরলোপ** বলে। যেমন: অলাবু>অলাউ>লাউ, অপিধান>পিধান, উদ্ধার>উধার>ধার, উডুম্বর>ডুমুর, অতসী>তিসি: এইগুলি আদিস্বর-লোপের দৃষ্টান্ত। অন্ত্যস্বর-লোপের দৃষ্টান্ত হইল: রাত্রি>রাতি>রাত>রাত্, হস্ত>হাত

>হাত্, ভক্ত>ভাত>ভাত্। মধ্যস্বর-লোপের দৃষ্টান্ত হইল: জানালা>জান্‌লা, বসতি>বস্তি, ভগিনী>ভগ্নী, নাতিনী>নাত্‌নী, নারিকেল>নারকেল। উচ্চারণ-জনিত মধ্যস্বর-লোপকে বলা হয় সম্প্রকর্ষ।

ব্যঞ্জনধ্বনি-বিলোপ বা বর্ণলোপ [Hapology]: পদের মধ্যস্থিত স্বরধ্বনিযুক্ত বা স্বরধ্বনিহীন কোন বর্ণ যদি লুপ্ত হয়, তাহাকে বলা হয় **বর্ণলোপ**। যেমন: ফাল্গুন>ফাগুন, আলাহিদা>আলাদা, গোষ্ঠ>গোঠ, নবধর>নধর, অশ্বত্থ>অশথ, স্থান>থান, মজ্‌দুর>মজুর, বড়দিদি>বড়দি, বউদিদি>বউদি, ভাইশ্বশুর>ভাশুর, স্ফটিক>ফটিক, আলোক>আলো, কার্পাস>কাপাস।

বাংলায় সন্ধির কারণে অথবা উচ্চারণে সরলীকরণের জন্য অনেক সময় ধ্বনির লোপ হয়। যেমন: কাঁচা+কলা=কাঁচকলা, মিশি+কালো=মিশকালো, জগৎ+জন=জগজন, জগৎ+বন্ধু=জগবন্ধু ইত্যাদি। আধুনিক বাংলায় পদান্ত অ-কার উচ্চারিত হয় না। যেমন: হাত্, রাত্, মুখ্, চোখ্, কান্, কঠিন্, কোমল্, বলুন্, করুক্, ইত্যাদি।

শব্দ-মধ্যবর্তী র-কার ও হ-কার লোপ: বাংলায় উচ্চারণ-কালে বহু শব্দ-মধ্যবর্তী র-কার ও হ-কার লুপ্ত হয়। যেমন: র-কার লোপ: কর্ম>কম্ম, ধর্ম>ধম্ম, করল>কল্ল, ধরল>ধল্ল, তেপ্রান্তর>তেপান্তর, শৃগাল>শিয়াল। [এইগুলি সমীকরণজনিত পরিবর্তনও বটে।] কিন্তু কল্ল, চল্ল, বল্ল ইত্যাদি লেখা উচিত নয়, ওগুলি যথাক্রমে করল, চলল, বলল—এইভাবে লেখা উচিত। হ-কার লোপ: ফলাহার>ফলার, বাহির>বা'র [দরিয়া], চাহে>চায়, গাহে>গায়, শাহ্>শা, মহাশয়>মশায়, তাহার>তার, লোহা>লোয়া, বেহাই>বেয়াই।

বিদেশী শব্দের বাংলা বর্ণীকরণ

বিদেশী ভাষা হইতে যে সকল শব্দ বাংলা ভাষায় গৃহীত হইয়াছে, তাহাদের বিদেশী শব্দ বলা হয়। বিদেশী ভাষাগুলির ধ্বনিসমূহ যেমন স্বতন্ত্র, তাহাদের রূপদানের জন্য তাহাদের বর্ণমালাও তেমনি স্বতন্ত্র। আবার, বাংলা ভাষার ধ্বনি ও তাহার বর্ণমালা তেমনি স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। তাই সমস্যা দেখা দেয় বিদেশী শব্দগুলির বাংলা ধ্বনিতে উচ্চারণে এবং বাংলা বর্ণে রূপায়ণে। বিদেশী শব্দসমূহকে বাংলা বর্ণে প্রকাশ করাকে বিদেশী শব্দের বাংলা বর্ণীকরণ বলা হয়।

বাংলায় প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বিদেশী শব্দ আছে। তাহার মধ্যে প্রায় আড়াই হাজারই আরবী-ফারসী শব্দ, চারশত তুর্কী শব্দ, আটশত ইংরেজি শব্দ, দেড়শত পর্তুগীজ ও ফরাসী শব্দ এবং অবশিষ্টগুলি অন্যান্য বিদেশী শব্দ। বহু অ-বাংলা ভারতীয় শব্দ ইহার মধ্যে পড়ে। তাহারাও বাংলা ভাষার বিদেশী বা আগন্তুক শব্দ।

কিন্তু যে সমস্যা আমাদের বিব্রত করে, তাহা হইল ইহাদের উচ্চারণের সমস্যা, উচ্চারণ-অনুযায়ী বাংলা হরফে লিখিবার সমস্যা তথা বাংলা বর্ণীকরণের সমস্যা। সোজা কথায়, তাহাই বিদেশী শব্দের বাংলা বানানের সমস্যা।

এই সমস্যার মনীষী-স্বীকৃত সহজ সমাধান হইল, উহাদের প্রকৃত উচ্চারণ এবং

বানান মূল ভাষায় যাহাই হউক, উহাদের বাংলা উচ্চারণের দিকে নজর রাখিয়া বাংলা হরফে লিখিত হইবে। তবে দীর্ঘদিন ধরিয়া উহাদের যে বানান চলিয়া আসিতেছে, সেই প্রচলিত বানানকে অস্বীকার করাও উচিত নয়।

স্মরণীয় যে, ইংরেজি 'o', 'f', 'v', 'w', 'z' ইত্যাদির প্রতিবর্ণ বাংলায় নাই। এসব ক্ষেত্রে ইহাদের উচ্চারণের কাছাকাছি বাংলা বর্ণ ব্যবহার করিয়া কাজ সারিয়া লইতে হয়। তবুও বিদেশী শব্দের বাংলা বানানের ক্ষেত্রে কতকগুলি নিয়ম মানিয়া চলা আবশ্যিক। যেমন:

অ আ—'All' শব্দটির উচ্চারণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 'অল' লেখাই উচিত। কিন্তু Allah শব্দটি 'আল্লা' লেখাই বাঞ্ছনীয়। কাজেই, 'A'-র বানান কোথায় 'অ' হইবে এবং কোথায় 'আ' হইবে, তাহা উচ্চারণের উপর নির্ভর করে।

্যা—য-ফলা+আ-কারকে রূপ দিবার মতো কোন একক বর্ণ বাংলায় নাই। অবশ্য বাংলা 'আ-'এর বিকৃত উচ্চারণ '্যা'-র মতো। কিন্তু বিদেশী শব্দে 'আ'-র বিকৃত উচ্চারণ অসমীচীন। বাংলা উচ্চারণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শুধু 'আ' অথবা 'অ্যা' ব্যবহার করিতে হইবে। যেমন: ট্রাম [tram], মাস্টার [master], হাসপাতাল [hospital], ডাক্তার [doctor], ফাস্ট [fast], ক্লাস [class], গ্লাস [glass], আপিস [office] ইত্যাদি। আবার, অ্যাসিড [acid], স্যার [sir], প্রিন্সিপ্যাল [principal], হাফ্‌ব্যাক [half-back], ব্যারিস্টার [barrister], ব্যাটস্‌ম্যান [batsman], ল্যাম্পপোস্ট [lamp-post] ইত্যাদি।

ই ঈ—মূল উচ্চারণে 'e', 'i', 'ea', 'ee', 'ei' ও 'ie'—ইহাদের উচ্চারণ যদি হ্রস্ব হয়, তবে বাংলায় হ্রস্ব-ই এবং যদি দীর্ঘ হয়, তবে দীর্ঘ-ঈ ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। যেমন: ইংরেজ [The English], ইংরেজি [English], ইণ্টারেস্ট [interest], ইন্সিওরেন্স [insurance], ইন্সপেক্টার [inspector], ইন্‌ফরমেশান [information], ইম্‌পসিবল্‌ [impossible] ইত্যাদি। আর, ঈস্ট [east], ঈগল [eagle], ঈজিচেয়ার [easychair], ঈজেল [easel] [বাংলায় অবশ্য 'ইজেল' বানানই প্রচলিত]—ইত্যাদি। 'y'-এর বাংলা উচ্চারণ কখনও কখনও 'ই' হয়। যেমন: পিরামিড [Pyramid]।

উ ঊ—মূল উচ্চারণ অনুযায়ী 'w', 'u,' 'oo'—ইহাদের ইংরেজি উচ্চারণ হ্রস্ব কিংবা দীর্ঘ হইলেও বাংলা বানানে উ হইবে। যেমন: উইলিয়াম [William], উইল [will], উইট [wit], উল [wool], উকিল, উজীর, ফুট, ফুল [full], বুট [boot], ফ্লুট [flute] ইত্যাদি। আবার, স্পুন [spoon]—কিন্তু ইংরেজিতে দীর্ঘ-উ উচ্চারিত হইলেও বাংলা উচ্চারণে হ্রস্ব-উ উচ্চারিত হয়; এবং বানানও হয় তদনুরূপ। যেমন: সেলুন [saloon], ফেস্টুন [festoon], বেলুন [balloon], বেবুন [baboon], লেগুন [lagoon] ইত্যাদি।

ঋ—বিদেশী শব্দে ঋ-কার বর্জনীয়। ঋ-কারের স্থানে রি বা র-ফলা+ই-কার ব্যবহৃত হওয়া উচিত। প্রেস্‌ক্রিপ্‌শান [Prescription—প্রেসকৃপ্‌শান অশুদ্ধ], ক্রিশ্‌মাস [Christmas—কৃশ্‌মাস অশুদ্ধ], যিশু খ্রীস্ট [Jesus Christ—যিশু খৃস্ট অশুদ্ধ], খ্রীস্টাব্দ [খৃস্টাব্দ অশুদ্ধ], ব্রিটেন [Britain—বৃটেন অশুদ্ধ], ব্রিটিশ [British—বৃটিশ অশুদ্ধ] ইত্যাদি।

এ—বাংলা উচ্চারণ-অনুসারে 'e', 'ai' এবং 'ae'-তে 'এ' প্রযুক্ত হয়।—যেমন: ফাউণ্টেনপেন [fountainpen], ট্রেন [train], চেন [chain], মেন [main], এনকোর [encore], পেঙ্গুইন [penguin], এনামেল [enamel], এস্‌প্লানেড [esplanade], এরোপ্লেন [aeroplane], এক্‌সপার্ট [expert] ইত্যাদি। কিন্তু pain-এর বানান 'পেইন' লেখা উচিত।

ও—W-স্থানে প্রচলিত রীতি-অনুসারে 'উ' বা 'ও' ব্যবহৃত হওয়া উচিত। যেমন: উইলসন [Wilson], উইলিয়াম [William], ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ [Wordsworth], সাব-ওয়ে [sub-way] ইত্যাদি।

ক খ—ইংরেজি 'c' ও 'k' বর্ণের স্থানে বাংলায় 'ক' হয়। যেমন: কংগ্রেস [Congress], কনস্টেবল [constable], কোম্পানী [company], আমেরিকা [America], কানাডা [Canada], কীটস্‌ [Keats], কিণ্ডারগার্টেন [kindergarten], কিমোনো [Kimono], কিলোমিটার [Kilometre] ইত্যাদি।

ইংরেজি kh স্থানে 'খ' হয়। যেমন: খরিফ [kharif], খলিফা [khalifa] ইত্যাদি।

গ ঘ—ইংরেজি 'g' বর্ণের স্থানে 'গ' এবং 'gh'-এর স্থানে 'ঘ' হয়। যেমন: গ্যারান্টি [guarantee], গার্ড [guard], গার্ডেন [garden], গ্রামার [grammar], গল [Gaul], গ্র্যাণ্ড [grand], গ্রীন [green], ঘানা [Ghana] ইত্যাদি।

ঙ ং—ইংরেজি 'ng'-এর স্থানে 'ঙ্‌' বা 'ং' ব্যবহৃত হয়। যেমন: গাঙ্‌রিণ বা গ্যাংরিণ [gangrene], রঙ্‌রুট বা রংরুট [wrong-route], লঙ্‌ম্যান বা লংম্যান [longman], ওরাঙ্‌-ওটাঙ্‌ বা ওরাং-ওটাং [orang-outang] ইত্যাদি।

চ ছ—ইংরেজি 'ch'-এর স্থানে 'চ' এবং 'chh'-এর স্থানে 'ছ' হয়। যেমন: চার্লস [Charles], চেম্বারলেন [Chamberlaine], চার্জ [charge], চেম্বার [chamber], চার্চিল [Churchil] ইত্যাদি। আবার 'tu'-এর উচ্চারণ 'চু' বা 'চা' হয়। যেমন: মিউচুয়াল [mutual], স্ট্যাচার [stature]।

জ ঝ—ইংরেজি 'j' [কখনও কখনও 'g'] বর্ণের স্থানে 'জ' এবং 'jh'-এর স্থানে 'ঝ' হয়। যেমন: জেম্‌স্‌ [James], জন [John], জেরুজালেম [Jerusalem], জাপান [Japan], জ্যাক [Jack], জিল [Jill], মেজর [Major], জুডাস [Judas], জাস্টিস [Justice], জজ [Judge], জর্জিয়া [Gorgia], ম্যাজিস্ট্রেট [Magistrate], জেনারেল [General], জার্মানী [Germany], ম্যানেজার [Manager] ইত্যাদি। আবার, ইংরেজি 'z'-এর স্থানে বাংলায় সাধারণতঃ 'জ'

ব্যবহৃত হয়। যেমন: জেব্রা [Zebra], জু [Zoo], জুলু [Zulu] ইত্যাদি। বাংলায় 'Z'-এর শুদ্ধ উচ্চারণের জন্য 'জ়' ব্যবহার করা উচিত; কিন্তু বাংলা বর্ণমালায় এই বর্ণ নাই; এমন-কি, বাংলা উচ্চারণেও এই ধ্বনি অনুপস্থিত। আবার, 'Z'-এর খাঁটি উচ্চারণ 'ৎস্' করা হয়। যেমন: নাৎসী [Nazi]।

ট—ইংরেজি 't'-এর বাংলা বানান 'ট' হয়। যেমন: টম [Tom], টাইপ [type], টিম [team], ট্রেন [train], টেবিল [table] ইত্যাদি। কখনও কখনও 'th'-ও 'ট' উচ্চারিত হয়। যেমন: টমাস [Thomas], টেম্স [Thames] ইত্যাদি।

ড—ইংরেজি 'd'-এর বাংলা উচ্চারণ 'ড' হয়। যেমন: ডেভিড [David], ডাক্তার [doctor], ড্রিল [drill], ড্রেন [drain], ডন [don], ডবল [double], ব্যাণ্ড [band], গ্র্যাণ্ড [grand], ফ্রেণ্ড [friend] ইত্যাদি।

ণ ন—ইংরেজিতে মূর্ধন্য-'ণ' ও দন্ত্য-'ন'-এর পার্থক্য নাই; শুধু 'n' দিয়া কাজ চলিয়া যায়। বাংলায়ও উচ্চারণে 'ণ' ও 'ন'-এর কোন ব্যবধান নাই; আছে শুধু দন্ত্য-'ন'-এর উচ্চারণ। কাজেই বিদেশী শব্দের বানানের ক্ষেত্রে অযথা জটিলতা বৃদ্ধি না করিয়া কেবল 'ন'-ই ব্যবহৃত হওয়া উচিত। যেমন: ব্রেন, ট্রেন, ড্রেন, সাইরেন, প্যাটার্ন, বায়রন [Byron], পেণ্টাগন ইত্যাদি। তেমনি কোরান, দরুন, গুজরান, ফরমান, শিরনী, কুর্নিশ, কোরবানি ইত্যাদি।

ত [ৎ] থ: ইংরেজিতে 'ত'-এর উচ্চারণ নাই, কিন্তু 'থ' ধ্বনি আছে। কিন্তু ফরাসী, আরবী, ফারসী, তুর্কী ও অন্যান্য বিদেশী ভাষায় 'ত' ও 'থ'-এর উচ্চারণ আছে। যেমন: নতরদাম [Notredome], থিয়েটার [theatre], কার্তুজ, কৈফিয়ত, মেরামত, তাবিজ, তামাদি, তোতা, দোয়াত, রাস্তা, থানা, থার্মোমিটার [ইং] ইত্যাদি। কিন্তু তখৎ, নেহাৎ, দৌলৎ, হিম্মৎ, ফুরসৎ ইত্যাদি না লিখিয়া যথাক্রমে তখ্ত্, নেহাত, দৌলত, হিম্মত, ফুরসত ইত্যাদি লেখা উচিত।

দ—ইংরেজি 'th'-এর [এবং ইতালীয় 'd'-এর] বাংলা উচ্চারণ 'দ' হয়। যেমন: ব্রাদার, ফাদার, মাদার, দান্তে [Dante], ওভিদ [Ovid] ইত্যাদি। অন্যান্য বিদেশী শব্দ—দরবার, দলিল, আদালত, খোদা, মসজিদ ইত্যাদি।

প ফ—ইংরেজি 'p'-এর বাংলা উচ্চারণ 'প'। যেমন: পুলিস [police], পালিশ [polish], সুপার [super], পেপার [paper] ইত্যাদি। ইংরেজি 'f' এবং 'ph'-এর বাংলা উচ্চারণ 'ফ' বর্ণের সাহায্যে ব্যক্ত হয়। যেমন: ফুল [full], ফ্রী [free], ফী [fee], লোফার [loafer], ফ্যান [fan], সালফার [sulphur], সালফেট [sulphate], ফিজিকস্ [physics], ফিজিওলজি [physiology] ইত্যাদি।

ব ভ—ইংরেজি 'b'-এর বাংলা উচ্চারণ 'ব' এবং 'v'-এর বাংলা উচ্চারণ 'ভ'। যেমন: বক্স [box], বোর্ড [board], বিল [bill], বল [ball], ব্যাণ্ড [band], ভোট [vote], ভেইল [veil], ভ্যারাইটি [variety], ভ্যাক্সিন [vaccine] ইত্যাদি।

ম—ইংরেজি 'm'-এর বাংলা প্রতিবর্ণ 'ম'। যেমন: মাদার [mother], মর্নিং [morning], মটন [mutton] ইত্যাদি।

য র ল ব—বিদেশী শব্দে 'য' ব্যবহার করা উচিত নয়; বর্গীয় 'জ'ই ব্যবহৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে 'য'-ফলা ব্যবহারে বাধা নাই। জন [John—যোহন নয়], জ্যাক [Jack] ব্যবহৃত হইতে পারে। ইংরেজি 'r'-এর বাংলা উচ্চারণ 'র'। যেমন: রিম্ [rim], রিসক্ [risk], রোমান [Roman] ইত্যাদি। 'ল' ইংরেজি 'l'-এর প্রতিবর্ণ। যেমন: লাইন [line], স্কুল [school], লোয়ার [lower], লটারি [lottery], লোন [loan] ইত্যাদি। বাংলায় অন্তঃস্থ-ব-এর অস্তিত্ব নাই। তবে ইংরেজি 'wa'-র বাংলায় উচ্চারণ 'ওয়' হওয়া বাঞ্ছনীয়। ওয়ার [war], হার্ডওয়ার [hardware], ওয়াল [wall] ইত্যাদি। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ [Wordsworth] লিখিতে হইবে, ওয়ার্ডস্বার্থ নয়।

শ ষ স—বিদেশী শব্দের বাংলা উচ্চারণে 'ষ'-এর অস্তিত্ব নাই। বিদেশী শব্দের উচ্চারণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শুধু 'শ' ও 'স' হইবে। যেখানে উচ্চারণ sh-এর মতো, সেখানে শ এবং যেখানে উচ্চারণ s-এর মতো, সেখানে 'স' লেখা উচিত। যেমন: শেক্‌স্‌পীয়ার [Shakespeare], শেলী [Shelley], শো [show], শার্ট [shirt], পালিশ [polish], পেনশন [pension]; কিন্তু ক্লাস [class], পুলিস [police], পেনসিল [pencil], সিমেণ্ট [cement]। তেমনি সবুজ, সাদা, মসলা, মসজিদ, আসমান, আসল, বাদশাহ, শিকার,* শহীদ, দরবেশ, পশম, রেশম, চশমা, রোশনাই, শাল ইত্যাদি হইবে। এমনকি ট-বর্গেও ষ্ট্রিট, ষ্টেশন, ষ্টীমার, ষ্টিয়ারিং, ষ্টীল, ষ্টুপিড, পোষ্ট অফিস, খ্রীষ্ট ইত্যাদি না হইয়া যথাক্রমে স্ট্রীট, স্টেশন, স্টীমার, স্টিয়ারিং, স্টীল, স্টুপিড, পোস্ট অফিস, খ্রীস্ট ইত্যাদি হইবে। তেমনি জিনিষ, পোষাক, বারকোষ, তক্তপোষ ইত্যাদির পরিবর্তে যথাক্রমে জিনিস, পোশাক, বারকোশ, তক্তপোশ হইবে।

হ য়—'হ' ইংরেজী 'h' বর্ণের প্রতিবর্ণ। যেমন: হাউস [house], হোম, [home], হাই [high], হায়ার [higher, hire], হোটেল [hotel] ইত্যাদি। 'য়' ইংরেজি 'y' বা সমোচ্চারিত ধ্বনির প্রতিবর্ণ। যেমন: মেয়র [Mayor], চেয়ার [Chair], রেডিয়ম [radium], সোয়েটার [sweater] ইত্যাদি।

● **কতকগুলি পরিচিত বিদেশী শব্দের বাংলা বর্ণীকরণ**

Elizabeth [এলিজাবেথ], Britain [ব্রিটেন, 'বৃটেন' নয়], Christian [খ্রীস্টান, 'খৃষ্টান' নয়], Shakespeare [শেকস্‌পীয়ার, 'শেক্ষপীয়র' নয়], John [জন, 'যোহন' নয়], Wordsworth [ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ, 'ওয়ার্ড্‌স্বার্থ' নয়], Century [সেঞ্চুরি], Germany [জার্মানী, 'জর্মানী' নয়], Renaissance [রেনেসাঁস', 'রেনেসাঁ' নয়], Restaurant [রেস্তোরাঁ, 'রেস্টুরেণ্ট' নয়], Rousseau [রুশো], Paul [পল], Chemistry [কেমিস্ট্রি], Chemical [কেমিক্যাল], Cafe [কাফে], Eluard [এলুয়ার], Souvenir [সুভেনিয়ার], Canal [ক্যানাল], Bank [ব্যাঙ্ক,

'ব্যাংক' নয়], League [লীগ], Picnic [পিকনিক], Puncture [পাংচার], Rickshaw [রিক্‌শা], George Bernard Shaw [জর্জ বার্নার্ড শ], John Donne [জন ডান], Ballad [ব্যালাড], Ballet [ব্যালে]।

॥ অনুসরণী ॥

১. নিম্নলিখিত শব্দগুলি অবলম্বনে বাংলা 'এ' স্বরবর্ণের উচ্চারণগত বৈচিত্র্য নিরূপণ কর: দেখা, শেখা, একদা, এক, কেন, বেলা [সময়]। মা. '৬৮।

২. উদাহরণসহ নিম্নলিখিত পরিভাষাগুলির ব্যাখ্যা লিখ: হ্রস্বস্বর: সন্ধ্যক্ষর বা যৌগিক স্বর, মা. '৫৯, '৬০, '৬১; উষ্মবর্ণ, ম. '৫৫, '৬৩, উ. মা. [কম্পার্ট.], '৬১, মহাপ্রাণ বর্ণ, উ. মা. '৬৩, '৬৪; বর্গীয় বর্ণ, নাসিক্যধ্বনি, ঘোষবর্ণ, উ. মা. '৬২, অন্তঃস্থ বর্ণ, মা. '৬০, '৬২, উ. মা. '৬০, অল্পপ্রাণ বর্ণ, মা. '৫৪, উ. মা. '৬৩, মহাপ্রাণ বর্ণ, মা. '৫২, '৫৮, উ. মা. [কম্পার্ট.], '৬২, তালব্য বর্ণ, মা. '৫৩, '৬১, স্বরান্ত অক্ষর; ব্যঞ্জনান্ত বা হলন্ত অক্ষর, কণ্ঠৌষ্ঠ্য বর্ণ, কণ্ঠতালব্য বর্ণ, মূর্ধন্য বর্ণ, মা. '৬০, দন্ত্যবর্ণ, ক. প্রা. '৬১; স্পর্শবর্ণ, মা. '৫৯, উ. মা. '৬৪, অনুনাসিক বর্ণ, মা. '৬৫, অযোগবাহ বর্ণ বা আশ্রয়স্থানভাগী বর্ণ, মা. '৬৭, প্লুত স্বর, তরল স্বর, পার্শ্বিক ধ্বনি।

৩. উদাহরণসহ পার্থক্য নির্দেশ কর: ধ্বনি, বর্ণ ও অক্ষর, স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি; স্বরান্ত অক্ষর ও ব্যঞ্জনান্ত বা হলন্ত অক্ষর; হ্রস্বস্বর ও দীর্ঘস্বর, মৌলিক স্বরধ্বনি ও যৌগিক স্বরধ্বনি, অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ বর্ণ, মা. '৬০, মা. [কম্পার্ট.] '৬০, ঘোষবর্ণ ও অঘোষবর্ণ, স্পর্শবর্ণ ও উষ্মবর্ণ, হ্রস্বস্বর ও প্লুতস্বর, শিসধ্বনি ও পার্শ্বিক ধ্বনি।

৪. দৃষ্টান্তসহ আলোচনা কর: একই বর্ণের বিভিন্ন ধ্বনি ও বিভিন্ন বর্ণের একই ধ্বনি।

৫. ধ্বনিবিলোপ কাহাকে বলে? দৃষ্টান্তসহ আলোচনা কর।

৬. উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর: আদ্য অ-কারের উচ্চারণ-বৈচিত্র্য, ম. '৬৫, অ-কারের দীর্ঘ উচ্চারণ, উ. মা. '৬০, এ-কারের বিশুদ্ধ ও বিকৃত উচ্চারণ, মা. '৫৮, ও-কার ও এ-কারের বিভিন্ন উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য, মা. [কম্পার্ট.], '৬২

৭. নিম্নলিখিত বর্ণগুলির উচ্চারণ-স্থান সম্বন্ধে টীকা লিখ: ঐ, ঙ, ক, ং, য, ণ, ঞ, মা. '৬১, এ, ও, ট, অন্তঃস্থ-ব, ড়, ল, মা. '৫৯, অ, ঙ, ভ, স, ঃ, ক্ষ, ক. প্রা. '৬৩, ঋ, ঔ, ঞ, ভ, হ, ক. প্রা. '৪৪, ং, ঐ, ঞ, চ, ড, ণ, ক. প্রা. '৬৭, এ ও ঊ। ক. প্রা. '৪৮

৮. বাংলা বর্ণমালায় কোনগুলি উষ্মবর্ণ? কেন উহাদের উষ্মবর্ণ বলা হয়? উ. মা. '৬৮

৯. ক. বাংলা বর্ণমালার অনুনাসিক বর্ণগুলির উল্লেখ কর। উ. মা. '৬৯। কোন্ কোন্ বর্ণের অপভ্রংশে চন্দ্রবিন্দুর উৎপত্তি হয়? একটি করিয়া দৃষ্টান্ত দাও। অনুস্বারের উচ্চারণ কিরূপ? উহাকে অনুস্বার বলা হয় কেন?

খ. বাংলা বর্ণমালার দন্ত্যবর্ণ কোনগুলি? উহাদের ঐরূপ বলা হয় কেন? উ. মা. '৬৯

১০. বিদেশী শব্দের বাংলা বর্ণীকরণের প্রধান প্রধান নিয়মগুলি দৃষ্টান্তসহ সংক্ষেপে লিখ।

১১. বিদেশী শব্দের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বর্ণগুলির শুদ্ধ প্রয়োগ দেখাও: ই ও ঈ, উ ও ঊ, জ ও য, ণ ও ন, শ, ষ ও স।

১২. ক. বাংলা হরপে বা বর্ণে লিখ: Great Britain, Shakespeare, station, street, pencil, morning show, police, steamer, Thames, Stephen, pyramid, chocolate, chalk, Thompson, Nazi, John, Mazzini, Wordsworth.

খ. শুদ্ধ করিয়া লিখ: নাজি, যীশুখৃষ্ট, প্রেসরূপশান, ল্যাম্পোষ্ট, ওয়ার্ডস্বার্থ, যোহন।

ক্রিয়াপদ

বাক্যের অন্তর্গত কার্য-বোধক পদকে বলা হয় **ক্রিয়াপদ**। ক্রিয়াপদের অস্তিত্ব ব্যতীত বাক্য সংগঠিত হইতে পারে না। [আমি] 'নদীকূলে বসে আছি'—বাক্যে 'বসে আছি' ক্রিয়াপদ উপস্থিত। কিন্তু 'দুর্গম [হয়] গিরি, কান্তার [হয়] মরু, দুস্তর [হয়] পারাবার'—বাক্যটি তিনটি ক্ষুদ্র বাক্যের সমষ্টি এবং তিনটি বাক্যেই 'হয়' ক্রিয়াপদ উহ্য। উপস্থিত থাকুক বা উহ্য থাকুক, বাক্যে ক্রিয়াপদের অস্তিত্ব থাকিবেই।

ক্রিয়াপদকে বিশ্লেষ করিলে পাওয়া যায় ধাতু-প্রকৃতি এবং প্রত্যয়-বিভক্তি। শব্দের মূল রূপকে বলা হয় **প্রকৃতি**। প্রকৃতি দুই প্রকার: **নাম-প্রকৃতি ও ধাতু-প্রকৃতি**। অর্থাৎ প্রাতিপদিক ও ধাতু। অর্থবোধক বর্ণ বা বর্ণ-সমষ্টির নাম **প্রাতিপদিক**।

কাজেই, প্রত্যেক ক্রিয়াপদকে বিশ্লেষ করিলে বা ভাঙিলে, শেষ পর্যন্ত এমন একটি মূল বা জড় পাওয়া যায়, যাহাকে আর বিশ্লেষ বা ভাগ করা সম্ভব নয়। ক্রিয়াপদের এই অবিভাজ্য জড় অংশ, ক্রিয়ার এই শুদ্ধ ভাব-দ্যোতক মূল—ইহাকেই বলা হয় 'ধাতু'। যেমন: সে **হাসে**, আমরা **কাঁদি**, তুমি **দেখ**—বাক্য তিনটির ক্রিয়াপদ তিনটিকে বিশ্লেষ করিলে 'হাসে=হাস্+এ', 'কাঁদি=কাঁদ্+ই', 'দেখ=দেখ্+অ' পাওয়া যায়। 'হাসে' ক্রিয়াপদটির মূল হইল 'হাস্'-ধাতু, 'কাঁদি' ক্রিয়াপদটির মূল হইল 'কাঁদ্'-ধাতু, 'দেখ' ক্রিয়াপদটির মূল হইল 'দেখ্'-ধাতু। কাজেই, ক্রিয়ার মূলই হইল ধাতু।

মূল ধাতুর সহিত প্রত্যয় ও বিভক্তি যোগে যে কার্য-বোধক পদ গঠিত হয়, তাহাই **ক্রিয়াপদ**। যেমন: 'দেখ্'—ইহার সহিত 'ই' বিভক্তি যোগ করিলে 'দেখি'—উত্তম পুরুষের এই ক্রিয়াপদটি গঠিত হয়। তেমনি, 'দেখ্'+অ='দেখ' [মধ্যম পুরুষের ক্রিয়াপদ], 'দেখ্'+এ='দেখে' [প্রথম পুরুষের ক্রিয়াপদ] 'দেখ্' ইতাম='দেখিতাম,' 'দেখ্'+ইলাম='দেখিলাম', 'দেখ্'+ইব='দেখিব'। 'দেখ্' +আ [প্রত্যয়]+ইব='দেখাইব'—ক্রিয়াপদগুলি এইভাবে গঠিত। কিন্তু লক্ষ্য কর, মূল ধাতুর যে অর্থ, তাহার দ্বারা গঠিত ক্রিয়াপদেও সেই অর্থ অক্ষুণ্ণ থাকে।

গঠন-অনুসারে ধাতু প্রধানতঃ চার প্রকার: **মৌলিক বা সিদ্ধধাতু, সাধিত ধাতু, যৌগিক ধাতু ও সংযোগমূলক ধাতু**। **ক. মৌলিক বা সিদ্ধ ধাতু:** যে ধাতু স্বয়ংসিদ্ধ এবং যাহাকে আর বিশ্লেষ করা যায় না, তাহাকে **মৌলিক** বা **সিদ্ধ ধাতু** বলা হয়। যেমন: কর্, চল্, বল্, দেখ্, হাস্, ডাক্, পড়্, নে, দে, পা, খা, চা, আন্, শেখ্ ইত্যাদি। **খ. সাধিত ধাতু:** মৌলিক বা সিদ্ধ ধাতুর সহিত প্রত্যয় যুক্ত হইয়া নূতন ধাতু গঠিত বা সাধিত হইলে, তাহাকে বলা হয় **সাধিত ধাতু**। সাধিত' ধাতুকে বিশ্লেষ করিলে মূল ধাতু ও প্রত্যয় পাওয়া যায়। যেমন:

[কর্‌+আ=] করা, [চল্‌+আ=] চলা, [বল্‌+আ=] বলা, [দেখ্‌+আ=] দেখা, [হাস্‌+আ=] হাসা, [ডাক্‌+আ=] ডাকা। **গ. যৌগিক ধাতু:** অসমাপিকা ক্রিয়ার সহিত সিদ্ধ বা মৌলিক ধাতু যোগ করিলে যে নূতন ধাতু গঠিত হয়, তাহার নাম **যৌগিক ধাতু**। যেমন: শুকাইয়া যা, দাঁড়াইয়া থাক্‌, কাঁদিয়া ফেল্‌, বসিয়া পড়্‌, চলিয়া যা, ঘুরিতে লাগ্‌, বলিয়া দে, খুলিয়া বল্‌ ইত্যাদি। সাধারণতঃ 'ইয়া' ও 'ইতে' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার সহিত মৌলিক ধাতু যুক্ত হইয়া যৌগিক ধাতু গঠিত হয়। **ঘ. সংযোগমূলক ধাতু:** বিশেষ্য, বিশেষণ ও ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের সহিত মৌলিক বা সিদ্ধ ধাতু যুক্ত হইয়া যে ধাতু গঠিত হয়, তাহাকে সংযোগমূলক ধাতু বলা হয়। যেমন: সাঁতার কাট্‌, ভিক্ষা দে, ক্ষুধা পা, শাস্তি দে, আঁক কাট্‌, উদয় হ, অস্ত যা, তুফান তোল্‌, লেখাপড়া কর্‌, মানুষ হ, সুখী হ, হাডুডু খেল্‌, কপাডি খেল্‌, প্রশ্ন কর্‌, উত্তর দে, কষ্ট পা ইত্যাদি। [মৌলিক বা সিদ্ধ ধাতু, সাধিত ধাতু ও যৌগিক ধাতু সম্পর্কে আরো বিস্তারিত আলোচনা পরে করা হইয়াছে।]

মূল ধাতু হইতে কার্য-বোধক ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। অর্থ-প্রকাশের ক্ষমতা-অনুসারে ক্রিয়াপদ আবার দুই প্রকার: সমাপিকা ও অসমাপিকা। বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশক্ষম ক্রিয়াপদকে বলা হয় **সমাপিকা ক্রিয়া**। যেমন: 'জন্ম **লভিবে কী** বিশাল প্রাণ।'—'লভিবে' সমাপিকা ক্রিয়াপদ। তেমনি—'সেখানে **ছুটিতাম** সকালে উঠি', 'সহসা বনমধ্যে করুণ ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে **পাইলাম**', আমি এখন চিঠি **লিখিতেছি, 'ডাকতেছিল** শ্যামল দুটি গাই'—বাক্যগুলিতে 'ছুটিতাম', 'পাইলাম', 'লিখিতেছি', 'ডাকতেছিল' পদগুলি সমাপিকা ক্রিয়াপদ।

কিন্তু বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশে অক্ষম ক্রিয়াপদকে **অসমাপিকা ক্রিয়াপদ** বলা হয়। যেমন: 'দুঃসহ ব্যথা **হয়ে** অবসান।'—'হয়ে' [হইয়া] অসমাপিকা ক্রিয়াপদ। তেমনি—'কাঙালী মায়ের বুকে ঠেস্‌ **দিয়া বসিয়া ভাবিতে** লাগিল,' সে **আসিলে** আমি যাইব, তাহারা সূর্যাস্ত **দেখিতে** গিয়াছে, নদী কুলকুল শব্দ **করিয়া ছুটিয়া** চলিয়াছে—বাক্যগুলিতে 'দিয়া', 'বসিয়া', 'ভাবিতে', 'আসিলে', 'দেখিতে', 'করিয়া', 'ছুটিয়া'—পদগুলি অসমাপিকা ক্রিয়াপদ।

বাংলায় অসমাপিকা ক্রিয়াপদ তিন প্রকারে গঠিত হয়। ধাতুর উত্তর **'ইয়া'** [পদ্যে 'ই'], **'ইতে'** ও **'ইলে'** যোগ করিয়া: **এক.** কর্‌+ইয়া=করিয়া, খা+ইয়া=খাইয়া, বল্‌+ইয়া=বলিয়া: খাইবে **বলিয়া** জিদ **করিয়া** সে সব আম **খাইয়া** ফেলিয়াছে। উঠ্‌+ই=উঠি', ধর্‌+ই=ধরি', খুল্‌+ই=খুলি': 'সেখানে ছুটিলাম সকালে **উঠি**', আরেকবার সমুখে এসো প্রদীপখানি **ধরি**', 'দেখিব আমি নটরাজের দেউল-দ্বার **খুলি**।' ই-প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়া কেবলমাত্র পদ্যে ব্যবহৃত হয়, গদ্যে হয় না। **দুই.** পড়্‌+ইতে=পড়িতে, আন্‌+ইতে=আনিতে, দেখ্‌+ইতে=দেখিতে: সে **পড়িতে** বসিল, সে জল **আনিতে** গিয়াছে, রাধারাণী মাহেশে রথ **দেখিতে** গিয়াছিল। **তিন.** হাস্‌+ইলে=হাসিলে, ছুঁ+ইলে=

ছুঁইলে, হ+ইলে=হইলে: **হাসিলে** তাহার মুখ হইতে যেন মুক্তা ঝরিয়া পড়ে। ময়লা **ছুঁইলে** শাস্তি পাইবে। অসুস্থ **হইলে** তিনি আসিবেন না।

স্বরধ্বনি পরিবর্তনের ফলে সাধু বাংলায় অসমাপিকা ক্রিয়া চলিত বাংলায় রূপান্তরিত হয়। যেমন: করিয়া>ক'রে, চলিয়া>চলে, গড়িতে>গড়তে, বলিতে> বলতে, হাসিলে>হাসলে, চলিলে>চললে ইত্যাদি।

অসমাপিকা ক্রিয়া কার্য-বোধক পদ হইলেও বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশে অক্ষম। যেমন: 'সে এখানে **আসিয়া** আর্তস্বরে কাঁদিল'—বাক্যটিতে 'সে এখানে আসিয়া আর্তস্বরে'—অংশটুকু বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশে অক্ষম। 'কাঁদিল'—এই সমাপিকা ক্রিয়া যোগে বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হইল।

ক্রিয়া বিভক্তি: ধাতুর সহিত যে সকল বিভক্তি যুক্ত হইয়া ক্রিয়াপদকে গঠন করিয়া তাহাকে রূপময় করিয়া তোলে এবং বাক্যে ব্যবহারের যোগ্যতা দান করে, তাহাকে বলা হয় ধাতু-বিভক্তি বা ক্রিয়া-বিভক্তি। যেমন: দুল্+ **ইতেছে** [=দুলিতেছে], ফুল্+**ইতেছে** [=ফুলিতেছে], ভুল্+**ইতেছে** [=ভুলিতেছে]।

ক. সিদ্ধ বা মৌলিক ধাতু:

সিদ্ধ বা মৌলিক ধাতুর সহিত ক্রিয়া-বিভক্তি [ইতেছে, ইয়াছে, ইল, ইত, ইব] যুক্ত হইলে **মৌলিক ক্রিয়া** গঠিত হয়। যেমন: [কর্+ইতেছে=] করিতেছে, [বল্+ইল=] বলিল, [চল্+ইত=] চলিত, [বস্+ইব=] বসিব। বাংলায় ব্যবহৃত সিদ্ধ বা মৌলিক ধাতু দুই প্রকারের: **সংস্কৃত** বা **তৎসম সিদ্ধ ধাতু** এবং **তদ্ভব** বা **প্রাকৃতজ সিদ্ধ ধাতু**। **সংস্কৃত** বা **তৎসম সিদ্ধ ধাতু:** যা, চল্, দুহ্, কৃ, ক্রী, লিখ্, সেব্, লভ্, দৃশ্, ঘট্, চর্, জল্, দুল্, দা, পাল্, পিষ্, পুষ্, ফল্, শুষ্, সাধ্ ইত্যাদি। **তদ্ভব** বা **প্রাকৃতজ সিদ্ধ ধাতু:** কৃ [সংস্কৃত সিদ্ধ ধাতু] >কর্ [বাংলা সিদ্ধ ধাতু], ধৃ [সংস্কৃত সিদ্ধ ধাতু]>ধর্ [বাংলা সিদ্ধ ধাতু], বৃ [সংস্কৃত সিদ্ধ ধাতু]>বর্ [বাংলা সিদ্ধ ধাতু], মৃ [সংস্কৃত সিদ্ধ ধাতু]>মর্ [বাংলা সিদ্ধ ধাতু], খাদ্ [সংস্কৃত সিদ্ধ ধাতু]>খা [বাংলা সিদ্ধ ধাতু], পঠ্ [সংস্কৃত সিদ্ধ ধাতু]>পড়্ [বাংলা সিদ্ধ ধাতু], গৈ [সংস্কৃত সিদ্ধ ধাতু]>গাহ্ [বাংলা সিদ্ধ ধাতু], জাগৃ [সংস্কৃত সিদ্ধ ধাতু]>জাগ্ [বাংলা সিদ্ধ ধাতু], জ্ঞা [সংস্কৃত সিদ্ধ ধাতু]>জান্ [বাংলা সিদ্ধ ধাতু] ইত্যাদি। তাছাড়া, বাংলার নিজস্ব কিছু সিদ্ধ ধাতুও আছে, সেগুলির কোথাও উৎস নির্দেশ করা যায় না। যেমন: **কাট্, খাট্, ডাক্, বাজ্, ভাজ্, ভাস্, ডুব্, বাঁচ্, বল্, এড়্, ঠেল্, রুখ্, জড়্, টুট্, গড়্, খুল্, ভুল্** ইত্যাদি। এগুলিকে **খাঁটি বাংলা সিদ্ধ ধাতুও** বলা হয়। আর আছে ধ্বনি হইতে জাত কিছু-সংখ্যক ধ্বন্যাত্মক ধাতু। যেমন: **কুট্, ঠুক্, ধুক্, ফুঁক্, হাঁচ্** ইত্যাদি। এগুলিও সিদ্ধ ধাতু।

খ. সাধিত ধাতু :

সাধিত ধাতু আবার চার প্রকার : ১. **নাম ধাতু**, ২. **ধ্বন্যাত্মক ধাতু**, ৩. **ণিজন্ত ধাতু** বা **প্রেরণার্থক ধাতু** বা **প্রযোজক ধাতু** ও ৪. **কর্মবাচ্যের ধাতু**।

১. **নামধাতু :** বিশেষ্য, বিশেষণ ও অব্যয়—এই নামপদগুলির সহিত প্রত্যয় [সাধারণতঃ আ] যুক্ত হইয়া ধাতু গঠিত হইলে তাহাকে **নামধাতু** বলা হয়। **যেমন : সংস্কৃত** বা **তৎসম নামধাতু**—দমন [বিশেষ্য]+আ+ইয়া=দমনিয়া, পবিত্র+আ [বিশেষণ]+ইলা=পবিত্রিলা, দান [বিশেষ্য]+আ+ইলা= দানিলা, উত্তর [বিশেষ্য]+আ+ইল=উত্তরিল, জিজ্ঞাসা [বিশেষ্য]+আ+ ইল=জিজ্ঞাসিল, কাতর [বিশেষণ]+আ+ইল=কাতরিল, চূর্ণ [বিশেষ্য ও বিশেষণ]+আ+ইবে=চূর্ণিবে, ঘন [বিশেষণ]+আ+ক্যঙ্+শানচ্=ঘনায়মান, শ্যাম [বিশেষণ]+আ+ক্যঙ্+শানচ্=শ্যামায়মান, ধূম [বিশেষ্য]+আ+ক্যঙ্ +শানচ্=ধূমায়মান, দণ্ড [বিশেষ্য]+আ+ক্যঙ্+শানচ্=দণ্ডায়মান। আকাশে **ঘনায়মান** মেঘপুঞ্জে দশদিক অন্ধকার হইয়া আসিল। দূরে **শ্যামায়মান** বনশ্রেণী কাঁপিতে লাগিল। **ধূমায়মান** পর্বতশ্রেণী **দণ্ডায়মান**। **বাংলা নামধাতু**— ফেন [বিশেষ্য]+আ=ফেনা : '**ফেনাইয়া** উঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান।' ঠেঙ [বিশেষ্য]+আ=ঠেঙা : ওকে ওরা খুব **ঠেঙিয়েছে**। বেত [বিশেষ্য]+ আ=বেতা : সে তাকে **বেতিয়ে লম্বা** করে দেবে বলে শাসিয়েছে। জুতা [বিশেষ্য]+আ=জুতা : সে তোমাকে ধরলে **জুতিয়ে** ছাড়বে। কিল [বিশেষ্য] +আ=কিলা : **কিলিয়ে** কাঁঠাল পাকানো যায়, কিন্তু মানুষ পাকানো যায় না। রাঙা [বিশেষ্য]+আ=রাঙা : 'রঙে রঙে **রাঙালো** আকাশ।' ঘন [বিশেষণ] +আ=ঘনা : 'ওপারে আঁধার **ঘনিয়েছে** [ঘনাইয়াছে] দেখ্ চাহিরে।' আগল [বিশেষ্য]+আ=আগলা : বাবা কাজে যায়, আর মেয়ে ঘর **আগলায়**। আঁচড় [বিশেষ্য]+আ=আঁচড়া : তুমি চুল **আঁচড়াওনি** কেন? কামড় [বিশেষ্য]+ আ=কামড়া : কুকুরটা কি **কামড়ায়**? ধমক্ [বিশেষ্য]+আ=ধমকা : ছেলেটাকে মিছিমিছি **ধমকাচ্ছ** কেন? **বিদেশী নামধাতু**—চাবুক [বিশেষ্য]+ আ=চাব্কা : তাকে পেলে সবাই **চাবকাবে**। তড়পা [বিশেষ্য]+আ=তড়পা : এত **তড়পাচ্ছ** কেন?

বাংলা নামধাতুরূপে সংস্কৃত বিশেষ্য পদ : আরম্ভ—'**আরম্ভিলা** ভগ্নদূত।' আদেশ —'রাজা দূতপানে চাহি **আদেশিলা**।' ঘর্ঘর—'**ঘর্ঘরিল** রথচক্র।' ভাতি— '**ভাতিল** অসি।' নাদ—'**নাদিল** কম্বু।' বিলাপ—'**বিলাপিলা** আক্ষেপে রাক্ষস।' **প্রভাত**—'রাত্রি **প্রভাতিল**।' কবি মধুসূদনের কাব্যে নামধাতুর বহুল প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। ইহাদের প্রয়োগ কাব্যকে এক উদাত্ত গাম্ভীর্য দান করে।

২. **ধ্বন্যাত্মক ধাতু :** ধ্বন্যাত্মক অব্যয় বা অনুকারাত্মক অব্যয় প্রত্যয়যোগে ধাতুরূপে ব্যবহৃত হইলে, তাহাকে ধ্বন্যাত্মক ধাতু বলে। যেমন : **ফুঁস+আ=ফুঁসা :**

'নাগিনী **ফুঁসিছে**।' ধুঁক্+আ=ধুঁকা : সে রাস্তার ধারে পড়ে **ধুঁকছে**। হাঁক্+আ=হাঁকা ; সে জোর গলায় **হাঁকলো**। হাঁচ+আ=হাঁচা : সে আজ খুব **হাঁচ্ছে**। শন্শন্+আ=শন্শনা : **শন্শনিয়ে** উঠলো গাছের পাতাগুলো। ঝম্ঝম্+আ=ঝম্ঝমা : **ঝম্ঝমিয়ে** বৃষ্টি এলো। হন্হন্+আ=হন্হনা : 'যাচ্ছে কারা **হন্হনিয়ে**?' টগ্বগ্+আ=টগ্বগা : 'আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার 'পরে **টগ্বগিয়ে** তোমার পাশে পাশে।' ঝিল্মিল্+আ=ঝিল্মিলা : 'রোদ উঠেছে **ঝিল্মিলিয়ে** বাঁশের ডালে ডালে।' টন্টন্+আ=টন্টনা : পায়ের ব্যথাটা আবার **টন্টনায়**। চড়্চড়্+আ=চড়চড়া : মাঠ ফাটছে **চড়চড়িয়ে**। মচ্মচ্+আ=মচ্মচা : বাবু যান জুতো পায়ে **মচ্মচিয়ে**। হক্চক্+আ=হক্চকা : আমি ভয়ে **হক্চকিয়ে** গেলাম। ভন্ভন্+আ=ভন্ভনা : 'উড়ছে মাছি **ভন্ভনিয়ে**।'

৩. **ণিজন্ত ধাতু** বা **প্রেরণার্থক ধাতু** বা **প্রযোজক ধাতু :** কর্তার প্রেরণায় [প্রবর্তনায় বা চালনায়] **অন্য** কেহ ধাতু নিষ্পন্ন করিলে, সেই ধাতুকে ণিজন্ত ধাতু বা প্রেরণার্থক ধাতু বা প্রযোজক ধাতু বলা হয়। সিদ্ধ বা মৌলিক ধাতুর সহিত **ণিচ্ প্রত্যয়** [প্রেরণার্থে] যুক্ত হইয়া ণিজন্ত বা প্রেরণার্থক বা প্রযোজক ধাতু গঠিত হয়। বাংলায় 'আ' বা 'ওয়া' হইতেছে ণিচ্ প্রত্যয়। যেমন : কর্+আ=করা, খা+আ=খাওয়া, বল্+আ=বলা, পড়্+আ=পড়া, খেপ্+আ=খেপা। মৌলিক ক্রিয়ায় : কর্+ই=করি : আমি স্নান করি ; খা+ই=খাই : আমি মিষ্টি খাই ; বল্+ব=বলব : আমি তোমাকে বলব ; পড়্+ছি=পড়ছি : আমি বাংলা পড়ছি, খেপ্+ছ=খেপছ : তুমি খেপ্ছ কেন? এই ধাতুগুলি ণিচ্ প্রত্যয় যোগে ণিজন্ত ক্রিয়ার রূপ লাভ করিলে দাঁড়ায় : কর্+আ+ই=করাই : আমি তাকে স্নান **করাই** ; খা+আ+ই=খাওয়াই : আমি সবাইকে মিষ্টি **খাওয়াই** ; বল্+আ+ব=বলাব : আমি তোমাকে **বলাব** ; পড়্+আ+ছি=পড়াচ্ছি : আমি তোমাদের বাংলা **পড়াচ্ছি** ; খেপ্+আ+ছ=খেপাচ্ছ ; পাগলটাকে তোমরা **খেপাচ্ছ** কেন?

অতিরিক্ত দৃষ্টান্ত : আমাকে তুমি **বকিও** না। 'অপু, আমি ভালো হয়ে উঠলে তুই আমাকে রেলগাড়ি **দেখাবি**?' সাপুড়ে সেদিন রাস্তায় সাপ **খেলাচ্ছিল**। '**কাঁপাইয়া** রণস্থল, **কাঁপাইয়া** গঙ্গাজল, **কাঁপাইয়া** বনস্থল উঠিল সে ধ্বনি।'

৪. **কর্মবাচ্যের ধাতু :** কর্মবাচ্যের ক্রিয়া কর্ম-অনুসারে গঠিত হয়। সিদ্ধ বা মৌলিক ধাতুর সহিত কর্মবাচ্যের আ-প্রত্যয় যুক্ত হইয়া কর্মবাচ্যের ধাতু গঠিত হইয়া থাকে। পরে কর্মবাচ্যের ধাতুর সহিত ক্রিয়া-বিভক্তি যুক্ত হইয়া কর্মবাচ্যের ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন : শুন্+[কর্মবাচ্যের] আ=শোনা : কথাটা ভালো **শোনায়** না। দেখ্+[কর্মবাচ্যের] আ=দেখা : কাজটা খারাপ **দেখায়**। মান্+[কর্মবাচ্যের] আ=মানা : এ কাজ তোমায় **মানায় না**। বিক্+[কর্মবাচ্যের] আ=বিকা : 'বাজারে **বিকায়** ফল তণ্ডুল।'

গ. যৌগিক ধাতু ঃ

অসমাপিকা ক্রিয়ার সহিত কোনও মৌলিক বা সিদ্ধ ধাতুর যোগে যে ধাতু গঠিত হয়, তাহাকে **যৌগিক ধাতু** বলে। তাহাতে অসমাপিকা ক্রিয়াটির অর্থ ই প্রাধান্য লাভ করে। সমাপিকা ক্রিয়াটি সেই অর্থকে সম্পূর্ণতা দানে সাহায্য করে মাত্র। সাধারণতঃ 'ইয়া' এবং 'ইতে' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার সহিত নে, দে, পা, যা, পড়্, থাক্, লাগ্, উঠ্, রাখ্, আস্, চল্ ইত্যাদি মৌলিক ধাতু যুক্ত হইয়া যৌগিক ক্রিয়া গঠিত হয়।

যৌগিক ক্রিয়ার দৃষ্টান্তগুলি লক্ষ্য কর ঃ

বসিয়া [অস. ক্রি.]+পড়্ [সিদ্ধ ধাতু]=বসিয়া পড়্ ঃ সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়ল। খাইতে [অস. ক্রি.]+বস্ [সিদ্ধ ধাতু]=খাইতে বস্ ঃ সে খাইতে বসিয়াছিল। খাইয়া [অস. ক্রি.]+নে [সিদ্ধ ধাতু]=খাইয়া নে ঃ দিদি আমাকে এক মুঠো কুল দিয়ে বলল, 'শীগ্‌গীর খেয়ে নে।' দেখিতে [অস. ক্রি.]+পা [সিদ্ধ ধাতু]=দেখিতে পা ঃ অন্ধ অবাক হইয়া বলিল, 'আবার আমি পৃথিবীর মুখ দেখিতে পাইব ?' বলিয়া [অস. ক্রি.]+যা [সিদ্ধ ধাতু]=বলিয়া যা ঃ 'অনেক কথা যাও যে বলে কোন কথা না বলি।' ঝরিয়া [অস. ক্রি.]+পড়্ [সিদ্ধ ধাতু]=ঝরিয়া পড়্=শিশুর হাসিতে যেন মুক্তো ঝরে পড়ে। বসিয়া [অস. ক্রি.]+থাক্ [সিদ্ধ ধাতু]=বসিয়া থাক্ ঃ 'আমি তরী নিয়ে বসে আছি নদী কিনারে।' খুলিয়া [অস. ক্রি.]+রাখ্ [সিদ্ধ ধাতু]=খুলিয়া রাখ্ ঃ 'রাখো, রাখো, খুলে রাখো শিয়রের ঐ জানালা দুটো।' উঠিয়া [অস. ক্রি.]+বস্=উঠিয়া বস্ ঃ তাঁহার আহ্বানে রুগ্‌ণরাও যেন উঠিয়া বসিল। চলিয়া [অস. ক্রি.]+আস [সিদ্ধ ধাতু]=চলিয়া আস ঃ 'চলে এসো ঘরে পরবাসী।'

ঘ. সংযোগমূলক ধাতু ঃ

বিশেষ্য, বিশেষণ ও ধ্বন্যাত্মক অব্যয় পদের সহিত সিদ্ধ বা মৌলিক ধাতু যোগ করিয়া যে নূতন ধাতু গঠিত হয়, তাহাকে সংযোগমূলক ধাতু বলে। ইংরেজিতে এগুলিকে 'Group Verb' বলা হয়।

বাংলায় কর্, থাক্, হ, দে, পা, খা, যা, বাস্, উঠ্, বস্, মান্ প্রভৃতি মৌলিক বা সিদ্ধ ধাতু যোগে অজস্র প্রকার সংযোগমূলক ধাতু সংগঠিত হইয়া থাকে। এই সকল সংযোগমূলক ধাতুর পূর্বপদ বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয় হইয়া থাকে। যেমন ঃ কষ্ট [বি]+পা [সিদ্ধ ধাতু]=কষ্ট পাওয়া ঃ "দূরদেশে গিয়ে কেষ্টারে লয়ে 'কষ্ট' অনেক 'পাবে'।" মুখস্থ [বিণ]+কর্ [সিদ্ধ ধাতু]=মুখস্থ কর্ ঃ কবিতাটি 'মুখস্থ কর'। বন্দী [বিণ]+থাক্ [সিদ্ধ ধাতু]=বন্দী থাক্ ঃ আমাদের ছেলেরা ব্রিটিশের কারাগারে বছরের পর বছর 'বন্দী থেকেছে'। শান্তি [বি]+পা [সিদ্ধ ধাতু]= শান্তি পাওয়া ঃ কোথায় গেলে 'শান্তি পাবো' বলতে পারো ? মানুষ [বি]+হ [সিদ্ধ ধাতু]=মানুষ হওয়া ঃ "আবার তোরা মানুষ হ'।" মন [বি]+দে [সিদ্ধ ধা[illegible]]=মন দেওয়া ঃ এবার লেখাপড়ায় 'মন দাও'। ডিগ্‌বাজি [বি]+খা [সিদ্ধ

ধাতু]=ডিগ্‌বাজি খাওয়া : পরীক্ষায় সে দু'বার 'ডিগ্‌বাজি খেয়েছে'। মূর্ছা [বি]+যা [সিদ্ধ ধাতু]=মূর্ছা যাওয়া : ওকে দেখলে ভয়ে তুমি 'মূর্ছা যাবে'। ভালো [বিণ]+বাস্‌ [সিদ্ধ ধাতু]=ভালোবাস্‌ : "সবারে 'বাস্‌রে ভালো'।" গজ্‌গজ্‌ [ধ্ব. অ.]+কর্‌ [সিদ্ধ ধাতু]=গজ্‌গজ্‌ কর্‌ : "পেটে বিদ্যে 'গজ্‌গজ্‌' করছে"। রাগে তিনি 'গজ্‌গজ্‌ করছেন'।

● **যৌগিক ক্রিয়া ও সংযোগমূলক ক্রিয়ার পার্থক্য :** যৌগিক ক্রিয়া ও সংযোগমূলক ক্রিয়া উভয়েই সাধিত ক্রিয়ার অন্তর্গত। কিন্তু যৌগিক ক্রিয়ায় মৌলিক বা সিদ্ধ ধাতুটি অসমাপিকা ক্রিয়ার সহিত যুক্ত হয় এবং সংযোগমূলক ক্রিয়ায় মৌলিক বা সিদ্ধ ধাতুটি যুক্ত হয় বিশেষ্য বা বিশেষণ বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয় পদের সহিত। অর্থাৎ, যৌগিক ক্রিয়ায় অসমাপিকা ক্রিয়াপদটির প্রাধান্য এবং সংযোগমূলক ক্রিয়ায় বিশেষ্য বা বিশেষণ বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের প্রাধান্য লক্ষণীয়।

● **ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া ও প্রযোজক বা ণিজন্ত ক্রিয়া :** ধ্বন্যাত্মক ধাতু ও ণিজন্ত ধাতুর উত্তর বিভক্তি যুক্ত হইয়া তাহাদের বাক্যে ব্যবহারের যোগ্যতা দান করিলে, তাহাদের যথাক্রমে ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া ও ণিজন্ত ক্রিয়া [প্রেরণার্থক ক্রিয়া বা প্রযোজক ক্রিয়া] বলা হয়। যেমন : 'ঢাল-তলোয়ার **ঝন্‌ঝনিয়ে** বাজে' [ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া]। 'তাহারি ছায়ায় আমরা **মিলাব** জগতের শতকোটি' [ণিজন্ত ক্রিয়া বা প্রেরণার্থক ক্রিয়া বা প্রযোজক ক্রিয়া]।

● **অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রকারভেদ** ●

নিমিত্তার্থক অসমাপিকা ক্রিয়া : নিমিত্ত বুঝাইতে ধাতুর উত্তর 'ইতে' প্রত্যয় যোগ করিয়া নিমিত্তার্থক অসমাপিকা ক্রিয়া গঠন করা হইয়া থাকে। যেমন : আমরা **পড়িতে** ইস্কুলে যাই। সে মাছ **কিনিতে** বাজারে গিয়াছে। ওরা যাবে মন্দিরে পূজা **দিতে**। 'ফুলের মালাগাছি **বিকাতে** আসিয়াছি।'

অনুসর্গরূপে অসমাপিকা ক্রিয়া : 'সুখের **লাগিয়া** এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।' 'পাল্‌কি **করে** বৌ আনবে খোকন পরিপাটি।' 'যে পথ **দিয়ে** পাঠান এসেছিল, সে পথ **দিয়ে** ফিরলো নাকো তারা।' 'বায়ু দূর **হতে** আসিয়াছে।'

ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যরূপে অসমাপিকা ক্রিয়া : '**মরিয়া** [মরণে] হবে জয়ী আমার 'পরে এমনি করিয়াছ ফন্দি।' আর **বাঁচিয়া** [বাঁচনে] কি হইবে ?

ক্রিয়াবাচক বিশেষণরূপে অসমাপিকা ক্রিয়া : 'হেরো ঐ ধনীর দুয়ারে **দাঁড়াইয়া** কাঙালিনী মেয়ে।'

পূর্বকালীনতা বুঝাইতে অসমাপিকা ক্রিয়া : সূর্য **উঠিলে** আমরা বাড়ি ফিরিলাম। চোর **পালালে** বুদ্ধি বাড়ে।

কর্মরূপে অসমাপিকা ক্রিয়া : সে বই **পড়তে** ভালোবাসে। তুমি অঙ্ক **কষতে** চাও না। '**যেতে** দাও গেল যারা।'

সম্ভাবনা অর্থে অসমাপিকা ক্রিয়া : আজ বিকেলে ঝড়জল **হতে** পারে। সে ভবিষ্যতে একজন বড় লেখক **হতে** পারে।

বাধ্যবাধকতা অর্থে অসমাপিকা ক্রিয়া : 'আমায় যে সব **দিতে** হবে।' 'নূতন সমুদ্র-তীর পানে **দিতে** হবে পাড়ি।'

ধারাবাহিকতা অর্থে অসমাপিকা ক্রিয়া : 'হাসিতে হাসিতে খেলিতে খেলিতে নামিয়া এসেছি শেষ।' খালি বই **পড়ে পড়ে** ছেলেটা পাগল হয়ে গেল।

ক্রিয়াবিশেষণরূপে অসমাপিকা ক্রিয়া : সে গান **গাইতে গাইতে** হঠাৎ এসে হাজির। সে গল্প **শুনতে শুনতে** ঘুমিয়ে পড়লো।

অসমাপিকা ক্রিয়ার বীপ্সা বা দ্বিত্ব প্রয়োগ : হিন্দী গান **শুনে শুনে** কান পচে গেল। **'দেখিতে দেখিতে** গুরুর মন্ত্রে জাগিয়া উঠিল শিখ।'

● **ক্রিয়াবাচক বিশেষণ :** ধাতুর উত্তর প্রত্যয় যোগ করিয়া এমন কতকগুলি শব্দ গঠিত হয়, যাহারা একই সঙ্গে ক্রিয়া এবং বিশেষণের অর্থ দ্যোতিত করে; তাহাদের ক্রিয়াবাচক বিশেষণ [Participle বা Verbal Adjective] বলা হয়।

ক্রিয়াবাচক বিশেষণ গঠনের উপায় : ১. কর্তৃবাচ্যের ধাতুর উত্তর সাধু ভাষায় '**ইতে**' ও চলিত ভাষায় '**তে**' প্রত্যয় যোগ করিয়া। 'আপনি আমার স্বর্গীয় পিতা মহাশয়কে এই রামায়ণ **পড়তে** দেখেছেন।' সেইরূপ—'আমরা অনেক দূর পর্যন্ত তাঁহার সেই মেয়েলি নাকি সুরে সংগীত-চর্চা **শুনিতে শুনিতে** গেলাম।' ২. ধাতুর উত্তর **অন্ত, আ, আনো, তি** প্রত্যয় যোগ করিয়া : **পড়ন্ত** বেলা, **চলন্ত** গাড়ি, **ঘুমন্ত** ছেলে, **জীবন্ত** [**জ্যান্ত**] মানুষ, **দেখা** জিনিস, **শোনা** গান, **জানা** কথা, **ভাঙা** হাট, **রাঁধা** ভাত, **ভাজা** মাছ, **বানানো** গল্প, **কোঁচানো** ধুতি, **হারানো** বই, **জমানো** টাকা, **শেখানো** বুলি, **উঠতি** গুণ্ডা, **পড়তি** বয়েস ইত্যাদি। ৩. ঘটমান বর্তমান [Present Continuous] কালের দ্বারা। **আসছে** মাসে আমি দিল্লী যাবো। ৪. সংস্কৃত ধাতুর উত্তর **ক্ত, শানচ্, তব্য, অনীয়** ইত্যাদি প্রত্যয় যোগে : **মৃত** ব্যক্তি, **কৃত** কর্ম, **বর্তমান** কাল, **ধূমায়মান** পর্বত, **বক্তব্য** বিষয়, **কর্তব্য** কর্ম, **মাননীয়** ব্যক্তি, **স্মরণীয়** কথা, **বরণীয়** মানুষ।

● **ক্রিয়াবাচক** বা **ভাববাচক বিশেষ্য :** ধাতুর উত্তর প্রত্যয় যোগ করিয়া এমন কতকগুলি শব্দ গঠিত হয়, যাহারা একই সঙ্গে ক্রিয়া ও বিশেষ্যের অর্থ দ্যোতিত করে, তাহাদিগকে **ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য** [Gerund বা Verbal Noun] বলা হয়। **ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য** বা **ভাববাচক বিশেষ্য গঠনের উপায় :** ১. **অ, আ [ও], ই, আনি, আনো, আই, আও** প্রত্যয় যোগে : ছল্+অ= ছল : তার **ছল**-চাতুরি বোঝা ভার। দেখ্+আ=দেখা : '**দেখাশোনা** হয় নিতি নিতি।' যা+আ=যাওয়া : 'আমার নাই বা হলো পারে **যাওয়া**।' হাস্+ ই=হাসি : আমি তার **হাসির** অর্থ জানি। শাস্+আনি=শাসানি : তোমার **শাসানিতে** কেউ ভয় পায় না। সাজ্+আনো=সাজানো : তাদের **ঘর-সাজানো**

শেষ হয়েছে। লড়্+আই=লড়াই: '**লড়াই** গেছে থেমে।' ঘেরা+আও=ঘেরাও: পুলিশ ডাকাতের আড্ডাটাকে **ঘেরাও** করলো।

২. **অন, অনা, অনি, অনী, উনি, উনী, নি, নী, তি** প্রত্যয় যোগে: নাচ্+অন=নাচন: 'থামাও তোমার পাগুলে **নাচন**।' চাল্+অনা=চালনা: তিনি সেনাবাহিনীকে জয়ের পথে **চালনা** করিলেন। সর্+অনি=সরণি [পথ]; কাঁদ্+অনী=কাঁদনী; খাট্+উনি=খাটুনি; পিট্+উনি=পিটুনি; জ্বল্+উনি=জ্বলুনি; নাচ্+উনি=নাচুনি; কাট্+নি=কাট্‌নি [কাট্‌নী]; কাট্+তি=কাট্‌তি।

৩. সংস্কৃত ধাতুর উত্তর **অনট্, অল্, ঘঞ্** প্রভৃতি যোগে: গম্+অনট্=গমন, ভ্রম্+অনট্=ভ্রমণ, পা+অনট্=পান, জি+অল্=জয়, ভী+অল্=ভয়, ক্রী+অল্=ক্রয়, নট্+অল্=নাট, ভূ+ঘঞ্=ভাব, পঠ্+ঘঞ্=পাঠ ইত্যাদি।

● **পঙ্গু ক্রিয়া বা অসম্পূর্ণ রূপ ক্রিয়া:** এমন কতকগুলি ধাতু আছে, যাহাদের সকল ভাবের [mood] ও সকল কালের (tense) রূপ পাওয়া যায় না; অন্য ধাতুর সেই ভাবের বা সেই কালের রূপ ব্যবহার করিয়া কাজ চালাইয়া লইতে হয়। তাহাদের বলা হয় **পঙ্গু ক্রিয়া** বা **অসম্পূর্ণ ক্রিয়া**। যেমন: √যা ধাতুর পুরাঘটিত বর্তমানে 'গিয়াছে' এবং অতীতকালে 'গিয়াছিল' সংস্কৃত √'গম্' ধাতুরই বিবর্তিত বাংলা রূপ 'গ' ধাতু হইতে উৎপন্ন। √আছ্ ধাতুর ভবিষ্যৎকালে 'থাকিবে' √থাক্ ধাতুরই রূপ। √বট্ ধাতুর অতীতও নাই, ভবিষ্যৎও নাই। ইহারা পঙ্গু ক্রিয়া।

● **নঞর্থক ধাতু:** 'ন' এই অব্যয়ের সহিত 'হ্' ধাতুর যোগে 'নহ্' ধাতু গঠিত হয়; ইহাও সংযোগমূলক ধাতু। কিন্তু নেতিবাচক অর্থদ্যোতক বলিয়া ইহাকে নঞর্থক ধাতু বলা হয়। 'নহ্' ধাতু হইতে উত্তম পুরুষে নহি>নই, মধ্যম পুরুষে নহ>নয়, নহেন>নন [সম্ভ্রমার্থে], নহিস্>নস্ [অবজ্ঞার্থে] এবং প্রথম পুরুষে নহে>নয়, নহেন>নন [সম্ভ্রমার্থে] গঠিত হয়। 'নহ্' ধাতু হইতে জাত অসমাপিকা ক্রিয়ার সাধু বাংলায় রূপ—'নহিলে', চলিত বাংলায় 'নইলে'। যেমন: '**নইলে** মোদের রাজার সনে মিলব কি স্বত্বে?'

আবার, 'না' এই অব্যয়ের সহিত 'হ্' ধাতুর যোগে 'নাহি' ক্রিয়াপদটি গঠিত। 'নাহি' হইতে চলিত বাংলা 'নাই' ও 'নি' পদ দুইটি আসিয়াছে। ইহারা সকল পুরুষে ও সকল বচনে একই রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন: আমি **নাই**, তুমি **নাই**, সে **নাই**। আমি বলি **নি**, তুমি বলো **নি**, সে বলে **নি**। সেইজন্য ইহারা অব্যয় পদ।

সনন্ত ও যঙন্ত ধাতু: যে সকল ধাতুর উত্তর ইচ্ছার্থে 'সন্' প্রত্যয় যুক্ত হয়, তাহাদিগকে **সনন্ত ধাতু** বলে। সনন্ত ধাতুর প্রয়োগ বাংলায় নাই, কিন্তু সনন্ত শব্দের ব্যবহার আছে। সনন্ত ধাতুর সহিত 'আ' বা 'উ' প্রত্যয় যোগে কৃদন্ত শব্দ গঠিত হয়। যেমন: জ্ঞা+সন্+আ [উ]=জিজ্ঞাসা [জিজ্ঞাসু], পা+সন্+আ [উ]=পিপাসা [পিপাসু], মুচ্+সন্+আ [উ]=মুমুক্ষা [মুমুক্ষু], মৃ+সন্+আ [উ]=মুমূর্ষা [মুমূর্ষু], ভুজ্+সন্+আ [উ]=বুভুক্ষা [বুভুক্ষু], হন্+সন্+আ

[উ] = জিঘাংসা [জিঘাংসু], লভ্‌ + সন্‌ + আ [উ] = লিপ্সা [লিপ্সু], জি + সন্‌ + আ = জিগীষা, শ্রু + সন্‌ + আ = শুশ্রূষা, কিৎ + সন্‌ + আ = চিকিৎসা, বচ্‌ + সন্‌ + আ = বিবক্ষা।

যে সকল ধাতুর উত্তর পৌনঃপুন্য বা আতিশয্য অর্থে যঙ্‌ প্রত্যয় হয়, তাহাদিগকে **যঙন্ত ধাতু** বলে। বাংলায় যঙন্ত ধাতুর প্রযোগ নাই, কিন্তু যঙন্ত ধাতুর সহিত শানচ্‌ [মান] প্রত্যয় যোগ করিয়া যে পদ গঠিত হয়, বাংলায় কেবল তাহারই প্রয়োগ আছে। যেমন: জ্বল্‌ + যঙ্‌ [জাজ্বল্য] + শানচ্‌ [মান] = জাজ্বল্যমান, দুল্‌ + যঙ্‌ [= দোদুল্য] + শানচ্‌ [মান] দোদুল্যমান, রুদ্‌ + যঙ্‌ [= রোরুদ্য] + শানচ্‌ [মান] = রোরুদ্যমান, দীপ্‌ + যঙ্‌ [দেদীপ্য] + শানচ্‌ [মান] = দেদীপ্যমান।

কর্মের ভিত্তিতে ক্রিয়াকে আবার তিন শ্রেণীতে বিন্যস্ত [যায়]। এক. সকর্মক ক্রিয়া, [দুই.] অকর্মক ক্রিয়া এবং তিন. দ্বিকর্মক ক্রিয়া।

● **সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়া:** যে সকল ক্রিয়ার কর্ম থাকে, তাহাদের বলা হয় **সকর্মক ক্রিয়া**। যেমন: 'রামানন্দ **পেলেন** গুরুর পদ।' "কি ফল **লভিনু** হায়।' এখানে প্রথম বাক্যে 'পেলেন' ক্রিয়ার একটি কর্ম 'পদ' এবং দ্বিতীয় বাক্যে 'লভিনু' ক্রিয়ারও একটি কর্ম 'ফল'। কাজেই, ইহারা সকর্মক ক্রিয়া। তেমনি—খাওয়া, লেখা, পড়া, করা, ধরা, মারা, বলা, বাজান, কাটা, ভাঙা, দেখা ইত্যাদি সকর্মক ক্রিয়া। আবার, কোন কোন সকর্মক ক্রিয়ার দুইটি কর্ম থাকে, তাহাদের বলা হয় **দ্বিকর্মক ক্রিয়া**। যেমন: তিনি আমাকে চিঠি লিখবেন। আমি তোমাকে একটি গল্প বলব। 'অপু, ভালো হয়ে উঠলে তুই আমাকে বেলগাড়ি দেখাবি?' এই তিনটি বাক্যের প্রথমটিতে 'লিখবেন' ক্রিয়ার 'আমাকে' ও 'চিঠি' দুইটি কর্ম আছে, দ্বিতীয়টিতে 'বলব' ক্রিয়ার 'তোমাকে' ও 'গল্প' দুইটি কর্ম এবং তৃতীয়টিতে 'দেখাবি' ক্রিয়ার 'আমাকে' ও 'বেলগাড়ি' দুইটি কর্ম আছে। কাজেই, এই ক্রিয়াগুলি দ্বিকর্মক। আর, যে ক্রিয়ার কর্ম থাকে না, তাহাকে বলে **অকর্মক ক্রিয়া**। যেমন: এ পৃথিবীতে কেউ হাসে, কেউ কাঁদে। সে নাচে। শকুন্তলা ভাবে। এই বাক্যগুলিতে 'হাসে', 'কাঁদে', 'নাচে', 'ভাবে'—এই ক্রিয়াগুলির কর্ম নাই। ইহারা তাই অকর্মক ক্রিয়া। তেমনি—চলা, হাঁটা, বেড়ান, ঘুমান, মরা, ডোবা ইত্যাদি অকর্মক ক্রিয়া।

অকর্মক ক্রিয়ার সকর্মক ক্রিয়ায় রূপান্তর: সমধাতুজ কর্ম যোগে অকর্মক ক্রিয়া সকর্মক ক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়: যেমন: 'কহিলেন শেষে ক্রূর হাসি **হেসে**।' আর মায়া-কান্না **কাঁদতে** হবে না। সে মণিপুরী নাচ **নাচবে**। তাছাড়া, অতিরিক্ত কর্ম যোগ করিয়াও অকর্মক ক্রিয়াকে সকর্মক করা হয়। যেমন—শকুন্তলা রাজা দুষ্মন্তের **কথা** ভাবছিলেন।

সকর্মক ক্রিয়ার অকর্মক ক্রিয়ায় রূপান্তর: বইটি পড় [সকর্মক], মন দিয়া পড় [অকর্মক], ভাত খাও [সকর্মক], তুমি একবেলা খাও [অকর্মক]।

● **মৌলিক ক্রিয়া, যৌগিক ক্রিয়া ও সংযোগমূলক ক্রিয়া:** সিদ্ধধাতু বা মৌলিক ধাতুর উত্তর ক্রিয়া-বিভক্তি যোগ করিয়া যে ক্রিয়া গঠিত হয়, তাহাকে বলে

মৌলিক ক্রিয়া। যেমন: '**দুলিতেছে** তরী, **ফুলিতেছে** জল, **ভুলিতেছে** মাঝি পথ।' অসমাপিকা ক্রিয়ার সহিত মৌলিক ক্রিয়া যোগ করিয়া যে ক্রিয়া গঠিত হয়, তাহাকে বলে যৌগিক ক্রিয়া। যেমন: মেয়েটি অজ্ঞান **হইয়া পড়িয়াছে।** 'ধানের ক্ষেতে বাতাস **নেচে যায়** চপল ছেলের মতো। 'শিলা রাশি রাশি **পড়িছে খসে।**' আবার, বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের সহিত মৌলিক ক্রিয়া যুক্ত হইয়া যে ক্রিয়া গঠিত হয়, তাহাকে বলে সংযোগমূলক ক্রিয়া। যেমন: 'পরে মাস-দেড়ে ভিটেমাটি ছেড়ে **বাহির হইনু** পথে।' 'রামকানাই কাগজ কলম লইয়া **প্রস্তুত হইলেন।**' 'পুঁথির শুকনো পাতা **খস্‌খস্‌ গজ্‌গজ্‌ করিতে লাগিল।**'

॥ অনুসরণী ॥

*১. উদাহরণসহ বুঝাইয়া দাও:

সাধিত ধাতু, মা. '৬৪, উ. মা, '৬০, ক. প্রা. '৬২ ; নামধাতু, মা. '৫৬ ; উ. মা. '৬১, '৬৪, '৬৮, '৭০ ; ক. প্রা. '৬১, ব. প্র. '৬২ ; যৌগিক ক্রিয়া, মা. '৫৮, '৬০, '৬২ ; উ. মা. '৬২, [কম্পার্ট.] '৬৯ ; ক. প্রা. '৬৩ ; মৌলিক ক্রিয়া, ধ্বন্যাত্মক ধাতু, মা. '৫৯ ; কর্মবাচ্যের ক্রিয়া, ক্রিয়াবাচক বিশেষণ, ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য, পঙ্গু ক্রিয়া বা অসম্পূর্ণ ক্রিয়া, প্রযোজক বা ণিজন্ত ক্রিয়া, মা. '৫৫, '৫৯, '৬৩ ; নঞর্থক ধাতু উদ্দেশ্যার্থক বা নিমিত্তার্থক অসমাপিকা ক্রিয়া, সিদ্ধ ধাতু, উ. মা. '৬৯ ; অকর্মক ক্রিয়া। উ. মা. '৭০

*২. নিম্নলিখিত শ্রেণীর ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া চারটি বাক্য রচনা কর। যৌগিক ক্রিয়া, প্রযোজক ক্রিয়া, ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া, দ্বিকর্মক ক্রিয়া। মা. '৬১

*৩. পার্থক্য বুঝাইয়া দাও: মৌলিক ক্রিয়া ও যৌগিক ক্রিয়া, উ. মা. '৬০ ; নাম-প্রকৃতি ও ধাতু-প্রকৃতি, সনন্ত ও যঙন্ত ধাতু ; অকর্মক ও সকর্মক ক্রিয়া ; যৌগিক ক্রিয়া ও সংযোগমূলক ক্রিয়া।

৪. কি কি উপায়ে অকর্মক ক্রিয়াকে সকর্মক ক্রিয়ায় রূপান্তরিত করা যায়? 'সে ঘুমিয়েছে'—এই বাক্যের অকর্মক ক্রিয়াটিকে সকর্মক ক্রিয়ায় পরিবর্তিত কর।

৫. 'খা' ও 'পড়্‌' [বই পড়া]—এই সকর্মক ধাতু দুইটিকে অকর্মকরূপে ব্যবহার কর।

৬. দৃষ্টান্ত দাও:

ক্রিয়াবাচক বিশেষণের ভাবে প্রয়োগ, ক্রিয়াবাচক বিশেষণরূপে ঘটমান বর্তমান, অনুসর্গরূপে অসমাপিকা ক্রিয়া, নামধাতুরূপে বিশেষণ, ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যরূপে অসমাপিকা ক্রিয়া, ক্রিয়াবাচক বিশেষণ-রূপে অসমাপিকা ক্রিয়া, অসমাপিকা ক্রিয়ার দ্বিত্ব প্রয়োগ।

৭. ধাতু ও ক্রিয়াপদের পার্থক্য কি? মৌলিক ও সাধিত ধাতু কাহাকে বলে? দুইটি উদাহরণ সহযোগে বুঝাইয়া দাও। উ. মা. [কম্পার্ট.] '৭০

● ক্রিয়ার কাল ●

ক্রিয়া-সংঘটনের সময়কে ব্যাকরণে বলা হয় **ক্রিয়ার কাল।** সময়কে কাজের সুবিধার জন্য তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। কাজেই, ক্রিয়ার কাল তিন প্রকার: ক. **বর্তমান**, খ. **অতীত** ও গ. **ভবিষ্যৎ।**

ক. বর্তমান কাল: Present Tense.

যে ক্রিয়ার সংঘটন-কাল বর্তমান, অর্থাৎ যে ক্রিয়া এখন সংঘটিত হইতেছে,

তাহার কালকে বলা হয় **বর্তমান কাল**। বর্তমান কালের আবার নানা প্রকারের রূপভেদ আছে এবং সেই রূপভেদ অনুসারে একই কালে বিভিন্ন রূপের ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন: 'জল **পড়ে**, পাতা **নড়ে**।' '**দুলিতেছে** তরী, **ফুলিতেছে** জল, **ভুলিতেছে** মাঝি পথ।' '**ছিঁড়িয়াছে** পাল।' '**কে আছ** জোয়ান, **হও** আগুয়ান।'

দৃষ্টান্তগুলিতে 'পড়ে', 'নড়ে', 'দুলিতেছে', 'ফুলিতেছে', 'ভুলিতেছে', 'ছিঁড়িয়াছে', 'আছ' এবং 'হও'—এই ক্রিয়াপদগুলি একই বর্তমান কালের; কিন্তু ইহাদের রূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার।

ক্রিয়া-সংঘটনকালের সূক্ষ্মতার বিচারে ক্রিয়ার বর্তমান কাল চার প্রকারের হইয়া থাকে: ১. **সাধারণ** বা **নিত্য বর্তমান**, ২. **ঘটমান বর্তমান**, ৩. **পুরাঘটিত বর্তমান** ও ৪. **বর্তমান কালের অনুজ্ঞা**।

১. ক **সাধারণ** বা **নিত্য বর্তমান**: Present Indefinite: যেখানে ক্রিয়াটি স্বভাবতঃ ঘটে বা বরাবর ঘটিয়া থাকে, তাহার কালকে সাধারণ বর্তমান বা নিত্য বর্তমান বলে। সাধারণ বা নিত্য বর্তমানে মূল ধাতুর সহিত কোনও কালবাচক প্রত্যয় যুক্ত হয় না। উত্তম, মধ্যম ও প্রথম পুরুষে যথাক্রমে পুরুষবাচক বিভক্তি 'ই', 'অ' এবং 'এ' যুক্ত হয়। মধ্যম পুরুষে সম্ভ্রমার্থে 'এন' এবং তুচ্ছার্থে 'ইস্' যুক্ত হইয়া থাকে। তাহা হইলে 'কর্' ধাতুর উত্তম পুরুষে 'কর'+ই=করি, মধ্যম পুরুষে 'কর্' +অ=কর, 'কর্'+এন=করেন, 'কর্'+ইস্=করিস্ এবং প্রথম পুরুষে 'কর্'+এ= করে, 'কর্'+এন=করেন [সম্ভ্রমার্থে] হয়। যেমন: 'তোমারে **করি** নমস্কার।' 'মন্ত্রশক্তিতে তোমরা বিশ্বাস **কর** না, কারণ আজকাল কেউ **করে** না, কিন্তু আমি **করি**।' 'রামচন্দ্র কি এখনও সেতুবন্ধনের কাজে ব্যস্ত **আছেন**।'

খ সাধারণ বর্তমান বা নিত্য বর্তমান কালের ক্রিয়াকে অতীত কালে সংঘটিত কোন ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনায় ব্যবহার করিলে তাহার কালকে **ঐতিহাসিক বর্তমান** বলে। যেমন: গৌতম বুদ্ধ কপিলাবস্তু নগরে জন্মগ্রহণ **করেন**। ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু **হয়**। সম্রাট হইয়া অশোক কলিঙ্গ দেশ আক্রমণ **করেন**।

গ. **অতীত কালের অর্থে বর্তমান কালের ক্রিয়ার ব্যবহার**: সে বছর আমরা ভাগলপুর চলে **যাই** এবং এক বছর পরে আবার কলকাতায় ফিরে **আসি**।

২. **ঘটমান বর্তমান**: Present Continuous: যে ক্রিয়ার কার্য এখনও সংঘটিত হইতেছে, তাহার কালকে বলা হয় ঘটমান বর্তমান। ঘটমান বর্তমানে মূল ধাতুর সহিত 'ইতে' প্রত্যয় [অসমাপিকা ক্রিয়া-প্রত্যয়], 'আছ্' ধাতু এবং পুরুষবাচক ক্রিয়া-বিভক্তি [অর্থাৎ 'ই', 'অ' এবং 'এ'] যোগ করিয়া ক্রিয়া-রূপ গঠিত হয়। উত্তম পুরুষে 'কর্' ধাতু+'ইতে'+'আছ্' ধাতু+'ই'=করিতেছি, মধ্যম পুরুষে 'কর্' ধাতু+'ইতে'+'আছ্' ধাতু+অ [এন, ইস্]=করিতেছ, [করিতেছেন, করিতেছিস্] এবং প্রথম পুরুষ 'কর্' ধাতু+'ইতে'+'আছ্' ধাতু+এ [এন্]=করিতেছে [করিতেছেন] হয়। ইহা হইল সাধু ভাষার রূপ। চলিত ভাষার রূপ হইল:

করছি, করছ [করছেন, করছিস্], করছে [করছেন]। যেমন: 'হাজার বছর ধরে আমি পথ **হাঁটিতেছি** পৃথিবীর পথে।' '**দুলিতেছে** তরী, **ফুলিতেছে** জল, **ভুলিতেছে** মাঝি পথ।'

৩. **পুরাঘটিত বর্তমান:** Present Perfect: যে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার ফল এখনও বর্তমান, তাহার কালকে বলা হয় পুরাঘটিত বর্তমান। পুরাঘটিত বর্তমানে মূল ধাতুর সহিত 'ইয়া' প্রত্যয় [অসমাপিকা ক্রিয়া-প্রত্যয়], 'আছ্' ধাতু এবং ক্রিয়া-বিভক্তি ['ই', 'অ' এবং 'এ'] যুক্ত হইয়া ক্রিয়া-রূপ গঠিত হয়। 'কর্' ধাতুর উত্তম পুরুষে 'কর্' ধাতু+'ইয়া'+'আছ্'+ই= করিয়াছি [>চলিত বাংলায়—করেছি], মধ্যম পুরুষে 'কর্' ধাতু+'ইয়া'+'আছ্'+অ [এন, ইস্]=করিয়াছ [>চলিত বাংলায়—করেছ], করিয়াছেন [>চলিত বাংলায়—করেছেন], করিয়াছিস্ [>চলিত বাংলায়—করেছিস্] এবং প্রথম পুরুষে 'কর্' ধাতু='ইয়া'+'আছ্'+এ [এন]=করিয়াছে [>চলিত বাংলায়—করেছে], করিয়াছেন [>চলিত বাংলায়—করেছেন] হয়। যেমন: 'দেখিতে **গিয়াছি** পর্বতমালা, দেখিতে **গিয়াছি** সিন্ধু।' '**ছিঁড়িয়াছে** পাল।' 'আসি অলক্ষ্যে **দাঁড়ায়েছে** তারা।'

৪. **বর্তমান কালের অনুজ্ঞা:** Present Imperative Mood: বর্তমান কালে প্রার্থনা, আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, অনুমতি ইত্যাদি বুঝাইতে বর্তমান কালের অনুজ্ঞা হয়। ইহা কেবলমাত্র মধ্যম পুরুষের এবং প্রথম পুরুষের ক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়। বর্তমান কালের অনুজ্ঞায় মূল ধাতুর সহিত 'অ', 'উন', 'উক', 'ইস্'—এই প্রত্যয়গুলি যুক্ত হইয়া, আবার কখনও বা কোনও প্রত্যয় প্রযুক্ত না হইয়াই ক্রিয়া-রূপ গঠিত হইয়া থাকে। 'কর্' ধাতুর বর্তমান কালের অনুজ্ঞায় মধ্যম পুরুষে 'কর্'+অ= কর, সম্ভ্রমার্থে 'কর্'+উন=করুন, তুচ্ছার্থে কর্+০='কর্', প্রথম পুরুষে 'কর্+উক্ =করুক, সম্ভ্রমার্থে 'কর্'+উন=করুন। যেমন: 'অন্তর মম বিকশিত **কর**, অন্তরতর হে।' 'ভারতেরে সেই স্বর্গে **করো** জাগরিত।' 'অতএব দয়া করি **কহো** দয়াবতি।' '**ওঠো**, প্রতিজ্ঞা পালন **করো**।'

খ অতীত কাল: Past Tense.

যে ক্রিয়ার সংঘটন-কাল অতীত কালে, অর্থাৎ যে ক্রিয়া অতীত কালে সংঘটিত হইয়া গিয়াছে এবং তাহার ফল বর্তমান নাই, তাহার কালকে **অতীত কাল** বলা হয়। যেমন: 'পঁচিশ বৎসর পূর্বে একবার আমি কলকাতায় **এসেছিলুম**।'

ক্রিয়া-সংঘটনকালের সূক্ষ্মতার বিচারে অতীত কালকে চার ভাগে বিভক্ত করা যায়: ১. **সাধারণ** বা **নিত্য অতীত**, ২. **ঘটমান অতীত**, ৩. **পুরাঘটিত অতীত** ও ৪. **নিত্যবৃত্ত অতীত**।

উল্লিখিত কাল-বিভাগ অনুসারে অতীত কালের ক্রিয়ায় ভিন্ন ভিন্ন রূপ রহিয়াছে।

১. **সাধারণ** বা **নিত্য অতীত:** Past Indefinite: যে ক্রিয়া অতীত কালে

সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে এবং তাহার ফল বর্তমান নাই, তাহার কালকে সাধারণ অতীত বা নিত্য অতীত বলা হয়। সাধারণ বা নিত্য অতীতে মূল ধাতুর সহিত অতীত কাল-বাচক 'ইল্' প্রত্যয় এবং পুরুষানুসারী ক্রিয়াবিভক্তি [আম, এ, অ, এন, ই] যুক্ত হইয়া ক্রিয়া-রূপ গঠিত হয়। 'কর্' ধাতুর উত্তম পুরুষে 'কর্'+'ইল্'+আম=করিলাম [>চলিত বাংলায়—করলাম, করলুম, করলেম], মধ্যম পুরুষে 'কর্'+'ইল্'+এ [এন, ই]=করিলে [>চলিত বাংলায়—করলে], সম্ভ্রমার্থে—করিলেন [>চলিত বাংলায়—করলেন], তুচ্ছার্থে—করিলি [>চলিত বাংলায়—করলি], এবং প্রথম পুরুষে 'কর্'+'ইল্'+অ [এন]=করিল [>চলিত বাংলায়—করল], সম্ভ্রমার্থে—করিলেন [চলিত বাংলায়—করলেন] ক্রিয়া-রূপ হয়। যেমন: '**আনিলাম** অপরিচিতের নাম ধরণীতে।' "নদীকে জিজ্ঞাসা **করিলাম**, 'নদী, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ'?" 'রামানন্দ **পেলেন** গুরুর পদ।'

২. **ঘটমান অতীত:** Past Continuous: যে ক্রিয়া অতীত কালে সংঘটিত হইতেছিল, অর্থাৎ অতীতে যে ক্রিয়ার কাজ চলিতেছিল, তাহার কালকে **ঘটমান অতীত** বলা হয়। ঘটমান অতীতে মূল ধাতুর সহিত 'ইতে' প্রত্যয় 'আছ্' ধাতু, অতীত কালবাচক 'ইল্' প্রত্যয় এবং পুরুষানুসারী ক্রিয়া-বিভক্তি [আম, এ, অ, এন, ই] যুক্ত হইয়া ক্রিয়া-রূপ গঠিত হয়। 'কর্' ধাতুর উত্তম পুরুষে 'কর্'+'ইতে'+'আছ্'+'ইল্'+আম=করিতেছিলাম [>চলিত বাংলায়—করছিলাম, করছিলুম, করছিলেন, করতেছিলাম, মধ্যম পুরুষে 'কর্,+'ইতে'+'আছ্'+'ইল'+এ [এন, ই] =করিতেছিলে [>চলিত বাংলায়—করছিলে], সম্ভ্রমার্থে—করিতেছিলেন [>চলিত বাংলায়—করছিলেন] তুচ্ছার্থে—করিতেছিলি [>চলিত বাংলায়—করছিলি; কোথাও কোথাও—করছিলিস্] এবং প্রথম পুরুষে 'কর্'+'ইতে'+'আছ'+'ইল্'+অ =করিতেছিল [>চলিত বাংলায়—করছিল] সম্ভ্রমার্থে—করিতেছিলেন [>চলিত বাংলায়—করছিলেন]—এই ক্রিয়া-রূপগুলি হয়। যেমন: '**বলিতেছিলাম** বসি একধারে।' '**বাঁধিতেছিল** সে দীর্ঘ চিকুর।' '**ডাকতেছিল** শ্যামল দুটি গাই।'

৩. **পুরাঘটিত অতীত:** Past Perfect: অতীত কালে সংঘটিত হইয়াছিল, এমন ক্রিয়ার কালকে **পুরাঘটিত অতীত** বলা হয়। পুরাঘটিত অতীত মূল ধাতুর সহিত 'ইয়া' প্রত্যয়, 'আছ্' ধাতু+অতীত কালবাচক 'ইল্' প্রত্যয় এবং সর্বশেষে পুরুষানুসারী ক্রিয়াবিভক্তি [আম, এ, অ, এন, ই] যুক্ত হইয়া ক্রিয়া-রূপ গঠিত হয়। 'কর্' ধাতুর উত্তম পুরুষে 'কর্'+'ইয়া'+'আছ্'+'ইল্'+আম=করিয়াছিলাম [>চলিত বাংলায়—করেছিলাম, করেছিলুম, করেছিলেন], মধ্যম পুরুষে 'কর্'+'ইয়া' +'আছ্'+'ইল্'+এ=করিয়াছিলে [>চলিত বাংলায়—করেছিলে], সম্ভ্রমার্থে—করিয়াছিলেন [>চলিত বাংলায়—করেছিলেন], তুচ্ছার্থে করিয়াছিলি [>চলিত বাংলায়—করেছিলি; কোথাও কোথাও—করেছিলিস্], প্রথম পুরুষে 'কর্'+'ইয়া'+ 'আছ্'+'ইল্'+অ=করিয়াছিল [>চলিত বাংলায়—করেছিল], সম্ভ্রমার্থে—করিয়াছিলেন [>চলিত বাংলায়—করেছিলেন] এই ক্রিয়া-রূপগুলি হয়। যেমন:

'চোখের আলোয় **দেখেছিলেম**।' '**দাঁড়িয়েছিলুম** চণ্ডীমণ্ডপের বারাণ্ডায়।' 'তুমি আমায় **ডেকেছিলে** ছুটির নিমন্ত্রণে।' 'লোক **জুটেছিল** কম নয়।'

৪. **নিত্যবৃত্ত অতীত :** Habitual Past : অতীতে প্রায়ই ঘটিত এইরূপ অর্থে ক্রিয়ার যে কাল হয়, তাহাকে **নিত্যবৃত্ত অতীত** বলা হয়। নিত্যবৃত্ত অতীতে মূল ধাতুর সহিত অতীত কালবাচক 'ইত্' প্রত্যয় এবং পুরুষানুযায়ী ক্রিয়া-বিভক্তি [আম, এ, অ, এন, ইস্] যুক্ত হইয়া ক্রিয়ারূপ গঠিত হয়। 'কর্' ধাতুর উত্তম পুরুষে 'কর্+'ইত্'+আম=করিতাম [>চলিত বাংলায়—করতাম, করতুম, করতেম], মধ্যম পুরুষে 'কর্'+'ইত্'+এ=করিতে [>চলিত বাংলায়—করতে], সম্ভ্রমার্থে—করিতেন [>চলিত বাংলায়—করতেন], তুচ্ছার্থে—করিতিস্ [>চলিত বাংলায়—করতিস্], প্রথম পুরুষে 'কর্'+'ইত্'+অ [এন]=করিত [>চলিত বাংলায়—করত], সম্ভ্রমার্থে—করিতেন [>চলিত বাংলায়—করতেন]—এই ক্রিয়া-রূপগুলি হয়। যেমন : 'কুরঙ্গিণী সঙ্গে রঙ্গে **নাচিতাম** বনে, **গাইতাম** গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি।' 'সেখানে **ছুটিতাম** সকালে উঠি।'

গ. **ভবিষ্যৎ কাল :** Future Tense.

যে ক্রিয়ার সংঘটন-কাল ভবিষ্যৎ কালে অর্থাৎ যে ক্রিয়া ভবিষ্যৎ কালে সংঘটিত হইবে, তাহার কালকে ভবিষ্যৎ কাল বলা হয়। যেমন : 'প্রভাতেই **যাব** এই সীমা ছেড়ে, **দেব** আমার অহংকার দূর করে তোমার বিশ্বলোকে।' ভবিষ্যৎ কালকে চার ভাগে বিভক্ত করা যায়: ১. **সাধারণ ভবিষ্যৎ**, ২. **ঘটমান ভবিষ্যৎ**, ৩. **পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ** ও ৪. **ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞা**।

এই কাল-বিভাগ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া-রূপ গঠিত হইয়া থাকে।

১. **সাধারণ ভবিষ্যৎ :** Future Indefinite : যে ক্রিয়া এখনও সংঘটিত হয় নাই, কিন্তু পরে সংঘটিত হইবে, তাহার কালকে সাধারণ ভবিষ্যৎ বলে। সাধারণ ভবিষ্যতে মূল ধাতুর সহিত ভবিষ্যৎ কালবাচক 'ইব্' প্রত্যয় এবং পুরুষানুসারী ক্রিয়া-বিভক্তি [অ, এ, এন, ই] যুক্ত হইয়া ক্রিয়া-রূপ গঠিত হয়। 'কর্' ধাতুর উত্তম পুরুষে 'কর্'+'ইব্'+অ=করিব [>চলিত বাংলায়—করব], মধ্যম পুরুষে 'কর্'+'ইব্'+এ [এন, ই]=করিবে [>চলিত বাংলায়—করবে], সম্ভ্রমার্থে—করিবেন [>চলিত বাংলায়—করবেন], তুচ্ছার্থে—করিবি [>চলিত বাংলায়—করবি], প্রথম পুরুষে 'কর্'+'ইব্'+এ [এন]=করিবে [>চলিত বাংলায়—করবে], সম্ভ্রমার্থে—করিবেন [>করবেন]—এই ক্রিয়া-রূপগুলি হয়। যেমন : 'আমি **ঢালিব** করুণাধারা, আমি **ভাঙ্গিব** পাষাণকারা।' 'প্রতিভার তপে সে ঘটনা **হবে, লাগিবে** না তার বেশি।' '**উদিবে** সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্বার।'

২. **ঘটমান ভবিষ্যৎ :** Future Continuous : যে ক্রিয়া ভবিষ্যতে সংঘটিত হইতে থাকিবে অর্থাৎ যে ক্রিয়ার কাজ ভবিষ্যতে চলিতে থাকিবে, তাহার কালকে ঘটমান ভবিষ্যৎ বলা হয়। ঘটমান ভবিষ্যতে মূল ধাতুর সহিত 'ইতে' প্রত্যয় [অসমাপিকা ক্রিয়া-প্রত্যয়] যুক্ত হয় এবং তাহার পরে 'আছ্' [>'থাক্'

পৌঁছিয়া থাকিবে। ৩. অতীতকালে বর্তমান কালের প্রয়োগ: আমি আজ বিকালেই **আসছি**। ৪. অতীত কালে ভবিষ্যৎ কালের প্রয়োগ: **আসবেই** যদি, তবে কাল এলে না কেন? ৫. ভবিষ্যৎ কালে বর্তমান কালের প্রয়োগ: কাল ভোরে আমি দিল্লী **যাচ্ছি**। ৬. ভবিষ্যৎ কালে অতীত কালের প্রয়োগ: সে এখনও এলো না, আমাদের **ডোবালো** দেখ্‌ছি।

●ক্রিয়ার ভাব

বাক্যে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইবার রীতিকে বলা হয় **ক্রিয়ার ভাব** বা **প্রকার** [Mood]। "বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদে কর্তার বিশেষ অবস্থা, অথবা কর্তৃ-সম্বন্ধীয় বিশেষ কোনও ক্রিয়া বুঝায়: এই ক্রিয়ার ভাব যাহাতে সূচিত হয়, তাহাকে বলা যাইতে পারে ক্রিয়ার ভাব [ইংরেজিতে Mood; রামমোহন ইহাকেই বলিয়াছেন 'ক্রিয়ার প্রকার']।" ক্রিয়ার ভাব বা প্রকারকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়: ১. নির্দেশক ভাব [Indicative Mood], ২. অনুজ্ঞা [Imperative Mood] ও ৩. আপেক্ষিক ভাব বা ঘটনান্তরাপেক্ষিত ভাব [Subjunctive Mood]।

১. **নির্দেশক ভাব** [Indicative Mood]। যখন কোন ক্রিয়ার দ্বারা কোন কাজ হওয়া বা না-হওয়া বুঝায় কিংবা কোন প্রশ্ন বা বিস্ময়ের দ্বারা কাজটি নির্দেশিত হয়, তখন তাহাকে নির্দেশক বা নির্ধারক বা অবধারক ভাব বলা হয়। যেমন: 'সে গান **গাহিত**, শাস্ত্র **পড়িত না**।' 'ও কি আর **লাফায়**?' 'আহা, **কী দেখিলাম**!'

২. **অনুজ্ঞা ভাব** [Imperative Mood]: কিছু করিবার আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, অনুমতি, আশীর্বাদ, কামনা বা প্রার্থনা ইত্যাদি বুঝাইলে ক্রিয়ার যে বিশেষ রীতি প্রযুক্ত হয়, তাহাকে বলে অনুজ্ঞা ভাব। যেমন: 'পাখিটাকে শিক্ষা **দাও** [আদেশ]।' 'যাত্রা **করো** যাত্রীদল [আদেশ]।' 'সদা সত্য কথা **বলিও** [উপদেশ]।' 'বৈরাগীর উত্তরীয় পতাকা করিয়া **নিয়ো** [উপদেশ]!' তোমাদের কল্যাণ **হোক** [আশীর্বাদ]। 'বল **দাও**, মোরে বল **দাও** [প্রার্থনা]।' 'তোমারি **হউক** জয় [কামনা]।'

৩. **আপেক্ষিক ভাব** বা **ঘটনান্তরাপেক্ষিত ভাব** [Subjunctive Mood]: কোন যৌগিক বাক্যে যদি কোন একটি বাক্যের অর্থ অন্য একটি বাক্যের অপেক্ষায় থাকে, তবে তাহা যে বাক্যের অপেক্ষায় থাকে, তাহার ক্রিয়ার ভাবকে আপেক্ষিক ভাব বা ঘটনান্তরাপেক্ষিত ভাব বলা হয়। যেমন: 'যদি তোমার উইল করিবার ইচ্ছা **থাকে** তো বলো।' যদি মন দিয়া লেখাপড়া **কর**, তবে জীবনে উন্নতি **করিবে**। 'যদি বারণ **করো** তবে গাহিব না।' 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না **আসে** তবে একলা চলোরে।'

● ক্রিয়া-বিভক্তি

কাল ও পুরুষানুসারে যে বর্ণ বা বর্ণ-সমষ্টি ধাতুর উত্তর যুক্ত হইয়া ক্রিয়াপদ গঠন করে, সেই বর্ণ বা বর্ণ-সমষ্টিকে ধাতু-বিভক্তি বা ক্রিয়া-বিভক্তি বলা হয়। যেমন: 'কর্' [মূল ধাতু]+'ইত্'+এন=করিতেন। এখানে 'ইত্'+এন='ইতেন' হইল ক্রিয়া-বিভক্তি। লক্ষণীয় যে, এখানে 'ইত্' কালবাচক প্রত্যয়। অন্যান্য কালবাচক প্রত্যয়ও বাংলায় আছে। যেমন: 'ইল্', 'ইব্'। সে যাহা হউক, এখানে 'ইত্' কালবাচক প্রত্যয়ের সহিত পুরুষবাচক [প্রথম-পুরুষ—সম্ভ্রমার্থে] বিভক্তি 'এন' যুক্ত হইয়া ক্রিয়া-বিভক্তি গঠিত হইয়াছে। বাংলায় কালবাচক প্রত্যয় এবং পুরুষবাচক বিভক্তি যুক্ত হইয়া ক্রিয়া-বিভক্তি গঠিত হয়।

● ক্রিয়ার রূপ

ক্রিয়া-বিভক্তি সহযোগে ক্রিয়া রূপময় হইয়া উঠে। নীচে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন পুরুষের ক্রিয়া-বিভক্তির রূপ প্রদত্ত হইল। [ ] বন্ধনী-চিহ্নের মধ্যে চলিত ভাষার ক্রিয়া-বিভক্তি দেওয়া হইয়াছে:

বর্তমান কাল

	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	প্রথম পুরুষ
নিত্য বর্তমান	ই	অ, ইস্, এন	এ, এন
ঘটমান „	ইতেছি [ছি]	ইতেছ, ইতেছিস্, ইতেছেন [ছ, ছিস্, ছেন]	ইতেছে, ইতেছেন [ছে, ছেন]
পুরাঘটিত „	ইয়াছি [এছি]	ইয়াছ, ইয়াছিস্, ইয়াছেন [এছ, এছিস্, এছেন]	ইয়াছে, ইয়াছেন [এছে, এছেন]
অনুজ্ঞা „	×	অ, উন	উক, উন

অতীত কাল

সাধারণ বা নিত্য অতীত	ইলাম [লাম, লুম, লেম]	ইলে, ইলি, ইলেন [লে, লি, লেন]	ইল, ইলেন [ল, লেন]
নিত্যবৃত্ত „	ইতাম [তাম, তুম, তেম]	ইতে, ইতিস্, ইতেন [তে, তিস্, তেন]	ইত, ইতেন [ত, তেন]
ঘটমান „	ইতেছিলাম [ছিলাম, ছিলুম, ছিলেম]	ইতেছিলে, ইতিছিলি, ইতেছিলেন [ছিলে, ছিলি, ছিলেন]	ইতেছিল, ইতেছিলেন [ছিল, ছিলেন]

	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	প্রথম পুরুষ
পুরাঘটিত অতীত	ইয়াছিলাম [এছিলাম, এছিলুম, এছিলেম]	ইয়াছিলে, ইয়াছিলি, ইয়াছিলেন [এছিলে, এছিলি, এছিলেন]	ইয়াছিল, ইয়াছিলেন [এছিল, এছিলেন]

ভবিষ্যৎ কাল

সাধারণ ভবিষ্যৎ	ইব [ব]	ইবে, ইবি, ইবেন [বে, বি, বেন]	ইবে, ইবেন [বে, বেন]
ঘটমান „	ইতে থাকিব [তে থাকব]	ইতে থাকিব, ইতে থাকিবি, ইতে থাকিবেন [তে থাকবে, তে থাকবি, তে থাকবেন]	ইতে থাকিবে, ইতে থাকিবেন [তে থাকবে, ইতে থাকবেন]
পুরাঘটিত „	ইয়া থাকিব [এ থাকব]	ইয়া থাকিবে, ইয়া থাকিবি, ইয়া থাকিবেন [এ থাকবে, এ থাকবি, এ থাকবেন]	ইয়া থাকিবে, ইয়া থাকিবেন [এ থাকবে, এ থাকবেন]
অনুজ্ঞা „	×	ইবে, ইও, ইবি, ইস্, ইবেন [বে, ও, বি, ইস্, বেন]	ইবে, ইবেন [বে, বেন]

‘কর্’

বর্তমান কাল

	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	প্রথম পুরুষ
সাধারণ বা নিত্য বর্তমান	করি	কর, করিস্, করেন	করে, করেন
ঘটমান „	করিতেছি [করছি]	করিতেছ, করিতেছিস্, করিতেছেন [করছ, করছিস্, করছেন]	করিতেছে, করিতেছেন [করছে, করছেন]
পুরাঘটিত „	করিয়াছি [করেছি]	করিয়াছে, করিয়াছিস্, করিয়াছেন [করেছ, করেছিস্, করেছেন]	করিয়াছে, করিয়াছেন [করেছে, করেছেন]
অনুজ্ঞা „	×	কর, কর্, করুন	করুক, করুন

অতীত কাল

	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	প্রথম পুরুষ
সাধারণ বা নিত্য অতীত	করিলাম [করলাম, করলুম, করলেম]	করিলে, করিলি, করিলেন [করলে, করলি, করলেন]	করিল, করিলেন [করল, করলেন]
নিত্যবৃত্ত „	করিতাম [করতাম, করতুম, করতেম]	করিতে, করিতিস্, করিতেন [করতে, করতিস্, করতেন]	করিত, করিতেন [করত, করতেন]
ঘটমান „	করিতেছিলাম [করছিলাম, করছিলুম, করছিলেম]	করিতেছিলে, করিতেছিলি, করিতেছিলেন [করছিলে, করছিলি, করছিলেন]	করিতেছিল, করিতেছিলেন, [করছিল, করছিলেন]
পুরাঘটিত „	করিয়াছিলাম [করেছিলাম, করেছিলুম, করেছিলেম]	করিয়াছিলে, করিয়াছিলি, করিয়াছিলেন [করেছিলে, করেছিলি, করেছিলেন]	করিয়াছিল, করিয়াছিলেন [করেছিল, করেছিলেন]

ভবিষ্যৎ কাল

	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	প্রথম পুরুষ
সাধারণ ভবিষ্যৎ	করিব [করব]	করিবে, করিবি, করিবেন [করবে, করবি, করবেন]	করিবে, করিবেন [করবে, করবেন]
ঘটমান „	করিতে থাকিব [করতে থাকব]	করিতে থাকিবে, করিতে থাকিবি, করিতে থাকিবেন [করতে থাকবে, করতে থাকবি, করতে থাকবেন]	করিতে থাকিবে, করিতে থাকিবেন [করতে থাকবে, করতে থাকবেন]
পুরাঘটিত „	করিয়া থাকিব [করে থাকব]	করিয়া থাকিবে, করিয়া থাকিবি, করিয়া থাকিবেন [করে থাকবে, করে থাকবি, করে থাকবেন]	করিয়া থাকিবে, করিয়া থাকিবেন [করে থাকবে, করে থাকবেন]
অনুজ্ঞা „	×	করিবে, করিও, করিবে, করিস্, করিবেন [করবে, করো, করবি, করিস্, করবেন]	করিবে, করিবেন [করবে, করবেন]

বাংলায় অন্যান্য ক্রিয়ার রূপ বিভিন্ন কালে এবং বিভিন্ন পুরুষে 'কর্' ধাতুর অনুরূপ।

॥ অনুসরণী ॥

*১. সংজ্ঞা লিখ ও উদাহরণ দাও : নিত্যবৃত্ত অতীত, মা. '৫৫, '৬১, '৬৩, উ. মা. '৬২ ; যৌগিক কাল, '৬৬ ; পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ, মা. '৫২, উ. মা. '৬০ ; ঘটমান অতীত, উ. মা. '৬২, ক. প্র. '৬২, ব. প্র. '৬১ ; মৌলিক কাল, ঐতিহাসিক বর্তমান, পুরাঘটিত বর্তমান, পুরাঘটিত অতীত, ঘটমান ভবিষ্যৎ ও ভবিষ্যৎকালের অনুজ্ঞা, মা. '৫৬ ; ঘটনান্তরাপেক্ষিত ভাব, নিত্যবৃত্ত বর্তমান, নিত্যবৃত্ত ঘটমান বর্তমান, ঘটমান পুরানিত্যবৃত্ত পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত।

*২. নিত্য অতীত, নিত্যবৃত্ত অতীত, ঘটমান অতীত, পুরাঘটিত অতীত—এই চারটি কালের পার্থক্য বুঝাইয়া প্রত্যেকের একটি করিয়া দৃষ্টান্ত দাও। মা. '৬৪।

*৩. √'হ' ধাতু অথবা √'শুন্' ধাতুর পুরাঘটিত বর্তমান, ঘটমান অতীত, বর্তমান অনুজ্ঞা এবং ঘটমান ভবিষ্যতের প্রথম পুরুষের সাধু ও চলিত রূপ লিখ। উ. মা. '৬১

৪. মৌলিক কাল ও যৌগিক কালের পার্থক্য কি দৃষ্টান্তসহ বুঝাইয়া দাও।

৫. দৃষ্টান্ত দাও : অতীতকালের অর্থে ভবিষ্যৎ কালের প্রয়োগ, ভবিষ্যৎ কালের অর্থে অতীত কালের প্রয়োগ, বর্তমান কালের অর্থে ভবিষ্যৎ কালের প্রয়োগ, অতীত কালের অর্থে বর্তমান কালের প্রয়োগ। মা. '৫৬

৬. বল্, হাস্, পড়্, লিখ্—এই ধাতুগুলির বর্তমান কালের রূপ লিখ।

৭. চল্, শুন্, দে, যা—এই ধাতুগুলির অতীত কালের রূপ লিখ।

৮. শো, হ মিল্, খা—এই ধাতুগুলির ভবিষ্যৎ কালের রূপ লিখ।

৯. ব্যাকরণগত টীকা লিখ : 'সেথানে ছুটিতাম সকালে উঠি।' 'অশথ উঠিয়াছে প্রাচীর টুটি।' 'ওটা দিতে হবে।' 'সে বছরে কাকা পেনু কিছু টাকা।' 'করিলাম মন শ্রীবৃন্দাবন বারেক আসিব ফিরি।' সে কাল কলকাতায় আসছে। তুমি দেখছি, আমার সর্বনাশ করলে।

১০. ক্রিয়ার ভাব কাহাকে বলে? ক্রিয়ার ভাব-প্রকাশক প্রকার কয় রকমের? দৃষ্টান্তসহ আলোচনা কর।

১১. কর্ ধাতুর পুরাঘটিত বর্তমান কালের (Present Perfect) সকল পুরুষের রূপান্তর লিখ। উ. মা. '৭০

বাক্যের মধ্যে লিঙ্গ, বিভক্তি, পুরুষ বা বচনে যে সকল পদের রূপের কোন পরিবর্তন হয় না, তাহাদের অব্যয় পদ বলা হয়। যেমন: ও, এবং, বাহবা, ছিঃ, মরি, কিন্তু, তবু, তথাপি ইত্যাদি। অব্যয় অর্থাৎ যাহার ব্যয় বা পরিবর্তন নাই—যে সকল পদ সকল অবস্থাতেই একই রূপ থাকে, তাহারা অব্যয় পদ। অব্যয় বাক্যস্থ শব্দগুলির স্থান, কাল ও পাত্রের সম্বন্ধ-নির্দেশক এবং ভাব-প্রকাশক।

প্রচুর সংস্কৃত অব্যয় বাংলায় স্থান লাভ করিয়াছে। যেমন: অকস্মাৎ, অচিরাৎ, অতএব, অতঃপর, অতীব, অত্র, অথবা, অর্থাৎ, অদ্য, অধুনা, অনন্তর, অন্যত্র, অপি, অপিচ, অবশ্য, অয়ি, অরে, অহো, আঃ, আশু, ইদানীং, একত্র, একদা, এবং, এবম্বিধ, কথঞ্চিৎ, কদাচ, কদাচিৎ, কদাপি, কল্য, কিংবা, কিঞ্চিৎ, কিন্তু, কুত্র, কুত্রাপি, কেবল, ক্বচিৎ, চমৎকার, ঝটিতি, তত্র, তত্রাপি, তথৈব, তদানীং, ধিক্, নচেৎ, নতুবা, নিতান্ত, পশ্চাৎ, পরন্তু, পরশ্ব, পুনঃ, পুনশ্চ, পৃথক্, প্রতি, প্রত্যহ, প্রত্যুত, প্রভৃতি, প্রাক্, প্রাতঃ, প্রায়, প্রায়শ, বরং, বরঞ্চ, বা, বিনা, বৃথা, যত্র, যথা, যদি, যদ্যপি, যাবৎ, যুগপৎ, রে, সদা, সদ্যঃ, সম্প্রতি, সম্যক্, সর্বত্র, সর্বথা, সহসা, সাক্ষাৎ, সুতরাং, সুষ্ঠু, স্বয়ং, হা, হন্ত, হে।

খাঁটি বাংলা অব্যয়ের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। যেমন: অথচ, আচ্ছা, আর, আবার, আ মরি, আ মরে যাই, আরে, আহারে, ইঃ, ইস্, উঃ, উহু, ওঃ, ওরে, ওলো, ও হরি, ওহে, ওহো, কি, কেন, কখন, তখন, তবে, তবেই, তবু, তারপর, তেমনি, তো, দূর, ধেৎ, ছি ছি, ছ্যা ছ্যা, না, নাকি, বাঃ, বাপ্‌রে, বাহবা, বুঝি, বেশ, মরি মরি, মতো, মতন, যখন, যেমন, শাবাস, হায়, হায় হায়, হায়রে ইত্যাদি।

অব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ

অব্যয় পদগুলিকে প্রধানতঃ দুইটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়: এক. সংযোগবাচক বা সম্বন্ধবাচক এবং দুই. ভাববাচক। স্মরণীয় যে, একই অব্যয় সংযোগবাচক বা ভাববাচক হইতে পারে। কাজেই, ইহাদের শ্রেণীবিন্যাস হওয়া উচিত প্রয়োগ এবং অর্থের ভিত্তিতে।

এক. সংযোগবাচক বা সম্বন্ধবাচক অব্যয়ের মধ্যে আবার পড়ে: পদান্বয়ী অব্যয় এবং সমুচ্চয়ী বা বাক্যান্বয়ী অব্যয়; দুই. ভাববাচক অব্যয়ের মধ্যে পড়ে: অনন্বয়ী অব্যয়।

কাজেই, অব্যয় মূলতঃ তিন প্রকার: এক. পদান্বয়ী অব্যয়, দুই. সমুচ্চয়ী বা বাক্যান্বয়ী অব্যয় এবং তিন. অনন্বয়ী অব্যয়।

এক. পদান্বয়ী অব্যয়

যে সকল অব্যয় বাক্যের বিভিন্ন পদের মধ্যে অন্বয় বা সম্বন্ধ প্রকাশ করে, তাহাদের

পদান্বয়ী অব্যয় বলা হয়। স্মরণীয় যে, পদান্বয়ী অব্যয় পদসমূহের মধ্যে অন্বয় বা সম্বন্ধ প্রকাশ করে, বাক্যসমূহের মধ্যে নয়। যেমন : বিনা, ব্যতীত, ছাড়া, সঙ্গে, সহিত, সহ, সনে, সম, মত, মতন, ন্যায়, সদৃশ, তুল্য, যেন, পশ্চাতে, সম্মুখে, পাশে, বামে, ভিতর, ভিতরে, বাহিরে, সামনে, পিছনে, অন্তরে, নিমিত্ত, জন্য, তরে, পর্যন্ত, অবধি, হইতে, থেকে, চেয়ে, পানে, প্রতি ইত্যাদি। এই অব্যয়গুলিকে আবার **অনুসর্গ অব্যয়**ও বলা হয়। ইহারা বিশেষ্য বা সর্বনামের পরে বসিয়া বিভক্তির কাজ করে ; অর্থাৎ, বাক্যস্থিত পদগুলির সহিত ক্রিয়ার সম্বন্ধ প্রকাশ করে।

দৃষ্টান্ত : "সীতা 'বিনা' আমি যেন মণিহারা ফণী।" "ব্যথা মোর উঠবে জলে ঊর্ধ্ব 'পানে'।" "অশান্তির 'অন্তরে' যেথায় শান্তি সুমহান।" "আমি পরানের 'সাথে' খেলিব আজিকে মরণ খেলা।" "আমার সকল 'দিয়া' সাজাব তোমারে।" "নদী জলে-পড়া আলোর 'মতন' ছুটে যা ঝলকে ঝলকে।" "হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের 'মত' নাচে রে।" "মোড়লের কাছে পত্র দেয় পাঁচ হাজার টাকা দাবি করে ব্রাহ্মণের 'জন্যে'।" "বাংলার মুখ ভুলে খাঁচার নষ্ট শুকের 'মতন' কাটাইনি দিনমাস।" "গাংশালিখের ঝাঁক, মনে হয়, 'যেন' সেই কালীদহে ভাসে।" "বনের 'মাঝ' দিয়ে আঁকাবাঁকা সরু পথ।" "ওপাড়া 'হইতে' আয় মায়ে ঝিয়ে।" "বাঘের 'সঙ্গে' যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি।" "তুমি আর উড়ে উড়ে কেঁদো নাকো ধানসিঁড়ি নদীটির 'পাশে'।" "ইহার 'চেয়ে' হতেম যদি আরব বেদুইন।" "শিখর 'হইতে' শিখরে ছুটিব।"

দুই. সমুচ্চয়ী বা বাক্যান্বয়ী অব্যয়

যে সকল অব্যয় একাধিক পদ বা বাক্যের মধ্যে সংযোগ অথবা বিয়োগ সাধন করে, তাহাদের সমুচ্চয়ী বা বাক্যান্বয়ী অব্যয় বলে। এই অব্যয় আবার বহু রকমের হইতে পারে। যেমন : ক **সংযোজক**—যে সকল অব্যয় একাধিক পদ বা বাক্যের মধ্যে সংযোগ সাধন করে, তাহাদের সংযোজক অব্যয় বলা হয়। যেমন : ও, আর, এবং, আরও, অপিচ, অধিকন্তু। 'ও', 'এবং' সাধু ও চলিত উভয় ভাষাতেই চলে ; 'আর' চলে শুধু চলিত ভাষায়। "বেলায় উঠে দেখলুম চমৎকার রোদ্দুর উঠেছে 'এবং' শরতের পরিপূর্ণ নদীর জল তল্ তল্ থৈ থৈ করছে।" "উই 'আর' ইঁদুরের দেখ ব্যবহার।" **খ. বিয়োজক**—যে সকল অব্যয় একাধিক পদ বা বাক্যের মধ্যে বিয়োগ সাধন করে, তাহাদের বিয়োজক অব্যয় বলা হয়। যেমন : বা, কিংবা, অথবা, হয়, না-হয়। "এই জীবনটা ভালো 'কিম্বা' মন্দ 'কিম্বা' যা হোক একটা কিছু।" অমল 'অথবা' বিমল কেউ একজন আসিলেই চলিবে। **গ. সংকোচক**—কিন্তু, তথাপি, তবে। "বোধ হয় এগারোটা, কিম্বা সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে, 'কিন্তু' এ পর্যন্ত লেখাপড়া কিম্বা কোনো কাজে হাত দিইনি।" অনেক অনুরোধ-উপরোধ জানানো হইল, 'তথাপি' তাহাকে টলানো গেল না। "'তবে' তাই হোক, ক্ষমাতেই আনো দাহ।" **ঘ. হেতুবোধক**—কারণ, যেহেতু, ব'লে, কেননা, জন্য। তোমার ভুলের 'জন্য' আমরা অনেক মাশুল দিয়াছি। "কিছু বলব 'ব'লে' এসেছিলাম।" "তোর আপন

জনে ছাড়বে তোরে, তা 'ব'লে' ভাবনা করা চলবে না।" ঙ. **নিত্য-সম্বন্ধী**—যদি—তবে, যেই না—অমনি, যদিও—তবু, বরং—তবুও, যে—সেই, যদিও—তথাপি। "যদি বারণ কর, 'তবে' গাহিব না।" 'যেই না' পা দিয়েছি, 'অমনি' সিঁড়িটা মড়মড় করে পড়ল ভেঙে। "মা 'যদি' হও রাজি, বড়ো হলে আমি হব খেয়া ঘাটের মাঝি।" 'বরং' মৃত্যু বরণ করিব, 'তবুও' পরাভব স্বীকার করিব না। "যদিও' আমার অনেক গুরুতর কাজ ছিল, 'তবু' খুব গম্ভীরভাবে আদ্যোপান্ত শুনে গেলুম।" চ. **সিদ্ধান্ত-মূলক**—অতএব, সুতরাং, কাজেই, তাই। "আমার যাহা বলিবার বলিয়াছি, 'কাজেই' আমার আর নূতন কিছু বলিবার নাই। "সময় যে নাই; আবার শিশিররাত্রে 'তাই' নিকুঞ্জে ফুটায়ে তোল নব কুন্দরাজি।" ছ. **ক্রিয়াবিশেষণবাচক**—হঠাৎ, অকস্মাৎ, দৈবাৎ। সে 'সদ্য' বিদেশ থেকে ফিরেছে, ওকে এখন কিছু বলো না। কাজ যা ছিল সেরে ফেলেছি, 'আপাততঃ' হাতে কোন কাজ নেই। 'হঠাৎ' আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল করে চিত্ত।" "আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে 'দৈবে' হতেম দশম রত্ন নবরত্নের মালে।" "অকস্মাৎ' তূর্যধ্বনি হইল তখন।" জ. **ব্যতিরেকাত্মক**—নচেৎ, নতুবা, নইলে। "বন্ধু, তোমার বুকভরা লোভ দুচোখে স্বার্থ-ঠুলি/'নতুবা' দেখিতে তোমারে সেবিতে দেবতা হয়েছে কুলি।" "আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে/'নইলে' মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে?"

তিন. অনন্বয়ী বা ভাববাচক অব্যয়

বাক্যের সহিত যে সকল অব্যয়ের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকে না, কিন্তু মনের উচ্ছ্বাস বা কোন বিশেষ ভাব প্রকাশ করিতে ব্যবহৃত হয়, তাহাদের অনন্বয়ী বা ভাববাচক অব্যয় বলা হয়। যেমনঃ ক. **বিস্ময়বোধক**—আহা, অ্যাঁ, ওমা, ওরে বাবা। "আহা' আজি এ বসন্তে এত ফুল ফুটে!" "বাঃ'—এও তো বড়ো মজা!" 'বাহবা'! "বাবারে', আমি চুপ করে এই কচুবনে লুকিয়ে থাকি।" "অহো' কী দুঃসহ আস্পর্ধা!" "বাহবা! শাবাস রে তোর ভরসা দেখি!" "মিল্টন, 'আহা'! তুমি যদি আজ বাঁচিয়া থাকিতে!" খ. **প্রশংসাবোধক**—বাঃ, মরি মরি, চমৎকার, খাসা, বেশ। "ওহে সুন্দর 'মরি মরি'।" 'মরি' ও কার বাছা, ওকে কোথায় নিয়ে যায়।" গ. **ঘৃণাবোধক**—ছিঃ, ছি-ছি, থু, ধিক। "ছি-ছি' চোখের জলে ভেজাস্ নে আর মাটি।" "ধিক' ধনুঃশর! 'ধিক' বাহু বল!" "এই 'কি' তোমার উপহার।" 'ধিক ধিক ধিক'!" ঘ. **সম্মতিবোধক**—আচ্ছা, আজ্ঞে হ্যাঁ। "আচ্ছা' সে দেখা যাবে।" 'আজ্ঞে হ্যাঁ', তাই হবে। ঙ. **অসম্মতি বোধক**—না, উহুঁ, কিছুতেই না, কখ্খনো না। "না', আমি তোমাদের কোন কথাই শুনবো না।" চ. **আহ্বানবোধক**—ওহে, ওরে, ওগো, ও। "ও' আমার দেশের মাটি।" "ও ভাই, দেখে যা কত ফুল তুলেছি।" "ওরে গৃহবাসী, খোল দ্বার খোল।" "হে' নূতন, দেখা দিক আর বার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ।" "আরে' দাঁড়া দাঁড়া, অত ব্যস্ত হলে ফস্কাবে শিকার।" 'ওগো' তোরা আজ যাস্‌নে গো তোরা যাস্‌নে ঘরের বাহিরে।" "ওরে' নবীন, 'ওরে' আমার কাঁচা!" ছ. **বিরক্তি-বোধক**—ধেৎ, ধুত্তোরি, কি জ্বালা। 'কি মুস্কিল', তোমরা যে এখানেই ঝগড়া শুরু

করে দিলে। জ. কাতরভাবোধক বা শোকজ্ঞাপক—হায়-হায়, হায়, ও হো-হো। "এ যে 'হায়' পথের বাতাসে মিবে যায়।" "আহা' ঐ করুণ চোখে ও কার পানে চায়।" "হা', কী দশা হল আমার!" ঝ. প্রশ্নবোধক—প্রশ্ন বুঝাইবার জন্য বাক্যের মধ্যে যে সব অব্যয় ব্যবহার করা হয়, তাহাদের প্রশ্নবোধক অব্যয় বলা হয়। যেমন: নাকি, কেমন, তো, না, নারে, বটে ইত্যাদি। "তোমার 'নাকি' মেয়ের বিয়ে?" "কেমনে' শুধিব বলো তোমার এ ঋণ?" "কেমন', বলেছিলুম 'না' আমার জয় কেউ ঠেকাতে পারবে না?" ঞ. তুলনাবাচক—তুলনা বুঝাইতে যে অব্যয়গুলি ব্যবহৃত হয়, তাহাদের তুলনাবাচক অব্যয় বলা হয়। যেমন: মত, মতন, ন্যায়, যেন, সদৃশ, সম, যেমন, যথা ইত্যাদি। "বিনা মেঘে বজ্ররবের 'মতো' উঠলো বেজে কাড়া-নাকাড়া।" "ভূতের 'মতন' চেহারা যেমন নির্বোধ অতি ঘোর।" তাঁহার 'ন্যায়' মহানুভব ব্যক্তি আমি আর দেখি নাই। "জ্বলিতেছে কেন 'যেন' সারে সারে প্রদীপমালার 'মতো'?" "আকাশ কাঁদে হতাশ 'সম'।" তাহার বাহুযুগল ইস্পাত 'সদৃশ' কঠিন। "একত্র আছিনু বদ্ধ পাণ্ডবে কৌরবে কলঙ্ক 'যেমন' থাকে শশাঙ্কের বুকে।" "তব অনুগামী দাস রাজেন্দ্র-সঙ্গমে দীন 'যথা' যায় দূর তীর্থ দরশনে।" *ট বাক্যালংকার অব্যয়—যে সকল অব্যয় বাক্যের অলংকরণের জন্য অর্থাৎ সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহা ছাড়া অন্য কোনরূপ অর্থপ্রকাশে সাহায্য করে না, তাহাদের বাক্যালংকার অব্যয় বলা হয়। যেমন: না, তো, বা, গে, আর, কি। "তুই আমার মুণ্ড নিবি না 'তো' কে নেবে।" "তবে যাও 'না' টানো 'গে'-'না' হে।" "সন্ন্যাসিনী 'যে' আমি।" "আমার নাই 'বা' হল পারে যাওয়া।" "তোমরা 'যে' বেড়াতে যাবার নাম করে মেলায় যাচ্ছো, কেউ কি 'আর' তা জানে না?" *ঠ. ধ্বন্যাত্মক অব্যয় বা অনুকারবোধক অব্যয়—যে সকল অব্যয় ধ্বনির অনুকরণে গঠিত, তাহাদের ধ্বন্যাত্মক অব্যয় বা অনুকারবোধক অব্যয় বলে। যেমন: ঝর ঝর, শন শন, টাপুর টুপুর, টিপ্ টিপ্, ঠক্ ঠক্, ঝি ঝি, হি হি, হো হো, গোঁ গোঁ। ড. উপসর্গ অব্যয়—এই অব্যয়গুলি ধাতুর পূর্বে বসিয়া নূতন নূতন শব্দ গঠন করে কিংবা নূতন নূতন অর্থ দান করে। যেমন: [আ-হৃ=] আহার, [বি-হৃ=] বিহার, [বি-অব-হৃ=] ব্যবহার। *খাঁটি বাংলা উপসর্গ অব্যয়: ['অ'-ঘোর] অঘোর, ['অনা'-ছিষ্টি] অনাছিষ্টি, ['হা'-ভাতে] হাভাতে, ['হা'-ঘরে] হাঘরে, ['আ'-কাঁড়া] আকাঁড়া।

*অব্যয়ের কিছু অতিরিক্ত দৃষ্টান্ত

দস্যুর 'মতো' ভেঙে চুরে দেয় চিরাভ্যাসের মেলা। [তুলনাবাচক অব্যয়]। 'হঠাৎ' কখন সন্ধ্যাবেলায় নামহারা ফুল গন্ধ এলায় [ক্রিয়াবিশেষণবাচক অব্যয়]। আসলে, আদর করা ব্যাপারটা অভিভাবকদেরই বিনোদনের 'জন্য', ছেলেদের পক্ষে এমন বালাই আর নাই ['আসলে'—সিদ্ধান্তমূলক, 'জন্য'—হেতুবোধক]। পথে কত

'যে' বিঘ্ন ঘটল তার ঠিক নেই [বাক্যালংকার অব্যয়]। বাঁশঝাড়ে কাকগুলো 'কা' 'কা' করে ডেকে ওঠে [ধ্বন্যাত্মক অব্যয়]। হাত চলছে না, 'তবু' পাততাড়ি-লেখা বন্ধ করবার 'জো' নেই ['তবু'—সংযোজক, 'জো'—বাক্যালংকার]। রাতের বেলায় ঘরের বাইরে বাতাস 'শন-শন' বইতে থাকে [ধ্বন্যাত্মক অব্যয়]। 'আহা', ওদের মতো 'যদি' ডানা পেতাম 'তবে' কি 'আর' মা আমায় ঘরে বন্ধ করে রাখতে পারতেন ?' ['আহা' —কাতরতাবোধক, 'যদি—তবে'—নিত্যসম্বন্ধী, 'আর'—বাক্যালংকার]। জীবন 'যে' জীবনযাত্রায় বাহির হইয়া পড়িতে চায় [বাক্যালংকার]। 'যেমন' নীহারিকাকে সৃষ্টিছাড়া বলা চলে না, 'কারণ' তাহা সৃষ্টির একটা বিশেষ অবস্থায় সত্য ['যেমন'— তুলনাবাচক, 'কারণ'—হেতুবোধক]। সে 'আর' কিছু নয়, এক-একটি পরিস্ফুট চিত্র আঁকিয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষা [বাক্যালংকার অব্যয়]। কাব্যরচনা 'ও' জীবন-রচনা ও দুটা একই বৃহৎ-রচনার অঙ্গ [সংযোজক অব্যয়]। ইহার 'উপরে' বরিশালের ভলন্টিয়ারের দল স্বদেশী কীর্তন গাহিয়া কোমর বাঁধিয়া যাত্রী সংগ্রহে লাগিয়া গেল, 'সুতরাং' জাহাজে যাত্রীর অভাব হইল না 'কিন্তু' আর সকলপ্রকার অভাবই বাড়িল 'বই' কমিল না। ['উপরে'—পদান্বয়ী, 'সুতরাং'—সিদ্ধান্তমূলক, 'কিন্তু'— সংকোচক, 'বই'—ব্যতিরেকাত্মক]। তুমি অধম—তাই 'বলিয়া' আমি উত্তম না হইব কেন ? ['বলিয়া'—হেতুবোধক]। ঐ 'যে' ! ঐ গাছটার 'পেছনে' ! 'কেমন' অনেক দূর 'না' ? ['যে'—বাক্যালংকার, 'পেছনে'—পদান্বয়ী, 'কেমন'—প্রশ্নবোধক, 'না'— বাক্যালংকার]। এই দীর্ঘ সময়ের 'মধ্যে' এরা কি 'আর' বাড়েনি, 'আর' আপনার মধ্যেও কি কোনো পরিবর্তন হয়নি ? ['মধ্যে'—পদান্বয়ী, 'আর'—বাক্যালংকার, 'আর'—বাক্যান্বয়ী]। ছিনাথ কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিল ; 'কিন্তু' পিসেমশায়ের 'আর' রাগ পড়ে না ['কিন্তু'—সংকোচক, 'আর'—বাক্যালংকার]। 'অকস্মাৎ' আমার ঠিক পিঠের কাছে 'হুম্' শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে ছোড়দা 'ও' যতীনদার সমবেত আতকণ্ঠে গগনভেদী 'রৈ-রৈ' চীৎকার—'ওরে বাবা রে', খেয়ে ফেল্লে 'রে' !" ['অকস্মাৎ'—ক্রিয়াবিশেষণবাচক, 'এবং'—বাক্যান্বয়ী, 'ও'—পদান্বয়ী, 'রৈ-রৈ'— ধ্বন্যাত্মক, 'ওরে বাবারে'—বিস্ময়বোধক', 'রে'—বিস্ময়বোধক]। এ 'তো' মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয় ['তো'—বাক্যালংকার]। দুরাত্মারা এই পদ কামনা করে, 'কিন্তু' রাখতে পারে না। ['কিন্তু'—সংকোচক]। শক্তি মরে ভীতির কবলে, 'পাছে' লোকে কিছু বলে ['পাছে'—সংশয়সূচক]। 'যদিও' মা তোর দিব্য আলোকে ঘিরে আছে আজ আঁধার ঘোর, কেটে যাবে মেঘ ['যদিও'—নিত্যসম্বন্ধী]। আমি 'ছাড়া' আর কেহ 'তো' পায় না খুঁজে তারে ['ছাড়া'—পদান্বয়ী, 'তো'—বাক্যালংকার]। আমি 'যেন' যাবো দেশান্তরে ['যেন'—তুলনাবাচক]। দেখো 'তো' চেয়ে, আমারে তুমি চিনিতে পারো 'কিনা' ['তো'—বাক্যালংকার, 'কিনা'—প্রশ্নবোধক]।

●কয়েকটি সংস্কৃত অব্যয়ের ব্যবহার

'অতি' বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ। 'আচম্বিতে' আকাশ মেঘাবৃত হইয়া চারিদিক অন্ধকার করিয়া আসিল। যদি 'একান্ত' যাইবেই, তবে আমাকে লইয়া

চক্ষ। লোকটি 'নিতান্ত' সরল। দৃশ্যটি 'অতীব' করুণ। 'সহসা' বায়ু বহিল প্রতিকূলে। 'ঝটিতি' আসিয়া তাহাকে বিপন্মুক্ত কর। কল্যপ্রাতে 'অবশ্য' আসিবে। যাবে দেশে ফিরে—মা-ঠাকুরাণীরে দেখিতে পাইবে 'পুন' [:]। এ 'কেবল' ফুটাপাত্রে জল ঢেলে দিনরাত্রে 'বৃথা' চেষ্টা তৃষ্ণা মিটাবারে। 'যুগপৎ' শোকে এবং বিরহে কাতর হইয়া তিনি কাব্যটি রচনা করেন। তিনি আমার কথা 'প্রায়' ভুলিয়া গিয়াছেন।

*এগুলি মূলতঃ অব্যয় ; কিন্তু ইহাদের ব্যবহার ক্রিয়াবিশেষণের মতো।

'বৃথা' এ সাধনা ধীমান্! সে 'যাব'জ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইল। তিনি আমাকে 'যৎপরোনাস্তি' তিরস্কার করিলেন।

*এগুলি মূলতঃ অব্যয় ; কিন্তু ইহাদের ব্যবহার বিশেষণরূপে।

দেশে আর 'আপাততঃ' যুদ্ধভয় নাই। বৃদ্ধ রাজার অকর্মণ্যতার সুযোগে মন্ত্রীরাই 'কার্যতঃ' রাজা হইয়া উঠিল। 'ধর্মতঃ' আমি কখনও অসৎ কর্ম করি নাই। তিনি 'জ্ঞানতঃ' অন্যায় করেন না। তিনি 'ন্যায়তঃ' এ কথা বলিতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথের রচিত কবিতা এবং সংগীতের মধ্যে 'বস্তুতঃ' কোন পার্থক্য নাই। রবীন্দ্রনাথ 'মূলতঃ' কবি। বার্ধক্যের জন্য তিনি আর হাঁটিতে পারেন না, 'বিশেষতঃ' তিনি বর্তমানে অসুস্থ। বিদ্যাসাগর 'স্বভাবতঃই' দয়াপ্রবণ ছিলেন।

'অচিরাৎ' তাঁহাকে সমস্ত কাজকর্ম ফেলিয়া রাখিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে হইল। 'ইদানীং' সে আমার সহিত কথাবার্তা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। তাহার কথা আমি 'আদৌ' বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। 'উপর্যুপরি' শোকের আঘাতে তিনি একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন। চাণক্যের উদ্দেশ্য ছিল 'যেন-তেন-প্রকারেণ' নন্দবংশ ধ্বংস করা। বন্ধুদ্বয়ের সম্মুখে 'দৈবাৎ' একটি ভল্লুক আসিয়া উপস্থিত হইল।

*এগুলি সংস্কৃত বিভক্তিযুক্ত পদ কিন্তু ইহাদের ব্যবহার অব্যয়ের মতো।

●কয়েকটি বাংলা অব্যয়ের ব্যবহার

আর—নূতন করিয়া বসা 'আর' [এবং] ভাঙা পুরানো হাটের মেলা। হ'লনা 'আর' [আবার] দেখা। গরীবের জীবন—বাঁচা 'আর' [কিংবা] মরা দুইই সমান। 'আর' [অতিরিক্ত] কত দূরে আছে যে আনন্দধাম ? নিমে কি 'আর' [কখনও] মধু থাকে ? 'আর' [পরবর্তী] বছরে আমরা সবাই পুরী বেড়াতে যাবো। তোমাকে বইটা দিয়ে আমি পরীক্ষায় ফেল করি 'আর' [প্রায় সেই রকম] কি ! তুমি তো এই গেলে 'আর' [সঙ্গে সঙ্গে] এলে, খেলে কখন ? আমি কি 'আর' [বাক্যালংকার] জানতাম যে তোমার এই হবে ?

কি—জান না 'কি' [প্রশ্ন] জীব তুমি জননী জন্মভূমি ? 'কি' [বিস্ময়] যাদু বাংলা গানে গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে। 'কি' [কিংবা] হিন্দু 'কি' মুসলমান সকলেই দেশবন্ধুর মৃত্যুতে শোকার্ত হইয়া উঠিয়াছিল। 'কি' [তুচ্ছতা] আমায় শাস্তির ভয় দেখাও তোমরা ! যা 'কি' [অতি-পার্থক্য] ছিলেন আর 'কি' হইয়াছেন ! ছি ছি, 'কি'

[illegible] 'কি' [illegible] এলো ও 'কি' এলো না ; বোঝা গেল না।

তো—হে বন্ধু, আছো 'তো' [প্রশ্ন] ভালো? মরতে হয় 'তো' [তবে] মর শেষে। যাবে 'তো' [যদি] চলো। সে 'তো' [বাক্যালংকার] আর ফিরবে না রে। ওর কথা শুনে আমি 'তো' [বিস্ময়] অবাক! তুমি যদু চাটুজ্জের কথা বলছো? ও 'তো' [ভর্ৎসনা] একটা আস্ত পাগল! আমি 'তো' [জোর] আছি, তুমি যাও।

না—যেও 'না' [নিষেধ] রজনি, আজি লয়ে তারাদলে। 'না' [সংশয়] জানি কোথা এলুম। 'না' বুঝে কারে তুমি ভাসালে আঁখিজলে। শুনতে পেলুম পোস্তা গিয়ে তোমার 'না' [সংশয়]-কি মেয়ের বিয়ে? চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে, নিয়ো 'না' [মিনতি] নিয়ো 'না' সরায়ে। 'না' [বিশেষ্য] বললে ছাড়ছি না [দৃঢ়তা] কি? তুমি একথা বলতে পারলে, তুমি 'না' [তিরস্কার] বাঙ্গালী? 'না' [অভিমান] যাবে—'না'-ই যাবে, এত কথা কিসের? 'না', [অনুরোধ] যেয়ো 'না' [অনুরোধ], যেয়ো 'না' কো। হিন্দু 'না' [জিজ্ঞাসা] ওরা মুসলিম? ওই জিজ্ঞাসে কোন জন? আমি 'না' হয় [অনিশ্চয়তা] নাই গেলাম। তুমি যাও 'না' [হাঁ-বাচক]। 'না' [বিশেষণ] ঝাল 'না' [ঐ]-মিষ্টি। ওপথে যেয়ো না, কেন-'না' [কারণ] ওপথে বিপদ আছে। তুমি তো হাঁ-কে 'না' [বিশেষ্য], 'না' [বিশেষ্য]-কে হাঁ করতে পারো। বিলাস যে মিত্তির-বংশের ছেলে, ওকথা কে 'না' [বাক্যালংকার] জানে।

॥ অনুসরণী ॥

১. অব্যয় পদ কাহাকে বলে? মা. '৬৭, মা. (কম্পার্ট) '৬৫

২. অনন্বয়ী অব্যয় কাহাকে বলে উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর। উ. মা. '৬১

৩. অব্যয় পদ কয় প্রকার? প্রধান প্রধান অব্যয় পদগুলির দৃষ্টান্ত দাও।

৪. ফিন ফিন, খিল খিল, গমগম, গনগন, ছমছম, ঝমঝম, ঝলমল—অনুকার অব্যয়গুলির যথাযথ প্রয়োগ দেখাও। ক. বি. '৫৫

৫. 'না' পদটির বিবিধ পরিচয় নির্দেশ কর: সে না-কি রাগ করিয়াছিল, তাই বলিল, 'আমি বেড়াতে যাবনা, তুমি যাওনা।' আমি বলিলাম, 'না বললে ছাড়ছি না কি?' সে বলল, 'যতই বল না কেন, আমি নাচাব।' আমি বলিলাম, 'অর্থাৎ কিনা খোঁড়া। ন্যাকামি দেখ না।'

৬. অনন্বয়ী অব্যয় কয় প্রকার? প্রত্যেক প্রকারের একটি করিয়া দৃষ্টান্ত দাও।

৭. নিম্নলিখিত পদগুলিকে অব্যয়রূপে ব্যবহার কর:

আদৌ, উপর্যুপরি, অচিরাৎ, দৈবাৎ, বৃথা, ইদানীং, যৎপরোনাস্তি, যেন-তেন-প্রকারেণ, কেবল, যুগপৎ।

৮. চিহ্নিত পদগুলি কোন্ শ্রেণীর অব্যয় লিখ:

এ জগতে 'হায়' সেই বেশি চায় আছে যার 'ভূরি ভূরি'। কোথা 'হা' হন্ত চিরবসন্ত, আমি বসন্তে মরি। সাতকোটি সন্তানেরে 'হে' মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালি করে, মানুষ করনি। কীর্তনে 'আর' বাউলের গানে আমরা দিয়েছি খুলি মনের গোপনে নিভৃত ভুবনে দ্বার ছিল যতগুলি। জাগিল বিজলী 'যেন' নীল নবঘনে। মন্ত্রের সাধন 'কিংবা' শরীর পাতন। কেহ 'বা' ক্ষুধায় ম্লান, কেহ রোগে ম্রিয়মাণ। 'যখন' আসিতেন, 'তখন' 'আর' আহার পাইবার সম্ভাবনা থাকিত না। 'সুতরাং' তাঁহাকে রাত্রিতে অনাহারে থাকিতে হইত। 'অকস্মাৎ' নাবিকেরা দরিয়ার পাঁচপীরের নাম কীর্তিত করিয়া মহা-কোলাহল করিয়া উঠিল। 'বস্তুত' বাহুবল অপেক্ষা বাক্যবল সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ। 'তথাপি' প্রজার সঙ্গে বাহুবলের পরীক্ষা সুখদায়ক নহে। 'হে' রাজেন্দ্র, তব হাতে কাল অন্তহীন। সে আমায় ডাকে এমন করিয়া কেন 'যে' কব তা 'কেমনে'। আয়'রে' 'ওরে' মৌমাছি আয়, চৈত্রে 'যে' যায় পত্রঝরা। ব্যাধির 'চেয়ে' আধি হল বড়ো। ডাক্তারে যা বলে বলুক-'নাকো' সেগুলি 'যদি' গাছের পাতা হইতে 'তবে' নিশ্চয়ই ঝরিয়া যাইত। সদর স্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেখানে 'বোধ করি' ফ্রী স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়।

৫.

কৃৎ-প্রত্যয় ও তদ্ধিত-প্রত্যয়

শব্দই ভাষার সমৃদ্ধির অন্যতম উপকরণ। যে ভাষার যত বেশী শব্দ আছে, সেই ভাষা তত বেশী সমৃদ্ধ। শব্দ বা ধাতুর উত্তর প্রত্যয় যুক্ত হইয়া নূতন নূতন শব্দ গঠিত হয়। বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষা হইতে প্রচুর প্রত্যয় উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহা ছাড়া আছে তাহার নিজস্ব কিছু প্রত্যয় এবং বিদেশী প্রত্যয়।

প্রত্যয়ঃ শব্দ বা ধাতুর উত্তর যে সমস্ত বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ যুক্ত হইয়া প্রাতিপদিক* গঠিত হয়, তাহাদিগকে **প্রত্যয়** বলা হয়। যেমনঃ অক, আলু, শানচ্, শতৃ, তৃচ্, ইষ্ণু, ষ্ণি, ষ্ণিক, আই, আলি ইত্যাদি। বিভিন্ন প্রত্যয় যোগে নূতন নূতন শব্দ গঠিত হয়।

প্রত্যয় দুই প্রকারঃ ১. **কৃৎ-প্রত্যয়** ও ২. **তদ্ধিত-প্রত্যয়**।

কৃৎ-প্রত্যয়ঃ ধাতু-প্রকৃতির সহিত যে সকল প্রত্যয় যুক্ত হইয়া প্রাতিপদিক গঠিত হয়, তাহাদিগকে কৃৎ-প্রত্যয় বলা হয়। যেমনঃ অক, আলু, শানচ্, শতৃ, তৃচ্, ইষ্ণু ইত্যাদি কৃৎ-প্রত্যয়। গায়ক [গৈ+অক], দয়ালু [দয়্+আলু], বর্তমান [বৃৎ+শানচ্], দাতা [দা+তৃচ্], চলিষ্ণু [চল্+ইষ্ণু]—এই কৃৎ-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন শব্দগুলি **কৃদন্ত শব্দ**। কোন ধাতুর উত্তর কোন বিশেষ প্রত্যয়যোগে বিশেষ্য পদ গঠিত হয়; আবার, একই ধাতুর উত্তর ভিন্ন প্রত্যয়যোগে বিশেষণ পদও গঠিত হয়। যেমনঃ উৎকৃষ্+ঘঞ্=উৎকর্ষ [বি]; উৎ-কৃষ্+ক্ত=উৎকৃষ্ট [বিণ]। কৃদন্ত বিশেষ্য—'উৎকর্ষ'; কৃদন্ত বিশেষণ—'উৎকৃষ্ট'।

তদ্ধিত-প্রত্যয়ঃ শব্দ বা নাম-প্রকৃতির সহিত যে সকল প্রত্যয় যুক্ত হইয়া নূতন নূতন প্রাতিপদিক গঠিত হয়, তাহাকে তদ্ধিত-প্রত্যয় বলা হয়। যেমনঃ ষ্ণি, ষ্ণিক, আই, আলি ইত্যাদি **তদ্ধিত-প্রত্যয়**। দাশরথি [দশরথ+ষ্ণি], মাঙ্গলিক [মঙ্গল+ষ্ণিক], বড়াই [বড়+আই], ঠাকুরালি [ঠাকুর+আলি]—এইগুলি তদ্ধিত-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন শব্দ। তদ্ধিত-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন শব্দকে **তদ্ধিতান্ত শব্দ** বলা হয়।

যে সকল প্রত্যয়যোগে পুংলিঙ্গ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ শব্দে রূপান্তরিত হয়, তাহাদের **স্ত্রী-প্রত্যয়** বলা হয়। যেমনঃ ঈ [পাত্র—পাত্রী], আনী [শিব—শিবানী] ইত্যাদি। **স্ত্রী-প্রত্যয়** প্রকৃতপক্ষে তদ্ধিত-প্রত্যয়েরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আচার্য সুনীতিকুমার ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁহার মতে, 'শব্দের উত্তর প্রযুক্ত হইলেও, এই স্ত্রী-প্রত্যয় ব্যাকরণের বিচারে তদ্ধিত-প্রত্যয়ের পর্যায়ে পড়ে না। ইহাকে বিশেষভাবে স্ত্রী-প্রত্যয় নামেই অভিহিত করা হয়।'

*প্রাতিপদিক—'বিভক্তিবিহীন সার্থক শব্দ'।

ধাত্ববয়ব : ধাতু বা শব্দের উত্তর যে বর্ণ বা বর্ণ-সমষ্টি যোগে নূতন নূতন ধাতু গঠিত হয়, তাহাকে ধাত্ববয়ব প্রত্যয় বলা হয়। যেমন : বল্ [ধাতু]+'আ' [ধাত্ববয়ব]=বলা [বলানো অর্থে]—নূতন ধাতু ; শ্রু [ধাতু]+সন্ [ধাত্ববয়ব]+শুশ্রূষ্ [শুনিবার ইচ্ছা অর্থে]—নূতন ধাতু।

● এখন, **কৃৎ-প্রত্যয়, ধাত্ববয়ব প্রত্যয় ও ধাতু বিভক্তি**—এই তিনটির মধ্যে পার্থক্যটি সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

কৃৎ-প্রত্যয় ধাতুর উত্তর যুক্ত হইয়া নূতন শব্দ গঠন করে। যেমন : 'কৃ' [ধাতু] +'অক'=কারক। ধাত্ববয়ব প্রত্যয় ধাতুর উত্তর যুক্ত হইয়া নূতন ধাতু গঠন করে। যেমন, 'পড়্' [ধাতু]+আ=পড়া [পড়ানো অর্থে]। ধাতু-বিভক্তি ধাতুর সহিত যুক্ত হইয়া ধাতুকে ক্রিয়াপদে পরিণত করিয়া তাহাকে বাক্যে ব্যবহৃত হইবার যোগ্যতা দান করে। যেমন : 'কর্' [ধাতু]+'ই' [ধাতু-বিভক্তি]=করি [উত্তম পুরুষের সাধারণ বর্তমানের ক্রিয়াপদ]।

● এইবার, **প্রত্যয় ও বিভক্তির মধ্যে পার্থক্যটি** জানা প্রয়োজন। প্রত্যয় ধাতু ও শব্দের উত্তর প্রযুক্ত হয় ; তাহার ফলে নূতন শব্দ গঠিত হয়। এই শব্দ কেবলমাত্র বিভক্তি-যুক্ত হইলে তবেই বাক্যে ব্যবহৃত হইতে পারে। প্রত্যয়ের ন্যায় বিভক্তিও দুই প্রকার : শব্দ-বিভক্তি ও ধাতু-বিভক্তি। শব্দ-বিভক্তি বা ধাতু-বিভক্তি যুক্ত হইবার পূর্বে শব্দ বা ধাতুর সহিত এক বা একাধিক প্রত্যয় যুক্ত হইতে পারে ; কিন্তু শব্দ-বিভক্তি বা ধাতু-বিভক্তি যুক্ত হইবার পর আর কোন প্রত্যয় যুক্ত হইতে পারে না।

কৃৎ-প্রত্যয় ও তদ্ধিত-প্রত্যয় যোগের বিধি : ধাতু ও শব্দের উত্তর প্রত্যয় যুক্ত হয়। কিন্তু লক্ষণীয় যে, প্রত্যয়-যোগের সময় প্রত্যয়ের কিয়দংশ ধাতু বা শব্দের উত্তর যুক্ত হয়, অবশিষ্টাংশ লুপ্ত হয়। 'গম্' [ধাতু]+'অনট্' [প্রত্যয়]=গমন [লক্ষণীয়, 'ট্' লুপ্ত] ; সুন্দর [শব্দ]+ষ্ণ্য [প্রত্যয়]=সৌন্দর্য [লক্ষণীয়, 'ষ্ণ' লুপ্ত]। প্রত্যয়ের এই লুপ্ত অংশকে বলা হয় '**ইৎ**'।

উপধা : শব্দ বা ধাতুর অন্ত্য [সর্বশেষ] বর্ণের অব্যবহিত পূর্ববর্তী বর্ণকে উপধা বলা হয়। যেমন : 'দেবতা' শব্দের 'ত্' বর্ণ। 'দেবতা' শব্দটি বিশ্লেষণ করিলে দাঁড়ায় : দ্+এ+ব্+অ+ত্+আ। 'আ' অন্ত্য বর্ণ, উহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী বর্ণ 'ত্' হইল উপধা।

●সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়

সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয় যোগে তৎসম শব্দ গঠিত হয়। দৃষ্টান্তগুলিতে প্রত্যয়সমূহের যে অংশটুকু শব্দের সহিত যুক্ত, তাহা বন্ধনী-চিহ্নের মধ্যে প্রদত্ত হইল।

—ণক [অক] : কর্তৃবাচ্যে 'করেন যিনি'—অর্থে এই প্রত্যয় হয়। নিষ্পন্ন পদটি প্রধানতঃ বিশেষ্যপদরূপে ব্যবহৃত হয়। গৈ+ণক=গায়ক ; দৃশ্+ণক=দর্শক ; লিখ্+ণক=লেখক ; কৃষ্+ণক=কৃষক ; পচ্+ণক=পাচক ; শাস্+ণক=

শালক ; হন্+ণক=ঘাতক ; দা+ণক=দায়ক ; কৃ+ণক=কারক ; ধৃ+ণক=ধারক ; নশ্+ণক=নাশক ; পঠ্+ণক=পাঠক ; চালি+ণক=চালক ; পালি+ণক=পালক ; প্র-তৃ+ণক=প্রতারক ; সম্-পাদি+ণক=সম্পাদক ; পরি-ব্রজ্+ণক=পরিব্রাজক। তেমনি—শোষক, পাবক [পূ+ণক], সেচক, শিক্ষক, পরীক্ষক [পরি-ঈক্ষ্+ণক], জনক [জন্+ণিচ্+ণক], অধ্যাপক [অধি-ই+ণিচ্+ণক]।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : 'অন্ধ গায়ক পথের ধারে গান শুনিয়ে ভিক্ষে করে।' 'আমরা ঘাতক সন্নিধানে পশুর ন্যায় ভয়ঙের নিকট নিবদ্ধ হইলাম।'

—আলু : শীলার্থে কর্তৃবাচ্যে কয়েকটি ধাতুর উত্তর এই প্রত্যয় হয়। নিষ্পন্ন পদটি বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। দয়্+আলু=দয়ালু ; নি-দ্রা+আলু=নিদ্রালু ; কৃপ্+আলু=কৃপালু। তেমনি—ভাবালু, স্বপ্নালু, শ্রদ্ধালু, তন্দ্রালু [তন্-দ্রা+আলু]।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় দয়ালু ব্যক্তি বিরল। সে তাহার স্বপ্নালু দুই চোখে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল।

—শানচ্ [মান] : ক্রিয়ার কাজটি চলিতেছে অর্থে আত্মনেপদী ধাতুর উত্তর কর্তৃ ও কর্মবাচ্যে এবং পরস্মৈপদী ধাতুর উত্তর কেবল কর্মবাচ্যে এই প্রত্যয় হয় ; নিষ্পন্ন পদগুলি বিশেষণ পদ হইয়া থাকে। চল্+শানচ্=চলমান ; মৃ+শানচ্=ম্রিয়মাণ ; বৃৎ+শানচ্=বর্তমান ; বৃধ্+শানচ্=বর্ধমান ; দীপ্+শানচ্=দীপ্যমান ; শী+শানচ্=শয়ান, আস্+শানচ্=আসীন ; শুভ্+শানচ্=শোভমান ; মুহ্+শানচ্=মুহ্যমান [মোহ্যমান] ; উৎ-ই+শানচ্=উদীয়মান ; বি-রাজ্+শানচ্=বিরাজমান। আত্মনেপদী ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ও কর্মবাচ্যে এবং পরস্মৈপদী ধাতুর উত্তর কর্মবাচ্যে শানচ্ প্রত্যয় হয়। সেই দিক দিয়া প্রবহমান [প্র-বহ্+শানচ্] এবং চলমান [চল্+শানচ্] অশুদ্ধ। এখানে বহিতেছে অর্থে 'প্রবহৎ' [প্র-বহ্+শতৃ] এবং চলিতেছে অর্থে 'চলৎ' [চল্+শতৃ] শুদ্ধ। কিন্তু অশুদ্ধ হইলেও 'প্রবহমান' ও 'চলমান' শব্দ দুইটি বর্তমানে খুবই প্রচলিত।

শানচ্ প্রত্যয়ের অতিরিক্ত দৃষ্টান্ত : কম্পমান, বিদ্যমান, সেবমান, ধাবমান, প্রতীক্ষমাণ, নির্মীয়মাণ, বিলীয়মান, অপসৃয়মাণ, আবহমান, দৃশ্যমান, আলোচ্যমান, প্রতীয়মান।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : 'এইখানে মোগলের মুকুট-রতন শয়ান শান্তির মাঝে।' 'বিধাতা দেছেন প্রাণ থাকি সদা ম্রিয়মাণ।' 'আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান।' উদীয়মান সূর্যের আলোকে ধান্যক্ষেত্র যেন লক্ষ্মীর ন্যায় বিরাজমান।

—ইষ্ণু : শীলার্থে এই প্রত্যয় হয়। নিষ্পন্ন শব্দগুলি বিশেষণ পদ। জি+ইষ্ণু=জিষ্ণু ; চল্+ইষ্ণু=চলিষ্ণু ; সহ্+ইষ্ণু=সহিষ্ণু ; বৃধ্+ইষ্ণু=বর্ধিষ্ণু ; ক্ষি+ইষ্ণু=ক্ষয়িষ্ণু। তেমনি—চরিষ্ণু।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : 'তরু হতে যেবা হয় সহিষ্ণু, তৃণ হতে দীনতর সেই বৈষ্ণব।' গ্রামটি এককালে বর্ধিষ্ণু ছিল, তাই তাহার ক্ষয়িষ্ণু রূপ আজ সহজেই চোখে পড়ে।

—**শতৃ [অৎ]ঃ** বর্তমানকালে কর্তৃবাচ্যে এই প্রত্যয় হয়। বাংলায় ইহার প্রয়োগ বিরল। নিষ্পন্ন পদগুলি বিশেষণ হইয়া থাকে। ধাব্ +শতৃ=ধাবৎ ; চল্ +শতৃ= চলৎ ; পঠ্ +শতৃ=পঠৎ ; জীব্ +শতৃ=জীবৎ ; অস্ +শতৃ=সৎ ; মহ্ +শতৃ=মহৎ ; জাগৃ+শতৃ=জাগ্রৎ ; ভূ+শতৃ=ভবৎ ; জ্বল্ +শতৃ=জ্বলৎ ; গল্ +শতৃ=গলৎ।

বিশিষ্ট প্রয়োগঃ 'মহৎ যে হয় তার সাধু ব্যবহার।' তিনি আজ বৃদ্ধ, **চলচ্ছক্তিহীন**। বৎসরের শেষে হিসাব মিলাইতে গিয়া সরকারী অফিসের কর্ম-চারীরা **গলদ্‌ঘর্ম** হইতে লাগিল। **জীবদ্দশায়** সেখানে যাইব না।

—**তৃচ্, তৃন্ [তা]ঃ** শীলার্থে, সম্যগর্থে বা জীবিকার্থে কর্তৃবাচ্যে এই প্রত্যয় হয়। নিষ্পন্ন শব্দগুলি বিশেষ্য। কৃ+তৃচ্=কর্তা ; দা+তৃচ্=দাতা ; নী+তৃচ্= নেতা ; যুধ্ +তৃচ্=যোদ্ধা ; মা+তৃচ্=মাতা ; পা+তৃচ্=পিতা ; ভ্রাজ্ +তৃচ্ =ভ্রাতা ; বি-ধৃ+তৃচ্=বিধাতা ; সূ+তৃচ্=সবিতা ; হন্+তৃচ্=হন্তা ; বুধ্ +তৃচ্ =বোদ্ধা ; শ্রু+তৃচ্=শ্রোতা ; দৃশ্ +তৃচ্=দ্রষ্টা ; সৃজ্ +তৃচ্=স্রষ্টা ; বচ্ +তৃচ্ =বক্তা ; রচ্ +তৃচ্=রচয়িতা ; প্র-নী+তৃচ্=প্রণেতা ; গ্রহ্ +তৃচ্=গ্রহীতা। তেমনি—হন্তা, বেত্তা, বিজেতা, ক্রেতা, বিক্রেতা, নিয়ন্তা [নি-যম্+তৃচ্], বিশ্বপিতা, স্থাপয়িতা, প্রবক্তা, দুহিতা, আহর্তা, সমাহর্তা, জামাতা [জায়া-মা+তৃচ্]।

বিশিষ্ট প্রয়োগঃ 'ক্ষমতা আছে যার রাখিতে ধন তাবেই **দাতা** হওয়া সাজে।' 'তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আমাদের **নেতা**।' '**মাতা** মোর, **ভ্রাতা** মোর, মোর রাজকুল একমুহূর্তেই মাতা, করেছ নির্মূল মোর জন্মক্ষণে।' 'হতে পারতাম রাজনৈতিক **বক্তাও** অন্ততঃ।' রবীন্দ্রনাথ 'রক্তকরবী'র **রচয়িতা**।

● বাংলা কৃৎ-প্রত্যয়

অঃ ধাতুর অর্থে অথচ বিশেষ্যাকারে ব্যবহারের জন্য এই প্রত্যয় যুক্ত হয়। ছাড়্ +অ=ছাড় [ছাড়পত্র] ; বাঁধ্ +অ=বাঁধ ; মার্ +অ=মার ; হার্ +অ= হার ; ধর্ +অ=ধর ; পাকড়্ +অ=পাকড় ; নাচ্ +অ=নাচ , ডাক্ +অ=ডাক ; ছুট্ +অ=ছুট ; ঝুল্ +অ=ঝুল ; দুল্ +অ=দুল [=দোল] ; চল্ +অ=চল ; ঘির্ +অ=ঘের ; বেড়্ +অ=বেড় ; সাজ্ +অ=সাজ।

বিশিষ্ট প্রয়োগঃ 'মরীয়ার মুখে মারণের বাণী উঠিতেছে **মার মার**।' 'যদি তোর **ডাক** শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে।' '**বাঁধ** ভেঙে দাও, **বাঁধ** ভেঙে দাও।' 'দে **দোল দোল**।' সে আজ মণিপুরী **নাচ** নাচবে।

—**অত,-অতি ঃ** 'অত'-প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলি বিশেষণ ; কিন্তু 'অতি'-প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলি বিশেষ্য। বস্ +অত=বসত ; মান্ +অত=মানত ; ফির্ +অত=ফেরত ; পার্ +অত=পারত ; বস্ +অতি=বসতি।

বিশিষ্ট প্রয়োগঃ শেষে **বসত**বাটী বিক্রী করে তিনি কাশীবাসী হয়েছেন। **পারত**পক্ষে তিনি সেখানে যান না। সন্তানের আরোগ্যের জন্য মা মন্দিরে **মানত** করিলেন। গ্রামে বহুলোকের **বসতি**।

—অন : ভাববাচ্যে, কারকবাচ্যে ও ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বুঝাইতে এই প্রত্যয় হয়। নিষ্পন্ন শব্দগুলি কৃদন্ত বিশেষ্য [Verbal Noun]। নড়্+অন=নড়ন, বাঁচ্ +অন=বাঁচন ; সাজ্+অন=সাজন ; বাঁধ্+অন=বাঁধন ; কাঁদ্+অন=কাঁদন ; ধর্+অন=ধরন ; গড়্+অন=গড়ন ; বাড়্+অন=বাড়ন ; চড়্+অন=চড়ন ; ঘুর্+অন=ঘুরন ; পর্+অন=পরন ; চল্+অন=চলন ; লেখ্+অন=লেখন ; বল্+অন=বলন ; ভাঙ্+অন=ভাঙন ; সাধ্+অন=সাধন ; দেখ্+অন=দেখন ; ভাব্+অন+আ=ভাবনা ; গাঁথ্+অন=গাঁথন ; কাঁপ্+অন=কাঁপন ; ঝাড়্+অন=ঝাড়ন।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : 'প্রলয়-**নাচন** নাচলে যখন আপন ভুলে, নটরাজ, জটার **বাঁধন** পড়ল খুলে।' 'লুটিয়ে-পড়া কিসের **কাঁদন** উঠেছে আজ নবীন ধানে।' মেয়েটির **চলন-বলন** ভালো নয়। 'আসে নির্দয় নব-যৌবন **ভাঙনের** মহারথে।'

—অনা, না : নিষ্পন্ন শব্দগুলি বিশেষ্য। লাঞ্ছ্+অনা=লাঞ্ছনা ; গঞ্জ্+অনা=গঞ্জনা ; ঝর্+অনা=ঝরনা ; বাজ্+না=বাজনা ; বাট্+না=বাট্না ; রাঁধ্+না =রান্না ; কাঁদ্+না=কান্না ; কাট্+না=কাট্না, ঝুল্+অনা=ঝুলনা ; দুল্+অনা =দোলনা ; মাগ্+না=মাগ্না ; ধর্+না=ধরনা ; খেল্+না=খেলনা ; ফেল্+না=ফেলনা ; ঢাক্+না=ঢাকনা ; কুট্+না=কুট্না ; কর্+না=করনা [>কন্না]।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : 'শিলং পর্বতে **ঝরনার** জল বেড়ে উঠল।' '**কান্নাহাসির দোলদোলানো** পৌষ-ফাগুনের পালা।' 'ফুলডোরে বাঁধা **ঝুলনা**।' 'গাজনের **বাজনা** বাজা।' 'নিয়ে যাবে মোরে সব **লাঞ্ছনা** হতে।'

—আও : নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষ্য। ঘির্+আও=ঘেরাও ; ফল্+আও=ফলাও ; চড়্+আও=চড়াও ; পাকড়্+আও=পাকড়াও ; ঢাল্+আও=ঢালাও ; লাগ্+আও=লাগাও।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : ভোরবেলা পুলিশ ওদের বাড়ি **ঘেরাও** করলো। পরের দিন খবরের কাগজে ঘটনাটা **ফলাও** করে ছাপা হলো।

—তি : এই প্রত্যয় যোগে ভাব-বাচক বিশেষ্য ও বিশেষণ গঠিত হয়। কাজেই, নিষ্পন্ন শব্দ কৃদন্ত বিশেষ্য ও কৃদন্ত বিশেষণ [Verbal Noun ও Verbal Adjective]। ঘাট্+তি=ঘাট্তি ; ভর্+তি=ভর্তি ; কম্+তি=কম্তি ; ফির্+তি =ফির্তি ; চল্+তি=চল্তি ; ঝড়্+তি=ঝড়্তি ; পড়্+তি=পড়্তি ; উঠ্+তি=উঠ্তি ; বাড়্+তি=বাড়্তি ; কাট্+তি=কাট্তি ; গুণ্+তি=গুণ্তি ; বস্+তি=বস্তি ; ভাঙ্+তি=ভাঙ্তি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : **চল্তি** গাড়িতে কখনো উঠো না। **ফির্তি** ট্রেনেই চলে এসো। সে এখন পাড়ার **উঠ্তি** গুণ্ডা। এই বইয়ের বেশ **কাট্তি**। **ঝড়্তি**

—**আরি, উরি :** করণবাচ্যে এই প্রত্যয় হয়। নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষ্য। কাট্+আরি=কাটারি [কাটারী] ; ধুন্+আরি=ধুনারি ; ধুন্+উরি=ধুনুরি ; ভিখ্+আরি=ভাখারি ; ডুব্+আরি=ডুবারি ; ডুব্+উরি=ডুবুরি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : 'ডুবুরি জলে মুকুতা খোঁজে।' 'তুমি মোরে, হে **ভিখারি,** মার কাছ হতে কাড়ি করেছ আপন অনুচর।'

—**উ :** নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষণ [কখনও কখনও বিশেষ্য] হয়। নিব্+উ=নিবু ; ডুব্+উ=ডুবু ; হ+বু=হবু ; উড়্+উ=উড়ু ; ঝগড়্+উ=ঝগড়ু ; হাঁট্+উ=হাঁটু ; ঝাড়্+উ=ঝাড়ু ; চাল্+উ=চালু ; ঢাল্+উ=ঢালু।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : 'শান্তিপুর **ডুবু ডুবু** নদে ভেসে যায়।' **নিবু নিবু** দীপের আলোয় দেয়ালে ছায়াগুলি কাঁপিতে লাগিল। 'বৈশাখ মাসে তায় **হাঁটুজল** থাকে।' কথাটা এখন খুব **চালু**।

—**উনি :** নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষ্য। খাট্+উনি=খাটুনি ; জ্বল্+উনি=জ্বলুনি ; চাল্+উনি=চালুনি ; বক্+উনি=বকুনি ; পিট্+উনি=পিটুনি ; কাঁদ্+উনি=কাঁদুনি ; কাঁপ্+উনি=কাঁপুনি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : '**খাটুনি** যে ভালো ছিল **জ্বলুনির** চেয়ে।'

● সংস্কৃত তদ্ধিত-প্রত্যয়

—**ষ্ণি [ই] :** অপত্য অর্থে নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষ্য। দশরথ+ষ্ণি=দাশরথি ; রাবণ+ষ্ণি=রাবণি ; অর্জুন+ষ্ণি=অর্জুনি ; সুমিত্রা+ষ্ণি=সৌমিত্রি ; ভগীরথ+ষ্ণি [+ঈ—স্ত্রী]=ভাগীরথী [ভগীরথ-আনীত নদী] ; সত্যক+ষ্ণি=সাত্যকি ; অরুণ+ষ্ণি=আরুণি ; দ্রোণ+ষ্ণি=দ্রৌণি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : 'উত্তরিলা কাতরে **রাবণি**।' 'দিব্যরথে **দাশরথি** পশিলা সংগ্রামে।' 'নাদিলা **সৌমিত্রি** শূর নির্ভয় হৃদয়ে।' **ভাগীরথীর** উভয় তীরে পঞ্চবটীছায়াচ্ছন্ন গ্রামগুলি দাঁড়াইয়া আছে।

—**ষ্ণেয় [এয়] :** অপত্য অর্থে নিষ্পন্ন শব্দ প্রধানতঃ বিশেষ্য। কুন্তী+ষ্ণেয়=কৌন্তেয় ; গঙ্গা+ষ্ণেয়=গাঙ্গেয় ; নিকষা+ষ্ণেয়=নৈকষেয় ; বিমাতৃ+ষ্ণেয়=বৈমাত্রেয় ; ভগিনী+ষ্ণেয়=ভাগিনেয় ; কৃত্তিকা+ষ্ণেয়=কার্তিকেয় ; রাধা+ষ্ণেয়=রাধেয় ; অত্রি+ষ্ণেয়=আত্রেয় ; ইতরা+ষ্ণেয়=ঐতরেয় ; অম্বিকা+ষ্ণেয়=আম্বিকেয় ; সরমা+ষ্ণেয়=সারমেয় ; বিনতা+ষ্ণেয়=বৈনতেয়। [ভাব অর্থে] অগ্নি+ষ্ণেয়=আগ্নেয় ; পুরুষ+ষ্ণেয়=পৌরুষেয় ; অতিথি+ষ্ণেয়=আতিথেয় ; পথ+ষ্ণেয়=পাথেয় [রাস্তা-খরচ]।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : বিসুবিয়াস এক জীবন্ত **আগ্নেয়** পর্বত। বেদ হিন্দুগণের নিকট **অপৌরুষেয়**। মহাপুরুষগণের আদর্শই আমাদের জীবন-যাত্রার **পাথেয়**।

—**ষ্ণায়ন [আয়ন] :** অপত্য [পুত্র] অর্থে নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষ্য। দক্ষ+ষ্ণায়ন=দাক্ষায়ণ ; বৎস+ষ্ণায়ন=বাৎস্যায়ন ; [অন্যান্য অর্থে] : রাম+ষ্ণায়ন=রামায়ণ ; রস+ষ্ণায়ন=রসায়ন ; দ্বীপ+ষ্ণায়ন=দ্বৈপায়ন।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : 'এশিয়া যে নয় কুলিরই আলয় প্রমাণ করিল যেবা, কুলিতে জাগায়ে মহামানবতা নর-নারায়ণ সেবা।' 'রামায়ণের তুমিই মোদের বাল্মীকি আশ্রম।'

—ষ্ণী [ঈয়] **:** সম্বন্ধ অর্থে নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষণ। রাষ্ট্র+ষ্ণীয়=রাষ্ট্রীয়; জাতি+ষ্ণীয়=জাতীয়। বায়ু+ষ্ণীয়=বায়বীয়; পান+ষ্ণীয়=পানীয়; স্বর্গ+ষ্ণীয়=স্বর্গীয়; মানব+ষ্ণীয়=মানবীয়; দানব+ষ্ণীয়=দানবীয়; দেশ+ষ্ণীয়=দেশীয়।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : জাতীয় ভাবধারা হইতে রাষ্ট্রীয় চেতনার উদ্ভব।

—ষ্ণিক [ইক] **:** সম্বন্ধ অর্থে নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষণ। নীতি+ষ্ণিক=নৈতিক; রাষ্ট্র+ষ্ণিক=রাষ্ট্রিক; জগৎ+ষ্ণিক=জাগতিক; ন্যায়+ষ্ণিক=নৈয়ায়িক; লোক+ষ্ণিক=লৌকিক; ভূগোল+ষ্ণিক=ভৌগোলিক; ভূমি+ষ্ণিক=ভৌমিক; শরীর+ষ্ণিক=শারীরিক; পুরাণ+ষ্ণিক=পৌরাণিক; পরলোক+ষ্ণিক=পারলৌকিক; সমাজ+ষ্ণিক=সামাজিক; ইতিহাস+ষ্ণিক=ঐতিহাসিক; মূল+ষ্ণিক=মৌলিক; পরমাণু+ষ্ণিক=পারমাণবিক; নগর+ষ্ণিক=নাগরিক; দেহ+ষ্ণিক=দৈহিক; অণু+ষ্ণিক=আণবিক; চরিত্র+ষ্ণিক=চারিত্রিক; পরত্র+ষ্ণিক=পারত্রিক; বিদ্যুৎ+ষ্ণিক=বৈদ্যুতিক; অন্তর+ষ্ণিক=আন্তরিক; বিজ্ঞান+ষ্ণিক=বৈজ্ঞানিক; দ্বার+ষ্ণিক=দৌবারিক; যোগ+ষ্ণিক=যৌগিক; গিরি+ষ্ণিক=গৈরিক; রসায়ন+ষ্ণিক=রাসায়নিক; পথ+ষ্ণিক=পথিক; অধুনা+ষ্ণিক=আধুনিক; সম্প্রতি+ষ্ণিক=সাম্প্রতিক; অত্যন্ত+ষ্ণিক=আত্যন্তিক; প্রত্যহ+ষ্ণিক=প্রাত্যহিক; বিষয়+ষ্ণিক=বৈষয়িক; রাজনীতি+ষ্ণিক=রাজনৈতিক [রাজনীতিক]; অর্থনীতি+ষ্ণিক=অর্থ নৈতিক [অর্থনীতিক]; অহন্+ষ্ণিক=আহ্নিক; দিন+ষ্ণিক=দৈনিক; মাস+ষ্ণিক=মাসিক; নির্ব্যক্তি+ষ্ণিক=নৈর্ব্যক্তিক; বর্ষ+ষ্ণিক=বার্ষিক; পঞ্চবর্ষ+ষ্ণিক=পঞ্চবার্ষিক; সম্প্রদায়+ষ্ণিক=সাম্প্রদায়িক; বিদেশী+ষ্ণিক=বৈদেশিক; উপনিবেশ+ষ্ণিক=ঔপনিবেশিক; সাম্রাজ্য+ষ্ণিক=সাম্রাজ্যিক; প্রদেশ+ষ্ণিক=প্রাদেশিক; বৎসর+ষ্ণিক=বাৎসরিক; অনুপূর্ব+ষ্ণিক=আনুপূর্বিক; পরস্পর+ষ্ণিক=পারস্পরিক; ভূত+ষ্ণিক=ভৌতিক; পঞ্চভূত+ষ্ণিক=পঞ্চভৌতিক; অধিদেব+ষ্ণিক=আধিদৈবিক; জীব+ষ্ণিক=জৈবিক; জীবন+ষ্ণিক=জৈবনিক; অধ্যাত্ম+ষ্ণিক=আধ্যাত্মিক; সত্ত্ব+ষ্ণিক=সাত্ত্বিক; রজঃ+ষ্ণিক=রাজসিক; তমঃ+ষ্ণিক=তামসিক; অঙ্গ+ষ্ণিক=আঙ্গিক; অকস্মাৎ+ষ্ণিক=আকস্মিক; গ্রন্থাগার+ষ্ণিক=গ্রন্থাগারিক; অভ্যন্তর+ষ্ণিক=আভ্যন্তরিক; সময়+ষ্ণিক=সাময়িক; সমুদ্র+ষ্ণিক=সামুদ্রিক; বেতাল+ষ্ণিক=বৈতালিক; বিতান+ষ্ণিক=বৈতানিক; বিকাল+ষ্ণিক=বৈকালিক; বেদ+ষ্ণিক=বৈদিক; উপনিষদ্+ষ্ণিক=ঔপনিষদিক; মনস্+ষ্ণিক=মানসিক; ছন্দস্+ষ্ণিক=ছান্দসিক; বেদান্ত+ষ্ণিক=বৈদান্তিক; শিল্প+ষ্ণিক=শৈল্পিক; সাহিত্য+ষ্ণিক=সাহিত্যিক; সংকেত+ষ্ণিক=সাংকেতিক; কাব্য+ষ্ণিক=কাব্যিক; প্রশাসন+ষ্ণিক=প্রশাসনিক; পিতৃ+ষ্ণিক=পৈতৃক;

[পৈত্রিক—অশুদ্ধ]; অলংকার + ষ্ণিক = আলংকারিক ; মুখ + ষ্ণিক = মৌখিক ; গণতন্ত্র + ষ্ণিক = গণতান্ত্রিক ; সমাজতন্ত্র + ষ্ণিক = সমাজতান্ত্রিক ; দ্বিপ্রহর + ষ্ণিক = দ্বিপ্রাহরিক ; ইহ + ষ্ণিক = ঐহিক ; তত্ত্ব + ষ্ণিক = তাত্ত্বিক ; পরমার্থ + ষ্ণিক = পারমার্থিক ; কায় + ষ্ণিক = কায়িক ; তর্ক + ষ্ণিক = তার্কিক ; মানব + ষ্ণিক = মানবিক ; দানব + ষ্ণিক = দানবিক ; উপকূল + ষ্ণিক = উপকৌলিক [ঔপকূলিক]; সংঘাত + ষ্ণিক = সাংঘাতিক ; প্রকৃতি + ষ্ণিক = প্রাকৃতিক ; পরিপার্শ্ব + ষ্ণিক = পারিপার্শ্বিক ; ব্যবসায় + ষ্ণিক = ব্যবসায়িক ; ধর্ম + ষ্ণিক = ধার্মিক ; সংবাদ + ষ্ণিক = সাংবাদিক ।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : 'ফেরে দ্বারে **দৌবারিক**।' **পৌরাণিক** যুগ হইতে **আধুনিক** কাল পর্যন্ত নানা অর্থহীন **লৌকিক** ক্রিয়াকাণ্ড আমাদের **সামাজিক** অগ্রগতিকে ব্যাহত করিয়া আসিতেছে। **বৈদেশিক** শাসনমুক্ত হইয়া ভারত **পঞ্চবার্ষিকী** পরিকল্পনার পথে যাত্রা করিয়াছে। 'যে বিচারক বা **নৈয়ায়িক**, কস্মিনকালে কেহ তাহাকে কিছু বুঝাইতে পারে না।'

—মতুপ্, বতুপ্ : 'আছে' এই অর্থে ব্যবহৃত হয় ; নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষ্য। বুদ্ধি + মতুপ্ = বুদ্ধিমান্ ; আয়ুঃ + মতুপ্ = আয়ুষ্মান্ ; চক্ষুঃ + মতুপ্ = চক্ষুষ্মান্ ; ধী + মতুপ্ = ধীমান্ ; বিদ্যা + বতুপ্ = বিদ্যাবান্ ; রূপ + বতুপ্ = রূপবান্ ; গুণ + বতুপ্ = গুণবান্ ; শক্তি + মতুপ্ = শক্তিমান্ ; বল + বতুপ্ = বলবান্ ; শ্রদ্ধা + বতুপ্ = শ্রদ্ধাবান; জ্ঞান + বতুপ্ = জ্ঞানবান্ ; চরিত্র + বতুপ্ = চরিত্রবান্ ; পুণ্য + বতুপ্ = পুণ্যবান্ ; স্বাস্থ্য + বতুপ্ = স্বাস্থ্যবান্ ; ধন + বতুপ্ = ধনবান্ ; ভাগ্য + বতুপ্ = ভাগ্যবান্ ; সার + বতুপ্ = সারবান্ ; প্রজ্ঞা + বতুপ্ = প্রজ্ঞাবান্ ; সৌভাগ্য + বতুপ্ = সৌভাগ্যবান্ ; লক্ষ্মী + মতুপ্ = লক্ষ্মীবান্। [মূল শব্দে 'ম' আছে বলিয়া 'মতুপ্' স্থলে 'বতুপ্' হইয়াছে।]

বি. দ্র. : **মান্ ও বান্** স্থানে স্ত্রীলিঙ্গে যথাক্রমে 'মতী' ও 'বতী' হয়। যেমন : বুদ্ধিমান—বুদ্ধিমতী [স্ত্রীলিঙ্গ), গুণবান্—গুণবতী [স্ত্রীলিঙ্গ]।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : 'বৃথা এ সাধনা, **ধীমান্**।' কতিপয় **বুদ্ধিমান্** ও **জ্ঞানবান্** ব্যক্তিই সমগ্র সমাজটাকে শাসন করিতেছে। তাঁহার ন্যায় **জ্ঞানবান্** এবং **চরিত্রবান্** ব্যক্তি এতদঞ্চলে দুর্লভ। 'আমার এ জীবনের সন্ধ্যায় প্রভাতে কাছে থাক **সর্বশক্তিমান্**।'

—ইন্ [ঈ] : 'আছে' এই অর্থে ব্যবহৃত হয় ; নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষণ। গুণ + ইন্ = গুণী ; ধন + ইন্ = ধনী ; প্রাণ + ইন্ = প্রাণী ; জ্ঞান + ইন্ = জ্ঞানী ; মান + ইন্ = মানী ; হস্ত + ইন্ = হস্তী ; কর + ইন্ = করী ; শিখা + ইন্ = শিখী ; ফণা + ইন্ = ফণী ; শশ + ইন্ = শশী ; যোগ + ইন্ = যোগী ; তাম্বূল + ইন্ = তাম্বূলী। তেমনি—অর্থী, দন্তী, শূলী, বলী, সঙ্গী, রোগী, পক্ষী, প্রতিযোগী, অনুরাগী ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : 'ওগো **গুণী**, কাছে থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি।' 'যে ধনে হইয়া **ধনী**, মানীরে মান না **মানী** তাহারি খানিক।' 'সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ **ধনীর** ধনবৃদ্ধি।' 'সীতা বিনা আমি যেন মণিহারা **ফণী**।'

—ময়ট্ [ময়] : বিকারার্থে ব্যবহৃত হয় ; নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষণ। গুণ+ময়ট্=গুণময় ; কৃপা+মট্য়=কৃপাময় ; মৃৎ+ময়ট্=মৃন্ময় ; হিরণ্য ['য' লুপ্ত]+ময়ট্=হিরণ্ময় ; চিৎ+ময়ট্=চিন্ময় ; বাক্+ময়ট্=বাঙ্ময় ; স্বর্ণ+ময়ট্=স্বর্ণময় ; আলোক+ময়ট্=আলোকময় ; গো+ময়ট্=গোময় ; জ্যোতিঃ+ময়ট্=জ্যোতির্ময়। তেমনি—মধুময়, ধূলিময়, জলময়, মেঘময়, হেমময়, প্রজ্ঞাময়, প্রাণময়, স্নেহময়, ছন্দোময়, শোভাময়, স্বপ্নময়, বাণীময়, মণিময়, তন্ময়, মায়াময়, প্রেমময়, দুঃখময়, করুণাময়, আনন্দময়, মহিমময়, মনোময়, পৃথিবীময়, বিশ্বময়, বনময়, অরণ্যময়, শিলাময়, প্রস্তরময় ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : 'ওগো **দয়াময়**, তুমি থাক সাথে সাথে প্রাণে বল করহ বিধান।' 'সকলি কি **স্বপ্নময় মায়াময়** ছায়া দিয়ে লেখা?' 'ভেঙেছে দুয়ার, এসেছ **জ্যোতির্ময়**।' 'এ দ্যুলোক **মধুময়**, মধুময় পৃথিবীর ধূলি।' **মৃন্ময়ী** প্রতিমা হয়ে উঠবে **চিন্ময়ী**।

—বিন্ [বি] : 'আছে' অর্থে ব্যবহৃত হয় ; নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষণ। যশস্+বিন্=যশস্বী ; মায়া+বিন্=মায়াবী ; তেজস্+বিন্=তেজস্বী। তেমনি—মেধাবী, তপস্বী, মনস্বী, ওজস্বিনী [ভাষা], স্রোতস্বিনী [নদী]।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : মায়াবী মারীচ সোনার হরিণের বেশ ধারণ করিয়া কুটিরের সম্মুখে খেলা করিতে লাগিল। তিনি **ওজস্বিনী** ভাষায় বক্তৃতা করিতে লাগিলেন।

—ঈন : ভাব অর্থে নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষণ। গ্রাম+ঈন=গ্রামীণ ; কুল+ঈন=কুলীন ; প্রাচ্+ঈন=প্রাচীন ; সর্বাঙ্গ+ঈন=সর্বাঙ্গীন ; সর্বজন+ঈন=সার্বজনীন বা সর্বজনীন ; স্মরণীয় : সার্বজনীন [সর্বজন-সম্বন্ধীয়] ; সর্বজনীন [সর্বজনের কল্যাণ-কর]। কাল+ঈন=কালীন ; কন্যা+ঈন=কানীন ; শালা [আলয়]+ঈন=শালীন ; তৎকাল+ঈন=তৎকালীন ; অর্বাচ+ঈন=অর্বাচীন ; সম্মুখ+ঈন=সম্মুখীন ; অভ্যন্তর+ঈন=আভ্যন্তরীণ ; নব+ঈন=নবীন ; বিশ্বজন+ঈন=বিশ্বজনীন।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : এখন পল্লীতে পল্লীতে **সার্বজনীন** পূজার প্রচলন দেখা যায়। 'প্রাচীন ভারতে **সর্বজনীন** শিক্ষার ছিল অবারিত-দ্বার।' **গ্রামীণ** শিল্পের উন্নতি ব্যতীত গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতি সম্ভব নয়। 'পরম **কুলীন** স্বামী বন্দ্যবংশখ্যাত।' কর্ণ ছিলেন কুন্তীর **কানীন** পুত্র।

—ইতচ্ [ইত] : জাত অর্থে নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষণ। ত্বরা+ইতচ্=ত্বরিত ; লজ্জা+ইতচ্=লজ্জিত। মূর্ছা+ইতচ্=মূর্ছিত ; পুষ্প+ইতচ্=পুষ্পিত। তেমনি—ফলিত, তরঙ্গিত, কল্লোলিত, পুঞ্জিত, মন্দ্রিত, মুকুলিত, কুসুমিত, হিল্লোলিত, পিপাসিত, পণ্ডিত [পণ্ডা+ইতচ্] ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : 'বর্ষণ-গীত হল মুখরিত **মেঘমন্দ্রিত** ছন্দে।' '**ত্বরিতে** নামায় পাল নদীপথে ত্রস্ত তরী যত।' '**মুকুলিত** জীবনের রেণুগুলি রয়েছে ছড়ানো ও পথের ধূলি 'পরে।' 'তারুণ্যের সোনার স্বপন কর্ণিকার শাখে শাখে হয়ে আছে

পুষ্পিত কাঞ্চন।' 'ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে **পুঞ্জিত** অভিমান।' '**বিকশিত** বিশ্ব-বাসনার অরবিন্দ-মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার।' 'যার লাগি ফিরি একা একা আঁখি **পিপাসিত** নাহি দেখা।'

—ইমন্ [ইম] : ভাব অর্থে নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষণ; 'আ'-প্রত্যয়ান্ত হইলে বিশেষ্য। লঘু+ইমন্+আ=লঘিমা; চন্দ্র+ইমন্+আ=চন্দ্রিমা; নীল+ইমন্+আ=নীলিমা; রক্ত+ইমন্+আ=রক্তিমা; শ্যামল+ইমন্+আ=শ্যামলিমা; গুরু+ইমন্+আ=গরিমা; মধুর+ইমন্+আ=মধুরিমা; অণু+ইমন্+আ=অণিমা; দীর্ঘ+ইমন্+আ=দ্রাঘিমা; মহৎ+ইমন্+আ=মহিমা; তনু+ইমন্+আ=তনিমা; কালি+ইমন্+আ=কালিমা; জড়+ইমন্+আ=জড়িমা; শোণ+ইমন্+আ=শোণিমা। [স্বার্থে]: বহু+ইমন্+আ=ভূমা। কিন্তু রক্ত+ইমন্=রক্তিম।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : 'শ্যামলে শ্যামল তুমি **নীলিমায়** নীল।' 'শোকের **কালিমা** যুগ যুগ ধরি তোমার আঁধার দিয়াছে যে গড়ি।' 'হেথা মত্ত স্ফীতস্ফূর্ত ক্ষত্রিয়-**মহিমা**, হোথা স্তব্ধ মহামৌন ব্রাহ্মণ-**মহিমা**।' 'জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর **তনিমা**, ত্রিলোকের হৃদি-রক্তে আঁকা তব চরণ-**শোণিমা**।'

—ল : আছে অর্থে নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষণ। পাংশু+ল=পাংশুল; মাংস+ল=মাংসল; শ্যাম+ল=শ্যামল; শীত+ল=শীতল; ধূম+ল=ধূমল; বহু+ল=বহুল; হিম+ল=হিমল; পিঙ্গ+ল=পিঙ্গল; কপি+ল=কপিল; শ্রী+ল=শ্রীল; কুশ+ল=কুশল; বৎস+ল=বৎসল; পেশ+ল=পেশল; মঞ্জু+ল=মঞ্জুল; মৃদু+ল=মৃদুল; ঊর্মি+ল=ঊর্মিল।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : 'ধরণীতল হল **শীতল** চিকন আভায় ভ'রে।' '**শ্যামল** সঘন নববরষার কিশোর দূত কি এলে?' 'ধূসর **পাংশুল** মাঠ, ধেনুগণ ধায় ঊর্দ্ধমুখে।' 'পশ্চিমে বিচ্ছিন্ন মেঘে সায়াহ্নের **পিঙ্গল** আভাস রাঙাইছে আঁখ।'

—ইল : আছে অর্থে নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষণ। ফেন+ইল=ফেনিল; সর্প+ইল=সর্পিল; জটা+ইল=জটিল; পঙ্ক+ইল=পঙ্কিল; কুট+ইল=কুটিল; পিচ্ছা+ইল=পিচ্ছিল; শঙ্কা+ইল=শঙ্কিল।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : 'তোমার মোহন এল ভীষণ বেশে, আকাশ-ঢাকা **জটিল** কেশে।' 'ঘোর-**কুটিল** পন্থ তার, লোভ-**জটিল** বন্ধ।' 'তঁহি অতি **শঙ্কিল পঙ্কিল** বাট।' 'মন্ত্রমুগ্ধ চরণে **ফেনিল** জলধি গরজে জলদমন্দ্র।'

—র : আছে অর্থে নিষ্পন্ন শব্দ প্রধানতঃ বিশেষণ। মধু+র=মধুর; মুখ+র=মুখর; নখ+র=নখর; পাণ্ডু+র=পাণ্ডুর; উষ+র=উষর; নগ+র=নগর; ধূম+র=ধূম্র।

—তন : ভাব অর্থে নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষণ। পুরা+তন=পুরাতন; সনা+তন=সনাতন; চিরম্+তন=চিরন্তন; নব+তন=নবতন>নূতন; সায়ম্+তন=সায়ন্তন; তদানীম+তন=তদানীন্তন; অদ্য+তন=অদ্যতন; পূর্ব+তন=পূর্বতন;

অধুনা+তন=অধুনাতন; ইদানীম্+তন=ইদানীন্তন; নক্তম্ [রাত্রি]+তন=নক্তন্তন; অধঃ+তন=অধস্তন; ঊর্ধ্ব+তন=ঊর্ধ্বতন; প্রাক্+তন=প্রাক্তন।

বিশিষ্ট প্রয়োগ: 'নূতন করিয়া লহ আরবার চির-পুরাতন মোরে।' 'সায়ন্তনের ক্লান্ত ফুলের গন্ধ হাওয়ার 'পরে অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনে সকল অঙ্গ ভরে।' বাংলার কৃষক-সমাজের দারিদ্র্য চিরন্তন। সনাতন ভারতীয় রীতিতে তাঁহারা আমাদিগকে সংবর্ধনা জানাইলেন।

● বাংলা তদ্ধিত-প্রত্যয়

—ই, ঈ: সংযোগ, সম্বন্ধ, শীল, জাতি, ব্যবসায়, হ্রস্বতা ইত্যাদি অর্থে নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষ্য ও বিশেষণ। দেশ+ই=দিশি; বিলাত+ই=বিলাতি; বাঙ্গাল+ই=বাঙ্গালি; ডাক্তার+ই=ডাক্তারি; মাস্টার+ই=মাস্টারি; সওদাগর+ই=সওদাগরি; জমিদার+ই=জমিদারি; ছোরা+ই=ছুরি; গোলা+ই=গুলি; ছাতা+ই=ছাতি; যাঁতা+ই=যাঁতি, জাঁতি। দাম+ঈ=দামী; ভার+ঈ=ভারী; দরদ+ঈ=দরদী; মরম+ঈ=মরমী; গরম+ই=গরমী [গর্মি]। উৎপন্ন অর্থে নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষণ: দেশ+ঈ=দেশী; বিলাত+ঈ=বিলাতী; বিহার+ঈ=বিহারী; জাপান+ঈ=জাপানী; বৃন্দাবন+ঈ=বৃন্দাবনী; কামরূপ+ঈ=কামরূপী; কটক+ঈ=কটকী; পাঞ্জাব+ঈ=পাঞ্জাবী; গুজরাট+ঈ=গুজরাটী; মাদ্রাজ+ঈ=মাদ্রাজী; শান্তিপুর+ঈ=শান্তিপুরী; কাশ্মীর+ঈ=কাশ্মীরী; জৌনপুর+ঈ=জৌনপুরী; বেনারস+ঈ=বেনারসী। নিপুণ অর্থে নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষণ: সেতার+ঈ=সেতারী, শিকার+ঈ=শিকারী; ধ্রুপদ+ঈ=ধ্রুপদী; হিসাব+ঈ=হিসাবী; মজলিস+ঈ=মজলিসী। জীবিকা অর্থে নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষ্য: চাষ+ঈ=চাষী; ঢাক+ঈ=ঢাকী; ঢোল+ঈ=ঢুলী; তেল+ঈ=তেলী; করাত+ঈ=করাতী। উপাদান অর্থে নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষণ: রেশম+ঈ=রেশমী; সূতা+ঈ=সূতী। সম্বন্ধ অর্থে নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষ্য: পসার+ঈ=পসারী; দোকান+ঈ=দোকানী; কয়েদ+ঈ=কয়েদী; ভাঁড়ার+ঈ=ভাঁড়ারী। [বিশেষণ অর্থে] বাদাম+ঈ=বাদামী; আসমান+ঈ=আসমানী; জাফরান+ঈ=জাফরানী; প্রণাম+ই=প্রণামী; নমস্কার+ঈ=নমস্কারী; আশীর্বাদ+ঈ=আশীর্বাদী; সেলাম+ঈ=সেলামী; দর্শন+ঈ=দর্শনী।

বিশিষ্ট প্রয়োগ: 'বাদল করেছে, গর্মি আর নেই।' 'চাষী উপবাসী থাকিতে না দেয়, নট তারে তোষে নৃত্যে গানে।' 'তাঁতী, তিলি, মালী সমান ভালো।' জাপানীরা ফুল খুব ভালোবাসে।' দোকানী পসারীরা আজ হাটে যায় নাই। 'শালওয়ালারা ভাল ভাল পশ্চিমী শাল ও রুমাল লইয়া আসিত। 'পশ্চিমী ক্ষেত্রীরা বেনারসী ও চেলীর জোড় লইয়া উপস্থিত হইত।'

—মি: ভাব অর্থে নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষ্য। বুড়ো+মি=বুড়োমি; দুষ্টু+মি=দুষ্টুমি; ছেলে+মি=ছেলেমি; গোঁড়া+মি=গোঁড়ামি; গুণ্ডা+মি=গুণ্ডামি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : 'আমি যদি দুষ্টুমি করে চাঁপার গাছে চাঁপা হয়ে ফুটি।' ধর্মীয় **গোঁড়ামি** বর্তমান কালে নিশ্চিহ্নপ্রায়। তোমার **বুড়োমি** আর সহ্য হয় না।

—আমি : ভাব অর্থে নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষ্য। পাগল+আমি=পাগলামি ; জেঠা+আমি=জেঠামি ; ভণ্ড+আমি=ভণ্ডামি ; ধূর্ত+আমি=ধূর্তামি ; পাকা+আমি=পাকামি ; ন্যাকা+আমি=ন্যাকামি ; ভাঁড়+আমি=ভাঁড়ামি ; বাঁদর+আমি=বাঁদরামি ; দুষ্ট+আমি=দুষ্টামি ; ফাজিল+আমি=ফাজলামি ; [দক্ষতা অর্থে] ঘর+আমি=ঘরামি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : 'শিকলদেবীর এই যে পূজাবেদী—চিরকাল কি রইবে খাড়া ? —**পাগলামি**, তুই আয়রে দুয়ার ভেদি।' বক-ধার্মিকদের **ভণ্ডামি** সহ্য করা যায় না। তুমি আর **জেঠামি** করো না।

আর : কর্ম অর্থে নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষ্য। ভাঁড়+আর=ভাঁড়ার ; মাঝ+আর=মাঝার ; চাম+আর=চামার ; কাম+আর=কামার ; কুম [>কুম্ভ]+আর=কুমার [>কুমোর]।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : 'সবারি রয়েছে কাজ এ বিশ্ব-**মাঝার**।' 'বাউরী, **চামার** কাওর, তেওর, পাটনী, কোটাল, কপালী, মালো, বামুন, কায়েৎ, **কামার**, **কুমোর** তাঁতী, তিলি, মালী সমান ভালো।'

—আরি : প্রকার অর্থে নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষ্য ও বিশেষণ দুইই হয়। মাঝ+আরি=মাঝারি ; কাট+আরি=কাটারি ; ভুখ+আরি=ভুখারি ; রকম+আরি=রকমারি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : '**ভুখারি** ফিরিয়া চলে।' কাল রাতে **মাঝারি** ধরনের বৃষ্টি হয়েছে।

—আরী : কর্ম ও সম্বন্ধ অর্থে নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষ্য। ভিখ্+আরী=ভিখারী ; কাঁসা+আরী=কাঁসারী ; পূজা+আরী=পূজারী ; শাঁখা+আরী=শাঁখারী ; ঝি+আরী=ঝিয়ারী ; দিশ+আরী=দিশারী।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : 'তুমি মোরে, হে **ভিখারী**, মার কাছ হতে কাড়ি করেছ আপন অনুচর।' **শাঁখারী** 'শাঁখা চাই' 'শাঁখা চাই' বলিয়া ডাকিয়া গেল। **পূজারী** পূজায় বসিলেন।

—আরু, রু : বহন করা অর্থে নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষণ। বোমা+আরু=বোমারু। অন্যান্য অর্থে নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষ্য। দিশ+আরু=দিশারু ; শশ+আরু=শশারু ; সজা+রু=সজারু ; গো+রু=গোরু।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : আকাশ-যুদ্ধে শত্রুপক্ষের একখানি **বোমারু** বিমান ধ্বংস হইয়াছে। 'সঙ্গে শিশুগণ ফেরে, তাড়িয়া **শশারু** ধরে।' 'রাখাল **গোরুর** পাল লয়ে যায় মাঠে।'

—ইয়া [>এ] : সম্বন্ধ বা সংযোগ বুঝাইতে নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষণ। শহর+ইয়া

=শহুরিয়া<শহুরে ; পাড়া+গাঁ+ইয়া=পাড়াগাঁইয়া>পাড়াগেঁয়ে ; সেকাল+ইয়া=সেকালিয়া>সেকেলে ; বারমাস+ইয়া=বারমাসিয়া [>বারমেসে] ; একপাশ+ইয়া=একপাশিয়া [>একপেশে] ; মোট+ইয়া=মুটিয়া>মুটে ; মাটি+ইয়া=মাটিয়া>মেটে ; হলুদ+ইয়া [>এ]=হলদে ; বালি+ইয়া=বালিয়া>বেলে। নাও+ইয়া=নাইয়া>নেয়ে ; জাল+ইয়া=জালিয়া>জেলে ; পাহাড়+ইয়া=পাহাড়িয়া>পাহাড়ে।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : **শহুরে** মানুষেরা **পাড়াগেঁয়ে** মানুষগুলোর সম্পর্কে চিরকালই উন্নাসিক। 'আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের **মুটে** মজুরের।' 'চালু সেরে বাঁধা দিনু **মাটিয়া** পাথরা।' 'তাঁতি বসে তাঁত বোনে, **জেলে** ফেলে জাল।'

—উয়া [>ও] : সম্বন্ধ বা সংযোগ বুঝাইতে নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষণ। ভাত+উয়া=ভাতুয়া>ভেতো ; মাঠ+উয়া=মাঠুয়া>মেঠো ; মাছ+উয়া=মাছুয়া>মেছো ; গাছ+উয়া=গাছুয়া>গেছো ; পট+উয়া=পটুয়া>পটো ; কাঠ+উয়া=কাঠুয়া>কেঠো ; ঝড+উয়া=ঝড়ুয়া>ঝড়ো ; খড+উয়া=খড়ুয়া>খড়ো ; বাত+উয়া=বাতুয়া>বেতো ; বান+উয়া=বানুয়া>বেনো ; জল+উয়া=জলুয়া>জলো ; গোঁফ+উয়া=গোঁফুয়া>গুঁফো।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : সকাল থেকে **ঝড়ো** হাওয়া বইছে। **মেঠো** সুরে গান গেয়ে ধান কাটছে চাষী। ঘরের **খড়ো** চাল কতোক্ষণ আর ঝড়ের দাপট সইতে পারে? **বেতো** ঘোড়াটাকে গাড়ীতে জুড়ে দিয়ে ভূতপূর্ব জমিদারবাবু মাঝে মাঝে হাওয়া খেতে বেরোন। আজ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনেক **বেনো** জল ঢুকে পড়েছে।

—উক : স্বভাব অর্থে নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষণ ; **উ :** নিষ্পন্ন শব্দও বিশেষণ। ভাব+উক=ভাবুক ; পেট+উক=পেটুক ; লাজ+উক=লাজুক ; মিশ+উক=মিশুক ; চুম+উক=চুমুক ; দুষ্ট+উ=দুষ্টু ; কান [<কৃষ্ণ]+উ=কানু ; নীচ+উ=নীচু ; উঁচ [উচ্চ]+উ=উঁচু ; পিছ+উ=পিছু ; ভীত+উ=ভীতু ; আগ+উ=আগু ; চুম+উ=চুমু ; সাঁতার+উ=সাঁতারু।

—ট, টিয়া [>টে] : নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষণ। তুলা+ট=তুলট ; ধুলা+ট=ধুলট ; দাপ+ট=দাপট ; ঝাপ+ট=ঝাপট ; তামা+টিয়া=তামাটিয়া>তামাটে ; সাদা+টিয়া=সাদাটিয়া>সাদাটে ; পাগলা+টিয়া=পাগলাটিয়া>পাগলাটে ; ঝগড়া+টিয়া=ঝগড়াটিয়া>ঝগড়াটে ; ঘোলা+টিয়া=ঘোলাটিয়া>ঘোলাটে ; ধোঁয়া+টিয়া>ধোঁয়াটিয়া=ধোঁয়াটে ; ভাড়া+টিয়া>ভাড়াটিয়া=ভাড়াটে ; রোগা+টিয়া>রোগাটিয়া=রোগাটে।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : তিনি ছিলেন ডাকসাইটে জমিদার ; তাঁর **দাপটে** বাঘে-গোরুতে একঘাটে জল খেত। 'পাখি যেন মারিতেছে ডানার **ঝাপট**।' রোদ্দুরে পুড়ে পুড়ে তার গায়ের রং হয়ে গেছে **তামাটে**। '**ভাড়াটে** কুঠি! নদীর স্রোতের জঞ্জাল সম আসিয়া জুটি।'

—পানা, পারা : সদৃশ অর্থে নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষণ। চাঁদ+পানা=চাঁদপানা ; হাঁড়ি+পানা=হাঁড়িপানা ; লম্বা+পানা=লম্বাপানা ; কালো+পানা=কালোপানা ; পাগল+পারা=পাগলপারা।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : বাছার অমন **চাঁদপানা** মুখ শুকিয়ে একেবারে-কালি হয়ে গেছে। 'তোর গায়ে ওটা **কালোপানা** কি রে?' 'আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া আকুল **পাগলপারা**।'

—বন্ত, মন্ত : 'আছে' অর্থে কয়েকটি শব্দের উত্তর এই প্রত্যয় হয়। নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষণ। গুণ+বন্ত=গুণবন্ত ; ভাগ্য+বন্ত=ভাগ্যবন্ত ; পয়+মন্ত=পয়মন্ত ; শ্রী+মন্ত=শ্রীমন্ত ; লক্ষ্মী+মন্ত=লক্ষ্মীমন্ত।

● বিদেশী তদ্ধিত-প্রত্যয়

কতকগুলি বিদেশী শব্দ [বিশেষতঃ ফারসী] তদ্ধিত-প্রত্যয়রূপে বাংলায় ব্যবহৃত হয়। তাহাদের **বিদেশী তদ্ধিত-প্রত্যয়** বলা হয়। যেমন :

—ওয়ান : নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষ্য। কোচ+ওয়ান=কোচোয়ান ; গাড়ী+ওয়ান=গাড়োয়ান ; [দ্বার]>দার+ওয়ান=দারোয়ান ; পাল+ওয়ান=পালোয়ান।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : '**কোচোয়ান** গাড়িতে উঠিয়া মনের আনন্দে গান গাহিতে লাগিল।' '**দারোয়ান** গায় গান শোনো ঐ রামা হৈ।'

—আনি : নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষ্য। তল+আনি=তলানি ; [অম্ল>] আম+আনি=আমানি ; বাবু+আনি=বাবুয়ানি ; হিঁদু+আনি=হিঁদুয়ানি ; কাতর+আনি=কাতরানি ; নাক+আনি=নাকানি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : 'তারা নিজে নিজেই আগেকার দিনের **তলানি** নিয়ে কোনোমতে একটু সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করে।' '**আমানি** খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান।' 'আজ মহরম্, নিখিল মুসলিম-জগতের ক্রন্দন-**কাত্‌রানির** দিন।'

—আনা : নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষ্য। বাবু+আনা=বাবুয়ানা ; গরীব+আনা=গরীবানা [চাল] ; মুন্‌শী+আনা=মুন্‌শীয়ানা ; মালিক+আনা=মালিকানা ; মুরুব্বি+আনা=মুরুব্বিয়ানা ; ঘর+আনা=ঘরানা ; সাল+আনা=সালিয়ানা ; সাহেব+আনা=সাহেবিয়ানা।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : কাহিনী বর্ণনায় তাঁর **মুন্‌শীয়ানা** সত্যি প্রশংসনীয়। বড়ে গোলাম আলি লক্ষ্নৌ-**ঘরানার** বিশিষ্ট গায়ক। জমির **মালিকানা** কৃষকদেরই থাকবে।

—খানা : নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষ্য। ডাক্তার+খানা=ডাক্তারখানা ; পিল+খানা=পিলখানা ; তোশা+খানা=তোশখানা ; বৈঠক+খানা=বৈঠকখানা ; ছাপা+খানা=ছাপাখানা ; মুদি+খানা=মুদিখানা।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : ভিড় এখন সবখানেই—**ডাক্তারখানায়** ভিড়, **বৈঠকখানায়** ভিড়, **চিড়িয়াখানায়** ভিড়, এমন-কি ভিড় **কয়েদখানায়ও**।

—খোর : নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষণ। সুদ+খোর=সুদখোর ; মুনাফা+খোর= মুনাফাখোর ; নেশা+খোর=নেশাখোর ; গাঁজা+খোর=গাঁজাখোর ; মদ+খোর= মদখোর ; ঘুষ+খোর=ঘুষখোর ; চশম+খোর=চশমখোর ; গুলি+খোর= গুলিখোর ; আফিম+খোর=আফিমখোর।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : **সুদখোর** মহাজনেরা দীর্ঘকাল কৃষকদের শোষণ করেছে। এখন চারিদিকে **মুনাফাখোর** আর **ঘুষখোরদেরই** তো রাজত্ব।

—ওয়ালা : নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষ্য। কাবুলি+ওয়ালা=কাবুলিওয়ালা ; রিকশা +ওয়ালা=রিকশাওয়ালা ; ফল+ওয়ালা=ফলওয়ালা ; ফেরি+ওয়ালা=ফেরি-ওয়ালা ; বাড়ি+ওয়ালা=বাড়িওয়ালা ; ঘড়ি+ওয়ালা=ঘড়িওয়ালা ; বাসন+ ওয়ালা=বাসনওয়ালা ; বাঁশি+ওয়ালা=বাঁশিওয়ালা , দই+ওয়ালা=দইওয়ালা ; ফুল+ওয়ালা [স্ত্রী]=ফুলওয়ালী ; চুড়ি+ওয়ালা [স্ত্রী]=চুড়িওয়ালী।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : 'এমন-কি বেদানার বস্তা লইয়া বিদেশী **কাবুলিওয়ালা** পর্যন্ত বাদ যাইত না।' '**ফেরিওলা** যাচ্ছে ফেরি নিয়ে।'

—বাজ [দক্ষ] **:** নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষণ ; **-বাজি** [দক্ষতা] **:** নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষ্য ; বক্তৃতা+বাজ=বক্তৃতাবাজ ; চাল+বাজ=চালবাজ ; মামলা+বাজ=মামলাবাজ। ফন্দী+বাজ=ফন্দীবাজ ; ফাঁকি+বাজ=ফাঁকিবাজ ; দাঙ্গা+বাজ=দাঙ্গাবাজ ; গল্প +বাজ=গল্পবাজ ; মতলব+বাজ=মতলববাজ ; দাঁও+বাজ=দাঁওবাজ ; গুণ্ডা +বাজি=গুণ্ডাবাজি ; ধাপ্পা+বাজি=ধাপ্পাবাজি ; গলা+বাজি=গলাবাজি ; ফাঁকি +বাজি=ফাঁকিবাজি ; ফেরেব+বাজি=ফেরেববাজি। তেমনি, দলবাজি, ধান্ধাবাজি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : লোকটা যেমনি **চালবাজ, মামলাবাজিতেও** তেমনি ওস্তাদ। 'এ পৃথিবীতে গ্লাড্‌স্টোন্ ডিস্রেলি প্রভৃতির ন্যায় তুমি কেবল **গলাবাজিতে** জিতিয়া গেলে।'

—গর : নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষ্য। কারি+গর=কারিগর ; সওদা+গর=সওদাগর ; বাজি+গর=বাজিগর>বাজিকর ; হালুই+গর=হালুইগর>হালুইকর।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : 'কে বেঁধেছে এমন ঘর ধন্য **কারিগর**।' মধ্যযুগে বাঙালী সমাজে **সওদাগরদের** স্থান ছিল অতি উচ্চে। '**বাজিকরের** মেয়ে তারে যেমন নাচায় তেমনি নাচে।'

—গিরি : নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষ্য। বাবু+গিরি=বাবুগিরি ; কেরানী+গিরি= কেরানীগিরি ; গোয়েন্দা+গিরি=গোয়েন্দাগিরি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : এখন না হয় তোমার পিতা বর্তমান ; কিন্তু এভাবে **বাবুগিরি** করিয়া আর কতদিন কাটিবে ? **কেরানীগিরি** করে সারা জাতটা আজ কেরানীর জাতে পরিণত হয়েছে।

—দানি : বিশেষ্য। পিক্+দানি=পিকদানি ; নস্য+দানি=নস্যদানি ; ছাই +দানি=ছাইদানি ; ফুল+দানি=ফুলদানি ; ধূপ+দানি=ধূপদানি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : **ফুলদানিতে** ফুল আর **ধূপদানিতে** ধূপ দিও।

—দান : নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষ্য। বাতি+দান=বাতিদান ; কলম+দান= কলমদান ; আতর+দান=আতরদান।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : মাথার ওপরে ঝুলছিল উজ্জ্বল **বাতিদান**।

—দার : বিশেষ্য [কখনও কখনও বিশেষণ]। চৌকি+দার=চৌকিদার ; দাবী+দার=দাবীদার ; দোকান+দার=দোকানদার ; খরিদ+দার=খরিদ্দার ; মজুত+দার=মজুতদার ; ব্যবসা+দার=ব্যবসাদার ; পাওনা+দার=পাওনাদার ; হাবিল+দার=হাবিলদার ; ফৌজ+দার=ফৌজদার ; হুকুম+দার=হুকুমদার ; তালুক+দার=তালুকদার ; অংশ+দার=অংশীদার ; বর্গা+দার=বর্গাদার ; জমি+দার=জমিদার ; জোত+দার=জোতদার ; পোত+দার=পোতদার> পোদ্দার ; দানা+দার=দানাদার ; মজা+দার=মজাদার ; রঙ+দার=রঙদার ; বুটি+দার=বুটিদার ; চটক+দার=চটকদার ; পেশা+দার=পেশাদার ; সমঝ+দার=সমঝদার ; দেনা+দার=দেনাদার ; বাজন+দার=বাজনদার ; চুড়ি+দার =চুড়িদার।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : 'শোন্‌রে মালিক, শোন্‌রে **মজুতদার**, তোদের প্রাসাদে জমা হলো কতো মৃত মানুষের হাড়।' যুদ্ধান্তে **হাবিলদার** কবি স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। 'সন্তানসম পালে যারা জমি, তারা **জমিদার** নয়।'

—নবিশ, নামা : বিশেষ্য। নকল+নবিশ=নকলনবিশ ; শিক্ষা+নবিশ= শিক্ষানবিশ ; হিসাব+নবিশ=হিসাবনবিশ ; জমা+নবিশ=জমানবিশ ; পত্র+নবিশ =পত্রনবিশ, হুকুম+নামা=হুকুমনামা ; বয় [বিক্রয়]+নামা=বয়নামা।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : সে এখন একটি বিখ্যাত শিল্প-প্রতিষ্ঠানে **শিক্ষানবিশ** আছে। এদিকে সমস্তই প্রস্তুত ; এখন শুধু **হুকুমনামা** পেলেই হয়।

—চী, চি [তুর্কী] : নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষ্য। তবলা+চী=তবলচী ; মশাল+চি =মশালচি ; ধুনা+চি=ধুনাচি, ধুনুচি। তেমনি—খাজাঞ্চি, বেঙাচি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : সে এই রাত-দুপুরে গান গাইবে ; আমি এখন **তবলচী** পাই কোথায় ? '**বেঙাচিতে** ভরে গেল দেশ।'

॥ অনুসরণী ॥

১ প্রত্যয় কাহাকে বলে ? প্রত্যয় কয় প্রকার ও কি কি ? দুইটি করিয়া উদাহরণ দিয়া বুঝাও।

২. কৃৎ-প্রত্যয়, ধাত্ববয়ব প্রত্যয় ও ধাতু-প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য কি দৃষ্টান্ত সহযোগে বুঝাইয়া দাও।

৩. 'ইৎ' কাহাকে বলে ? দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দাও।

৪. উপধা কাহাকে বলে ? উদাহরণ দিয়া ব্যাখ্যা কর।

*৫. কৃৎ-প্রত্যয় কাহাকে বলে ? দুইটি সংস্কৃত ও দুইটি বাংলা কৃদন্ত শব্দ দ্বারা মোট চারিটি বাক্য রচনা কর। মা. '৫২।

৬. কৃৎ বা তদ্ধিত-প্রত্যয়ের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া তদনুযায়ী যে কোন চারিটি বাংলা কৃদন্ত বা সংস্কৃত তদ্ধিতান্ত শব্দ গঠিত কর। উ. মা. '৬১

*৭. তদ্ধিত ও কৃৎ-প্রত্যয়ের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও। ৭টি বাংলা ও সংস্কৃত-উভয়বিধ কৃৎ ও তদ্ধিতের উদাহরণ দাও। মা. '৫৫, '৫৮ ; উ. মা. '৬০, '৬২। তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও : বাংলা কৃৎ-প্রত্যয়, '৬৮।

*৮. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সনন্ত ও যঙন্ত ধাতু হইতে নিষ্পন্ন শব্দের উদাহরণ দাও। উ. মা. '৬১।

*৯. কৃৎ ও তদ্ধিত-প্রত্যয়ের পার্থক্য উদাহরণ সহকারে বুঝাইয়া দাও। উ. মা. '৬৬; তৎসম ও বাংলা উভয়বিধ কৃৎ ও তদ্ধিতের দৃষ্টান্ত দাও। বিশেষ্য পদকে বিশেষণে রূপান্তরিত করিবার জন্য যে যে কৃৎ ও তদ্ধিত-প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে অন্ততঃ দুইটি করিয়া প্রত্যয়ের উদাহরণ দাও। উ. মা. '৬৩।

[**সংকেত :** তৎসম অর্থাৎ সংস্কৃত। **কৃত-প্রত্যয় :** হৃষ্ + অচ্ = হর্ষ [বিশেষ্য], হৃষ্ + ক্ত = হৃষ্ট [বিশেষণ]। মৃ + সন + আ = মুমূর্ষা [বিশেষ্য]; মৃ + সন্ + উ = মুমূর্ষু [বিশেষণ]। **তদ্ধিত-প্রত্যয় :** আদি [বিশেষ্য]; আদি + ম = আদিম [বিশেষণ]। রক্ত + ইমন + আ = রক্তিমা [বিশেষ্য]; রক্ত + ইমন = রক্তিম [বিশেষণ]।]

*১০. যে কোন চারিটি উপসর্গের সহিত কৃ বা হৃ ধাতুর যোগে উৎপন্ন চারিটি শব্দের উল্লেখ কর [আ-কৃ + ঘঞ্ = আকার; প্র-কৃ + ঘঞ্ = প্রকার; বি-কৃ + ঘঞ্ = বিকার, প্রতি-কৃ + ঘঞ্ = প্রতিকার; আ-হৃ + ঘঞ্ = আহার; প্র-হৃ + ঘঞ্ = প্রহার; বি-হৃ + ঘঞ্ = বিহার; প্রতি-হৃ + ঘঞ্ = প্রতিহার।],

১১. তদ্ধিত-প্রত্যয় কাহাকে বলে? পাঁচটি সংস্কৃত ও পাঁচটি বাংলা তদ্ধিতান্ত শব্দ স্বরচিত পৃথক্ পৃথক্ বাক্যে ব্যবহার কর।

*১২. উদাহরণ সহকারে ব্যাখ্যা কর : স্বার্থিক প্রত্যয়, উ. মা. '৬৪; কৃৎ-প্রত্যয়, মা. '৬২, ব. প্র. '৬২। তদ্ধিত-প্রত্যয়, মা. '৬১; বিদেশী তদ্ধিত-প্রত্যয়, মা. '৪২; অপত্যার্থে তদ্ধিত-প্রত্যয়, ক. প্রা. '৬১। সমাসান্ত প্রত্যয়, উ. মা. '৬৬; ক. প্রা. '৬৩; বাংলা কৃৎ-প্রত্যয়, উ. মা. '৬৯।

[**সংকেত :** সমাসান্ত প্রত্যয়—সমাস অধ্যায়ের শেষ অংশ দ্রষ্টব্য।]

*১৩. নিম্নলিখিত প্রত্যয়গুলির প্রয়োগ দেখাও ও অর্থ-নির্দেশ কর : ইমন্, ত্ব, মৎ, গিরি, ওয়ালা, আনি, উয়া, অন্ত, আ; উ. মা. '৬৪।

১৪. কৃৎ ও তদ্ধিত-প্রত্যয়ের সাহায্যে বিশেষ্যপদ বিশেষণে ও বিশেষণ পদ বিশেষ্যে পরিণত হয়, তাহা উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও; উ. মা. '৬৪।

[**সংকেত : কৃৎ**-প্রত্যয়—বচ + অনট্ = বচন [বি], বচ্ + তব্য = বক্তব্য বা বচ্ + ক্ত = উক্ত [বিণ], মুচ্ + অনট্ = মোচন [বি], মুচ্ + মুক্ত = মুক্ত [বিণ]। উপ-হৃ + ঘঞ্ = উপহার [বি], উপ-হৃ + ক্ত = উপহৃত [বিণ]। হন্ + অল্ = বধ [বি], হন্ + ত = হত [বিণ]। **তদ্ধিত-প্রত্যয়**—শ্যাম + ল = শ্যামল [বিণ], শ্যামল + ইমন্ + আ = শ্যামলিমা [বি]।

*১৫. অর্থ নির্দেশ করিয়া ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর এবং কোন প্রত্যয় কি কারণে হইয়াছে লিখ : সহিষ্ণু, দাশরথি, পথ্য [পথিন্ + যক্], কনিষ্ঠ, কাটারি, জন্মকাল; উ. মা. '৬২। ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর : সোনা, মেটে, দাঁতাল, সহিষ্ণু, সৌমিত্রি, ছিন্ন, শব্দায়মান, দিশারু, পড়ন্ত, লাজুক; উ. মা. '৬০। অর্থসহ প্রত্যয় নির্ধারণ কর : বরণীয়, কার্য, নম্র, জলদ, ভস্মসাৎ, সোনা, মিথ্যুক, সাপুড়ে; উ. মা. [কম্পার্ট.] '৬০। প্রকৃতি-প্রত্যয় ও ব্যুৎপত্তিগত অর্থ লিখ : শুশ্রূষা, ভাষা, কৃত, রোরুদ্যমান, মাতৃকা, কাটারি, বড়াই; উ. মা. '৬১। বিবক্ষা, ছাত্র, সন্তান, স্বর, সত্তা, ভাগবত, আণবিক; উ. মা. '৬৩। প্রকৃতি-প্রত্যয় ও ব্যুৎপত্তিগত অর্থ লিখ : চঞ্চল, পুত্র, ভৃত্য, সার্বভৌম, সাহিত্য, বন্দী, সৌগত, আর্জব; উ. মা. '৬৪। প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ধারণ কর ও ব্যুৎপত্তিগত অর্থ লিখ : অভিষেক, মহিমা, আহূত, বাবুগিরি, ভয়ংকর, বাড়ন্ত, দোকানদার; উ. মা. '৬৫। প্রকৃতি-প্রত্যয় নিরূপণ কর : বক্ষ্যমাণ, রোরুদ্যমান, কৌন্তেয়, মায়াবী, শাঁসাল, বলিয়ে, আদুরে, ঢাকনি; উ. মা. '৬৬। গোময়, সঞ্চিত, লেঠেল, আত্মজ, দারিদ্র্য; উ. মা. '৬৭। জাহ্নবী, ঠাকুরালি, ফণী, মিঠাই; উ. মা. '৬৮। বর্তমান, আধুনিক, প্রদর্শক, কর্তব্য পরিপুষ্ট, স্মরণ, সংস্কৃত; ক. প্রা. '৬৭। শয়ান, লুণ্ঠিত, দাতব্য, পাহাড়ে, নিদ্রালু; উ. মা. '৬৭। সিঁধেল, ভুখড়, তন্দ্রালু, বৈদান্তিক, পানীয়, গাইয়ে, শুনানি, পাকড়াও; উ. মা. '৭০।

*১৬. প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ধারণ কর ও ব্যুৎপত্তিগত অর্থ লিখ : বৈচিত্র্য, দাশরথি, জমিদার, শুশ্রূষা, চর্চিত, বার্ষিক, জ্যাঠামো, মেয়েলি, বড়াই, ঘরোয়া; মা. '৫৩। একলা, মিতালি, নাটিয়াল, দয়ালু, চলন্ত, ভিক্ষুক, জুয়াড়ি, মুন্সীআনা, তামাটে, দুরন্তপনা; মা '৫৫। দাশরথি পাণ্ডিত্য সাধুতা, গরিষ্ঠ, কর্তব্য,

পিপাসা, বিনষ্ট, উপকারী · মা. '৬৭। বর্ধিষ্ণু, শয়ান, গিরিশ, প্রিয়ংবদা, তামাটে, বাঘা, বুনো, নৈয়ায়িক; মা. '৫৩। কানাই, সেবাইত, মিতালি, জৈন, মূর্ধন্য, আতিথ্য, মিথ্যুক, নৈয়ায়িক; মা, '৭২। সহিষ্ণু, দাশরথি, পণ্য, কনিষ্ঠ, কাটারি, বড়াই জমকালো. মা. [কম্পার্ট.] '৬২। বুদ্ধিমান, শারীরিক, লোভনীয়, সত্তা, শোভমান, ধনা, নন্দিনী মা. '৬৫। মৃন্ময়, রবিবাসরীয়, ছেলেমি, যশস্বী, চলন্ত, খেয়ালী, শাঁখারী, নীলিমা; মা. '৬৬। শ্রোতব্য, জিষ্ণু, শয়ান ভুক্ত, কৌন্তেয়, লঘিমা, পড়ুয়া, তাম্বুলী; মা. '৬৯। পরিধেয়, শয়ান, শুল্ক, হানি, ত্যাগ, খেলনা, পড়ুয়া, সৌর, জ্যেষ্ঠ, পায়স, ভস্মীভূত, দ্রাঘিমা, হলদে, মেছো, হ্যাংলাপনা; মা. '৫৬। সরসিজ, বিক্রীত, মুক্তি, শ্রবণীয়, কম্পমান, সৌমিত্র, দাশরথি, গাঙ্গেয়, দস্যিপনা; মা. '৭৩।

*১৭. কারণ দেখাইয়া অশুদ্ধি সংশোধন কর: ভৌগলিক, মহত্ব, মৃয়মান, অপকর্ষতা; উ. মা. '৬১। লক্ষ্যণীয়, সখ্য, ভৌগলিক, ঐক্যমত, নিশ্চয়তা, বৈশিষ্ট্যতা; উ. মা. '৬৪।

*১৮. নিম্নলিখিত প্রত্যয়গুলির প্রয়োগ দেখাও: ইমন্, ত্ব, ষং, গিরি, ওয়ালা, আমি, উয়া, অন্ত, আনি; উ. মা. '৬৪। ক্তি, তৃচ্, ইত, ইন্, উয়া, অন্ত, আলি, পনা. উ মা. '৬৬। ইল, ঈয়স্ [ঈয়স্], তন, ইমন্, গিরি, দান, বিন্, তা; উ. মা. '৬৭। খোর, দার, রাজ, ইমন্, পনা, খানা, গিরি; উ. মা. [কম্পার্ট.] '৬৯।

*১৯. বাংলায় শতৃ ও শানচ্ প্রত্যয়ান্ত পদ কিভাবে ব্যবহৃত হয় দেখাও; মা. '৬৬।

*২০. শানচ্ প্রত্যয়-যুক্ত পাঁচটি কৃদন্ত পদ রচনা করিয়া বাক্যে প্রয়োগ কর; ক. প্রা. '৬৯।

*২১. প্রকৃতি-প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন কর: গঙ্গা+এয, মৃদু+ঈয়স্, ক্ষি+ক্ত, বৃৎ+শানচ্, গ্রহ্+তৃচ্, লাঠি+আল, পাড়াগাঁ+ইয়া; মা. '৬৭।

*২২. স্থূলাক্ষরে মুদ্রিত পদগুলির স্থানে সেই অর্থে কৃদন্ত বা তদ্ধিতান্ত পদ বসাও: ক. ভাদ্রমাসের **শেষদিনে** বিশ্বকর্মা পূজা হয়। ক. ভারতবর্ষে **দেখিবার** কি,র অভাব নাই। গ. মহাপুরুষেরা সর্বদাই **স্মরণের যোগ্য**। ঘ. পত্রিকাখানি **ছয় মাস অন্তর বাহির হয়**। ঙ. মেয়েটি **গৃহের ব্যবস্থা** ভালো জানে। চ. তোমার কাছে [**নদী**] **পার** হইবার পয়সা আছে? ছ. **মাটির তৈয়ারী**।

২৩. প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ণয় করিয়া স্বরচিত বাক্যে ব্যবহার কর: চৈনিক, সার্বজনীন, শ্রীমন্ত, বিবিয়ানা, এমনতর, চালবাজি নকলনবিশ, গোমশ, দাশরথি, ভাগীরথী, বিশ্বজনীন, অকর্মণ্য, সৈন্ধব, শ্রমিক, মহিম, নৌকা, পাতলা, কুঠরী, সোনালী, হলুদে, বড়াই, রেশমী, চিমটি, গোরু, ঘুমন্ত, উন্নতি, রাঁধুনী, ডুবুরী, পোড়ো, একলা, হাবিলদার, মেঠো, লাঠিয়াল, হেঁৎকা, রান্না, ডাকু, হবু, জ্যান্ত, বৈঠক, ফেওন, মাগনা, জ্যান্তা, বালাই, ঘর-ভাঙ্গানী, ধুনুরী, বকুনি, বাজিয়ে, গুনতি, রঞ্জক, সবিতা, শুভঙ্করী, দেদীপ্যমান, পৌত্র, উৎকর্ষ, ঐশ্বর্য, জ্যোতির্ময়, সাম্য, তৃতীয়, বক্ষ্যমাণ, বিবক্ষা, সার্বভৌম, উত্তীর্ণ, অর্ঘ্য, নশ্বর, বস্ত্র।

[**সংকেত:** বক্ষ্যমাণ—বচ্+স্যমান্; বিবক্ষা—বচ্+সন্+আ; অর্ঘ্য—অর্ঘ (অর্হ্+ঘঞ্)+যৎ; নৌকা—নৌ+ক+আ]

২৪. প্রকৃতি-প্রত্যয়যোগে এক কথায় প্রকাশ কর: দূতের কাজ, পুরোহিতের কাজ, ভূগোল সম্বন্ধীয়, ঠাকুরের ভাব, স্মৃতিশাস্ত্র জানেন যিনি, বৃহস্পতির উপাসক, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র, উজ্জ্বলের ভাব, দ্রোণের পুত্র, কুন্তীর পুত্র, শরীর সম্বন্ধীয়, পরলোক সম্বন্ধীয়, প্রতিযোগীর ভাব, মনুষ্যের গুণ, জট আছে যাহাতে, ঢাকার উৎপন্ন, ঝগড়া করে যে, ঋষির উক্ত, যাহা পুনঃ পুনঃ জ্বলিতেছে, শ্রী আছে যাহার, বিনতার পুত্র, পাণ্ডুর পুত্র, মধু পান করে যে, যাহা জানা উচিত, যাহা প্রশংসার যোগ্য, যাহা ক্ষয় পাইতেছে, যে মরিতেছে, মরিতে ইচ্ছুক, শুনিবার ইচ্ছা।

উপসর্গ

'যে সকল অব্যয় শব্দ ধাতুর সহিত মিলিত হইয়া বা ধাতুকে অবলম্বন করিয়া ঐ ধাতুর নানা অর্থের সৃষ্টি করে', তাহাদের উপসর্গ [Prepositional Prefixes] বলে।

'উপসর্গের অর্থবাচকতা নাই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে, তাহারা স্বয়ং কোন বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে না; কিন্তু ধাতুযোগে বিশেষ বিশেষ স্থলে বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে।' এই গুণের জন্য উপসর্গ কেবল প্রয়োজনীয় নয়, ভাষার পক্ষে অপরিহার্য। একটি মাত্র ধাতু ভিন্ন ভিন্ন উপসর্গযোগে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ গঠন করে। 'উপসর্গ' কথাটি 'উপ-সৃজ্ ধাতু+ঘঞ্' হইতে গঠিত। তাহার অর্থ—'উপসৃষ্টি'।

সংস্কৃত ভাষায় কুড়িটি উপসর্গ আছে। সেগুলি হইল : **প্র, পরা, অপ, সম্, নি, অব, অনু, নির্, দুর্, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অভি, অতি, অপি, উপ, আ**। কিন্তু পাণিনির মতে, উপসর্গ কুড়ি নয়, দ্বাবিংশতি অর্থাৎ বাইশ। তিনি **'নিস্'** ও **'দুস্'**—এই অতিরিক্ত দুইটি উপসর্গকে হিসাবের মধ্যে ধরিয়াছেন।

সংস্কৃত উপসর্গ প্রধানতঃ ধাতুর পূর্বে প্রযুক্ত হয়। বাংলায়ও উপসর্গ কেবলমাত্র ধাতুর পূর্বে প্রযুক্ত হয়। রবীন্দ্রনাথও বলেন, 'উপসর্গ থাকে সামনে, প্রত্যয় থাকে পিছনে, নতুন শব্দ তৈরী করবার বেলায় তাঁদের নইলে চলে না।'

সংস্কৃত ধাতুর সহিত ভিন্ন ভিন্ন উপসর্গযোগে কিভাবে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ গঠিত হয় ও অর্থান্তর ঘটে, তাহার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়া একটি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করা যাইতে পারে :

"প্রহারাহার সংহার বিহার পরিহারবৎ।"

অর্থাৎ, 'হৃ' ধাতুর সহিত 'প্র' উপসর্গ-যোগে 'প্রহার', 'আ' উপসর্গ-যোগে 'আহার', 'সম্' উপসর্গ-যোগে 'সংহার', 'বি' উপসর্গ-যোগে 'বিহার' এবং 'পরি' উপসর্গ-যোগে 'পরিহার' শব্দ গঠিত হয়। সংস্কৃত উপসর্গগুলি মূল ধাতুর পূর্বে বসিয়া কিরূপে শব্দের অর্থ বদলাইয়া দেয়, তাহা কয়েকটি ধাতুর দ্বারা প্রদর্শিত হইল :

১। সংস্কৃত √হৃ [হরণ করা] ধাতু : √হৃ+ঘঞ্=হার [মালা, ভাগ]।

আ-হৃ+ঘঞ্=আহার [ভোজন]; **বি-হৃ+ঘঞ্=বিহার** [ভ্রমণ]; **প্র-হৃ+ঘঞ্=প্রহার** [আঘাত]; **বি-অব-হৃ+ঘঞ্=ব্যবহার** [আচরণ]; **অব-হৃ+ঘঞ্=অবহার** [বাটা]; **অপ-বি-অব-হৃ+ঘঞ্=অপব্যবহার** [ভুল প্রয়োগ]; **সম-হৃ+ঘঞ্=সংহার** [হত্যা]; **সম্-আ-হৃ+ঘঞ্=সমাহার** [সমষ্টি]; **পরি-হৃ+ঘঞ্=পরিহার** [পরিত্যাগ]; **প্রতি-হৃ+ঘঞ্=প্রতিহার**

[দৌবারিক]; বি-অতি-হৃ+ঘঞ্=ব্যতিহার [বিনিময়]; নি-হৃ+ঘঞ্= নিহার, নীহার [বরফ]; অধি-হৃ+ঘঞ্=অধিহার [অতিরিক্ত মূল্য]; উৎ-হৃ+ঘঞ্=উদ্ধার [মুক্তি]; উপ-হৃ+ঘঞ্=উপহার [উপঢৌকন]; উপ-সম্-হৃ+ঘঞ্=উপসংহার [পরিসমাপ্তি]।

● সংস্কৃত √বদ্ [মূল অর্থ—বলা] ধাতু: √বদ্+ঘঞ্=বাদ [উক্তি, মত]।

প্র-বদ্+ঘঞ্=প্রবাদ [জনশ্রুতি], অপ-বদ্+ঘঞ্=অপবাদ [নিন্দা]; সম্-বদ্+ঘঞ্=সংবাদ [খবর], অনু-বদ্+ঘঞ্=অনুবাদ [ভাষান্তর]; বি-বদ্+ঘঞ্=বিবাদ [ঝগড়া], প্রতি-বদ্+ঘঞ্=প্রতিবাদ [বিরুদ্ধ উক্তি]।

● সংস্কৃত √বহ্ [মূল অর্থ—বহন করা] ধাতু: √বহ্+ঘঞ্=বাহ [বহনকারী]।

প্র-বহ্+ঘঞ্=প্রবাহ [স্রোত], নির্-বহ্+ঘঞ্=নির্বাহ [যাপন করা]; বি-বহ্+ঘঞ্=বিবাহ [পরিণয়], উৎ-বহ্+ঘঞ্=উদ্বাহ [পরিণয়]।

● সংস্কৃত √রুধ্ [মূল অর্থ—রোধ করা] ধাতু: √রুধ্+ঘঞ্=রোধ [বাধা]। অব-রুধ্+ঘঞ্=অবরোধ [পরিবেষ্টন], অনু-রুধ্+ঘঞ্=অনুরোধ [মিনতি], নি-রুধ্+ঘঞ্=নিরোধ [বাধা]; বি-রুধ্+ঘঞ্=বিরোধ [বিবাদ]; প্রতি-রুধ্+ঘঞ্=প্রতিরোধ[বাধাদান]; উপ-রুধ্+ঘঞ্=উপরোধ[অনুনয়]।

● সংস্কৃত √নী [মূল অর্থ—আনয়ন করা] ধাতু: √নী+ঘঞ্=নয় [নীতি]।

প্র-নী+ঘঞ্=প্রণয় [প্রীতি], অনু-নী+ঘঞ্=অনুনয় [মিনতি]; নির্-নী+ঘঞ্=নির্ণয় [নির্ধারণ], বি-নী+ঘঞ্=বিনয় [নম্রতা], পরি-নী+ঘঞ্= পরিণয় [বিবাহ], অভি-নী+ঘঞ্=অভিনয় [কৃত্রিম ভাব প্রকাশ]।

১. **সংস্কৃত উপসর্গ:**

প্র—প্রশংসা, প্রগাঢ়, প্রগতি, প্রভূত, প্রহার, প্রকাশ, প্রখর, প্রসাদ, প্রচণ্ড, প্রলয়, প্রতাপ, প্রকট, প্রগল্ভ, প্রচলন, প্রদাহ, প্রবল, প্রজ্ঞা, প্রকর্ষ, প্রস্তাব, প্রভাব, প্রচ্ছদ, প্রভব, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, প্রণয়, প্রণয়ন, প্রক্ষেপ, প্রমাদ, প্রবাহ, প্রণাম, প্রগতি। **পরা**—পরাক্রম, পরাজয়, পরাভব, পরাধীন, পরাঙ্মুখ, পরাকাষ্ঠা, পরাগ, পরামর্শ। **অপ**—অপমান, অপচয়, অপনোদন, অপপ্রয়োগ, অপবাদ, অপযশ, অপহরণ, অপকার, অপব্যয়, অপমৃত্যু, অপকর্ষ, অপরাধ, অপঘাত, অপগত, অপসৃত, অপরূপ, অপদেবতা। **সম্**—সম্ভাষণ, সম্মুখ, সম্মান, সম্ভার, সম্মিলন, সংবাদ, সঞ্চয়, সংঘাত, সংগ্রহ, সংকলন, সংকট, সংকীর্ণ, সন্তাপ, সঞ্চালন, সম্পত্তি, সন্তোষ, সংগীত, সংস্কার, সংগতি, সম্পাদন, সমাবর্তন, সম্পূর্ণ, সমাহার, সন্ধান, সম্পদ, সংসার, সম্ভোগ। **নি**—নিগ্রহ, নিকৃষ্ট, নিবৃত্তি, নিবাস, নিগম, নিশ্চল, নিবারণ, নিরোধ, নিকট, নিমজ্জন, নিরাময়, নিরাকরণ, নীরোগ, নিদর্শন, নিপাত, নিশ্চয়। **অব**—অবতরণ, অবচেতন, অবরোহণ, অবহেলা, অবজ্ঞা, অবরোধ, অবসর, অবকাশ, অবগুণ্ঠন, অবস্থা, অবতার,

অবদান, অবমান, অবগত, অবনত, অবলম্বন, অবগাহন। অনু—অনুজ, অনুতাপ, অনুমতি, অনুপ, অনুচর, অনুশোচনা, অনুমোদন, অনুরূপ, অনুকরণ, অনুলিপি, অনুবর্তন, অন্বেষণ, অনুমান, অনুসার, অনুবাত, অনুপাত, অনুরাগ, অনুকার, অনুরোধ, অনুগ্রহ, অনুবাদ। নির্—নির্ণয়, নির্দোষ, নির্গমন, নির্জন, নির্মল, নির্ভয়, নির্ভর, নির্ধন, নির্বাস, নিঃসম্বল, নিঃসঙ্কোচ, নিরপরাধ, নিরন্তর, নিরভিমান, নিরতিশয়। দুর্—দুর্গতি, দুর্জয়, দুর্ভাগ্য, দুরদৃষ্ট, দুর্লভ, দুর্জন, দুরাশা, দুর্ভিক্ষ, দুর্দিন, দুর্ব্যবহার, দুরন্ত, দুর্দম, দুর্মদ, দুর্মতি, দুর্ঘটনা, দুর্বিপাক, দুরারোগ্য। বি—বিজ্ঞান, বিকার, বিরাগ, বিজয়, বিচার, বিরোধ, বিবাদ, বিষাদ, বিক্রয়, বিসর্জন, বিয়োগ, বিজন, বিনয়, বিষম, বিস্মৃতি, বিখ্যাত, বিতৃষ্ণা। অধি—অধিবেশন, অধিত্যকা, অধিরোহণ, অধিকার, অধিবাসী, অধ্যয়ন, অধ্যবসায়, অধিপতি, অধীশ্বর, অধিগত, অধ্যাত্ম, অধ্যাস, অধিষ্ঠান, অধিনায়ক। সু—সুদর্শন, সুন্দর, সুশ্রী, সুকোমল, সুদৃশ্য, সুকর, সুকণ্ঠ, সুনীতি, সুবাস, সুদিন, সুজলা, সুফলা, সুনাম, সুগম, সুতীক্ষ্ণ, সুস্থ, সুতা, সুভাব, সুভাষিত, স্বস্তি [= সু + অস্তি], সুকৃতি, সুলভ, সুষমা, সুকুমার, সুগন্ধ, সুচিন্তিত, সুদূর, সুহৃদ্, সুশান্ত, সুজন। উৎ—উৎসর্গ, উৎকর্ণ, উৎপত্তি, উত্তপ্ত, উন্মুখ, উদ্‌গ্রীব, উন্নয়ন, উৎসাহ, উৎপাটন, উত্তাল, উজ্জ্বল, উচ্ছ্বাস, উত্থান, উচ্ছৃঙ্খল, উদ্বেগ, উদ্ধার, উৎকর্ষ, উদ্ভাবনা, উৎকোচ, উৎক্ষেপণ, উদ্ভিদ্, উত্থাপন, উৎকীর্ণ, উৎসারণ, উত্তর, উচ্ছন্ন, উদ্যম, উদ্বাস্তু, উৎখাত, উদাহরণ, উচ্চারণ। পরি—পরিখা, পরিতাপ, পরিপন্থী, পরিবার, পরিত্যাগ, পরিহার, পরীক্ষা, পরিশ্রম, পরিণয়, পরিণাম, পরিক্রমা, পরিধান, পরিহাস, পরিণত, পরিচয়, পরিপূর্ণ, পরিপাক, পরিবর্তন, পরিচালক, পরিচালনা, পরিচ্ছদ, পরিচ্ছেদ, পরিচর্যা। প্রতি—প্রতিমূর্তি, প্রতিকূল, প্রতিকার, প্রতিনিধি, প্রতিকৃতি, প্রতিধ্বনি, প্রতিষ্ঠা, প্রতিক্রিয়া, প্রতিফল, প্রতিহিংসা, প্রতিশোধ, প্রতিবাদ, প্রত্যহ, প্রতীতি, প্রত্যাশা, প্রত্যুত্তর, প্রত্যাখ্যান, প্রত্যর্পণ, প্রত্যয়ন, প্রতিবিধান, প্রতিফলন, প্রতিশ্রুতি, প্রতীক্ষা, প্রতিবেশী, প্রতিপক্ষ। অভি—অভিধান, অভিজ্ঞান, অভিরাম, অভিনয়, অভীষ্ট, অভীপ্সা, অভিভাবক, অভিধান, অভ্যুদয়, অভিমুখ, অভ্যুত্থান, অভিযোগ, অভিসার, অভিশাপ, অভিনব, অভিমান, অভিজাত, অভিলাষ। অতি—অতিকায়, অত্যন্ত, অত্যুক্তি, অতিশয়, অতিক্রম, অত্যধিক, অতীব, অতিরেক, অতিবৃদ্ধি, অতিপ্রাকৃত, অতিমানব, অত্যুগ্র, অত্যল্প, অত্যুষ্ণ, অত্যাশ্চর্য, অত্যাবশ্যক, অত্যুজ্জ্বল, অত্যুৎকৃষ্ট, অতিরঞ্জন, অত্যাচার, অতিরিক্ত, অতিবৃষ্টি। অপি—অপিনিহিতি, অপিধান। উপ—উপহার, উপকার, উপচার, উপবাস, উপবন, উপকণ্ঠ, উপায়, উপাসনা, উপস্থিতি, উপবেশন, উপনয়ন, উপকূল, উপকথা, উপক্রম, উপনদী, উপসাগর, উপত্যকা, উপগ্রহ, উপজাত, উপদ্রব, উপনগর, উপনিবেশ, উপদেশ, উপনিষদ্। আ—আহার, আহরণ, আচরণ, আস্বাদন, আচ্ছাদন, আরক্ত, আজন্ম, আশ্লেষ, আক্রমণ, আগমন, আবেশ, আদেশ, আরম্ভ, আদান, আদর্শ, আকণ্ঠ, আবাস, আবাহন, আভাস, আকুল। নিস্—নিস্তার, নিষ্কৃতি, নিষ্কাশন, নিস্তেজ, নিস্তাপ, নিষ্পাপ, নিষ্প্রদীপ, নিষ্ফল, নিষ্কলুষ, নিষ্কণ্টক,

নিষ্কণ্টক, নিশ্চল, নিঃশ্বাস, নিঃস্বন্। **দুস্**—দুস্তর, দুষ্কৃতি, দুষ্প্রবৃত্তি, দুশ্চরিত্র, দুশ্ছেদ্য, দুঃসাধ্য, দুঃসহ, দুঃশাসন, দুঃস্বপ্ন, দুশ্চিন্তা, দুঃসময়।

২. উপসর্গরূপে সংস্কৃত অব্যয়ঃ

কতকগুলি সংস্কৃত অব্যয় বিশেষ কয়েকটি ধাতুর পূর্বে উপসর্গরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ **অন্তঃ**—অন্তঃপুর, অন্তঃসলিলা, অন্তঃকরণ, অন্তঃসার, অন্তঃস্থ, অন্তরঙ্গ, অন্তর্ভুক্ত, অন্তর্ভূত, অন্তর্গত, অন্তর্জলী, অন্তর্ধান, অন্তর্বর্তী, অন্তর্ঘাত, অন্তর্দশা, অন্তর্দেশীয়। **আবিঃ**—আবির্ভাব, আবিষ্কার। **পুরঃ**—পুরস্কার, পুরোহিত, পুরোবর্তী, পুরোভাগ, পুরোধা, পুরোগমন। **তিরস্**—তিরস্কার, তিরোভাব, তিরোধান। **পূর্ব**—পূর্বরাগ, পূর্ববর্তী, পূর্বতন, পূর্বাহ্ণ, পূর্বাভাস, পূর্বাশা, পূর্বোক্ত, পূর্বপুরুষ, পূর্বজ্ঞান, পূর্বাচল। **প্রাদুঃ**—প্রাদুর্ভাব। **বহিঃ**—বহিঃস্থ, বহির্গমন, বহিরাগত, বহির্দ্বার, বহির্ভূত, বহিষ্কার, বহিরঙ্গ, বহির্ভারত, বহির্জগৎ, বহিরাবরণ, বহির্ভাগ, বহির্বিভাগ, বহির্বাণিজ্য। **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎকার, সাক্ষাদ্দর্শন। **অলম্**—অলংকার, অলংকরণ।

৩. বাংলা উপসর্গঃ

বাংলা ভাষারও কতকগুলি নিজস্ব উপসর্গ আছে। ইহারা নামপদের পূর্বে বসে এবং শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটায়।

অ—অফুরন্ত, অদেখা, অসুবিধা, অবাঙালী, অবোলা, অকাজ, অযাত্রা, অবশ, অবিবেকী, অপাত্র, অযথা, অনড়, অচিন, অপয়া, অবেলা, অজানা, অচেনা, অকেজো, অনামী। **অনা**—অনাবৃষ্টি, অনামুখো, অনাসৃষ্টি। **আ**—আদেখ্লা, আলুনি, আভাঙা, আকাটা, আধোয়া, আসিদ্ধ, আভাজা, আকাট, আঘাটা, আকাল, আগাছা, আপাকা, আকাঁড়া। **দর**—দরকাঁচা, দরসিদ্ধ, দরপাকা। **নি**—নিলাজ, নিখরচা, নিখাদ, নির্জলা, নির্ভেজাল, নির্ভরসা, নিভাঁজ, নিটোল, নিখুঁত। **পাতি**—পাতিলেবু, পাতিহাঁস, পাতিকাক, পাতকুয়া। **বে**—বেচাল, বেহায়া, বে-হেড, বেসরম, বেতাল, বেজাত, বেহাত, বেঢপ, বেসুরো, বেতার, বেসামাল, বেহদ্দ। **বি**—বিভুঁই, বিদেশী, বিজোড়, বিকল, বিপথ। **ভর**—ভরদিন, ভরসন্ধ্যা, ভরদুপুর, ভরপেট। **ভরা**—ভরাঘট, ভরাসাঁঝ, ভরাগাঙ, ভরাবাজি, ভরাডুবি, ভরাযৌবন, ভরানদী। **রাম**—রামদা, রামছাগল, রামগরুড়, রামশিঙে, রামশালিক, রাম-ধোলাই। **স**—সপাট, সজোর, সজল, সটান, সঠিক, সখেদ, সকাতর, সক্ষম, সবুট। **হা**—হাভাতে, হাঘরে, হাপিত্যেশ, হা-হুতাশ।

৪. বিদেশী উপসর্গঃ

ফি—ফিদিন, ফিবছর, ফিসন, ফিবার, ফিরোজ। **হর**—হরবোলা, হররোজ, হরদিন, হরঘড়ি, হরসাল। **গর**—গরমিল, গরহজম, গররাজি, গরহাজির। **হেড**—হেড-মিস্ত্রী, হেড্-চাপরাশী, হেড্-পণ্ডিত, হেড্-অফিস। **না**—নাচার, নাখোরাজ, নাবালক, নামঞ্জুর, নাহক, নারাজ, নাছোড়বান্দা, নাকাল। **ব**—বকলম, বনাম, বমাল। **বে**—বেবন্দোবস্ত, বেয়াদপি, বেকসুর, বে-টাইম, বেরসিক, বেআইনী, বেইজ্জত, বেপরোয়া,

বেনামী, বেতার, বেহুঁশ। **বদ্**—বদ্‌মাইস, বদ্‌রাগী, বজ্জাত, বদ্‌মেজাজী, বদ্‌নাম। **ফুল**—ফুলবাবু, ফুলহাতা. ফুলটিকিট, ফুলশার্ট, ফুলপ্যাণ্ট, ফুল-টাইম। **হাফ্**—হাফ্-টিকিট, হাফ্-হাতা, হাফ্-টাইম, হাফ্-আখড়াই। **সব্**—[Sub]—সব্-ডেপুটি, সব্-জজ্, সব্-রেজিস্ট্রার, সব্-অফিস। **নিম্**—নিমরাজী, নিমখুন, নিম-হাকিম, নিম-মোল্লা। **বর**—বরখাস্ত, বরবাদ, বরদাস্ত। **কার**—কারবার, কারখানা, কারসাজি, কারচুপি, কারদানি। **খাস**—খাসমহল,. খাসকামরা। **খোস**—খোসগল্প, খোস-মেজাজ খোসগন্ধ, খোসবাবু।

অনুসর্গ

যে সকল পদ বাক্যের মধ্যস্থিত পদগুলির সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য পদের অগ্রে বা পরে বসে, অথচ পদগুলি হইতে বিযুক্ত হইলেও বিচ্ছিন্ন অবস্থায় অর্থযুক্ত থাকে, তাহাদিগকে **অনুসর্গ** বলা হয়।

কারকের বিভক্তিরূপে, অর্থাৎ বাক্যের ক্রিয়াপদের সহিত বাক্যস্থিত অন্যান্য পদগুলির সম্বন্ধ বুঝাইতে ইহারা ব্যবহৃত হয়। ইহারা আসলে স্বতন্ত্র পদ। কিন্তু কারক বুঝাইতে ইহারা বিভক্তিরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন: **করণ কারকে** দ্বারা, দিয়া, ক'রে, করিয়া, সাহায্যে, কর্তৃক ইত্যাদি শব্দ; **সম্প্রদান কারকে** জন্য, নিমিত্ত, হেতু, অর্থে, তরে, লাগিয়া, উদ্দেশে ইত্যাদি শব্দ; **অপদান কারকে** হইতে, হতে, থেকে, চেয়ে, অপেক্ষা, নিকট হইতে, কাছ থেকে ইত্যাদি শব্দ এবং **অধিকরণ কারকে** কাছে, নিকটে, মধ্যে, মাঝে, পাশে, ভিতরে, উপরে, পানে, দিকে ইত্যাদি শব্দ। এই শব্দগুলিকে বলা হয় **অনুসর্গ, পরসর্গ** বা **কর্মপ্রবচনীয়**।

উপসর্গ [Preposition] যেমন ধাতুর পূর্বে বসিয়া অর্থ-বৈচিত্র্য আনে, ইহারাও তেমনি নামপদের [অর্থাৎ বিশেষ্য ও বিশেষণ] অগ্রে বা পরে বসিয়া বাক্যের অর্থকে সুস্পষ্ট করে। সেইজন্য ইহাদের **অনুসর্গ** বা **পরসর্গ** [Post-position] বলা হয়।

এই পদগুলি অব্যয়রূপেও ব্যবহৃত হয়।

'হতে' [<হইতে], 'থেকে' [<থাকিয়া], 'চেয়ে' [<চাহিয়া], 'দ্বারা', 'দিয়ে' [<দিয়া], 'কারণে', 'জন্য', 'নিমিত্ত', 'ছাড়া', 'বিনা', 'মতো', 'মতন', 'সঙ্গে', 'সাথে', 'ভিতরে', 'উপরে' ইত্যাদি শব্দগুলির এক-একটি নিজস্ব অর্থ আছে এবং ইহারা বাক্যে স্বাধীনভাবে প্রযুক্ত হইবার যোগ্য। তাই ইহাদের সম্পর্কে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর বলেন: "উহারা স্বতন্ত্র আস্ত গোটা পদ; 'দ্বারা' পদটি সংস্কৃত হইতে অবিকল আসিয়াছে, অন্যগুলা হয়ত অসমাপিকা ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু উহারা এখন মূল অর্থ পরিহার করিয়া সংকীর্ণ অর্থে কেবল অব্যয় পদে দাঁড়াইয়াছে। ইংরেজিতে Preposition যেমন Objective Case-এর পূর্বে বসিয়া উহাকে govern করে বা শাসন করে, ইহারা সেইরূপে বাঙ্গালা পদের পরে বসিয়া পূর্ববর্তী পদকে শাসন করে বা পদের সহিত অন্বিত হয়।" যেমন:

"সীতা 'বিনা' আমি যেন মণিহারা ফণী।" "তোমা 'ছাড়া' আর এ জগতে মোর কেহ নাই।" "সকলের 'তরে' সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের 'তরে'।" "খাঁটি সোনার 'চাইতে' খাঁটি।" "পরের 'কারণে' স্বার্থ দিয়া বলি এ-জীবন মন সকলি দাও।" "সে জীবনে কাহারও মন্দ 'বই' ভালো করিল না।" "ইহার 'চেয়ে' হতেম যদি আরব বেদুয়িন।" "সবার 'উপরে' মানুষ সত্য, স্রষ্টা আছে কি নাই।" "আমি তোমার যাত্রীদলের রব 'পিছে'।" "তোমার 'কাছে' আরাম চেয়ে পেলাম শুধু লজ্জা।" "তব 'সনে' মিশি আছে নিশি কত হাহাকার।" "পুরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন 'পাশে'।" "ব্যথা মোর উঠবে জ্বলে ঊর্ধ্ব-'পানে'।" "সিংহল 'নামে' রেখে গেছে নিজ শৌর্যের পরিচয়।" ইত্যাদি।

॥ অনুসরণী ॥

১. উপসর্গ কাহাকে বলে? সংস্কৃতে উপসর্গ কয়টি ও কি কি? সংস্কৃত উপসর্গ ও বিদেশী উপসর্গ—প্রত্যেকের পাঁচটি করিয়া উদাহরণ দাও।

*২. উদাহরণসহ পার্থক্য নির্দেশ কর: উপসর্গ ও অনুসর্গ। উ. মা. '৭০

*৩. বাংলা উপসর্গ সম্বন্ধে যাহা জান উদাহরণসহ লিখ মা. '৫৩; উ. মা. '৭১

*৪. উপসর্গযোগে ধাতুর অর্থের কিরূপ পরিবর্তন হয় চারিটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে দেখাইয়া দাও। উ.মা.'৭৪

*৫. প্রকৃতি, প্রত্যয় ও উপসর্গ কাহাকে বলে? উদাহরণযোগে বুঝাইয়া দাও। উ. মা. '৭৫

*৬. আগমন, আক্ষেপ, আহার, উপকার, আনয়ন, নিবৃত্তি, অপসারিত—এই শব্দগুলির মধ্যে যে-কোন ছয়টির আদিতে যে-উপসর্গ আছে, তাহার স্থানে অন্য উপসর্গ ব্যবহার করিলে অর্থের কিরূপ পরিবর্তন হয় দেখাও। মা. '৭৬

[সংকেত: আগমন—আসা, অভিগমন—অগ্রসর হওয়া; আক্ষেপ—ক্ষোভ, সংক্ষেপ—অল্পীকরণ; আহার—ভোজন, বিহার—ভ্রমণ; উপকার—মঙ্গল সাধন, অপকার—অমঙ্গল সাধন; আনয়ন—আনা, প্রণয়ন—রচনা; নিবৃত্তি—নিবারণ, প্রবৃত্তি—স্পৃহা; অপসারিত—দূরীকৃত, প্রসারিত—বিস্তৃত।]

৭. উপসর্গের যোগে ধাতুর অর্থ কিভাবে পরিবর্তিত হয় দেখাও। উ. মা. '৭৬

৮. পাঁচটি সংস্কৃত অব্যয়কে উপসর্গরূপে প্রয়োগ করিয়া বাক্য রচনা কর।

৯. প্র, পরি, বি, উপ—'হৃ' ধাতুর সহিত এই চারিটি উপসর্গযোগে চারিটি পৃথক্ পৃথক্ শব্দ গঠন কর।

*১০. নিম্নলিখিত যে কোন চারিটি উপসর্গ প্রয়োগ করিয়া চারিটি পৃথক শব্দ গঠন কর: প্র, অতি, পরা, নির্, দুর্, বি, অধি, উপ। মা. '৭২

*১১. উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর: বিদেশীয় অর্থে উপসর্গ। মা. '৭৭

[সংকেত: সংস্কৃত—উৎকোচ, উচ্ছৃঙ্খল; বাংলা—অপয়া, অকেজো, অপদার্থ; বিদেশী—বদনাম, বজ্জাত, বদরাগী।]

১২. নিম্নোক্ত উপসর্গযোগে পৃথক্ পৃথক্ শব্দ গঠিত করিয়া প্রত্যেকটির সাহায্যে এক একটি সার্থক বাক্য রচনা কর: প্র—, সম্—, অধি—, অব—, উৎ—, বে—।

*১৩. নিম্নপ্রদর্শিত যে কোন পাঁচটি শব্দে ব্যবহৃত উপসর্গ উল্লেখ করিয়া ঐ পাঁচটি শব্দের অর্থ লিখ:

পরমিল, অনড়, আজানু, আতপ্ত, বেরসিক, উপনদী, প্রত্যাহার।

[সংকেত: মিলের অভাব, নিশ্চল, জানু পর্যন্ত, অত্যন্ত গরম, রসজ্ঞানহীন, যে নদী অন্য নদীতে গিয়া পতিত হয়, সংবরণ, ফিরাইয়া লওয়া।]

১৪. অনুসর্গ কাহাকে বলে? উপসর্গের সঙ্গে ইহার পার্থক্য কি? দৃষ্টান্তসহ আলোচনা কর।

৭. শব্দের বিশিষ্ট প্রয়োগ

বাংলায় বিভিন্ন শব্দকে বিভিন্ন অর্থে এবং বিভিন্ন রূপে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। এক-একটি শব্দের এক-একটি অর্থ থাকে। কিন্তু অনেক সময় সেই সকল অর্থে শব্দকে ব্যবহার না করিয়া বিভিন্ন বিশেষ বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। তাহাকেই বলা হয় **শব্দের বিশিষ্ট প্রয়োগ**। এখানে বিভিন্ন প্রকার শব্দের বিভিন্ন অর্থে বিশিষ্ট প্রয়োগের উদাহরণ প্রদত্ত হইল:

● বিশেষ্য পদের বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ

● **অঙ্ক>অঙ্কে কাঁচা** [গণিতে কাঁচা]: ছেলেটি অঙ্কে কাঁচা। **মাতৃ-অঙ্ক** [মায়ের কোল]: 'তব অঙ্ক শঙ্কাশূন্য বৈকুণ্ঠ-সমান।' **পঞ্চাঙ্ক** [নাটকের পাঁচটি অংশ]: 'মেবার পতন' একখানি পঞ্চাঙ্ক নাটক। **অঙ্কপাত করা** [দাগ কাটা]: মাটিতে অঙ্কপাত করিয়া সন্ন্যাসী তাহার ভবিষ্যৎ গণনা করিলেন। **পদাঙ্ক** [পদচিহ্ন]: প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আমাদের চলিতে হইবে।

● **আলাপ>বাক্যালাপ** [কথাবার্তা]: তাহার সহিত আমার বাক্যালাপ বন্ধ। **আলাপ করা** [পরিচয় করা]: আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম। **সুরের আলাপ** [সুর ভাঁজা]: বড়ে গোলাম আলি প্রথমেই ভৈরব রাগে আলাপ শুরু করলেন।

● **উত্তর>উত্তর দেওয়া** [জবাব দেওয়া]: 'উত্তর দাও আদি পিতা ভগবান।' **উত্তর দিক** [দিক-বিশেষ]: শীতকালে উত্তর দিক হইতে হিমেল বাতাস বহিতে থাকে। **উত্তরপুরুষ** [বংশধর]: সেখানে এখন কবির উত্তরপুরুষেরা বাস করেন। **উত্তরকাল** [পরবর্তীকাল]: আজ যাহা সাহিত্যরূপে সৃষ্টি হইতেছে, উত্তরকালেই হইবে তাহার যথার্থ মূল্যায়ন। **অষ্টোত্তর** [আটের অধিক] **শত**: এ পূজায় যে অষ্টোত্তর শত বিল্বপত্রের প্রয়োজন। **লোকোত্তর** [অসাধারণ]: রবীন্দ্রনাথ ছিলেন লোকোত্তর প্রতিভার অধিকারী। **দেবোত্তর** [দেবত্র বা দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত]: ওটা আমার দেবোত্তর সম্পত্তি, উহাতে হাত দিও না।

● **কাগজ>লেখার কাগজ** [লেখার উপকরণ]: আমার লেখার কাগজ নেই। **কাগজ বাহির করা** [পত্রিকা প্রকাশ করা]: 'নন্দ একদা হঠাৎ একটা কাগজ করিল বাহির।' **কোম্পানীর কাগজ** [সরকার কর্তৃক গৃহীত ঋণের দলিল]: তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ কিনেছিলেন।

● **মুখ>মুখে আনা** [বলা]: এমন কথা আর কখনো মুখে এনো না। **মুখ খারাপ করা** [অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দেওয়া]: এখানে মুখ খারাপ করো না

কিন্তু ; ভালো হবে না তাহলে। **মুখ সামলানো** [সংযতভাবে কথা বলা] : মুখ সামলিয়ে কথা বলো। **মুখ খোলা** [কথা বলিতে শুরু করা] : আজ তিনি মুখ খোলেননি। **মুখ বন্ধ করা** [চুপ করা] : তুমি এখন মুখ বন্ধ করবে কিনা ? **মুখ চুন** [লজ্জায় মলিন] : সব শুনে বাবুরা সব মুখ চুন করে বসে রইলেন। **মুখ রাখা** [সম্মান বজায় রাখা] : ঠাকুর, খোকা যেন আমার মুখ রাখে। **মুখ তুলে চাওয়া** [প্রসন্ন হওয়া] : দেবতা যদি একবার মুখ তুলে চান, তাহলে আমার কোন অভাবই আর থাকবে না। **মুখ করা** [গালি দেওয়া] : লোকটা তোমাকে মুখ করে চলে গেল, আর তুমি কিছু বললে না ? **মুখ নাড়া দেওয়া** [কটু ভর্ৎসনা করা] : তিনি তো দিনরাত আমাকে মুখ নাড়া দিচ্ছেন। **মুখে আগুন** [মৃত্যু কামনা করা] : যে এমন কথা বলে, তার মুখে আগুন। **মুখে ফুল-চন্দন পড়া** [আশীর্বাদ বা শুভ কামনা করা] : তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। **মুখ দেখানো** [সসম্মানে চলা] : কাজটা যদি না করতে পারি, তাহলে মুখ দেখানো যাবে না। **মুখের কথা** [অত্যন্ত সহজ] : বিলেত যাওয়া কি মুখের কথা ? **মুখ পোড়ানো** [সুনাম নষ্ট করা] : তুমি আমার মুখ পুড়িয়েছ, আর বেশী বকো না।

●**বুক>বুক ফাটা** [বেদনাতে অন্তর বিদীর্ণ হওয়া] : ওদের বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। **বুক দশহাত হওয়া, বুক ফুলিয়া ওঠা** [গর্বিত বা আনন্দিত হওয়া] : ছেলের কৃতিত্বে বাবার বুক দশহাত হয়ে গেল [ফুলে উঠলো]। **বুক দিয়ে পড়া** [সর্বশক্তি লইয়া উদ্যোগী হওয়া] : ভাইকে বাঁচাবার জন্যে তিনি বুক দিয়ে পড়লেন। **বুক ফোলানো** [গর্ব প্রকাশ করা] : ওকে নিয়ে এত কাণ্ড হয়ে গেল, তবু সে এখনও বুক ফুলিয়ে চলে। **বুক বাঁধা** [ধৈর্য ও সাহস অবলম্বন করা] : এত ঝড়-ঝাপটা সত্ত্বেও তিনি কি করে বুক বেঁধে রয়েছেন, তাই ভাবি। **বুক ভাঙা** [অত্যন্ত মনঃকষ্ট হওয়া] : একমাত্র ছেলে তার বুক ভেঙে দিয়ে চলে গেছে। **বুকের রক্ত দেওয়া** [প্রাণ দেওয়া] : স্বাধীনতার বেদীমূলে দেশের ক্ষুদিরামের দলই বুকের রক্ত দিয়েছে। **বুকে হাত দিয়ে বলা** [সাহস বা আন্তরিকতার সঙ্গে] : বুকে হাত দিয়ে বলো তো, তুমি ভয় পাওনি !

●**মাথা>মাথা পেতে নেওয়া** [শিরোধার্য করা] : তিনি যদি আমাকে কোন শাস্তি দিতেন, আমি তা মাথা পেতে নিতাম। **মাথা কেনা** [আজ্ঞা বহন করা] : আমি কেন তাঁকে হক কথা বলতে পারবো না ? তিনি কি আমার মাথা কিনেছেন ? **মাথা কাটা যাওয়া** [অপমান বোধ করা] : এত লোকের মাঝখানে সে এমন কাণ্ড করলো যে, লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেল। **মাথা খাওয়া** [দিব্যি দেওয়া] : 'মাথা খাও, ভুলিয়ো না, খেয়ো মনে করে।' **মাথা খাওয়া** [স্বভাব নষ্ট করে দেওয়া] : তুমিই তো আব্দার দিয়ে দিয়ে ছেলেটার মাথা খেয়েছো। **মাথায় তোলা** [অত্যন্ত প্রশ্রয় দেওয়া] : যেমন তাকে মাথায় তুলেছো, তেমনি এখন তার ফল ভোগ করো। **মাথা ব্যথা** [দুশ্চিন্তা] : পাড়ায় কার কি হলো, না হলো, তোমার

তাতে এত মাথাব্যথা কেন? **মাথা হেঁট হওয়া** [অপমান বোধ করা]: এমন কিছু করো না, যাতে লোকের কাছে আমার মাথা হেঁট হয়। **মাথা খাটানো** [বুদ্ধি খাটানো]: লোকটা মাথা খাটিয়ে কলটা বানিয়েছে বেশ, তাই না? **মাথা ঘামানো** [চিন্তা করা]: ওই সব বাজে কথায় মাথা ঘামিয়ে কোন লাভ আছে কি? **মাথা** [প্রধান]: তিনি গাঁয়ের মাথা, তাঁকে সব কথা বলতে হবে বৈ-কি? **মাথা** [বোধশক্তি]: দেখতে অমন হলে কি হবে, পড়াশুনায় ছেলেটার খুব মাথা আছে। **মাথা গরম করা** [চটিয়া যাওয়া]: অত সহজে আমি মাথা গরম করি না হে। **মাথা ঠাণ্ডা করা** [উত্তেজনা দূর করা]: মাথা ঠাণ্ডা করে একবার কথাটা ভেবে দেখো। **মাথায় হাত বুলানো** [ঠকানো]: সে তার মাথায় হাত বুলিয়ে তার অমন দামী ঘড়িটা হাতিয়ে নিয়েছে। **মাথায় হাত** [দুশ্চিন্তাগ্রস্ত]: বন্ধুর বুদ্ধিতে চলতে গিয়ে সর্বস্ব খুইয়ে এখন তাঁর মাথায় হাত। **মাথায় বাড়ি** [সর্বনাশ]: আমার মাথায় বাড়ি, আমি কি অমন কথা বলেছি? **মাথায় ওঠা, মাথায় চড়া** [প্রশ্রয় পাওয়া]: অতিরিক্ত আবদারে ছেলেটা মাথায় উঠেছে [মাথায় চড়েছে]। **মাথার উপর কেউ না থাকা** [অভিভাবক-হীন হওয়া]: ছেলেটার মাথার উপর কেউ নেই বলে তুমি ওকে যা খুশী তাই বলবে? **মাথায় কাঁঠাল ভাঙা** [প্রবঞ্চনা করিয়া আদায় করা]: ধনীরা চিরকাল গরীবদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে আরও ধনী হয়েছে। **মাথা ঠেকানো** [প্রণাম করা]: 'স্নেহের সে দানে বহু সম্মানে বারেক ঠেকানু মাথা।' **মাথা** [কিছু না]: গান শিখে কী হবে, মাথা? **মাথায় করে রাখা** [সযত্নে পালন করা]: লেখাপড়া কর মন দিয়ে, আমি তোমাকে মাথায় করে রাখবো। **মাথা তোলা, মাথা চাড়া দিয়ে উঠা** [নবচেতনায় জাগরিত হওয়া]: আজ এশিয়া-আফ্রিকার পরাধীন দেশগুলি একে একে মাথা তুলে উঠে দাঁড়াচ্ছে [মাথা চাড়া দিয়ে জেগে উঠছে]। **মাথা বিক্রি করা** [বশ্যতা স্বীকার করা]: আপনার আপিসে চাকরি করি বলে কি আপনার কাছে মাথা বিক্রি করেছি? **মাথার ঘাম পায়ে ফেলা** [কঠোর শ্রম করা]: মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যারা ফসল ফলায়, তারা ফসলের মালিক নয় কেন?

● **হাত > হাত করা** [বশে আনা]: বড়বাবুকে হাত করে সে দিব্যি ছুটির ব্যবস্থা করে নিয়েছে। **হাত কামড়ান** [আপসোস করা]: তখন চাকরিটা নিলাম না, এখন তাই হাত কামড়াচ্ছি। **হাত খালি** [রিক্তহস্ত]: এখন তাঁর একেবারে হাত খালি। তাঁর কাছে চেয়ে এখন কিছু পাবে না। **হাত খরচ** [খুচরা ব্যয়]: তাঁর এখন হাত খরচেরই টাকার অভাব। **হাত-খোলা** [দানশীল]: তাঁর মতো হাত-খোলা মানুষ এ অঞ্চলে একটিও নেই। **হাত গুটান** [নিরস্ত হওয়া]: টাকার দাম কমে যাওয়ায় অনেক ব্যবসায়ী এখন হাত গুটিয়ে বসে গেছে। **হাত গোনা, হাত দেখা** [ভাগ্য বিচার করা]: ঠাকুরমশাই হাত দেখেন। দেখে [হাত গুনে] বলেছেন, আমি পাস করবো। **হাতটান** [ছিঁচকে চুরির অভ্যাস]:

লোকটাকে একটু চোখে-চোখে রেখো, ওর একটু হাতটান আছে। **হাত তোলা** [প্রহার করা]: তুমি ওর গায়ে হাত তুলেছ কোন্ সাহসে? **হাত পাকান** [অভ্যাস দ্বারা পটু হওয়া]: ছোটবেলা থেকে লিখে লিখে সে পদ্য লেখায় বেশ হাত পাকিয়েছে। **হাত-পা বাঁধা** [নিরুপায়]: ও-ব্যাপারে আমার হাত-পা বাঁধা, কিছু করবার আমার উপায় নেই। **হাত-বদল** [অধিকার পরিবর্তন]: ওপর তলায় জমি হাত-বদল হয়ে গেছে, কৃষকেরা যে তিমিরে, সেই তিমিরে। **হাতে খড়ি** [প্রথম শিক্ষা]: ইস্কুলেই আমার কবিতা লেখার হাতে খড়ি। **হাতে ধরা** [সনির্বন্ধ অনুরোধ করা]: আমি তাঁকে আমার বাড়ি আসবার জন্যে হাতে ধরে বলেছি, তাতেও কি উনি আসবেন না? **হাতে নয় ভাতে মারা** [প্রহার না করিয়া অন্য উপায়ে দুর্বল করা]: ভারতীয়েরা ইংরেজদের হাতে নয় ভাতে মারিয়াছিল। **হাতে নাতে** [বমাল]: চোরটা হাতে-নাতে ধরা পড়েছে। **হাতে-পাওয়া** [আয়ত্তে পাওয়া]: তোমাকে যখন একবার হাতে পেয়েছি, তখন সহজে ছাড়ছি না। **কপালে হাত দেওয়া** [ভাগ্যের দোহাই দেওয়া]: সক্ষম থাকতে কিছু করোনি, এখন কপালে হাত দিলে হবে কি? **কাঁচা হাত** [অপটু হাত]: ছবিটা নিতান্তই কাঁচা হাতের আঁকা। **পাকা হাত** [পটু হস্ত]: দেখলেই বোঝা যায়, এটা পাকা হাতের কাজ। **হাতে-কলমে** [নিজে পরীক্ষা করিয়া]: হাতে-কলমে যা শেখা যায়, তা কেউ কখনো ভুলতে পারে না। **হাত পাতা** [ভিক্ষা করা]: খাদ্যের জন্য আজও আমাদের বিদেশীর কাছে হাত পাততে হয়। **হাতযশ** [দক্ষ বা পারদর্শী বলিয়া খ্যাতি]: মানসিক রোগের চিকিৎসায় আমাদের ডাক্তারবাবুর খুব হাতযশ।

●**গা>গা করা, গা দেওয়া** [মনোযোগ দেওয়া]: আপনি যদি একটু গা করেন [গা দেন] তা হলে কাজটা হয়। **গা-গতর** [সর্বাঙ্গ]: সারাদিন খেটে খেটে গা-গতর ব্যথা হয়ে গেছে। **গা জুড়ানো** [শান্তি পাওয়া বা শ্রান্তি দূর করা]: সে মরলে আমার গা জুড়োয়। এখানে বাতাসে বসে একটু গা জুড়োই। **গা জোরি, গা-জুরি** [জবরদস্তি]: গা-জোরি করলে তো চলবে না। আইনমতো চলতে হবে। **গা ঝাড়া দিয়ে ওঠা** [জড়তা ত্যাগ করিয়া কাজে লাগা]: এখনই গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াতে হবে আমাদের। **গা-জ্বালা করা** [বিরক্তির উদ্রেক হওয়া]: ওর রকম-সকম দেখে আমার গা-জ্বালা করে। **গা ঢাকা দেওয়া** [আত্মগোপন করা]: পুলিশ আসতেই চোরটা অন্ধকারে গা ঢাকা দিল। **গা ঢেলে দেওয়া** [শয়ন করা]: সারাদিনের ক্লান্তির পর বিছানায় এইমাত্র গা ঢেলে দিয়েছি; এখন আর উঠতে পারবো না। **গা তোলা** [ওঠা]: বেলা অনেক হয়েছে, এবার গা তোলো। **গা-সহা, গা-সওয়া** [অভ্যস্ত]: সব রকমের অপমানই এখন তার গা সওয়া হয়ে গেছে। **গায়ে-কাঁটা দেওয়া** [আতঙ্কে রোমাঞ্চ হওয়া]: 'কী ভয়ানক লড়াই হলো মা যে শুনে তোমার গায়ে দেবে কাঁটা।' **গায়ের জ্বালা** [ঈর্ষা]: সে ভাল চাকরি পেয়েছে, তাতে তোমার গায়ের জ্বালা কেন? **গায়ের ঝাল ঝাড়া, গায়ের ঝাল মেটান** [প্রচণ্ড ক্রোধ প্রকাশ করা]: ওকে একবার

সামনে পেলে প্রাণের আনন্দে গায়ের ঝাল ঝাড়বো [মেটাবো]। **গায়ে থুতু দেওয়া** [অত্যন্ত ঘৃণা প্রকাশ করা]: কারখানার লোহা-লক্কড়ের গায়ে থুতু দিয়ে সে গাঁয়ে ফিরে এলো। **গায়ে পড়িয়া** [অযাচিতভাবে]: তুমি আবার গায়ে পড়ে আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে এলে কেন? **গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ান** [পরিশ্রম-বিমুখ হইয়া চলা]: কতদিন এভাবে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াও, আমি দেখব। **গায়ে মাখা** [আমল দেওয়া]: ও ছেলেমানুষ—কিছু জানে না ; ওর কথা গায়ে মাখবেন না। **গায়ে মাস লাগা** [হৃষ্টপুষ্ট হওয়া]: দেওঘরে গিয়ে ওর গায়ে মাস লেগেছে, দেখ্‌ছি। **গায়ে হাত তোলা** [প্রহার করা]: কোন্‌ সাহসে তুমি ওর গায়ে হাত তুলেছ?

●**চোখ>চোখ ওঠা** [চক্ষুরোগবিশেষ হওয়া]: 'বোধ হয় রূপসীর চক্ষু উঠিয়াছে!' **চোখ খোলা, চোখ ফোটা** [প্রকৃত জ্ঞানলাভ করা]: সমস্ত দেখে-শুনে এতদিনে তার চোখ খুলেছে [চোখ ফুটেছে]। **চোখ পাকান, চোখ রাঙান** [রাগ দেখানো]: আপনি এভাবে আমাদের চোখ পাকাচ্ছেন [চোখ রাঙাচ্ছেন] কেন? **চোখ টেপা, চোখ ঠারা** [ইশারা করা]: তিনি চোখ টিপে [চোখ ঠেরে] আমাকে বসে পড়তে বললেন। **চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো** [স্পষ্ট প্রমাণসহ বোঝানো]: ব্যাপারটা তাঁকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে, নইলে তিনি বিশ্বাস করবেন না। **চোখে চোখে রাখা** [সতর্ক দৃষ্টি রাখা]: নতুন চাকরটাকে একটু চোখে চোখে রেখো। **চোখে মুখে কথা বলা** [বাচালতা করা]: ছেলেটা যেন চোখে মুখে কথা বলছে। **চোখের বালি** [চক্ষুঃশূল ব্যক্তি]: আমি যেন ওঁর চোখের বালি, আমাকে উনি একেবারেই সইতে পারেন না। **চোখে সরষে ফুল দেখা** [দিশাহারা হওয়া]: বাবা মারা যাবার পর বিমল চোখে সরষে ফুল দেখলো। **চোখের মাথা খাওয়া** [অন্ধবৎ আচরণ করা]: কিছুই দেখতে পাচ্ছো না ; চোখের মাথা খেয়েছো নাকি? **চোখ কপালে ওঠা** [অত্যন্ত আশ্চর্য হওয়া]: বাজারে জিনিসপত্রের দাম শুনে মদনবাবুর চোখ কপালে উঠলো। **চোখ টাটানো** [ঈর্ষা হওয়া]: তোমার উন্নতি দেখে আজ সবার চোখ টাটাচ্ছে। **চোখের চামড়া, চোখের পর্দা** [লজ্জা-সম্ভ্রম]: লোকটার চোখের চামড়া [পর্দা] বলতে কিছুই নেই, নইলে আমার এই বিপদের দিনে টাকা চাইতে আসে? **চোখে পড়া** [দ্রষ্টব্য হয়ে ওঠা]: চোখে পড়বার মতো চেহারা তার ছিল না।

●**কান>কান কাটা** [সম্পূর্ণ পরাস্ত করা : মেয়েটা সব বিষয়েই বেশী নম্বর পেয়ে ছেলেদের কান কেটেছে। **কান কাটা** [নির্লজ্জ]: রামুর মত কান কাটা লোক আমি একটাও দেখিনি ; কিছুতেই ওর লজ্জা নেই। **কান দেওয়া** [শোনা, গ্রাহ্য করা]: ওই বাচাল লোকটার কথায় তুমি কান দিচ্ছ কেন? **কান পাতলা** [অপরের কথায় সহজে আস্থা-স্থাপনকারী]: তিনি ভারী কান পাতলা লোক : যে যাই বলে, তাই তিনি সত্যি বলে বিশ্বাস করে বসেন। **কান**

পাতা [কোন কিছু শুনিতে প্রস্তুত হওয়া]: 'আমি কান পেতে রই আপন হৃদয়-গহন দ্বারে।' **কান ভাঙ্গান** [কাহারও বিরুদ্ধে কিছু বলিয়া মনোমালিন্য সৃষ্টি করা]: জানি, আমার বিরুদ্ধে নানাকথা বলে সে তোমার কান ভাঙ্গিয়ে দিয়েছে। **কান ভারী করা** [কাহারও বিরুদ্ধে অন্যের মন বিষাক্ত করিয়া দেওয়া]: তাঁর নিন্দা করে তুমি আমার কান ভারী করতে এসেছো? **কানে আঙুল দেওয়া** [অশ্রাব্য কিছু শুনিতে না চাওয়া]: সে যা বলেছে, শুনলে তুমি কানে আঙুল দেবে। **কানে ওঠা** [কর্ণগোচর হওয়া]: কথাটা যখন একবার কর্তার কানে উঠেছে, তখন তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। **কানে তালা লাগা** [ভয়ানক উচ্চ গোলমালের জন্য শুনিতে না পাওয়া]: পূজা-বাড়ীর হৈ-হট্টগোলে কানে তালা লাগার উপক্রম হয়েছে। **কানে তোলা** [শুনান, গ্রাহ্য করা]: পুরুষ মানুষের কানে কি বাড়ির সব কথা তুলতে আছে? সে আমার কথা কানেই তুললো না। **কানে যাওয়া** [শুনিতে পাওয়া], **কানের মাথা খাওয়া** [শুনিতে না পাওয়া]: এত ডাকছি, তবু তোমার কানে গেল না; বলি, কানের মাথা খেয়েছো নাকি!

● **গলা>গলা টিপলে দুধ বেরোয়** [নিতান্ত শিশু বা অজ্ঞ]: গলা টিপলে যার দুধ বেরোয়, সেই বাপ্পার মুখে কিনা এই কথা! **গলায় গলায়** [অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ]: চন্দন আর রঞ্জনের এখন গলায় গলায় ভাব। **গলাবাজি** [চেঁচামেচি, বক্তৃতা]: আমরা গান শুনতে এসেছি, কারও গলাবাজি শুনতে আসিনি। **গলায় পড়া** [গলগ্রহ হওয়া]: দিদি জামাইবাবু গত হলেন, আর শেষে ভাগনেটা আমার গলায় এসে পড়লো। **গলায় দড়ি** [ধিক্কারসূচক উক্তি]: তোমার মুখে আমাকে এই কথা শুনতে হলো? আমার গলায় দড়ি!

● **নাক>নাক উঁচান, নাক বাঁকান, নাক সিট্‌কান** [ঘৃণা প্রকাশ করা]: আমাদের কাজ দেখে সে নাক উচিয়ে [নাক বেঁকিয়ে বা নাক সিট্‌কিয়ে], চলে গেল। **নাক মলা, নাকে খত দেওয়া** [স্বকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করা]: এই আমি নাক মলছি [নাকে খত দিচ্ছি], আর যদি ওদের হয়ে কোন কথা বলি। **নাক গলান** [অনধিকার-চর্চা করা]: তুমি বিজ্ঞানের লোক; সাহিত্যের ব্যাপারে নাক গলাতে এসেছ কেন? **নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরান** [অত্যন্ত বশীভূত করে ফেলা]: কটা টাকা ধার দেবে বলে সে ওকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে। **নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা** [নিজের সমূহ ক্ষতি করে পরের অসুবিধা সৃষ্টি করা]: পাড়ার ছেলেরা খেলতো বলে অমন সোনার মতো জমি লোকটা জলের দামে বিক্রি করে দিলে। নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা আর কাকে বলে?

● **মন>মন ওঠা** [আশা মেটা]: অত পেয়েও ছেলেটার কিছুতেই মন ওঠে না। **মন করা** [সংকল্প করা]: 'করিলাম মন শ্রীবৃন্দাবন বারেক আসিব ফিরি।' **মন কষাকষি** [পরস্পর মনোমালিন্য]: এখন দুই শরিকের খুব মন কষাকষি চলেছে। **মন কেমন করা** [অস্থির বা ব্যাকুল হওয়া]: সকাল থেকে

মায়ের জন্য মন কেমন করছে। **মন খারাপ হওয়া** [বিষাদগ্রস্ত হওয়া]: তার কথা শুনে কাল থেকে আমার মন খারাপ হয়ে গেছে। **মন খোলা** [সরল]: এমন মন-খোলা লোক আজকালকার দিনে সত্যিই বিরল। **খোলা মন** [সংস্কারহীন মন]: খোলা মন নিয়ে বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত। **মন খোলা** [মনের কথা খুলে বলা]: তোমাকে আমার সব কথাই মন খুলে বললাম, এখন যা করার করো। **মন গলা** [করুণাপরবশ হওয়া]: তাঁকে সমস্তই বললাম, তবুও তাঁর মন গললো না। **মন জোগান** [মনের মতো কাজ করিয়া প্রসন্ন করা]: নতুন বউ এখন শাশুড়ির মন জুগিয়ে চলবে, এইটেই আশা করেছিলাম। **মন-মরা** [বিষণ্ণ]: সারাদিন তুমি এমন মন-মরা হয়ে থাকো কেন? **মনে করা** [কল্পনা করা]: 'মনে করো, যেন বিদেশ ঘুরে মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে।' **মনে দাগকাটা** [স্থায়ী স্মৃতি থাকা]: তাঁর কথা আমাদের মনে দাগ কেটেছে। **মনে ধরা** [পছন্দ হওয়া]: ছেলেটিকে বাবা-মার খুব মনে ধরেছে। **মনে পড়া** [স্মরণ হওয়া]: আজ মনে পড়ছে, ১৩৪৮ সালের বাইশে শ্রাবণের কথা। **মনের আগুন** [শোকদুঃখাদিজনিত মানসিক যন্ত্রণা]: মনের আগুন কি চোখের জলে নেভে? **মনের কালি** [মনোমালিন্য]: ভালোবাসাতেই মানুষের মনের কালি দূর হবে। **মনের জোর** [আত্মবিশ্বাস]: শুধু মনের জোরেই এতখানি পথ একদিনে হেঁটে আসতে পেরেছি। **মনের ঝাল ঝাড়া, মনের ঝাল মিটান** [অন্তরের ক্রোধ প্রকাশ করা]: অনেক দিন পরে আমাকে কাছে পেয়ে উনি মনের ঝাল ঝাড়লেন [মিটালেন]। **মনের মতো** [পছন্দসই]: শুধু এই লাইব্রেরীতেই আমি আমার মনের মতো বই পাই। **মনের মানুষ** [পছন্দসই ব্যক্তি]: 'আমি কোথায় পাবো তারে আমার মনের মানুষ যে রে?' **মনের মিল** [সদ্ভাব]: ওদের ভাইদের মধ্যে আশ্চর্য মনের মিল দেখ্‌ছি।

● **কথা>কথা কাটাকাটি** [তর্ক-বিতর্ক]: মিছামিছি কথা কাটাকাটি করে কি লাভ? **কথা দেওয়া** [প্রতিশ্রুতি দেওয়া]: কথা দিলাম, সামনের শনিবারে ওখানে যাবো। **কথা চালা, কথা পাড়া** [প্রস্তাব করা]: তখন অবস্থা বুঝে আমি কথাটি চাললাম [পাড়লাম]। **কথাবার্তা** [আলাপ-আলোচনা]: ওর সঙ্গে সেদিন ও বিষয়ে কোন কথাবার্তাই হয়নি। **কথা রাখা** [প্রতিজ্ঞা পালন করা]: জীবন দিয়েও আমি আমার কথা রাখবো। **কথা শোনা** [কথা মান্য করা]: ছেলেরা আজকাল আর আমার কথা শোনে না। **কথায় কথায়** [প্রসঙ্গক্রমে]: কথায় কথায় সেদিন ওরা ঝগড়া বাধিয়ে বসলো। **কথার কথা** [মূল্যহীন কথা]: ওটা বলেছি কথার কথা, ওটাকে অত গুরুত্ব দিচ্ছেন কেন? **ছোট মুখে বড় কথা** [সামান্য ব্যক্তির বৃহৎ ব্যাপারে মন্তব্য করা]: আর যাই হোক, ছোট মুখে বড় কথা মানায় না। **কথার মতো কথা, লাখ কথার এককথা** [উচিত কথা]: সেদিন সে যা বলেছে কথার মতো কথা [লাখ কথার এক কথা]।

● বিশেষণ পদের বিশিষ্ট অর্থে প্রয়োগ

● **বড়>বড় কথা** [প্রধান কথা, স্পর্ধিত উক্তি]: খুব বড় কথা বলেছো তুমি। ছোট মুখে বড় কথা ভালো শোনায় না। **বড় কুটুম** [সম্বন্ধী]: ওকে চিনতে পারলে না? তোমার বড় কুটুম গো। **বড় গলা** [উঁচু গলা]: সেদিন সে নিজের ছেলের কথা খুব যে বড় গলায় বলে এসেছিল, আজ কি হলো? ওর ছেলে যে একটি চোর, তা যে সবাই জেনে ফেলেছে। **বড় জোর** [খুব বেশী হয়তো]: কতোই বা ওর বয়স হবে?—বড় জোর কুড়ি। **বড় বাড়ি** [বড় শরিকের বাড়ি]: বড় বাড়িতে আজ সকলের নেমন্তন্ন। **বড়লোক** [ধনী ব্যক্তি]: বড়লোকেরা গরীবদের কথা একেবারেই ভাবে না। **বড় মানুষী, বড় মানুষি** [ধনী লোকের অভিনয়]: আমরা গরীব বলে বড় মানুষি করতে এসো না, মেজবউ। **বড় হওয়া** [খ্যাতিমান হওয়া]: দেখো, তোমার ছেলে কত বড় হবে। **বড় মানুষ** [মহাপুরুষ]: বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কত বড় মানুষ ছিলেন, তাহা বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। **বড় মুখ করে আসা** [প্রত্যাশা নিয়ে আসা]: সে তোমার কাছে সেদিন কত বড় মুখ করে এসেছিল, আর তুমি কিনা তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলে? **বড়বাবু** [প্রধান বাবু]: 'হেড-আপিসের বড়বাবু লোকটি বড় শান্ত।'

● **ছোট>ছোট নজর** [ঘৃণা]: তোমার যে এত ছোট নজর হবে, তা আমি আগে ভাবতে পারিনি। **ছোট কাজ** [হেয়]: ছোট কাজ করে বলে মানুষটাকে ছোট ভেবো না। **ছোট জাত** [অবনত সম্প্রদায়]: সমাজের ছোট কাজগুলো করে বলেই কি হাড়ি-মুচি-ডোম—এরা ছোট জাত? **ছোট আদালত** [ক্ষমতায় নিম্নতর]: ছোট আদালতে জিতেছো তো কি হয়েছে? আমি আবার আপীল করবো। **ছোট হয়ে যাওয়া** [সম্মান নষ্ট হওয়া]: তুমি কথাটা বলাতে আমি ওর কাছে ছোট হয়ে গেলাম। **ছোট হওয়া** [নম্র]: 'বড় যদি হতে চাও ছোট হও তবে।' **মুখ ছোট হয়ে যাওয়া** [সংকুচিত হওয়া]: দেখলে না, আমাকে দেখে ওর মুখ কেমন ছোট হয়ে গেল। **ছোট করা** [মর্যাদায় হানি করা]: তুমি ওভাবে আমাকে ওর কাছে ছোট করলে কেন? **ছোট লোক** [অভদ্র]: 'ছি! ছি! আমাকে ও এত ছোট লোক মনে করে!'

● **কাঁচা>কাঁচা পথ** [মাটির তৈয়ারী]: দশ মাইল কাঁচা পথ গোরুর গাড়িতে করে যেতে হবে। **কাঁচা বয়স** [তরুণ]: তোমাদের কাঁচা বয়স, তোমরা এখন রাতকে দিন করতে পারো। **কাঁচা বুদ্ধি** [অপরিণত]: তোমার যে এমন কাঁচা বুদ্ধি হবে, তা কি আমি আগে জানতাম? **কাঁচা লেখা** [অপটু]: এটা বড় কাঁচা লেখা, পত্রিকায় ছাপা যাবে না। **কাঁচা কাজ** [অদক্ষভাবে কৃত]: সব জেনেও তুমি এমন কাঁচা কাজ করলে কেন? **অঙ্কে কাঁচা** [অদক্ষ]: রমেন অঙ্কে বড় কাঁচা। **কাঁচা কথা** [অনির্ভরযোগ্য প্রতিশ্রুতি]: জানো রাখতে পারবে না, তবু এমন কাঁচা

কথা তাকে দিয়ে এলে কেন ? **কাঁচা খাতা** [খসড়া] : হিসাব কাঁচা খাতায় তুলেছো, অথচ পাকা খাতায় তোলোনি। **কাঁচা রং** [অস্থায়ী] : এ তো কাঁচা রং, জলে ধুলেই উঠে যাবে। **কাঁচা সোনা** [বিশুদ্ধ] : ওটা কাঁচা সোনার গয়না। **কাঁচা পয়সা** [সহজলভ্য] : তার হাতে এখন কাঁচা পয়সা আসছে কিনা, তাই সে ধরাকে সরাজ্ঞান করছে। **কাঁচা ঘুম** [অপূর্ণ] : কাঁচা ঘুম থেকে উঠে ছেলেটা খালি কাঁদছে। **কাঁচা মাল** [স্বাভাবিক উৎপন্ন দ্রব্য] : কাঁচা মালের অভাবে কারখানাটি বন্ধ হয়ে যাবার মুখোমুখি। **কাঁচা হাত** [অপটু হাত] : ছবিটা কাঁচা হাতের আঁকা।

● **পাকা>পাকা চোর** [অভিজ্ঞ চোর] : 'বাবু কন্ হেসে, বেটা সাধুবেশে পাকা চোর অতিশয়।' **পাকা ছেলে** [ধাড়ী] : হারু বড় পাকা ছেলে। **পাকা কাজ** [নিপুণভাবে কৃত] : তোমার কাছ থেকে এই রকম পাকা কাজই আশা করেছিলাম। **পাকা লেখা** [নির্দিষ্ট ধরন-প্রাপ্ত] : এ রকম পাকা লেখা তোমার ছাড়া আর কার হবে ? **পাকা খাতা** [চূড়ান্ত হিসাবের খাতা] : হিসেবটা পাকা খাতায় তুলেছো তো ? **পাকা রং** [স্থায়ী] : কাপড়টার রং পাকা, কাচলে উঠবে না। **পাকা পাঁচ সের** [পাকা ওজন] : গাইটা দুধ দিত পাকা পাঁচ সের। **পাকা বাড়ি** [দগ্ধ ইটের তৈয়ারী] : ঝড়ের দিন সবাই রায়বাবুদের পাকা বাড়িতে গিয়ে উঠেছিল। **পাকা কথা** [অপরিবর্তনীয়] : আমি তোমাকে পাকা কথাই দিলুম, ওর কোন নড়চড় হবে না। **পাকা দলিল** [আইনানুসারে সম্পাদিত] : বাকি টাকাটা দিয়ে আমি পাকা দলিল করিয়ে নেব। **পাকা সোনা** [খাঁটি] : দেখছো কি, সমস্ত গয়নাই পাকা সোনার। **পাকা হাড়** [শ্রমে অভ্যস্ত] : পাকা হাড়, তাই এত ঝড়-ঝাপটায় ভাঙেনি। **পাকা ফলার** [লুচি-মিঠাইসহ] : রায়বাড়িতে সেদিন হয়েছিল পাকা ফলারের আয়োজন। **পাকা দেখা** [বর বা কনেকে আশীর্বাদ] : সেদিন ছিল রায়বাবুর মেয়ের পাকা দেখা। **পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়া যাওয়া** [সম্পন্ন-প্রায় কাজ পণ্ড] : আর দুটো দিন হলেই কাজ হাসিল হয়ে যেত। কিন্তু তার আগেই বুড়োর ছেলে এসে গেল ; আর পাকা ঘুঁটি একেবারে কেঁচে গেল। **পাকা ধানে মই** [সুসম্পন্ন কাজ পণ্ড] : তুমি আমাকে দেখতেই পারো না কেন ? আমি কি তোমার পাকা ধানে মই দিয়েছি ? **পাকা মাথা** [প্রবীণ ব্যক্তি] : কোন কাজ করবার আগে পাকা মাথার বুদ্ধি নিও। **পাকা হাত** [নিপুণ] : স্পষ্টই বোঝা যায়, এটা পাকা হাতের কাজ। **পাকা মাথায় সিঁদুর পরা** [প্রবীণ বয়স পর্যন্ত সধবা থাকা] : আশীর্বাদ করি, পাকা মাথায় সিঁদুর পরো।

● **খোলা>খোলা মাঠ** [উন্মুক্ত মাঠ], **দিল্ খোলা** [উদার হৃদয়] : 'খোলা মাঠের উপদেশে দিল্-খোলা হই তাই রে।' **খোলা মন** [সংস্কারহীন মন] : খোলা মন নিয়ে চিন্তা করুন, দেখবেন এগুলি অর্থহীন। **মুখ-খোলা** [অকপট] : এমন মুখ-খোলা লোক আমি আর দেখিনি। **খোলা হাওয়া** [মুক্ত বাতাস] : ভোরের খোলা হাওয়ায় একটু বেড়িয়ে এসো।

● **বাসি>কাপড় বাসি করা** [ধৌত করা] : ধোপাকে কাপড়টা বাসি করে

আনতে বলেছো তো ? **বাসি ভাত** [পূর্ব দিনে প্রস্তুত] : 'বাসি ভাত খাও, বাছা, ঐ ঢাকা রয়েছে।' **বাসি খবর** [অতি পুরাতন] : মহাশূন্য থেকে মানুষ ঘুরে এলেছে, ওটা তো বাসি খবর। **বাসি কাপড়** [পূর্ব রাত্রে পরিহিত বস্ত্র] : বাসি কাপড়ে পূজার ফুল তুলো না। **বাসি ঘর** [দিনের মধ্যে যে ঘর সাফ করা হয় নাই] : ঝাঁট পড়েনি, বাসি ঘর এখনও পড়ে আছে। **বাসি জল** [পূর্ব দিনে তোলা জল] : এক গেলাস বাসি জল খেয়ে নাও, দেখি। **বাসি দুধ** [পূর্ব দিনে যে দুধ দোহন করা হইয়াছে] : বাসি দুধ কখনও খাবে না। **বাসি ফুল** [পূর্ব দিনের তোলা ফুল] : বাসি ফুলে কোন পূজো হয় না। **বাসি বিয়ে** [হিন্দু-বিবাহের পরদিন আচরণীয় অনুষ্ঠান] : পাড়ার মেয়েরা দল বেঁধে বাসি বিয়ে দেখতে এলো। **বাসি মড়া** [যে শব গতরাত্রির মধ্যে দাহ করা হয় নাই] : বড় ছেলে ছিল দিল্লীতে ; তাই সরকার মশাইয়ের মৃতদেহ বাসি মড়া হয়ে গেল। **বাসি মুখ** [প্রভাতে নিদ্রা-ভঙ্গের পর যে মুখ প্রক্ষালিত হয় নাই] : তুমি বাসি মুখে চা খাও ?

● **সাদা>সাদা মন** [সংস্কারহীন মন] : সাদা মন নিয়ে ব্যাপারটা চিন্তা করে দেখুন। **সাদা কথা** [সহজ কথা] : সাদা কথায় বলে, মরা হাতি লাখ টাকা। **সাদা হাত** [নিরাভরণ হাত] : মেয়েটার সাদা হাতের দিকে তাকান যায় না। **সাদাসিধে** [বিলাস-বর্জিত] : লোকটি অত্যন্ত সাদাসিধে। **সাদা-মাঠা** [কারুকার্যহীন] : উনি পত্রিকার জন্যে একটা সাদা-মাঠা গল্প লিখেছেন।

● ক্রিয়াপদের বিশিষ্ট অর্থে প্রয়োগ

● **কাটা>কথা কাটাকাটি** [তর্ক-বিতর্ক করা] : মিছিমিছি কথা কাটাকাটি করে তো কোন লাভ নেই। **ফোড়ন কাটা** [বিদ্রূপ করা] : ওরা ফোড়ন কাটতেই তো ওস্তাদ, কাজটা করুক দেখি। **ভুল কাটা** [দাগ দিয়া বাতিল করা] : মাস্টার মশাই কত আর ভুল কাটবেন ? **পুকুর কাটা** [খনন করা] : রামবাবুরা তেলিপাড়ার মাঠে একটা পুকুর কাটবেন। **আঁক কাটা** [অঙ্কন করা] : বইয়ের পাতায় আঁক কেটেছে কে ? **ছড়াকাটা** [সুর করে বলা] : পদ্মবুড়ির মত ছড়া কাটতে কেউ পারে না। **তিলক কাটা** [দেহের নানা স্থানে চন্দনের ছাপ আঁকা] : সারা গায়ে তিলক কাটলে হবে কি ? লোকটা আসলে ভণ্ড। **চেক কাটা** [লিখিয়া দেওয়া] : বলামাত্রই তিনি এক হাজার টাকার একখানা চেক কেটে দিলেন। **পথ কাটা** [তৈয়ারী করা] : 'চলার বেগে পথ কেটে চল, করিসনে আর দেরি।' **খাল কাটা** [খনন করা] : তখনই বলেছিলাম, খাল কেটে কুমীর এনো না। **ছানা কাটা** [তৈয়ারী করা] : বাড়িতে ছানা কাটিয়ে সন্দেশ বানাতে তো আর বাধা নেই। **টেরি কাট** [চুল বিন্যাস করা] : সারাদিন ছেলেটার টেরি কাটা ছাড়া আর কোন কাজই নেই। **টেঁক কাটা, গাঁট কাটা** [চুরির উদ্দেশ্যে কাটা] : টেঁক-কাটা টেঁক কাটে, গাঁট-কাটা গাঁট কাটে। **তাল কাটা** [সমতাচ্যুত হওয়া] : তাল কেটে যাচ্ছে, গা-টা আবার ধরো। **মেঘ কাটা** [আকাশ পরিষ্কার হওয়া] : আকাশের

মেঘ কেটে যাচ্ছে। **নেশা কাটা** [নেশা তিরোহিত হওয়া] : নেশা কাটলে দেখলো, সে রাস্তার ধারে পড়ে আছে। **ভয় কাটা** [সাহস হওয়া] : তোমাকে দেখে আমার ভয় কাটলো। **মাল কাটা** [বিক্রী হওয়া] : বাজার বড় মন্দা, মাল কাটছে না তেমন। **সাঁতার কাটা** [সাঁতার দেওয়া] : সে রোজ সাঁতার কাটে।

● **ওঠা>ওঠা** [জাগরিত হওয়া] : 'উঠগো ভারতলক্ষ্মী, উঠ জগতজনপূজ্যা।' **দাঁত ওঠা** [গজান] : শিশুটির দাঁত উঠিয়াছে। **কানে ওঠা** [শুনিতে পাওয়া] : একবার যখন কথাটা তাঁর কানে উঠেছে, তখন নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। **কথা ওঠা** [প্রসঙ্গে আসা] : সেদিন মিটিংএ সবার মাইনে বাড়াবার কথা উঠেছিল। **বাজারে ওঠা** [আমদানি হওয়া] : বাজারে এখন কাঁঠাল উঠেছে। **ফসল ওঠা** [কাটা শেষ হয়ে যাওয়া] : মাঠের ধান উঠে গেছে, এখন তো কলাই বুনতে পার। **রং ওঠা** [মুছিয়া যাওয়া] : কাপড়টার রং উঠে গেছে। **জাতে ওঠা** [পতিত অবস্থা হইতে মুক্তি লাভ] : সে এখন জাতে উঠেছে। **অন্ন ওঠা** [জীবিকা রহিত হওয়া] : তুমি এখান থেকে আমার অন্ন উঠিয়ে তবে ছাড়লে, দেখছি। **মন ওঠা** [সন্তোষ জন্মান] : কোন জিনিসেই তোমার মন ওঠে না। **চোখ ওঠা** [চক্ষুরোগ-বিশেষ হওয়া] : 'বোধ হয় রূপসীর চক্ষু উঠিয়াছে।' **দোকান উঠে যাওয়া** [কারবার স্থগিত হওয়া] : চুনীবাবুর দোকান উঠে গেছে। **প্রথা উঠে যাওয়া** [রহিত হওয়া] : পণপ্রথা এখন প্রায় উঠে গেছে। **ভাড়াটে উঠে যাওয়া** [বাড়ি বদল করা] : তাঁরা এখন এখান থেকে বালিগঞ্জে উঠে গেছেন।

● **তোলা>প্রসঙ্গ তোলা** [উত্থাপন করা] : এখন ও প্রসঙ্গ তুলছো কেন? **ঘুম থেকে তোলা** [জাগান] : ওকে ঘুম থেকে তোলে কার সাধ্য? **জাতে তোলা** [উন্নত করা] : প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে তাকে জাতে তোলা হলো। **বাড়ি তোলা** [নির্মাণ করা] : বস্তির পাশে সে এখন পাঁচতলা বাড়ি তুলেছে। **বাড়ি থেকে ভাড়াটে তোলা** [উচ্ছেদ করা] : বাড়ি থেকে ভাড়াটে তোলবার জন্যে তিনি কি কম চেষ্টা করেছেন? **দুধ তোলা** [বমন করা] : ছেলেটা কাল থেকে দুধ তুলছে। **হাই তোলা** [ত্যাগ করা] : 'ডান পা তুলিয়ে তোলে হাই।' **মাথা তোলা** [অবস্থার উন্নতি করা] : আজ দেখি, পরাধীন জাতিগুলি একে একে মাথা তুলছে। **হাত তোলা** [প্রহার করা] : তুমি ওর গায়ে হাত তুলো না। **পিঠের চামড়া তোলা** [বেদম প্রহার করা] : সে বলছে, ওখানে গেলে এবার সে তার পিঠের চামড়া তুলে নেবে। **কথা তোলা** [প্রসঙ্গে আসা] : ও কথা এখন আর তুলে কি হবে? **প্রথা তুলিয়া দেওয়া** [রহিত করা] : জমিদারী প্রথা এখন তুলে দেওয়া হয়েছে। **পটোল তোলা** [মারা যাওয়া] : কৃপণ বুড়োটা কাল রাত্তে পটোল তুলেছে। **মাথায় তোলা** [প্রশ্রয় দেওয়া] : তখন বলেছিলাম, ছেলেটাকে অত মাথায় তুলো না। **সিকেয় তোলা** [স্থগিত রাখা] : এখন তোমার প্রস্তাবটা সিকেয় তোলা থাক। **লাইন তোলা** [উদ্ধৃত করা] : সে লাইন তুলে দেখিয়েছে, রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনার সঙ্গে তার রচনার কতো মিল।

● **ধরা>বেশ ধরা** [পরিধান করা]: তুমি আবার সাধুর বেশ ধরলে কবে থেকে? **চোর ধরা** [গ্রেপ্তার করা]: পুলিশ চোরটাকে ধরতে পারেনি। **গোঁ ধরা** [জিদ ধরা]: ছেলে গোঁ ধরেছে, পাস করে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে। **কাউকে ধরা** [কোন কাজের জন্ত মুরুব্বি ধরা]: রায় মশাইকে ধরো, তাহলে দেখো, কাজটা ঠিক হয়ে যাবে। **রোগে ধরা** [আক্রমণ করা]: 'বিন্নুর বয়স বাইশ যখন রোগে ধরলো তারে।' **দোর ধরা** [হত্যা দেওয়া]: তারকেশ্বরের দোর ধরে তাকে পেয়েছিলাম কোলে। **ঠাণ্ডায় গলা ধরা** [শব্দহীন হওয়া]: ঠাণ্ডায় তার গলা ধরে গেছে। **লোনা ধরা** [ছাপ লাগা]: ঘরের দেওয়ালে লোনা ধরতে শুরু করেছে। **মাথা ধরা** [যন্ত্রণা হওয়া]: রোজ সকালে তার মাথা ধরে। **পা ধরে যাওয়া** [অবশ হয়ে আসা]: রেশনের 'কিউ'তে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ধরে গেছে। **ওষুধ ধরা** [কার্যকর হওয়া]: কাল ধমক দিয়েছিলাম, আজ দেখছি, ওষুধ ধরেছে। **বৃষ্টি ধরা** [বন্ধ হওয়া]: বৃষ্টি একটু ধরলেই আমরা বেরিয়ে পড়বো। **রূপ ধরা** [সাজে সজ্জিত হওয়া]: 'স্নেহময়ীর রূপ ধরে মা দাঁড়িয়ে আছে মাঠের 'পরে।' **খুঁত ধরা** [দোষ খুঁজিয়া বাহির করা]: তুমি শুধু দিনরাত আমার কাজের খুঁত ধরতেই আছো। **তরকারি ধরে যাওয়া** [পুড়িয়া উঠা]: আলুর দমটা একটু ধরে গেছে। **উনান ধরা** [জ্বলিয়া উঠা]: এখনও উনুন ধরেনি, রান্না হবে কখন? **বুড়ী ধরা** [ছোঁয়া]: আমি আগে বুড়ী ধরেছি। **মন ধরা** [মনোমত হওয়া]: তোমার কথাটা তার খুব মনে ধরেছে। **ভূতে ধরা** [আচ্ছন্ন হওয়া]: তাকে ভূতে ধরেছে। **প্রাণ ধরা** [কোনমতে বাঁচিয়া থাকা]: বাছা, তোর জন্তেই আমি এতদিন প্রাণ ধরে আছি। **মানুষের মধ্যে ধরা** [গণ্য করা]: আমি তাকে মানুষের মধ্যে ধরি না। **ট্রেন ধরা** [যথাসময়ে আরোহণ করা]: তাড়াতাড়ি চলো, নইলে ট্রেন ধরতে পারবে না। **চুলে পাক ধরা** [প্রকাশ পাওয়া]: তাঁর চুলে পাক ধরেছে। **আফিম ধরা** [কু-অভ্যাস করা]: সে ইদানীং আফিম ধরেছে। **পোঁ ধরা** [একান্ত অনুগত হওয়া]: সে তো বড়বাবুর পোঁ ধরে আছে। **ম্যাও ধরা** [দায়িত্ব নেওয়া]: গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। কিন্তু একাজে ম্যাও ধরবে কে? **হাত-পায়ে ধরা** [অত্যন্ত দীনভাবে অনুরোধ করা]: তাঁকে হাতে-পায়ে ধরে বললুম, কিন্তু মনিবের দয়া হলো না। **ট্রেন স্টেশন ধরা** [থামা]: এই ট্রেনটা কোন্ কোন্ স্টেশন ধরে, বলতে পারেন? **গান ধরা** [আরম্ভ করা]: 'গান ধরেছেন গ্রীষ্মকালে ভীষ্মলোচন শর্মা।' **আগুন ধরা** [জ্বলিতে থাকা]: একটা বাড়িতে আগুন ধরলে সব কটা বাড়িতেই আগুন ধরে যাবে! **চাঁদ ধরা** [নাগাল পাওয়া]: বামন হয়ে চাঁদ ধরতে চেয়ো না।

● **লাগা>আগুন লাগা** [জ্বলিয়া ওঠা]: 'ওরে তুই ওঠ্, আজি আগুন লেগেছে কোথা!' **মনে লাগা** [ব্যথিত হওয়া]: কথাটা আমার মনে বড় লেগেছে। **চোট লাগা** [আঘাত পাওয়া]: তার হাতে চোট লেগেছে। **টাকা লাগা** [ব্যয়িত হওয়া]: 'লাগে লাখ টাকা দেবে গৌরী সেন।' **ভালো লাগা** [পছন্দ হওয়া]:

'এই তো ভালো লেগেছিল আলোর নাচন পাতায় পাতায়।' **সময় লাগা** [সময় ব্যয়িত হওয়া] : এখানে পৌঁছুতে কত সময় লাগবে ? **কাজে লাগা** [নিযুক্ত হওয়া] : মাসের পয়লা থেকেই সে কাজে লেগে গেছে। **উঠিয়া পড়িয়া লাগা, আদাজল খাইয়া লাগা** [উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করা] : যদি পাস করতে চাও, তবে এখন থেকেই উঠে পড়ে [আদাজল খেয়ে] লাগো। **যুদ্ধ লাগা** [আরম্ভ হওয়া] : আবার যদি যুদ্ধ লাগে, তবে কেউ বাঁচবে না। **বাতাস লাগা** [স্পর্শ করা] : 'গায়ে লাগুক হাওয়া।' **নৌকা লাগা** [ভিড়া] : তীরে এসে নৌকো লাগলো। **গ্রহণ লাগা** [ঘটা] : কাল গ্রহণ লাগছে কখন ? **পিছনে লাগা** [শত্রুতা করা] : তুমি আমার পিছনে লেগেছো কেন ?

● একই শব্দের বিভিন্ন পদরূপে প্রয়োগ

এই পর্যায়ে বিভিন্ন শব্দের বিভিন্ন পদরূপে প্রয়োগ প্রদর্শিত হইল। শব্দের এই রূপরূপায়ণের দ্বারা ভাষা সমৃদ্ধ হয়।

অগ্নি : [বি]—রুদ্র দেবতার নয়নে প্রলয়-অগ্নি জ্বলিতেছিল। [বিণ]—জিনিস কি আর কিনব ? সবই তো অগ্নিমূল্য !

পাপ : [বি]—পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়। [বিণ]—অমন পাপ কথা মুখেও এনো না।

অনাথ : [বি]—'অনাথ নাথ তিনি, দীনের গতি।' [বিণ]—'অনাথ শিশুরে কোলে নিবি, জননীরা আয় তোরা সব।'

সার : [বি]—সংসারে সার কিছুই নাই। [বিণ]—এই হলো সার কথা।

সভ্য : [বি]—সে আমাদের সমিতির একজন সক্রিয় সভ্য। [বিণ]—ইংরেজের সভ্য শাসনে ভারতে মানবতার চিতাশয্যা রচিত হইয়াছিল।

সুন্দর : [বি]—'সুন্দর, তুমি চক্ষু ভরিয়া এনেছ অশ্রুজল।' [বিণ]—'কত মানুষের সুখে দুখে গাঁথা সুন্দর ধরাতল।' 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।'

রক্ত : [বি]—'তুমি আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দিব।' [বিণ]—'নগ্ন শিমুলে কার ভাণ্ডার রক্ত দুকূল দিল উপহার ?'

ভাল : [বি]—ভাল ও মন্দ দুই-ই জগতে আছে এবং চিরকাল থাকবে। [বিণ] - 'ভালো মানুষ নইরে মোরা ভালো মানুষ নই।' [ক্রি-বিণ]—ভালোই বলেছ। [অব্যয়]—'কি যে বলছিলে ভাল। আরেক বার বল ত'।'

বড় : [বি]—'বড়র পীরিতি বালির বাঁধ।' [বিণ]—বড় বড় কথা ছাড়। ছোট মুখে বড় কথা। [ক্রি-বিণ]—ছেলেটি বড় বকে।

ঠাণ্ডা : [বি]—ঠাণ্ডা পড়ছে, বাইরে থেকো না। [বিণ]—ঠাণ্ডা ভাত কি শীতের সময় খাওয়া যায় ?

সমান : [বি]—সমানে সমানে লেগেছে ভাল। [বিণ]—তোমার থাকা না থাকা দুই-ই সমান। [ক্রি-বিণ]—কখন থেকে সমানে মুখে মুখে তর্ক করছ।

ঠিক : [বি]—তার কথার ঠিক নেই। [বিণ]—ঠিক যোগ দিয়ে দেখ ত' অঙ্কটা। [ক্রি-বিণ]—এ কি ঠিক হল ?

রুদ্র : [বি]—এ কি ভূমিকম্প, না রুদ্রের পদধ্বনি ! [বিণ]—'হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ !' 'হে রুদ্র-বীণা, বাজো, বাজো, বাজো।'

অন্ন : [বি]—'অন্ন লইয়া থাকি তাই মোর যাহা যায়, তাহা যায়।' [বিণ] —তাঁহার অল্প আয়, সেইজন্যই মাসে মাসে এত ঋণ।

অসম্ভব : [বি]—'মরি অসম্ভবের পায়ে মাথা কুটে।' [বিণ]—অসম্ভব ক্ষমতা না থাকলে এ কাজ করা যায় না। [ক্রি-বিণ]—ছেলেটি অসম্ভব চালাক।

উত্তর : [বি]—'উত্তর দাও, আদি-পিতা ভগবান।' 'পেল না উত্তর।' [বিণ]—উত্তরকালে তিনি যে খ্যাতনামা পুরুষ হবেন, তা আগেই বোঝা গিয়েছিল।

জোর : [বি]—গায়ের জোরে সব কাজ হয় না। [বিণ]—একটা জোর খবর বেরিয়েছে যুগান্তরে। [ক্রি-বিণ]—জোরে দৌড়াও, নয়ত ট্রেন ধরতে পারবে না। [অব্যয়]—ওঁর বয়স কত হবে ! জোর তিরিশ।

হয় : [বি]—তুমি যে হয়কে নয় করতে চাও। [ক্রি]—হয় কি না হয়, করে দেখ। [অব্যয়]—হয় এবার পরীক্ষা দাও ; না হয়, ছেড়ে দাও।

সত্য : [বি]—'সত্যের নাহি পরাজয়।' [বিণ]—'সত্যবাক্য শিশুতেই জানে।' [ক্রি-বিণ]—সত্যই আমি তাহাকে দেখি নাই।

কালো : [বি]—'কালো জগতের আলো।' 'কালোয় যেজন আলো বানায়, ভুলায় সবার মন, তারি পদরজের তরে লুটায় বৃন্দাবন।' 'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কান্দ কেনে ?' [বিণ]—'আমি তাই কালো রূপ ভালোবাসি।'

সাদা : [বি]—'সাদা রবে সবাকার টুঁটি টিপে, এ নহে তব বিধান।' [বিণ] —সাবধান, সাদা পোশাকে পুলিশ ঘুরছে।

নীল : [বি]—এককালে বাংলাদেশে নীলের চাষ হতো। [বিণ]—'শ্যামলে শ্যামল তুমি নীলিমায় নীল।' 'নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহিরে।'

মন্দ : [বি]—মন্দকে মন্দই বলতে হবে। [বিণ]—প্রস্তাবটি মন্দ নয়। [ক্রি-বিণ]—'যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে সব সংগীত গেছে ইংগিতে থামিয়া।'

● ভিন্নার্থক এক শব্দ ও সদৃশ শব্দ

শব্দই ভাষার সম্পদ। এক একটি শব্দ এক একটি অর্থের দ্যোতনা করে। কিন্তু এমন অনেক শব্দ আছে, যাহারা একাধিক অর্থ প্রকাশ করে। যেমন : 'অচল' শব্দটির একটি অর্থ—'পর্বত', অপর অর্থ—'বাতিল'। 'পর্বত' অর্থে শব্দটি বিশেষ্য, কিন্তু 'বাতিল' অর্থে বিশেষণ।

● ভিন্নার্থক এক শব্দ

অচল—ভারতের উত্তরে দেবতাত্মা 'হিমাচল' [পর্বত]। সমাজে ধর্মীয় গোঁড়ামি বর্তমানে 'অচল' [বাতিল]।

অঙ্ক—তিনি 'অঙ্ক'শাস্ত্রে [গণিত] পণ্ডিত। মাতৃ-'অঙ্ক'ই [ক্রোড়] শিশুর পরম আশ্রয়। নাটকটি পাঁচটি 'অঙ্কে' [অংশ] বিভক্ত।

অর্থ—'অর্থ'ই [টাকাকড়ি] অনর্থের মূল। তিনি কবিতাটির 'অর্থ' [তাৎপর্য] বুঝিতে পারিলেন না।

আশা—তার আসার 'আশায়' [অপেক্ষায়] বসে আছি। উষার আবির্ভাবে 'পূর্বাশা' [দিক] রক্তিম বর্ণ ধারণ করিল। 'আশা' [লাঠি]-বরকন্দাজ 'আশা'-হস্তে উপনীত হইল।

উত্তর—মেলেনি 'উত্তর' [জবাব]। শীতকালে 'উত্তর' [দিক বিশেষ] দিক হইতে শীতল বাতাস বয়। তিনি 'উত্তর'-[পরবর্তী] কালে মহাকবি হইয়াছিলেন।

কর্ম—এই কর্মময় পৃথিবীতে সকলকেই নিজ নিজ 'কর্ম' [কাজ] করিতে হয়। আমি আর কি করিব ? তোমার 'কর্ম'ই [ভাগ্য] মন্দ।

কাগজ—ইদানীং 'কাগজ' [লেখার উপকরণ] বড়ো দুর্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা সকলে মিলিয়া একটি 'কাগজ' [পত্রিকা] বাহির করিল।

কাল—জীবনপ্রবাহ বহি 'কাল' [মৃত্যু]-সিন্ধুপানে ধায় ফিরাব কেমনে ? 'কাল' [সময়] নিরবধি।

গজ—যুদ্ধে কত অশ্ব 'গজ' [হাতী], কত সৈন্য মারা পড়িল। স্তম্ভটির উচ্চতা বাইশ 'গজ' [পরিমাপ]।

গুণ-কোন 'গুণ' [উৎকর্ষ] নাহি তার কপালে আগুন। ওঝা 'গুণ' [জাদু] জানে। হাওয়া পড়িয়া গেলে তাহারা 'গুণ' [নৌকার দড়ি] টানিয়া অগ্রসর হইল। আনিল তোমার স্বামী বান্ধি নিজ 'গুণে' [ধনুকের ছিলা]। পঁচিশকে তিন দিয়ে 'গুণ' [পূরণ] কর। বয়সে ওর চেয়ে পাঁচ 'গুণ' [বার] সে বড়ো।

গুরু—'গুরু' [দীক্ষাদাতা, শিক্ষক] কাছে লব 'গুরু' [দুঃসহ] দুখ।

ঘন—'ঘন' [গাঢ়] 'ঘনা'কারে [মেঘ] ধূলা উঠিল আকাশে।

চরণ—'চরণে' [পা] পদ্ম, অতসী অপরাজিতায় ভূষিত দেহ। কবিতার-'চরণে' [পঙ্‌ক্তি] কাব্য-সরস্বতীর বিচরণ।

চরিত্র—বিচিত্র মানব-'চরিত্র' [স্বভাব]। সেই নাটকে মাত্র পাঁচটি 'চরিত্র' [পাত্র-পাত্রী]।

চাল—খড়ো 'চালে'র [কুঁড়েঘরের আচ্ছাদন] ছায়ায় বসে সে 'চালে' [চাউল] কাঁকর বাছছিল। খুব 'চাল' [মিথ্যা বড়াই] মারছে সে আজকাল।

ঝাল—তরকারিটা আজ বড়ো 'ঝাল' [লঙ্কার স্বাদ] হয়ে গেছে। ফুটো ঘটিতে একটু 'ঝাল' [ধাতু জুড়িবার পান] দিয়ে দিলে কাজ চলতে পারবে। বহুদিন পরে পাঁচুটাকে পেয়ে নায়েবমশাই খুব করে গায়ের 'ঝাল' [রাগ] মেটালেন।

নীল—আকাশ ঘন 'নীল' [রং]। 'নীল' [বিষ]-কণ্ঠ করেছেন পৃথ্বীরে নির্বিষ।

বিষয়—ব্যাকরণ 'বিষয়ে' [সম্বন্ধে] তাঁহার জ্ঞান গভীর। 'বিষয়' [সম্পত্তি]-বিষ-বিকার-জীর্ণ দীর্ণ অপরিতৃপ্ত।

বৃত্তি—শৃগালের 'বৃত্তি' [আচরণ] এবে তোমার আশ্রয়। কবীর 'বৃত্তি'তে [পেশা] ছিলেন জোলা। ছাত্রটি পরীক্ষায় প্রথম হয়ে 'বৃত্তি' [জলপানি] পেয়েছে।

বাস—দেবতার 'বাস' [বসতি] কি কেবল বৈকুণ্ঠে? রজনীগন্ধা 'বাস' [গন্ধ] বিলালো। তাহার বেশ-'বাস' [কাপড়] ছিল মলিন।

রাগ—তাহার অঙ্গ-'রাগ' [বর্ণ] ছিল ধূলিধূসরিত! 'রাগে' [ক্রোধে] তিনি কিছুক্ষণ মৌন হইয়া রহিলেন। আমি তাঁহার কণ্ঠে দেশ-'রাগে' [স্বর-বিন্যাসের একটি পদ্ধতি] আলাপ শুনিয়াছিলাম।

শারদা—শরতে 'শারদা'র [দুর্গা] পূজায় বাংলাদেশ মুখরিত। 'সারদা'র [সরস্বতী] পূজা হয় শ্রীপঞ্চমীতে। ['সারদা' শব্দটিরও একটি অর্থ দুর্গা, অন্য অর্থ সরস্বতী।]

●ভিন্নার্থক সদৃশ শব্দ

বাংলায় কিছু কিছু শব্দের উচ্চারণ একই রকম, অথচ বানানে পার্থক্য আছে। সে-সকল শব্দের বানানগত পার্থক্য ও অর্থের পার্থক্য সম্বন্ধে ভালোভাবে জ্ঞান না থাকিলে রচনায় সেগুলির প্রয়োগে নানা বিভ্রান্তি ঘটে, সেইরূপ কিছু শব্দের অর্থ ও প্রয়োগ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

অংশ—ভাগ। পিতার সম্পত্তির একটি অংশ তাহার আইনতঃ প্রাপ্য। অংস—কাঁধ। একটি পারাবত আসিয়া তাহার অংসোপরি উপবেশন করিল।

অজগর—বৃহৎ সর্প। বহু যুগের অজগর-নিদ্রা ভাঙিয়া আজ সমগ্র ভারত জাগিয়া উঠিয়াছে। অজাগর—নিদ্রিত। 'এ যে অজাগর-গরজে সাগর ফুলিছে।'

অন্ন—ভাত। শোকে-দুঃখে তিনি অন্নজল ত্যাগ করিলেন। অন্য—অপর। 'হে মৃত ভারত, সেই এক পথ আছে, নাহি অন্য পথ।'

অন্ত—শেষ। প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দয়ার অন্ত ছিল না। অন্ত্য—শূদ্রকুলজাত। ভারতীয় সমাজ শূদ্রদের দীর্ঘকাল অন্ত্যজ করিয়া রাখিয়াছিল।

অনু—পশ্চাৎ। 'তব অনুগামী দাস।' অণু—ক্ষুদ্রতম অংশ। 'সিন্ধুমূলে জলবিন্দু বিশ্বমূলে অণু, সমগ্রে প্রকাশ।'

অবদ্য—নিন্দনীয়। তাহার অপরাধ অবদ্য। অবধ্য—বধের অযোগ্য। আশ্রিত জন অবধ্য।

অর্ঘ—মূল্য। জিনিসপত্র এখন মহার্ঘ। অর্ঘ্য—পূজার উপকরণ। 'অতিথির তরে অর্ঘ্য সাজায়ে আনো।'

অবদান—শ্রেষ্ঠ দান। দুর্গেশনন্দিনী বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম অবদান। অবধান—মনোযোগ দিয়া শোনা। 'দুঃখ কর অবধান।'

অবিহিত—বিধি-বহির্ভূত। তোমাদের এই পূজা অবিহিত পূজা। অভিহিত—কথিত। দুর্গাপূজা শারদীয়া পূজা নামে অভিহিত।

অপগত—দূরীভূত। 'এসো অপরাজিত বাণী, অসত্য হানি, অপহত শঙ্কা, অপগত সংশয়।' **অবগত**—জ্ঞাত। তিনি সমস্ত অবগত হইয়াছেন।

অপচয়—ক্ষতি। জাতীয় সম্পদের অপচয় ভারত-ভাগ্য-বিধাতা ক্ষমা করিবেন না। **অবচয়**—চয়ন। 'পুষ্প অবচয় করেছি গোটা-কয় এখন বসে মালা গাঁথি।'

অশক্ত—অক্ষম। বার্ধক্যের ভারে তিনি গুরু দায়িত্ব বহনে আজ অশক্ত। **অসক্ত**—নির্লিপ্ত। সাংসারিক মায়ামোহবন্ধন হইতে তিনি বর্তমানে অসক্ত।

অশন—ভোজন। অনশনে অর্ধাশনে তাহার দিন কাটে। **অসন**—দূরীকরণ। সমস্ত দেখিয়া তাঁহার সকল সংশয়ের নিরসন [নিঃ+অসন] হইল।

অশিত—ভক্ষিত। ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্র কর্তৃক নিরীহ পথচারী অশিত হইল। **অসিত**—কালো। 'সিতাসিত দুই পক্ষ একই না জানি।'

অশ্ব—ঘোড়া। 'কৃষ্ণ অশ্বে বসিয়া রয়েছে, চিত্রে যেন সে আঁকা।' **অশ্ম**—প্রস্তর। মৃত্তিকার নিম্নে কোথাও কোথাও জীবাশ্ম পাওয়া যায়।

অশ্লীলতা—অশিষ্টতা। সামাজিক জীবনের সর্বত্র অশ্লীলতা পরিহার্য। **অসিলতা**—তলোয়ার। 'বাজে অসিলতা ঝন্‌ঝন্।'

আভাষ—আলাপ। তরুশাখায় বিহঙ্গেরা তখন মধুরাভাষে ব্যস্ত ছিল। **আভাস**—ঈষৎ প্রকাশ। দূর হইতে তাঁহার রথের আভাস সামান্য দেখা যাইতেছে।

অকিঞ্চন—দীন। 'কৃপা, প্রভু, কর অকিঞ্চনে।' **আকিঞ্চন**—আকাঙ্ক্ষা। 'সেই আকিঞ্চন লয়ে এসেছি হেথায়।'

আদি—প্রথম। রামায়ণ আদি-কবি বাল্মীকি-বিরচিত। **আধি**—মনঃপীড়া। 'ব্যাধির চেয়ে আধি হলো বড়ো।'

আপণ—দোকান। দুইদিকে আপণের সারি **আপন**—নিজ। 'আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ।'

আসার—প্রবল বর্ষণ। 'আবার এসেছি আমি শ্রাবণের জলধারাসারে।' **আষাঢ়**—বাংলা বৎসরের তৃতীয় মাস। 'আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে।'

আহুতি—হোম। মুনিবর ঘৃত আহুতি দিয়া যজ্ঞ করিতেছিলেন। **আহূতি**—আহ্বান। দেশমাতৃকার আহূতি তাঁহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল।

আভরণ—অলংকার। 'তনু দেহটি সাজাব তব আমার আভরণে।' **আবরণ**—আচ্ছাদন। 'এই আবরণ ক্ষয় হবে গো।'

ইতি—এই পর্যন্ত। 'পড়ল ঘুমের দফায় ইতি।' **ঈতি**—ছয় প্রকার শস্য-হানিকর উৎপাত। 'কিন্তু কোন ঈতি দেখা দেয় যদি তা হলে ত রক্ষা নাই।'

ইহা—এই। 'মোর শিষ্য বিনা ইহা অন্যে নাহি জানে।' **ঈহা**—ইচ্ছা। 'ঈষৎ ঈক্ষণে ঈহা পুরাও আমার।'

উদ্যত—প্রবৃত্ত। 'অরণ্য উদ্যতবাহু।' **উদ্ধত**—অবিনীত। 'তাইতো প্রাচীন সঞ্চিত ধনে উদ্ধত অবহেলা।'

উপাদান—উপকরণ। ইট, চুন, বালি প্রভৃতি উপাদানে বাসগৃহ নির্মিত হয়।

উপাধান—বালিশ। কোমল উপাধানে মাথা রাখিয়া তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন।

কুল—বংশ। 'জনম তব কোন্ মহাকুলে?' **কূল**—তীর। 'কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা।'

কৃত—সম্পাদিত। কৃত অপরাধ স্বীকার করিলে রক্ষা পাইবে। **ক্রীত**—কেনা হইয়াছে এমন। ক্রীত পণ্য বিক্রয় করিয়া বাড়ি চল।

কৃতদাস—সাময়িক দাসত্বে আবদ্ধ। ভাগ্যদোষে সে আজ কৃতদাস। **ক্রীতদাস**—কেনা গোলাম। আজিও পৃথিবীতে ক্রীতদাস-প্রথা বিলুপ্ত হয় নাই।

কৃতি—কাজ। লোকটার সুকৃতি বলিতে কিছু নাই। **কৃতী**—কৃতকার্য। রবীন্দ্রনাথ ভারতের একজন কৃতী সন্তান।

কটি—কোমর। 'ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পরো করবী।' **কোটি**—শতলক্ষ। 'কোটি-কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে নরকের প্রায়।'

কমল—পদ্ম। 'আলোর অমল কমলখানি কে ফোটালে?' **কোমল**—নরম। 'অর্কের কোমল পত্র করয়ে ভক্ষণ।'

কীর্তি—যশঃ। 'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ।' **কৃত্তি**—ব্যাঘ্রছাল। 'কৃত্তিবাস কীর্তিবাস কবি।'

গিরিশ—শিব। কৈলাস হইতে গিরিশ ত্রিশূল হস্তে বাহির হইলেন। **গিরীশ**—হিমালয়। ভারতের উত্তরে গিরীশ হিমালয়।

গোলক—গোলাকার বস্তু। সূর্য একটি প্রকাণ্ড জলন্ত অগ্নি-গোলক। **গোলোক**—বৈকুণ্ঠ। হরির গোলোকে বসতি।

চির—নিত্য। 'ওরা চিরকাল ধরে থাকে হাল।' **চীর**—ছিন্নবসন। 'জীর্ণ চীর-পরা বনবাসীরে বসাল নৃপ রাজাসনে।'

চূত—আম্র। 'চূত-মঞ্জরী চুঁয়াইয়া শিশির ঝরিতেছে।' **চ্যুত**—স্খলিত। বৃন্তচ্যুত পুষ্পের মতো আমরাও একদিন ঝরিয়া যাইব।

তরুণী—যুবতী। 'অমনি কথা না বলি ভরা ঘট ছলছলি নতমুখে চলি গেল তরুণী।' **তরণী**—নৌকা। 'এ ঘাটে বাঁধিব মোর তরণী।'

দ্বার—দরজা। 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।' **দার**—স্ত্রী। তিনি ছিলেন অকৃতদার।

দীপ—প্রদীপ। 'আমার এ দীপ না জ্বালালে দেয় না কিছুই আলো।' **দ্বিপ**—হাতী। 'দ্বিপ-পৃষ্ঠে পর্যঙ্ক শোভিছে মনোহর।' **দ্বীপ**—জলবেষ্টিত ভূখণ্ড। 'নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ প্রবাল দিয়ে ঘেরা।'

দিন—দিবস। 'আমার যেদিন গেছে ভেসে চোখের জলে।' **দীন**—দরিদ্র। 'দীন যথা যায় দূর তীর্থ-দরশনে।'

দুকুল—উভয় বংশ। বধূটির পিতৃকুল ও পতিকুল—দুকুলই বজায় রহিল। **দুকূল**—রেশমী কাপড়। 'রক্ত দুকূল দিল উপহার।'

দেশ—রাজ্য। 'দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী।' **দ্বেষ**—হিংসা। 'জাগিবে না তাহে বাহুবল কিবা জাগিবে না দ্বেষাদ্বেষি।'

দ্যুত—পাশাখেলা। 'একি তুই দেবতার দ্যূত খেলা অনিবার?' **দূত**—চর। 'সাবাসি দূত, তোর কথা শুনি কোন্ বীর-হিয়া নাহি চাহেরে পশিতে সংগ্রামে?'

নীর—জল। 'চির-স্থির কবে নীর হায় রে জীবন-নদে?' **নীড়**—পাখির বাসা। 'আমি নীড়-হারা নিশার পক্ষী।'

পূর্বাহ্ন—পূর্বদিন। উৎসব দিবসের পূর্বাহে তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। **পূর্বাহ্ণ**—দিবসের প্রথম ভাগ। তুমি আগামীকল্য পূর্বাহ্ণে এখানে আসিয়া ভোজন করিবে।

বলি—পূজার উপচার। 'আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন্ বলিদান?' **বলী**—বলবান্। 'চাপি রিপুচয় বলী পড়েছিল যথা গরুড়।'

বান—বন্যা। 'বান এসেছে মরা গাঙে খুলতে হবে নাও।' **বাণ**—শর। 'কোন্ পাষাণের বিষবাণে তার নয়নের মণি ভিন্ন।'

বিনা—ব্যতীত। 'আজ বিনা-কাজে বাজিয়ে বাঁশি কাটবে সারাবেলা।' **বীণা**—বাদ্যযন্ত্র। 'বীণা তবে রেখে দে, গান আর গাস্ নে।'

বিজন—নির্জন। 'বসেছি বিজনে নব নীপবনে পুষ্পিত তৃণদলে।' **বীজন**—পাখা। 'তোমার পবন করিছে বীজন জুড়াতে দগ্ধপ্রাণ।'

শব—মৃতদেহ। 'সেই পশু মানুষের অগণিত শব।' **সব**—সকল। 'আমাদের আছে সব, কিন্তু দেখে নেবার লোক নেই।'

শয্যা—বিছানা। 'ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি পঙ্কশয্যা হতে।' **সজ্জা**—বেশভূষা। 'এবার আমার অঙ্গ ছেয়ে পরাও রণসজ্জা।'

শরণ—আশ্রয়। 'হে মহাজীবন, হে মহামরণ, লইনু শরণ।' **স্মরণ**—পূর্বচিন্তা। চিরদিন রাখিয়ো স্মরণ।'

শঙ্কর—শিব। 'হে ভবেশ, হে শঙ্কর, সবারে দিয়েছ বর।' **সঙ্কর**—মিশ্র। বাঙালীর মতো সঙ্কর জাতি আর নাই।

শম—শান্তি। দম, শম, দানাদির দ্বারা তিনি রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। **সম**—সমান। 'বুদ্ধের করুণ আঁখি দুটি সন্ধ্যা তারাসম রহে ফুটি।'

শীকর—জলকণা। বায়ু-তাড়িত শীতল শীকর-স্পর্শে তাহার নিদ্রা আসিল। **শিকড়**—গাছের মূল। 'জল দাও প্রাণের শিকড়ে।'

শ্মশ্রু—দাড়ি। বৃদ্ধদের মধ্যে ঐ অজাতশ্মশ্রু যুবকটি কে? **শ্বশ্রূ**—শাশুড়ী। শ্বশ্রূঠাকুরাণী বধূটিকে জননীর মতো স্নেহ করেন।

শ্রবণ—শোনা। তাপসীদের কণ্ঠে জননীর নাম শ্রবণ করিয়া বালক শান্ত হইল। **স্রবণ**—ক্ষরণ। পর্বত-গাত্র বাহিয়া জলের স্রবণ লক্ষ্য করিলাম।

শীত—ঠাণ্ডা। 'শীতের হাওয়ায় লাগলো নাচন আমলকীর ঐ ডালে ডালে।' **সিত**—সাদা। 'সিতাসিত দুই পক্ষ একই মা জানি।'

সূত—সারথি। ভাগ্যবিড়ম্বিত মহাবীর কর্ণ আজীবন সূতপুত্র বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। **সুত**—পুত্র। নন্দের সুত শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলিলেন।

শূর—বীর ॥ 'সেথায় হারাবংশী সবাই মহা মহা শূর।' **সূর**—সূর্য। সৌর কিরণে অন্ধকার অপসৃত হইল। **সুর**—দেবতা ॥ 'সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ।'

সর্গ—সৃষ্টি, গ্রন্থের পরিচ্ছেদ ॥ 'মেঘনাদবধ' কাব্যের প্রথম সর্গের নাম 'অভিষেক'। **স্বর্গ**—দেবলোক ॥ 'থাকো স্বর্গ হাস্যমুখে, করো সুধা পান দেবগণ।'

সত্য—যথার্থ ॥ 'সত্যের নাহি পরাজয়।' **স্বত্ব**—অধিকার। এই জমির স্বত্ব কাহার? **সত্ত্ব**—গুণবিশেষ ॥ ঈশ্বরের মধ্যেই সত্ত্বগুণের প্রকাশ।

●তাহা ছাড়া, নিম্নলিখিত সমোচ্চার্য শব্দগুলির অর্থ-পার্থক্য লক্ষ্য কর:

অধ্যয়ন—পাঠ; **অধ্যাপন**—শিক্ষাদান ॥ **অবিরাম**—অবিশ্রাম; **অভিরাম**—সুন্দর ॥ **অবিহিত**—বিধি-বিরুদ্ধ; **অভিহিত**—কথিত ॥ **অশ্ব**—ঘোড়া; **অশ্ম**—প্রস্তর ॥ **আভাষ**—ভূমিকা; **আভাস**—ক্ষীণ প্রকাশ। **ওষধি**—ফল পাকিলে যে গাছ মরিয়া যায়; **ঔষধি**—ভেষজ উদ্ভিদ্ ॥ **কপাল**—ললাট; **কপোল**—গাল ॥ **কুট**—পর্বত; **কূট**—জটিল ॥ **কুজন**—খারাপ ব্যক্তি; **কূজন**—পাখির ডাক। **কালি**—মসী; **কালী**—শিবপত্নী। **টিকা**—তিলক, রোগ-প্রতিষেধক; **টীকা**—ব্যাখ্যা। **তত্ত্ব**—গূঢ় অর্থ; **তথ্য**—প্রকৃত ঘটনা, পরিসংখ্যান্। **দিন**—দিবস; **দীন**—দরিদ্র। **দীপ**—প্রদীপ; **দ্বীপ**—জলবেষ্টিত ভূভাগ; **দ্বিপ**—হস্তী। **নিরাশ**—হতাশ; **নিরাস**—নিরাকরণ। **নিদান**—মূল কারণ; **নিধান**—আধার। **নিবার**—নিষেধ; **নীবার**—ধান্যবিশেষ। **নির্জর**—দেবতা; **নির্ঝর**—ঝরনা। **নিশিত**—ধারালো; **নিশীথ**—রাত্রি। **নিরশন**—অনাহার; **নিরসন**—দূরীকরণ। **নিবৃতি**—বিরতি; **নির্বৃতি**—মুক্তি, শান্তি। **পরিচ্ছদ**—পোশাক; **পরিচ্ছেদ**—অধ্যায়। **পক্ষ**—পাখা; **পক্ষ্ম**—নেত্রলোম। **পরশ্ব**—পরশু দিন; **পরস্ব**—পরের ধন। **পরুষ**—কঠোর; **পুরুষ**—নর। **পরিষদ**—সভা; **পারিষদ**—সভাসদ। **পৃষ্ট**—জিজ্ঞাসিত; **পৃষ্ঠ**—পিঠ। **প্রকৃত**—যথার্থ; **প্রাকৃত**—সাধারণ। **প্রসাদ**—অনুগ্রহ; **প্রাসাদ**—অট্টালিকা। **বসন**—বস্ত্র; **ব্যসন**—কামজ ও কোপজ দোষ। **বর্শা**—সড়কি; **বর্ষা**—বৃষ্টির ঋতু। **বাদ্য**—বাজনা; **বাধ্য**—বশীভূত। **বিংশ**—কুড়ি সংখ্যার পূরক; **বিংশতি**—কুড়ি। **বিশ**—কুড়ি; **বিষ**—গরল; **বিস**—পদ্মের মৃণাল। **বিত্ত**—বিভব; **বৃত্ত**—মণ্ডল। **বিস্মিত**—আশ্চর্যান্বিত; **বিস্মৃত**—স্মরণে নাই এমন। **বিকৃত**—বিকার-প্রাপ্ত; **বিক্রীত**—যাহা বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। **বেদ**—শাস্ত্র; **বেধ**—গভীরতা। **ভাষ**—কথন; **ভাস**—দীপ্তি। **মুখ**—বদন; **মূক**—বোবা। **যজ্ঞ**—হোম; **যোগ্য**—উপযুক্ত। **যতি**—বিরতি; **জ্যোতি**—দীপ্তি। **রিক্ত**—শূন্য; **রিকৃথ**—ধন। **শর**—বাণ; **স্বর**—ধ্বনি; **স্মর**—কামদেব। **শয্যা**—বিছানা; **সজ্জা**—সাজ। **শম**—শান্তি; **সম**—সমান। **শারদা**—দুর্গা; **সারদা**—সরস্বতী। **শুক্তি**—ঝিনুক; **সুক্তি**—সুভাষিত। **শুচি**—পবিত্র; **সুচি, সূচী**—বিষয়-তালিকা, ছুঁচ। **শ্রবণ**—শোনা; **স্রবণ**—ক্ষরণ। **সাক্ষর**—অক্ষর-জ্ঞানযুক্ত; **স্বাক্ষর**—সহি। **সার্থ**—বণিক-সম্প্রদায়; **স্বার্থ**—নিজের উদ্দেশ্য। **সীমন্ত**—সিঁথি; **সীমান্ত**—প্রান্ত।

কার্তিকেয় ; স্কন্ধ—কাঁধ। স্তম্ব—কাণ্ডহীন বৃক্ষ ; স্তম্ভ—থাম। স্ব—স্বয়ং ; স্বঃ—স্বর্গ। স্বীকার—সম্মতিদান ; শিকার—মৃগয়া।

॥ অনুসরণী ॥

*১. নিম্নলিখিত শব্দ-যুগলের অর্থের পার্থক্য নির্দেশ কর :

গিরিশ, গিরীশ ; গোলক, গোলোক : কৃতি, কৃতী : স্বত্ব, সত্ত্ব : মা. '৫৭। সত্ত্ব, স্বত্ব ; অধ্যয়ন, অধ্যাপন ; বিংশ, বিংশতি : উ. মা. '৬৫ ; পূর্বাহ, পূর্বাহ্ণ : স্বত্ব, সত্ত্ব ; কৃত, ক্রীত : শয্যা, সজ্জা : উ. মা. '৬৭।

*২. নিম্নলিখিত সমধ্বনিবিশিষ্ট শব্দ-যুগলের অর্থগত পার্থক্য নিরূপণ কর :

বর্ষা, বর্শা : স্বীকার, শিকার ; আশা, আসা। মা. '৬৬

*৩. শব্দযুগ্মকগুলির অর্থভেদ বুঝাইয়া দাও : কুল, কূল ; বর্শা, বর্ষা ; বিজন, বীজন ; শয্যা, সজ্জা ; কুট, কূট : আরোহণ, অবরোহণ ; সত্ত, সত্ত্ব : উ. মা. '৭০। শান্ত, সান্ত : প্রকার, প্রাকার : অবিহিত, অভিহিত ; শুচি, সূচী : আপন, আপণ ; করি, করী। উ. মা. '৬৯

*৪. অর্থ-পার্থক্য নির্দেশ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ বাক্য রচনা কর :

অর্ঘ, অর্ঘ্য ; দূত, দ্যুত ; উদ্ধত, উদ্ধৃত ; আদি, আধি ; সর্গ, স্বর্গ ; বলি, বলী ; গোলক, গোলোক ; নির্জর [দেবতা], নির্ঝর [ঝরনা] ; বাণ, বান ; বসন, ব্যসন [বিপদ] ; শ্মশ্রু, শ্বশ্রূ ; কূজন, কুজন ; নীর, নীড় ; গিরিশ, গিরীশ ; দীপ, দ্বীপ ; প্রসাদ, প্রাসাদ ; অবদান, অবধান ; উপাদান, উপাধান ; তরণী, তরুণী ; চুকুল চুকূল ; আভাস, আভাব [ভূমিকা] ; অন্ত, অন্ত্য [শেষের] ; উদ্দেশে [সন্ধানে], উদ্দেশ্যে [জন্য] ; কৃত্ত [ছিন্ন], কৃত্য [কার্য] ; জ্যোতি, যতি [ছেদ, সংযমী], তদীয় [তাহার], ত্বদীয় [তোমার] ; ধরা, ধড়া [কটিবস্ত্র] ; ধাত্রী [বিধাতা], ধাত্রী ; প্রকৃত, প্রাকৃত [প্রকৃতি-বিষয়ক] ; বেদ, বেধ [গভীরতা] ; মূর্খ, মুখ্য [প্রধান] ; যাম [প্রহর], জাম ; যতি, যতী [ভিক্ষু, তপস্বী] ; যজ্ঞ, যোগ্য ; সকৃত ও সকৃৎ [একবার] ; সহিত, স্বহিত [আত্ম-কল্যাণ] ; বল্লব [গোপ], বল্লভ [স্বামী] ; শীল [চরিত্র], শিল [বাটনা বাটার পাথরের ফলক] ; সপত্ন [সতীন] সপত্নী ; সূত্রধর [ছুতোর], সূত্রধার [নাট্য-প্রস্তাবক প্রধান নট] ; পরভৃত [কোকিল], পরভৃৎ [কাক]।

৫. বিভিন্ন বিশিষ্ট অর্থে শব্দগুলিকে প্রয়োগ করিয়া সার্থক বাক্য রচনা কর : অঙ্ক, উত্তর, ছড়া, মুখ, হাত, চোখ, কান, ধরা কাটা, পাকা, মোটা, বড়।

৬. বিশিষ্ট অর্থসহ স্বরচিত বাক্যে প্রয়োগ কর :

অশ্রুপাত, উত্তরকাল, মুখ রাখা, মুখ করা, মুখের কথা, বুক বাঁধা, বুক ভাঙা, মাথায় তোলা, মাথায় হাত, মাথায় ওঠা, মাথা বাথা, মাথা খাওয়া, মাথা তোলা, মাথার ঘাম পায়ে ফেলা, হাত আসা, হাত খোলা, হাতটান, হাতে খড়ি, হাতে পাওয়া, পাকা হাত, হাতে নয় ভাতে মারা, গা-করা, গা-ঢাকা দেওয়া, গা-তোলা, গায়ে পড়া, গায়ের জ্বালা, চোখ খোলা, সাদা চোখ, চোখের দেখা, চোখের বালি, চোখ কপালে ওঠা, চোখ রাখা, চোখে পড়া, কান কাটা, নাক কাটা, কান ভাঙান, কানে আঙুল দেওয়া, নাক গলান, মনে করা, মন খোলা, মনের আগুন, মনের কালি, মনের মানুষ, মনের ঝাল মিটান।

৭. বিশিষ্ট অর্থসহ স্বরচিত বাক্যে ব্যবহার কর :

বড় গলা, বড় মুখ, বড় জোর, ছোট নজর, ছোট কাজ, ছোট হওয়া, কাঁচা বয়স, কাঁচা খাতা, কাঁচা পয়সা, কাঁচা ঘুম, কাঁচা মাল, কাঁচা হাত, পাকা চোর, পাকা হাড়, খোলা মন, বাসি কাপড়, বাসি ঘর, বাসি মুখ।

৮. নিম্নলিখিত ক্রিয়াপদগুলির প্রত্যেকটিকে পাঁচ প্রকার বিশিষ্ট অর্থে স্বরচিত বাক্যে ব্যবহার কর : ওঠা, তোলা, কাটা, ধরা, লাগা।

৯. বিশেষ্য পদগুলিকে বিশেষণ পদরূপে ব্যবহার কর : অগ্নি, পাপ, সার, উত্তর।

১০. বিশেষণ পদগুলিকে বিশেষ্যরূপে ব্যবহার কর : ভাল, মন্দ, কালো, সাদা, নীল, অসম্ভব, সুন্দর।

১১. নিম্নোক্ত যে-কোন পাঁচটির প্রয়োগ দেখাইয়া পাঁচটি পৃথক্ বাক্য রচনা কর : হাতযশ, কানে তোলা, চোখে-মুখে, নাক-গলানো, মাথা কেনা, দাঁও মারা, ক্তানকানা [বাগ্‌ধারা দ্রষ্টব্য।] উ. মা. '৬৭

১২. দুইটি পৃথক্ পৃথক্ অর্থে ব্যবহার কর : অর্থ, আশা, কর্ম, কাল, গুণ, গুরু, চরিত্র, বাস, সারদা।

১. সমাস

পরস্পর-অর্থ-সম্পর্কযুক্ত একাধিক পদের একপদে সংহতি লাভের নাম **সমাস**। যেমন: বীণা পাণিতে যাহার=বীণাপাণি, চরণ পদ্মের ন্যায়=চরণপদ্ম, গাছে পাকা=গাছ-পাকা। প্রথম দৃষ্টান্তে 'বীণা' ও 'পাণি'র মধ্যে, দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে 'চরণ' ও 'পদ্মে'র মধ্যে এবং তৃতীয় দৃষ্টান্তে 'গাছ' ও 'পাকা'র মধ্যে একটি করিয়া অর্থ-সম্বন্ধ রহিয়াছে। অন্তর্নিহিত অর্থ-সম্পর্ক না থাকিলে সমাস হয় না।

যে সকল পদ মিলিত হইয়া সমাস হয়, তাহাদের বলা হয় **সমস্যমান পদ**। 'বীণাপাণি' পদে 'বীণা' ও 'পাণি' পদগুলি এবং 'চরণপদ্ম' পদে 'চরণ' ও 'পদ্ম' পদগুলি কিংবা 'গাছ-পাকা' পদে 'গাছ' ও 'পাকা' পদগুলি সমস্যমান পদ।

সমস্যমান পদগুলি মিলিত হইয়া যে একপদে সংহতি লাভ করে, তাহাকে বলা হয় **সমস্ত পদ** বা **সমাসবদ্ধ পদ**। 'বীণাপাণি', 'চরণপদ্ম' ও 'গাছ-পাকা' পদগুলি সমস্ত পদ বা সমাসবদ্ধ পদ।

সমাসবদ্ধ পদটিকে বিশ্লেষ করিবার জন্য যে বাক্যের প্রয়োজন হয়, তাহাকে বলা হয় **সমাস-বাক্য** বা **ব্যাস-বাক্য** বা **বিগ্রহ-বাক্য**। 'বীণা পাণিতে যাহার' কিংবা 'চরণ পদ্মের ন্যায়'—এই বাক্যগুলি সমাস-বাক্য বা ব্যাস-বাক্য বা বিগ্রহ-বাক্য।

সমস্যমান পদগুলির প্রথম পদটিকে 'পূর্বপদ' এবং পরবর্তী পদটিকে [বা পদগুলিকে] 'উত্তর পদ' বা 'পরপদ' বলা হয়। সমস্ত পদে কখনও পূর্বপদের প্রাধান্য, যেমন: 'চরণ-কমল'; কখনও পরপদের প্রাধান্য, যেমন: উড়ো যে জাহাজ=উড়োজাহাজ; কখনও উভয় পদের প্রাধান্য, 'হরগৌরী'। আবার, কখনও-বা পূর্বপদ ও পরপদের কোনটিকে না বুঝাইয়া তৃতীয় পদের প্রাধান্য বুঝাইয়া থাকে। যেমন: 'বীণাপাণি'।

● সন্ধি ও সমাসের পার্থক্য:

পরস্পর-সন্নিহিত দুইটি বর্ণের মিলনকে **সন্ধি** বলা হয়। কিন্তু পরস্পর-অর্থ-সম্পর্ক-যুক্ত একাধিক পদের একপদে সংহতি লাভ করার নাম **সমাস**। যেমন: প্রতি+এক=প্রত্যেক [সন্ধি], এক এক=প্রত্যেক [সমাস]; পীত+অম্বর=পীতাম্বর [সন্ধি]; পীত অম্বর যাহার=পীতাম্বর [সমাস]।

সন্ধিতে সন্নিহিত দুইটি বর্ণের মিলনের ফলে দুইটি পদেরও মিলন হয়: বর্ণের এই মিলনের ভিত্তি হইল **উচ্চারণ**। পদের মিলন সন্ধির লক্ষ্য নয়। ইহা সমাসের কাজ। সমাসে দুই বা ততোধিক পদের মিলন হইয়া থাকে এবং পদের এই মিলনের ভিত্তি হইল **অর্থ**। অবশ্য, সমাস সংঘটিত হইবার পর সম্ভব হইলে সন্নিহিত দুইটি

বর্ণ সন্ধিসূত্রে মিলিত হইতে পারে। আবার, অর্থের যোগ না থাকিলে সন্ধিও হয় না।

সন্ধিতে বিভক্তির লোপ হয় না। সমাসে অলুক্ সমাস ব্যতীত প্রতিটি পদের বিভক্তির লোপ হয়। সন্ধিতে বহু পদ বহুপদই থাকে। সমাসে বহু পদ একটিমাত্র পদে পরিণত হয়।

● সমাসের প্রকার-ভেদ

সমাস প্রধানতঃ **ছয় প্রকার : দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ, কর্মধারয়, দ্বিগু, বহুব্রীহি** এবং **অব্যয়ীভাব**। ইহা ছাড়া আরও দুই প্রকার সমাস আছে—**সুপ্‌সুপা** ও **নিত্যসমাস**। আচার্য সুনীতিকুমারের মতে, সমাস মুখ্যতঃ তিন প্রকার—১. **সংযোগমূলক**—দ্বন্দ্ব, ২. **বর্ণনামূলক**—বহুব্রীহি, এবং ৩. **ব্যাখ্যানমূলক**—তৎপুরুষ, কর্মধারয়, দ্বিগু ও অব্যয়ীভাব।

আবার, সংস্কৃত বৈয়াকরণ পাণিনির মতে, সমাস প্রধানতঃ চার প্রকার : **দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি** ও **অব্যয়ীভাব**। কর্মধারয় ও দ্বিগু সমাস প্রকৃতপক্ষে তৎপুরুষ সমাসেরই অন্তর্গত।

সংস্কৃত ব্যাকরণে সমাস ছয় প্রকারের। "দ্বিগুর্দ্বন্দ্বোঽব্যয়ীভাবঃ কর্মধারয় এব চ। পঞ্চমস্তু বহুব্রীহিঃ ষষ্ঠস্তৎপুরুষঃ স্মৃতঃ॥" বাংলা ব্যাকরণেও সমাস ছয় প্রকার।

১. দ্বন্দ্ব সমাস

ইহা সংযোগমূলক সমাস। 'দ্বন্দ্ব' কথাটির দুইটি অর্থ : সংঘাত ও মিলন। দ্বন্দ্ব সমাস কথাটিতে দ্বিতীয় অর্থ ['মিলন']-টিই গৃহীত হয়। দ্বন্দ্ব সমাস অর্থাৎ মিলনের সমাস।

যে সমাসে দুই বা তাহার অধিক পদের মিলন হয় এবং সমস্যমান প্রত্যেক পদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে।

সমস্যমান পদগুলিকে সংযোজক অব্যয় যুক্ত করে। দ্বন্দ্ব সমাসে উভয় পদেরই প্রাধান্য।

দুই পদের মিলন : হর ও গৌরী = হরগৌরী ; মশা ও মাছি = মশামাছি ; বর ও কনে = বরকনে ; পিতা ও মাতা = পিতামাতা ; জায়া ও পতি = **দম্পতি, দম্পতী** ; কুশ ও লব = **কুশীলব** ; চোখ ও কান = চোখকান ; মাথা ও মুণ্ডু = মাথামুণ্ডু ; ঝি ও চাকর = ঝি-চাকর ; ঘাস ও বিচালি = ঘাস-বিচালি।

দুইয়ের অধিক পদের মিলন : স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল = স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ; তেল, নুন ও লকড়ি—তেল-নুন-লকড়ি ; চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য ও পেয় = চর্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয় ; দুধ, দই, ক্ষীর ও সরপুরিয়া = দুধ-দই-ক্ষীর-সরপুরিয়া ; রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ = রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ ; রোগ, শোক, জরা ও মৃত্যু = রোগ-শোক-জরা-মৃত্যু ; [illegible] = ইট-কাঠ-চুন-বালি-সুরকী।

বাংলা সমাহার দ্বন্দ্ব : ডাল-ভাত, ডাল-ভাত-মাছ-তরকারি, মালা-চন্দন, আলু-পোস্ত, খানা-পিনা, দুধ-কলা, ঝি-জামাই, ডাল-রুটি, আনাগোনা, বেচাকেনা, বিকিকিনি, নদীনালা, খাল-বিল, মুড়ি-মুড়কি, কান্না-হাসি, পৌষ-ফাল্গুন ইত্যাদি।

দুই বা ততোধিক বিশেষ্য পদের দ্বন্দ্ব : দ্বন্দ্ব সমাস সাধারণতঃ বিশেষ্য পদসমূহের মধ্যেই সংঘটিত হয়। উপরের দৃষ্টান্তগুলি বিশেষ্যে-বিশেষ্যে দ্বন্দ্ব সমাসেরই দৃষ্টান্ত। তেমনি=জন্ম-মৃত্যু, জীবন-মরণ, কর্ণার্জুন, ধানদূর্বা, শিবদুর্গা, জাতি-ধর্ম-বর্ণ, হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান, অশন-বসন, নদী-গিরি-বন, মন্ত্রতন্ত্র, ধূপধুনা-গঙ্গাজল, সত্য-শিব-সুন্দর, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, দেব দেবী, নদ-নদী, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম, চক্ষুকর্ণ, আলো-অন্ধকার, নিশিদিন, হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ, আচার-ব্যবহার, পূজা-পার্বণ, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা, স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল, দেব-দানব-যক্ষ-রক্ষ ইত্যাদি।

দুই বিশেষণ পদের দ্বন্দ্ব : ভালোমন্দ, হিতাহিত, ক্ষুদ্র-বৃহৎ, সাদাকালো, লঘু-গুরু, হতাহত, লালনীল, ইতর-ভদ্র, কাঁচাপাকা, উচ্চনীচ, ন্যায়-অন্যায়, চেনা-অচেনা, কাটা-ছেঁড়া, সহজ-সরল, দীন-দুঃখী, ধনী-গরীব, ছোটবড়, সিতাসিত, আঁকা-বাঁকা, যাতায়াত, সুখী-অসুখী ইত্যাদি। কিন্তু স্মরণীয়, বিশেষণ দুইটি একটি মাত্র বস্তু বা ব্যক্তিকে নির্দেশ করিলে তখন উহা দ্বন্দ্ব সমাস না হইয়া **কর্মধারয় সমাস** হইবে।

দুই সর্বনাম পদের দ্বন্দ্ব : তুমি-আমি, যে-সে, যাকে-তাকে, যার-তার, যা-তা, এ-ও-তা, এর-তার, একে-তাকে, এটা-ওটা ইত্যাদি।

দুই ক্রিয়া পদের দ্বন্দ্ব : উঠ-বস, হেসে-খেলে, মারধর, মরি-বাঁচি, উঠে-পড়ে, হেসে-কেঁদে, নেচে-কুঁদে, শুয়ে-গড়িয়ে, কেঁদে-ককিয়ে, দেখে-শুনে, বলে-কয়ে, হারি-জিতি, হাঁটি-চলি, পড়ি-মরি, ভেঙে-চুরে, চেয়ে-চিন্তে, র'সো [রও ও সও] ইত্যাদি।

● দ্বন্দ্ব সমাসের কতকগুলি বিশিষ্ট ব্যবহার :

ক. দ্বন্দ্ব সমাসের পরপদে রাত্রি ও নিশা-শব্দের অন্ত্য স্বর লুপ্ত হয়। যেমন : অহঃ ও রাত্রি=**অহোরাত্র**, দিবা ও রাত্রি=**দিবারাত্র**, অহঃ ও নিশা=**অহর্নিশ**। কিন্তু, দিবা ও নিশি=**দিবানিশি**। কিন্তু বাংলায় দিনরাত, নিশিদিন, রাতদিন [রাদ্দিন]।

খ. গোত্র-সম্বন্ধ ও বিদ্যা-সম্বন্ধ হইলে এবং ঋ-কারান্ত শব্দ পরে থাকিলে পূর্ববর্তী ঋ-কারান্ত শব্দ আকারান্ত হয়। যেমন : মাতৃ ও পিতৃ=মাতাপিতা। সংস্কৃতে **মাতৃপিতৃহীন**=যাহার মাতার পিতা অর্থাৎ মাতামহ নাই; **পিতৃমাতৃহীন**=যাহার পিতার মাতা অর্থাৎ পিতামহী নাই। **মাতাপিতৃহীন**=যাহার মাতা ও পিতা নাই। সংস্কৃতে পিতামাতা অশুদ্ধ। বাংলায় পিতামাতা, মাতাপিতা=দুই-ই চলে।*

* সংস্কৃতে স্ত্রীলিঙ্গবাচক ও পুংলিঙ্গবাচক শব্দে দ্বন্দ্ব সমাস হইলে আগে স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ ও পরে পুংলিঙ্গবাচক শব্দ বসে। যেমন : মাতাপিতা, শ্বশ্রূশ্বশুর, বধূবর, দাসীদাস ইত্যাদি। কিন্তু বাংলায় তা হয় না। বাংলায় আগে পুংলিঙ্গবাচক শব্দ ও পরে স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ বসাই প্রচলিত রীতি। যেমন : পিতামাতা, শ্বশুরশাশুড়ী, বর-বউ, দাস-দাসী ইত্যাদি।

গ. সংস্কৃতে জায়া ও পতি=দম্পতি, দম্পতী, জম্পতি, জায়াপতি। কিন্তু বাংলায় হয় শুধু দম্পতি বা দম্পতী।

ঘ. কুশ ও লব সংস্কৃতে কুশীলব। বাংলায়ও কুশীলব [নট] প্রচলিত।

ঙ. **অলুক্ দ্বন্দ্ব :** অ [অর্থাৎ না] লুক্ [অর্থাৎ লোপ]—কথাটির অর্থ 'যাহাতে বিভক্তির লোপ হয় না।'

যে দ্বন্দ্ব সমাসে সমস্যমান পদগুলির বিভক্তি লোপ হয় না, তাহাকে **অলুক্ দ্বন্দ্ব সমাস** বলে। যেমন: মাঠে ও ময়দানে=মাঠে-ময়দানে। তেমনি—ঘরে-বাইরে, বনে-বাদাড়ে, বনে-জঙ্গলে, জলে-জঙ্গলে, হাটে-বাজারে, দুধে-ভাতে, জপে-তপে, দুঃখে-সুখে, শয়নে-উত্থানে, বুকে-পিঠে, কোলে-পিঠে, ডাইনে-বাঁয়ে, তেলে-বেগুনে, তেলে-জলে, আদায়-কাঁচকলায়, হাতে-পায়ে, হাতে-কলমে, মায়ে-ঝিয়ে, কাগজে-কলমে, ইস্কুলে-কলেজে, হাটে-মাঠে, গৃহে-গোঠে, ঝোপে-ঝাড়ে, গায়ে-গতরে, ক্ষেতে-খামারে, ট্রামে-বাসে, দেশে-বিদেশে, জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে, বনে-উপবনে ইত্যাদি।

সমার্থক দ্বন্দ্ব : একই অর্থ-বিশিষ্ট পদসমূহ যে সমাসে মিলিত হয়, তাহাকে **সমার্থক দ্বন্দ্ব সমাস** বলা হয়। যেমন: কাগজ ও পত্র=কাগজ-পত্র, রাজা ও বাদশা=রাজা-বাদশা। তেমনি—কাজ-কর্ম, যাগ-যজ্ঞ, ভুল-ভ্রান্তি, জন্তু-জানোয়ার, মাঠ-ময়দান, জন-মানব, পাইক-বরকন্দাজ, শাক-সব্‌জি, বাড়ি-ঘর, জমি-জমা, ভিটে-মাটি, মামলা-মোকদ্দমা, কোর্ট-কাছারি, ঠাট্টা-মস্করা, সভা-সমিতি, হাট-বাজার, ছাই-পাঁশ, ডাক্তার-বদ্যি, কথা-বার্তা, মাথামুণ্ডু, চিঠি-পত্র, রাজা-রাজড়া, সাজ-পোশাক, চোর-ডাকাত, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, কুলি-মজুর, লোক-লস্কর, হাসি-তামাসা ইত্যাদি।

ইত্যাদি-অর্থসূচক দ্বন্দ্ব : এক জাতীয় বুঝাইতে **ইত্যাদি-অর্থসূচক দ্বন্দ্ব সমাস** হয়। ১. সহচর শব্দ সংযোগে—যেমন: যুদ্ধ-বিগ্রহ, খল-কপটতা, ফুটোফাটা, ডাকহাঁক, খানাপিনা, ছেলেপিলে, ধর-পাকড়, থানাপুলিশ, মার-ধর, বিলিবিক্রি, ঘর-গেরস্থালি, খড়কুটো, গোঁফদাড়ি, হাত-পা, দেহ-মন, গান-বাজনা, নাচ-গান, হৈ-হল্লোড়, ডুগি-তবলা, খোল-করতাল, জলকল, জামা-কাপড়, ঝড়বৃষ্টি, বৃষ্টি-বাদল, সর্দি-কাশি, দুঃখ-কষ্ট, ধুলোবালি, ঠেঙা-লাঠি, লাঠি-সোটা, গাছ-পালা, ঝোপ-জঙ্গল, ডাল-পালা, জলকাদা, জিনিসপত্র, ঘরবাড়ি। ২. অনুচর শব্দ সংযোগে—যেমন: স্নানাহার, খেলাধুলো, পচা-পান্তকো, চোর-ছ্যাঁচোড়, চেয়ার-টেবিল, ছল-চাতুরি, ঝাড়-লণ্ঠন, জাল-জোচ্চুরি, হাঁড়ি-হেঁসেল, আজকাল, কালপরশু, পাঁচ-সাত, চুরি-চামারি, ঘটি-বাটি, থালা-বাসন, গান-বাজনা, দোকান-পাট, হাট-বাজার, হাতী-ঘোড়া, গোরু-বাছুর, ঘর-দোর, খুন-খারাপি, ঢাল-তলোয়ার, গোলা-বারুদ, লাঠি-সড়কি। ৩. প্রতিচর শব্দ সংযোগে—যেমন: উত্থান-পতন, পতন-অভ্যুদয়, উঁচু-নিচু, জয়-পরাজয়, ক্রয়-বিক্রয়, বেচা-কেনা. উথাল-পাতাল, জোয়ার-ভাঁটা, জল-স্থল, স্বর্গ-নরক, পাপ-পুণ্য, ভালোমন্দ, হাসিকান্না, ক্ষুদ্র-বৃহৎ, আকাশ-পাতাল, উপর-নীচ, দিনরাত, সকাল-সন্ধ্যা, পোকা-মাকড়, শেয়াল-কুকুর, কুকুর-বিড়াল, গোঁজামিল, ছেলে-

মেয়ে, বৌ-বেটা, আলোছায়া, সাদাকালো, দিনরাত, ঝি-জামাই, ছেলে-পুলে, বাঙালী-অবাঙালী, লেনদেন, চাল-চুলো, চোর-ডাকাত। ৪. বিকার শব্দ সংযোগে—যেমন : ধর্ম-কর্ম, ওলট-পালট, অদল-বদল, তুক্‌তাক্‌, বা-তা, ফাঁক-ফোকর, আঁকি-বুকি, কান্না-কাটি, যন্তর-মন্তর, ভাঙ্গা-চোরা, খেলা-ধূলা, জারি-জুরি, কাঁদা-কাটা, যত্ন-আত্যি, ঝাড়-ফুঁক, গাল-গল্প। ৫. অনুকার শব্দ সংযোগে—যেমন : কাজ-টাজ, চা-টা, ভাত-টাত, হাতে-নাতে, হাঁড়ি-কুড়ি, প্রজাপত্তর, বিষয়-আশয়, গোলা-পালা, কাচ্চা-বাচ্চা, ঝালা-পালা, নাকানি-চোবানি।

একশেষ দ্বন্দ্ব : যেমন : তুমি, সে ও আমি = আমরা ; তুমি ও সে = তোমরা।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : সেখানে আমি **অহোরাত্র** নদীর কুলুকুলু সংগীত শুনিতাম। **দিবারাত্র** তাহারা শুধু কলহ করে। 'কেবল আমার সাথে দ্বন্দ্ব **অহর্নিশ**।' '**দিবা-নিশি** ভাবনা কিসে ক্লেশ পাবো না।' '**নিশিদিন** তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।' তাহার মাতামহের পরলোকগমনে সে **মাতৃপিতৃহীন** [মাতামহহীন] হইল। পিতামহীর মৃত্যুতে সে **পিতৃমাতৃহীন** [পিতামহীহীন] হইয়াছে। পিতা ও মাতাকে হারাইয়া সে শৈশবে **মাতাপিতৃহীন** [মাতাপিতাহীন] হইয়াছে। তিনি **নবদম্পতীকে** [**দম্পতি**] আশীর্বাদ করিলেন। নাটকের **কুশীলবগণ** একে একে আবির্ভূত হইলেন। **ঘরে-বাইরে** আজ আমাদের সমান দুর্গতি। 'আমার সন্তান যেন থাকে **দুধে-ভাতে**।' ভিড় এখন কোথায় নেই ? **ইস্কুলে-কলেজে, হাটে-বাজারে, মাঠে-ময়দানে** ভিড় এখন সবখানেই। 'বাবা একেবারে **তেলে-বেগুনে** উঠলেন জলে।' 'ওপাড়া হইতে আয় **মায়ে-ঝিয়ে**।' '**হাটে-মাঠে-গৃহে-গোঠে** সবাকার ধান।' 'পরে মাস দেড়ে **ভিটে-মাটি** ছেড়ে বাহির হইনু পথে।'

২. তৎপুরুষ সমাস

যে সমাসে পূর্বপদের কারক বা সম্বন্ধ-বোধক বিভক্তি লুপ্ত হইয়া পরপদের অর্থ-প্রাধান্য প্রতীয়মান হয়, তাহাকে **তৎপুরুষ সমাস** বলা হয়। যেমন : শরণকে আগত = শরণাগত ; মধুর দ্বারা মাখা = মধুমাখা। 'শরণকে' এবং 'মধুর দ্বারা' এই পূর্বপদ দুইটির প্রথমটিতে দ্বিতীয়া বিভক্তি এবং দ্বিতীয়টিতে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে ; কিন্তু সমস্তপদে বিভক্তি লুপ্ত হইয়া পরপদ দুইটির অর্থের প্রাধান্য প্রতীয়মান হইতেছে। তৎপুরুষ সমাসে প্রথমা বিভক্তি ছাড়া সকল বিভক্তিই লোপ পায়। বিভক্তি অনুযায়ী তৎপুরুষ সমাসের নামকরণ হয়।

দ্রিঃ দ্রঃ কারকের ক্ষেত্রে প্রথমা, দ্বিতীয়া ইত্যাদি বিভক্তির পরিবর্তে বিভক্তি-চিহ্নের উল্লেখ করা উচিত। কারণ, কারক বাক্য-নির্ভর এবং বাংলা ব্যাকরণে বাংলা বাক্যেরই কারবার ; সংস্কৃতের নয়। কিন্তু ব্যাংলায় গৃহীত সংস্কৃত শব্দগুলির যখন তৎপুরুষ সমাস হয়, তখন সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ, তৃতীয়া তৎপুরুষ ইত্যাদি ব্যবহার করাই যুক্তিসঙ্গত। কারণ বাংলায় সমাস-নির্ণয়ের অন্য ব্যবস্থা নাই।

● তৎপুরুষ সমাসের বিবিধ রূপ :

দ্বিতীয়া তৎপুরুষ : যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের দ্বিতীয়া বিভক্তি [কে, রে

ইত্যাদি] লুপ্ত হইয়া পরপদের অর্থ-প্রাধান্য প্রতীয়মান হয়, তাহাকে **দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস** বলে।

১. গত, প্রাপ্ত, আপন্ন, আশ্রিত, আরূঢ়, অতীত, সংক্রান্ত প্রভৃতি শব্দযোগে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ হয়। যেমন : শরণকে আগত = শরণাগত ; স্বঃ [স্বর্গ] কে গত = স্বর্গত ; বিপদকে আপন্ন = বিপদাপন্ন ; দেবকে আশ্রিত = দেবাশ্রিত ; সংখ্যাকে অতীত = সংখ্যাতীত ; অশ্বকে আরূঢ় = অশ্বারূঢ় ; বয়ঃকে প্রাপ্ত = বয়ঃপ্রাপ্ত ; স্বকে গত = স্বগত ; ব্যক্তিকে গত = ব্যক্তিগত। তেমনি = হস্তগত, মজ্জাগত, মর্মগত, পুঁথিগত, জাতিগত, স্মরণাতীত, সাহায্যপ্রাপ্ত, চরণাশ্রিত, আলোকপ্রাপ্ত, বৃত্তিপ্রাপ্ত, গা-ঢাকা, নখ-নাড়া, গা-নাড়া, রথ-দেখা, কলা-বেচা, বাসন-মাজা, ঘর-ধোয়া, জল-তোলা, কাপড়-কাচা, হাত-দেখা, লুচি-ভাজা, বধূ-বরণ, নবীন-বরণ।

২. ব্যাপ্তি বুঝাইলে কালবাচক দ্বিতীয়ান্ত পদের সহিত দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হইয়া থাকে। যেমন : চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী = চিরসুখী ; চিরকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী = চিরস্থায়ী ; চিরকাল ব্যাপিয়া বসন্ত = চিরবসন্ত ; ক্ষণকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী = ক্ষণস্থায়ী। তেমনি—চিরহরিৎ, দীর্ঘস্থায়ী, চিরস্মরণীয়, চিরদুঃখিনী, চির-বঞ্চিত, চির-কৃতজ্ঞ, চির-শত্রু, চির-রুগ্‌ণ, নিত্যানন্দ, জীবনানন্দ, পক্ষাশৌচ, চির-চঞ্চল।

৩. পূর্বপদটি বিশেষণীয় বিশেষণ বা ক্রিয়াবিশেষণ হইলে পরবর্তী কৃদন্তপদের সহিত দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হইয়া থাকে। যেমন : দ্রুত যথা তথা গামী = দ্রুতগামী ; ধীর যথা তথা গামী = ধীরগামী ; মৃদু যথা তথা ভাষিণী = মৃদুভাষিণী ; অবশ্য যথা তথা কর্তব্য = অবশ্যকর্তব্য ; ঘনভাবে সন্নিবিষ্ট = ঘনসন্নিবিষ্ট ; নিম [অর্ধ] ভাবে রাজী = নিমরাজী ; নিম [অর্ধ] ভাবে খুন = নিমখুন ; দৃঢ়রূপে বদ্ধ = দৃঢ়বদ্ধ। তেমনি—নিমদাগী, আধ-পাকা, অর্ধ-সমাপ্ত, অর্ধ-স্ফুট, আধ-পোড়া, অর্ধ-দগ্ধ।

অতিরিক্ত বাংলা দৃষ্টান্ত : চুল-চেরা, ধান-কাটা, ছেলে-ভুলানো, ঘর-বদলানো।

তৃতীয়া তৎপুরুষ : যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের তৃতীয়া বিভক্তি [দ্বারা, দিয়া, সাহায্যে ইত্যাদি] লুপ্ত হইয়া পরপদের অর্থ-প্রাধান্য প্রতীয়মান হয়, তাহাকে **তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস** বলে। যেমন : মধুর দ্বারা মাখা = মধুমাখা ; শ্রীর দ্বারা হীন = শ্রীহীন ; শ্রীর দ্বারা যুক্ত = শ্রীযুক্ত ; একের দ্বারা উন বিংশতি = ঊনবিংশতি ; শোকের দ্বারা আকুল = শোকাকুল ; বিজ্ঞান দ্বারা সম্মত = বিজ্ঞানসম্মত ; ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য = ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ; বাক্যের দ্বারা দত্তা = বাগ্‌দত্তা ; বাণের দ্বারা বিদ্ধ = বাণবিদ্ধ ; অন্নের দ্বারা উপচার = অন্নোপচার : তেমনি—বিদ্যাহীন, দৃষ্টিহীন, বজ্রাহত, রৌদ্রদগ্ধ, তমসাবৃত, স্বনাম-খ্যাত, কীটদষ্ট, দুগ্ধপোষ্য, ঋণগ্রস্ত, স্বোপার্জিত, পরশুচ্ছিন্ন, মেঘাচ্ছন্ন, মোহাচ্ছন্ন, স্নেহান্ধ, ভ্রমান্ধ, মোহান্ধ, গুণমুগ্ধ, শ্রম-সাধ্য, ঘৃতপক্ক, পদদলিত, মসীলিপ্ত, মাতৃহীন, রবাহূত, শক্তিসম্পন্ন, রত্নখচিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ, রজ্জুবদ্ধ, বিধিবদ্ধ, হস্ত-চালিত, বায়ু-চালিত, বিদ্যুৎ-চালিত, জরাজীর্ণ, কণ্টকাকীর্ণ, বাল্মীকি-প্রণীত, আশ্চর্যান্বিত [আশ্চর্যের দ্বারা অন্বিত], রোগাক্রান্ত, জনশূন্য, সর্পদষ্ট, গুরুদত্ত, যন্ত্রচালিত, লিপিবদ্ধ, [illegible] [illegible] স্বর্ণ-মণ্ডিত রক্তাক্ত, তৈলাক্ত, বিপদসঙ্কুল, ভক্তিযুক্ত।

অতিরিক্ত বাংলা দৃষ্টান্ত : দা-কাটা, ঢেঁকি-ছাঁটা, মধু-মাখা, মন-গড়া, ঝাঁটা-পেটা, লেপ-মুড়ি, তেল-মাখা, চুন-মাখা, শান-বাঁধানো, তাস-খেলা, লাঠি-খেলা, ধামা-চাপা, হাত-ছানি, পোয়া-কম, সিকি-কম, বাদুড়-চোষা, কালি-মাখা।

চতুর্থী তৎপুরুষ : যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের চতুর্থী বিভক্তি [কে, রে, নিমিত্ত, উদ্দেশে ইত্যাদি] লুপ্ত হইয়া পরপদের অর্থ-প্রাধান্য প্রতীয়মান হয়, তাহাকে **চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস** বলে। উদ্দেশ বুঝাইতে বা নিমিত্তার্থে চতুর্থী বিভক্তি হয় এবং সেরূপ ক্ষেত্রেও চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন : দেবকে বা দেব উদ্দেশে দত্ত = দেবদত্ত ; জীয়ন উদ্দেশে কাঠি = জীয়নকাঠি ; যূপের নিমিত্ত কাষ্ঠ = যূপকাষ্ঠ ; শয়নের নিমিত্ত কক্ষ = শয়নকক্ষ ; রান্নার নিমিত্ত ঘর = রান্নাঘর। তেমনি—পুত্রশোক, আরাম-কেদারা, বালিকা-বিদ্যালয়, অতিথিশালা, শান্তিনিকেতন, শিশু-বিভাগ, কিশোর-পত্রিকা, শিশু-সাহিত্য, জপমালা, মালগুদাম, অনাথাশ্রম, বিশ্রামঘর, নাটমন্দির, স্মৃতি-মন্দির, দেবমন্দির, দেব-বলি, ছাত্রাবাস, বিদ্যাভবন, পাঠভবন, পান্থনিবাস, তীর্থযাত্রা, সভামঞ্চ, ভোজনাগার, বিজয়-উল্লাস, চণ্ডীমণ্ডপ, ফাঁসিকাঠ, যজ্ঞশালা, খাদ্য-আন্দোলন, দূতাবাস, ভিক্ষাপাত্র।

অতিরিক্ত বাংলা দৃষ্টান্ত : পাগলা-গারদ, রেল-ভাড়া, রেল-মাশুল, খেয়াঘাট, বিয়ে-পাগলা, ডাক-মশুল, ধান-জমি, বসত-বাটী, মড়া-কান্না, ঠাকুর-ঘর, ডাকঘর।

পঞ্চমী তৎপুরুষ : যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের পঞ্চমী বিভক্তি [হইতে, থেকে, চেয়ে, অপেক্ষা ইত্যাদি] লুপ্ত হইয়া পরপদের অর্থ-প্রাধান্য প্রতীয়মান হয়, তাহাকে **পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস** বলে। যেমন : শাপ হইতে মুক্ত = শাপমুক্ত ; আদি হইতে অন্ত = আদ্যন্ত ; যূথ হইতে ভ্রষ্ট = যূথভ্রষ্ট ; জন্ম হইতে অন্ধ = জন্মান্ধ ; সর্প হইতে ভয় = সর্প-ভয় ; মানব হইতে ইতর = মানবেতর ইত্যাদি। তেমনি—বন্ধনমুক্তি, পদচ্যুত, দুগ্ধজাত, রোগমুক্তি, সিংহাসনচ্যুত, শাখাভ্রষ্ট, বিক্রয়লব্ধ, স্বর্গভ্রষ্ট, বিদেশাগত, বহিরাগত, ব্যাঘ্র-ভীতি, ধর্মচ্যুত, বৃন্তচ্যুত, সমাজচ্যুত, আকাশবাণী, মৃত্যুভয়, লোকলজ্জা, সত্যভ্রষ্ট, লক্ষ্যভ্রষ্ট, লোকভয়, চোরভয়, পদচ্যুত, বন্যাত্রাণ, জলাতঙ্ক, প্রাণাধিক, দেবোত্তর, কারামুক্ত, ঋণমুক্তি, প্রাণপ্রিয়, পাঠশালা-পলায়ন, যুদ্ধোত্তর, অষ্টোত্তর, তজ্জাত, তদ্ভব।

অতিরিক্ত বাংলা দৃষ্টান্ত : গাঁ-তাড়ানো, জেল-খালাস, জেল-পালানো, ইস্কুল-পালানো, বিলাত-ফেরত, আগাগোড়া।

ষষ্ঠী তৎপুরুষ : যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের ষষ্ঠী বিভক্তি [র, এর ইত্যাদি] লুপ্ত হইয়া পরপদের অর্থ-প্রাধান্য প্রতীয়মান হয়, তাহাকে **ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস** বলে। যেমন : গঙ্গার জল = গঙ্গাজল , ছাত্রদের সমাজ = ছাত্রসমাজ ; বৌদ্ধদের ধর্ম = বৌদ্ধধর্ম ; স্ব-র [নিজের] পত্নী = স্বপত্নী, [কিন্তু সমান বা একই পতি যাহাদের = সপত্নী—বহুব্রীহি]। সূর্যের অস্ত = সূর্যাস্ত ; *পথের রাজা = রাজপথ ; *হংসের রাজা = রাজহংস ; কবিদের রাজা = রাজকবি বা কবিরাজ ইত্যাদি। তেমনি—পিত্রালয়, তরুচ্ছায়া, দেশবন্ধু, রাষ্ট্রপতি, কবিগুরু, গিরিরাজ, গিরীশ, সূর্যোদয়, রাজ্যেশ্বর, রাজপুত্র, ব্রাহ্মণতনয়, শ্রেষ্ঠীপুত্র, লঙ্কেশ্বর, দিল্লীশ্বর, বিশ্বকবি, বিশ্বভারতী, সূর্যালোক, দীনবন্ধু, নদীতীর, রাজাজ্ঞা, গোদুগ্ধ, মৃগশাবক, সাধুসঙ্গ, অশোক-কানন, সাগরতীর, জাতিসংঘ।

কতকগুলি ঈ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ পূর্বপদ হইলে সমস্তপদে ঈ-কার ই-কার হয়। যেমন: কালীর দাস=কালিদাস, দেবীর দাস=দেবিদাস, ষষ্ঠীর দাস=ষষ্ঠীদাস ইত্যাদি। কিন্তু চণ্ডীর দাস=চণ্ডিদাস ও চণ্ডীদাস দুই-ই হয়।

স্মরণীয়: রাজপথ, রাজকবি, কবিরাজ, রাজহংস, রাজমিস্ত্রী, রাজরোগ—সমস্ত পদগুলিতে পূর্বপদগুলির **পরনিপাত** হয়। যেমন: মিস্ত্রীদের রাজা=রাজমিস্ত্রী।

সপ্তমী তৎপুরুষ: যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের সপ্তমী বিভক্তি [এ, তে, এতে, য়, মধ্যে ইত্যাদি] লুপ্ত হইয়া পরপদের অর্থ-প্রাধান্য প্রতীয়মান হয়, তাহাকে **সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস** বলে। যেমন: কর্মে নিপুণ=কর্মনিপুণ; শিল্পে পটু=শিল্পপটু; জলে মগ্ন=জলমগ্ন; পূর্বে ভূত=ভূতপূর্ব; পূর্বে শ্রুত=শ্রুতপূর্ব; সত্যে নিষ্ঠা= সত্যনিষ্ঠা; গৃহে বাস=গৃহবাস; সংখ্যায় গরিষ্ঠ=সংখ্যাগরিষ্ঠ। তেমনি—অরণ্যবাস, বনবাস, পাপাসক্ত, ক্রীড়াকুশল, রণনিপুণ, বিশ্ববিখ্যাত, গৃহাগত, তীরলগ্ন, উত্তরায়ণ, ধ্যানমগ্ন, জলমগ্ন, অকালপক্ব, অকালমৃত্যু, কাশীবাস, পুরুষোত্তম, নরোত্তম, সর্বোত্তম, সরোবর, সর্ববিদ্যাবিশারদ, কর্ম-কুশল, মহাকাশ-ভ্রমণ, কবি-শ্রেষ্ঠ, বন-ভোজন, অকালবার্ধক্য, পাঠরত, অধ্যয়ন-রত, গৃহকর্ম-নিপুণা, সত্যাগ্রহ, অকালবোধন।

অতিরিক্ত বাংলা দৃষ্টান্ত: গাছপাকা, ইংরেজি-শিক্ষিত, রাতকানা, তালকানা।

স্মরণীয়: পূর্বে ভূত=ভূতপূর্ব; পূর্বে শ্রুত=শ্রুতপূর্ব; পূর্বে দৃষ্ট=দৃষ্টপূর্ব; পূর্বে আস্বাদিত=আস্বাদিত-পূর্ব—সমস্ত পদগুলিতে পূর্বপদগুলির **পরনিপাত** হইয়াছে।

তৎপুরুষ সমাসের অতিরিক্ত প্রকার-ভেদ: তৎপুরুষ সমাস আরও কয়েক প্রকারের হইয়া থাকে। যেমন: **উপপদ তৎপুরুষ, অলুক্ তৎপুরুষ, নঞ্ তৎপুরুষ** ইত্যাদি।

●**উপপদ তৎপুরুষ:** সমাসবদ্ধ কৃদন্ত পদের পূর্বপদকে উপপদ বলা হয়। অর্থাৎ, যে সব পদের পরস্থিত ধাতুর কৃৎপ্রত্যয় হয়, তাহাদের উপপদ বলা হয়। যেমন: গৃহস্থ, জলচর, খেচর, উদ্ভিদ্, জলজ—এই সমাসবদ্ধ কৃদন্ত পদগুলির পূর্বপদ—যথাক্রমে—গৃহ, জল, খ, উৎ, জল—ইহারা উপপদ।

উপপদের সহিত কৃদন্ত পদের যে সমাস হয়, তাহাকে বলা হয় **উপপদ তৎপুরুষ সমাস**। যেমন: জলে চরে যে=জলচর; গৃহে থাকে যে=গৃহস্থ; পঙ্কে জন্মে যাহা=পঙ্কজ; জল দেয় যে=জলদ; শত্রুকে হত্যা করে যে=শত্রুঘ্ন; সত্য বলে যে=সত্যবাদী; ইন্দ্রকে জয় করে যে=ইন্দ্রজিৎ; খ-এ [আকাশে] চরে যে=খেচর; অগ্রে জন্মে যে=অগ্রজ; দুঃখে থাকে যে=দুঃস্থ; গোরুকে পালন করে যে=গোপ; পরম [শত্রুকে] তপ [দমন] করে যে=পরন্তপ; অপ্ বা জলে জন্মে যাহা=অব্জ। তেমনি—পাদপ, নীরদ, কুম্ভকার, অভ্রভেদী, দিগ্বিজয়ী, মৃত্যুঞ্জয়, ধনঞ্জয়, ভূধর, ভূচর, হলধর, জলজ, অনুজ, অন্ত্যজ, কুজ, হিতকর, মধুপ, মনোজ, মনসিজ, সরোজ, যাদুকর, দিবাকর, ছত্রধর, বনবাসী, অন্তেবাসী [অন্তে অর্থাৎ গুরুগৃহে বাস করে যে], অরিন্দম, দীপঙ্কর, ভুজগ, করদ, স্বর্ণকার, চিত্রকর, পথিকৃৎ, সূত্রধর, মণ্ডপ, গুণগ্রাহী, গ্রীশ, গিরিশ

নিশাচর, সর্বংসহা, সর্বনাশী, তটস্থ, মুখস্থ, হিমস্থ, পাপস্থ, সূত্রধর, শ্রুতিধর, রাজ্যপাল, বসুধা, বসুন্ধরা, আত্মজ, ভূমিষ্ঠ, গঙ্গাধর, নভশ্চর, বাজিকর, দনুজ, সব্যসাচী [সব্য অর্থাৎ উভয় হস্তেই সচন করেন যিনি], প্রকৃতিস্থ, কর্মনাশা, শ্রমজীবী, সর্বহারা।

অতিরিক্ত বাংলা দৃষ্টান্ত : মাছিমারা, দিশাহারা, লক্ষ্মীছাড়া, বর্ণচোরা, গাঁটকাটা, পকেট-মার, ছেলে-ধরা, ভুঁইফোড়, শোলোক-বলা, সবজান্তা, বাস্তুহারা।

●**অলুক্ তৎপুরুষ :** যে সমাসে পূর্বপদের বিভক্তির লোপ হয় না, তাহাকে **অলুক্ সমাস** বলে। যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের বিভক্তির লোপ হয় না, তাহাকে **অলুক্ তৎপুরুষ সমাস** বলা হয়। সকল প্রকার তৎপুরুষ সমাসেই অলুক্ তৎপুরুষ হইয়া থাকে। যেমন : **তৃতীয়া**—হাত দিয়ে কাটা = হাতে-কাটা, তেল দিয়ে ভাজা = তেলে-ভাজা। তেমনি—ঘিয়ে-ভাজা, হাতে-গড়া, কলে-ছাঁটা, হাতে-পোঁতা, বাঁশে-বাঁধা, চোখে-দেখা, বানের-জলে-ভেসে-আসা, সবার-পরশে-পবিত্র-করা। **চতুর্থী**—পরের নিমিত্ত পদ = পরস্মৈপদ। তেমনি—আত্মনেপদ, ভাতের-চাল, মুড়ির-চাল, জামার-কাপড়, খেলার-মাঠ, পেটের-ভাত, ভুলের-মাশুল, ঘানির-বলদ, চায়ের-কাপ, চায়ের-দুধ, পড়ার-ঘর, খাবার-ঘর। **পঞ্চমী**—সার হইতে সার = সারাৎসার ; পর হইতে পর = পরাৎপর ; ঘানি হইতে তেল = ঘানির-তেল তেমনি—কলের-জল, বাপের বেটা, পুকুরের মাছ, ক্ষেতের-ধান, বিদেশ-থেকে-আনা আকাশ-থেকে-পড়া, কাছ-থেকে-দেখা, নদী-থেকে-আনা, বন-থেকে-আনা। **ষষ্ঠী**—ভ্রাতুঃ [ভ্রাতার] পুত্র = ভ্রাতুষ্পুত্র, তেমনি—বাচস্পতি, বাপের-বাড়ি, মামার-বাড়ি, গোরুর-গাড়ি, গোরুর-দুধ, ঘোড়ার-গাড়ি, কলের-গান, ভাগের মা, মাটির-মানুষ সোনার বাংলা, মোমের-পুতুল, ভোরের-পাখি, রাজার-মেয়ে, পরের-মা, অনুরোধের আসর, গল্প-দাদুর আসর। **সপ্তমী**—যুধি [যুদ্ধে] স্থির = যুধিষ্ঠির ; সরসি [সরোবরে] জাত = সরসিজ ; মনসি [মনে] জাত = মনসিজ ; সোনায় সোহাগা = সোনায়-সোহাগা। তেমনি—খেচর, ঘরে-পাতা, কলেজে-পড়া, হাতে-গরম, অন্তেবাসী অরণ্যে-রোদন, দিনে-ডাকাতি, অঙ্কে-কাঁচা, গোড়ায় গলদ।

● **নঞ্ তৎপুরুষ :** যে তৎপুরুষ সমাসের পূর্বপদ নঞর্থক বা নিষেধার্থক অব্যয়, তাহাকে **নঞ্ তৎপুরুষ সমাস** বলে। সংস্কৃত নঞ্ অব্যয়ের বাংলা রূপ—অ, অন্, অনা, আ, গর্, ন, না, বি ও বে। **অ**—নাই মিল = অমিল ; নয় সুখ = অসুখ ; নয় সুস্থ = অসুস্থ ; নয় শুভ = অশুভ ; নয় গণ্য = অগণ্য [যাহা গণন করা যায় না] ; নয় গণ্য = নগণ্য [যাহা গণ্য করা যায় না—অর্থাৎ তুচ্ছ]। **অন্**—নয় উচিত = অনুচিত ; নয় এক = অনেক ; নাই অন্ত = অনন্ত ; নাই সীমা = অসীম নাই আহার = অনাহার ; নয় আহূত = অনাহূত ; নয় আস্বাদিত = অনাস্বাদিত **অনা**—নাই বৃষ্টি = অনাবৃষ্টি ; *নয় আঘ্রাত = অনাঘ্রাত। **আ**—নয় গাছা = আগাছা নয় ঘাটা = আঘাটা ; নয় কাল = আকাল ; নয় কাঁড়া = আকাঁড়া ; নয় লুনি = আলুনি **গর্**—নয় হাজির = গরহাজির ; নয় রাজী = গররাজী ; নয় মিল = গরমিল। **ন**—ন অতি দীর্ঘ = নাতিদীর্ঘ ; নয় অতি দূর = নাতিদূর ; নয় অতি শীত ও উষ্ণ = নাতি

নীতোক ; নয় ধর=নধর। না—নয় রাজী=নারাজ, নয় মঞ্জুর=না-মঞ্জুর; নয় বালক=নাবালক; নাই দাবী=নাদাবী; নাই খেয়াজ [খাজনা]=নাখেরাজ। নি, নির্—নাই ভরসা=নির্ভরসা; নাই আশা=নিরাশা; নয় ভেজাল=নির্ভেজাল. নাই খুঁত=নিখুঁত; নাই ভুল=নির্ভুল; নাই জন=নির্জন। বি—নয় দেশ=বিদেশ; নাই শৃঙ্খলা=বিশৃঙ্খলা; নয় সদৃশ=বিসদৃশ; নয় জোড়=বিজোড়। বে—নাই গতিক=বেগতিক; নয় মানান=বেমানান। তেমনি—অনির্বচনীয় [নয় বচনীয়], অনুত [নয় ক্ষত], অমৃত [নয় মৃত], অম্লান, অনাবশ্যক, অবাধ্য, অনিবার্য, অভাব [নাই ভাব], অব্যক্ত, অনলস, অজ্ঞাত, অখ্যাত, অপবিত্র, অসৎ, অমঙ্গল, নাতিবৃহৎ, নাতিক্ষুদ্র, অনশন, অনভিপ্রেত, অনিচ্ছা, অনীহা [নয় ঈহা], অনভিজ্ঞ, অবিরাম, অপরিণত, অনিপুণ।

বিশিষ্ট প্রয়োগঃ শরণাগতকে রক্ষা করা কর্তব্য। **স্বগত** উক্তি হইতে তাহার মনের কথা জানা গেল। 'পাড়ায় এসেছে এক **নাড়ী-টেপা** ডাক্তার।' **ছেলে-ভুলানো** ছড়া, **জামাই-ঠকানো** প্রশ্ন, **লোক-হাসানো** কাণ্ড, **প্রাণ-মাতানো** সংগীত, **হাড়-কাঁপানো** শীত, **হাড়-জ্বালানো** ছেলে, **চোখ-ঝলসানো** বিদ্যুতের আলো, **প্রাণ জুড়ানো** বাতাস, **ঘুম-ভাঙানো** ডাক। আলস্য বাঙালীর **মজ্জাগত** দোষ। পল্লীবাংলা আজ **শ্রীহীন**। **বিজ্ঞানসম্মত** উপায়ে আজ রোগের চিকিৎসা হওয়া উচিত। বালকটি আসলে একটি **ভস্মাচ্ছাদিত** বহ্নি। **অদ্রিমুক্ত** ব্যক্তিরা অন্যের প্রশংসা শুনিতে ভালোবাসেন না। নরপিশাচদের কবল হইতে **দুগ্ধপোষ্য** শিশুরাও নিষ্কৃতি পায় নাই। **পুত্রশোকে** চন্দ্রধর একেবারে ভাঙিয়া পড়িলেন না। আসলে এই পৃথিবীটা একটা বড়ো রকমের **পাগলা-গারদ**। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র **জন্মান্ধ** ছিলেন। **যুদ্ধোত্তর**-কালে শ্রমিক-বিক্ষোভ অত্যন্ত প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে। 'যৌবরাজ্যে বসিয়ে দে মা **লক্ষ্মীছাড়ার** সিংহাসনে।'

৩. কর্মধারয় সমাস

যে সমাসে পূর্বপদ ও পরপদ যথাক্রমে বিশেষণে ও বিশেষ্যে বা বিশেষ্যে ও বিশেষ্যে বা বিশেষণে ও বিশেষণে গঠিত হয় এবং পরপদের অর্থ-প্রাধান্য প্রতীয়মান হয়, তাহাকে **কর্মধারয় সমাস** বলা হয়। কর্মধারয় সমাস মূলতঃ তৎপুরুষ সমাসেরই প্রকারভেদ; ইহাতে পরপদেরই প্রাধান্য। ইহা প্রথমা তৎপুরুষেরই নামান্তর। যেমন: রক্ত যে পদ্ম=রক্তপদ্ম; যিনি রাজা তিনিই বাহাদুর=রাজাবাহাদুর; লাল ও নীল=লাল-নীল। প্রথম দৃষ্টান্তে—পূর্বপদ বিশেষণ [রক্ত] ও পরপদ বিশেষ্য [পদ্ম], দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে—পূর্বপদ বিশেষ্য [রাজা] ও পরপদ বিশেষ্য [বাহাদুর] এবং তৃতীয় দৃষ্টান্তে পূর্বপদ বিশেষণ [লাল] ও পরপদ বিশেষণ [নীল]।

বিশেষণ ও বিশেষ্যে কর্মধারয়ঃ সু [ভাল] যে পুরুষ=সুপুরুষ; মহৎ যে জন=মহাজন। তেমনি—নীলোৎপল, হারাধন, চলচ্চিত্র, স্বায়ত্তশাসন, ভাঙাহাট, পুণ্যাহ, শুক্লপক্ষ, কৃষ্ণপক্ষ, শ্বেতপদ্ম, পূর্ণচন্দ্র, সদ্গুরু, কুমন্ত্রণা, মহারাজ, মহামন্ত্রী, মহাবীর, মহাষ্টমী [মহতী যে অষ্টমী], মহর্ষি, মহাপুরুষ, মহাজন, মহাবিদ্যা, মহাজ্ঞান,

মহারাণী, শুচিবস্ত্র, কাপুরুষ [কু যে পুরুষ—কুপুরুষ], পাণ্ডুলিপি [পাণ্ডু যে লিপি], শ্বেতচন্দন, মিষ্টবাক্য, রক্তাম্বর, ছিন্নপত্র, বীরাঙ্গনা, সজ্জন, নীলাকাশ, শ্বেতপদ্ম, লাল কমল, ছিন্নবস্ত্র, ভগ্ন-সৌধ, বিশ্ব [সকল]-মানব, রুদ্রবীণা, মহাসভা, হেড-পণ্ডিত, ফুল [full]-বাবু, পোড়ামাটি, হলুদপাখী, কালোমাণিক, নীলমণি, চোরাবালি, ঝরাপাতা, কালোবাজার, খাসমহল, কেনাগোলাম, কালপেঁচা, কাঁচকলা, হেড্‌মাস্টার, উড়োজাহাজ, ডুবোজাহাজ, উড়োচিঠি।

কতকগুলি শব্দে সমস্তপদে পূর্বপদ ও পরপদের অবস্থান পরিবর্তিত হইয়া যায়। ইহাকে 'পূর্বনিপাত' বলা হয়। যেমন: অধম যে রাজা = রাজাধম ; অধম যে নর = নরাধম ; উত্তম যে নর = নরোত্তম। বাংলায় এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে। যেমন: বাটা এমন হলুদ = হলুদ-বাটা ; ভাজা এমন চাল = চাল-ভাজা ; সিদ্ধ এমন আলু = আলুসিদ্ধ। তেমনি—মাছ-ভাজা, পটোল-ভাজা, বেগুন-পোড়া।

বিশেষ্য ও বিশেষ্যে কর্মধারয় : যে খোকা সেই বাবু = খোকাবাবু ; যিনি রাজা তিনিই ঋষি = রাজর্ষি ; যাহা গঙ্গা তাহাই নদী = গঙ্গানদী ; যাহা কলিকাতা তাহাই শহর = কলিকাতা-শহর ; যিনি পিতা তিনিই ঠাকুর = পিতাঠাকুর ইত্যাদি। তেমনি—রাজ-সন্ন্যাসী, দেবর্ষি, লাট-সাহেব, দ্যুলোক, ভূলোক, দাদুভাই, গিন্নীমা, দিদিভাই, দাদাবাবু, গুরুদেব, পিতৃদেব, মাতৃদেবী, ঠাকুরমহাশয়, ঠাকুরমা, শুকতারা, সম্রাট-কবি, নৃপশিশু, ডাক্তারবাবু, সর্দার-পড়ুয়া, বউঠাকুরাণী, বটগাছ, ডাক্তার-সাহেব, পণ্ডিতমহাশয়, শিক্ষকমহাশয়, কথকঠাকুর, মাতা-ঠাকুরাণী।

বিশেষণ ও বিশেষণে কর্মধারয় : যাহা কাঁচা তাহাই মিঠা = কাঁচামিঠা ; যাহা মৃদু তাহাই মন্দ = মৃদুমন্দ ; যে চালাক সেই চতুর = চালাক-চতুর ; যাহা লাল তাহাই নীল = লাল-নীল ; যাহা ভীষণ তাহাই সুন্দর = ভীষণ-সুন্দর ; তেমনি—গাঢ়নীল, নীল-লোহিত, সহজ-সরল, দীনদুঃখী, ক্লান্তক্লিষ্ট, পণ্ডিতমূর্খ, জীবন্মৃত, অম্লমধুর, শীতোষ্ণ, ন্যূনাধিক, গণ্যমান্য, হৃষ্টপুষ্ট, সুস্থ-সবল, হিংস্র-কুটিল, মিঠাকড়া, কঠোর-কোমল, মধুর-ললিত, কান্ত-কোমল, বাঁধা-ধরা, শান্তশিষ্ট, কানাখোঁড়া, সুপ্তোত্থিত, দীনহীন, স্নিগ্ধ-সজল, স্নিগ্ধোজ্জ্বল।

● **কর্মধারয় সমাস সম্পর্কে কতকগুলি বিশেষ সংস্কৃত-বিধি :**

১. প্র, পূর্ব, মধ্য, অপর, সায়ম্ প্রভৃতি শব্দের পর 'অহন্' শব্দের 'অহ্ন' আদেশ হয়। যেমন: পূর্ব যে অহ = পূর্বাহ্ন [দিনের পূর্বভাগ], পূর্বাহ [পূর্বদিন] ; প্র [পূর্ব] যে অহ = প্রাহ্ন। তেমনি—মধ্যাহ্ন, পরাহ্ন, অপরাহ্ন, সায়াহ্ন।

২. স্বরবর্ণ পরে থাকিলে 'কু' স্থানে 'কৎ' [কদ্] আদেশ হয়। যেমন: কু যে আচার = কদাচার ; কু যে আকার = কদাকার ; কু যে অর্থ = কদর্থ ; কু যে অভ্যাস = কদভ্যাস। তেমনি—কদক্ষর, কদুক্তি, কদুত্তর, কদর্য, কদন্ন, কদুষ্ণ [কবোষ্ণ]।

৩. পূর্বপদ 'মহৎ' স্থানে 'মহা' এবং পরপদ 'সখি' স্থানে 'সখ', 'রাজন্' স্থানে 'রাজ' ও 'রাত্রি' স্থানে 'রাত্র' আদেশ হয়। যেমন: মহৎ যে জন = মহাজন, মহৎ যে রাজা = মহারাজ [বাংলায় 'মহারাজা' শব্দও প্রচলিত। যেমন: বর্ধমানের

মহারাজা]। মহৎ যিনি আশয়=মহাশয় ; কিন্তু মহতের আশয়=মহাশয় [ষষ্ঠী তৎপুরুষ]। প্রিয় যে সখা=প্রিয়সখ ; পূর্ব যে রাত্রি=পূর্বরাত্র। অর্ধরাত্র, দীর্ঘরাত্র।

•কর্মধারয় সমাস প্রধানতঃ তিন প্রকারের হইয়া থাকে। যেমন : ১. সাধারণ, কর্মধারায়, ২. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ও ৩. উপমামূলক কর্মধারয়।

১. **সাধারণ কর্মধারয় :** বিশেষণ-বিশেষ্যে বা বিশেষ্য-বিশেষ্যে বা বিশেষণ-বিশেষণে যে কর্মধারয় সমাস হয়, তাহাকে **সাধারণ কর্মধারয় সমাস** বলে। [পূর্বে ইহার দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে।]

২. **মধ্যপদলোপী কর্মধারয় :** যে কর্মধারয় সমাসে ব্যাস-বাক্যের মধ্যস্থিত ব্যাখ্যানমূলক পদের লোপ হয়, তাহাকে **মধ্যপদলোপী কর্মধারয়** বলা হয়। যেমন : সিংহ 'চিহ্নিত' আসন=সিংহাসন ; ছায়া 'প্রধান' তরু=ছায়াতরু ; তেল 'মাখিবার' ধুতি=তেলধুতি ; ঘি 'মিশান' ভাত=ঘি-ভাত ; জল 'মিশ্রিত' সাগু=জলসাগু ; পল [মাংস] 'মিশ্রিত' অন্ন=পলান্ন ; সিঁদুর 'রাখিবার' কৌটা=সিঁদুর-কৌটা ; হাতে 'পরিবার' ঘড়ি=হাতঘড়ি ; পঞ্চ 'অধিক' দশ=পঞ্চদশ। উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলিতে সমস্যমান পদে ব্যাখ্যানমূলক পদের [যথা : 'চিহ্নিত', 'প্রধান', 'মিশ্রিত', 'রাখিবার', 'পরিবার', 'অধিক' ইত্যাদি] আবির্ভাব ঘটিয়াছে ; কিন্তু সমস্ত-পদগুলিতে তাহারা লুপ্ত হইয়াছে। সেইজন্য ইহারা মধ্যপদলোপী কর্মধারয়। তেমনি—ভিক্ষান্ন, একাদশ, ষোড়শ, প্রীতি-ভোজ, প্রীতি-উপহার, বৌভাত, জামাইষষ্ঠী [জামাইয়ের কল্যাণার্থ ষষ্ঠী], ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া, কাঞ্চন-কোকনদ, বরফ-জল, কব্জি-ঘড়ি, ফুলদানি, কেশ-তৈল, গন্ধতেল, ছাইদান, বাতিদান, রজত-মুদ্রা, স্বর্ণালঙ্কার, গন্ধবণিক, তালপাটালি, অগ্নিবাণ, হাঁটুজল, গৃহ-মার্জার, হাসিমুখ, জীবনবীমা [জীবন আশঙ্কায় বীমা], স্বর্ণাক্ষর, লক্ষ্মীশ্রী [লক্ষ্মীযুক্তা শ্রী], স্বর্ণাভরণ, রৌপ্যমুদ্রা, রজতচক্র, বিজয়-শঙ্খ [বিজয়-সূচক শঙ্খ], কীর্তি-মন্দির, গাড়িবারান্দা [গাড়ি রাখিবার বারান্দা], শোক-সভা [শোক-প্রকাশিকা সভা], পদ্মবেদী [পদ্ম-চিহ্নিত বেদী], মধ্যাহ্ন-ভোজন, সিন্দুর-কৌটা, মনিব্যাগ, জল-চৌকি, আলোকচিত্র, মরুভূমি, মরুদ্যান, জন্মদিবস, জন্মোৎসব, স্মৃতি-সৌধ, সূচীশিল্প, পাদটীকা, মৌমাছি, দুধ-বার্লি, ধর্মঘট [ধর্ম রক্ষার্থে ঘট], সাম্যবাদ [সাম্য-বিষয়ক বাদ], রাষ্ট্রনীতি, বরযাত্রী, সিংহদ্বার, যাদুঘর [যাদু বা পুরাকীর্তি-শোভিত ঘর], ভাইফোঁটা, স্বাধীনতা-দিবস [স্বাধীনতার স্মরণে পালনীয় দিবস], শহীদ-দিবস।

৩. **উপমামূলক কর্মধারয় :** যে কর্মধারয় সমাসে দুইটি অসম জাতীয় বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে তুলনা বা উপমার মাধ্যমে সাদৃশ্য কল্পনা করা হয়, তাহাকে **উপমামূলক কর্মধারয়** বলা হয়। উপমার চারটি অঙ্গ : ক. **উপমান**, খ. **উপমেয়**, গ. **সাধারণ ধর্ম** ও ঘ. **তুলনাবাচক শব্দ**।

ক. **উপমান**—যাহার সঙ্গে তুলনা করা হয় বা সাদৃশ্য কল্পনা করা হয়, তাহাকে **উপমান** বলা হয়। খ. **উপমেয়**—যাহাকে তুলনা করা হয় বা যাহার সাদৃশ্য কল্পনা করা হয়, তাহাকে **উপমেয়** বলা হয়। গ. **সাধারণ ধর্ম**—দুইটি অসম

জাতীয় বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে তুলনা করিতে গিয়া যে একটি বিশেষ বিষয়ে সাদৃশ্য কল্পনা করা হয়, তাহাকে **সাধারণ ধর্ম** বলা হয়। 'চাঁদের ন্যায় সুন্দর মুখ' দৃষ্টান্তটিতে 'চাঁদ' [উপমান] ও 'মুখে'র [উপমেয়] মধ্যে একটি বিষয়ে মিল আছে। উভয় বস্তুর মধ্যে সেই মিল হইল 'সুন্দর'। 'সুন্দর' সাধারণ ধর্মবাচক শব্দ। ঘ. **তুলনাবাচক শব্দ**—এই ধরনের উপমা বা তুলনায় উপমা বা তুলনাটিকে স্পষ্ট করিয়া তুলিবার জন্য একটি অব্যয় পদ ব্যবহার করা হয়। উল্লিখিত দৃষ্টান্তে 'ন্যায়' শব্দটি তুলনাবাচক শব্দ। ন্যায়, মত, মতন, সদৃশ ইত্যাদি তুলনাবাচক শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়।

উপমান, উপমেয় ও সাধারণ ধর্মের ভিত্তিতে উপমামূলক কর্মধারয় তিন প্রকারের : **উপমান কর্মধারয়, উপমিত কর্মধারয় ও রূপক কর্মধারয়।**

১. **উপমান কর্মধারয় :** উপমান পদের সহিত সাধারণ ধর্মবাচক শব্দের যে সমাস হয়, তাহাকে বলা হয় **উপমান কর্মধারয়।** যেমন : কুসুমের ন্যায় কোমল = কুসুম-কোমল। এখানে 'কুসুম' উপমান, 'কোমল' সাধারণ ধর্মবাচক শব্দ, কাজেই ইহা উপমান কর্মধারয়। তেমনি—ঘনের [মেঘের] ন্যায় শ্যাম = ঘনশ্যাম ; শশের ন্যায় ব্যস্ত = শশব্যস্ত ; তুষারের ন্যায় ধবল = তুষারধবল ; কাজলের ন্যায় কালো = কাজল-কালো ; বজ্রের ন্যায় কঠিন = বজ্রকঠিন ; হস্তীর ন্যায় মূর্খ = হস্তী-মূর্খ।

অতিরিক্ত দৃষ্টান্ত : জলদ-গম্ভীর, বক-ধার্মিক, মসীকৃষ্ণ, ইস্পাত-কঠিন, বিড়াল-তপস্বী, ভ্রমরকৃষ্ণ, কাশশুভ্র, তুষার-শুভ্র, কুন্দশুভ্র, হিমশীতল, তুষারশীতল, শিশির-স্নিগ্ধ, শৈলোন্নত, জ্যোৎস্না-ধবল, মেঘ-নীল, ঘনকালো, শোণিত-রাঙা, মেঘ-মেদুর, ভ্রূকুটি-কুটিল, স্বপ্নমধুর, অরুণ-রাঙা, দূর্বাদলশ্যাম, বজ্রগম্ভীর, শঙ্খ-ধবল, নবনীত-কোমল, নিমতিতা, মিশ্‌কালো, গোবেচারা, ফুটফাটা, দুধ-শাদা, সিন্দুর-রাঙা।

২. **উপমিত কর্মধারয় :** উপমান পদের সহিত উপমেয় পদের সমাসকে উপমিত কর্মধারয় বলা হয়। যেমন : 'মুখ' চাঁদের 'ন্যায়' = চাঁদমুখ। এখানে 'চাঁদ' উপমান, 'মুখ' উপমেয়। উপমান ও উপমেয়ের সমাস হইয়াছে। কাজেই, ইহা উপমিত কর্মধারয়। তেমনি—পুরুষ সিংহের ন্যায় = পুরুষসিংহ ; কর পল্লবের ন্যায় = করপল্লব ; আঁখি পদ্মের ন্যায় = পদ্ম-আঁখি ; লোচন পলাশের ন্যায় = পলাশ-লোচন ; চরণ কমলের ন্যায় = চরণ-কমল ; মুখ চন্দ্রের ন্যায় = মুখচন্দ্র [চন্দ্রমুখ]।

অতিরিক্ত দৃষ্টান্ত : পদপদ্ম, বাহুলতা, তনুলতা, নরশার্দূল, নরসিংহ, পুরুষ-ব্যাঘ্র, ফুলকুমারী, কর-কিশলয়, অধর-কিশলয়, অধর বিম্ব [বিম্বাধর], বাহুবল্লরী, কটিকজল, অধর-কমল, মুখ-চম্পক, সোনামুখ, হাঁড়ি-মুখ, করপল্লব, পদপল্লব, কদমছাঁট, ফুলবাবু [ফুলের মত বাবু], চন্দ্রপুলি, ওলকপি, চাঁদবদন, অধর-পল্লব, চরণ-পদ্ম, জটাজাল।

৩. **রূপক কর্মধারয় :** যে সমাসে উপমান ও উপমেয়ের সাদৃশ্য এত নিবিড় হয় যে, উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে অভেদ কল্পনা করা হয় অর্থাৎ উপমান ও উপমেয়ের ভেদাভেদ করা যায় না, তাহাকে **রূপক কর্মধারয় সমাস** বলা হয়। যেমন : মন রূপ মাঝি = মনমাঝি। এখানে 'মন' উপমেয় ও 'মাঝি' উপমান। মন ও মাঝির মধ্যে সাদৃশ্য এত নিবিড় হইয়াছে যে, দুইটি বস্তুকে

পৃথক কল্পনা করা যায় না। মনে হয়, দুই-ই এক অর্থাৎ অভিন্ন। উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে এই অভেদ-কল্পনার জন্য রূপক কর্মধারয় সমাস হইয়াছে। যেমনি—বিদ্যা রূপ আলোক=বিদ্যালোক; ক্রোধ রূপ বহ্নি=ক্রোধবহ্নি; ভব রূপ নদী=ভবনদী; মন রূপ মাঝি=মনমাঝি; প্রাণ রূপ পাখি=প্রাণপাখি; সুধা রূপ অনল=সুধানল।

অতিরিক্ত দৃষ্টান্ত: ভবসিন্ধু, ভবসাগর, দেহ-মন্দির, শোকাগ্নি, শোকসিন্ধু, শোক-সাগর, দেহ-পিঞ্জর, বিষাদ-সিন্ধু, বিদ্যারত্ন, জীবনস্রোত, মন-বিহঙ্গ, হৃদয়-সাগর, স্নেহ-সুধা, জীবনতরু, আকাশ-পট, জীবন-প্রবাহ, আকাশ-গঙ্গা, স্নেহপাশ, মরণস্রোত, বিরহ-আঁধার, গন্ধজাল, হৃদয়-পদ্ম, মনোরথ, মন-ময়ূরী, জ্ঞানবৃক্ষ, হৃদয়-আকাশ, বিদ্যাধন, চক্ষুরত্ন, কীর্তিধ্বজা, প্রেমসুধা, চরিতামৃত, কথামৃত, শান্তিবারি, যৌবন-কুসুম, বাণী-মঞ্জরী, কল্পলতা, হৃদয়-কুসুম, মাৎসর্য-বিষ, স্নেহসমুদ্র, প্রাণ-বাহিনী, মায়াডোর, দেহ-আকাশ, জীবন-উদ্যান, হৃদয়-অরণ্য, রূপ-সাগর, চিত্ত-চকোর, মন-মধুকর, দুঃখানল, মন-পবন, আঁখি-পাখি, যৌবন-বাউল, দিল-দরিয়া, মানুষ-কোকিল, জ্ঞান-বহ্নি, ধনবহ্নি, রূপবহ্নি, ধর্মবহ্নি, ইন্দ্রিয়বহ্নি, সংসার-কানন, জ্ঞানালোক, সংসার-সাগর, কালস্রোত, কালচক্র, *কালসাপ, জীবন-তরী, হৃৎপদ্ম, সভ্যতা-নাগিনী, জ্ঞান-বর্তিকা, সমাজ-সৌধ, ভাব-বিগ্রহ, দেশ-মাতৃকা, বাদল-বাউল।

বিশিষ্ট প্রয়োগ: 'জনগণে যারা জোঁকসম শোষে তারে **মহাজন** কয়।' পাখতুনরা আজ **স্বায়ত্ত-শাসন** লাভের জন্য সংগ্রাম করিতেছে। তাঁহার উপন্যাসের **পাণ্ডুলিপি** হারাইয়া গিয়াছে। **রাজর্ষি** জনক রামচন্দ্রের হাতে সীতাকে সম্প্রদান করিলেন। 'কেতকী-কেশরে **কেশপাশ** করো সুরভি।' '**নৃপশিশু** নতশিরে বসি রহে নদীতীরে।' '**স্নিগ্ধোজ্জ্বল** শ্যামকান্তি তবু তব অমৃত-পরশা।' 'বাংলার রবি জয়দেব কবি **কান্ত-কোমল** পদে করেছে সুরভি সংস্কৃতের **কাঞ্চন-কোকনদে**।' তিনি **শশব্যস্ত** হইয়া স্থানটি পরিত্যাগ করিলেন। 'হে **মহামানব**, একবার এসো ফিরে।' **বৌভাতের প্রীতি-ভোজে** শুধু **প্রীতি-উপহারেরই** ভিড়। **আলোক-চিত্রের** প্রদর্শনী ছিল মেলার একটি আকর্ষণ। পনেরই আগস্ট ভারতের **স্বাধীনতা-দিবস**। **শহীদ-দিবসে** আমরা সেই অমর আত্মাগুলিকে অন্তরে স্মরণ করি। **তুষার-ধবল** আকাশে যেন জ্যোৎস্নার বান ডাকিয়াছে। '**জলদ-গম্ভীর** স্বরে কহিলা সৌমিত্রি।' গায়ে নামাবলী দেখে ভুলে যেও না, আসলে উনি একটি **বক-ধার্মিক**। তাঁহার হৃদয় ছিল যেমন **ইস্পাত-কঠিন**, অন্যদিকে তেমনি **কুসুম-কোমল**। '**জীবন-প্রবাহ** বহি' **কালসিন্ধু** পানে ধায়, ফিরাব কেমনে?' **মন-মাঝি** তোর বৈঠা নে রে।' 'দেখিবারে **আঁখি-পাখি** ধায়।'

বি. দ্র.: উপমিত কর্মধারয় ও রূপক কর্মধারয়ের মধ্যে পার্থক্যটি অতি সূক্ষ্ম। রূপক কর্মধারয়ে সাদৃশ্যটি অত্যন্ত নিবিড়, উপমিত কর্মধারয়ে সাদৃশ্যটি তেমন নিবিড় নয়। উপমিত কর্মধারয়ে উপমেয়ের প্রাধান্য: কিন্তু রূপক কর্মধারয়ে উপমানেরই প্রাধান্য। উপমিত কর্মধারয়ে দুইটি পদই বস্তুবাচক; কিন্তু রূপক কর্মধারয়ে একটি পদ ভাববাচক, অন্যটি বস্তুবাচক। যেমন: উপমিত কর্মধারয়—বিকশিত বিশ্ব-বাসনার অরবিন্দ-মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার। উপমেয়—'পাদ'। ক্রিয়াপদটি উপমেয়ের অনুগামী। রূপক কর্মধারয়—দেখিবারে 'আঁখি-পাখি' ধায়। উপমান—'পাখি'। ক্রিয়াপদটি উপমানের অনুগামী।

৪. দ্বিগু সমাস

দ্বিগু সমাসও তৎপুরুষ সমাসেরই প্রকার-ভেদ মাত্র।

যে তৎপুরুষ সমাসের পূর্বপদে সংখ্যাবাচক বিশেষণ বসিয়া সমাহার বা সমষ্টি বুঝায় এবং পরপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাকে **দ্বিগু সমাস** বলা হয়। দ্বিগু সমাসেও তৎপুরুষ সমাসের মতো পরপদেরই প্রাধান্য। যেমন: পঞ্চ বটের সমাহার = পঞ্চবটী। 'পঞ্চ' এই পূর্বপদটি সংখ্যাবাচক বিশেষণ। ইহার দ্বারা সমাহার বা সমষ্টি বুঝাইতেছে এবং 'বট' এই পরপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। অতএব এই দৃষ্টান্তটি সমাহার **দ্বিগু সমাসের**। তেমনি— সপ্ত অহের সমাহার = সপ্তাহ; শত অব্দের সমাহার = শতাব্দী; নব রত্নের সমাহার = নবরত্ন; পঞ্চ নদের [নদীর] সমাহার = পঞ্চনদ [পঞ্চনদী]। তেমনি—ত্রিজগৎ, ত্রিফলা, চতুষ্পদ, পঞ্চভূত, দ্বিপ্রহর, ত্রিসন্ধ্যা, ত্রিযামা, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, পঞ্চরাত্রি, পঞ্চদুর্গা, নবদুর্গা, সপ্তর্ষি, ত্রিবেণী, দশচক্র, ত্রিচক্র [যান], ত্রিভুবন, চতুষ্পর্ণা, পঞ্চপ্রদীপ, বারমাস্যা [বারমাসী], চৌপদী, ষড়রিপু, ষড়ঋতু, অষ্টধাতু, পঞ্চামৃত, পঞ্জাব, ষড়ধাতু, ষট্‌পদী, অষ্টবসু, নবগ্রহ, চতুরঙ্গ, সপ্তসিন্ধু, দশদিগন্ত, চতুর্দশপদী, ত্রিমূর্তি, সপ্তরথী, শতবার্ষিকী, পঞ্চবার্ষিকী, অষ্টাঙ্গ, ষোড়শোপচার।

অতিরিক্ত বাংলা দৃষ্টান্ত: পাঁচকড়ি, তিনকড়ি, সাতকড়ি, সাতঘাট, পাঁচশালা, দশসালা, তেমাথা, চৌমাথা, চৌরঙ্গী, চৌরাস্তা, তেপায়া, পাঁচফোড়ন, দুয়ানি, দুবেলা, দোচালা, দোপাটা, তেপান্তর [প্রান্তর], দুপুর, ত্রিতাল, চৌতাল, চৌদিক, চৌপর, চারতলা, চারদিক, চৌপায়া, সাতসমুদ্র, তেরনদী, তে-মোহনা, তে-রাত্তির, সেতার, দোতারা, দোয়াব, দোটানা, দোনলা, দোহারা, সাতকাণ্ড, সাতখুন, সাতনরী, দুকূল।

বিশিষ্ট প্রয়োগ: 'শত **শতাব্দী** ভাঙেনি যে হাড়, সেই হাড়ে ওঠে গান।' 'আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে, দৈবে হতেম দশম রত্ন **নবরত্নের** মালে।' '**পঞ্চনদীর** তীরে বেণী পাকাইয়া শিরে দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে জাগিয়া উঠিল শিখ।' যামিনী **ত্রিযামা**; আকাশে দৈববাণী শ্রুত হইল। **দশচক্রে** ভগবান ভূত। 'আমাদের সেনা যুদ্ধ করেছে সজ্জিত **চতুরঙ্গে**।' '**সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত** মাতাও যে ঝংকারে।' ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দে রবীন্দ্র-জন্ম-**শতবার্ষিকী** অনুষ্ঠিত হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে **সপ্তরথী** বালক অভিমন্যুকে বধ করিয়া ক্ষাত্রবীর্যকে কলঙ্কিত করিয়াছিল। ছোট-রানীর গলায় ছিল **সাতনরী** হার। 'হাটের **দোচালা** মুদিল নয়ান।' 'পিরাণ **দোপাটা** দিতে করে টানাটানি।' 'কটিতে ছিল নীল **দুকূল**, মালতী-মালা মাথে।' 'শ্মশানের বুকে আমরা রোপণ করেছি **পঞ্চবটী**।'

৫. বহুব্রীহি সমাস

যে সমাসে পূর্বপদ বা পরপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান না হইয়া তৃতীয় একটি অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাকে **বহুব্রীহি সমাস** বলা হয়। যেমন: নীল কণ্ঠে যাহার = নীলকণ্ঠ। পূর্বপদটি 'নীল' অর্থাৎ বিষ, পরপদটি

'কণ্ঠ'। সমাসবদ্ধ পদটিতে নীল বা বিষ কিংবা কণ্ঠ কাহাকেও বুঝাইতেছে না; যাহার কণ্ঠে বিষ থাকে অর্থাৎ 'শিব'কে বুঝাইতেছে। অতএব দৃষ্টান্তটি বহুব্রীহি সমাসের।

বহুব্রীহি সমাস কয়েক প্রকারের হয়। যেমন: ১. সমানাধিকরণ বহুব্রীহি, ২. ব্যধিকরণ বহুব্রীহি, ৩. ব্যতিহার বহুব্রীহি, ৪. মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি, ৫. অলুক্ বহুব্রীহি ও ৬. নঞর্থক বহুব্রীহি।

১. সমানাধিকরণ বহুব্রীহি: যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদ বিশেষণ ও পরপদ বিশেষ্য, তাহাকে **সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস** বলা হয়। যেমন: পীত অম্বর যাহার=পীতাম্বর; পুণ্য শ্লোক [যশঃ] যাহার=পুণ্যশ্লোক; পোড়া মুখ যাহার=মুখপোড়া; পক্ব কেশ যাহার=পক্বকেশ; প্রোষিত [প্রবাসী] ভর্তা [স্বামী] যাহার [স্ত্রী]=প্রোষিতভর্তৃকা ইত্যাদি। তেমনি—দুর্গোৎসাহ, হর্যক্ষ [হরি অর্থাৎ পিঙ্গল বর্ণ অক্ষি যাহার], ছিন্নতন্ত্রী, রক্তাম্বরা, মস্তিচ্ছন্ন, শ্বেতাম্বরা, মধ্যবিত্ত, উর্ধ্ববাহু, আজানুলম্বিতবাহু, শুদ্ধচিত্ত, চরিতার্থ [চরিত অর্থ যাহার], মন্দভাগ্য, হতভাগ্য, হতবুদ্ধি, কৃতাঞ্জলি, জিতেন্দ্রিয়, কৃতবিদ্য [কৃত বিদ্যা যাহার], বিগতশ্রী, শুদ্ধসত্ত্ব, সুহৃদ্, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, বিশালাক্ষী, দশভুজা, ত্রিনয়নী, মহাপ্রাণ [মহান্ প্রাণ যাহার], প্রোষিতভার্য [প্রোষিতা ভার্যা যাহার], বিবিধ [বি অর্থাৎ বহু বিধা অর্থাৎ প্রকার যাহার], অপরূপ [অপ অর্থাৎ বিচিত্র], ছিন্নমূল, হীনপ্রভা, বিগত-যৌবন, স্বচ্ছসলিলা, কুবের [কু অর্থাৎ কুৎসিত বের অর্থাৎ দেহ], নীল-বাসনা, নীল-নয়না, প্রসন্ন-সলিলা, রক্ত-আঁখি, শ্যামাঙ্গী, লাল-পেড়ে, মিহিদানা, মধ্যবয়সী, দশানন, দীর্ঘকায়, কৃতার্থ, নতশির, উচ্চশির, সিদ্ধকাম, সিদ্ধহস্ত, পঞ্চানন, ত্রিলোচন, বদমেজাজী, খোশমেজাজী, কালোবরণ, অকৃতকার্য, সুধী, করিতকর্মা, তীক্ষ্নবুদ্ধি, ছন্নমতি, কদাকার ['কু'স্থানে 'কদ্' আদেশ], স্বল্পায়ু, নষ্টকীর্তি, লব্ধ-প্রতিষ্ঠ, সমবয়সী, দীর্ঘদেহী, ন্যুব্জপৃষ্ঠ, বাসন্তী-দুকূলা, একরোখা, একগুঁয়ে, দোমনা, সবশাস্ত্র [সবশ অস্ত্র যাহার], কালোপেড়ে।

সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাসে কখনও কখনও বিশেষ্য পদটি পূর্বে এবং বিশেষণ পদটি পরে বসে। যেমন: পেটমোটা, রাশভারি, বিলাসপ্রিয়, ভূষণ-প্রিয়া।

অনেক সময় সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদটি বিশেষ্য হইয়াও বিশেষণ-স্থানীয়রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। যেমন: শশী ভূষণ যাহার=শশীভূষণ; ফণী ভূষণ যাহার=ফণিভূষণ; অহি ভূষণ যাহার=অহিভূষণ; কৃত্তি [বাঘের ছাল] বাস যাহার=কৃত্তিবাস, ভূতগণের নাথ যিনি=ভূতনাথ; মেঘ বাহন যাহার=মেঘবাহন; নদী মাতা যাহার=নদীমাতৃক; বিশ্ব মিত্র যাহার=বিশ্বামিত্র। তেমনি—দিগম্বর, কৃষিমাতৃক [কৃষি মাতা যাহার], দিগ্বসনা, বিভূতিভূষণ, পদ্মাসনা।

স্মরণীয়: ঈ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ পূর্বপদ থাকিলে সমাসবদ্ধ পদটিতে ঈ-কার ই-কার হয়। আবার 'দাস' শব্দ যোগেও 'কালী', 'দেবী' ও 'ষষ্ঠী' শব্দের দীর্ঘ-ঈ হ্রস্ব-ই হয়। যেমন: কালিদাস [কিন্তু কালীপদ, কালীচরণ], দেবিদাস [কিন্তু দেবীচরণ, দেবীপদ, দেবীপ্রসাদ]; ষষ্ঠিদাস [কিন্তু ষষ্ঠীচরণ, ষষ্ঠীকান্ত]। কেবলমাত্র 'চণ্ডীদাস' ও 'চণ্ডিদাস' উভয় রূপই প্রচলিত।

৩. **ব্যধিকরণ বহুব্রীহি :** যে বহুব্রীহি সমাসে [illegible] তাহাদের মধ্যে একটি পদ [অধিকরণ] সপ্তমী-বিভক্তিযুক্ত, তাহাকে **ব্যধিকরণ বহুব্রীহি সমাস** বলা হয়। যেমন : চন্দ্র শেখরে যাহার = চন্দ্রশেখর। এখানে পূর্বপদ 'চন্দ্র', পরপদ 'শেখরে'—উভয় পদই বিশেষ্য ; কিন্তু পরপদে সপ্তমী বিভক্তির চিহ্ন 'এ' যুক্ত রহিয়াছে এবং সমস্তপদ 'চন্দ্রশেখর' শিবকে বুঝাইতেছে। দৃষ্টান্তটি ব্যধিকরণ বহুব্রীহি সমাসের। তেমনি—খড়্গ হস্তে যাহার = খড়্গহস্ত ; শূল পাণিতে যাহার = শূলপাণি ; বীণা পাণিতে যাহার = বীণাপাণি ; পদ্ম নাভিতে যাহার = পদ্মনাভ ; ডমরু পাণিতে যাহার = ডমরুপাণি ; নীল কণ্ঠে যাহার = নীলকণ্ঠ ইত্যাদি। তেমনি—রত্নগর্ভা, মকরচূড়, চন্দ্রচূড়, শ্রীকণ্ঠ, শ্রীনিবাস, বজ্রপাণি, শশিশেখর, শশাঙ্ক, ঊর্ণনাভ [ঊর্ণা নাভিতে যাহার], আশীবিষ [আশীতে অর্থাৎ দাঁতে বিষ যাহার], ক্ষণজন্মা, পাপমতি, অন্তমনস্ক, অন্তমনা, কৃতান্ত, হিরণ্যগর্ভ, পিনাকপাণি, ধর্মবুদ্ধি, বিয়োগান্ত, সত্যসন্ধ, শিরস্ত্র, সূর্যমুখী, গাণ্ডীবধন্বা, পুষ্পধনু।

ব্যতিহার বহুব্রীহি : পরস্পর-সাপেক্ষ ক্রিয়া বা পরস্পর ক্রিয়া-বুঝাইতে যে বহুব্রীহি সমাসে একই পদ দ্বিত্ব হইয়া পূর্বপদ ও পরপদরূপে বসে, তাহাকে **ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস** বলে। যেমন : লাঠিতে লাঠিতে যে যুদ্ধ = লাঠালাঠি ; কানে কানে যে কথা = কানাকানি ; ঘুষিতে ঘুষিতে যে যুদ্ধ = ঘুষাঘুষি ; হাতে হাতে যে যুদ্ধ = হাতাহাতি ; কোলে কোলে যে মিল = কোলাকুলি। তেমনি—গলাগলি, দলাদলি, গালাগালি, কেশাকেশি, চুলোচুলি, মারামারি, টানাটানি, ধস্তাধস্তি, হাঁকাহাঁকি, বকাবকি, কষাকষি, রক্তারক্তি, টানাটানি, রেষারেষি, ভাগাভাগি, দেখাদেখি, নখানখি, হানাহানি, চোখাচোখি, তর্কাতর্কি, ফাটাফাটি, খুনাখুনি, কড়াকড়ি, গুঁতাগুঁতি, ঘেষাঘেষি।

৪. **মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি :** যে বহুব্রীহি সমাসে ব্যাসবাক্যের ব্যাখ্যানমূলক মধ্যবর্তী পদটির লোপ হয়, তাহাকে **মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস** বলা হয়। ইহার অন্য নাম **উপমান পূর্বপদ বহুব্রীহি** বা **উপমাত্মক বহুব্রীহি**। যেমন : মৃগের নয়নের ন্যায় নয়ন যাহার = মৃগনয়না। এখানে ব্যাসবাক্যের উপমাত্মক ব্যাখ্যানমূলক পদটির লোপ হইয়াছে। কাজেই, এই দৃষ্টান্তটি **মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি** বা **উপমান পূর্বপদ বহুব্রীহি** বা **উপমাত্মক বহুব্রীহি** সমাসের। স্বর্ণের আভার ন্যায় আভা যাহার = স্বর্ণাভ ; চন্দ্রের ন্যায় বদন যাহার = চন্দ্রবদনা ; এণ'র অক্ষির ন্যায় অক্ষি যাহার = এণাক্ষী ; মীনের অক্ষির ন্যায় অক্ষি যাহার = মীনাক্ষী ; খঞ্জনের নয়নের ন্যায় নয়ন যাহার = খঞ্জন-নয়না ইত্যাদি। তেমনি—পদ্মমুখী, অশ্রুমুখী, বিড়ালাক্ষী, বিধুমুখী, কপোতাক্ষ, কমলাক্ষ, বিম্বাধরা, কম্বুকণ্ঠ, ক্ষুরধার, শ্বাপদ [শ্বা অর্থাৎ কুকুরের ন্যায় পদ যাহার], পদ্মগন্ধী, কুম্ভকর্ণ, শূর্পনখা, কর্ণামৃত [কর্ণে অমৃতের ন্যায় যাহা], মেঘবরণ, তড়িতবরণী, হরিণনয়নী, গোমড়ামুখো, ডাকাবুকো [ডাকের বুকের মতো বুক যাহার]।

৫. **অলুক্ বহুব্রীহি :** যে বহুব্রীহি সমাসে বিভক্তির লোপ হয় না, তাহাকে **অলুক্ বহুব্রীহি সমাস** বলা হয়। যেমন : গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে =গায়েহলুদ। এখানে 'গায়ে' শব্দের সপ্তমী বিভক্তি সমস্তপদে লুপ্ত হয় নাই। কাজেই, ইহা **অলুক্ বহুব্রীহি সমাসের** দৃষ্টান্ত। মতান্তরে ইহা **অনুষ্ঠানবাচক বহুব্রীহিও**। হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে=হাতেখড়ি ; মুখে ভাত দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে=মুখেভাত ; হরির উদ্দেশে লুঠ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে=হরির লুঠ।

৬ **নঞর্থক বহুব্রীহি :** যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদ নঞর্থক বা নিষেধার্থক অব্যয়, তাহাকে **নঞর্থক বহুব্রীহি সমাস** বলা হয়। যেমন : নাই ভুল যাহাতে =নির্ভুল। এখানে পূর্বপদ নঞর্থক বা নিষেধার্থক অব্যয়। এবং সেই অব্যয়ের অর্থ বা পরপদের অর্থ প্রধান না হইয়া তৃতীয় একটি পদের অর্থ [নির্ভুল বস্তু] প্রধানরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। কাজেই, দৃষ্টান্তটি **নঞর্থক বহুব্রীহি সমাসের**। তেমনি— নাই পরোয়া যাহার=বেপরোয়া , নাই নাড়ীজ্ঞান যাহার=আনাড়ী ; নাই ইমান যাহার=বেইমান , নাই জল যাহাতে=নির্জলা। তেমনি—অবুঝ, নির্বোধ, নিরহঙ্কার, নিরপরাধ, বেকার, বেইজ্জত, নির্ভীক, নির্ধন, বেহায়া [নাই হায়া অর্থাৎ লজ্জা যাহার], অজ্ঞান, অনাদি, নিরুপায়, নির্বাক্, নিষ্পাপ, নিস্তরঙ্গ, নির্মল, নিরুপদ্রব, নিঃসহায়, বেহুঁশ, বেসুরো, নিষ্কলুষ, নীরব, অপয়া [নাই পয় যাহার], নির্লজ্জ, নিরপেক্ষ, অসীম, অপদার্থ, নিঃশঙ্ক, অতল, নির্দয়, নির্মম [নাই মমতা যাহার], বেতার [নাই তার যাহাতে], বেয়াদপ, নীরন্ধ্র, নিশ্চিন্ত, নীরস, অপুত্রক।

সহার্থক বহুব্রীহি : সহার্থক পদের সহিত বিশেষ্য পদের যে বহুব্রীহি সমাস হয়, তাহাকে সহার্থক বহুব্রীহি সমাস বলা হয়। যেমন : সস্ত্রীক [স্ত্রীর সহিত বর্তমান], সপত্নীক, সপুত্র, সবান্ধব, সশিষ্য, সপরিবার, সযত্ন, সাদর, সপ্রীতি, সবিনয়, সশ্রদ্ধ, সস্নেহ, সাড়ম্বর, সোৎসাহ, সদর্প, সাহংকার, সফল, সার্থক, সজল, সকরুণ, সাকার, সাগ্নিক, সকৌতুক, সলজ্জ, সনাথ, সবল, সতর্ক, সতেজ, সসাগরা, সবিরাম, সশস্ত্র, সশঙ্ক, সভয়, সক্রিয়, সদয়, সহর্ষ, সবাক্, সধবা, সাবলীল, সফল, সসম্মান, সহৃদয়, সগোত্র, সস্বর, সশব্দ, সক্রিয়, সলীল, সতীর্থ [সমান বা একই তীর্থ বা গুরু যাহার], সপত্নী [সমান বা একই পতি যাহার—স্ত্রী লিঙ্গে], সখেদ, সবেগ, সমান [মানের সহিত বর্তমান], সভক্তি, সজোর, সহিত, সকল, সশরীর, সার্থ [অর্থের সহিত বর্তমান]।*

বহুব্রীহি সমাসের অতিরিক্ত দৃষ্টান্ত : মৃতভর্তৃকা, বিপত্নীক [বিগত হইয়াছে পত্নী যাহার], প্রোষিতপত্নীক, বিধবা [বিগত হইয়াছে ধব অর্থাৎ স্বামী যাহার], বিয়োগান্ত, মিলনান্ত, সমকক্ষ, কান্তকুব্জ, অষ্টাবক্র, কৃষিপ্রধান, জনবিরল, রূপবান্, প্রাপ্তবয়স্ক, বহুসংখ্যক, অন্তরীপ, দ্বীপ, দেশবন্ধু, সোদর, সহোদর, অবাক্, অদ্বিতীয়া, সমবয়সী, অল্পবয়স্ক, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, বীতশ্রদ্ধ, দ্বিরদ [রদ=দাঁত]।

* উত্তরপদ বিশেষণ হইলে সহার্থক বহুব্রীহি হইবে না। অবশ্য সেরূপ শব্দের প্রয়োগ প্রচুর। কিন্তু ইহারা অশুদ্ধ। যেমন : সশঙ্কিত, সচকিত, সকাতর, সলজ্জিত, সকৃতজ্ঞ, সঠিক সাশঙ্কিত ইত্যাদি।

বহুব্রীহি সমাসের কতকগুলি স্মরণীয় নিয়ম :

১. 'সহ' শব্দের স্থানে 'স' হয় : বাক্যের সহিত বর্তমান=সবাক্। সহ [সমান] উদর যাহার=সোদর বা সহোদর, সমান ধর্ম যাহার=সধর্মা।

২. 'অক্ষি' শব্দের স্থানে 'অক্ষ', 'ধনুস্' শব্দের স্থানে 'ধন্বন্' [ধন্বা] এবং 'নাভি' শব্দের স্থানে 'নাভ' হয়। যেমন : বিশালাক্ষ, গাণ্ডীবধন্বা, ঊর্ণনাভ ইত্যাদি।

৩. ঈ-কারান্ত শব্দের উত্তর, নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের উত্তর এবং 'উরস্' শব্দের উত্তর 'ক' হয়। যেমন : নদীমাতৃক, সস্ত্রীক, নিরর্থক, বিশালউরস্ক ইত্যাদি।

৪. কতকগুলি শব্দের উত্তর বিকল্পে 'ক' হয়। যেমন : অল্পবয়স্ক, প্রাপ্তবয়স্ক, বহুসংখ্যক ইত্যাদি।

৫. 'ধর্ম' শব্দের উত্তর 'অন্' [আ] হয়। যেমন : সমান ধর্ম যাহার=সমানধর্মা বা সধর্মা। তেমনি : বিধর্মা [বিধর্মী—বিকল্পে], সুধর্মা।

৬. 'গন্ধ' শব্দের উত্তর বিশেষ অর্থে 'ই' হয়। যেমন : সু [শোভন] গন্ধ যাহার=সুগন্ধি। তেমনি : পদ্মগন্ধি, চন্দনগন্ধি।

৭. 'সম', 'দ্বি', 'অন্তর' শব্দের পর 'অপ্' 'ঈপ্' হয়। যেমন : সমীপ, দ্বীপ, অন্তরীপ।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম জানে না, এমন বাঙালী ক'জন আছে ? কোমলতাই **নদীমাতৃক** বাংলাদেশের স্বভাব-ধর্ম। আজ বাঙালী **মধ্যবিত্ত** সমাজ চরম অবক্ষয়ের সম্মুখীন। আমার আকাঙ্ক্ষা কি **চরিতার্থ** হইবে না ? ঠাকুর-পরিবারের সকল সন্তানই ছিলেন **কৃতবিদ্য**, খ্যাতিমান্। তাহার মতো **হতভাগ্য** এ পৃথিবীতে আর কেহ নাই। পল্লী-বাংলা আজ দীনা, মলিনা, **বিগতশ্রী**। বর্তমানের **মিহিদানা** বিখ্যাত। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান বহু মারণাস্ত্রের আবিষ্ক্রিয়ায় আজ **সিদ্ধকাম**। সুভাষচন্দ্রের পিতা জানকীনাথ ছিলেন কটকের **লব্ধ-প্রতিষ্ঠ** আইন-ব্যবসায়ী। ভারত আজ তাহার সমস্ত কিছু হারাইয়া একেবারে **সর্বস্বান্ত**। 'আয় রে পাখি **লেজঝোলা**।' '**কৃত্তিবাস কীর্তিবাস** কবি।' '**নীলকণ্ঠ** করেছেন পৃথ্বীরে নির্বিষ।' 'কী যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে কভু **আশীবিষে** দংশেনি যারে ?' নেতাজী সুভাষচন্দ্র ছিলেন **ক্ষণজন্মা** মহানায়ক। 'মাল-**চেনাচেনি**' দর-**জানাজানি**, কানাকড়ি নিয়ে কত **টানাটানি**, **হানাহানি** করে কেউ নিল ভরে, কেউ গেল খালি ফিরে।' 'লাগিবে না তাহে বাহুবল কিবা জাগিবে না **দ্বেষাদ্বেষি**।' '**বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী** মুখে গন্ধ ছুটে।' 'কিম্বা **বিম্বাধরা** রমা অম্বুরাশি-তলে।' তার মতো **বেইমান**, **বেহায়া** আর **বেপরোয়া** মানুষ আমি আর দেখিনি। মেঘ **প্রোষিতভর্তৃকা** যক্ষপ্রিয়ার নিকট বিরহের বাণী বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল।

৬. অব্যয়ীভাব সমাস

যে সমাসের পূর্বপদে অব্যয় থাকে এবং অব্যয়ের **অর্থই প্রধানরূপে** প্রতীয়মান হয়, তাহাকে বলা হয় **অব্যয়ীভাব সমাস**। অব্যয়ীভাব সমাসে পূর্বপদ অর্থাৎ অব্যয় পদেরই অর্থের প্রাধান্য। যেমন : ভিক্ষার অভাব=দুর্ভিক্ষ

এখানে পূর্বপদ [দুর্] অব্যয়, তাহার অর্থ [অভাব]-ই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। অভাব, সামীপ্য, ব্যাপ্তি [বীপ্সা, পুনঃপুনঃ], অনতিক্রম, পর্যন্ত [সীমা], সাদৃশ্য, যোগ্যতা, পশ্চাৎ, বৈপরীত্য, ক্ষুদ্রতা, সাকল্য ইত্যাদির অর্থে **অব্যয়ীভাব সমাস** হয়। যেমন: **অভাব**—ভিক্ষার অভাব=দুর্ভিক্ষ; ভাতের অভাব=হা-ভাত; ঘরের অভাব=হা-ঘর; বন্দোবস্তের অভাব=বে-বন্দোবস্ত; মিলের অভাব=অমিল বা গরমিল; বিঘ্নের অভাব=নির্বিঘ্ন; ব্যবস্থার অভাব=অব্যবস্থা; কায়দার অভাব=বেকায়দা; আমিষের অভাব=নিরামিষ; মক্ষিকার অভাব=নির্মক্ষিক। তেমনি—বেমানান, নির্ঝঞ্ঝাট, আলুনি, বেকসুর, বেজায় [জায় বা হিসাবের অভাব]। **সামীপ্য**—কূলের সমীপে=উপকূল, নগরীর সমীপে=উপনগরী, কণ্ঠের সমীপে=উপকণ্ঠ, অক্ষির সমীপে=সমক্ষ, সন্ধ্যার কাছাকাছি=সন্ধ্যা-নাগাদ, গোদাবরীর সমীপে=অনুগোদ। তেমনি—অনুগঙ্গ, অনুবাত। **ব্যাপ্তি** [অবধি, বীপ্সা, পুনঃপুনঃ]—জন্ম হইতে=আজন্ম; শৈশব হইতে=আশৈশব; বাল্য হইতে=আবাল্য; দিন দিন=প্রতিদিন; রোজ রোজ=হররোজ; বছর বছর=ফি-বছর; সন সন=ফি-সন। তেমনি=প্রতিক্ষণ, অনুক্ষণ, প্রতিগৃহ, প্রতিমণ, জনপিছু, মাথাপিছু, জনপ্রতি, দিনভর, মাঠকে-মাঠ, জনকে-জন, গ্রামকে-গ্রাম, দিনকে-দিন, প্রত্যেক, প্রত্যহ, প্রত্যক্ষ, প্রতিবার, ফি-বছর, প্রতিজন। **অনতিক্রম**—শক্তিকে অতিক্রম না করিয়া=যথাশক্তি; উচিতকে অতিক্রম না করিয়া=যথোচিত; যথাবিধি, যথারীতি, যথেচ্ছ; অর্থকে অতিক্রম না করিয়া=যথার্থ, সাধ্যকে অতিক্রম না করিয়া=যথাসাধ্য; ইষ্টকে অতিক্রম না করিয়া=যথেষ্ট; তেমনি—যথাযোগ্য, যথাসত্য, যথাপূর্ব, সাধ্যমতো, রীতিমতো, ইচ্ছামতো, নিয়মমাফিক। **পর্যন্ত**—সমুদ্র পর্যন্ত=আসমুদ্র; সমুদ্র হইতে হিমাচল পর্যন্ত=আসমুদ্রহিমাচল; জীবন পর্যন্ত=আজীবন; ব্রহ্ম পর্যন্ত=আব্রহ্ম; [ব্রহ্ম হইতে স্তম্ব পর্যন্ত=আব্রহ্মস্তম্ব], কণ্ঠ পর্যন্ত=আকণ্ঠ। তেমনি—আজানু, আমরণ, আপাদমস্তক, আমূল, আকর্ণ। **সাদৃশ্য**—বনের সদৃশ=উপবন; নদীর সদৃশ=উপনদী; কথার সদৃশ=উপকথা; দেবতার সদৃশ=উপদেবতা; আচার্যের সদৃশ=উপাচার্য। তেমনি—উপাধ্যক্ষ, প্রতিমূর্তি, প্রতিধ্বনি, প্রতিরূপ, প্রতিলিপি, উপদ্বীপ, উপগ্রহ, উপসাগর, উপবিভাগ, উপমন্ত্রী, উপরাষ্ট্রপতি, বিমাতা। **যোগ্যতা**—রূপের যোগ্য=অনুরূপ; কূলের যোগ্য=অনুকূল; প্রেরণার যোগ্য=অনুপ্রেরণা। তেমনি—অনুভাব, অনুধ্যান। **পশ্চাৎ**—গমনের পশ্চাৎ=অনুগমন; সরণের পশ্চাৎ=অনুসরণ; ধাবনের পশ্চাৎ=অনুধাবন। তেমনি—অনুশোচনা, অনুতাপ, অনুক্রম, অনুরণন, অনুরাধা, অনুদৈর্ঘ্য, উপেন্দ্র, অনুপূর্ব, অনুনাদ, অনুস্বার। **বৈপরীত্য**—দানের বিপরীত=প্রতিদান; ফলের বিপরীত=প্রতিফল; কূলের বিপরীত=প্রতিকূল। তেমনি—প্রতিহিংসা, প্রতিপক্ষ, প্রতিশোধ। **ক্ষুদ্রতা**—ক্ষুদ্র গ্রহ=উপগ্রহ; ক্ষুদ্র অঙ্গ=প্রত্যঙ্গ। **সাকল্য**—বাল, বৃদ্ধ ও বনিতা সকলে=আবালবৃদ্ধবনিতা; পামর, জনসাধারণ সকলেই=আপামর-জনসাধারণ; দ্বিজ চণ্ডাল সকলেই=আদ্বিজচণ্ডাল। **বিভক্তির অর্থে**—উষায়=প্রত্যূষ; অক্ষির সমীপ=প্রত্যক্ষ;

আত্মাকে অধি=অধ্যাত্ম; দৈবকে অধি=অধিদৈব; ভূতকে অধি=অধিভূত; দক্ষিণকে প্রগত=প্রদক্ষিণ; অক্ষির অগোচর=পরোক্ষ।

বিশিষ্ট প্রয়োগ: 'দূর হবে **দুর্ভিক্ষের** ক্ষুধা।' শুভ কার্য **নির্বিঘ্নে** সমাধা হইল। **আশৈশব** যিনি পরম সুখে প্রতিপালিত, তিনি এ দুঃখ কেমন করিয়া সহ্য করিবেন? 'নৌকা **ফি-সন** ডুবিছে ভীষণ।' সে তাহার কৃতকার্যের **যথোচিত** পারিশ্রমিক পাইয়াছিল। প্রতিকার না হইলে তিনি **আমরণ** অনশন করিবেন। 'সাগর জলে সিনান করি সজল এলোচুলে বসিয়াছিলে উপল-**উপকূলে**।' 'চলিলে সাথে, হাসলে **অনুকূল**।' 'সহসা বায়ু বহিল **প্রতিকূলে**।' 'ভারতের মৃত্তিকা আমার শৈশবের শিশুশয্যা, যৌবনের **উপবন**, আমার বার্ধক্যের বারাণসী।' 'নমি আমি প্রতিজনে **আদ্বিজচণ্ডাল**।' 'ধ্বনিটিরে **প্রতিধ্বনি** সদা ব্যঙ্গ করে।'

সমাসান্ত প্রত্যয়: সমাস সংঘটিত হইবার পর সমস্তপদে সমাসেরই অঙ্গ হিসাবে যে প্রত্যয় অর্থের কোনরূপ রূপান্তর সাধন না করিয়া তদ্ধিতের ন্যায় যুক্ত হয়, তাহাকে সমাসান্ত প্রত্যয় বলে। যেমন: পথের রাজা=রাজপথ [অ]; এক-রোখা [আ]; সুগন্ধি [ই]; শত অব্দের সমাহার=শতাব্দী [ঈ]; ঘরের অভাব যাহার=হা-ঘরে [এ]; ঘরের দিকে মুখ যাহার=ঘরমুখো [ও]; বিপত্নীক [ক]।

নিত্য সমাস

যে সমাসে সমস্যমান পদগুলির দ্বারা ব্যাসবাক্য হয় না, ব্যাসবাক্য গঠনের জন্য অন্য পদের প্রয়োজন হয়, তাহাকে **নিত্য সমাস** বলে। যেমন: অন্য ভাষা=ভাষান্তর; অন্য মনু=মন্বন্তর; অন্য গতি=গত্যন্তর; অন্য গ্রাম=গ্রামান্তর। তেমনি—দেশান্তর, উপায়ান্তর, দিগন্তর, মাসান্তর, ধর্মান্তর, দিনান্তর, দৃষ্টান্তর, লোকান্তর, জন্মান্তর, পাঠান্তর, প্রকারান্তর, বারান্তর, যুগান্তর, ভাবান্তর, মতান্তর, প্রসঙ্গান্তর, বিষয়ান্তর, জলমাত্র, দর্শনমাত্র, দেখামাত্র, নামমাত্র ইত্যাদি।

অলুক্ সমাসের মতো নিত্য সমাসও কোন স্বতন্ত্র সমাস নয়।

● **সমাসজনিত অর্থ-পার্থক্য:**

অনর্থ [সর্বনাশ]=নাই অর্থ=নঞ্ তৎপুরুষ; অনর্থক [বৃথা]=নাই অর্থ যাহাতে =নঞর্থক বহুব্রীহি। পূর্বাহ্ণ=অহনের পূর্ব [দিনের প্রথম অংশ]=ষষ্ঠী তৎপুরুষ; পূর্বাহ =পূর্ব অহ [পূর্ব দিন]=কর্মধারয়। পূর্বরাত্রি=রাত্রির পূর্ব [রাত্রির প্রথম অংশ]=ষষ্ঠী তৎপুরুষ; পূর্বরাত্রি=পূর্বা রাত্রি [গতরাত্রি]=কর্মধারয়। জামাতাপুত্র=জামাতা ও পুত্র=দ্বন্দ্ব; জামাতৃপুত্র=জামাতার পুত্র=ষষ্ঠী তৎপুরুষ। মহদাশয়=মহতের আশয় [আধার]=ষষ্ঠী তৎপুরুষ; মহাশয়=মহৎ যে আশয়=কর্মধারয়। মহৎধন= মহতের ধন=ষষ্ঠী তৎপুরুষ; মহাধন=মহৎ যে ধন=কর্মধারয়। মহৎপ্রাণ=মহতের প্রাণ=ষষ্ঠী তৎপুরুষ; মহাপ্রাণ=মহান্ প্রাণ যাঁহার=বহুব্রীহি। কুপুরুষ=কু যে পুরুষ [শ্রীহীন]=কর্মধারয়; কাপুরুষ=কু যে পুরুষ [ভীরু]=কর্মধারয়। সুগন্ধ=সু গন্ধ যাহার [নিজস্ব গন্ধ নয়—যেমন, 'সুগন্ধ বায়ু']=বহুব্রীহি; সুগন্ধি=সু গন্ধ যাহার,

[নিজস্ব গন্ধ—যেমন, 'সুগন্ধি পুষ্প']=বহুব্রীহি। সপত্নী=সমান পতি যাহাদের =বহুব্রীহি; স্বপত্নী=স্ব-র [নিজের] পত্নী=বহুব্রীহি। প্রিয়সখা=প্রিয় সখা যাহার=বহুব্রীহি; প্রিয়সখ=প্রিয় যে সখা=কর্মধারয়। ছিন্নশাখা =ছিন্ন শাখা যাহার [বৃক্ষ]=বহুব্রীহি; ছিন্নশাখ=ছিন্ন যে শাখা=কর্মধারয়। হীনবল=হীন বল যাহার=বহুব্রীহি; বলহীন=বলের দ্বারা হীন=তৃতীয়া তৎপুরুষ। সাক্ষর=অক্ষরের সহিত বর্তমান [অক্ষর-জ্ঞান আছে যাহার]= বহুব্রীহি; স্বাক্ষর=স্ব-র [নিজের] অক্ষর [সহি]=ষষ্ঠী তৎপুরুষ। সশঙ্ক= শঙ্কার সহিত বর্তমান=বহুব্রীহি; শশাঙ্ক=শশ অঙ্কে যাহার [চন্দ্র]=বহুব্রীহি। মাতৃপিতৃহীন=মাতার পিতার দ্বারা হীন=তৃতীয়া তৎপুরুষ; পিতৃমাতৃহীন=পিতার মাতার দ্বারা হীন=তৃতীয়া তৎপুরুষ।

॥ অনুসরণী ॥

*১. সমাস প্রধানতঃ কয় প্রকার? তাহাদের নাম উল্লেখ করিয়া প্রত্যেক সমাসের একটি করিয়া উদাহরণ দাও। উ. মা. '৬১, '৬৫ ; মা. '৫৭, '৬১।

*২. সমাস কাহাকে বলে? সন্ধি ও সমাসের পার্থক্য দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দাও।
উ. মা. '৬০, '৬২, '৬৬ ; মা. '৬৩।

*৩. নিম্নলিখিত সমাসগুলির মধ্যে পার্থক্য দেখাও:

ক. কর্মধারয় ও বহুব্রীহি, উ. মা. '৬৩ ; খ. সমানাধিকরণ ও ব্যধিকরণ বহুব্রীহি, উ. মা. '৬৫ ; গ. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ও মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি, উ. মা. '৬১ ; ঘ. নঞ্ তৎপুরুষ ও নঞ্ বহুব্রীহি ; ঙ. অলুক্ তৎপুরুষ ও অলুক্ বহুব্রীহি ; চ. বহুব্রীহি সমাস ও কর্মধারয় সমাস, উ. মা. '৬৫ ; মা. '৬৫ ; ছ. রূপক সমাস ও উপমিত সমাস, উ. মা. '৬৩, '৬২, '৬৬ ; জ. কর্মধারয় ও দ্বিগু সমাস, উ. মা. '৬৬।

*৪. দৃষ্টান্তসহ নিম্নলিখিত সমাসগুলির সংজ্ঞা লিখ:

অলুক্ তৎপুরুষ, রূপক কর্মধারয়, খাঁটি বাংলা দ্বন্দ্ব উপপদ তৎপুরুষ, ব্যতিহার বহুব্রীহি, নিত্য সমাস, মা. '৬৩ : কর্মধারয় সমাস, উ. মা. '৭০ ; উপমান কর্মধারয়, মা. '৬৩ ; উপমিত কর্মধারয়, রূপক কর্মধারয়, মা. '৫৩ ; '৬১ ; উ. মা. [কম্পার্ট.] '৬৯ ; ক. প্রা. '৬১ ; উপমান পূর্বপদ বহুব্রীহি, অলুক্ সমাস, উ. মা. '৬৪ ; মা. '৬৪, '৫৮ ; ক. প্রা. '৬২ ; অলুক্ দ্বন্দ্ব, অলুক তৎপুরুষ অলুক্ বহুব্রীহি, নিত্য সমাস, উ. মা. '৬৩ : ব্যতিহার বহুব্রীহি, উ. মা. '৬১, '৬৩ ; ক প্রা. '৬১ ; অব্যয়ীভাব সমাস, উ. মা. '৬৪, '৬৮ ; মা. '৬২ ; ক. প্রা. '৬২ ; নঞর্থক বহুব্রীহি, উ. মা. '৬৩, '৬৪ ; উপপদ তৎপুরুষ, উ. মা. '৬১, '৬৩ ; অব্যয়ীভাব, বীপ্সার্থে অব্যয়ীভাব উ মা. '৬৩, '৬৮ ; দ্বিগু, মা. '৫৩ ; মধ্যপদলোপী কর্মধারয়, ক. প্রা. '৬১ ; সমাসান্ত প্রত্যয়, উ. মা. '৬৩ ; ক. প্রা. '৬২, '৬৩ ; বিগ্রহ বাক্য, মা. '৬৫ ; বহুব্রীহি সমাস, উ. মা. '৬৯।

*৫. কর্মধারয় সমাস কাহাকে বলে? উপমান কর্মধারয় ও রূপক কর্মধারয়ের প্রভেদ উদাহরণ সাহায্যে বুঝাইয়া দাও। মা. '৫৬ ; ক. প্রা. '৬২।

৬. কর্মধারয় ও দ্বিগু সমাসকে তৎপুরুষ সমাসের অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা যুক্তি সহকারে বিচার কর।

৭. দৃষ্টান্তসহ তৎপুরুষ সমাসের বিভিন্ন রূপের পরিচয় দাও। মা. '৫৬ ; ক. প্রা. '৬৬।

*৮. নিম্নলিখিত পদগুলির ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর: তুষারধবল, বপাশক্তি, পুরুষসিংহ, স্বাধীনতা-দিবস, চিরসুখ, ন্যূনাধিক, লব্ধ-প্রতিষ্ঠ, হাসাহাসি, রাজপথ : উ. মা. '৬০। পঞ্চরাত্র, পুরুষসিংহ, সিংহাসন, লোক-দেখানো, ধনিগণ, ভ্রাতুষ্পুত্র, সুখশান্তি, নিখুঁত : উ. মা. [কম্পার্ট.] '৬০। গৃহাগত, গাছপাকা, বধূবর, গৌরাঙ্গ, ছাগদুগ্ধ, সস্ত্রীক, কোলাকুলি, খেচর : উ. মা [কম্পার্ট] '৬১। দেশান্তর, কাঁচামিঠে, শরণাপন্ন, সরসিজ, শোকানল, বিয়ে-পাগলা, বিপত্নীক ; উ. মা. '৬২। পাদপদ্ম, প্রত্যক্ষ, ঘনশ্যাম, সুপ্তোত্থিত, বিশ্বামিত্র

বেচাকেনা, অন্তেবাসী, অপুত্রক : উ. মা. [কম্পার্ট.] '৬২। দাকাটা, তেলেভাজা, রান্নাঘর, গোলাভরা, সুধী, হতভাগা, মতিচ্ছন্ন, নদীমাতৃক, সুপ্রোথিত : উ. মা. '৬৪। প্রোষিতভর্তৃকা, বিপত্নীক, বীণাপাণি, যথাশক্তি, তেলেভাজা : উ. মা. '৬৭। ছেলেধরা, যথাবিধি, লাঠিখেলা, হাতাহাতি, শোকানল, সুধী : মা. '৫৯। রান্নাঘর, মুখপোড়া অষ্টাদশ, আঁখিপাখি, অহোরাত্রি, পুরুষসিংহ, নির্ভোজ, আসমুদ্র, তেমাথা : মা. '৬০। ভিক্ষান্ন, অগ্নিভয়, ডাক্তারসাহেব, লাঠিখেলা, লাঠালাঠি, ঘরমুখো, গোঁজামিল, নবনীকোমল : মা. '৬১। যথাশক্তি, কৃতকার্য, সপ্তাহ, গ্রামবাসী, বেহায়া, ঘি-ভাত, লোকলজ্জা : মা. [কম্পার্ট.] '৬২। কদাচার, বেয়াদব, গরমিল, আবালা, শতাব্দী, সুধী, আমৃত্যু, গায়ে-হলুদ, গোঁজামিল, পঞ্চবটী : ক. প্রা. '৬১। স্বজনহিতার্থী, বহুশাস্ত্রজ্ঞ, আতিথ্যপরায়ণ, সমাজহিতৈষী, শরণাগতাশ্রয় : ক. প্রা. '৬২। শ্রীভ্রষ্ট, শ্রীযুক্ত, শ্রীধর, সপ্তাহ, জলদ-গম্ভীর, হিংসা-বিষ, নরসিংহ : ক. প্রা. '৬৫। ভিক্ষালব্ধ একতারা, মহোৎসব, হৃৎপদ্ম, আত্মসমাহিত, অভিলষিত-দর্শন, স্মরণস্তম্ভ : ক. প্রা. '৬৭। পটোলভাজা, ঢেঁকিছাঁটা, বিয়ে-পাগলা, তিনকড়ি, ঘর-পালানো, হাতাহাতি, লেজঝোলা, তেমোহনা, অম্লমধুর, গাছপাকা, ঘনশ্যাম, না-মঞ্জুর, শশব্যস্ত, বিধবা, হাতেখড়ি, জীবন্মৃত, সেতার, গ্রামান্তর, রাতকানা, মাথাপিছু, লক্ষ্মীছাড়া, সখন্ত্র, ছেলেভুলানো, বালিকা-বিদ্যালয়, ঘরপাতা, কাণাকড়ি, স্বাধীনতা-দিবস, সপত্নী, সস্ত্রীক, অর্থনীতি, তেপান্তর, রূপবাণী, উড়োজাহাজ, চুলাচুলি, জলযোগ, শতবার্ষিকী, সতীর্থ, তেপায়া, ডাকাবুকো, মাথাব্যথা, চালাক-চতুর, লাঠালাঠি, একঘরে, দা-কুমড়ো, বক-ধার্মিক, রাজহাঁস, স্বর্গত, বাগ্দত্তা, আজানুলম্বিতবাহু, আগাগোড়া, মনোরথ, আনাড়ী, কাজলকালো, ফি-বছর ও মনমাঝি। অষ্টাদশ, আঁখিপাখি, অহোরাত্র, পুরুষসিংহ, নির্ভোজ, আসমুদ্র, তেমাথা : উ. মা. '৬৯। লাভালাভ, আগাগোড়া, রথারূঢ়, বর্ণচোরা, ঘি-ভাত, ঢেঁকিছাঁটা পঞ্চভূত, উকিল, ব্যারিস্টার, মাথাপিছু রান্নাঘর, বীরপূজা, হৃৎপদ্ম : উ. মা. '৭০। ঘরজামাই অগ্নিভয়, সপ্তাহ, ভূতপূর্ব, তেলেজলে, আটচালা, মাথাপিছু, নরসিংহ, মিশকালো, নামঞ্জুর : উ. মা [কম্পার্ট.] '৭০।

৯. সমস্তপদে পরিণত করিয়া সমাসের নাম লিখ : মহান রাজা মুখ চন্দ্রের ন্যায়, পঞ্চবর্গের সমাহার, কর্ম করে যে, বোঝাই নৌকা যাহার দ্বারা, নাই ক্রিয়া যাহার, কমলের মতো অক্ষি যাহার : উ মা. [কম্পার্ট.] '৬৭। জায়া ও পতি, পঞ্চনদীর সমাহার, সমান ধর্ম যার, সুন্দর গন্ধ যার, কুৎসিত আচার, শোভন হৃদয় যার, পুরুষ সিংহের ন্যায়, অমৃতের ন্যায় মধুর, জলে চরে যে, বোঝাই নৌকা যাহার দ্বারা, বালিকাদের বিদ্যালয়, ঘৃতের দ্বারা পক্ক : মা. '৬৯। পুত্রের সহিত বর্তমান, বিশাল উরঃ যাহার, পুণ্ডরীকের ন্যায় অক্ষি যাহার, জলদের মতো গম্ভীর, জীবনরূপ প্রবাহ, কালীর দাস, হস্তচালিত শিল্প, অন্তে বাস করে যে, প্রোষিত ভার্যা যাহার, অন্তে অপ্ [জল] যাহার, দুই দিকে অপ্ যাহার, রাহার [পথের] নিমিত্ত খরচ, মহতী যে অষ্টমী, চরিত অর্থ যাহার, শালের মতো প্রাংশু, নীর দেয় যে।

১০. সমাসের নাম করিয়া সমাসবদ্ধ কর : বিদ্বান+সমাজ ; ছাগী+দুগ্ধ ; অন্ত+জন্ম ; পূর্ব+অহন্ ; খর+স্রোত ; শত+অব্দ ; কু [কুৎসিত] অন্ন ; ছিন্ন+শাখা ; প্রা. '৬২। সুন্দর+শ্রী ; কুৎসিত+পুরুষ ; অধর+বিম্ব ; মনঃ+রথ, হংস+রাজ ; পূর্ব+রাত্রি ; অপর+অহন্।

১১. অর্থ-পার্থক্য দেখাও : স্বগত, স্বর্গত ; স্বপত্নী, সপত্নী ; অনর্থ, অনর্থক ; পূর্বাহ্ন, পূর্বাহ্ণ ; মাতা-পিতৃহীন, মাতৃপিতৃহীন, পিতৃমাতৃহীন ; সুগন্ধ, সুগন্ধি ; সশঙ্ক, শশাঙ্ক ; মহাশয়, মহদাশয় ; পূর্বরাত্র, পূর্বরাত্রি।

১২. নিম্নলিখিত শব্দগুলির সমাসবদ্ধ রূপ ও সমাসের নাম লিখ :

জায়া ও পতি, পঞ্চ নদীর সমাহার, সমান ধর্ম যার, সুন্দর গন্ধ যার, কুৎসিত আচার, শোভন হৃদয় যার, পুরুষ সিংহের ন্যায়, অমৃতের ন্যায় মধুর, জলে চরে যে, বোঝাই নৌকা যাহার দ্বারা, বালিকাদের বিদ্যালয়, ঘৃতের দ্বারা পক্ক, ভিজে এমন ছোলা, প্রীতির নিমিত্ত ভোজ, মসীর ন্যায় কৃষ্ণ, নাই তার যাহাতে, দিন ব্যাপিয়া, গলায় গলায় যে মিল, বনের সদৃশ, লব ও কুশ, ফুলের মত বাবু, ধামা ধরে যে, তন্তু বয়ন করে যে, পাস করিয়াছে যে, কূলের বিপরীত, অরিকে দমন করে যে, কাছ হইতে ছাড়া, এলো কেশ যে নারীর, অন্ত দ্বীপ, ক্ষণে জন্ম যাহার, নাটের নিমিত্ত মন্দির, দুধের মতো সাদা, যোগ্যতাকে অতিক্রম না করিয়া, মূর্তির সদৃশ, অক্ষির সমীপে, একদিকে চোখ যাহার।

১৩. সংজ্ঞাসহ উদাহরণ দাও : বহুব্রীহি, দ্বন্দ্ব, অব্যয়ীভাব, কর্মধারয়, দ্বিগু ; [উ. মা. কম্পার্ট.] '৭০

১৪. নিম্নলিখিত সমস্ত পদগুলির পাঁচটিকে স্বরচিত বাক্যে প্রয়োগ কর : শিরোধার্য, কৃতবিদ্য, নদীমাতৃক, দুগ্ধপোষ্য, সর্বস্বান্ত, চরিতার্থ, পুণ্যশ্লোক, শশব্যস্ত, দূরদর্শী ; ক. প্রা '৬৬।

১৫. নিম্নলিখিত বাক্যগুলির মধ্যে স্থূলকায় শব্দগুলির ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর :

তোমার দেখছি **জোরবরাত**। এমন **লোক-দেখানো** কাজ না করাই ভালো। **কলেছাঁটা** চাল খেয়েই তো অসুখ করেছে। **বেগতিক** দেখে লোকটা পালিয়ে গেল। আজ সেই **স্মৃতিমন্দিরের** দ্বার খোলা হবে। আয় রে পাখি **লেজঝোলা**। **গায়ে-পড়া** মানুষ আমার ভালো লাগে না : মা. '৫২। আমি নিত্য কহিতেছি **যথাসত্য** বাণী। দুজনায় **মহাতর্ক** শক্তি কার বেশী। **ঠেলাঠেলি** ভিড় করে শিশুতরুদলে। **দর্শকজন** মুদিল নয়ন সভা হল নিস্তব্ধ। ছোট গ্রামখানি লেহিয়া লইল **প্রলয়লোলুপ** রসনা। **গেরুয়াবসনা** সন্ধ্যা নামিল পশ্চিম-মাঠ পারে। সহসা **ভূতলে** প'ড়ে পদ্মটি রাখিল ধরি, প্রভুর **চরণপদ্ম** 'পরে ; মা. '৬৫।

বাংলা ভাষার শব্দ-সম্ভার অত্যন্ত সমৃদ্ধ। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা হইতে বিবর্তনের পথ বাহিয়া বাংলা ভাষার উদ্ভব। ফলে, অতি স্বাভাবিক কারণেই প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার বহু শব্দ বিবর্তিত হইয়া বাংলায় নতুন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। আবার, বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষা হইতেও বহু শব্দ ঋণ-গ্রহণ করিয়াছে। তাহা ছাড়া, বাংলা ভাষায় বিদেশী শব্দের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। নানা উপলক্ষে বাংলাদেশে বহু বিদেশী জাতির সমাগম ঘটিয়াছে; তাহাদের ভাষারও বহু শব্দ বাংলা ভাষায় রাখিয়া গিয়াছে।

বাংলা শব্দ-সম্ভারকে দুই শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়: **মৌলিক শব্দ ও আগন্তুক শব্দ**। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা বা সংস্কৃত হইতে পরিবর্তিত বা অপরিবর্তিতরূপে গৃহীত শব্দগুলিকে বলা হয় মৌলিক শব্দ। তৎসম, তদ্ভব ও অর্ধ-তৎসম শব্দগুলি ইহার অন্তর্ভুক্ত। আর, বিভিন্ন কালে বিভিন্ন ভাষার সংস্পর্শে আসিবার ফলে তাহাদের বহু শব্দ বাংলা ভাষায় গৃহীত হইয়াছে; তাহাদের বলা হয় আগন্তুক শব্দ। দেশী ও বিদেশী শব্দগুলি ইহার অন্তর্ভুক্ত। মজার ব্যাপার, দেশী শব্দগুলিও আগন্তুক শব্দ।

বাংলা ভাষার শব্দ-সম্ভারকে ছয় শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায়। অর্থাৎ, বাংলা শব্দ-ভাণ্ডারের শব্দ ছয় প্রকার: তৎসম, তদ্ভব, অর্ধ-তৎসম, দেশী, বিদেশী ও মিশ্র শব্দ।

১. **তৎসম শব্দ:** [তৎ=সংস্কৃত, সম=সমান; অর্থাৎ সংস্কৃতের সমান] যে সকল শব্দ সংস্কৃত ভাষা হইতে অপরিবর্তিত আকারে বাংলা ভাষায় গৃহীত হইয়াছে, তাহাদের তৎসম শব্দ বলা হয়। যেমন: বৃক্ষ, লতা, নদী, ধরিত্রী, সমুদ্র, স্নান, কাষ্ঠ, হস্ত, চক্ষু, কর্ণ, মস্তক, অন্ন, বস্ত্র, নক্ষত্র, গিরি, কুসুম, ব্যাঘ্র, অশ্ব, হস্তী, সূর্য, চন্দ্র, সন্ধ্যা রাত্রি, অরণ্য, গৃহ, বায়ু, আকাশ ইত্যাদি। এই সমস্ত শব্দ সংস্কৃত ভাষা হইতে বাংলা ভাষায় ঋণ-স্বরূপ গৃহীত। বাংলা ভাষার মোট শব্দ-সমষ্টির চুয়াল্লিশ শতাংশ অর্থাৎ মোট প্রায় এক লক্ষ পঁচিশ হাজার শব্দের মধ্যে প্রায় পঞ্চান্ন হাজার শব্দই তৎসম শব্দ। কাজেই, সংস্কৃত হইতে গৃহীত ঋণের পরিমাণ সহজেই অনুমেয়।

২. **তদ্ভব শব্দ:** [তৎ=সংস্কৃত, ভব=জাত; অর্থাৎ সংস্কৃত হইতে জাত] যে সকল সংস্কৃত শব্দ যুগ-যুগান্তরের বিবর্তনের পথে প্রাকৃত-অপভ্রংশ ইত্যাদি স্তরের মধ্য দিয়া পরিবর্তিত হইয়া বাংলা ভাষায় রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহাদের বলা হয় তদ্ভব শব্দ। যেমন:

সংস্কৃত	>	প্রাকৃত	>	বাংলা
হস্ত		হত্থ		হাত
ভক্ত		ভত্ত		ভাত
কাষ্ঠ		কট্‌ঠ		কাঠ
কৃষ্ণ		কহ্ন [কাহ্ন]		কান্ [<আদরার্থে উ= কানু ; +আদরার্থে আই=কানাই]

তেমনি : পদ>পা, ব্যাঘ্র>বাঘ, কণ্টক>কাঁটা, পক্ষী>পাখি, চন্দ্র>চাঁদ, সন্ধ্যা>সঞ্ঝা>সাঁঝ, কর্মকার>কামার, দধি>দৈ, স্বর্ণ>সোনা, মস্তক>মাথা, চক্ষু>চোখ, কর্ণ>কান, বংশ>বাঁশ, হংস>হাঁস, সর্প>সাপ, নৃত্য>নচ্‌চ>নাচ, গ্রাম>গাঁ, অদ্য>আজ, পৃষ্ঠ>পিঠ, মৃত্তিকা>মাটি, মক্ষিকা>মাছি, গৃহ>ঘর, পিতৃষ্বসা>পিসি, কার্য>কাজ, গাত্র>গা, স্কন্ধ>কাঁধ, ব্রাহ্মণ>বামুন, সামন্তপাল>সাঁওতাল, ভূমি>ভুঁই, লৌহ>লোহা>নোয়া, তাম্র>তামা, কর্পট>কাপড়, ভাণ্ড>ভাঁড়, অর্ধ>আধ, ইক্ষু>আখ, মৎস্য>মাছ ইত্যাদি। প্রাকৃত হইতে জাত বলিয়া ইহাদের আর এক নাম **প্রাকৃতজ শব্দ**। এই শব্দগুলিকে সংস্কৃত ভাষা হইতে বাংলা ভাষা উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করিয়াছে। এই শব্দগুলির বর্তমান রূপের মধ্যে ভাষার ক্রমবিবর্তনের হাজার হাজার বছরের ইতিহাস বিধৃত রহিয়াছে।

আবার, প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায়ও অন্যান্য ভাষার বহু শব্দ গৃহীত হইয়াছিল। সেই শব্দগুলিও কালক্রমে রূপান্তরিত হইয়া বাংলা ভাষায় স্থান লাভ করিয়াছে। সেই শব্দগুলিকে বলা হয় **রূপান্তরিত তদ্ভব**। যেমন : **তামিল শব্দ**—মুটে>মুটক [সং] মুডঅ [প্রা]>মোট [বাংলা]=বোঝা। পিল্লৈ—পিল্লিক [সং]>পিলুঅ [প্রা]>পিলে [বাংলা]। **গ্রীক শব্দ**—দ্রাখ্‌মে>দ্রম্য [সং]>দম্মে [প্রা]>দাম [বাংলা]। সুরিংক্‌স্>সুরঙ্গ [সং]>সুড়ঙ্গ [বাংলা]। **পারসিক শব্দ**—মৌচিক>মোচিঅ [প্রা]>মুচি [বাংলা]। **তুর্কী শব্দ**—তুর্ক>তুরুষ্ক [সং]>তুরুক [বাংলা]। তিগীর>ঠক্কর [সং]>ঠাকুর [বাংলা]। **পহ্লবীশব্দ**—পোস্ত [লিখিবার চামড়া]>পুস্তিকা [সং]>পুঁথি [বাংলা]।

৩. **অর্ধ-তৎসম** বা **ভগ্ন-তৎসম শব্দ** : যে-সকল তৎসম শব্দ বাঙালীর মুখে উচ্চারণের বিকৃতির ফলে রূপান্তর লাভ করিয়াছে, তাহাদের বলা হয় **অর্ধ-তৎসম** বা **ভগ্ন-তৎসম শব্দ**। যেমন :

তৎসম	>	অর্ধ-তৎসম	তৎসম	>	অর্ধ-তৎসম
কৃষ্ণ		কেষ্ট	পুত্র		পুত্তুর
বিষ্ণু		বিষ্টু	শ্রাদ্ধ		ছেরাদ্দ

তেমনি : শ্রদ্ধা>ছেদ্দা, শ্রীদাম>ছিদাম, শ্রী>ছিরি, নিমন্ত্রণ>নেমন্তন্ন, প্রণাম>পেন্নাম, পুরোহিত>পুরুত, কায়স্থ>কায়েত, কুৎসিত>কুচ্ছিৎ, গৃহস্থ>গেরস্থ, গৃহিণী>গিন্নি, নিশ্চিন্ত>নিশ্চিন্দি, ঘৃণা>ঘেন্না, বৈদ্য>বদ্দি, কবিরাজ>

কব্‌রেজ, পথ্য>পথ্যি, স্বস্তি>সোয়াস্তি, যজ্ঞ>যজ্জি, মিত্র>মিত্তির, পিত্ত>পিত্তি, হা-প্রত্যাশা>হাপিত্যেশ, স্বাদ>সোয়াদ, অনাসৃষ্টি>অনাচ্ছিষ্টি, বৃহস্পতি>বেস্পতি, বিস্যুৎ, বিশ্রী>বিচ্ছিরি, মিথ্যা>মিছা, গ্রাম>গেরাম, রাত্রি>রাত্তির, রৌদ্র> রোদ্দুর, জ্যোৎস্না>জোছনা, বৃষ্টি>বিষ্টি, মন্ত্র>মন্তর, তন্ত্র>তন্তর, মহার্ঘ>মাগ্‌গি, মহোৎসব>মোচ্ছব, আধিক্যতা [ভুল সংস্কৃত]>আদিখ্যেতা ইত্যাদি। অর্ধ-তৎসম শব্দকে সেমি-তৎসম [Semi-তৎসম] শব্দও বলা হয়।

লক্ষণীয়: তদ্ভব ও অর্ধ-তৎসম শব্দ উভয়েরই উৎস সংস্কৃত; কিন্তু তদ্ভব শব্দের রূপান্তর বহু শতাব্দীর ক্রম-বিবর্তনের ফল; আর অর্ধ-তৎসম শব্দের পরিবর্তন আকস্মিক উচ্চারণ-বিকৃতি-জনিত। তদ্ভব: কৃষ্ণ>কন্‌হ>কাহ্ন>কান্ [কানু বা কানাই]। অর্ধ-তৎসম: কৃষ্ণ>কেষ্ট।

৪. **দেশী শব্দ**: বাংলা দেশে আর্য-জাতির বংশধর [এবং আর্যভাষার] আগমনের পূর্বে যে জাতি বাস করিত, তাহাদের কিছু শব্দ বাংলা ভাষায় স্থান গ্রহণ করিয়াছে। সেই শব্দগুলিকে দেশী শব্দ বলে। যেমন: চাউল, মুড়ি, ঢেঁকি, ঝাঁকা, খেয়া, ধুচুনি, ঝিঙা, ঝাঁটা, খোপা, টোপর, খাঁচা, ছাল, চাল, পেট, ডাহা, ধামা, ঢোল, মাঠ, ঢেউ, খড়, কুলা, কলা, লাঠি, তেঁতুল, ডাগর, বাদুড, গাড়ি, ঘোড়া, খাড়ু, গাড়ু, ঘোমটা, বঁটি, কামড়, ডাঁসা, সড়কি, আড্ডা, ডাব, ঝাড়, বোঝা, দোয়েল, ফিঙে, কাতলা, চিংড়ি, বক, কুকুর, চাচ, ঢোঁড়া, ডিঙি, ঘুড়ি ইত্যাদি।

৫. **বিদেশী শব্দ**: বাংলা দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রীয় যোগাযোগের ফলে বহু আরবী, ফারসী, ইংরেজি, ফরাসী, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, তুর্কী, চীনা, জাপানী, বর্মী ও রুশ শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে। তাহাদিগকে বিদেশী শব্দ বলা হয়। যেমন: **আরবী**—আইন, আদালত, আক্কেল, কবর, সমাজ, কোরান, কৈফিয়ত, কেচ্ছা, ইমারত, তালেবর, মজ্‌দুর, মজুর, তলব, খবর, খাজনা, জিলা, মেরামত, তারিখ, দলিল, দালাল, তাবিজ, তামাদি, কাগজ, কলম, দরখাস্ত, কেতাব, ফসল, হিসাব, বিদায়, দফা, ব্যঙ্গ, জাহাজ, কেচ্ছা, খেতাব, তামাসা, গোলাম, হাকিম, হুকুম ইত্যাদি। **ফারসী**—আমির, উজীর, মালিক, সিপাই, ইয়ার, আন্দাজ, দোকান, নালিশ, পেশা, ফেরার, মোকদ্দমা, মোক্তার, বীমা, দরবেশ, খোদা, দরদ, বরফ, আবাদ, বাগান, খরচ, জমিদারী, ফরিয়াদ, তোতা, কিনারা, দরিয়া, বেহারা, চরখা, চশমা, খাতা, গোলাপ, বাদাম, পর্দা, মশলা, শিশি, সিন্দুক, রুমাল, সানাই, শরিক, দালান, কারখানা, কারিগর, দোয়াত, ময়দা, ময়দান, রাস্তা, খুশি ইত্যাদি। **ইংরেজি**—চেয়ার, টেবিল, আপিস, উইল, গ্লাস, অফিস, জেল, মাইল, সিনেমা, স্টেশন, কলেজ, স্কুল, বল, বেঞ্চ, পকেট, নিব, রেল, মোটর, বাক্স, স্টিমার, হাসপাতাল, পুলিস, কোর্ট, কলেরা, লাট, ট্রাম, বাস, থিয়েটার, মাস্টার, রবার, লাইব্রেরী, লিষ্টি, ফিষ্টি, ডাক্তার ইত্যাদি। **ফরাসী**—কাফে, কার্তুজ, কুপন, আঁশ, বিস্কুট, ওলন্দাজ, দিনেমার, ফিরিঙ্গি, বুর্জোয়া, রেস্তোরাঁ ইত্যাদি। **পর্তুগীজ**—আলমারি, আলপিন, কেরানী, গারদ,

ক্রুশ, জানালা, সাবান, তোয়ালে, ফিতা, গামলা, বালতি, পেরেক, বারান্দা, নিলাম, পাউরুটি, গীর্জা, বোতল, চাবি, কামরা, সাগু, পেয়ারা, নোনা, আতা, পেঁপে, কামিজ, আলকাতরা, ফিতা, বোতাম, আনারস, মিস্ত্রী ইত্যাদি। **ওলন্দাজ**—ইস্কাপন, রুইতন, হরতন, তুরুপ, ইস্কুপ ইত্যাদি। **তুর্কী**—আলখাল্লা, উজবুক, কাঁচি, চাকু, দারোগা, লাশ, বারুদ, বেগম, বিবি, বাহাদুর, কুলি, বোচকা, উর্দু ইত্যাদি। **চীনা**—কাগজ, চা, তুফান, চিনি, লিচু, লুচি ইত্যাদি। **জাপানী**—রিকশা, হারিকিরি ইত্যাদি। **বর্মী**—লুঙ্গি, ঘুঘনি ইত্যাদি। **রুশ**—বলশেভিক, সোভিয়েত, স্পুটনিক ইত্যাদি। **পেরু**—কুইনিন ইত্যাদি। **ইতালীয়**—ম্যাজেন্টা ইত্যাদি। **অস্ট্রেলীয়**—ক্যাঙ্গারু ইত্যাদি। **তিব্বতী**—লামা ইত্যাদি। তাহা ছাড়া আছে **হিন্দী**—বানি, কচুরী, হুণ্ডি ইত্যাদি। **গুজরাটী**—তকলি, হরতাল ইত্যাদি। **মারাঠী**—চৌথ, বর্গী ইত্যাদি। **পাঞ্জাবী**—চাহিদা, শিখ ইত্যাদি। **সাঁওতালী**—কম্বল, ময়ূর ইত্যাদি।

খাঁটি বাংলা শব্দ: তদ্ভব, দেশী ও যে সকল বিদেশী শব্দ বহুপূর্বে বাংলা ভাষায় গৃহীত হইয়া বিবর্তনের পথে বাংলা রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহাদের খাঁটি বাংলা শব্দ বলা হয়। তদ্ভব ও দেশী শব্দের দৃষ্টান্ত পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে। যে সব বিদেশী শব্দ বিবর্তিত হইয়া খাঁটি বাংলা শব্দরূপে গৃহীত হইয়াছে, তাহারা যেমন: দাম [<প্রাচীন গ্রীক শব্দ—'দ্রাখ্‌মে'], মুচি [<প্রাচীন পারসিক শব্দ—'মোচিক'] ইত্যাদি।

৬. **মিশ্র শব্দ:** তৎসম, তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দের মধ্যে যে কোন এক শ্রেণীর শব্দের সহিত অপর শ্রেণীর শব্দ বা প্রত্যয়াদির যোগে যে সকল নূতন শব্দ গঠিত হইয়াছে, তাহাদের মিশ্র শব্দ বা সংকর শব্দ [Hybrid words] বলা হয়। যেমন: **তদ্ভব + বিদেশী**—হাট-বাজার, জলাজমি, কাজ-কারবার, সীমা-সরহদ্দ, জামাই-বাবু, রাজা-উজীর, ধন-দৌলত, শাক-সব্‌জি, খ্রীস্টাব্দ। **বিদেশী + তদ্ভব**—মাস্টার-মশাই, ডাক্তার-বদ্যি, পাউরুটি, অফিস-পাড়া, রেলগাড়ি, হাফ্‌-ছুটি, আইন-সঙ্গত, হেড্‌-পণ্ডিত। **বিদেশী + বিদেশী**—উকিল-ব্যারিস্টার, কোর্ট-কাছারি, হেড্‌-মৌলবী, পুলিস-সাহেব, হাফ্‌-আখড়াই। বিদেশী প্রত্যয়যুক্ত মিশ্র শব্দ—পণ্ডিতগিরি, চড়নদার, বাড়িওয়ালা, নস্যদান। বিদেশী উপসর্গযুক্ত মিশ্র শব্দ—বেতার, বে-হাত, গরমিল।

বাংলা শব্দ-ভাণ্ডারে উল্লিখিত ছয় প্রকারের শব্দ ছাড়া আরও কয়েক প্রকার শব্দের সাক্ষাৎ মেলে। যেমন:

অপশব্দ: মূল ভাষার কোন শব্দ বিকৃত বা পরিবর্তিতরূপে ব্যবহৃত হইলে, তাহাকে অপশব্দ বলা হয়। যেমন: ভাগ্য [সংস্কৃত]>ভাইগ্‌গ [পূর্ববঙ্গীয় বাঙ্গালী উপভাষা]।

ইতর-শব্দ: যে সকল শব্দ মার্জিত লোকদের কথায় বা ভাষায় ব্যবহৃত হয় না, তাহাদের বলা হয় ইতর-শব্দ [Slang]। যেমন: গুল মারা, পেটো, গেঁজানো ইত্যাদি। এই সব শব্দের উদ্ভব কোন ব্যক্তি বা দলবিশেষের উচ্চারণ হইতে। ইহারা কালক্রমে জাতে উঠিতে পারে বা লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে।

খণ্ডিত শব্দ : কোন কোন শব্দের অংশবিশেষ বাদ দিয়া উচ্চারিত হয় ; তাহাদের খণ্ডিত শব্দ বলা হয়। যেমন : ফোন [<টেলিফোন], বাইক [<বাইসাইকেল], মাইক [<মাইক্রোফোন], সুপার [সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট]।

॥ অনুসরণী ॥

১. তদ্ভব, তৎসম ও অর্ধ-তৎসম শব্দ কাহাকে বলে—উদাহরণসহ পরিস্ফুট কর। উ. মা. '৬০।

২. দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দাও : তদ্ভব, মা. '৫৭; '৫৪, '৬২ ; ক. প্রা. '৬২ ; প্রাকৃতজ শব্দ, উ. মা. '৬১ ; তৎসম, মা. '৫৩ '৫৫ ; অর্ধ-তৎসম, মা. '৫৯ ; মা. [কম্পার্ট.] '৬২ ; উ. মা. '৬২, '৬৮ : ভগ্ন-তৎসম, মা. '৬২ ; উ. মা. '৬৩ ; খাঁটি বাংলা শব্দ ; বিদেশী শব্দ ও মিশ্র শব্দ, দেশী শব্দ, উ. মা. [কম্পার্ট.] '৬২।

৩. তদ্ভব শব্দ ও অর্ধ-তৎসম শব্দের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। মা. '৬০ : উ. মা. '৬৫

৪. উদাহরণসহ তৎসম ও তদ্ভব শব্দের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও উ. মা. '৬১

৫. দেশী ও বিদেশী শব্দ বলিতে কি বুঝায় ? দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দাও। ক. বি. '৪৭

৬. প্রাকৃতজ শব্দ এবং মৌলিক ও আগন্তুক শব্দ কাহাকে বলে ? দৃষ্টান্তসহ পরিস্ফুট কর।

৭. বাংলা ভাষায় বহু-ব্যবহৃত পাঁচটি বিদেশী ও তাহাদের আকরের উল্লেখ কর। উ. মা. '৬৩

৮. নিম্নোদ্ধৃত অংশগুলিতে প্রযুক্ত শব্দগুলির শ্রেণী নির্দেশ কর :

ক. ‘দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ,
কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারী দিতে হবে পাড়ি নিতে হবে তরী পার।’—নজরুল ইসলাম।

তরী [তৎসম], জল [তৎসম], মাঝি [তদ্ভব], পথ [তৎসম], পাল, হাল [দেশী], হিম্মৎ [বিদেশী—আ.], জোয়ান [বিদেশী—ফা.] আগুয়ান [তদ্ভব], তুফান [বিদেশী—ফা.], ভারী [তদ্ভব] পাড়ি [দেশী], পার [তৎসম]।

খ. ‘নিকের মোজা, চকচকে পাম্প-শু আগাগোড়া ওভারকোটে মোড়া, গলায় গলাবন্ধ, হাতে দস্তানা মাথায় টুপি—পশ্চিমের শীতের বিরুদ্ধে তাঁহার সতর্কতার অভাব নাই।’ —শরৎচন্দ্র

৯. কাহাকে বলে উদাহরণসহ বুঝাইয়া লিখ :

ইতর শব্দ, খণ্ডিত শব্দ ও অপশব্দ।

---

৩. শব্দদ্বৈত ও ধ্বন্যাত্মক শব্দ

শব্দদ্বৈত

একই শব্দ যখন একসঙ্গে দুইবার উচ্চারিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন অর্থের দ্যোতনা করে, তখন তাহাকে **শব্দদ্বৈত** বলা হয়। শব্দদ্বৈত বাংলা ভাষার একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। নিখুঁত মনের ভাব প্রকাশে শব্দদ্বৈতের ভূমিকা অসামান্য। অনেক সময় একই শব্দ না হইয়া বিকৃত শব্দ কিংবা বিপরীত শব্দও প্রযুক্ত হইয়া শব্দদ্বৈত গঠিত হইয়া থাকে; ইহারা কখনও দ্বন্দ্ব সমাসের অন্তর্ভুক্ত হয়, কখনও ব্যতিহার সমাসের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১ চলিত বাংলায় **একই শব্দ দুইবার** প্রয়োগের দ্বারা নূতন অর্থের দ্যোতনা করা যায়। তাহাদের **দ্বিরুক্ত শব্দ** বা **শব্দযুগ্ম** বা **শব্দদ্বৈত** বলা হয়। যেমন:

'তোমা লাগি **দিকে দিকে** কাঁদিছে ক্রন্দসী।' 'এসেন পণ্ডিতেরা **দূর দূর** থেকে।' '**দেউলে দেউলে** কাঁদিয়া ফিরি গো।' '**ঘরে ঘরে** আছে পরমাত্মীয়, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া।' **বছর বছর** এমনভাবে কষ্ট করা যায় না [প্রতি বছর]। **হাজার হাজার** লোক জমে গেল [অনেক হাজার]। **গাড়ী গাড়ী** খাবার আসতে লাগলো [অনেক খাবার]। **ধামা ধামা** মুড়ি নিমেষে ফুরায় [অনেক ধামা]। **ঢুলু ঢুলু** চোখ যে! ঘুম আসছে নাকি [ঘুম আসবার মতো]? **কাঁদ কাঁদ** মুখে ছেলেটি চলে গেল [প্রায় কান্নার মতো]। **জল জল** করে প্রাণটা শুকিয়ে গেল [জলের তীব্র আকাঙ্ক্ষায়]। **বই বই** করে ছেলেটা পাগল [বই পড়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষায়]। **চলো চলো**, দেরী হয়ে যাচ্ছে [তাগিদ]। **ধরো ধরো**, এখনি উল্টে পড়বে [আগ্রহাতিশয্য]। '**পথে পথে** কাটাই বেলা।' **গান গান** করে সারা দেশের লোক যেন ক্ষেপে উঠেছে। আয় আমরা **চোর চোর** খেলি। 'ঢেউ —আবার ঢেউ। যেন **রাশি রাশি বস্তা বস্তা** তুলা।' **লক্ষ লক্ষ** টাকা ক্ষতি হয়ে গেল। "দুই পারের বনশ্রেণীর মধ্যে **দলে দলে** জোনাকি, যেন নিঃশব্দে **মুঠো মুঠো** আগুনের 'হরির লুঠ' ছড়াইতেছে।" 'নদী **কূলে কূলে**, উঠে কল্লোল।' 'এবার **আলোয় আলোয়** বিদায় দে মা, **ভালোয় ভালোয়** চলে যাই।' 'ওরে ভাই, ফাগুন লেগেছে **বনে বনে, ডালে ডালে, ফুলে ফুলে পাতায় পাতায়** রে, **আড়ালে আড়ালে কোণে কোণে**।' তেমনি—আশায়-আশায়, কানে-কানে, মাঠে-মাঠে, গানে-গানে, প্রাণে-প্রাণে, অন্তরে-অন্তরে, হৃদয়ে-হৃদয়ে, চালে-চালে, দেশে-দেশে, মানুষে-মানুষে, পায়ে-পায়ে, হাতে-হাতে। [পৌনঃপুন্য অর্থে] বছর-বছর, বারে-বারে, সপ্তাহে-সপ্তাহে, রোজ-রোজ, মাসে-মাসে, মাঝে-মাঝে, সময়-সময়, ঘণ্টায়-

ঘণ্টায়, পলে-পলে, নিমেষে-নিমেষে, কখনো-কখনো, কথায়-কথায়, পলকে-পলকে [নিয়ত অবস্থান বুঝাইতে] চোখে-চোখে, হাতে-হাতে, পিঠে-পিঠে, মনে-মনে, তলে-তলে, উপরে-উপরে, ভিতরে-ভিতরে, আগে-আগে, পাশে-পাশে, সঙ্গে-সঙ্গে, পিছনে-পিছনে। [ক্রিয়ার দীর্ঘস্থায়িত্ব বুঝাইতে] হাসিতে-হাসিতে, খেলিতে-খেলিতে, চলিতে-চলিতে, ছুটিতে-ছুটিতে, দেখিতে-দেখিতে, বলিতে-বলিতে, বসিতে-বসিতে, পড়িতে-পড়িতে, নাচিতে-নাচিতে, ডেকে-ডেকে, নেচে-নেচে, কেঁদে-কেঁদে, ঘুরে-ঘুরে, ছুটে-ছুটে [বিশেষ নিশ্চয়তা বুঝাইতে] টাট্‌কা-টাট্‌কা, গরম-গরম, ঠিক-ঠিক, সকাল-সকাল, নিজে-নিজে, গলায়-গলায়, মজার-মজার।

২. ঈষদর্থে বা সাদৃশ্য বুঝাইতে শব্দদ্বৈত হয়। যেমন: ঘুম-ঘুম পাচ্ছে। শীত-শীত করছে। ওকে কেমন যেন চোর-চোর মনে হচ্ছিল। তার গায়ে গোরু-গোরু গন্ধ। লোকটার পেটে-পেটে বুদ্ধি। এসো, হাতে-হাতে কাজটা করে ফেলি। তখন সূর্য ডুবু-ডুবু। 'আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে সূর্যি ডোবে-ডোবে।' 'এত যাই-যাই করছ কেন?' এইতো এলে, এখনই উঠি-উঠি করছ? 'আউশের খেত জলে ভরো-ভরো।' তেমনি—মেঘ-মেঘ, জ্বর-জ্বর, নিবু-নিবু, হাসি-হাসি, মানে-মানে, ফিরে-ফিরে, যাব-যাব, করি-করি, খাই-খাই, বলি-বলি, যায়-যায়, ভাসা-ভাসা, ফাঁকা-ফাঁকা, চেনা-চেনা।

৩ একটি প্রকৃত শব্দ ও একটি বিকৃত শব্দ যোগে গঠিত শব্দদ্বৈত বাংলায় কখনও 'প্রভৃতি' বুঝাইতে, কখনও বা 'অবজ্ঞা' বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়। যেমন: 'সারাদিন কাটে জপে-তপে।' চা-টা খেয়ে বেরিয়ে পড়া যাক্। কম সম করে খরচ করো। বাজারে মাছ-কাছ কিছুই নেই। চল, পাখি-টাখি মারা যাবে। ভাত-টাত কি দেবে, দাও। ঘোড়া-টোড়ার ধার ধারি না, পায়ে হেঁটেই মেরে দেব। কাজ-টাজ এখন আর ভাল লাগছে না। অলি-গলি দিয়ে কোথায় নিয়ে চললে? বকা-ঝকা করে মনটা খারাপ হয়ে গেল। মার-ধোর করে কিছু হবে না। রাগ-বাগ করে আব কি হবে? এই ভাঙা-চোরা পুতুল নিয়ে কি খেলা হবে? বই-টই কিছু পেলে? কথাটার মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না। তেমনি—জড়-সড়, আবোল-তাবোল, জল-টল, ধার-ধোর, কাপড়-চোপড়, চাকর-বাকর, লাঠি-সোটা, রকম-সকম।

৪. ব্যতিহার বুঝাইতে শব্দদ্বৈত হয়। যেমন: তাহাদের মুখ-দেখাদেখি বন্ধ হইয়া গেল। চোখাচোখি হইলেই তাহাদের কথা-কাটাকাটি শুরু হইয়া যায়। রাতারাতি কাজটা সারিয়া ফেল। লোকজনের ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙিয়া গেল। আমি বুঝি সোজাসুজি। তাকে ধরাধরি করে সবাই বাড়ি নিয়ে এল। যা বলছ, খোলাখুলি বল। অত হাসাহাসি করছ কেন? এখানে তেমন কিছু কড়াকড়ি নেই। সরাসরি বাড়ি চলে যাও। তেমনি—কানাকানি, বলাবলি, মাঝামাঝি, পাশাপাশি, বাঁধাবাঁধি, হাঁটাহাঁটি, মারামারি, কাছাকাছি, মুখোমুখি, ঠেলাঠেলি, গড়াগড়ি, দৌড়াদৌড়ি, কোলাকুলি।

৫. ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও শব্দদ্বৈত ছাড়া **আর এক শ্রেণীর যুগ্ম বা জোড়া-শব্দ** বাংলা ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়।

ক. ইহাদের মধ্যে **বিপরীতার্থক যুগ্ম শব্দের** কথা আগেই আলোচনা করা হইয়াছে। যেমন—অগ্র-পশ্চাৎ ; আগা-গোড়া ; মরণ-বাঁচন ; দোষ-গুণ ; সুখ-দুঃখ ; হাসি কান্না ; ইতর-ভদ্র ; নাচন-কোদন ; আদান-প্রদান ; লেন-দেন ; দেনা-পাওনা ; উঠা-বসা ; রাত-দিন ; পড়া-শোনা ; ভালো-মন্দ ; ভাঙ্গা-গড়া ; আলো-আঁধার।

খ. এ ছাড়া **সমার্থক শব্দযুগ্মের প্রয়োগ দ্বারা** অর্থের ব্যাপকতা বোঝান যায়। যেমন—হাসি-খুশি ; ঝি-চাকর ; চোর-ডাকাত ; লোক-লস্কর ; বলা-কওয়া ; দুঃখ-কষ্ট ; আদর-যত্ন ; পাহাড়-পর্বত ; ঠাট্টা-তামাসা ; শিশি-বোতল ; ছাই-পাঁশ ; ধূলি-মাটি ; হেলা-ফেলা ; কান্না-কাটি ; চুরি-ডাকাতি ; হাট-বাজার ; লজ্জা-সরম।

গ **বিভিন্নার্থক শব্দযুগ্ম :** যেমন—অন্ন-বস্ত্র ; অন্ন-জল ; ভাত-কাপড় ; জল-বায়ু ; জামা-কাপড় ; টেবিল-চেয়ার ; দোয়াত-কলম ; খাতা-পেন্সিল ; ডাল-রুটি ; আসমান-জমিন ; ধূলা-বালি ; ইট-পাথর ; হাত-পা ; চোখ-কান ; গোঁফ-দাড়ি।

৬. **ধ্বন্যাত্মক বা অনুকারাত্মক শব্দের শব্দদ্বৈত** হয়। যেমন : **কলকল** —'এসো এসো হে তৃষ্ণার জল **কলকল ছলছল**।' **ঠংঠং**—'মন্দিরেতে কাঁসর-ঘণ্টা বাজল **ঠংঠং**।' **ঝরঝর**—'আজি বারি ঝরে **ঝরঝর** ভরা বাদরে।' **দুরু-দুরু**— 'দুরুদুরু করে হিয়া।' **সন-সন**—'দুলিছে পবনে **সন-সন** বন-বীথিকা।' **টন্‌টন্**— পুরাতন ব্যথাটা **টন্‌টন্** করে উঠল। **ছলোছলো**—'দিয়েছি পাতি মম জল **ছলোছলো** আঁখি।' **ফরফর**—**ফরফর** করিয়া নিশান উড়িতেছে। **ডিম্‌ডিম্**— 'দুন্দুভি বেজে ওঠে **ডিম্‌ডিম্** রবে।'

ধ্বন্যাত্মক শব্দ বা অনুকারাত্মক শব্দ

বাংলা ভাষায় এমন কতকগুলি শব্দ আছে, যাহারা স্বাভাবিক ধ্বনির অনুকরণ হইতে জাত। সেই ধ্বনি-সংকেত দ্বারা তাহারা বিশেষ বিশেষ অর্থ দ্যোতিত করে। এইরূপ শব্দকে **ধ্বন্যাত্মক** বা **অনুকারাত্মক শব্দ** বলে। যেমন : **'ঠক্'** করিয়া কী একটা মেঝেতে পড়িল। সে আমার পায়ে **'ঢিপ্'** করিয়া একটা প্রণাম করিয়া বসিল। দরজায় **'খুট্'** করিয়া এক শব্দ হইল। **'দুম্'** করে তার পিঠে পড়ল একটা তাল।

ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির আভিধানিক অর্থ খুঁজিতে যাওয়া বৃথা। ধ্বনির সাহায্যেই ইহারা মনের মধ্যে এমন একটি দ্যোতনার সৃষ্টি করে, তাহাতে উপস্থাপনা অত্যন্ত নিখুঁত হয়।

ইহাদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'সৈন্যদলের পশ্চাতে যেমন একদল অনুযাত্রিক থাকে, তাহারা রীতিমতো সৈন্য নহে, সৈন্যদের নানাবিধ প্রয়োজন সরবরাহ করে, • ইহারাও বাংলা ভাষার পশ্চাতে সেইরূপ ঝাঁকে ঝাঁকে ফিরিয়া সহস্র কর্ম করিয়া থাকে,

অথচ ঠিকমতো শব্দশ্রেণীতে ভর্তি হইয়া অভিধানকারের নিকট সম্মান প্রাপ্ত হয়. নাই। ইহারা না থাকিলে বাংলা ভাষার বর্ণনার পাঠ একেবারে উঠাইয়া দিতে হয়।' ইহারা অব্যয় এবং ক্রিয়ার বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। আবার, কখনও কখনও বিশেষ্যরূপে, কখনও বিশেষণরূপে, কখনও ক্রিয়ারূপে ইহাদের ব্যবহার দেখা যায়। এই প্রকার শব্দের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহারা অবিকৃত বা বিকৃতভাবে একবার বা দুইবার ব্যবহৃত হইয়া ধ্বনির ঝঙ্কার সৃষ্টি করিয়া বিশেষ অর্থ বোধগম্য করায়। যেমন:

আমি **অতশত** [অত প্রকার] জানি না।. খাওয়ার পরই শরীরটা তার **আইঢাই** [অস্বস্তিবোধ] করতে লাগলো। তাঁকে দেখার জন্যে মনটা **আঁকুপাঁকু** [উতলাবোধ] করছে। **আমতা-আমতা** [ইতস্ততঃ] করছ কেন ? যা ঘটেছে, তাই বল। 'মা বলিতে প্রাণ করে **আনচান** [অস্থির]।' বিকেল হতেই সে বাইরে যাবার জন্যে **উশখুশ** [অধীরতা প্রকাশ] করছে।

শশাটাকে সে **কচ্** [নরম জিনিস সংক্ষেপে কাটার শব্দ] করে কেটে ফেললো। লাউটাকে সে **কচ্‌কচ্** [বিলম্বিতভাবে কাটার শব্দ] করে কেটে ফেললো। সে বসে **কুচ্‌কুচ্** [মিহিভাবে কাটার শব্দ] করে পেঁয়াজ কাটছিল। **কচাকচ্** [সজোরে দ্রুত কাটার শব্দ] করে সে চালকুমড়োগুলো কাটতে লাগল। এক কোপে সে কলা-গাছটাকে **কচাৎ** [সজোরে সংক্ষেপে কাটার শব্দ] করে কেটে ফেললো। জাঁতি দিয়ে সে সুপুরিটা **কট্** [শক্ত জিনিস সংক্ষেপে কাটার শব্দ] করে কেটে ফেললো। দেখলাম, কুলের একটু সে **কুট্** [আরো সংক্ষেপে কাটার শব্দ] করে কামড়ে নিল। ভাত খেতে খেতে এখন **কটাৎ** বা **কটাস্** করে [শক্ত জিনিস সজোরে কাটার শব্দ] কাঁকর কামড়াতে হয়। তার কান **কট্‌কট্** [যন্ত্রণা] করছে। ডোবার ধারে পোকামাকড় **কিল্‌বিল্** [দলবদ্ধভাবে বিচরণ] করছে। পিঁপড়ে খেয়ে ব্যাঙ্ মশায়ের পেট করে **কুট্‌কুট্** [মৃদু ব্যথা]। জানালাটা **খট্** [শক্ত জিনিস ঠুকিবার শব্দ] করিয়া খুলিয়া গেল। অন্ধকারে কে যেন **খুট্** [ঐ মৃদু ও সংক্ষিপ্ত শব্দ] করিয়া বাক্স খুলল। দরজায় **খটাৎ** [জোর শব্দ] করিয়া খিল দিবার শব্দ হইল। অন্ধকারে কোথায় যেন **খটাস্** [খটাৎ-এর চেয়ে জোর] করিয়া শব্দ হইল। তিনি খড়ম পায়ে **খট্‌খট্** [ক্রমাগত খট্ শব্দ] করে সারা বাড়ি চষে বেড়াচ্ছেন। চোখে বালি পড়ে **খচ্‌খচ্** [কর্কশ ও কষ্টকর স্পর্শের অনুভূতি] করছে। সে রাগে **কট্‌কট্** [ক্রোধের ভাব প্রকাশ] করে তাকিয়ে রইলো। 'হেসে **খলখল** [আনন্দে হাসির শব্দ] গেয়ে **কলকল** [মধুর অস্ফুট ধ্বনি] তালে তালে দিব তালি।' '**কড়্ কড়্ কড়্** [মেঘের শব্দ] ডাকবে দেয়া, আসবো আমন ক'য়ে।' সারাদিন বাঁদরগুলো করছে **কিচির-মিচির** [একটানা কর্কশ কোলাহল], আর সারারাত **কিচমিচ** [একটানা মৃদু কলরব] করছে বাদুড়গুলো। 'কেবল তার পেটের মধ্যে পুঁথির শুকনো পাতা **খস্‌খস্** [পত্রের ঘর্ষণের শব্দ] **গজ্‌গজ্** [কথা বাহির হইবার জন্য ভাব-প্রকাশক] করিতে লাগিল।' আজ ঘরবাড়ি যেন **খাঁ খাঁ** [শূন্যতা বোধ] করছে। 'সুভাষিণী **খিল্‌খিল্** [ক্রমাগত হাসির শব্দ] করিয়া হাসিয়া উঠিল।' 'তিনিও একটু **খিটখিটে** [সদা বিরক্ত]—

তাঁহাকে বশ করিয়া লইতে হইবে।' আজকাল **খুঁতখুঁত্** [অসন্তুষ্ট হওয়া] করা তোমার স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

"কেবল সেই 'দাঁড়াও' শব্দ অনেকক্ষণ **গম্‌গম্** [ধ্বনিত গম্ভীর শব্দ] করিতে লাগিল।" উনুনে আগুন **গন্‌গন্** [আগুনের প্রখরতার ভাব] করছে আর সেই গন্‌গনে [তেজাল] আগুনে কড়া চাপিয়ে সে বেগুন ভাজছে। আমার কথায় কান না দিয়ে **গট্‌গট্** বা **গট্‌মট্** [সদম্ভ পদক্ষেপের শব্দ] করে চলে গেল। সে **গড়্‌গড়্** [দ্রুত ও অনায়াসে] করে ছড়া মুখস্থ বলতে পারে। সে রাগে **গর্‌গর্** [চাপা ক্রোধের ভাব] করতে লাগলো। ফাটা কপাল থেকে **গল্‌গল্** [অবিরল ধারায়] করে রক্ত ঝরছিল। বাড়িতে আজ লোকজন **গিজ্‌গিজ্** [ঠাসা-ঠাসির ভাব] করছে। **গুঁড়িগুঁড়ি** [একটানা বিন্দু বিন্দু] বৃষ্টি পড়ে। সে নিজের মনে **গুন্‌গুন্** [অস্ফুট স্বরে] করে গান গাইছে। **গুড়্‌গুড়্** [মৃদু গড়্ গড়্ শব্দ] শব্দে মেঘ ডাকছিল। '**গুরুগুরু** [গম্ভীর মেঘগর্জনধ্বনি] মেঘ গুমরি' গুমরি' গরজে গগনে গগনে।' 'চরকার **ঘর্‌ঘর্** [একটানা মৃদু চাকার শব্দ] পড়শীর ঘর-ঘর।' ঘেমায় সারা গা-টা আমার **ঘিন্‌ঘিন্** [ঘৃণাহেতু অস্বস্তি-বোধ] করছে। কুকুরের বাচ্চাটা সারাদিন **ঘুর্‌ঘুর্** [ঘোরাঘুরি করার ভাব] করছিল। রুগ্‌ণ ছেলেটা সব সময় **ঘ্যান্‌ঘ্যান্** [ক্রমাগত বিরক্তিকর নাকী স্বরে কান্না] করে কাঁদছে।

লোভে তার চোখদুটো **চক্‌চক্** [দীপ্ত] করে উঠলো। '**চিক্‌চিক্** [মৃদু দীপ্তি] করে বালি কোথা নাহি কাদা।' শীতকালে শুকনো গা **চড়্‌চড়্** [শীতের টান] করে। গ্রীষ্মের রোদ্দুর মাথার ওপর **চন্‌চন্** [প্রখরতাবোধক] করছিল। **চন্‌চনে** [শুষ্ক এবং প্রখর] রোদ্দুরে আমের বোলগুলো সব ঝরে গেল। আঙুলের কাটা জায়গাটা **চিন্‌চিন্** [ঈষৎ ব্যথা] করছে। খোকা **চুক্‌চুক্** [জিভ দিয়া দুধ খাইবার শব্দ] করে সবটুকু দুধ খেয়ে ফেলেছে। সে কেন **চুল্‌বুল্** [অস্থিরতার ভাব] করে ওখানে ঘুরে বেড়ায়? তাহাকে দেখিবার জন্য জননীর প্রাণ **ছট্‌ফট্** [অস্থিরতা] করিতেছিল। 'শ্রাবণ-আকাশে ওই দিয়েছি পাতি মম জল-**ছলছল** [সজল] আঁখি মেঘে মেঘে।' 'মায়ের কথায় তাহার চোখ **ছলছল** [অশ্রুপূর্ণ] করিয়া উঠিল।' ঐ বনের ধারে গেলেই সবার গা **ছম্‌ছম্** [ভয়সূচক] করে ওঠে।

অন্ধকারে তার চোখদুটো **জ্বল্‌জ্বল্** [দীপ্তিসূচক] করছিল। তোমার ঐ **জ্বল্‌জ্বল্** [অল্প উজ্জ্বল] করে চেয়ে থাকা আমার ভালো লাগে না। 'আজি বারি ঝরে **ঝরঝর** [ক্রমাগত পতনের শব্দ] ভরা বাদরে।' 'শরতে ধরাতল শিশিরে **ঝলমল** [উজ্জ্বল]। **ঝমঝম** [বৃষ্টি পতনের শব্দ] করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করলো। মলপায়ে সে **ঝম্‌ঝম্** [চলার শব্দ] করে হাঁটছিল। সারাদিন পড়ছিল **ঝম্‌ঝম্** [ক্রমাগত বৃষ্টির শব্দ] করে বৃষ্টি। 'শৃঙ্খলে বারবার **ঝন্‌ঝন্** [কর্কশ ঝনৎকার] ঝংকার, নয় এ তো তরণীর ক্রন্দন শঙ্কার।' '**ঝন্‌ঝনি ঝন্‌ঝনি** [তালে তালে কর্কশ ঝনৎকার] খঞ্জনি বাজে।' পরিষ্কার মেঝেটা আজ যেন **ঝক্‌ঝক্** [তীব্র উজ্জ্বল] করছে। চাময়ের সোনা বাঁধানো হাতল-গুলো রোদ্দুরে **ঝক্‌ঝক্** [সূক্ষ্ম উজ্জ্বল] করছিল। 'নদীর তরঙ্গহীন প্রবাহের উপর আলো

ঝিক্‌মিক্ [মৃদু উজ্জ্বল] করিতেছে। 'নদীর শান্ত জলে তখন রৌদ্র ঝিক্‌মিক্ [অতি মৃদু উজ্জ্বল] করিতেছিল।' 'গায়ে আলো করে ঝিক্‌মিক্ [আলোর মৃদু কম্পন] যেন পরেছে হীরার চিক্।' 'ঝিকিমিকি [আলোর মৃদু অথচ দ্রুত কম্পন] করে পাতা, ঝিলিমিলি [মৃদু ঝলমল] আলো। সারাক্ষণ তার হাত-পা ঝিন্‌ঝিন্ [অস্বস্তিকর জ্বালা] করছে। নদীর জল তিরতির [লঘু প্রবাহের ভাব] করে বয়ে চলেছে। ঝিরঝির [মৃদু কলধ্বনি] করে ঝরছে ঝরনার জল। দেয়ালের গা থেকে বালি ঝুরঝুর [মৃদু ঝুরঝুর শব্দ] করে ঝরে পড়ছে। 'ঝুরুঝুরু [মৃদু ঝরঝর শব্দ] পাতাগুলি নড়ে।' 'অগ্নিশিখার মতো তাদের সর্পিল উর্ধ্ব গতির প্রতি চাহিয়া থাকিলে মাথা ঝিম্‌ঝিম্ [অবশতার ভাব] করে।' 'নূপুরের ঝিনিঝিনি, ঝুনুঝুনু [মৃদু নিক্কণ] শব্দে সারা প্রাসাদ মুখরিত হইয়া উঠিল।' ঝুম্‌ঝুম্ [মৃদু ঝম্‌ঝম্ শব্দ] করে পায়ের মল বাজিয়ে সে চলে গেল। 'পাড়-ভাঙার অবিশ্রাম ঝুপ্ ঝাপ্ [ক্রমাগত পতনের শব্দ] শব্দ এবং জলের গর্জনে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল।' নদীর পাড়-ভাঙার ঝুপ্‌ঝুপ্ [ক্রমাগত পতনের মৃদু শব্দ] শব্দের যেন আর বিরাম নেই।

বুকটা ব্যথায় টন্‌টন্ [অস্বস্তিবোধ] করে উঠলো। দীঘির জল টল্‌টল্ [স্বচ্ছতার ভাব] করছে। বর্ষায় গঙ্গার জল টল্‌মল্ [অস্থির আন্দোলন] করছে। কলে টপ্‌টপ্ [ফোঁটায় ফোঁটায় শব্দ] করে জল পড়ছে। সারাদিন টিপ্‌টিপ্ [দ্রুত পড়ার শব্দ] করে বৃষ্টি পড়ছিল। কাঁচা কুলগুলো সে টপাটপ [দ্রুত] গিলতে লাগলো। 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর [বৃষ্টিপাতের মৃদু শব্দ] নদেয় এলো বান।' 'কুন্দ দন্তে আপন অধর দংশন করিয়া টিপিটিপি [নিঃশব্দে] হাসিতেছে।' 'মুদির দোকানে টিম্‌টিম্ [ক্ষীণ আলো] করে দীপ জ্বলে একখানে।' গ্রামে একটিমাত্র পাঠশালা, তাও অর্থাভাবে টিম্‌টিম্ [ক্ষীণভাবে অস্তিত্ব বজায় রাখা] করছে। 'এ পারেতে লঙ্কা-গাছটি রাঙা টুক্‌টুক্ [ঘোর লাল অথচ সুন্দর] করে।' 'দেয় ডুব টুপ্‌টুপ্ [দ্রুত ডুব দেওয়া] ঘোমটার বউটি।' রাস্তায় রিক্‌শাওয়ালা টুংটাং [ধাতুদ্রব্যাদির আওয়াজ] ঘণ্টা বাজিয়ে চলেছে। 'হাতে লণ্ঠন করে ঠন্‌ঠন্ [ধাতুদ্রব্যের শব্দ]।' 'মন্দিরেতে কাঁসরঘণ্টা বাজলো ঠংঠং [ঐ]।' আর শোনা যায় ভারবাহী পশু-কণ্ঠের ঠুংঠুং [ঘণ্টাদির মৃদু শব্দ] ধ্বনি। 'এমন সময় একটা ঠক্‌ঠক্ [কঠিন বস্তু ঠুকিবার] শব্দের সহিত গহনার ঝম্‌ঝম্ শব্দ শোনা গেল।' সে ভয়ে ঠক্‌ঠক্ [প্রবলভাবে] করে কাঁপছিল। 'ঠুন্ ঠুন্ [ধাতুপাত্রের আওয়াজ] পেয়ালা কেয়া রংবেরং।'

'ডিমিডিমি [ডমরুধ্বনি] বাজে ডমরু ভাল।' সে তার বড় বড় চোখে ড্যাব্-ড্যাব্ [বিস্ফারিত] করে চেয়েছিল। ড্যাং ড্যাং বা ড্যাড্যাং ড্যাং [ঢাকের ধ্বনি] করতে করতে বিসর্জনের শোভাযাত্রা চলে গেল। সে ঢক্‌ঢক্ [দ্রুত পানের শব্দ] করে সবটুকু জলই খেয়ে ফেললো। ওর সব কটা দাঁতই নড়বড়ে [নড়িবার শব্দ] করে নড়ছে। 'বাইরে কোঁচার পত্তন, বাড়িতে হাঁড়ি তো ঢন্‌ঢন্ [শূন্যকুম্ভের আওয়াজ]।' বেশী খেয়ে আইঢাই পেট করে ঢপ্‌ঢপ্ [শূন্যগর্ভ দ্রব্যে আঘাতের শব্দ]। 'ঢলঢল [সৌন্দর্য-তরঙ্গিত] কাঁচা অঙ্গের লাবণী অবনী বহিয়া যায়।' খুব

রোগা হয়ে গেছ, তাই জামাটা গায়ে **চলচল** [ঢিলা হওয়া] করছে। হেড্‌মাস্টার মশায়কে ক্লাসে হঠাৎ ঢুকতে দেখে ভয়ে সবার বুক **ঢিপ্‌ঢিপ্‌** [ভারি জিনিসের ক্রমাগত পতনের শব্দ] করতে লাগলো। 'হে যোগীন্দ্র, যোগাসনে **ঢুলুঢুলু** [আবেশ-বিভোর] দু'নয়নে, বিভোর বিহ্বল মনে কাহারে ধেয়াও?'

'মাঝে মাঝে এক-একটা জায়গা ঘৃতকুমারীর বেড়া দিয়ে ঘেরা, পরিষ্কার **তক্‌তক্‌** [পরিচ্ছন্নতা] করিতেছে।' নীচে জল **তর্‌তর্‌** [স্বচ্ছতা] করে বয়ে চলেছে। আমটা পেকে **তল্‌তল্‌** [খুব নরম অবস্থা] করছে। 'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে **তাতা থৈথৈ তাতা থৈ থৈ** [তাণ্ডব-নৃত্যের বোল]।' '**তুল্‌তুল্‌** [অতিশয় কোমল] টুকটুক্ কোন্ ফুল তার তুল।' '**থরথর** [প্রবল কম্প] করি কাঁপিছে ভূধর।' বর্ষার জলে মাঠ-ঘাট **থইথই** [তরল পদার্থের পরিব্যাপ্তি] করছে। থালায় পায়েস **থক্‌থক্‌** [ঘন ও ঈষৎ তরল] করছে। ছাল উঠে গিয়ে ঘা-টা **থক্‌থক্‌** [ক্ষত সাংঘাতিক হওয়া] করছে। লোকটার মেদবহুল শরীরে পেটের মাংস **থল্‌থল্‌** [স্থূল কোমল ও স্থিতি-স্থাপক] করছে। নিস্তব্ধ নিশুতি রাত **থমথম্‌** [নিথর] করছিল। তাহার বিষণ্ণ মুখখানি মেঘাবৃত আকাশের ন্যায় **থম্‌থম্‌** [জলভারাক্রান্ত] করিতেছিল। বর্ষাকালে ওদের উঠোনে পোকামাকড় **থিক্‌থিক্‌** বা **থক্‌থক্‌** [গাদাগাদি] করতে থাকে। লাঠিহাতে বৃদ্ধ একাকী **থুড়্‌থুড়্‌** [দুর্বলতাহেতু কম্পন] করে হেঁটে চলেছেন।

ঘা-টা সকাল থেকে **দগ্‌দগ্‌** [জ্বলন] করছে। অন্ধকারে জোনাকিরা **দপ্‌দপ্‌** [জ্বলন] করিয়া জ্বলিতে নিভিতে লাগিল। তাহার কপালের শিরা **দপ্‌দপ্‌** বা **দব্‌দব্‌** [ঈষৎ যন্ত্রণা] করিতেছে। তার গা থেকে **দরদর** [ক্ষরণ] করে ঘাম ঝরছিল। '**দরোদরো** [জল পড়ার শব্দ] বেগে জলে পড়ি জল ছলোছলো উঠে বাজি রে।' 'আমলকি বন কাঁপে যেন তার বুক করে **দুরুদুরু** [ভয়ে কম্পন]।' সারা পাহাড়-বন **দাউদাউ** [প্রবলভাবে জ্বলা] করে জ্বলে উঠলো। অন্ধকারে কারা যেন **দুড়্‌দাড়্‌** [অতি দ্রুত ও উচ্চ পদশব্দ] করে এগিয়ে আসছে শুনে আমার বুকের ভিতরটা **দুড়্‌দুড়্‌** [ভয়াদি-হেতু কম্পন] করছিল। সারাদিন বাড়ির মধ্যে **দুপ্‌দুপ্‌** [ক্রমাগত মৃদু ধপ্ শব্দ] শব্দ ভালো লাগে না। সমস্ত দিন ওরা **দুম্‌দুম্‌** [ক্রমাগত দুম্‌দুম্ শব্দ] করে ছাত পিটোয়। অমন **দুম্‌দুম্‌** [ক্রমাগত মৃদু দুড়ুম শব্দ] করে হাঁটছো কেন? ছাদের উপর **দুম্‌দাম্‌** [গভীর আঘাতের শব্দ] করে হাঁটছে কে? '**ধক্‌ধক্‌** [প্রবল অগ্নি-জ্বলনের আওয়াজ] দশদিকে বিদ্যুতের ঝলা।' বুকটা **ধড়ফড়** [অস্থিরতা] করিয়া উঠিল। অন্ধকারে শব্দটা শুনেই **ধড়মড়** [আকস্মিক ব্যস্ততা] করে উঠে বসলাম। 'এঞ্জিনের **ধকধকি** [প্রবল স্পন্দনের শব্দ] সব গেল থেমে।' শাদা কাপড়খানা **ধপ্‌ধপ্‌** বা **ধব্‌ধব্‌** [অতিশয় শুভ্রতা] করছে। মায়ের বুকে পুত্রশোক তুষের আগুনের মতো **ধিক্‌ধিক্‌** বা **ধিকিধিকি** [ধীরে ধীরে জ্বলার শব্দ] জ্বলছে। '**ধুক্‌ধুক্‌** [মৃদু স্পন্দন] করে বুক।' 'আগুন **ধু ধু** [তীব্র আগুন জ্বলার শব্দ] করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।' দিগন্ত পর্যন্ত শুকনো মাঠ **ধু ধু** [শূন্যতা] করছে। 'তাই বলি—সাবধান! করো নাকো **ধুপ্‌ধুপ্‌** [ভারী কিছু পতনের শব্দ]।' মজা পেয়ে

ছেলেরা **ধেই ধেই** [তাণ্ডব-নাচের আওয়াজ] করে নাচতে লেগেছে। ভাঙা কুঁড়েটা **নড়বড়** [দুর্বল কিছুর পতনের আশঙ্কা] করছে। ওকে বেশ এক হাত শিক্ষা দেবার জন্য হাতদুটো **নিস্‌পিস্‌** [অস্থিরতা] করছে।

তারা **পট্‌পট্‌** [মৃদু স্ফুটন] আখগুলো ভেঙে নিয়ে চিবোতে শুরু করে দিল। 'হঠাৎ একটা বিদ্যুৎ অন্ধকারটাকে আকাশের এক ধার হইতে আর এক ধার পর্যন্ত **পটাপট্‌** [বস্ত্রাদি ছেঁড়ার শব্দ] শব্দ করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল।' সে ফুল পেড়ে **পটাপট্‌** [অতি দ্রুত] পকেটে ভরতে লাগলো। শয়তান লোকটা আবার কেমন **পিট্‌পিট্‌** [অস্পষ্ট দৃষ্টিনিক্ষেপ] করে তাকায়। শুচিবায়ুগ্রস্তরা দিনরাত **পিট্‌পিট্‌** [স্পর্শভীতি] করে। মেলায় লোক **পিল্‌পিল্‌** [বহুজনের একত্র গমন] করে চলেছে। **পোঁ পোঁ** [বাঁশির শব্দ] করে বাঁশি বাজছিল। আমাকে দেখে তারা **পোঁ** [অতি দ্রুত] করে দৌড় দিল। উঠোনে কাদা **প্যাচ্‌ প্যাচ্‌** [জলকাদা মাড়াইয়া চলার শব্দ] করছে। রুগ্‌ণ ছেলেটা দিনরাত **প্যান্‌ প্যান্‌** [একগুঁয়ে নাকী কান্না] করে কাঁদে। সে **ফড়্‌ফড়্‌** [বস্ত্রাদি ফাড়িয়া ফেলিবার শব্দ] করে কাপড়খানা ফেড়ে দু'খানা করে ফেললো। '**ফর্‌ফর্‌** [পাতলা বস্তুর উড়িবার শব্দ] নিশান চলেছে পোতশ্রেণী।' আমাকে দেখলেই সে **ফিক্‌ফিক্‌** [ক্রমাগত ঈষৎ হাসি] করে হাসতে থাকে। অতি মিহি ধুতিটা **ফিন্‌ফিন্‌** [অত্যন্ত মিহি] করছে। 'বোল তার **ফিস্‌ ফিস্‌** [চাপা স্বর]।' বাইরে চলো, দেখবে জ্যোৎস্না কেমন **ফুট্‌ফুট্‌** [উজ্জ্বলতা] করছে। বাতাসে **ফুর্‌ফুর্‌** [হাল্‌কা জিনিস ওড়ার শব্দ] করে তার মাথায় চুল উড়ছিল। সে রাগে **ফোঁসফোঁস** [ক্রুদ্ধ গর্জনের শব্দ] করছিল। 'আর আর স্ত্রীলোকেরা **ফেল্‌-ফেল্‌** বা **ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌** [বিমূঢ় চাহনি] করিয়া চাহিয়া রহিল।' চিরকাল এইভাবে **ফ্যা-ফ্যা** [নিষ্ফল সন্ধান] করে ঘুরে বেড়ালে কি চলবে?

দিনরাত ছেলেটা কেবল **বক্‌বক্‌** [বাচালতা] করছে। '**ববম্‌ ববম্‌** [গালবাদ্য] বাজায় গাল।' 'তার হাতের খাঁড়া তখন **বন্‌বন্‌** [দ্রুতবেগে ঘূর্ণন] করে ঘুরছে।' 'ঘোড়াচুলো গাছগুলো ছোটে **বাঁইবাঁই** [দ্রুত ছুটিবার ভাব]।' লোকটা **বিড়্‌ বিড়্‌** [আপন মনে অনুচ্চ কথন] করে নিজের মনে কি বকছে। 'প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রহ **বোঁ বোঁ** [সবেগে ঘূর্ণন] করে যায়।' **ভন্‌ভন্‌** [বিশ্রী গুঞ্জন] করে মাছি উড়ছে। 'মধুমাসে মনোহর সৌরভেতে **ভরভর** [গন্ধে আমোদিত] প্রফুল্ল ফুলের কত শোভা।' '**ভভম্‌ ভভম্‌** [শিঙাদির শব্দ] বাজায় শিঙা।' 'কদম্বে আজ শিথিল রেণু সুবাসে **ভুর্‌ভুর্‌** [গন্ধে আমোদিত]।' 'হারাধনের একটি ছেলে কাঁদে **ভেউ ভেউ** [আকুল ক্রন্দন]।' 'চক্ষে শূন্যময় দেখে **ভোঁ ভোঁ** [ক্রমাগত ঘূর্ণনের শব্দ] করে কান।' জলার ধারে ব্যাঙগুলো **মক্‌মক্‌** [ব্যাঙের ডাক] করছে। 'নতুন চীনের জুতা করে **মস্‌মস্‌** [শুষ্ক চর্মাদি দুমড়াইবার শব্দ]।' বনের পাতাগুলো **মর্‌মর্‌** [পত্র কম্পনের শব্দ] শব্দ করিয়া কাঁপিতেছিল। ভূতেরা মানুষ ধরে আর **মট্‌ মট্‌** [শক্ত কিছু ভাঙার শব্দ] করে ঘাড় মটকায়। **মড়্‌ মড়্‌** [কঠিন দ্রব্য ভাঙিবার শব্দ] করে গাছের ডালটা

ভেঙে পড়লো। 'ময়ূর **মিটিমিটি** [নিমীলিত চাহনি] চায়।' ঘরের কোণে পিদিমটা **মিটমিট্** [ক্ষীণ আলো] করে জ্বলছিল। শরীরটা আজ **ম্যাজ্ ম্যাজ্** [অসুস্থতা] করছে।

'তাহার সর্বাঙ্গ রাগে **রিরি** [তীব্র ক্রোধ] করিয়া জ্বলিতে লাগিল।' 'অরণ্যের প্রত্যেক পাতা সেই শব্দের কম্পনে **রিরি** [তীক্ষ্ণ ঘর্ষণের অনুভূতি] করিতে লাগিল।' '**রমঝিম্** [মৃদু বৃষ্টিপাতের শব্দ] ঘন ঘন রে বরষে।' 'শাওন রজনী ঘন ঘন দেয়া গরজন **রিমিঝিমি** [অঝোরে বৃষ্টির শব্দ] শবদে বরিষে।' 'মন্দার বাজুক **রিন্-রিন্** [তারযন্ত্র বা নূপুরের শব্দ] **রিন্**।' পায়ের মল **রিনি ঝিনি** [নূপুরাদির শব্দ] শব্দে বাজতে লাগল। 'নূপুর বেজে যায় **রিনিরিনি** [ঐ]।' 'গান তার গুনগুন, মঞ্জীর **রুনরুন্** [ঐ]।' 'বেগুনেটের সনে নব পাশারাতে এই অলংকারের **রুনরুনি** [অলংকারাদি শব্দ]।' '**রুনু-রুনু** [নূপুর বা অলংকারের আওয়াজ] রবে বাজে আভরণ।' 'ঝংকারিবে মঞ্জীর **রুণু-রুণু** [নূপুরের শব্দ]।' '**লকলক্** [নমনীয় পদার্থের আন্দোলিত হওয়া] শিখা উঠিবে কেঁপে।' '**লটপট** [লুটিবার বা দুলিবার ভাব], জটা লপটে যায়।'

'দুলিছে পবনে **সনসন** [অতিদ্রুত বেগসূচক] বনবীথিকা।' আমাদের পাশ দিয়ে সাপটা **সড়সড়** [সর্পাদির দ্রুত গমনসূচক] করে ছুটে গেল। বৃষ্টির ছাটে বিছানাটা ভিজে **সপ সপ্** [জল সিক্ত] করছে। সে তখন **সপ সপ্** [তরল বস্তু খাইবার শব্দ] করে পায়েস খাচ্ছিল। ঠাকুর পিঠে তারপর **সপাং সপাং** [ক্রমাগত বেত্রাঘাতের শব্দ] বেত পড়তে লাগলো। তিনি **সপ সপ** [দ্রুত সপ্ সপ্ শব্দে আহার] করে একনিঃশ্বাসে পায়েসটুকু শেষ করে ফেললেন। বাইরে তখন **সাঁ সাঁ** বা **সাঁই সাঁই** [প্রবল বেগ] করে ঝড় বইছিল। এমন সময় **শোঁ শোঁ** বা **সোঁ সোঁ** [ঐ] শব্দে ছুটে এলো প্রচণ্ড ঝড়। সকালের হিমেল বাতাসে গা-টা **শিরশির্** বা **সিরসির্** [শিহরণের ভাব] করে উঠলো। দেখি, পথ দিয়ে চাটুজ্জে মশাই **হনহন্** [দ্রুতবেগে] করে হেঁটে চলেছেন। 'পশ্চাৎ হতে **হাহা** [অট্টহাসি] করে হাসি মত্ত ঝটিকা ঠেলা দেয় আসি।' 'ফাগুন করিছে **হাহা** [শূন্যতা] ফুলের বনে।' কাকটা **হাঁ হাঁ** [শূন্যতাবোধক] করছে! ওকে দেখামাত্র **হিহি** [বিদ্রূপের হাসি] করে সবাই হাসল। 'হাঁফ ছাড়ে **হাঁস-ফাঁস** [কষ্টে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস] ও রকম হাঁ করে।' 'গরম বাতাস **হু হু** [বেগে বাতাস বহিবার শব্দ] করে ছুটে যাচ্ছে ধুলো উড়িয়ে।' অমল আর পৃথিবীতে নেই শুনে আমার মনের ভেতরটা **হু হু** [যাতনা ও নৈরাশ্য] করে উঠলো। কিছু বলবার আগেই সে **হুড়হুড়** [জোরে জল পড়া] করে এক কলসি জল আমার মাথায় ঢেলে দিল। ভয় পেয়ে আমরা রাস্তার পাশের বাড়ির বৈঠকখানায় **হুড়মুড়** [ঠেলাঠেলি করিয়া প্রবেশ] করে ঢুকে পড়লাম। 'ছেলেরা সব বাসায় ছোটে **হো হো** [অট্টহাসি] করে উড়িয়ে দিয়ে ধুলো।' এমন সময় রাস্তার পাশের লোকগুলো **হৈ-হৈ** [উচ্চ গোলমাল] করে উঠলো।

ধ্বন্যাত্মক শব্দের বিশেষণরূপে ব্যবহার

ধ্বন্যাত্মক বিশেষণ : ইহাদের ধ্বন্যাত্মক বিশেষণও বলা হয়। **কচ্‌কচে** [চিবাইলে কচ্‌কচ্‌ আওয়াজ] ডাঁশা পেয়ারা খেতে বেশ লাগে। বাগানে খুব **কট্‌কটে** [কট্‌কট্‌-শব্দকারী] ব্যাঙ্‌ হয়েছে। তোমার ওই **কট্‌মটে** [নীরস] কথা আমার একেবারে ভালো লাগে না। এখন বেশ **কড়মড়ে** বা **কড়কড়ে** [চিবাইলে কড়কড় শব্দ] চাল-ভাজা হলে মন্দ হয় না। 'সেদিন **কন্‌কনে** [তীব্র শীতল] সন্ধ্যা।' আমি **কড়কড়ে** [আনকোরা] পঞ্চাশটি টাকা তাকে গুনে দিলাম। মেয়েটা একেবারে **কুচ্‌কুচে** [গাঢ় ও চক্‌চকে] কালো। শুক্‌নো **খট্‌খটে** [শুষ্ক] মেঝের ওপর পড়েছে বোশেখ মাসের রোদ। এমন **খড়্‌খড়ে** [খড়খড়-শব্দকারী] কাপড় আমার পরতে ভালো লাগে না। অন্ধকারে বুড়ির **খন্‌খনে** [খন্‌খন্‌ আওয়াজ-সৃষ্টিকারী] কথা শুনে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। এত **খস্‌খসে** [অমসৃণ] কাপড় আমি পরতে পারি না। তোমার মতো **খুঁতখুঁতে** [সব কিছুতেই অসন্তুষ্ট] ছেলে আমি আর দেখিনি। উনুনে এখনও বেশ **গন্‌গনে** [তেজাল] আগুন রয়েছে। এমন **ঘ্যান্‌ঘ্যানে** [ঘ্যান্‌ ঘ্যান্‌ করে এমন] ছেলে আর দেখিনি ; সব সময় কান্না। এই **ঘুট্‌ঘুটে** [গাঢ়] অন্ধকারে পথ চিনে এলে কি করে ? রোজ রাতে তার **ঘুস্‌ঘুসে** [চাপা] জ্বর হচ্ছে। আজ সকালে বেশ **চন্‌চনে** [প্রখর] রোদ উঠেছে। মেয়েটি বেশ **চট্‌পটে** [তৎপর] তো ! তার **চক্‌চকে** [উজ্জ্বল] জুতোয় কি করে কাদার দাগ লাগলো ? **চট্‌চটে** [আঠাল] মেঝেতে পা ফেলে হাঁটতে বিশ্রী লাগছিল। ছেলেটির বেশ **ছিপ্‌ছিপে** [কৃশ ও লম্বা] চেহারা। **ঝর্‌ঝরে** [গোটা গোটা] ভাত না হলে উনি আবার খান না। কলমটাতে বেশ **ঝর্‌ঝরে** [স্পষ্ট] লেখা হয়। শরতের এই **ঝল্‌মলে** [উজ্জ্বল] রোদ্দুর কার না ভাল লাগে ? '**ঝক্‌ঝকে** [উজ্জ্বল] নীলাকাশ সোনাঢালা রোদ্দুর।' ছোট্ট **টুকটুকে** [সুশ্রী] একটি মেয়ে রোজ সকালে স্কুল যেয়ে যেত। **টক্‌টকে** [গাঢ়] লাল-পেড়ে শাড়িতে তাকে বেশ মানাতো। কপালে তার **ডগডগে** [অতি গাঢ়] সিঁদুরের টিপ্‌। সে কিছু না বলে তার **ড্যাব্‌ড্যাবে** [ভাসা ভাসা] চোখে চেয়ে রইলো। ঐ **ডিগ্‌ডিগে** [অতিশয় কৃশ] লোকটার গায়ে এত জোর তা কে আগে জানতো ! মেঘ্‌লা আকাশে রোদ্দুর উঠলেই মেয়েটির **ঢলঢলে** [লাবণ্যময় মুখ মনে পড়ে। এমন **তক্‌তকে** [পরিষ্কার ও উজ্জ্বল] উঠোনখানা নোংরা করলে কে ? ঘা-টার রং হয়েছে **দগ্‌দগে** [ক্ষতাদির ভাব-সূচক] লাল। '**ফুট্‌ফুটে** [উজ্জ্বল] জোছনায় **ধব্‌ধবে** [অতিশয় পরিচ্ছন্নতা] আঙিনায় একখানি মাদুর পাতিয়ে জননী শুইয়া আছে।' ওরা থাকতো একটি **নড়বড়ে** [পতনোন্মুখ] পাতার কুটিরে। লাঠি হাতে চলেছিলেন **থুথুড়ে** [অশক্ত ও কম্পমান] এক বুড়ো। **ফিন্‌ফিনে** [অতি-মিহি] আদ্দির পাঞ্জাবিটা ছিঁড়ে গেল। **ফুর্‌ফুরে** [লঘু] হাওয়ায় একটু ঘুরে এসো। লোকটা একেবারে **মিশমিশে** [গাঢ়] কালো। **লিকলিকে** [কৃশ] চেহারার লোকটা হাতে **লক্‌লকে** [নমনীয় ও আন্দোলনশীল] একখানা বেত নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

● ধ্বন্যাত্মক শব্দের ক্রিয়ারূপে ব্যবহার

ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া : সাধারণতঃ 'ইয়া' বা 'ইয়ে' প্রত্যয় যোগে অসমাপিকা ক্রিয়ারূপেই ইহাদের ব্যবহার। যেমন : মায়ের কথা মনে হতেই খোকনের চোখদুটে **ছল্‌ছলিয়ে** উঠলো। 'ঢাল তলোয়ার **ঝন্‌ঝনিয়ে** বাজে।' '**চড়চড়িয়ে** পাহাড় ফাটে।' 'গড়ের মাঠে ঘোড়ার গাড়ি **গড়্‌গড়িয়ে** যায়।' খড়খড়িটার পাশে তার বুকটা **ধড়ফড়িয়ে** উঠলো। ভিড় ঠেলে **তড়বড়িয়ে** এগিয়ে গেলাম। আকাশ **কড়কড়িয়ে** একেবারে থেমে গেল। 'দুধের চাঁছি শুষছে মাছি, উড়ছে কতক **ভন্‌ভনিয়ে**।' 'ঘুরছে লাঠি **বন্‌বনিয়ে**।' 'যাচ্ছে কারা **হন্‌হনিয়ে**।'

● ধ্বন্যাত্মক শব্দের বিশেষ্যরূপে ব্যবহার

ধ্বন্যাত্মক বিশেষ্য : ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি মূলতঃ অব্যয় ; বিশেষ্যরূপেও ইহাদের প্রয়োগ দেখা যায়। তখন ইহাদের **ধ্বন্যাত্মক বিশেষ্য** বলা হয়। যেমন : তোমাদের **কচকচি** [একটানা তর্ক-বিতর্ক] আমার আর ভালো লাগে না। তোমার লেখার **কটমটি** [দুর্বোধ্যতা] এখনও যায়নি। বাজের **কড়কড়ানি**, ঝড়ের **শন্‌শনানি** আর পাতার **খস্‌খসানি** শুনে বুকের **ধুকুধুকানি** বেড়েই চললো। 'শালিকরা সব মিছিমিছি লাগিয়ে দেবে **কিচিমিচি** [কলরব]।' 'এঞ্জিনের **ধক্‌ধকি** [ধক্‌ধক্‌ শব্দ] সব গেল থেমে।' দূর থেকে অশ্বের **ঝমঝমি** শোনা যেতে লাগলো। ছোট্ট মেয়ে একলা বসে বাজায় **ঝুমঝুমি**।

এই ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি বাংলার সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব সম্পদ। ইহাদের কোনও আভিধানিক অর্থ নাই ; এমন-কি, ব্যুৎপত্তিগত অর্থের অন্বেষণও নিরর্থক। তবু বাঙ্গালীর অনুভূতির এমন নিখুঁত অনুবাদ, এমন সঠিক প্রকাশ অন্য কিছুতেই সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ তাই বলিয়াছেন—'এই ধ্বনিগুলির সঙ্গে অনুভূতির কোনও শব্দগত সাদৃশ্য নেই, তবু এই নিরর্থক শব্দগুলির দ্বারা অনুভূতির যেমন স্পষ্ট ধারণা হয়, এমন আর কিছুতেই হতে পারে না।'

॥ অনুসরণী ॥

*১. উদাহরণ সহকারে পরিভাষাগুলি ব্যাখ্যা কর : ধ্বন্যাত্মক শব্দ, উ. মা. '৬১ ; শব্দদ্বৈত, উ. মা. '৬২, '৬০ ; ধ্বন্যাত্মক বিশেষণ, উ. মা. '৬২ ; ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া, ধ্বন্যাত্মক বিশেষ্য।

২. শব্দদ্বৈত কি প্রকারে গঠিত হয় ? বিভিন্ন প্রকারের শব্দদ্বৈতের উদাহরণ দাও।

৩. অনুকার-ধ্বনিবিশিষ্ট শব্দদ্বৈত কাহাকে বলে ? উদাহরণ দিয়া বুঝাও।

৪. অর্থ-নির্দেশপূর্বক সার্থক বাক্য রচনা কর : টনটন, কনকন, শনশন, ঝিরঝির, ঝলমল, কলকল, রিরি, খাঁখাঁ, ধুধু, চনমনে, গনগনে, গজগজ, পিসপিস-নিসপিস, টো-টা, ভুলভুলে, কটমট, গমগম, ভগমগ, ঝিমিঝিমি, ঝিনঝিন, টিমটিম, টিপটিপ, মো মো, ভোঁ ভোঁ, ঝপ ঝপ, দুমদাম।

৫. অর্থ-পার্থক্য দেখাইয়া বাক্য রচনা কর: কলকল, খলখল; খচ্ খচ্, খট্খট্, কট্মট্; কচ্কচ্, কুচ্কুচ্; গড়গড়, গরগর; খস্খস্, মসমস্; ঘরঘর, ঘুরঘুর; চন্চন্, চিন্চিন্; চিকচিক্, ঝিক্ঝিক্; জ্বলজ্বল্, জুলজুল্; ঝকঝক্, ঝকমক; ঝিরঝির, ঝিরিঝিরি; ঝুর্ঝুর্, ঝুরুঝুরু; টলমল্, টলটল্; টপ্টপ্, টিপ্ টিপ্; ঠুনঠুন্, ঠুংঠুং; ঢপ্ ঢপ্, ঢিপ্ ঢিপ্; তক্তক, থক্থক্; তর্তর্, থর্থর্; দর্দর্, দরোদরো; দুড় দাড়, দুড় দুড়; দুমদুম, দুমদাম; ধড়ফড়, ধড়মড়; ফর্ফর্, ফুর্ফুর্; বোঁ বোঁ, ভোঁ ভোঁ; মিট্ মিট্, মিটিমিটি; রিম্ঝিম্, রিমিঝিমি, লক্লক, লট্পট্; রিন্ঝিন্, রিন্রিন; সড়সড়, শির্শির্; হাহা, হাঁহাঁ; হুড়হুড়, হুড়মুড়।

৬. দৃষ্টান্ত দাও: অনুকারাত্মক শব্দদ্বৈত, বিশেষ্যরূপে ধ্বন্যাত্মক শব্দ, বিশেষণরূপে ধ্বন্যাত্মক শব্দ, ক্রিয়ারূপে ধ্বন্যাত্মক শব্দ, ব্যতিহার শব্দদ্বৈত, বিপরীতার্থক যুগ্মশব্দ, ঈষদর্থে যুগ্মশব্দ, সমার্থক যুগ্মশব্দ, বিভিন্নার্থক যুগ্মশব্দ।

*৭. শব্দদ্বৈত বা একই শব্দের দুইবার উচ্চারণ কিরূপে উহার অর্থের পরিবর্তন ঘটায় দেখাইয়া দাও, মা. '৬৬

৮. বাক্য রচনা করিয়া অর্থ-পার্থক্য দেখাও: মেঘ, মেঘ-মেঘ, জ্বর, জ্বর-জ্বর শীত, শীত শীত, ঠক, ঠক-ঠক, ঢিপ, ঢিপ্-ঢিপ্, ভোঁ, ভোঁ-ভোঁ; গোঁ, গোঁ-গোঁ; ছল, ছলছল, টুপ্, টুপ্ টুপ্; খুট্, খুট্খুট্; ঢং, ঢংঢং, রি, রিরি; ঝিন্, ঝিনঝিন, ঠং, ঠংঠং; কট্, কট্কট্, কুট্, কুট্কুট্, ডুম্, ডুমডুম্, গুড়ুম, গুড়ুম গুড়ুম, কুচ, কুচ্কুচ্; শোঁ, শোঁ শোঁ, ঝম্, ঝম্ঝম্; ঝুপ্, ঝুপ ঝুপ, চট, চট্পট, খচ্, খচ্ খচ্, থুক, থুকথুক, ফিক, ফিকফিক।

পরস্পর-সম্পর্ক-যুক্ত কতকগুলি পদ একত্র সম্মিলিত হইয়া যদি একটি সম্পূর্ণ এবং সঙ্গত অর্থ পরিস্ফুট করে, তবে তাহাকে বাক্য বলা হয়।

কাজেই, বাক্য একটি পদ-পরিবার। ইহার অন্তর্গত প্রতিটি পদ একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে সম্পর্ক-যুক্ত। সেই বিশেষ উদ্দেশ্যটি হইল একটি সম্পূর্ণ এবং সঙ্গত অর্থ-প্রকাশ। যেমন: 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।' পদগুলি সুসংবদ্ধ এবং পরস্পর-সম্পর্ক-যুক্ত। সেই সঙ্গে অর্থবহ। আবার, একটিমাত্র পদেও বাক্য গঠিত হইতে পারে। যেমন: 'শোনো।' এক্ষেত্রে কর্তৃপদ ['তুমি'] উহ্য আছে। কিন্তু উহা উহ্য থাকিলেও বক্তা এবং শ্রোতা মনে মনে উহা প্রয়োগ করিয়া সমগ্র বাক্যটির অর্থ উপলব্ধি করিয়া নেয়। আবার, 'সেদিন শুভ্র পাষাণ-ফলকে'—এতগুলি শব্দ ব্যবহার করিয়াও বাক্য হইল না। কারণ, বাক্যের প্রধান যে দুইটি পদ—কর্তা এবং সমাপিকা ক্রিয়া—তাহারা এখানে অনুপস্থিত। কাজেই, 'পড়িল' ও 'রক্তলিখা' পদ দুইটি—বাক্যটির যথাক্রমে সমাপিকা ক্রিয়া ও কর্তা—প্রয়োগ করিলে বাক্যটি সম্পূর্ণ হইল। আবার, কেবল কর্তা আর সমাপিকা ক্রিয়া হইলেই বাক্য হয় না। বাক্যের একটি অর্থ থাকা চাই। শব্দের আছে সেই অর্থ-শক্তি। শব্দের এই অর্থ-শক্তি ত্রিবিধ: মুখ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ। ইহাদের যথাক্রমে বলা হয় অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা।

অভিধা: 'শব্দের যে শক্তি দ্বারা উহার ব্যাকরণ ও অভিধান-সম্মত মূল অর্থের বোধ হয়,' তাহাকে অভিধা বলে। যেমন: 'ফুটিয়াছে সরোবরে কমল-নিকর।' 'সরোবর' এখানে পুষ্করিণী এবং 'কমল-নিকর' অর্থাৎ পদ্মসমূহ। পুষ্করিণীতে পদ্মসমূহ ফুটিয়াছে—ইহাই ইহার ব্যাকরণ ও অভিধান-সম্মত অর্থ; তাহার অতিরিক্ত কিছু নয়।

লক্ষণা: আভিধানিক অর্থকে ছাপাইয়া কল্পনার দ্বারা শব্দের যে বিশেষ অর্থ আরোপিত হয়, তাহাকে বলে লক্ষণা। যেমন: 'আমরা বাঙ্গালী বাস করি সেই তীর্থে বরদ বঙ্গে।' বঙ্গদেশকে 'তীর্থ' এবং 'বরদ' কল্পনা করা হইয়াছে।

ব্যঞ্জনা: আভিধানিক ও লাক্ষণিক অর্থকে ছাপাইয়া শব্দের যে শক্তি মনের মধ্যে কাব্য-চমৎকারিত্ব সহযোগে দীর্ঘস্থায়ী অনুরণনের সৃষ্টি করে, তাহাকে বলে শব্দের ব্যঞ্জনা-শক্তি। যেমন: 'আমার এই দেহটারে তুলে ধরো, তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ করো।' [ভক্তি-পূত ব্যঞ্জনা]

বাক্যের আরও তিনটি উল্লেখযোগ্য দিক আছে: বাক্যের **যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তি।**

যোগ্যতা: অর্থগত ও ভাবগত মেলবন্ধনকেই যোগ্যতা বলা হয়। যেমন: 'মানুষ বাঘকে খাইয়াছে।' ব্যাকরণের দিক হইতে ইহা বাক্য; কিন্তু অভিজ্ঞতা ও যৌক্তিকতার দিক হইতে ইহা বাক্য হইতে পারে নাই। কারণ, যোগ্যতার অভাব।

আকাঙ্ক্ষা : বাক্যে যদি শ্রোতার আকাঙ্ক্ষা না মিটে, তবে তাহা বাক্য হয় না। বাক্যের এই গুণকে বলা হয় আকাঙ্ক্ষা। যেমন : বিদ্যাসাগর ছিলেন—ইহাতে কর্তা ও সমাপিকা ক্রিয়া আছে, কিন্তু আরও শুনিবার আকাঙ্ক্ষা থাকিয়া যায় ; তাই ইহা বাক্য হয় নাই। 'বিদ্যাসাগর ছিলেন দয়ার সাগর।'—বলায় ইহা বাক্য হইল।

আসত্তি : বাংলায় বাক্যে সাধারণতঃ কর্তা সর্বাগ্রে এবং সমাপিকা ক্রিয়া সর্বশেষে বসিয়া থাকে। অন্যান্য পদগুলি বসে মাঝখানে। 'আছে নামে যন্ত্র এক-রকম অণুবীক্ষণ।'—ইহাতে বাক্যস্থিত পদগুলির স্থান-বিপর্যয় ঘটিয়াছে। অর্থাৎ, বাক্যটিতে আসত্তি নাই। বাক্যের অন্তর্গত পরস্পর-সম্পর্কযুক্ত পদগুলির স্থান-নৈকট্যকে আসত্তি বলা হয়। যেমন, 'অণুবীক্ষণ নামে একরকম যন্ত্র আছে।'

উদ্দেশ্য ও বিধেয় : বাক্যের দুইটি অংশ ; উদ্দেশ্য ও বিধেয়। বাক্যের লক্ষ্য হইল কোন বিষয়ে বা কাহারও বিষয়ে কোন কিছু বলা। বাক্যের যে অংশে কাহারও সম্বন্ধে কিছু বলা হয়, তাহাকে **উদ্দেশ্য** [Subject] বলে। আর, বাক্যের যে অংশে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু বলা হয়, তাহাকে বলে **বিধেয়** [Predicate]। 'অনেক বিলম্বে ইন্দ্রর নতুন-দা আসিয়া ঘাটে পৌঁছিলেন।'—বাক্যটিতে 'ইন্দ্রর নতুন-দা' বিষয়ে বলা হইতেছে। কাজেই, 'ইন্দ্রর নতুন-দা' অংশটি উদ্দেশ্য। তাঁহার সম্বন্ধে কি বলা হইতেছে ? না—'অনেক বিলম্বে আসিয়া ঘাটে পৌঁছিলেন।'—এই অংশটি বিধেয়। উদ্দেশ্য অংশের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদ হইল কর্তা এবং বিধেয় অংশের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদ হইল সমাপিকা ক্রিয়া।

● বাক্যের গঠন-ভিত্তিক প্রকার-ভেদ

গঠন-অনুসারে বাক্য তিন প্রকার : সরল বাক্য, মিশ্র বা জটিল বাক্য ও যৌগিক বাক্য।

ক. সরল বাক্য [Simple Sentence] : যে বাক্যে একটিমাত্র ক্রিয়া নির্দেশিত হয় অর্থাৎ একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকে, তাহাকে সরল বাক্য বলে। যেমন : 'আমি দিব্যচক্ষু পেয়েছি।' 'তুমি [হও] বসন্তের কোকিল।' সমাপিকা ক্রিয়া কখনও থাকে ব্যক্ত, কখনও থাকে উহ্য।

খ. মিশ্র বা জটিল বাক্য [Complex Sentence] : যে বাক্যে থাকে একটি প্রধান [বা স্ব-নির্ভর] বাক্যাংশ এবং এক বা একাধিক অপ্রধান [বা পর-নির্ভর] বাক্যাংশ, তাহাকে বলে মিশ্র বা জটিল বাক্য। বাক্যাংশে একটি কর্তা এবং একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকে। প্রধান বাক্যাংশ অর্থ-প্রকাশে স্বাধীন বা স্ব-নির্ভর। কিন্তু যে বাক্যাংশ অর্থ-প্রকাশের ব্যাপারে স্বাধীন নয়, অর্থাৎ পর-নির্ভর, তাহাকে বলে অপ্রধান বাক্যাংশ। 'যে মিথ্যা কথা বলে, তাহাকে কেহ ভালোবাসে না।'—এই বাক্যে দুইটি বাক্যাংশ আছে : ১. 'যে মিথ্যা কথা বলে' এবং ২. 'তাহাকে কেহ ভালোবাসে না।' 'যে মিথ্যা কথা বলে'—এই বাক্যাংশ অনন্ত-নির্ভর হইয়া অর্থ-প্রকাশে সমর্থ নয়। তাই ইহা অপ্রধান বাক্যাংশ। কিন্তু, 'তাহাকে কেহ

ভালোবাসে না।'—এই বাক্যাংশটি অনন্ত-নির্ভর হইয়া অর্থ-প্রকাশে সক্ষম। তাই ইহা প্রধান বাক্যাংশ। অতএব সমগ্র বাক্যটি হইল মিশ্র বা জটিল বাক্য। তেমনি: 'যদি বারণ কর, তবে গাহিব না।' 'মানবাত্মার মহত্ত্ব যে জানে না, স্বাবলম্বন-শক্তি তাহার আসে না।' বাক্যগুলি মিশ্র বা জটিল বাক্য।

গ. **যৌগিক বাক্য** [Compound Sentence]: দুই বা ততোধিক সরল বা জটিল বাক্য সংযোজক বা বিয়োজক অব্যয়ের দ্বারা সংযুক্ত হইলে সমগ্র বাক্যটিকে যৌগিক বাক্য বলা হয়। যেমন: কাল তুমি আসিবে, নতুবা আমাকে যাইতে হইবে। 'কাল তুমি আসিবে' এবং 'আমাকে যাইতে হইবে—দুইটি স্বাধীন সরল বাক্য। ইহারা 'নতুবা' এই বিয়োজক অব্যয়ের দ্বারা যুক্ত হইয়াছে। কাজেই, ইহা যৌগিক বাক্যের উদাহরণ। তেমনি: 'তাহার মুখ অত্যন্ত পাণ্ডুর, কিন্তু চোখদুটো জ্বলিতে লাগিল।' সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল এবং যথাসময়ে কলেজে ভর্তি হইল।

● বাক্যের অর্থ-ভিত্তিক প্রকার-ভেদ

অর্থানুযায়ী বাক্য অনেক প্রকার হইতে পারে। যেমন: নির্দেশক বাক্য, প্রশ্নবোধক বাক্য, অনুজ্ঞাবাচক বাক্য, বিস্ময়বোধক বাক্য, ইচ্ছাবোধক বাক্য ইত্যাদি।

১. **নির্দেশক বাক্য** [Indicative Sentence]: যে বাক্যে কোন ঘটনা বা ভাবের বিবৃতি থাকে, তাহাকে নির্দেশক বাক্য বলা হয়। যেমন: 'শীতের সকালে রাস্তা দিয়া খেজুর রস হাঁকিয়া যাইতেছে।' 'একটা বিশেষ দিন সাতসমুদ্রপারের রাজপুত্রের মতো আসিয়া উপস্থিত হয়।'

নির্দেশক বাক্য আবার দুই প্রকার: অস্ত্যর্থক বাক্য ও নাস্ত্যর্থক বাক্য।

ক. **অস্ত্যর্থক বাক্য** [Affirmative Sentence]: যে বাক্যে ঘটনা বা ভাব বিবৃতির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাকে **অস্ত্যর্থক বাক্য** বলে। যেমন: ভগবান বুদ্ধ পৃথিবীকে শান্তির বাণী শুনাইয়া গিয়াছেন।

খ. **নাস্ত্যর্থক বাক্য** [Negative Sentence]: যে বাক্যে কোন ভাবের অস্তিত্ব বিবৃতির মাধ্যমে অস্বীকৃত হয়, তাহাকে **নাস্ত্যর্থক বাক্য** বলে। যেমন: ভারতবর্ষ রাজ্য লইয়া মারামারি করে নাই।

২. **প্রশ্নবোধক বাক্য** [Interrogative Sentence]: যে বাক্যে কোন ঘটনা বা ভাব সম্পর্কে কোনরূপ জিজ্ঞাসা থাকে, তাহাকে প্রশ্নবোধক বাক্য বলে। যেমন: 'হিন্দু না ওরা মুসলিম?—ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন?' 'কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক?—কে বলে তা বহুদূর?' 'তাজমহলের পাথর দেখেছ? দেখিয়াছ তার প্রাণ?' তুমি কি দেখেছ তাকে? আমাদের বুড়ি ঠাকুমাকে?'

৩. **অনুজ্ঞাবাচক বাক্য** [Imperative Sentence]: যে বাক্যে আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, প্রার্থনা বা নিষেধ ইত্যাদি বুঝায়, তাহাকে অনুজ্ঞাবাচক বাক্য বলে। যেমন: এগিয়ে চল। বৃথা সময় নষ্ট করিও না। 'আয় আমাদের অঙ্গনে অতিথি বালক তরুদল।' 'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো।'

৪. **বিস্ময়বোধক বাক্য** [Interjective Sentence]: যে বাক্যে মনের দুঃখ, আনন্দ ইত্যাদি আবেগ বা উচ্ছ্বাস প্রকাশিত হয়, তাহাকে বিস্ময়বোধক বাক্য বলে। যেমন: আহা, কী দেখিলাম! অহো, কী স্পর্ধা! কী আশ্চর্য! কী সুন্দর! কী চমৎকার!

৫. **ইচ্ছাবোধক বাক্য** [Optative Sentence]: যে বাক্যে মনের শুভ বা অশুভ ইচ্ছা প্রকাশিত হয়, তাহাকে ইচ্ছাবোধক বাক্য বলে। যেমন: তোমার কল্যাণ হোক। 'তোমারি হউক জয়।' 'যেন তে-রাত্তির না পোহায়!'

অর্থের ভিত্তিতে বাক্যের রূপান্তর

● **এক. অস্ত্যর্থক বাক্য হইতে নাস্ত্যর্থক বাক্য:**

১. তিনি সচ্চরিত্র ব্যক্তি।>তিনি অসচ্চরিত্র ব্যক্তি নন। ২. 'মানিকতলায় অনেক পোড়ো বাগান আছে।'>মানিকতলায় পোড়ো বাগানের অভাব নাই। ৩ দৈন্য জিনিসটাকে আমি ছোটো বলি।>'দৈন্য জিনিসটাকে আমি বড়ো বলি না।' ৪. 'ইংরাজি ভাষাটা আমাদের অতি মাত্রায় বিজাতীয় ভাষা।'>ইংরাজি ভাষাটা আমাদের অল্প মাত্রায়ও জাতীয় ভাষা নহে। ৫. 'জয়সিংহ অন্যমনস্ক ছিলেন।'> জয়সিংহ অনন্যমনস্ক ছিলেন না। ৬. প্রতিভা যে দেবদত্ত, একথা আংশিক সত্য। >'প্রতিভা যে দেবদত্ত, একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়।' ৭ 'তাকে শিয়ালে খাইয়াছে।' >তাকে শিয়ালে না খাইয়া ছাড়ে নাই। ৮. এখানে সব জিনিসই যেমন দুর্লভ, তেমনি দুর্মূল্য।>এখানে কোন জিনিসই যেমন সুলভ নয়, তেমনি সস্তাও নয়। ৯ এ রস রসজ্ঞেরই উপভোগ্য।>রসজ্ঞ ব্যতীত এ রস অন্য কাহারও উপভোগ্য নয়। ১০. উপায়ান্তর না থাকিলে দেশান্তরেই যাইতে হইবে।>উপায়ান্তর থাকিলে দেশান্তরে যাইতে হইবে না। ১১. পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সুশীল অন্যতম।>অন্য কোন পরীক্ষার্থী সুশীল অপেক্ষা অন্যতম নয়। ১২. ইংরেজি না জানিলে কোন কোন আধুনিক কবিতার অর্থ বুঝা কঠিন।>ইংরেজি জানিলে কোন কোন আধুনিক কবিতার অর্থ বুঝা কঠিন নয়।

● **দুই. নাস্ত্যর্থক বাক্য হইতে অস্ত্যর্থক বাক্য:**

১. 'সত্যের নাহি পরাজয়।'>সত্যের জয় আছেই। ২. আমি তাহাকে বিশ্বাস করি না।>আমি তাহাকে অবিশ্বাস করি। ৩. 'তাকে দেখেছে বলবার লোক তখন বিস্তর ছিল, মেনে নেবার লোকও কম ছিল না।'>তাকে দেখেছে বলবার লোক তখন বিস্তর ছিল, মেনে নেবার লোকও ছিল বহু। ৪. 'যাহা হউক, তথাপি কথাটা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক হয় নাই।'>যাহা হউক, তথাপি কথাটা মোটামুটি প্রাসঙ্গিক হইয়াছে। ৫. 'কোনও দোকানদারই সেই থালা কিনিতে সম্মত হইল না।'>সব দোকানদারই সেই থালা কিনিতে অসম্মত হইল। ৬. 'সৃষ্টিকর্তা যে কাহারও প্রতি পক্ষপাতী হইয়া তাহাকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন করিয়াছেন, ইহা সম্ভব নহে।'>সৃষ্টি-

কর্তা যে কাহারও প্রতি পক্ষপাতী হইয়া তাহাকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন করিয়াছেন, ইহা অসম্ভব। ৭. 'যত্নপূর্বক অধ্যয়ন না করিলে সবগুলি হইতে পর্যাপ্ত উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় না।'>যত্নপূর্বক অধ্যয়ন করিলে সবগুলি হইতে পর্যাপ্ত উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৮. 'হুজুর, আমি মিথ্যে কথা জীবনে বলি নি আর কখনো বলবও না।'>হুজুর, আমি সত্য কথাই জীবনে বলি আর সব সময় বলবও। ৯ 'পাষাণ প্রতিমা বিচলিত হইল না।'>পাষাণ প্রতিমা অবিচল রহিল। ১০. অন্য দিকে মন দিলে আমার শিক্ষাদানে কোন ফল হইবে না।>অন্যদিকে মন না দিলে আমার শিক্ষাদানে ফল হইবে। ১১. মাছ পাওয়া যায় তো তেল পাওয়া যায় না।>মাছ হয়তো পাওয়া যায়, কিন্তু তেল পাওয়া কঠিন। ১২ 'এ আমাদের গোচর ছিল না।' >এ আমাদের আগোচর ছিল।

● তিন. অস্ত্যর্থক বাক্য হইতে প্রশ্নবোধক বাক্য:

১ 'এই দেশে বুদ্ধ, চৈতন্য, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।'>এই দেশে কি বুদ্ধ, চৈতন্য, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন নাই? ২. 'পাখিটা দিনে দিনে দস্তুরমত আধমরা হইয়া আসিল।'>পাখিটা কি দিনে দিনে দস্তুরমত আধমরা হইয়া আসিল না? ৩. 'কাল রাত্তির থেকে মেঘের কামাই নাই।'>কাল রাত্তির থেকে কি মেঘের কামাই আছে? ৪. 'রাজনন্দিনী গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন।' >রাজনন্দিনী কি গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন না? ৫. 'খেলাটার চেয়ে এই জায়গাটার প্রতি আমার টান বেশি ছিল।'>খেলাটার চেয়ে এই জায়গাটার প্রতি আমার টান কি বেশি ছিল না? ৬. 'যত্নশীলই রত্নলাভে অধিকারী।'>যত্নশীলই কি রত্নলাভে অধিকারী নয়? ৭. 'প্রতিভা শিক্ষা-নিরপেক্ষ দেবদত্ত শক্তি।'>প্রতিভা কি শিক্ষা-নিরপেক্ষ দেবদত্ত শক্তি নয়? ৮. 'নবকুমারকে ব্যাঘ্রে হত্যা করিয়াছে।'>নবকুমারকে কি ব্যাঘ্রে হত্যা করে নাই? ৯ 'পিপাসিত জন যেমন সরোবর দেখতে চায়, রাম সেইরূপ এঁকে দেখবার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে আছেন।'> পিপাসিত জন যেমন সরোবর দেখতে চায়, রাম সেইরূপ এঁকে দেখবার জন্য কি উৎকণ্ঠিত হয়ে নেই? ১০. 'পাগলা কুকুর কামড়ালে জলাতঙ্ক রোগ দেখা দেয়।'> পাগলা কুকুর কামড়ালে কি জলাতঙ্ক রোগ দেখা দেয় না? ১১. 'ভাবপ্রবণতা আছে আমাদের দেশে অতি পরিমাণে।'>আমাদের দেশে কি অতি পরিমাণে ভাবপ্রবণতা নেই? ১২. পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সুশীল অন্যতম।>পরীক্ষার্থীদের মধ্যে কি সুশীল অন্যতম নয়?

● চার. প্রশ্নবোধক বাক্য হইতে অস্ত্যর্থক বাক্য:

১. আমি কি তাহার বংশ-পরিচয় জানি না?>আমি তাহার বংশ-পরিচয় জানি। ২. 'তুই আমার মুণ্ডু নিবি না তো কে নেবে?'>তুইই তো আমার মুণ্ডু নিবি। ৩. ভ্রম কাহার না হয়?>ভ্রম সকলেরই হয়। ৪. এ সব অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হচ্ছে না কি?>এ সব অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হচ্ছে। ৫. বাংলাদেশে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম কে

শোনে নাই ?>বাংলাদেশ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম সকলেই শুনিয়াছে। ৬ গান এবং ফুল কে না ভালোবাসে ?>গান এবং ফুল সকলেই ভালোবাসে। ৭. টাকায় কী না হয় ?>টাকায় সবই হয়। ৮. স্বাধীনতা কার না কাম্য ?>স্বাধীনতা সকলেরই কাম্য। ৯. তাহার সম্পর্কে কি আমি কিছুই জানি না ?>তাহার সম্পর্কে আমি সবই জানি। ১০. রবীন্দ্রনাথ কি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি নন ?>রবীন্দ্রনাথ ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। ১১. দেশকে ভালোবাসিয়া শত শহীদ কি জীবন উৎসর্গ করে নাই ? >দেশকে ভালোবাসিয়া শত শহীদ জীবন উৎসর্গ করিয়াছে। ১২. ভারতীয় সভ্যতা কি পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা নয় ?>ভারতীয় সভ্যতা পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা।

● পাঁচ. অস্ত্যর্থক বাক্য হইতে অনুজ্ঞাবাচক বাক্য :

১. প্রত্যহ মন দিয়া লেখাপড়া করা উচিত।>প্রত্যহ মন দিয়া লেখাপড়া করিও। ২. তোমার সেখানে যাওয়া কর্তব্য।>তুমি সেখানে যাও। ৩. তোমার একবার এখানে আসা উচিত।>তুমি একবার এখানে এস। ৪. নিজেকে জানা কর্তব্য।>নিজেকে জানো। ৫. সদা সত্যকথা বলা উচিত।>সদা সত্যকথা বলিবে। ৬. দরিদ্রের সেবা করা কর্তব্য।>দরিদ্রের সেবা করিবে। ৭. সশস্ত্রে আমার অনুসরণ করা উচিত।>'সশস্ত্রে আমার অনুসরণ করো।' ৮. ইহাদের দুই জনকে বন্দী করা কর্তব্য।>'ইহাদের দুজনকে বন্দী করো।' ৯. রঘুপতির কাছ হইতে তোমার দূরে থাকা উচিত।>'রঘুপতির কাছ হইতে দূরে থাকিয়ো।' ১০. [তোমার] এ স্থান ত্যাগ করা উচিত।>এ স্থান ত্যাগ করো। ১১. তাকে দেশ থেকে দূর করে দেওয়া দরকার>তাকে দেশ থেকে দূর করে দাও। ১২. 'দূর করে দিনু তোরে।'>দূর হয়ে যা।

● ছয়. নির্দেশক বাক্য হইতে বিস্ময়বোধক বাক্য :

১. সত্য সেলুকাস, এই দেশ বড় বিচিত্র।>'সত্য সেলুকাস, কী বিচিত্র এই দেশ!' ২. দৃশ্যটি অতীব করুণ।>দৃশ্যটি কী করুণ! ৩. ভারি চমৎকার চিত্র। >কী চমৎকার চিত্র! ৪. ইহা ভারি লজ্জার কথা।>কী লজ্জার কথা! ৫. ইহা অত্যন্ত ঘৃণার কথা।>কী ঘৃণার কথা! ৬. ছেলেটি খুব দরিদ্র।>ছেলেটি কী দরিদ্র! ৭. শিশুটির মৃত্যু-দৃশ্য অত্যন্ত শোকাবহ।>শিশুটির মৃত্যু-দৃশ্য কী শোকাবহ! ৮. সেই গল্পটি অত্যন্ত চমৎকার।>কী চমৎকার সেই গল্পটি! ৯. এই গানটি অত্যন্ত করুণ।>কী করুণ এই গানটি! ১০. দৃশ্যটি যারপরনাই ভয়াবহ। >দৃশ্যটি কী ভয়াবহ! ১১. যাহা দেখিলাম, ভারি সুন্দর।>'আহা, কী দেখিলাম!' ১২. সেই ত্যাগের মহিমা অতি অপূর্ব।>কী অপূর্ব সেই ত্যাগের মহিমা!

● সাত. বিস্ময়বোধক বাক্য হইতে নির্দেশক বাক্য :

১. কী অপূর্ব দৃশ্য!>দৃশ্যটি বড়ই অপূর্ব। ২. ত্যাগের কী অপূর্ব মহিমা! >ত্যাগের এই মহিমা অপূর্ব। ৩. কী সুন্দর!>ইহা সুন্দর বটে। ৪. কী ভয়ংকর! >ইহা ভয়ংকর। ৫. কী প্রচণ্ড বেগেই না ঝড় বহিতেছিল!>অত্যন্ত প্রচণ্ড বেগে ঝড় বহিতেছিল। ৬. আহা, কি রমণীয় দৃশ্য!>দৃশ্যটি অতীব রমণীয়। ৭. 'কী

ভয়ানক লড়াই হলো মা যে!'>মা, খুব ভয়ানক লড়াই হলো। ৮. 'আজ কী আনন্দ!'>আজ খুব আনন্দ। ৯. কী মিষ্টি সেই বাঁশির সুর!>সেই বাঁশির সুর ভারি মিষ্টি। ১০. কী লোমহর্ষক কাণ্ড!>কাণ্ডটি অত্যন্ত লোমহর্ষক। ১১. তাহার মুখখানি কী করুণ!>তাহার মুখখানি অত্যন্ত করুণ। ১২. কী অকৃতজ্ঞতা! >[ইহা] অতীব অকৃতজ্ঞতা।

গঠনের ভিত্তিতে বাক্যের রূপান্তর

● এক. সরল বাক্য হইতে মিশ্র বা জটিল বাক্য :

১. 'এ সংসারে কোনো দরকারি কাজে আমার হাত ছিল না'।>এ সংসারে যে কাজ দরকারি, তাতে আমার হাত ছিল না। ২. 'বন্দুক থাকলে মোকাবিলা করা যেত।'>যদি বন্দুক থাকতো, তাহলে মোকাবিলা করা যেত। ৩. 'সে সামনের দু পা তুলে উঠতেই দিলুম তার গলায় ফাঁস আটকিয়ে।'>সে যেই সামনের দু পা তুলে উঠেছে, অমনি দিলুম তার গলায় ফাঁস আটকিয়ে। ৪. 'রঘুপতি অরণ্য হইতে বাহির হইবামাত্র দুর্গ-প্রাকারের উপরে সৈন্যরা সচকিত হইয়া উঠিল।'>রঘুপতি যেইমাত্র অরণ্য হইতে বাহির হইলেন, অমনি দুর্গ-প্রাকারের উপরে সৈন্যরা সচকিত হইয়া উঠিল। ৫. 'ভালো করিয়া দেখিতে গেলে শিশুর মতো পুরাতন আর কিছুই নাই।'> যদি ভালো করিয়া দেখি, তবে শিশুর মতো পুরাতন আর কিছুই নাই। ৬. 'অবশেষে অন্য উপায় না দেখিয়া দুর্গা ধূপ দীপ নৈবেদ্য লইয়া ধ্যানে বসিলেন।'> অবশেষে যখন দুর্গা অন্য উপায় দেখিলেন না, তখন তিনি ধূপ দীপ নৈবেদ্য লইয়া ধ্যানে বসিলেন। ৭. 'গুহার ভিতরে বৃষ্টির ধারার বেগে স্বাভাবিক বিচিত্র কারুকর্ম দেখিয়া আমরা আশ্চর্য হইলাম।'>গুহার ভিতরে যখন বৃষ্টির ধারার বেগে স্বাভাবিক বিচিত্র কারুকর্ম দেখিলাম, তখন আমরা আশ্চর্য হইলাম। ৮. 'সার্কাসের বাক্সের মধ্যে উঠিয়া বুড়া বুদ্ধি ঠিক রাখিতে পারে নাই।'>বুড়া যখন সার্কাসের বাক্সের মধ্যে উঠিল, তখন সে বুদ্ধি ঠিক রাখিতে পারে নাই। ৯. 'নবদ্বীপচন্দ্রের দাখিল-করা দলিল মিথ্যা।'> নবদ্বীপচন্দ্র যে দলিল দাখিল করিয়াছিল, তাহা মিথ্যা। ১০. 'পোস্ট মাস্টার চলে গেলে সেই রাত্রে আবার রঘুবংশ নিয়ে পড়লুম।'<পোস্ট মাস্টার যখন চলে গেলেন, তখন সেই রাত্রে আবার রঘুবংশ নিয়ে পড়লুম।

● দুই. মিশ্র বা জটিল বাক্য হইতে সরল বাক্য :

১. 'ইন্দ্রের যেমন ঐরাবত আমার তেমনি পদ্মা।'>ইন্দ্রের ঐরাবতের মতো আমার পদ্মা। ২. 'মাস্তুল যেমনি এক পাক ঘুরছে অমনি সকলের আনন্দে উচ্চহাস্য।' >মাস্তুল এক পাক ঘুরলেই সকলের আনন্দে উচ্চহাস্য। ৩. 'মাঝিরা যদি আপনাদের মধ্যে মন খুলে হাসি গল্প করে সেটা তারা রাজার প্রতি অসম্মান জ্ঞান করে।'>মাঝিরা আপনাদের মধ্যে মন খুলে হাসি গল্প করলে সেটা তারা রাজার প্রতি অসম্মান জ্ঞান করে। ৪. 'আমাদের দেশে যারা বজ্রহাতে ইন্দ্রপদে বসিয়া আছেন তাঁদের সহস্র চক্ষু।'>আমাদের দেশে বজ্রহাতে ইন্দ্রপদে আসীন ব্যক্তিদের সহস্র চক্ষু। ৫.

'আমাদের জাতির মুক্তি যদি পার্শ্বের দিকে না থাকে তবে উপরের দিকে আছেই।' >আমাদের জাতির মুক্তি পার্শ্বের দিকে না থাকলে উপরের দিকে আছেই। ৬. যখন রাত্রি প্রভাত হয় তখন পাখিরা গান গাহিয়া উঠে।>রাত্রি প্রভাত হইলে পাখিরা গান গাহিয়া উঠে। ৭. যতদিন জীবন থাকিবে, ততদিন পরের দাসত্ব করিব না।>জীবন থাকিতে পরের দাসত্ব করিব না। ৮. 'যখন কপাট টেনে দেওয়া হতো, ঝর্‌ঝর্ কল্‌কল্ করে ঝরনার মতো জল ফেনিয়ে পড়ত। ৯ 'আমরা যখন ছোটো ছিলুম সন্ধ্যাবেলায় কলকাতা শহর এখনকার মতো এত বেশি সজাগ ছিল না'।>আমাদের ছোটো বেলায় সন্ধ্যাবেলায় কলকাতা শহর এখনকার মতো এত বেশি সজাগ ছিল না। ১০. 'এখনকার কালে সূর্যের আলোর দিনটা যেমন ফুরিয়েছে অমনি শুরু হয়েছে বিজলি আলোর দিন।'>এখনকার কালে সূর্যের আলোর দিনটা ফুরোতেই শুরু হয়েছে বিজলি আলোর দিন।

● তিন. সরল বাক্য হইতে যৌগিক বাক্য ঃ

১. দরিদ্র হইলেও লোকটি সৎ।>লোকটি দরিদ্র, কিন্তু সৎ। ২. সত্য কথা স্বীকার না করিলে শাস্তি পাইবে।>সত্য কথা স্বীকার কর, নতুবা শাস্তি পাইবে। ৩. 'কামাল নিরস্ত্র হয়ে বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছে।'>কামাল নিরস্ত্র হয়েছে এবং বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছে। ৪. 'সমুদ্রে পতিত হইয়াও বারিবিন্দুগণের বিশ্রাম নাই।'>বারিবিন্দুগণ সমুদ্রে পতিত হয়, কিন্তু তবুও তাহাদের বিশ্রাম নাই। ৫. 'এখন ভাগীরথী-তীরে বসিয়া তাহার কুলুকুলু ধ্বনি শ্রবণ করি।'>এখনও ভাগীরথী-তীরে বসি এবং তাহার কুলুকুলু ধ্বনি শ্রবণ করি। ৬. 'অপু এক দৌড়ে ফটক পার হইয়া রাস্তার উপর আসিয়া উঠিল।'>অপু এক দৌড়ে ফটক পার হইল এবং রাস্তার উপর আসিয়া উঠিল। ৭ 'তুমি গেলে তোমার ঘর সামলাবে কে?'>তুমি যাবে, কিন্তু তোমার ঘর সামলাবে কে? ৮. 'নক্ষত্র রায়কে সঙ্গে লইয়া মহারাজ পদব্রজে অরণ্যের দিকে চলিলেন।'>নক্ষত্র রায়কে মহারাজ সঙ্গে লইলেন এবং পদব্রজে অরণ্যের দিকে চলিলেন। ৯. প্রাসাদের পথে না গিয়ে রাজা মন্দিরের দিকে গেলেন। >রাজা প্রাসাদের দিকে গেলেন না, গেলেন মন্দিরের দিকে। ১০. 'হিন্দুরা বিধনের অনাসক্ত পরহিতৈষণা দেখিয়া তাঁহাকে ঘৃণা বা নিন্দা করিতে যেন সাহস করিল না।' >হিন্দুরা বিধনের অনাসক্ত পরহিতৈষণা দেখিল কিন্তু তাঁহাকে ঘৃণা বা নিন্দা করিতে সাহস করিল না।

● চার. যৌগিক বাক্য হইতে সরল বাক্য ঃ

১. তিনি ধনী ছিলেন, কিন্তু সুখী ছিলেন না।>তিনি ধনী হইয়াও সুখী ছিলেন না। ২. আমি অত্যন্ত দুর্বল, তাই আমি কোন কাজ করিতে পারিতেছি না।>অত্যন্ত দুর্বলতাবশতঃ আমি কোন কাজ করিতে পারিতেছি না। ৩. 'হিম-নিবারণ-জন্য সম্মুখে আবরণ দেওয়া ছিল, এজন্য নৌকার ভিতর হইতে আরোহীরা এ-সকল বিষয় কিছুই জানতে পারেন নাই।>হিম-নিবারণ-জন্য সম্মুখে আবরণ দেওয়া থাকায়

নৌকার ভিতর হইতে আরোহীরা এ-সকল বিষয় কিছুই জানিতে পারেন নাই। ৪. 'তুমি অধম—তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?'>তুমি অধম বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন? ৫. 'বারিকণাগণই বৃষ্টিরূপে পৃথিবী ধৌত করিতেছে, এবং মৃত ও পরিত্যক্ত দ্রব্য বহন করিয়া সমুদ্র-গর্ভে নিক্ষেপ করিতেছে।'>বারিকণাগণই বৃষ্টিরূপে পৃথিবী ধৌত করিয়া মৃত ও পরিত্যক্ত দ্রব্য বহন করিয়া সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিতেছে। ৬. 'আমাদের এক চাকর ছিল, তাহার নাম শ্যাম।'>শ্যাম নামে আমাদের এক চাকর ছিল। ৭. 'ছুঁচোর গোলাম চামচিকে, তাঁর মাইনে চোদ্দ সিকে।'>চাম চকে ছুঁচোর চোদ্দ সিকে মাইনের গোলাম। ৮. 'ইউরোপীয়দের আমরা যতই নিন্দা করি না, অনেক বিষয়ে তাহারা খাঁটি মানুষ।'>আমাদের নিন্দা সত্বেও ইউরোপীয়রা অনেক বিষয়ে খাঁটি মানুষ। ৯. 'নেশায় শরীরের শক্তি যায়, কিন্তু গুরুর কাছে শেখা বিদ্যে তো যায় না।'>নেশায় শরীরের শক্তি গেলেও গুরুর কাছে শেখা বিদ্যে যায় না। ১০. 'আমাদের দেহ সাড়ে তিন হাতের মধ্যে বদ্ধ, কিন্তু তাই বলিয়া ঠিক সেই সাড়ে তিন হাত পরিমাণ গৃহ নির্মাণ করা চলে না।'>আমাদের দেহ সাড়ে তিন হাতের মধ্যে বদ্ধ বলিয়া ঠিক সেই সাড়ে তিন হাত পরিমাণ গৃহ নির্মাণ করা চলে না।

● পাঁচ. মিশ্র বা জটিল বাক্য হইতে যৌগিক বাক্য :

১. যদি সৎপথে থাকিয়া পরিশ্রম কর, তবে তোমার ভবিষ্যতে ভালো হইবে। >সৎপথে থাকিয়া পরিশ্রম কর, ভবিষ্যতে তোমার ভালো হইবে। ২. যদিও ভালো বৃষ্টি হইয়াছে, তথাপি ভালো শস্য ফলিবার তেমন সম্ভাবনা নাই।>ভালো বৃষ্টি হইয়াছে কিন্তু ভালো শস্য ফলিবার তেমন সম্ভাবনা নাই। ৩ 'আমরা যখন ছোটো ছিলুম তখন সন্ধ্যাবেলায় কলকাতা শহর এখনকার মতো এত বেশি সজাগ ছিল না।'> আমরা তখন ছোটো ছিলুম, আর সন্ধ্যাবেলায় কলকাতা শহরও এখনকার মতো এত বেশি সজাগ ছিল না। ৪. 'যে বাঘের কবলে পড়েছিলেন বলে আমাদের চমক লাগিয়েছিলেন, সে বাঘের মুখ থেকে তিনি কামড় পাননি।'>তিনি এক বাঘের কবলে পড়েছিলেন বলে আমাদের চমক লাগিয়েছিলেন, কিন্তু সে বাঘের মুখ থেকে তিনি কামড় পাননি। ৫. 'বিশ্বনাথ শিকারী একদিন খবর দিল, শিলাইদহের জঙ্গলে বাঘ এসেছে।'>শিলাইদহের জঙ্গলে বাঘ এল এবং বিশ্বনাথ শিকারী একদিন সেই খবর দিল। ৬. 'পরদিবস প্রাতঃকালে সেই পর্বতশ্রেণীর মধ্যে যে পর্বত বনাকীর্ণ, সেই পর্বতের পথ দিয়া নিম্নে পদব্রজেই আরোহণ করিতে লাগিলাম।'>সেই পর্বতশ্রেণীর মধ্যে একটি বনাকীর্ণ পর্বত ছিল, এবং [আমি] সেই পর্বতের পথ দিয়া নিম্নে পদব্রজেই অবরোহণ করিতে লাগিলাম। ৭. 'সকাল হইতে দেখিতাম, প্রতিবেশীরা একে একে স্নান করিতে আসিতেছে।'>সকাল হইতে প্রতিবেশীরা একে একে স্নান করিতে আসিত, আর আমি দেখিতাম। ৮. 'যে ভাবরাজ্যে তিনি সঞ্চরণ করতেন, সেখানে তাঁর জীবন পূর্ণ হত প্রতিক্ষণে প্রকৃতির রসভাণ্ডার থেকে।'>তিনি এক ভাবরাজ্যে সঞ্চরণ করতেন এবং সেখানে তাঁর জীবন পূর্ণ হত প্রতিক্ষণে প্রকৃতির রসভাণ্ডার থেকে।

৯। 'বিদ্যাসাগরের উন্নত সুদৃঢ় চরিত্রে যাহা মেরুদণ্ড, সাধারণ বাঙালির চরিত্রে তাহার একান্তই অসম্ভাব।'>বিদ্যাসাগরের উন্নত সুদৃঢ় চরিত্রে ছিল একটি মেরুদণ্ড, কিন্তু সাধারণ বাঙালির চরিত্রে তাহার একান্তই অসম্ভাব। ১০. 'তাহার পরদিন যখন জয়সিংহ মন্দিরে ফিরিয়া আসিলেন তখন পূজার সময় অতীত হইয়া গিয়াছে।'>তাহার পরদিন জয়সিংহ মন্দিরে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু তখন পূজার সময় অতীত হইয়া গিয়াছে।

● ছয়. যৌগিক বাক্য হইতে মিশ্র বা জটিল বাক্য :

১. সে দরিদ্র বটে, কিন্তু আত্মসম্মান হারায় নাই।>যদিও সে দরিদ্র, তথাপি সে আত্মসম্মান হারায় নাই। ২. তোর ডাক শুনে কেউ না আসুক, একলা চলো রে।>'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে'। ৩. 'উনুনে যেন জ্বলা কাঠ নিভেছে তবু কয়লায় রয়েছে আগুন।'>যদিও উনুনে জ্বলা কাঠ নিভেছে, তথাপি কয়লায় রয়েছে আগুন। ৪. 'তার পরেকার খবর তলিয়ে গেছে জলের তলায়, তুলে আনতে দেরি হবে।'>তার পরেকার যে খবর তা তলিয়ে গেছে জলের তলায়, তাকে তুলে আনতে দেরি হবে। ৫. 'কাব্য ম্যাজিক হতে পারে, কিন্তু সমালোচনা লজিক হতে বাধ্য।'>যদিও কাব্য ম্যাজিক, তবু সমালোচনা লজিক হতে বাধ্য। ৬. এমন-কি তিনি হিতৈষণাবলে অনেক কাজ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার অনেকই আধুনিক সমাজতত্ত্ব মঞ্জুর করিবে না।>'এমন-কি তিনি হিতৈষণাবলে যে সকল কাজ করিয়াছেন তাহার অনেকই আধুনিক সমাজতত্ত্ব মঞ্জুর করিবে না।' ৭. তিনি ঠিক বাঙালিটি হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন এবং শেষ দিন পর্যন্ত বাঙালিটিই ছিলেন।>তিনি ঠিক যেমন বাঙালিটি হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, শেষদিন পর্যন্ত তেমনি বাঙালিটিই ছিলেন। ৮. তুমি এখানে থাক আর আমার সেখানকার কার্য অসম্পূর্ণ হউক।>তুমি যদি এখানে থাক, তাহা হইলে আমার সেখানকার কার্য অসম্পূর্ণ হইবে। ৯. ধর্ম স্বয়ং দ্বারে আসিয়া আহ্বান করিতেছেন এবং আপনি তাঁহাকে অবহেলা করিবেন না।>'ধর্ম যখন স্বয়ং দ্বারে আসিয়া আহ্বান করিতেছেন তখন তাঁহাকে অবহেলা করিবেন না।' ১০. 'ছাত্রের অভাব না ঘটুক, কিন্তু সরঞ্জামের অভাব না ঘটে।'>যদি ছাত্রের অভাব ঘটেও, তবুও সরঞ্জামের অভাব যেন না ঘটে।

॥ অনুসরণী ॥

১. গঠনের ভিত্তিতে বাক্যকে কয়শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় এবং কি কি? দৃষ্টান্ত দাও।

২. অর্থের ভিত্তিতে বাক্যকে কয়শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়? দৃষ্টান্তসহ তাহাদের পরিচয় দাও।

৩. সরল ও জটিল বাক্য সম্বলিত একটি যৌগিক বাক্য রচনা করিয়া তাহার অন্তর্গত সরল ও জটিল বাক্যের অংশগুলি দেখাইয়া দাও। এই ত্রিবিধ বাক্যের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও। উ. মা. '৬২।

[সংকেত: 'বড়ো হইয়া নদীর উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক ব্যাখ্যা শুনিয়াছি কিন্তু যখনই শ্রান্তমনে নদীতীরে বসিয়াছি তখনই সেই চিরাভ্যস্ত কুলুকুলু ধ্বনির মধ্যে এই পূর্বকথা শুনিতাম।']

৪. দৃষ্টান্তসহ সংজ্ঞা লিখ: অস্ত্যর্থক বাক্য, নাস্ত্যর্থক বাক্য, নির্দেশক বাক্য ও প্রশ্নবোধক বাক্য

৫. নিম্নলিখিত বাক্যগুলির কোন্টি কোন্ বাক্য? অর্থ পরিবর্তন না করিয়া নির্দেশানুযায়ী বাক্যগুলির রূপান্তর সাধন কর।

দুর্যোধন ভীমসেনের সহিত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন [মিশ্র]। যখন রাত্রি প্রভাত হইল, তখন পথিকেরা যাত্রা শুরু করিল [যৌগিক]। ব্রাহ্মণ অতিশয় দরিদ্র ছিলেন তাই ছেলেটিকে লেখাপড়া শিখাইতে পারেন নাই [যৌগিক]। তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মনটি শিশুর মতো [সরল]। 'যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক আমি তোমায় ছাড়বো না মা [সরল]।' ধ্যান-নিরতা পার্বতীর দিকে মহেশ্বর দৃষ্টিপাত করিলেন [মিশ্র]। রাত দুইটার পর আমাদের ডিঙি আসিয়া ঘাটে ভিড়িল [মিশ্র]। পাণ্ডবগণ যদি আপনার রক্ষক হন তবে ইন্দ্রও আপনাকে জয় করতে পারবেন না [সরল]। পাণ্ডবগণ অথবা আপনার পুত্রগণ যুদ্ধে নিহত হলে আপনার কী সুখ হবে, বলুন [মিশ্র]। আপনি যদি উপেক্ষা করেন তবে পৃথিবী ধ্বংস হবে [যৌগিক]। কাঙালীর মার জীবনের ইতিহাস ছোট কিন্তু সেই ছোট কাঙালী জীবনটুকু বিধাতার এই পরিহাসের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল [সরল]।

৬. কোন্‌টি কোন্ শ্রেণীর উল্লেখ করিয়া নির্দেশ-অনুযায়ী বাক্য পরিবর্তন কর :

দরিদ্র-নারায়ণের সেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম [নাস্ত্যর্থক বাক্য]। তাঁহার ন্যায় মহান্ কর্মবীর অতি অল্পই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন [নাস্ত্যর্থক]। মাতাপিতার প্রতি তাঁহার ভক্তির সীমা ছিল না [অস্ত্যর্থক]। ইহজগতের পাপতাপ ইহজগতেই শেষ হয় [প্রশ্নবোধক]। ছাত্রজীবনে অধ্যয়নই কি তপস্যা নয় [অস্ত্যর্থক]? ভারতীয় সভ্যতা পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা [প্রশ্নবোধক]। দেশসেবা আমার জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ [নাস্ত্যর্থক]। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি [প্রশ্নবোধক]। কী চমৎকার চিত্র [অস্ত্যর্থক]। নিকটে অগ্নিশিখা না থাকিলে তাহাদিগকে খ্যাসাইয়া তোলা সহজ ছিল না [অস্ত্যর্থক]। এই অচিন পাখির নিঃশব্দ যাওয়া-আসার খবর গানের সুর ছাড়া আর কে দিতে পারে [নাস্ত্যর্থক]? এই জয়-পরাজয়ের সংবাদ-আলোচনায় আমাদের উত্তেজনার অন্ত ছিল না [অস্ত্যর্থক]? এই গল্পটি অত্যন্ত চমৎকার [বিস্ময়বোধক]। কী শোকাবহ সেই ঘটনা [নির্দেশক বাক্য]। এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার [নাস্ত্যর্থক]? একতাই বল [নাস্ত্যর্থক]। তাহার শক্তি নাই [অস্ত্যর্থক]।

৭. অর্থ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যে-কোন পাঁচটি বাক্যের রূপান্তর সাধন কর : ক. সময় পাও তো কাল একবার এসো। খ. বৃদ্ধ হইলেও তাঁহার লেখনী এখনও অশ্রান্ত। গ. যাহা অনিবার্য তাহা শিরোধার্য। ঘ. একমাত্র তোমার কাছেই সান্ত্বনা পাই। ঙ. এমনভাবে শব্দগুলি সাজাও যাহাতে বর্ণের ক্রম নষ্ট না হয়। চ. ভ্রাতাদের মধ্যে সুশীলই যোগ্যতম। ছ. এত ভার বহন আমার ক্ষমতাতে কুলাইবে না। জ. দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্যাদা বুঝে না। ক. প্রা. '৬২

৮. নির্দেশ-অনুসারে বাক্যগুলির রূপান্তর সাধন কর : ক. আমাকে কি যেতেই হবে? ['আমাকে'-র স্থলে 'আমার' বসাও]। খ. সকলেই পাপী, তাহাদের মধ্যে তুমি পাপিষ্ঠ। [নেতিবাচক বাক্যে পরিণত কর]। গ. তুমি না চাহিলেও আমি দিতাম। [মিশ্রবাক্যে পরিণত কর]। ঘ. যখনই ডাকবেন, তখনই চলে আসব। [সরল বাক্যে পরিণত কর]। ক. প্রা. '৬২

৯. নিম্নলিখিত বাক্যটিকে পাঁচটি সরল বাক্যে বিশ্লেষণ কর : বহুক্লেশে পর্বতের অধিত্যকায় আরোহণের পর পথক্লান্তি ভুলিয়া চারিদিকের নয়ন-মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্যের পানে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম।
ক. প্রা. '৬২

১০. একবাক্যে পরিণত কর : উমেশবাবু ছিলেন অধ্যাপক। তাঁহার আয় ছিল পরিমিত। তাহা হইতে তিনি বহুকষ্টে সঞ্চয় করিতেন। এজন্য সংসারের ব্যয়সঙ্কোচ করিতে হইত। সেই সঞ্চিত অর্থ তিনি দরিদ্র ছাত্রদিগকে দান করিতেন। এই দানে তিনি জাতিধর্ম ভেদ বিচার করিতেন না। ক. প্রা. '৬৩

১১. অর্থ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বাক্যগুলির রূপান্তর সাধন কর : ক. এখানে সব জিনিসই যেমন দুর্লভ, তেমনি দুর্মূল্য। খ. এ রস রসজ্ঞেরই উপভোগ্য। গ. অন্যদিকে মন দিলে আমার শিক্ষাদানে কোন ফল হইবে না। ঘ. উপায়ান্তর না থাকিলে দেশান্তরেই যাইতে হইবে। ঙ. মাছ পাওয়া যায় তো তেল পাওয়া যায় না। চ. ভ্রম কাহার না হয়? ছ. পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সুশীল অন্যতম। জ. ইংরেজি না জানিলে কোন কোন আধুনিক কবিতার অর্থ বুঝা কঠিন। ঝ. বাজারে শীঘ্র যাও, নতুবা চিনি পাইবে না। ক. প্রা. '৬১

৫. বাক্য-প্রসারণ ও বাক্য-সংকোচন

বাক্য-প্রসারণ

বাক্যের দুইটি প্রধান অংশ : একটি উদ্দেশ্য, অপরটি বিধেয়। সম্বন্ধ পদ, বিশেষণ, অব্যয় ও কৃদন্ত পদ ইত্যাদির সহযোগে উদ্দেশ্য অংশটি সম্প্রসারিত করা যায় ; আবার বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণ, অব্যয় ও অসমাপিকা ক্রিয়া ইত্যাদি পদ-সংযোগে বিধেয় অংশ সম্প্রসারিত করা যায়। উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশের সম্প্রসারণের সাহায্যে সম্পূর্ণ বাক্যটি সম্প্রসারিত হইয়া যায়। ইহাই বাক্য-প্রসারণ।

দৃষ্টান্ত : রাম বনে গিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য—'রাম', বিধেয়—'বনে গিয়াছিলেন'। সম্প্রসারিত উদ্দেশ্য—অযোধ্যার রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র নবজলধরশ্যাম, রঘুকুলতিলক, নয়নাভিরাম রাম। সম্প্রসারিত বিধেয়—পিতৃসত্যরক্ষার নিমিত্ত সীতা ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া চতুর্দশ বৎসরের জন্য বনে গিয়াছিলেন। **সম্প্রসারিত বাক্য :** অযোধ্যার রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র নবজলধরশ্যাম, রঘুকুলতিলক, নয়নাভিরাম রাম পিতৃসত্যরক্ষার নিমিত্ত সীতা ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া চতুর্দশ বৎসরের জন্য বনে গিয়াছিলেন।

ফুল ফুটিয়াছে। উদ্দেশ্য—'ফুল', বিধেয়—'ফুটিয়াছে'। সম্প্রসারিত উদ্দেশ্য—বিচিত্রবর্ণের ও বিচিত্রগন্ধের অফুরন্ত ফুল। সম্প্রসারিত বিধেয়—ঋতুরাজ বসন্ত-সমাগমে বাগান আলো করিয়া ফুটিয়াছে। **সম্প্রসারিত বাক্য :** ঋতুরাজ বসন্ত-সমাগমে বিচিত্রবর্ণের ও বিচিত্রগন্ধের অফুরন্ত ফুল বাগান আলো করিয়া ফুটিয়াছে।

নদী প্রবাহিত হইতেছে। উদ্দেশ্য—'নদী', বিধেয়—'প্রবাহিত হইতেছে'। সম্প্রসারিত উদ্দেশ্য—শততরঙ্গ বিস্তার করিয়া যুগ যুগ ধরিয়া পৃথিবীর মুমুক্ষু নরনারীদের মুক্তি বিতরণ করিতে করিতে পতিতোদ্ধারিণী পুণ্যসলিলা গঙ্গানদী। সম্প্রসারিত বিধেয়—বঙ্গোপসাগরের উদ্দেশ্যে প্রবাহিত হইতেছে। **সম্প্রসারিত বাক্য :** পতিতোদ্ধারিণী পুণ্যসলিলা গঙ্গানদী শততরঙ্গ বিস্তার করিয়া যুগ যুগ ধরিয়া পৃথিবীর মুমুক্ষু নরনারীদের মুক্তি বিতরণ করিতে করিতে বঙ্গোপসাগরের উদ্দেশ্যে প্রবাহিত হইতেছে।

গায়ক গান করিতেছে। উদ্দেশ্য—'গায়ক'। বিধেয়—'গান করিতেছে'। সম্প্রসারিত উদ্দেশ্য—পথের ধারে বসিয়া এক অন্ধ গায়ক। সম্প্রসারিত বিধেয়—অত্যন্ত করুণ সুরে গান করিতেছে। **সম্প্রসারিত বাক্য :** পথের ধারে বসিয়া এক অন্ধ গায়ক অত্যন্ত করুণ সুরে গান করিতেছে।

বিদ্যাসাগরের নাম বিখ্যাত। উদ্দেশ্য—'বিদ্যাসাগরের নাম'। বিধেয়—'বিখ্যাত'। সম্প্রসারিত উদ্দেশ্য—বীরসিংহের সিংহশিশু পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম। সম্প্রসারিত বিধেয়—সারা ভারতে দয়ার সাগর নামে বিখ্যাত। **সম্প্রসারিত বাক্য :** বীরসিংহের সিংহশিশু পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম সারা ভারতে দয়ার সাগর নামে বিখ্যাত।

আমি দেখিতে লাগিলাম। উদ্দেশ্য—'আমি'। বিধেয়—'দেখিতে লাগিলাম'। সম্প্রসারিত উদ্দেশ্য—আঁকাবাঁকা পার্বত্য পথে চলিতে চলিতে আমি। সম্প্রসারিত বিধেয়—দেবতাত্মা হিমালয়ের নয়নাভিরাম অনির্বচনীয় দৃশ্যরাজি দেখিতে লাগিলাম। **সম্প্রসারিত বাক্য :** আঁকাবাঁকা পার্বত্য পথে চলিতে চলিতে আমি দেবতাত্মা হিমালয়ের নয়নাভিরাম অনির্বচনীয় দৃশ্যরাজি দেখিতে লাগিলাম।

'মেয়ে চোখের জল ফেলছেন।' উদ্দেশ্য—'মেয়ে'। বিধেয়—'চোখের জল ফেলছেন'। সম্প্রসারিত উদ্দেশ্য—শয়নঘরের মেঝেয় পড়ে রাজার মেয়ে। সম্প্রসারিত বিধেয়—রাতের অন্ধকারে কেবলি চোখের জল ফেলছেন। **সম্প্রসারিত বাক্য :** রাতের অন্ধকারে শয়নঘরের মেঝেয় পড়ে রাজার মেয়ে কেবলি চোখের জল ফেলছেন।

'কিষাণরা' দেখলে।' উদ্দেশ্য—'কিষাণরা'। বিধেয়—'দেখলে'। সম্প্রসারিত উদ্দেশ্য—ক্ষেতে যেতে যেতে কোন এক অজানা গাঁয়ের কিষাণরা। সম্প্রসারিত বিধেয়—সকালে পথের ধারে দেখলে রক্তমাখা দুই রাজকুমার সুরজমল আর পৃথ্বীরাজ। **সম্প্রসারিত বাক্য :** 'কোন এক অজানা গাঁয়ের কিষাণরা সকালে ক্ষেতে যেতে যেতে পথের ধারে দেখলে রক্তমাখা দুই রাজকুমার সুরজমল আর পৃথ্বীরাজ।'

'ঘোড়া মিলিয়ে গেছে।' উদ্দেশ্য—'ঘোড়া'। বিধেয়—'মিলিয়ে গেছে'। সম্প্রসারিত উদ্দেশ্য—সঙ্গের নতুন ঘোড়া। সম্প্রসারিত বিধেয়—সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পুবমুখো অনেক দূরে ছোটো একটি কালো ফোঁটার মতো আস্তে আস্তে দূর মাঠের একেবারে শেষে বনের আড়ালে মিলিয়ে গেছে। **সম্প্রসারিত বাক্য :** 'সঙ্গের নতুন ঘোড়া সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পুবমুখো অনেক দূরে ছোটো একটি কালো ফোঁটার মতো আস্তে আস্তে দূর মাঠের একেবারে শেষে বনের আড়ালে মিলিয়ে গেছে।'

স্মরণীয় : মূল বাক্যটি সাধু বা চলিত—যে ভাষায় রচিত, বাক্যটি সেই ভাষাতেই সম্প্রসারিত হইবে।

● বি: দ্র.: এই অধ্যায়ের শেষাংশে বাক্য-প্রসারণ সম্পর্কে অতিরিক্ত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

বাক্য-সংকোচন

রচনার চমৎকারিত্ব সৃষ্টির জন্য এবং ভাবের সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য বাক্য-সংকোচনের প্রয়োজন। বাক্য সংহতির অন্য নাম একপদে পরিণতকরণ। কতকগুলি উপায়ে বাক্যাংশের বা পদ-সমষ্টির সংকোচন সম্ভব। সেই উপায়গুলি হইল : ১. কৃৎ-প্রত্যয় যোগে, ২. তদ্ধিত-প্রত্যয় যোগে, ৩. সমাস-প্রয়োগে এবং ৪. সম্পূর্ণ ভিন্ন শব্দের প্রয়োগে।

১. কৃৎ-প্রত্যয় যোগে :

অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছা = **অনুসন্ধিৎসা**। অনুকরণ করিবার ইচ্ছা = **অনুচিকীর্ষা**। উপকার করিবার ইচ্ছা = **উপচিকীর্ষা**। *লাভ করিবার ইচ্ছা = **লিপ্সা**। গমন করিবার ইচ্ছা = **জিগমিষা**। *জয় করিবার ইচ্ছা = **জিগীষা**। *জানিবার ইচ্ছা = **জিজ্ঞাসা**। শুনিবার ইচ্ছা = **শুশ্রূষা**। মুক্তির বাসনা = **মুমুক্ষা**। মরিবার ইচ্ছা = **মুমূর্ষা**। যাহার মৃত্যু নিকটবর্তী = **মুমূর্ষু**। খাইবার ইচ্ছা = **বুভুক্ষা**। ক্ষমা করিবার ইচ্ছা = **তিতিক্ষা**। হনন [হত্যা বা বধ] করিবার ইচ্ছা = **জিঘাংসা**। পান করিবার ইচ্ছা = **পিপাসা**। সহ্য করা যাহার স্বভাব = **সহিষ্ণু**। যাহা বৃদ্ধি পাইতেছে = **বর্ধিষ্ণু**। যাহা ক্ষয় পাইতেছে = **ক্ষয়িষ্ণু**। যাহা পুনঃ পুনঃ দুলিতেছে = **দোদুল্যমান**। *যাহা পুনঃ পুনঃ জ্বলিতেছে বা জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে = **জাজ্বল্যমান**। যে পুনঃ পুনঃ কাঁদিতেছে = **রোরুদ্যমান**। *যাহা উড়িয়া যাইতেছে = **উড়ন্ত, উড্ডীয়মান**। যাহা ধূম উদ্গিরণ করিতেছে = **ধূমায়মান**। যাহা দীপ্তি পাইতেছে = **দীপ্যমান**। যাহা সঞ্চিত হইতেছে = **সঞ্চীয়মান**। যে বস্তুর অপচয় হইতেছে = **অপচীয়মান**। অভ্রকে [মেঘকে] লেহন করে যে = **অভ্রংলিহ**। যাহা বাঁচিয়া আছে = **জীবন্ত**। যাহা ছুটিতেছে = **ছুটন্ত**। যাহা ফুটিতেছে = **ফুটন্ত**। যাহা বলা হইবে = **বক্ষ্যমাণ**। যাহা দেখা যাইতেছে = **দৃশ্যমান্**। যে শুইয়া আছে = **শয়ান**। যাহা আসিবে = **আগামী**। যাহা লঙ্ঘন করা যায় না = **অলঙ্ঘ্য**। যাহা অতিক্রম করা যায় না = **অনতিক্রম্য**। যাহা সহ্য

করা যায় না=**অসহ্য**। *যাহা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না=**অনির্বচনীয়**। যাহা আরোহণ করিতে কষ্ট হয়=**দুরারোহ**। যেখানে অবগাহন করা দুঃসাধ্য=**দুরবগাহ**। যাহাকে সহজে দমন করা যায় না=**দুর্দমনীয়**। যে কষ্ট সহিতে পারে=**কষ্টসহিষ্ণু**। যাহারা এক স্থান হইতে অন্যস্থানে যাতায়াত করে=**যাযাবর**। *যে নিজেকে পণ্ডিত মনে করে=**পণ্ডিতম্মন্য**। যে নারী সূর্যকে দেখে নাই=**অসূর্যম্পশ্যা**। যিনি বহু দেখিয়াছেন=**বহুদর্শী, ভূয়োদর্শী**। যিনি দূরের ঘটনাও দেখিতে পান=**দূরদর্শী**। পরিণামে কি হইবে দেখার ক্ষমতা যাহার নাই=**অপরিণামদর্শী**। যে নারীর বিবাহ হয় নাই=**অনূঢ়া**। যে কর্মের অযোগ্য=**অকর্মণ্য**। অগ্রে গমন করে যে=**অগ্রগামী**। মধু পান করে যে=**মধুপ**। গৃহে থাকে যে=**গৃহস্থ**। *যে বিদেশে থাকে না=**অপ্রবাসী**। সরোবরে জন্মে যাহা=**সরোজ, সরসিজ**। মনে জন্মে যাহা=**মনোজ, মনসিজ**। পঙ্কে জন্মে যাহা=**পঙ্কজ**। পশ্চাতে জন্ম যাহার=**অনুজ**। *অগ্রে জন্ম যাহার=**অগ্রজ**। তনু হইতে জাত=**তনুজ**। যাহার জন্ম হয় নাই=**অজ**। দুইবার জন্ম যাহার=**দ্বিজ**। পা দিয়া পান করে যে=**পাদপ**। কর দেয় যে=**করদ**। ইন্দ্রকে জয় করিয়াছে যে=**ইন্দ্রজিৎ**। শত্রুকে বধ করে যে=**শত্রুঘ্ন**। শত্রুকে জয় করিয়াছে যে=**শত্রুজিৎ**। অরিকে দমন করিয়াছে যে=**অরিন্দম**। *যাহা সহজে ভাঙিয়া যায়=**ভঙ্গুর**। ডুব দিতে জানে যে=**ডুবুরি**। গ্রহণ করিবার যোগ্য=**গ্রাহ্য**। নৌ চলাচলের যোগ্য=**নাব্য**। *উপেক্ষার যোগ্য=**উপেক্ষণীয়**। যাহা হইবে=**ভাবী**। *যাহা অবশ্যই হইবে=**অবশ্যম্ভাবী**। যে সম্পত্তি স্থানান্তরিত করা যায়=**অস্থাবর**। যাহাতে বিসংবাদ নাই=**অবিসংবাদিত, অবিসংবাদী**। *যিনি অভিনয় করেন=**অভিনেতা**। *যে গান গাহিতে পারে=**গায়ক**। যিনি আরাধনার যোগ্য=**আরাধ্য**। পানের অযোগ্য=**অপেয়**। যাহা বপন করা হইয়াছে=**উপ্ত**। যাহা বলা হইয়াছে=**উক্ত**। যে হাতে-কলমে কাজ করিয়া দক্ষতা লাভ করিয়াছে=**করিতকর্মা**। যাহা কম্পিত হইতেছে=**কম্পমান**। যাহা ঘন হইতেছে=**ঘনায়মান**। যাহা ভাবা যায় না=**অভাবনীয়**। যাহা চিন্তা করা যায় না=**অচিন্তনীয়, অচিন্ত্য**। জয়সূচক যে উৎসব=**জয়ন্তী**। যাহা গতিশীল=**জঙ্গম**। যাহা স্থানান্তরিত করা যায় না=**স্থাবর**। যে ত্বরায় গমন করে=**তুরগ, তুরঙ্গ, তুরঙ্গম**। যে লাফাইয়া চলে=**প্লবগ**। যে বক্রভাবে গমন করে=**ভুজগ, ভুজঙ্গ, ভুজঙ্গম**। *যাহা সহজে লঙ্ঘন করা যায় না=**দুর্লঙ্ঘ্য**। দেখিবার যোগ্য=**দ্রষ্টব্য**। যাহা ডুবিয়া যাইতেছে=**ডুবন্ত, নিমজ্জমান**। *যে পড়ে=**পড়ো, পোড়ো, পড়ুয়া**। সন্ন্যাস লইয়া ভ্রমণ=**প্রব্রজ্যা**। *যাহা মর্মকে পীড়া দেয়=**মর্মন্তুদ**। *যাহা মাথা পাতিয়া লওয়ার যোগ্য=**শিরোধার্য**। যাহা পরিহার করা যায় না=**অপরিহার্য**। যাহা নিবারণ করা যায় না=**অনিবার্য** *যাহার পরিমাণ করা যায় না=**অপরিমেয়**। যাহার বিনাশ আছে=**নশ্বর**। যাহার বিনাশ নাই=**অবিনশ্বর**। যাহা চিরকাল মনে রাখিবার যোগ্য=**চিরস্মরণীয়**। যে উপকারীর উপকার স্বীকার করে=**কৃতজ্ঞ**। যে উপকারীর

উপকার স্বীকার করে না=**অকৃতজ্ঞ**। যে উপকারীর অপকার করে=**কৃতঘ্ন**। কুম্ভ করে যে=**কুম্ভকার**। জলে ও স্থলে চরে যে=**উভচর**। আকাশে চরে যে=**খেচর**। যাহা অনায়াসে লাভ করা যায়=**অনায়াসলভ্য**। যাহা সহজে লাভ করা যায়=**সুলভ**। যাহা কষ্টে লাভ করিতে হয়=**দুর্লভ**। যাহা সহজে জানা যায় না=**দুর্জ্ঞেয়**। কি করিতে হইবে, যে বুঝিতে পারে না=**কিংকর্তব্যবিমূঢ়**। যাহা অদূর ভবিষ্যতে হইবার কোন আশা নাই=**সুদূর-পরাহত**। *বাঁচিয়াও যে মরিয়া আছে=**জীবন্মৃত**। যাহা আতপ হইতে রক্ষা করে=**আতপত্র**। কোন বিষয়ে সম্পূর্ণ না জানিয়া সকল বিষয় কিছু কিছু জানা=**পল্লবগ্রাহিতা**। চক্ষুর দ্বারা গৃহীত=**গোচর**। সুপথ হইতে যে বিচলিত হইয়াছে=**উন্মার্গগামী**। কন্যাকালে জাত=**কানীন**। যে পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করিতে পারে=**জাতিস্মর**। যে নারীর সম্প্রতি বিবাহ হইয়াছে=**নবোঢ়া**। যে বুকে হাঁটিয়া গমন করে=**উরগ**। যে পায়ে হাঁটিয়া গমন করে না=**পন্নগ** [পদ্+ন+গ]। পা ধুইবার জল=**পাদ্য**। যাহা সহজে পরিপাক হয় না=**দুষ্পাচ্য**। অন্য গতি নাই বলিয়া=**অগত্যা**। যে নারীর সন্তান হয় না=**বন্ধ্যা**। যে নারী একবার মাত্র গর্ভধারণ করে=**কাকবন্ধ্যা**। যাহার বিবাহ হয় নাই=**অকৃতদার**। নিতান্ত দগ্ধ হয় যে সময়ে=**নিদাঘ**। সাক্ষাৎ দ্রষ্টা=**সাক্ষী**। যাহা চক্ষে দেখা যায়=**চাক্ষুষ**। যে শোনামাত্র মনে রাখিতে পারে=**শ্রুতিধর**। যে সকল সহ্য করিতে পারে=**সর্বংসহ**। মায়া নাই যাহার=**অমায়িক**। *যাহা পূর্বে ঘটে নাই=**অভূতপূর্ব**। যাহা পূর্বে শোনা যায় নাই=**অশ্রুতপূর্ব**। *যাহা পূর্বে দেখা যায় নাই=**অদৃষ্টপূর্ব**। যাহা পূর্বে হয় নাই=**অপূর্ব**। *যাহার শত্রু জন্মে নাই=**অজাতশত্রু**। যাহার দুই হাত সমান চলে=**সব্যসাচী**। সম্মুখে অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনা=**প্রত্যুদ্গমন**। যাহা অস্বীকার করা যায় না=**অনস্বীকার্য**।

২. তদ্ধিত-প্রত্যয় যোগে :

ঈশ্বরের অস্তিত্বে যে বিশ্বাস করে=**আস্তিক**। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না যে=**নাস্তিক**। মনুর পুত্র=**মানব**। দনুর পুত্র=**দানব**। অদিতির পুত্র=**আদিত্য**। পৃথার পুত্র=**পার্থ**। ভৃগুর পুত্র=**ভার্গব**। কুন্তীর পুত্র=**কৌন্তেয়**। জনকের কন্যা=**জানকী**। ব্যাকরণ জানেন যিনি=**বৈয়াকরণ**। বিজ্ঞান জানেন যিনি=**বৈজ্ঞানিক**। ইতিহাস জানেন যিনি=**ঐতিহাসিক**। স্মৃতি জানেন যিনি=**স্মার্ত**। বুদ্ধের উপাসনা করেন যিনি=**বৌদ্ধ**। বিষ্ণুর উপাসনা করেন যিনি=**বৈষ্ণব**। শক্তির উপাসনা করেন যিনি=**শাক্ত**। গণপতির উপাসনা করেন যিনি=**গাণপত্য**। শিবের উপাসনা করেন যিনি=**শৈব**। সব চেয়ে বড়=**জ্যেষ্ঠ**। সব চেয়ে ছোট=**কনিষ্ঠ**। যাহা বনে জাত=**বন্য, বনজ**। যাহা যুক্তিসঙ্গত নহে=**অযৌক্তিক**। যে স্ত্রীর বশীভূত=**স্ত্রৈণ**। যাহা হিরণ্য দ্বারা নির্মিত=**হিরণ্ময়**। *যাহা মাটির দ্বারা নির্মিত=**মেটে**। রেশমে নির্মিত=**রেশমী**।

শরীর সম্বন্ধীয়=**শারীরিক**। যাহা হেমন্তকালে জন্মে=**হৈমন্তিক**। যাহা শরৎকালে ঘটে=**শারদীয়**। বোকার মত=**বোকাটে**। পাগলের মত=**পাগলাটে**। *যে বিনা বেতনে কাজ করে=**অবৈতনিক**। পরিতুষ্ট হইয়া যাহা দেওয়া হয়=**পারিতোষিক**। *যিনি পুরাকালের বিষয় জানেন=**পুরাতাত্ত্বিক**। পার হইবার জন্য যে মূল্য=**পারানি**। পূর্বকাল সম্পর্কিত=**প্রাক্তন**। বালকের অহিত=**বালাই**। বার মাসের কাহিনী=**বারমাস্যা**। *যাহাতে মজা আছে=**মজাদার**। যাহারা স্থান হইতে স্থানান্তরে ভ্রমণ করে=**যাযাবর**। *সাধুর ভাব=**সাধুতা**। ময়ূরের কণ্ঠের ন্যায় রং যাহার=**ময়ূরকণ্ঠী**। জুয়া খেলে যে=**জুয়ারী** বা **জুয়াড়ী**। চৈত্রমাসে উৎপন্ন=**চৈতালী**। পাটনায় উৎপন্ন=**পাটনাই**। যে সাপ ধরিতে পটু=**সাপুড়িয়া, সাপুড়ে**। তীর ছুঁড়ে যে=**তীরন্দাজ**। যে বহু কথা বলে=**বাচাল**। *যে মায়া জানে না=**অমায়িক**। আট মাসে যে জন্মিয়াছে=**আটাশে**। এক পঙ্‌ক্তিতে বসার অযোগ্য=**অপাঙ্‌ক্তেয়**। *কোথাও উঁচু কোথাও নীচু=**বন্ধুর**। যে গাছ ফল পাকিলে মরিয়া যায়=**ওষধি**। ঋষির দ্বারা উক্ত=**আর্ষ**। খেয়া পার করে যে=**পাটনী**। একই সময়ে বর্তমান=**সমসাময়িক**। যাহা সারাদিন [আটপ্রহর] ব্যবহৃত হয়=**আটপৌরে**। যে রোগ নির্ণয়ে হাতড়াইয়া মরে=**হাতুড়ে**। *যে বিচার না করিয়া কাজ করে=**অবিমৃষ্যকারী**। যে নারী পতিপুত্রহীনা=**অবীরা**। যে জমিতে দুইবার ফসল হয়=**দোফসলী**। দুই দিকের হার [অনুপাত] সমান যাহার=**দোহারা**। দুয়ের মধ্যে একটি=**অন্যতর**। বর্ণমালার পারম্পর্য রক্ষা করিয়া=**বর্ণানুক্রমিক**। দ্বারে থাকে যে=**দৌবারিক**। *যাহার শ্রী আছে=**শ্রীমান্, শ্রীমন্ত**। যাহার মান আছে=**মানী**। *যাহার যশ আছে=**যশস্বী**। গাড়ী চালায় যে=**গাড়োয়ান**। জল দ্বারা ব্যাপ্ত=**জলময়**।

৩. সমাস-প্রয়োগে :

যিনি পণ্ডিত হইয়াও মূর্খ=**পণ্ডিতমূর্খ**। গো-র ন্যায় বেচারী=**গোবেচারী**। শশকের ন্যায় ব্যস্ত=**শশব্যস্ত**। শত অব্দের সমাহার=**শতাব্দী**। পা হইতে মাথা পর্যন্ত=**আপাদমস্তক**। জীবন পর্যন্ত=**আজীবন**। দ্বীপের সদৃশ=**উপদ্বীপ**। ভিক্ষার অভাব=**দুর্ভিক্ষ**। কূলের বিরুদ্ধে=**প্রতিকূল**। জন্ম হইতে অন্ধ=**জন্মান্ধ**। পুত্র নাই যাহার=**অপুত্রক**। পত্নী মৃত হইয়াছে যাহার=**বিপত্নীক**। পত্নীর সহিত বর্তমান=**সপত্নীক**। একই গুরুর শিষ্য=**সতীর্থ**। কানে কানে যে মন্ত্রণা=**কানাকানি**। যাহার সর্বস্ব হৃত হইয়াছে=**হৃতসর্বস্ব**। নদী মাতা যে দেশের=**নদীমাতৃক**। কৃষি মাতা যে দেশের=**কৃষিমাতৃক**। দুইদিকে অপ্‌ [জল] যাহার=**দ্বীপ**। যে স্ত্রীর ভর্তা [স্বামী] বিদেশে আছেন=**প্রোষিতভর্তৃকা**। যাহার মন অন্য দিকে নাই=**অনন্যমনা**। অন্য সহায় নাই যাহার=**অনন্যসহায়**। যাহা অন্য ব্যক্তিতে সাধারণ নয়=**অনন্যসাধারণ**। যাহার দাড়ি জন্মায় নাই=**অজাতশ্মশ্রু**। সুগন্ধ আছে যাহার=**সুগন্ধি**। গাণ্ডীব ধনু যাহার=**গাণ্ডীবধন্বা**। স্বামী নাই যাহার

=**বিধবা**। যাহার মমতা নাই=**নির্মম**। সমুদ্র হইতে হিমাচল পর্যন্ত=**আসমুদ্র-হিমাচল**। সাগর সমেত পৃথিবী=**সসাগরা-পৃথিবী**। যাহার পরিমাণ করা যায় না=**অপরিমেয়**। যাহার উপায় নাই=**নিরুপায়**। যাহার অন্য উপায় নাই=**অনন্যোপায়**। *যাহার ভাতের অভাব আছে=**হা-ভাতে**। যাহার ঘরের অভাব আছে=**হা-ঘরে**। যাহার কুল ও শীল জানা নাই=**অজ্ঞাতকুলশীল**। যাহা বাক্য ও মনের অতীত=**অবাঙ্‌মনসগোচর**। যাহা খুব [অতি] দীর্ঘ নহে=**নাতিদীর্ঘ**। যাহা অতি শীতও নয়, উষ্ণও নয়=**নাতিশীতোষ্ণ**। সামান্য উষ্ণ=**কবোষ্ণ**। যাহা হইতে পারে না=**অসম্ভব**। যাহা শোনার যোগ্য নহে=**অশ্রাব্য**। যাহা বলার যোগ্য নহে=**অকথ্য**। কর্ণ পর্যন্ত=**আকর্ণ**। জন্ম হইতে=**আজন্ম**। মৃত্যু [মরণ] পর্যন্ত=**আমৃত্যু** [আমরণ]। *শৈশব হইতে=**আশৈশব**। কণ্ঠ পর্যন্ত=**আকণ্ঠ**। জানু পর্যন্ত লম্বিত=**আজানুলম্বিত**। *উপস্থিত বুদ্ধি যাহার আছে=**প্রত্যুৎপন্নমতি**। যাহা প্রথমে মধুর=**আপাতমধুর**। যতটা পারা যায় [শক্তিকে অতিক্রম না করিয়া]=**যথাশক্তি**। যে বিদেশে থাকে=**প্রবাসী**। নাভি পর্যন্ত লম্বিত হার=**ললন্তিকা**। পথ দেখায় যে=**পথপ্রদর্শক**। শিক্ষার উপর নির্ভর না করিয়া=**শিক্ষা-নিরপেক্ষ** যে পরিমিত কথা বলে=**মিতভাষী**। যে আয় বুঝিয়া ব্যয় করে=**মিতব্যয়ী**। যে গলায় কাপড় দিয়াছে=**গললগ্নীকৃতবাস**। ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছেন যিনি—**জিতেন্দ্রিয়**। যে স্বামীর স্ত্রী বিদেশে থাকে=**প্রবাস-পত্নীক**। একই সময়ে বর্তমান=**সমসাময়িক**। যে ভূমির উৎপাদিকা-শক্তি নাই=**অনুর্বরা**। যে পূর্বে অপরের বাগ্‌দত্তা বা স্ত্রী ছিল=**অন্যপূর্বা**। যাহার দ্বিতীয় বা সদৃশ নাই=**অদ্বিতীয়**। যাহা নিজ অধিকারের বহির্ভূত, তাহার চর্চা=**অনধিকারচর্চা**। *কুৎসিত আকার যাহার=**কদাকার**। *খেলায় পটু যে=**খেলোয়াড়**। যে শুভক্ষণে জন্মিয়াছে=**ক্ষণজন্মা**। যাহার ঘাম ঝরিতেছে=**গলদ্‌ঘর্ম**। দিনের আলো ও রাতের অন্ধকারের সন্ধিক্ষণ=**গোধূলি**। যে গাছে বছরে দুইবার ফল ধরে=**দোফলা**। দুই রথীর যুদ্ধ=**দ্বৈরথ**। ধনুর দ্বারা যে যুদ্ধ করে=**ধনুর্ধর**। যে কাহারও অপেক্ষা রাখে না=**নিরপেক্ষ**। যাহার উদ্দেশ নাই [সন্ধান বা ঠিকানা অজ্ঞাত]=**নিরুদ্দেশ**। *যাহার গুণ নাই=**নির্গুণ**। *যাহার জন্য কর দিতে হয় না=**নিষ্কর**। *পরের সৌভাগ্য দেখিলে যে কাতর হয়=**পরশ্রীকাতর**। মৃত্যু কামনায় উপবাস=**প্রায়োপবেশন**। সর্বজন সম্বন্ধীয়=**সার্বজনীন**। সর্বজনের কল্যাণে=**সর্বজনীন**। *যাহার অনুরাগ দূর হইয়াছে=**বীতরাগ**। *খরচের হিসাব নাই যাহার=**বেহিসাবী**। বন্দোবস্তের অভাব=**বেবন্দোবস্ত**। ছল করিয়া কান্না =**মায়াকান্না**। যে নারীর হাসি শুচি=**শুচিস্মিতা**। *স্ত্রীর সহিত বর্তমান= =**সস্ত্রীক**। *হৃদয়ের প্রীতিকর=**হৃদ্য**। যেখানে মাছি প্রবেশ করিতে পারে না=**নির্মক্ষিক**। যে কোন অবলম্বন ছাড়াই থাকে=**নিরালম্ব**। যাহার কিছুই নাই=**নিঃস্ব, অকিঞ্চন**। হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিকের সমাহার=**চতুরঙ্গ**। যে নারীর সন্তান বাঁচে না=**মৃতবৎসা**। বেদান্ত জানেন যিনি=**বৈদান্তিক**। বেদ জানেন

যিনি=**বেদজ্ঞ**। যাহাকে শাসন করা কঠিন=**দুঃশাসন**। একই মায়ের পুত্র=**সহোদর**। যে ভূমিতে ফসল জন্মে না=**ঊষর**। *যে নারী প্রিয় বাক্য বলে=**প্রিয়ংবদা**। যে বৃক্ষের ফুল হয় না, কিন্তু ফল হয়=**বনস্পতি**।

৪. **সম্পূর্ণ ভিন্ন শব্দের প্রয়োগে :**

পুরুষের উদ্দাম নৃত্য=**তাণ্ডব**। হস্তীর চীৎকার=**বৃংহণ, বৃংহতি**। অশ্বের চীৎকার=**হ্রেষা**। ভূষণাদির শব্দ=**শিঞ্জন, টুংকার**। নূপুরের শব্দ=**নিক্কণ**। পাখীর কলরব=**কাকলি, কূজন**। ময়ূরের ডাক=**কেকা**। কোকিলের ডাক=**কুহু**। ভ্রমরের শব্দ=**গুঞ্জন**। বীণার ধ্বনি=**ঝঙ্কার**। ধনুকের শব্দ=**টঙ্কার**। বাঘের চামড়া=**কৃত্তি**। হরিণের চামড়া=**অজিন**। পরিব্রাজকের বৃত্তি=**প্রব্রজ্যা**। পরিব্রাজকের ভিক্ষা=**মাধুকরী**।

● **বিশিষ্ট প্রয়োগ**। ধনীদিগের **ধনলিপ্সা** অত্যন্ত প্রবল। **জিজ্ঞাসার** দীপশিখা জ্বালিয়া মানুষ অজানার অন্ধকারে পাড়ি দিয়াছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নাম ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে চির-**জাজ্বল্যমান** হইয়া থাকিবে। **তীরন্দাজ** আকাশে একটি **উড়ন্ত** [উড্ডীয়মান] বিহঙ্গকে তীরবিদ্ধ করিয়া ভূপাতিত করিল। ভারতের উত্তরে **অভ্রংলিহ** হিমাচল। কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরে সূর্যোদয়ের শোভা সত্যই **অনির্বচনীয়**। দ্বিজেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের **অগ্রজ**। মানুষের মন কি কাচের মতো **ভঙ্গুর**? এই সামান্য দোষত্রুটি **উপেক্ষণীয়**। অহংকারের পতন **অবশ্যম্ভাবী**। শিশিরকুমার ছিলেন ভারতের শ্রেষ্ঠ **অভিনেতা**। যুগের যন্ত্রণায় বর্তমানের যবনিকা **কম্পমান**। আদর্শ উদ্‌যাপনের পথে রহিয়াছে **দুর্লঙ্ঘ্য** বাধা। 'আমি আজ কানাই মাস্টার, **পোড়ো** মোর বেড়াল-ছানাটি।' রাজপুত-ললনাদের কাহিনী এক **মর্মন্তুদ** আত্ম-বিসর্জনের কাহিনী। যাহা **অনিবার্য**, তাহা **শিরোধার্য**। যাহারা **শুশ্রূষা** করিতেছিল, তাহারা **মুমূর্ষুকে** ঘিরিয়া বসিল। তাঁহার পূর্বপুরুষেরা ছিলেন **অপরিমেয়** সম্পদের অধিকারী। 'বিটপাল আর ধীমান্, যাদের নাম **অবিনশ্বর**।' অনাহারে, অনিদ্রায় এবং দুরারোগ্য ব্যাধিতে তিনি আজ **জীবন্মৃত**। অবিমৃষ্যকারিতার জন্য **অবিমৃষ্যকারীদের** পরে দুঃখ পাইতে হয়। তিনি চিরকাল **মেটে** ঘরেই বাস করিতেন। তিনি **অমায়িক** প্রকৃতির লোক ছিলেন। 'পতন-অভ্যুদয়-**বন্ধুর পন্থা** যুগ-যুগ-ধাবিত যাত্রী।' **পুরাতাত্ত্বিক** গবেষণায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, ভারতীয় সভ্যতা অতি সুপ্রাচীন। 'কণ্ঠে নিলেম গান, আমার শেষ **পারানির** গান।' নামগুলিকে **বর্ণানুক্রমিকভাবে** সাজাও। 'ফুল্লরার **বারমাস্যা**' দরিদ্র ব্যাধ-বধূর বেদনাময় আত্মকাহিনী। 'বিশ্বের পথে ছুটে চলিয়াছি আমি এক **যাযাবর**।' **সাধুতাই** শ্রেষ্ঠ উপায়। 'ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী **পাটনী**।' মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন **সমসাময়িক**। বাংলা **নদীমাতৃক** দেশ। শিশুরা আগন্তুকের **আপাদমস্তক** নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। 'দূর হবে **দুর্ভিক্ষের** ক্ষুধা।' ভূদেবচন্দ্র ছিলেন মধুসূদনের **সতীর্থ**। **প্রোষিতভর্তৃকা** প্রবাসী স্বামীর পথ চাহিয়া আছেন।

● এই অধ্যায়ের সূচনায় বাক্য-প্রসারণ বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। আর এক প্রকার পদ্ধতির দ্বারা বাক্য-প্রসারণ করা যায়। বাক্যের মধ্যে কোন কৃৎ-প্রত্যয় বা তদ্ধিত-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন শব্দ থাকিলে অথবা সমাসবদ্ধ পদ থাকিলে তাহাকে প্রসারিত করিয়া বাক্য-প্রসারণ করা যায়। সেজন্য বাক্য-সংকোচন অংশটি আগে পাঠ করিয়া লইতে হইবে। তারপর নিম্নের দৃষ্টান্তগুলি লক্ষ্য কর:

১. ধূমায়মান পর্বতকে আগ্নেয়গিরি বলা হয়।—যে পর্বত ধূম উদ্‌গিরণ করিতেছে, তাহাকে আগ্নেয়-গিরি বলা হয়। ২. তাহার প্রবল জিজ্ঞাসা তাহাকে স্থির থাকিতে দিল না।—তাহার জানিবার প্রবল ইচ্ছা তাহাকে স্থির থাকিতে দিল না। ৩. চলন্ত গাড়িতে উঠিবার চেষ্টা করিলে পতনের সম্ভাবনা থাকে।—যে গাড়ি চলিতেছে, তাহাতে উঠিবার চেষ্টা করিলে পতনের সম্ভাবনা থাকে। ৪. ক্ষয়িষ্ণু সমাজে প্রাচীন মূল্যবোধগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে।—যে সমাজ ক্ষয় পাইতেছে, তাহাতে প্রাচীন মূল্যবোধগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে। ৫. জীবনে কোন বাধাই অলঙ্ঘ্য বা অনতিক্রম্য নয়।—জীবনে এমন কোন বাধা নাই, যাহা লঙ্ঘন করা যায় না বা অতিক্রম করা যায় না। ৬. প্রকৃতির অনির্বচনীয় রূপমাধুরী আমরা দেখিতে লাগিলাম।—বাক্যে প্রকাশ করা যায় না, প্রকৃতির এমন রূপমাধুরী আমরা দেখিতে লাগিলাম। ৭. যে গায়ক, সে ভালো অভিনেতা না-ও হইতে পারে।—যে গান গাহিতে পারে, সে ভালো অভিনয় না-ও করিতে পারে। ৮. সর্বদা ভূয়োদর্শীর পরামর্শ গ্রহণ করিবে।—যিনি বহু দেখিয়াছেন, সর্বদা তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিবে। ৯. ঐতিহাসিকেরা তোমার এই কথা স্বীকার করিবেন না।—যাঁহারা ইতিহাস জানেন, তাঁহারা তোমার এই কথা স্বীকার করিবেন না। ১০. নাস্তিকেরাও একসময় ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিয়া বসেন।—যাঁহারা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন না, তাঁহারাও এক সময় ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিয়া বসেন। ১১. রাজনারায়ণ বসু ছিলেন ঋষিকল্প মানুষ।—রাজনারায়ণ বসু ছিলেন ঋষির মতন মানুষ। ১২. তিনি কবি মধুসূদনের সমসাময়িক।—তিনি কবি মধুসূদনের একই কালে বর্তমান ছিলেন। ১৩. এ বৎসর হৈমন্তিক ধান ভালো হয় নাই।—যে ধান হেমন্তকালে জন্মে, তাহা এ বৎসর ভালো হয় নাই। ১৪. একজন ডুবুরিকে ডাক।—যে ডুব দিতে জানে, এমন একজনকে ডাক। ১৫. অপরিণামদর্শীকে অনুশোচনা ভোগ করিতে হয়।—পরিণাম না দেখিয়া যে কাজ করে, তাহাকে অনুশোচনা ভোগ করিতে হয়। ১৬. নামগুলি বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজাও।—নামগুলি বর্ণমালার পারম্পর্য রক্ষা করিয়া সাজাও। ১৭. ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন।—ধৃতরাষ্ট্র জন্ম হইতে অন্ধ ছিলেন। ১৮. অজ্ঞাতকুলশীলকে গৃহে স্থান দেওয়া কি উচিত?—যাহার কুল ও শীল জানা নাই, তাহাকে গৃহে স্থান দেওয়া কি উচিত? ১৯. যে দেশে দুর্ভিক্ষ, সে দেশে মিতব্যয়ী হওয়া ভালো।—যে দেশে ভিক্ষার অভাব, সে দেশে আয় বুঝিয়া ব্যয় করা ভালো। ২০. তাঁহারা আগন্তুকের আপাদমস্তক লক্ষ্য করিয়া পরস্পর কানাকানি করিতে লাগিলেন।—তাঁহারা আগন্তুকের পা হইতে মাথা পর্যন্ত লক্ষ্য করিয়া কানে কানে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।

॥ অনুসরণী ॥

১. বাক্যগুলি প্রসারিত কর: বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। বর্ষাকালে বৃষ্টি হয়। আকাশ আবৃত হইল। বিদ্যাসাগর চলিলেন। পাখী ডাকিতেছে। সূর্য অস্ত গেল। বাতাস বহিতেছে। যুদ্ধ শুরু হইল। নবকুমার কহিলেন। আমি পাঠ করিয়াছি। জোনাকি হরির লুঠ ছড়াইতেছে। দুর্যোধন চলে গেলেন। কৃষ্ণ বলেন। বন্ধুরা স্থির করিল। বনশ্রেণী আয়োজন করেছে। রবীন্দ্রনাথ কবি। রূপ বদলাইয়া যায়। ফসল ফলে। মাঝিরা গান ধরেছে। খবর রটে গেল।

২. কৃদন্ত বা তদ্ধিতান্ত বা সমাসবদ্ধ পদগুলিকে প্রসারিত করিয়া বাক্যগুলিকে সম্প্রসারিত কর: মুমূর্ষুকে জল দান করা একটি পুণ্য কর্ম। জীবন্ত সর্প দংশন করে। যাহা অপরিহার্য, তাহা শিরোধার্য। নেতাজী যে একজন শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক ছিলেন, তাহা অবিসংবাদিত। জগতে অপরিণামদর্শীরাই ভুল করে। যাহা অবশ্যম্ভাবী, তাহা অনিবার্য। এদেশে দ্রব্যমূল্য কমিবে, ইহা সুদূরপরাহত ছিল। এমন অভূতপূর্ব ঘটনায় সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেল। তিনি আজন্ম বৈষ্ণব, আমরণ বৈষ্ণবই ছিলেন। জগতে

পরশ্রীকাতরেরাই অসুখী। এই বনে ওষধি যেমন দুর্লভ, বনস্পতি তেমন দুর্লভ নয়। তিনি একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। তিনি ছিলেন জিতেন্দ্রিয়, মিতব্যয়ী এবং মিতভাষী।

*৩. একপদে পরিণত করিয়া সার্থক বাক্য রচনা কর :

ক. যে গলায় কাপড় দিয়াছে। যে অগ্রে জন্মিয়াছে। যাহাতে মজা আছে। যে জীবিত থাকিয়াও মৃত। যে আপনাকে পণ্ডিত মনে করে। যাহার ভাতের অভাব আছে। যাহা সহজে ভাঙে। যাহা পূর্বে কখনও শোনা যায় নাই। মা. '৫৮। খ. যাহা অবশ্যই হইবে। বন্দোবস্তের অভাব। পা হইতে মাথা পর্যন্ত। যাহা ন্যায়ের অনুবর্তী নয়। মা. '৫৯। গ. স্ত্রীর সহিত বর্তমান। যাহা পূর্বে শোনা যায় নাই। যাহা পরিমাণ করা যায় না। যাহা সহজে ভাঙ্গিয়া যায় যিনি আরাধনার যোগ্য। যে জীবিত থাকিয়াও মৃতবৎ। শৈশবকাল হইতে। উপেক্ষার যোগ্য। মা. '৬০। ঘ. খেলায় দক্ষ। কুৎসিত আকার যাহার। যাহার জন্য কর দিতে হয় না। পান করিবার যোগ্য। প্রিয়বাক্য বলে যে রমণী। খরচের হিসাব নাই যার। যাহা উড়িয়া যাইতেছে। যাহা করিতে হইতেছে। মা. '৬১। ঙ. যাহা সহজে লঙ্ঘন করা যায় না। যাহা জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। যাহা কোথাও নীচু, কোথাও উঁচু। যে ডুবিয়া যাইতেছে। যাহা মাথা পাতিয়া লওয়ার যোগ্য। পরের সৌভাগ্য দেখিয়া যে কাতর হয়। যাহা পান করার অযোগ্য। মা. '৬২। চ. যাহার উপস্থিত-বুদ্ধি আছে। যাহা সহজে ভাঙে। জানিবার ইচ্ছা। যে-বস্তু খাইতে ইচ্ছা হয়। যাহার অনুরাগ দূর হইয়াছে। পুরাকালের বিষয় জানে যে। হৃদয়ের প্রীতিকর। মা. '৬৩। ছ. যে গাছ ফল পাকিলে মরিয়া যায়। আদর করার যোগ্য যে বা যাহা। যে বিদেশে থাকে না। যে ব্যক্তি বিশেষ বিবেচনা না করিয়া কাজ করে। যাহার গুণ নাই। যে মনকে পীড়া দেয়। যাহার শুনিবার ইচ্ছা আছে। যাহা বচনের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। মা. '৬৪। জ. সাধুর ভাব। যে ব্যাকরণ জানে। যাঁহার যশ আছে। যিনি অভিনয় করেন। যে পড়ে। মাটি দিয়া তৈয়ারী। মা. '৬৫।

৪. স্থূলাক্ষর বাক্যগুলিকে সংকুচিত কর বা স্থূলাক্ষর শব্দগুলির স্থানে একটিমাত্র শব্দ ব্যবহার কর বা জটিল বাক্যগুলিকে সরল বাক্যে পরিণত কর :

যাহার কুল ও শীল জানা নাই তাহাকে গৃহে স্থান দেওয়া উচিত হয় নাই। **যে মরিতে চাহিতেছে** তাহাকে মরিতে দাও। সে **জন্ম হইতেই** বধির। এখন দেশে **ভিক্ষার অভাব** নাই। তিনি **মৃত্যু পর্যন্ত** অনশন করিবেন। **যে নারী পুনঃ পুনঃ কাঁদিতেছিল** তাহার পরিচয় কাহারও জানা নাই। আমি যে আনন্দ লাভ করিলাম **তাহা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না।** **যিনি বহু দেখিয়াছেন** একমাত্র তিনিই সে কথা বলিতে পারেন। **যাহা নিবারণ করা যায় না, তাহা মাথা পাতিয়া লওয়া উচিত।** **যে রাঁধে,** সেও চুল বাঁধে। **পরিণামে কি হইবে দেখার ক্ষমতা যাহার নাই,** সে কি কখনও সুখী হইতে পারে? **যে বাঁচিয়াও মরিয়া আছে তাহার** আবার মৃত্যুভয় কি? ইনি ঘটনার একজন **সাক্ষাৎ দ্রষ্টা।** এই ঘটনা **পূর্বে কখনও ঘটে নাই।** **যিনি ব্যাকরণ জানেন** তাঁহাকে **জিজ্ঞাসা করিও।**

*৫. নিম্নমুদ্রিত উক্তিনিচয়ের উপযুক্ত প্রতিশব্দ রচনা কর :

যাহা সহজেই ভাঙ্গিয়া যায় : সে নিজেকে পণ্ডিত মনে করে : ঢাকায় উৎপন্ন : যাহা পূর্বে ঘটে নাই : মৃত্যুকাল পর্যন্ত : যিনি অরিকে দমন করেন : জীবিত থাকিয়াও মৃত যে : যে বুকে ভর দিয়া গমন করে : শ্রবণ করিবার ইচ্ছা : যে অবস্থায় ভিক্ষা মিলে না : যাহা বচনের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। উ. মা. '৭০। অপকার করিবার ইচ্ছা : উপায় নাই যাহার : পা হইতে মাথা পর্যন্ত : যাহা পূর্বে শোনা যায় নাই : যে দুই-বার জন্মায় : যাহা সহজে পাওয়া যায় না : যে বিচার করিয়া কাজ করে না : শ্রবণ করিবার ইচ্ছা। উ. মা. [কম্পার্ট.] '৭০। যাহা পূর্বে জানা যায় নাই : শত্রুকে বধ করিয়াছেন যিনি : যাহা অবশ্যই হইবে : হনন করিবার ইচ্ছা : ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছে যে : যাহা উড়িয়া যাইতেছে : যে গাছে বৎসরে দুইবার ফল হয়। উ. মা. '৬৯। অক্ষর জ্ঞান নাই যাহার : যাহা কামনার যোগ্য : বন্ধুর স্ত্রী : মিতার ভাব : জানিবার ইচ্ছা : যাহার প্রয়োজন নাই : যে উপকারীর ঋণ স্বীকার করে না। উ. মা. [কম্পার্ট.] '৬৯। যাহা বচনে প্রকাশ

করা যায় না ; বেদে যিনি অভিজ্ঞ ; ঈষৎ নীলবর্ণ বিশিষ্ট [নীলাভ] ; যাহা পান করিবার যোগ্য নহে ; যাহা অর্জন করা হইয়াছে [অর্জিত] ; যে বিবেচনাপূর্বক কাজ করে না [অবিবেচক] ; যাহার অন্য গতি নাই [অনন্যগতি] ; উ. মা. '৬৮ । একই গুরুর শিষ্য ; পরিব্রাজকের ভিক্ষা ; যাঁহার পত্নী বিদেশে থাকেন ; বিদেশে থাকে যে ; যে নিজেকে পণ্ডিত বলিয়া মনে করে ; যাহার কোন মায়া নাই ; যাহা প্রমাণ করা যায় না [অপ্রামাণিক] ; দিনের আলো ও রাত্রির অন্ধকারের মিলনকাল [গোধূলি] ; যাহার অন্যদিকে মন নাই ; যাহার দাড়ি জন্মে নাই ; যাহা হইতে পারে না ; সমান গোত্র যাহাদের ; যাহার স্বামী বিদেশে আছেন ; জায়া ও পতি ; ছেলে ধরে যে ; অতি শীতও নয়, অতি উষ্ণও নয় ; পণ্ডিত হইয়াও মূর্খ ; গো-র ন্যায় বেচারি ; হিসাবে দক্ষ ; ময়ূরের কণ্ঠের ন্যায় রং যাহার ; বনে জাত ; মাটি দ্বারা তৈয়ারী ; চক্ষু দ্বারা গৃহীত ; যাহা যুক্তিসঙ্গত নহে ; যাহা পূর্বে দেখা যায় নাই ; দর্শন জানেন যিনি ; ইন্দ্রিয়কে জয় করিয়াছে যে ; সকল সহ্য করে যে ; গৃহে থাকে যে ; যে সহজেই ভয় পায় ; যাহা নিন্দার যোগ্য ; যাহা দেওয়া যায় না ; যাহা পুনঃ পুনঃ জ্বলিতেছে ; যাহা বলা হইবে ; যাহা শোভা পায় [শোভন] ।

———

বাগ্ধারা

প্রত্যেক ভাষারই কতকগুলি চিরকালাগত নিজস্ব বাক্-ভঙ্গিমা আছে। তাহাদের কোনরূপ পরিবর্তন করা যায় না। নিয়ত ব্যবহারের দ্বারা তাহারা যুগ যুগ ধরিয়া বিশেষ অর্থ প্রকাশ করিয়া আসিতেছে। আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ না করিয়া তাহাদের গূঢ়ার্থই গ্রহণ করা হইয়া থাকে। ইহারা বাগ্ধারা। এই বাগ্ধারাই ভাষার প্রাণ।

নিম্নে এইরূপ বিশিষ্টার্থ-প্রকাশক বাক্যাংশের অর্থ ও ব্যবহারের রীতি প্রদর্শিত হইল :

১. **অকূল পাথার** [ভীষণ বিপদ]—স্বামী, পুত্র এবং যথাসর্বস্ব হারাইয়া মহিলাটি একেবারে অকূল পাথারে পড়িয়াছেন। ২. **অরণ্যে রোদন** [নিষ্ফল আবেদন]—নির্মম ঐ ব্যক্তির নিকট দয়া ভিক্ষা করা কেবল অরণ্যে রোদন মাত্র। ৩. **অকাল কুষ্মাণ্ড** [অকর্মণ্য ব্যক্তি]—বড় লোকের ছেলে ভজহরি একটি অকাল কুষ্মাণ্ড, ওকে দিয়ে কোন কাজই হবে না। ৪. **অন্ধের যষ্টি** [অসহায়ের সহায়] —'অন্ধের যষ্টির মত কর গো আমারে।' ৫. **অর্ধচন্দ্র দেওয়া** [গলাধাক্কা দেওয়া]—দাও ওকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় করে। ৬. **অগস্ত্য যাত্রা** [চির-বিদায় নেওয়া]—সেটা ছিল তাহার অগস্ত্য যাত্রা ; সেই যে সে গেল, আর ফিরিয়া আসিল না। ৭. **অগ্নিশর্মা** [অত্যন্ত ক্রুদ্ধ]—রাগে অগ্নিশর্মা হইয়া তিনি স্থান ত্যাগ করিলেন। ৮. **অহি-নকুল সম্বন্ধ** [নিদারুণ শত্রুতা]—তাহার সহিত তোমার ত' অহি-নকুল সম্বন্ধ। ৯. **অথৈ জল** [ভীষণ বিপদ]—এখন আমার চারিদিকে একেবারে অথৈ জল, কোনদিকেই নিস্তার নেই। ১০. **অমাবস্যার চাঁদ** [দুর্লভ-দর্শন]—তুমি যে আজকাল অমাবস্যার চাঁদ হয়ে উঠেছ, দেখা পাওয়াই ভার। ১১. **অশ্ব ডিম্ব** [অবাস্তব বস্তু]—যে যাহা পারিল লুটিয়া লইল, আর আমার ভাগ্যে অশ্ব ডিম্ব।

১২. **আনাগোনা** [আসা-যাওয়া]—'বন্ধ হবে আনাগোনা এই হাটে।' ১৩. **আহ্লাদে আটখানা** [অত্যন্ত আনন্দিত]—পাসের খবর পাইয়া পাঁচুগোপাল ত' আহ্লাদে আটখানা! ১৪. **আকাশ কুসুম** [অসম্ভব কল্পনা]—সে একজন বড় কবি হইবে, ইহা আকাশ কুসুম। ১৫. **আদার ব্যাপারী** [সামান্য কাজের লোক]—আমরা রোজ আনি, রোজ খাই, বিলেত যেতে প্লেনের ভাড়া কত জানবার কি দরকার? আদার ব্যাপারীর আবার জাহাজের খবর! ১৬. **আক্কেল সেলামী** [বোকামির দণ্ড]—তাহার কথায় অমন দামী বইটা আমাকে আক্কেল সেলামী দিতে হলো। ১৭. **আকাশ-পাতাল প্রভেদ**, ১৮. **আসমান-জমিন ফারাক** [খুব বেশী পার্থক্য]—তুমি উচ্চশিক্ষিত,

আর আমি গ্রাম্য পাঠশালায় পড়া সমাপ্ত করেছি মাত্র—তোমায় আমায় আকাশ-পাতাল প্রভেদ [আসমান-জমিন ফারাক]। ১৯. **আক্কেল গুড়ুম** [কিংকর্তব্য-বিমূঢ়]—খবরটা শুনেই ত' তার একেবারে আক্কেল গুড়ুম। ২০. **আমড়াগাছি** [খোসামোদ]—আমড়াগাছি করে সে বড়দার অমন দামী ঘড়িটা হাতিয়ে নিয়েছে। ২১. **আঠারো মাসে বছর** [দীর্ঘসূত্রী, অতি বিলম্বে কাজ করা]—তোমার ত' আঠারো মাসে বছর; দেখা যাক, কাজটা কবে শেষ হয়। ২২. **আড়ি পাতা** [লুকাইয়া কিছু শুনিবার চেষ্টা]—দুই বন্ধুতে কি গোপন পরামর্শ করিতেছে, তাহা চাকরটা আড়ি পাতিয়া শুনিবার চেষ্টা করিল। ২৩ **আদায় কাঁচকলায়** [বনিবনার অভাব]—পিতার মৃত্যুর পর দুই ভাইতে একেবারে আদায় কাঁচকলায়; মুখদেখাদেখি বন্ধ। ২৪. **আইঢাই** [বদহজমজনিত অস্বস্তি]—অবেলায় নেমন্তন্ন খেয়ে এখন তার পেটটাই আইঢাই করছে। ২৫. **আঙুল ফুলে কলাগাছ** [হঠাৎ ধনী হয়ে ওঠা]—বেশী মাইনের চাকরি পেয়ে এখন ত' সে আঙুল ফুলে কলাগাছ। ২৬ **আলালের ঘরের দুলাল** [বড়লোকের অপদার্থ সন্তান]—২৭. **আদা জল খেয়ে লাগা** [দৃঢ় সংকল্প নিয়ে কাজ করা]—আদা জল খেয়ে লেগে যাও, দেখবে ঠিক পাস করেছ। ২৮. **আমড়া কাঠের ঢেঁকি** [অকর্মণ্য]—তুমি ওকে বলেছ ঘর সাফ করতে? তা হলেই হয়েছে। ও ত' একটা আমড়া কাঠের ঢেঁকি। ২৯ **আষাঢ়ে গল্প** [অবাস্তব গল্প]—রাখো তোমার আষাঢ়ে গল্প। ভালো লাগে না এ সব উদ্ভট গল্প শুনতে। ৩০. **আকাশ থেকে পড়া** [আশ্চর্য হওয়া]—আমার কথা শুনে সে একেবারে আকাশ থেকে পড়লো; যেন কিছুই জানে না। ৩১ **আমতা আমতা করা** [সত্য গোপনের জন্য কিছু বলতে দ্বিধা প্রকাশ করা]—সে যখন আমতা আমতা করছিল, তখনই আমি বুঝেছিলাম, বইটা ও ছাড়া আর কেউ নেয়নি। ৩২. **আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া** [দুর্লভ কিছু পাওয়া]—বৃদ্ধ বয়সে পরিতোষবাবু হারানো ছেলেকে ফিরে পেয়ে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন।

৩৩ **ইঁচড়ে পাকা** [ডেঁপো; বয়সে বালক, বচনে বৃদ্ধ]—ছেলেটি একেবারে ইঁচড়ে পাকা, এই বয়সে যত পাকা পাকা কথা ওর মুখে। ৩৪. **ইলশে গুঁড়ি** [গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি]—সারাদিন ধরে ইলশে গুঁড়ি ঝরছিল। ৩৫. **ইতি গজ** [গোঁজামিল]—যেমন পারি ইতি গজ করে কাজটা সারলাম। ৩৬. **ইঁদুরে কপাল** [হঠাৎ ভাগ্যোদয়]—এখন তোমার ইঁদুরে কপাল, পেয়ে গেলে মুঠো মুঠো টাকা, এখন আর তোমার ভাবনা কি?

৩৭. **উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ** [অকেজো জিনিস দান করে আত্মতৃপ্তি]—আমাকে দিলে কুড়িয়ে-পাওয়া পুরোনো একটা কোট—গায়ে দেওয়াই যাবে না—উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ। ৩৮. **উভয় সঙ্কট** [দুই বিপদের মধ্যে পড়া]—আমার এখন উভয় সঙ্কট, একদিকে মামা, অন্যদিকে মেসো—কাকে রাখি কাকে ছাড়ি!

৩৯. **উড়ো কথা** [গুজব]—উড়ো কথায় কান দিও না। ৪০. **উড়ো চিঠি** [বেনামী চিঠি]—লোকটার নামে রোজ কত যে উড়ো চিঠি আসতো, তার ঠিক নেই। ৪১. **উলুবনে মুক্তো ছড়ানো** [অপাত্রে সদুপদেশ বর্ষণ]—তোমাকে এ সব কথা বলা মানে উলুবনে মুক্তো ছড়ানো, তা আমি জানি। ৪২. **উত্তম মধ্যম দেওয়া** [প্রহার করা]—লোকটাকে উত্তম-মধ্যম দিয়ে বিদায় করে দাও। ৪৩. **উড়ন চণ্ডী** [অপব্যয়ী]—কর্তামশাইর মেজোছেলে উড়ন চণ্ডীর মতো টাকা খরচ করে চলেছে। কিন্তু এর জন্যে একদিন আপসোস করতে হবে তাকে। ৪৪. **উড়ে এসে জুড়ে বসা** [অনধিকারীর সহসা প্রতিষ্ঠা লাভ]—কে হে বাপু তুমি? উড়ে এসে জুড়ে বসলে এখানে? ৪৫. **উপরোধে ঢেঁকি গেলা** [পরের অনুরোধে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করা]—ইচ্ছা ছিল না, তবু আমাকে কাজটা করতে হলো ; যেন উপরোধে ঢেঁকি গেলা। ৪৬. **উল্টো গাওয়া** [বিপরীত কথা বলা]—উনি ছিলেন বড় একজন কম্যুনিস্ট, এখন ধনীলোকের জামাই হয়ে উল্টো গাইতে শুরু করেছেন। ৪৭. **উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে** [একের দোষ অপরের উপর চাপানো]—দোষ করল কে, আর শাস্তি পেল কে?—উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে আর কি?

৪৮. **উনপঞ্চাশ বায়ু** [পাগলামি]—তোমার মাথায় উনপঞ্চাশ বায়ু ভর করেছে নাকি হে? কাজে-কর্মে, কথায়-বার্তায় তারই আভাস দেখ্‌ছি যেন।

৪৯. **একাদশ বৃহস্পতি** [খুব সুসময়]—তোমার ত' এখন একাদশ বৃহস্পতি, হাতের ধুলোমুঠিও সোনামুঠি হয়ে যাচ্ছে। ৫০. **এক ক্ষুরে মাথা কামানো** [একমতাবলম্বী হওয়া]—তোমারও দেখি তার মতো কথা ; এক ক্ষুরে মাথা কামিয়েছ না কি? ৫১. **একঢিলে দুই পাখি মারা** [একসঙ্গে দুই কার্য সিদ্ধ করা]—দু' পক্ষই আমার সাহায্য চায় ; এমন একটা কাজ করবো, যাতে এক ঢিলে দুই পাখি মরে। ৫২. **একমাঘে শীত যায় না** [বিপদ বারে বারেই আসতে পারে]—বিপদ কেটে গেছে ; তবু মনে রেখো, এক মাঘে শীত যায় না।

৫৩. **ওৎপাতা** [সুযোগের অপেক্ষায় থাকা]—সুযোগের অপেক্ষায় সে ওৎ পেতে বসে আছে। ৫৪. **ওষুধ ধরা** [ফল পাওয়া]—সেদিন শাস্তি পেয়ে রমেন পড়াশুনায় মন দিয়েছে, দেখ্‌ছি ; ওষুধ ধরেছে তাহলে।

৫৫. **কলুর বলদ** [পর-চালিত লোক]—কলুর বলদের মতো না চলে একটু নিজের বিদ্যাবুদ্ধি খাটাও। ৫৬. **কত ধানে কত চাল** [প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা]—রোজ রোজ ক্লাস পালাও ; একদিন ধরা পড়লে বুঝতে পারবে, কত ধানে কত চাল। ৫৭. **কড়ায়-গণ্ডায়** [পুরোপুরি]—আমার পাওনা আমি কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নেবো। ৫৮. **কপাল ফেরা** [ভাগ্য সুপ্রসন্ন হওয়া]—বড় সাহেবের নজরে পড়ে তার এখন কপাল ফিরতে শুরু করেছে। ৫৯. **কলকাঠি নাড়া** [আড়ালে থাকিয়া উস্কানি দেওয়া]—আড়ালে বসে ব্রিটেন আর আমেরিকা কলকাঠি নাড়বে, আর ভারত-ভূখণ্ডের হিন্দু-মুসলমান আমরা পরস্পর হানাহানি করে মরবো? ৬০. **কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে** [দুঃখের উপর আরো দুঃখ]—পুত্রশোকগ্রস্ত লোকটিকে

এভাবে গালি দিয়ে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিও না। ৬১. **কাঁটা নটের ঝাড়** [দুষ্ট ব্যক্তি]—যার পাল্লায় পড়েছ, ও একটি কাঁটা নটের ঝাড়; ধনেমানে বেরিয়ে আসতে পার কিনা, দেখ। ৬২. **কানে তুলো দেওয়া** [অগ্রাহ্য]—শুনতে পাচ্ছো না, কি বলছে ওরা? কানে তুলো দিয়ে বসে আছো নাকি? ৬৩. **ক-অক্ষর গোমাংস** [নিরক্ষর]—চুল আর পোশাকের বহর দেখে ভুলে যেও না। ভেতরে কিন্তু ক-অক্ষর গোমাংস। ৬৪. **কাঁঠালের আমসত্ব** [অসম্ভব ব্যাপার]—ঐ হাড়-কৃপণ লোকটার কাছ থেকে চাঁদা আদায় করেছ; এ যে দেখি কাঁঠালের আমসত্ব! ৬৫. **কাঁচা পয়সা** [প্রচুর অর্থ]—রতনের হাতে এখন কাঁচা পয়সা, তাই মাথাটা ঠিক রাখতে পারেনি। ৬৬. **কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরা** [অল্প বয়সে বকে যাওয়া]—এই বয়সে এতো—এ যে দেখছি, কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরেছে। ৬৭. **কেঁচে গণ্ডূষ করা** [নতুন করে আরম্ভ করা]—অঙ্ক ভুলে গিয়ে এখন ছোট ভাইকে শেখাতে বসে আবার কেঁচে গণ্ডূষ করতে হচ্ছে। ৬৮. **কালো বাজার** [চোরাই কারবার]—কালো বাজারের ফলে এখন দেশের এক শ্রেণীর লোক আঙুল ফুলে কলা গাছ হয়ে উঠেছে। ৬৯. **কান ভারী করা** [পরের কথায় বিশ্বাস করা]—তুমি তো নীলুর কথা শুনে কান ভারী করে বসে আছো; আমার কথা কি তুমি আর শুনবে? ৭০. **কথায় চিঁড়ে ভেজে না** [মৌখিক স্তোক বাক্য]—শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজে না। নগদ কিছু দিলে ভালো হয়। ৭১. **কথায় কথায়** [প্রসঙ্গক্রমে]—কথায় কথায় সেদিন সেন মশাইর প্রস্তাব এসে পড়লো। ৭২. **কথার কথা** [মূল্যহীন কথা]—টাকা হলে সবই হয়—ওটা শুধু একটা কথার কথা। ৭৩. **কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা** [শত্রু দিয়ে শত্রু নাশ করা]—কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা—এই হলো চাণক্য-নীতি। ৭৪. **কাজির বিচার** [বিচারের নামে প্রহসন]—কার দোষে কার শাস্তি হলো—এ যে কাজির বিচার! ৭৫. **কান পাত্‌লা** [যে পরের কথায় বিশ্বাস করে]—লোকটি বড় কান পাত্‌লা, পরের কথায় ওঠে আর বসে। ৭৬. **কলির সন্ধ্যা** [ভয়াবহ পরিণতির সূত্রপাত]—নতুন কর বসানোর কথায় আঁৎকে উঠছো কেন? এই তো সবে কলির সন্ধ্যা। করের চাপে একদিন 'ত্রাহি' 'ত্রাহি' বলে চীৎকার করতে হবে। ৭৭. **কল্কে পাওয়া** [আমল পাওয়া]—দু' পাতা লিখে সাহিত্যের সমাজে কল্কে পাবে ভেবেছ? অত সহজ নয় হে। ৭৮. **কান-কাটা** [নির্লজ্জ]—তোমার মতো কান-কাটা মানুষ আর দেখিনি; লোকে এতো অপমান ক'র, তবু তোমার জ্ঞান হয় না? ৭৯. **কুম্ভকর্ণের নিদ্রা** [দীর্ঘকাল উদ্যমহীন]—পালে বাঘ না পড়লে সরকারের কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাঙে না। ৮০. **কালনেমির লঙ্কা ভাগ** [কাজ শেষ হওয়ার আগে লাভের হিসাব]—আগে চাকরিটা পাও, তারপর কাকে কি দেবে হিসেব করলে চলবে—এখনই কালনেমির লঙ্কা ভাগ কেন? ৮১. **কাঠের পুতুল** [জড় ব্যক্তি]—সব তো শুনলে; এখন কাঠের পুতুলের মতো বসে না থেকে কাজে লেগে যাও। ৮২. **কুরুক্ষেত্র বাধানো** [ভীষণ ঝগড়া করা]—চাকরটা দেরী করে বাজি ফেরায় বাড়ীর গিন্নী একেবারে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধিয়ে বসলেন। ৮৩. **কৈ**

মাছের প্রাণ [অত্যন্ত কষ্ট-সহিষ্ণু]—আমার কৈ মাছের প্রাণ বলে এত কষ্ট সয়ে আসতে পেরেছি। ৮৪. **কেঁচো খুঁড়তে সাপ** [তুচ্ছ ব্যাপার থেকে বৃহৎ ব্যাপারের সূত্র আবিষ্কার]—দুর্নীতির তদন্ত আরম্ভ হয়েছে। দেখা যাক্, কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোয় কিনা। ৮৫. **কূপমণ্ডুক** [বিশ্ববিমুখ] কূপমণ্ডুকেরা দুনিয়ায় কি হচ্ছে, কোন খবরই রাখে না। ৮৬. **কোণঠাসা** [বেকায়দায় পড়া]—লেভী আর রেশন-প্রথা চালাতে গিয়ে সরকারের এখন একেবারে কোণঠাসা অবস্থা। ৮৭. **কেষ্টবিষ্টু** [গণ্যমান্য লোক]—পথঘাট বেশ সাজানো হয়েছে দেখ্‌ছি—কোন কেষ্টবিষ্টু আসবেন বোধহয়। ৮৮. **কেও-কেটা** [তুচ্ছ লোক]—তোমার বাড়ি এসেছেন বলে ওঁকে কেও-কেটা ভেবো না। উনি কিন্তু আসলে একজন জাঁদরেল অফিসার। ৮৯ **কানের পোকা বার করা** [বক্তৃতা করে উত্ত্যক্ত করা]—এখনকার দেশ-সেবা মানে তো চীৎকার করে মানুষের কানের পোকা বের করা। ৯০. **কেতাদুরস্ত** [ফ্যাসান-সম্মত]—শহুরে কেতাদুরস্ত পোশাকে তাহাকে দেখিয়া আমি অবাক হইয়া গেলাম।

৯১. **খয়ের খাঁ** [মোসাহেব]—বড়লোকের খয়ের খাঁ হয়ে জীবনধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। ৯২. **খাল কেটে কুমীর আনা** [কৃতকর্মের ফলে বিপদ ঘটানো] —বৈদেশিক শক্তির সাহায্য চাওয়া আর খাল কেটে কুমীর আনা একই কথা।

৯৩. **গায়ে পড়া** [স্বেচ্ছায়] গায়ে পড়ে প্রতিবেশীকে তোমার উপদেশ দিতে যাওয়া ঠিক হয়নি। ৯৪. **গোবর গণেশ** [নির্বোধ]—ছেলেটিকে চালাক মনে করেছিলুম; কিন্তু এখন দেখছি, ওটি একটি গোবর গণেশ। ৯৪. **গোকুলের ষাঁড়** [নিষ্কর্মা]—শহরের অলিতে গলিতে যে সব ছেলে দেখ, অধিকাংশই গোকুলের ষাঁড়—কোন কর্মের নয়। ৯৬. **গোঁফ-খেজুরে** [অত্যন্ত অলস]—তোমাদের মতো গোঁফ-খেজুরেদের জীবনে কিছুই হবে না। ৯৭. **গণেশ ওল্টানো** [কারবার গুটানো]—কাপড়ের কারবারে গণেশ উল্‌টিয়ে তবে এই লোহার কারবার খুলেছি। ৯৮. **গড্ডলিকা প্রবাহ** [অনুকরণ]—পড়াশোনা শেষ করে একটা চাকরি নিয়ে গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসালাম।

৯৯. **গুড়ে বালি** [বড় আশায় ছাই]—বড় আশা করে গিয়েছিলাম ; কিন্তু ভাই, সে গুড়ে বালি। ১০০. **গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা** [কাহারও কৃতিত্বের দ্বারা তাহাকেই স্মরণ]—রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতার মধ্য দিয়ে আমরা গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজাই করলাম। ১০১. **গোবরে পদ্মফুল** [নীচ কুলে মহৎ ব্যক্তি]—মেয়েটি সামান্য ঘরে জন্মালেও কিন্তু গোবরে পদ্মফুল। ১০২. **গৌরচন্দ্রিকা** [ভণিতা]—যা বলবার সংক্ষেপে বলে ফেল—এত গৌরচন্দ্রিকার প্রয়োজন কি? ১০৩. **গোরু মেরে জুতো দান** [ভীষণ ক্ষতির সামান্য ক্ষতিপূরণ]—চাকরি ছাড়িয়ে দিয়ে মাত্র এক মাসের মাহিনা দেওয়া—এ ত' গোরু মেরে জুতো দান। ১০৪. **গদাই লস্করি চাল** [অত্যন্ত মন্থর গতি]—সরকারের গদাই লস্করি চালে কবে কাজটা শেষ হবে, ভগবানই জানেন। ১০৫. **গোলে হরিবোল** [দায়সারা

কাজ]—চাকরটা হয়েছে মহা ফাঁকিবাজ। এত লোকের মধ্যে গোজে ছুরিবোজ দিয়ে কেটে পড়তে তার জুড়ি নেই। ১০৬. গোড়ায় গলদ বা বিসমিল্লায় গলদ [মূলেই ত্রুটি]—ছেলেটি লেখে ভালো, কিন্তু গোড়ায় গলদ—ব্যাকরণ একেবারে জানে না। ১০৭. গরীবের ঘোড়া রোগ [অবস্থার অতিরিক্ত আড়ম্বর]—পয়সা নেই, খেলা দেখতে এসেছে, গরীবের ঘোড়া রোগ কেন, বাবা? ১০৮. গোদের উপর বিষ ফোড়া [কষ্টের উপরে আরো কষ্ট]—জ্বরই সারেনি, তার উপর দাঁতের ব্যথা ; একেবারে গোদের উপর বিষ ফোড়া। ১০৯. গোল্লায় যাওয়া [নষ্ট হয়ে যাওয়া]—অসৎ সঙ্গে পড়ে ছেলেটা একেবারে গোল্লায় গেছে।

১১০. ঘোড়া দেখলেই খোঁড়া [সামান্য সাহায্যের সুযোগে আত্মনির্ভরতা ত্যাগ করা]—কাজটা করছিলে বেশ, ও আসতেই রেখে দিলে কেন? তুমি যে দেখছি, ঘোড়া দেখলেই খোঁড়া। ১১১. ঘরের ঢেঁকি কুমীর বা ঘরভেদী বিভীষণ [নিজেদের মধ্যেই বিশ্বাসঘাতক]—ওকে বিশ্বাস করো না। ও হচ্ছে ঘরের ঢেঁকি কুমীর। ১১২. ঘাট মানা [ত্রুটি স্বীকার করিয়া নত হওয়া]—এই সামান্য কথায় তুমি রাগ করলে? ঘাট মানছি, ভাই, এমন কথা আর আমি জীবনে বলবো না। ১১৩. ঘাড় ভাঙা [জবরদস্তি করে আদায় করা]—সমর হারুর ঘাড় ভেঙে রোজ টিফিন খায়। ১১৪. ঘাড়ে চাপা [গলগ্রহ হওয়া]—এই দুর্দিনে দূর-সম্পর্কের এক পিসি চার পাঁচটি ছেলেপুলে নিয়ে এসে ঘাড়ে চেপেছেন। ১১৫. ঘাড়ে ভূত চাপা [দুর্বুদ্ধি হওয়া]—ঘাড়ে ভূত চাপলো, আর অমনি দশ হাজার টাকার শেয়ার কিনে ফেললে? ১১৬. ঘুণাক্ষর [সামান্য ইংগিত]—ইরাকে যে এত বড় সামরিক অভ্যুত্থান হতে যাচ্ছে, কেউ ঘুণাক্ষরেও তা টের পায়নি। ১১৭. ঘোড়া ডিঙাইয়া ঘাস খাওয়া [উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে না মেনে কিছু করা]—তোমার অফিসারকে কিছু না বলে খোদ মালিককে প্রমোশনের কথা বলতে গেছ ; ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া কি এত সহজ? ১১৮. ঘোড়ার ঘাস কাটা [বাজে কাজ করা]—কাজ করি না তো আমি কি এখানে ঘোড়ার ঘাস কাটতে রোজ আসি? ১১৯. ঘোল খাওয়ানো [নাস্তানাবুদ করা]—ওকে একবার হাতে পেলে ঘোল খাইয়ে ছাড়বো। ১২০. ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে [যে বিপদে সকলেই পড়তে পারে, কাউকে তাতে পড়তে দেখে উল্লসিত হওয়া]—প্রতিবেশীর এই বিপদে তাকে উল্লসিত হতে দেখলাম।—ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে। ১২১. ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়া [বিপন্মুক্ত হওয়ায় স্বস্তি]—দুর্বৃত্তেরা চলে যেতে আমার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো।

১২২. চিনির বলদ [ভারবাহী, কিন্তু ফলভোগী নয়]—সন্দেশের কারখানায় কাজ করলে কি হয় ; আমরা সব চিনির বলদ—তাড়ু নাড়াই সার। ১২৩. চোখ টাটানো [ঈর্ষাপরায়ণ হওয়া]—ওর উন্নতিতে তোমার চোখ টাটাবার কারণ কি? ১২৪. চক্ষুঃশূল [দেখিলে বিরক্তি হয়, এমন ব্যক্তি]—আমি তোমার চক্ষুঃশূল, তা কি আমি জানি না? ১২৫. চোখের বালি [চক্ষুঃশূল]—জানি, আমি তোমার চোখের বালি ; তুমি আমাকে কখনো সইতে পারো না। ১২৬. চোখে ধুলো দেওয়া

[ঠকানো]—চোরটা পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গেল। ১২৭. চোখের চামড়া [চক্ষু-লজ্জা]—লোকটার চোখের চামড়া বলতে কিছু নেই। আমার এই দুর্দিনে টাকা চাইতে এসেছে। ১২৮. চাল চালা [ফন্দি খাটান]—তুমি যতই চাল চালো, ওর সঙ্গে পেরে উঠবে না। ১২৯. চুল-চেরা ভাগ [সূক্ষ্ম ভাগ]—যা হয় মোটামুটি ভাগ করে দাও, তোমাকে চুল-চেরা ভাগ করতে কে বলেছে? ১৩০. চুল-চেরা বিচার [অতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ]—অত চুল-চেরা বিচার করতে গেলে কাব্যরস উপলব্ধি করা যাবে না। ১৩১. চক্ষুদান করা [চুরি করা]—আর যাই করো, আমার ঘড়িটায় চক্ষুদান করো না। ১৩২. চক্ষু চড়কগাছ [অতিমাত্র বিস্ময়]—ছেলেটির কাণ্ড-কারখানা দেখে তো আমার চক্ষু চড়কগাছ। ১৩৩. চর্বিত চর্বণ [একই বিষয়ের পুনরালোচনা]—আজকের সভায়ও তিনি তাঁর গতদিনের বক্তৃতারই চর্বিত চর্বণ করলেন। ১৩৪. চশমখোর [চক্ষু-লজ্জাহীন]—মহাজনেরা চিরকালই চশমখোর হয়ে থাকে, এ আর নতুন কথা কি? ১৩৫. চাঁদের হাট [আনন্দের একত্র সমাবেশ]—ছেলেপুলে, নাতি-নাতনীদের নিয়ে বাড়িতে তুমি যে একেবারে চাঁদের হাট বসিয়ে দিয়েছ। ১৩৬ চুনকালি [কলঙ্ক]—আর যাই করো, বংশের নামে চুনকালি দিও না। ১৩৭. চুলোয় যাওয়া [ধ্বংস পাওয়া]—লাভ চুলোয় যাক্, এখন আসলটা হাতে এলেই বাঁচি। ১৩৮. চুনো পুঁটি [সামান্য ব্যক্তি]—আমরা তো সব চুনোপুঁটি, উনি রাজামানুষ—আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন কেন?

১৩৯ ছিচ কাঁদুনে [ছুঁইলে কাঁদে, এমন]—এমন ছিচ কাঁদুনে ছেলে আমি জন্মে দেখিনি, হাতটা ধরেছি, অমনি কেঁদে বাড়ি মাথায়! ১৪০. ছিনে জোঁক [নাছোড়বান্দা]—লোকটা একেবারে ছিনে জোঁক, কিছু আদায় না করে কিছুতেই ছাড়লে না। ১৪১. ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো [অনাদৃত অথচ সর্বশেষ অবলম্বন] —তুমি আর যাবে কোথায় বলো?—আমি আছি তোমার ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো। ১৪২. ছাই-চাপা আগুন [অপ্রকাশিত প্রতিভা]—ছেলেটি ছাই-চাপা আগুন, একদিন সকলের চোখে ও তাক লাগিয়ে দেবে, দেখো। ১৪৩. ছিনিমিনি খেলা [তছনছ করা]—মাথার উপর কেউ না থাকায় বাপের সম্পত্তি নিয়ে ছেলেটা ছিনিমিনি খেলছে। ১৪৪. ছুঁচোর কেত্তন [সবদা কলহ]—তোমাদের বাড়িতে তো সব-সময় ছুঁচোর কেত্তন লেগে আছে। ১৪৫. ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা [সামান্য লাভের জন্য বদনাম কুড়ানো]—সামান্য ক'টা টাকার জন্যে মিথ্যে কথা বলে ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করি আর কি! ১৪৬ ছেলের হাতে মোয়া [সহজে ভুলিয়ে নেবার জিনিস]—পাকিস্তান যতই ছল-চাতুরি করুক—কাশ্মীর ছেলের হাতে মোয়া নয়।

১৪৭ জিলিপির প্যাঁচ [কূট বুদ্ধি]—মধুর মুখের মধুর কথায় ভুলো না, ওর পেটে আছে জিলিপির প্যাচ। ১৪৮. জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ [সকল কাজের পটুতা]—জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ—সব কাজই ওঁকে করতে হয়। ১৪৯. জড় ভরত [নিষ্ক্রিয়]—জড় ভরত হয়ে বসে থাকলে জীবনে কিছুই করতে

পারবে না। ১৫০. জগাখিচুড়ি [বিসদৃশ মিশ্রণ]—সে বাংলা আর হিন্দি মিশিয়ে এক জগাখিচুড়ি ভাষায় কথা বলে।

১৫১. ঝড়ো কাক [রুক্ষ মূর্তি]—এমন সময় ঝড়ো কাকের মতো কোথা থেকে সুবল এসে হাজির। ১৫২. ঝাঁকের কই [এক দল-মতের লোক]—এখন ও দলছাড়া; দু'দিন বাদেই ঝাঁকের কই ঝাঁকেই মিশে যাবে। ১৫৩. ঝোপ বুঝে কোপ মারা [সুযোগ বুঝে কাজ সারা]—আমি শুধু সুযোগের অপেক্ষায় আছি; সময় এলেই ঝোপ বুঝে কোপ মারবো। ১৫৪. ঝাল ঝাড়া [রাগ দেখানো]—বহুদিন পরে তিনি আমাকে সামনে পেয়ে বেশ মনের সুখে ঝাল ঝাড়লেন।

১৫৫. টনক নড়া [চৈতন্য হওয়া]—মানুষ না খেয়ে মরছে, তবু সরকারের টনক নড়ে না। ১৫৬. টই টম্বুর [কানায় কানায় পূর্ণ]—এ বছর প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে, খাল-বিল, নদীনালা সব টইটম্বুর। ১৫৭. টাকার কুমীর [বিপুল অর্থের অধিকারী]—চোরা কারবার করে সে এখন টাকার কুমীর হয়ে উঠেছে। ১৫৮. টেক্কা দেওয়া [প্রতিযোগিতা করা]—সব কাজেই মেয়েরা এখন ছেলেদের সঙ্গে টেক্কা দিচ্ছে।

১৫৯. ঠোঁটকাটা [স্পষ্ট বক্তা]—এমন ঠোঁটকাটা মানুষ দেখিনি বাপু; মুখে যা-ই আসে তা-ই বলে দেয়। ১৬০. ঠুঁটো জগন্নাথ [অক্ষম]—ঠুঁটো জগন্নাথের মতো বসে না থেকে কাজটা সেরে ফেল। ১৬১. ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় [যেখানে সকলেই সমান অপরাধী]—সমাজে এত দুর্নীতি যে, ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে।

১৬২. ডামাডোল [ওলোট্-পালোট]—যুদ্ধের ডামাডোলে কে যে কোথায় গেল, আর দেখা পেলাম না। ১৬৩. ডান হাতের ব্যাপার [খাওয়া-দাওয়া]—বিবাহের দেরী আছে। চলো, আমরা ডান হাতের ব্যাপারটা আগেই সেরে ফেলি। ১৬৪. ডাল-ভাঙা ক্রোশ [অতি দূরত্ব]—কখন বেরিয়েছি ; এখনও বলছো আরও দু'ক্রোশ; এ যে দেখছি ডাল-ভাঙা ক্রোশ। ১৬৫. ডুব মারা [অদৃশ্য হওয়া]—সে সেই যে ডুব মেরেছে, আজও তার দেখা নেই। ১৬৬. ডুবে ডুবে জল খাওয়া [গোপনে গোপনে কিছু করা]—লোকটার বাইরে সাধুর বেশ; কিন্তু ডুবে ডুবে জল খাওয়ার গুরু। ১৬৭. ডাকাবুকো [দুঃসাহসী]—অন্ধকার রাত্রে একা একা ছেলেটা পালিয়ে এসেছে। এমন ডাকাবুকো ছেলে আমি দেখিনি। ১৬৮. ডুমুরের ফুল [অদৃশ্য]—তুমি যে আজকাল ডুমুরের ফুল হয়ে গেছ হে; দেখা-সাক্ষাৎ একেবারেই নেই।

১৬৯. ঢাক ঢাক গুড়গুড় [গোপন রাখার চেষ্টা]—যা বলার বলেই ফেল; অত ঢাকঢাক গুড়গুড় কিসের? ১৭০. ঢাক পিটানো [প্রচার করা]—পাসের খবরটা সে ঢাক পিটিয়ে সবাইকে জানিয়ে দিল। ১৭১. ঢাকের বাঁয়া [ব্যক্তিত্বহীন অনুবর্তী]—সেক্রেটারীর ঢাকের বাঁয়া হয়ে আমি কমিটিতে থাকতে পারবো না। ১৭২. ঢিমে তেতালা [অত্যন্ত মন্থর গতি]—এমন ঢিমে তেতালা ভঙ্গিতে কাজ করলে জীবনেও শেষ করতে পারবে না।

১৭৩. তালপাতার সিপাই [অত্যন্ত রোগা]—জামাই হয়েছে একটা

তালপাতার সিপাই ; বাতাসেই বুঝি উড়ে যাবে। ১৭৪. **তাক লাগানো** [অবাক্ করে দেওয়া]—এমন অভিনয় করবো যে, সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবো। ১৭৫. **তালকানা** [মাত্রাজ্ঞানহীন]—চাঁদুর মতো তালকানা লোককে দিয়েছো কেনাকাটার ভার। দেখো, কি করে আসে। ১৭৬. **তিলকে তাল করা** [তুচ্ছ ঘটনা ফাঁপিয়ে তোলা]—তিলকে তাল করতে পারায় যার জুড়ি নেই, তুমি সেই রাম্ন পিসির কথা বিশ্বাস করছো ? ১৭৭. **তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠা** [অত্যন্ত রেগে ওঠা]—চাকরটা কাঁচের বাসন ভেঙে ফেলেছে শুনেই গিন্নিমা একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। ১৭৮. **তেলা মাথায় তেল দেওয়া** [প্রয়োজন-হীনকে দান]—'তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্যজাতির রোগ।' ১৭৯. **তুষের আগুন** [দীর্ঘস্থায়ী দুঃখ]—একমাত্র ছেলেকে হারাবার পর থেকে নিঃসহায় বৃদ্ধার বুকে তুষের আগুন জ্বলছে। ১৮০. **তুলসীবনের বাঘ** [ছদ্মবেশী]—লোকটি সাধু সেজে বেড়ালে কি হবে, আসলে উনি একটি তুলসীবনের বাঘ ;—একেবারে পাকা শয়তান। ১৮১. **তীর্থের কাক** [কোন কিছুর প্রত্যাশী]—বৃদ্ধা তাঁর ছেলের টাকার প্রত্যাশায় বাড়িতে তীর্থের কাকের মতো বসে আছেন। ১৮২. **তাসের ঘর** [ভঙ্গুর]—পাকিস্তানে কত হিন্দুর সুখের সংসার তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে পড়লো। ১৮৩. **তুলকালাম** [তুমুল ঝগড়া]—ছোট্ট একটা কথা নিয়ে পাড়ায় এমন তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যাবে—কে আগে জানতো ?

১৮৪. **থ হয়ে যাওয়া** [স্তম্ভিত হয়ে যাওয়া]—ওইটুকু ছেলের মুখে এমন পাকা পাকা কথা শুনে আমি তো থ হয়ে গেলাম। ১৮৫. **থই পাওয়া** [ঠাঁই পাওয়া]—চরম দুর্দিনে বন্ধুর আনুকূল্য পেয়ে সে যেন থই পেল। ১৮৬. **থোঁতা মুখ ভোঁতা করা** [দেমাক ভেঙে দেওয়া]—সবার সামনে কথাটা ফাঁস করে দিয়ে কেমন তার থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিলাম।

১৮৭. **দায় সারা** [যেমন-তেমন করে করা]—তোমার এই দায় সারা গোছের কাজ আমার একদম ভালো লাগে না। ১৮৮. **দু'মুখো সাপ** [যার কাছে যেমন, তার কাছে তেমন]—নিমু একটা দু'মুখো সাপ ; তোমার কাছে এক রকম বলে, অন্যের কাছে বলে আরেক রকম। ১৮৯. **দক্ষযজ্ঞ** [হৈ-হট্টগোল]—তাঁর বক্তৃতা শুরু হতেই সভায় একবারে যেন দক্ষযজ্ঞ বেধে গেল। ১৯০. **দহরম-মহরম** [খুব খাতির]—থানার দারোগার সঙ্গে কেশববাবুর খুব দহরম-মহরম। ১৯১. **দন্তস্ফুট করা** [বুঝতে পারা]—সে বছর এমন শক্ত প্রশ্ন হয়েছিল যে, ভালো ছেলেরাও দন্তস্ফুট করতে পারেনি। ১৯২. **দাঁও মারা** [সহজে লাভ করা]—যুদ্ধের সুযোগে চোরা কারবারীরা বেশ দাঁও মেরেছে। ১৯৩. **দিনে ডাকাতি** [প্রকাশ্যে প্রতারণা করা] —তিন টাকার জিনিস দশ টাকায় বেচো ; এ-যে দিনে ডাকাতি হে ! ১৯৪. **দৈত্য-কুলের প্রহ্লাদ** [অসৎ বংশে সৎলোক]—ডাকাতের বংশে এমন ছেলে ! এ দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ ! ১৯৫. **দু' নৌকায় পা** [উভয় দিক বজায় রাখার চেষ্টা]—আমার এখন দু' নৌকায় পা ; কাকে ছাড়ি, কাকে রাখি ? ১৯৬. **দু' কান কাটা**

[অতিশয় নির্লজ্জ]—লোকটা একেবারে দু' কান কাটা ; যতই বলো, তবু কিছুতেই চেতনা হয় না। ১৯৭. **দুষ্টা সরস্বতী ভর করা** [দুর্বুদ্ধি হওয়া]—সেদিন তোমার ঘাড়ে দুষ্টা সরস্বতী ভর করেছিল ; তা নইলে অমন কথা বলতে পারো ? ১৯৮. **দুধের সাধ ঘোলে মেটানো** [আসলের অভাব নকলে পূরণ করা]—কফির অভাবে চা খেলাম ; কিন্তু দুধের সাধ কি ঘোলে মেটে ?

১৯৯. **ধর্মের ষাঁড়** [অকর্মণ্য]—নিধুবাবুর ছেলেটা সারাদিন পাড়াময় ধর্মের ষাঁড়ের মতো ঘুরে বেড়ায়। ২০০. **ধান ভানতে শিবের গীত** [অপ্রাসঙ্গিক কথা] —রবীন্দ্রনাথের কথা বলতে উঠে ভদ্রলোক নিজের জীবনী বলতে আরম্ভ করলেন—একেই বলে ধান ভানতে শিবের গীত। ২০১. **ধরাকে সরা জ্ঞান করা** [অত্যন্ত অহংকার প্রকাশ করা]—পরীক্ষায় পাস করে সে একেবারে ধরাকে সরা জ্ঞান করতে আরম্ভ করেছে। ২০২. **ধনুক-ভাঙা পণ** [ভীষণ প্রতিজ্ঞা]—রামবাবুর ছোটো-ছেলে বিলিতি ডিগ্রী না নিয়ে দেশে ফিরবে না ; এ যে তার ধনুক-ভাঙা পণ। ২০৩. **ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির** [অত্যন্ত সৎ]—মিথ্যে কথা বলবে না ত' সবংশে মর, একেবারে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির। ২০৪. **ধামা চাপা দেওয়া** [মুলতবী]—দাঙ্গা এসে পড়ায় দ্রব্যমূল্য-বৃদ্ধির প্রসঙ্গটি আপাততঃ ধামা চাপা দেওয়া হলো। ২০৫. **ধামাধরা** [খোসামুদে]—ধনীর যারা ধামাধরা, তাদের কাছে গরীবদের আশা করার কিছু নেই। ২০৬. **ধোপে টেকা** [যুক্তিনির্ভর হওয়া]—তোমার যুক্তিগুলো শুনতে বেশ, কিন্তু ধোপে টিকবে না।

২০৭. **ননীর পুতুল** [শ্রম-কাতুরে]—এমন ননীর পুতুল ছেলেকে নিয়ে কি হবে ? এখনো নিজের হাতে খেতেই শিখল না। ২০৮. **নেই-আঁকড়া** [নাছোড়বান্দা]—যদুর মতো নেই-আঁকড়া ছেলের সঙ্গে তুমি কিছুতেই পেরে উঠবে না। ২০৯. **নমো নমো করে সারা** [কোন রকমে দায় উদ্ধার]—টাকা পয়সার বড়ো টানাটানি, তাই কাজটা নমো নমো করে সারতে হলো। ২১০. **নয়-ছয় করা** [বাজে নষ্ট করা]—বাপের অনুপস্থিতিতে ছেলে সমস্ত টাকা-পয়সা নয়-ছয় করে শেষ করে ফেললো। ২১১. **নখ-দর্পণে থাকা** [বিশেষভাবে জানা]—পৃথিবীর কোথায় কি হচ্ছে, সমস্ত ওঁর নখ-দর্পণে আছে। ২১২. **নয়নের মণি** [একান্ত প্রিয়]—একমাত্র ছেলেটি ছিল দুঃখিনী জননীর বুকের ধন—নয়নের মণি। ২১৩. **নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা** [অক্ষমের বাজে অজুহাত]—হারমোনিয়াম বাজাতে জানো না, তাই বলো ; হারমোনিয়ামটাকে খারাপ বলছো কেন ? নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা। ২১৪. **নাড়ীনক্ষত্র** [খুঁটিনাটি]—আমাকে তোমার সম্বন্ধে কিছু বলতে হবে না। আমি তোমার নাড়ীনক্ষত্র জানি। ২১৫. **নাক সিটকানো** [অবজ্ঞা প্রকাশ করা] —মার্কিন মুলুক থেকে ফিরে এসে সে এখন দেশের মানুষদের নাক সিটকোতে আরম্ভ করেছে। ২১৬. **নবমীর পাঁঠা** [চরম বিপদের সম্মুখীন]—আমাকে দেখে সে নবমীর পাঁঠার মতো ভয়ে কাঁপতে লাগলো। ২১৭. **নাকে তেল দিয়ে ঘুমানো** [নিশ্চিন্তে সময় কাটানো]—দরখাস্ত করবার শেষ তারিখ কবে চলে গেছে ; এতদিন

নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছিলে নাকি ? ২১৮. **নিজের কোলে ঝোল টানা** [স্বার্থ-পরের মতো আচরণ করা]—লোকটা দেশের সেবা করবে কি ?—সব সময় নিজের কোলে ঝোল টানতেই ব্যস্ত। ২১৯. **নেক-নজরে পড়া** [অনুগ্রহ-দৃষ্টিতে পড়া]—তুমি এখন বড় সাহেবের নেক-নজরে পড়েছ, তোমার প্রমোশন ঠেকায় কে ?

২২০. **পরের মুখে ঝাল খাওয়া** [শোনা কথায় বিশ্বাস করা]—আমি তোমার মতো কান পাতলা নই যে, পরের মুখে ঝাল খাবো। ২২১. **পাকা ধানে মই** [ফলন্ত কাজ পণ্ড হওয়া]—তুমি আমার সঙ্গে শত্রুতা করছ কেন—আমি কি তোমার পাকা ধানে মই দিয়েছি ? ২২২. **পথের কাঁটা** [উন্নতির বাধা]—সে উন্নতি করুক, আমি তার পথের কাঁটা হতে চাই না। ২২৩. **পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা বা হাত বুলানো** [ফাঁকি দিয়ে পরের ধন আত্মসাৎ করা]—পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে আর কতকাল চলবে ? এবার নিজের রোজগার নিজে কর। ২২৪. **পরের ধনে পোদ্দারি** [পরের অর্থ যথেচ্ছ ব্যয় করে গর্ববোধ করা]—ম্যানেজারবাবু এতদিন তো পরের ধনে পোদ্দারি করে এসেছেন ; নিজের টাকায় হাত পড়ুক, তবেই তো বুঝবেন, কত ধানে কত চাল। ২২৫. **পর্বতের আড়ালে থাকা** [নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে থাকা]—এতকাল মাথার ওপরে জ্যাঠামশাই ছিলেন ; আমরা পর্বতের আড়ালে ছিলাম। সাংসারিক ঝড়-ঝাপ্‌টা কিছুই বুঝতে পারিনি। ২২৬. **পাড়া মাথায় করা** [হৈ-চৈ বাধানো]—বাড়িতে পায়েস তৈরী হয়নি বলে নাগবাবু রাত দুপুরে পাড়া মাথায় করলেন। ২২৭. **পায়াভারি** [উন্নতিজনিত অহংকার]—রাতারাতি প্রমোশন পেয়ে রমেনের বড়ো পায়াভারি হয়েছে ; কারো সঙ্গে কথাই বলে না। ২২৮. **পালের গোদা** [দলপতি]—গোলমালের মূল সেই পালের গোদাটাকে না ধরে এদের ধরে আনলে কেন ? ২২৯. **পিঠ্‌টান** [পালিয়ে যাওয়া]—পুলিশকে আসতে দেখে হারাণ পিঠ্‌টান দিল। ২৩০. **পুঁটিমাছের প্রাণ** [ক্ষীণ শক্তি]—মাস্টার মশাইদের হলো পুঁটি মাছের প্রাণ ; অথচ তাঁদেরই ঘাড়ে চাপলো শিক্ষাকরের বোঝা। ২৩১. **পাততাড়ি গুটানো** [সব ছেড়ে-ছুড়ে দেওয়া]—১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ইংরেজ এদেশ থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে স্বদেশে রওনা দিল। ২৩২. **পটোল তোলা** [মারা যাওয়া]—সারা গ্রামটাকে জালিয়ে পুড়িয়ে শেষে এতদিনে লোকটা পটোল তুললো। ২৩৩. **পাথরে পাঁচ কিল** [খুব ভাল অবস্থা]—তোমার ত এখন পাথরে পাঁচ কিল—বাড়ি গাড়ি কোন কিছুরই অভাব নেই। ২৩৪. **পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে** [পতনের পূর্বে বাড়াবাড়ি]—জার্মানীর বাড়াবাড়ি দেখে তখনই বোঝা গিয়াছিল যে, পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে। ২৩৫. **পেটে খেলে পিঠে সয়** [লাভের জন্য ক্ষতি স্বীকার]—লোকগুলোকে খাটিয়ে নেবে, অথচ মাইনে দেবে কম ; পেটে খেলে তবেই তো পিঠে সইবে। ২৩৬. **পোয়া বারো** [দারুণ সুযোগ]—বড়বাবুর অনুপস্থিতিতে কর্মচারীদের এখন পোয়া বারো ; সবাই মিলে এখন পুকুর চুরি করতে লেগেছে। ২৩৭. **পুকুর চুরি** [সমানে চুরি]—একেবারে পুকুর চুরি করো না হে ; যাতে একটু

রস-সয়, তার ব্যবস্থা করো। ২৩৮. **পর্বতের মূষিক প্রসব** [বিরাট আয়োজনের সামান্য সাফল্য]—এত তোড়জোড়ের পর শেষে এই হলো—একেই বলে পর্বতের মূষিক প্রসব। ২৩৯. **প্রজাপতির নির্বন্ধ** [বিবাহের দৈবযোগ]—কোন্ দেশের ছেলে আর কোন্ দেশের মেয়ে—শেষে কিনা বিবাহ হলো ; একেই বলে প্রজাপতির নির্বন্ধ ! ২৪০. **পোঁ ধরা** [খোসামোদ করা]—আর যাই করি, তপনের মতো বড় সাহেবের পোঁ ধরতে পারবো না।

২৪১. **ফাঁসির খাওয়া** [জীবনের শেষ খাওয়া]—সে যেভাবে খাবারগুলো গোগ্রাসে গিলছিল, দেখে মনে হচ্ছিল, সে বুঝি ফাঁসির খাওয়া খাচ্ছে। ২৪২. **ফুলবাবু** [শৌখিন লোক]—হরি মিস্তিরির ছেলে অবিনাশ চাকরি পেতে না পেতেই একেবারে ফুলবাবু হয়ে উঠেছে। ২৪৩. **ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাওয়া** [অল্পেই কাতর হওয়া]—মেয়ে তো নয়, যেন মোমের পুতুল ; ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যান। ২৪৪. **ফোড়ন কাটা** [কথার মধ্যে মন্তব্য করা]—চুপ করে বসে আমাদের কথা শোন, ফোড়ন কেটো না। ২৪৫. **ফোপর দালাল** [বাক্য-বীর]—ওই ফোপর দালালটি এখানে কোথায় এসেছেন—দেখো, কেউ ওর কথায় ভুলো না।

২৪৬. **বারো ভূত** [বাজে লোক]—ভদ্রলোক যা রোজগার করে রেখে গিয়েছিলেন, বারো ভূতে সব খেল। ২৪৭. **বালির বাঁধ** [নির্ভরযোগ্য নয়] —'বড়র পিরিতি বালির বাঁধ।' ২৪৮. **বাঘের দুধ** [দুষ্প্রাপ্য বস্তু]—টাকা থাকলে বাঘের দুধও পাওয়া যায়। ২৪৯. **বাড়া ভাতে ছাই** [বড় আশার মধ্যে নিরাশা]—ভেবেছিলাম, টাকাটা পেয়ে যাবো ; কিন্তু যোগেনবাবু আমার বাড়া ভাতে ছাই দিলেন। ২৫০. **বামন হয়ে চাঁদে হাত** [ছোট ব্যক্তির বড-আশা পোষণ] —দরিদ্র বামুনের ছেলে হয়ে তুমি ম্যাজিস্ট্রেট হবার স্বপ্ন দেখছ ; বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়িও না। ২৫১. **বোঝার উপর শাকের আঁটি** [গুরু দায়িত্বের উপর সামান্য বৃদ্ধি]—এত বড় কাজটা পারলে, এইটুকু আর পারবে না ?—এ তো বোঝার উপর শাকের আঁটি। ২৫২. **ব্যাঙের আধুলি** [অত্যন্ত প্রিয় সঞ্চয়]—মৃত স্বামীর সামান্য পুঁজিটুকু বিধবা মহিলা ব্যাঙের আধুলির মতো আগলে রয়েছেন। ২৫৩. **ব্যাঙের সর্দি** [অসম্ভব ব্যাপার]—তোমার মতো পেটুকের নিমন্ত্রণে অরুচি ! —এ যে একেবারে ব্যাঙের সর্দি হে ! ২৫৪. **বিড়াল তপস্বী** [ভণ্ড]—গায়ে নামাবলী দেখে ভুল করো না যেন ; আসলে উনি একটি বিড়াল তপস্বী। ২৫৫. **বকধার্মিক** [ভণ্ড]—ফোঁটা-তিলক কপালে ঐ লোকটাকে বকধার্মিক বলে মনে হয়, একটু সাবধানে থাকা ভালো।

২৫৬. **বর্ণচোরা আম** [ছদ্মবেশী গুণী ব্যক্তি]—অফিসের বড়বাবুকে রোজ পান চিবোতে আর টাকার অঙ্ক মেলাতেই দেখেছি। উনি ভালো গান করতে পারেন, কেউ জানতাম না। এতদিনে জানা গেল, উনি একটি বর্ণচোরা আম। ২৫৭. **বাপের ঠাকুর** [শ্রদ্ধাভাজন]—'ওরা কি তোর বাপের ঠাকুর, আমি কি তোর কেউ নই ?' ২৫৮. **বুকের পাটা** [সাহস]—এই রাত্তিরে কবরখানা থেকে ফুল তুলে নিয়ে এসো

তো; বুঝবো তোমার কেমন বুকের পাটা। ২৫৯. **বিন্দুবিসর্গ** [সামান্যতম ইংগিত]—এত বড় ঝড় আসছে, হাওয়া অফিসের কেউ তার বিন্দুবিসর্গও জানতে পারেননি। ২৬০. **বিনা মেঘে বজ্রপাত** [অপ্রত্যাশিত দুঃসংবাদ]—মামলা জয়ের আনন্দে সবাই যখন আত্মহারা, ঠিক তখনই বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো এলো কর্তামশাইর মৃত্যুর সংবাদ। ২৬১. **বুদ্ধির ঢেঁকি** [নিতান্তই নির্বোধ]—'হুঁকাটি বাড়ায়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে ব্যাটা বুদ্ধির ঢেঁকি।' ২৬২. **বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানো** [ফাঁকি দেওয়া]—যারা আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে অন্ধকারে মুঠো মুঠো টাকা কামায়, তারাই দেখি বড় বড় কথা বলে। ২৬৩. **বিদুরের ক্ষুদ** [সামান্য দান]—কিছুই আয়োজন করতে পারিনি; সামান্য বিদুরের ক্ষুদ আপনার পাতে দেওয়া হয়েছে; গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করুন। ২৬৪. **বাঁ হাতের ব্যাপার** [ঘুষ নেওয়া]—সরকারী অফিসে যাচ্ছো, কিন্তু মনে রেখো, দারোয়ান থেকে বড় সাহেব পর্যন্ত সকলেরই বাঁ হাতের ব্যাপার আছে। ২৬৫. **বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো** [একদিকে কড়াকড়ি, অপরদিকে প্রশ্রয়]—একদিকে আইনের কড়াকড়ি, অন্যদিকে আইনের চোখে ধুলো দিয়ে কাজ হাসিল। এ যেন বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো। ২৬৬. **বাস্তুঘুঘু** [ছদ্মবেশী গৃহশত্রু]—লোকটাকে চিনে রাখ;—ও কিন্তু একটা বাস্তুঘুঘু। ২৬৭. **বড় মুখ** [প্রত্যাশা]—ছেলেটা তোমার কাছে সাহায্য পাবে বলে বড় মুখ করে এসেছিল: তুমি তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলে? ২৬৮. **বিষকুম্ভ পয়োমুখ** [মুখে মিষ্টি-কথা, অন্তরে বিষ]—নিমুর মিষ্টিকথায় গলে যেও না, ও আসলে কিন্তু বিষকুম্ভ পয়োমুখ; ওর পেটে পেটে দুষ্টবুদ্ধি।

২৬৯. **ভরাডুবি** [সমূলে সর্বনাশ]—সমস্ত বিক্রি করে ব্যবসায় নেমেছি; এবার কিছু হলে আমার ভরাডুবি হবে। ২৭০. **ভস্মে ঘি ঢালা** [অপাত্রে দান করা]—অসাধু ব্যবসায়ীদের উপদেশামৃত দেওয়া আর ভস্মে ঘি ঢালা একই কথা। ২৭১. **ভিজে বিড়াল** [অন্তরে খল, কিন্তু বাহিরে নিরীহ]—ও যে এখানে ভিজে বিড়ালটির মতো বসে বসে আমাদের আলোচনা সব শুনছে; নিশ্চয়ই কোন কু-মতলব আছে। ২৭২. **ভুঁইফোড়** [হঠাৎ বড় হয়ে ওঠা]—স্বাধীনতালাভের পর যত ভুঁইফোড় দেশপ্রেমিক গজিয়ে উঠেছিল, তারাই তো এখন রাজনীতির বাজার মাত্ করে চলেছে। ২৭৩. **ভূতের বেগার খাটা** বা **ভূতের বোঝা বহা** [অর্থহীন পরিশ্রম করা]—'ভূতের বেগার মলেম খেটে।' ২৭৪. **ভূশণ্ডী কাক** [অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রবীণ ব্যক্তি]—সবাই গেছে, এখন এই ভূশণ্ডী কাকটি মরলে তবেই পাড়া জুড়োবে। ২৭৫. **ভেক ধরা** [ছদ্মবেশ ধরা]—সাধারণ পোশাকে বিশেষ সুবিধে হলো না। তাই সে সাধুর ভেক ধরেছে। ২৭৬. **ভোল ফেরানো** [চেহারার উন্নতি করা]—নতুন হেড্‌মাস্টার মশাই এসে দুদিনে ইস্কুলের ভোল ফিরিয়ে দিলেন। ২৭৭. **ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ** [ভীষণ বিশৃঙ্খল অবস্থা]—সমস্ত ব্যাপারটা এমন অগোছালো হয়ে পড়ে আছে; যেন ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ হয়ে গেছে। ২৭৮. **ভূতের মুখে রামনাম** [শত্রুর মুখে প্রশংসা]—পৃথিবীর

যুদ্ধবাজেরা আজ বলছে—শান্তি চাই ; এ যে ভূতের মুখে রামনাম। ২৭৯. ভাঁড়ে মা ভবানী [শূন্য ভাণ্ডার]—ওদিকে লম্বা বক্তৃতার বহর, আর এদিকে ভাঁড়ে মা ভবানী।

২৮০. মাকাল ফল [ড ']—চেহারায় অমন হলে কি হয়, ছেলেটা একটা আস্ত মাকাল ফল—কোন কাজের নয়। ২৮১. মাছের মায়ের পুত্রশোক [অবিশ্বাস্য ব্যাপার]—লাখপতি তুমি ; ক'টা টাকা বেশি খরচ করে আফ্‌সোস করছ। এ যে দেখি, মাছের মায়ের পুত্রশোক। ২৮২. মুখ রাখা [মান বজায় রাখা]—তোমরা সবাই আশীর্বাদ করো, ছেলে যেন আমার মুখ রাখে। ২৮৩. মিছ্‌রির ছুরি [বাইরে মধু, ভিতরে বিষ]—লোকটার কথা যেন মিছ্‌রির ছুরি—শুনতে বেশ ; কিন্তু ভেতরে খুব ধার। ২৮৪ মেও ধরা [ঝক্কাট পোয়ানো]—দীর্ঘ প্রস্তাব ত' গৃহীত হলো ; এখন মেও ধরবে কে ? ২৮৫. মাণিক জোড় [অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু]—হরিবাবুর ছেলে আর শ্যামবাবুর ছেলে—দুটিতে যেন মাণিক জোড়। ২৮৬. মায়াকান্না [সহানুভূতি পাইবার জন্য কান্নার ভান]—আর মায়াকান্না না কেঁদে হাতের কাজ চটপট সেরে ফেল। ২৮৭. মাছি-মারা কেরানী [অন্ধ নকলকারী]—মাছি-মারা কেরানীর মতো সমস্ত না টুকে একটু মাথা খাটাও। ২৮৮. মান্ধাতার আমল [অতি প্রাচীনকাল]—মান্ধাতার আমল থেকে এই রীতি আমাদের দেশে চলে আসছে। ২৮৯. মশা মারতে কামান দাগা [সামান্য কারণের জন্য বিরাট আয়োজন]—দরিদ্র ব্রাহ্মণকে জব্দ করার জন্য এই মশা মারতে কামান দাগার কি দরকার ছিল ? ২৯০. মগের মুলুক [অরাজক দেশ]—এটা কি মগের মুলুক পেয়েছ যে, যা-খুশি তাই করবে ? ২৯১. মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা [মর্মান্তিক আঘাতের পর আবার আঘাত]—একে মামলায় হেরে গিয়ে তিনি সব খুইয়ে পথে বসেছেন, তার ওপর কি দরকার ছিল মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দেবার ? ২৯২. মাটির মানুষ [সহিষ্ণু প্রকৃতির মানুষ]—মা-টি তো মাটির মানুষ ; তাঁর আব্‌দারে ছেলেটি একেবারে মাটি হয়ে গেল। ২৯৩. মাঠে মারা যাওয়া [সম্পূর্ণ ব্যর্থ হওয়া]—সরকারী অবহেলায় পরিকল্পনাগুলো সব মাঠে মারা যাবার যোগাড়। ২৯৪. মাটি হওয়া [নষ্ট হয়ে যাওয়া]—বৃষ্টিতে বিয়ের নেমন্তন্নটা একেবারে মাটি হয়ে গেল। ২৯৫. মামার বাড়ীর আব্‌দার [অন্যায় আব্‌দার]—যা চাইবে তা দিতে হবে ; এখানে ওসব মামার বাড়ীর আব্‌দার চলবে না। ২৯৬. মুচির কুকুর [হিংস্র]—লোকটা একেবারে মাটির মানুষ ; কিন্তু রাগলে একেবারে মুচির কুকুর। ২৯৭. মেঘ না চাইতে জল [হঠাৎ বরাত ফেরা]—লোকটি আশা করেছিল দুটি মাত্র টাকা ; কিন্তু লটারীতে পেয়ে গেল দু'হাজার টাকা ; যেন মেঘ না চাইতে জল। ২৯৮. মুখচোরা [লাজুক]—রমেশ যে এত মুখচোরা, তা আমার জানা ছিল না।

২৯৯. যাহা বাহান্ন তাহা তিপান্ন [সামান্য পার্থক্য]—দশ টাকা যা, সাড়ে দশ টাকাও তাই ; যাহা বাহান্ন তাহা তিপ্পান্ন। ৩০০. যখের ধন [কৃপণের সম্পত্তি] —বুড়োর সম্পত্তিতে হাত দেবে কে ? ও তো যখের ধন। ৩০১. যমের অরুচি [মৃত্যুর অস্পৃশ্য]—পাড়া-জ্বালানী বুড়িটা মরেও না, যেন যমের অরুচি।

৩০২. **রাঘব বোয়াল** [বড় অপরাধী]—চুনোপুঁটি ধরা পড়লো, আর যে রাঘব বোয়াল সেই গেল পালিয়ে। ৩০৩. **রগচটা** [বদরাগী]—দাশুর মতো রগচটা মানুষকে মিষ্টি কথায় বশ করতে হবে। ৩০৪. **রাশভারী** [গম্ভীর-স্বভাব]—বড়কর্তা ছিলেন রাশভারী মানুষ; অতি বড় ডাকসাইটে লোকও তাঁর সামনে যেতে ভয় পেতেন। ৩০৫. **রাবণের চিতা** [চিরদুঃখ]—একমাত্র পুত্রকে হারিয়ে বিধবা মহিলাটির বুকে রাবণের চিতা জ্বলছে যেন। ৩০৬. **রুটি মারা** [জীবিকা অপহরণ করা]—এভাবে ছাঁটাই করে গরীবের রুটি মারবেন না, স্যার।

৩০৭. **লক্ষ্মীর ভাণ্ডার** [প্রচুর থাকা]—আপনার তো লক্ষ্মীর ভাণ্ডার; এটুকু দিলে আপনি টেরই পাবেন না। ৩০৮. **লেফাফা দুরস্ত** [বাহ্য সাজসজ্জা]—অমন লেফাফা দুরস্ত বাবুটিকে দেখে ভুলে যেও না; আসলে ও একটি গোবর গণেশ। ৩০৯. **লঙ্কাকাণ্ড** [তুমুল ব্যাপার]—পুকুরের সামান্য একটা পুঁটি মাছের জন্য দু' ভাইতে সেদিন লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে বসলো। ৩১০. **লাল হওয়া** [খুব লাভ করা]—চোরা কারবারে লোকটা হঠাৎ লাল হয়ে উঠেছে। ৩১১. **লাল বাতি জ্বালা** [কারবার ফেল করা]—চুনের ব্যবসায়ে সে লালবাতি জ্বেলে দেশে ফিরে গেছে। ৩১২. **ল্যাংবোট** [পার্শ্বচর]—রামবাবু কিন্তু বড় সাহেবের একটি বড় ল্যাংবোট।

৩১৩ **শিবরাত্রির সল্‌তে** [একমাত্র বংশধর]—রাসবিহারী তার বংশের শিবরাত্রির সল্‌তে। ৩১৪. **শিমুল ফুল** [রূপবান্ অথচ গুণহীন ব্যক্তি]—চেহারা সুন্দর হলে হবে কি! আসলে ও একটি শিমুল ফুল, সাতবার চেষ্টা করেও পাস করতে পারেনি। ৩১৫. **শিরে সংক্রান্তি** [আসন্ন বিপদ]—পরীক্ষার একমাস মাত্র বাকী—শিরে সংক্রান্তি; এখন ওরা বলছে থিয়েটার করবে? ৩১৬. **শাঁখের করাত** [উভয় দিকেই ক্ষতিকারক]—তোমার কথা যেন শাঁখের করাত, যেতেও কাটে, আসতেও কাটে। ৩১৭. **শত্রুর মুখে ছাই দেওয়া** [অনিষ্টকারীর আশা নির্মূল করা]—শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে সে এখন বিপুল সম্পত্তির মালিক। ৩১৮. **শকুনি মামা** [গৃহভেদী কুটিল ব্যক্তি]—ঐ শকুনি মামাটাকে তাড়াতে না পারলে দু' ভায়ের মধ্যে বিবাদ মেটানো যাবো না। ৩১৯ **শাপে বর** [অনিষ্টের ফলে ইষ্ট]—চাকরিটা গিয়ে তার শাপে বর হয়েছে; নইলে এত বড় চাকরি সে পায়? ৩২০. **শ্মশান বৈরাগ্য** [অস্থায়ী অনাসক্তি]—মামলায় হেরে গিয়ে মদনের শ্মশান-বৈরাগ্য এসে গেছে; বলে কিনা সম্পত্তি অসার। ৩২১. **শাক দিয়ে মাছ ঢাকা** [গোপন করার ব্যর্থ চেষ্টা]—রাজনৈতিক ব্যাপার বলে তুমি শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চেষ্টা করো না। আমি সব জানি। ৩২২. **ষাঁড়ের গোবর** [অকর্মণ্য লোক]—গদাই একটা ষাঁড়ের গোবর, ওকে পাঠিয়েছ ডাক্তার ডাকতে?

৩২৩. **সবেধন নীলমণি** [একমাত্র ভরসা]—অনুষ্ঠানে হুটু ছাড়া আর কে গান গাইবে? সেই তো গানে এখানে সবেধন নীলমণি। ৩২৪. **সুখের পায়রা** [চিরসুখভোগী]—তুমি তো সুখের পায়রা, দুঃখের দিনে কেউ নও। ৩২৫. **সাক্ষী গোপাল** [ক্ষমতাহীন ব্যক্তি]—সেই বিপদের দিনে তুমি শুধু সাক্ষী গোপালের মতো

দাঁড়িয়ে রইলে ; কোন সাহায্যই করলে না। ৩২৬. **সোনায় সোহাগা** [মণিকাঞ্চন সংযোগ]—ছেলেটির যেমন সুন্দর চেহারা তেমনি অশেষ গুণ ; যেন সোনায় সোহাগা ! ৩২৭. **সরিষার ফুল দেখা** [অন্ধকার দেখা]—বাপ মারা যেতে সে যেন চোখে সরষের ফুল দেখলো। ৩২৮ **সাপে-নেউলে** [ঘোর শত্রুতা]—রামে আর শ্যামে যেন সাপে-নেউলে সম্পর্ক, দেখা হলেই ঝগড়া আর মারামারি। ৩২৯. **সসেমিরা** [কিংকর্তব্যবিমূঢ়]—চারদিকে অসংখ্য সমস্যার চাপে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তখন সসেমিরা অবস্থা। ৩৩০. **সেয়ানে সেয়ানে** [চালাকির জবাব চালাকিতে]—সে ঠকিয়ে তোমার ঘড়ি নিয়েছে, তুমিও ঠকিয়ে ওর রেডিও নিয়েছো ; এ যে সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি। ৩৩১. **সাত খুন মাপ** [গুরু অপরাধে শাস্তি না পাওয়া] —মন্ত্রীমশায়ের লোক বলেই সাতখুন মাপ ? ৩৩২. **স্বখাত সলিল** [কৃতকর্মের ফল]—'দোষ কারো নয় গো মা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি, শ্যামা।' ৩৩৩. **সাপের পাঁচ-পা দেখা** [হঠাৎ অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করা]—পরীক্ষায় কোনক্রমে পাস করে রাম যেন সাপের পাঁচ-পা দেখেছে। ৩৩৪. **সাত-পাঁচ** [নানা রকম]—সাত-পাঁচ ভেবে ঠিক করলুম, বিদেশে আমি যাবো না।

৩৩৫. **হরিঘোষের গোয়াল** [বিশৃঙ্খল অবস্থা]—আজ হেড্‌মাস্টার মশাই স্কুলে নেই বলে স্কুলটা যেন হরিঘোষের গোয়াল হয়ে গেছে। ৩৩৬. **হ-য-ব-র-ল** [বিশৃঙ্খল]—তোমার কাজকর্ম ভীষণ হ-য-ব-র-ল ; বড় সাহেব ভারি বিরক্ত হয়েছেন তোমার ওপর। ৩৩৭. **হস্তিমূর্খ** [অতিশয় মূর্খ]—বুলু একটি হস্তিমূর্খ, ওকে ইকনমিক্স বোঝাতে যাওয়া বৃথা। ৩৩৮. **হরিষে বিষাদ** [আনন্দের মধ্যে দুঃখ]—বিয়ের দিনে মেয়ের মা মারা যাওয়ায় সবার মনে হরিষে বিষাদ নেমে এলো। ৩৩৯. **হাড় জুড়ানো** বা **হাড়ে বাতাস লাগা** [স্বস্তিবোধ করা] —মামলাবাজ বুড়োটি মরলে সকলের হাড়ে বাতাস লাগে। ৩৪০. **হাড়-হাভাতে** [লক্ষ্মীছাড়া]—হারুর মতো হাড়-হাভাতে ছেলে আমি আর একটিও দেখিনি, যা হাতে পায়, সব উড়িয়ে দেয়। ৩৪১. **হাঁড়ির হাল** [অত্যন্ত দুরবস্থা]—একমাত্র রোজগেরে ছেলে মারা যাওয়ার পর মা-র হয়েছে হাঁড়ির হাল। ৩৪২. **হাতভারি** [ব্যয়কুণ্ঠ]—প্রাণগোপালবাবুর মতো হাতভারি লোকের কাছে কিনা বারোয়ারি পূজার চাঁদা আদায় করেছ! ৩৪৩. **হাতির খোরাক** [প্রচুর ব্যয়]—চাকরি তো ছেড়ে দিয়ে এলে ; এখন এতগুলো মানুষের হাতির খোরাক জোগাবে কি করে ? ৩৪৪. **হাত পাকানো** [অভিজ্ঞতা লাভ]—চুরিতে হাত পাকিয়ে সে এখন বাটপাড়ি করতে শুরু করেছে। ৩৪৫. **হাল ধরা** [নেতৃত্ব গ্রহণ করা]—শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর পর নেতৃত্বহীন বাংলার হাল ধরবার কেউ ছিল না। ৩৪৬. **হাল ছাড়িয়া দেওয়া** [আশা ত্যাগ করা]—চার-চারবার ফেল করে সে এখন হাল ছেড়ে দিয়েছে। ৩৪৭. **হালে পানি পাওয়া** [বিপন্মুক্ত হইবার সম্ভাবনা দেখা]—এই চরম দুর্দিনে ছেলেটি চাকরি জোগাড় করতে পারায় বৃদ্ধ হরিবাবু যেন হালে পানি পেয়েছেন। ৩৪৮. **হিতে বিপরীত** [ভালো করতে গিয়ে মন্দ করা]—কবির বারণ সত্ত্বেও

অপারেশন করা হলো ; কিন্তু হলো হিতে বিপরীত।—কবিকে আর বাঁচানো গেল না। ৩৪৯. **হেস্তনেস্ত** [শেষ মীমাংসা]—সে যদি এর পর কিছু বলে, তবে একটা হেস্তনেস্ত করে ছাড়বো। ৩৫০. **হাতে খড়ি** [আরম্ভ]—ইস্কুলেই আমার বক্তৃতা দেওয়ার হাতে খড়ি। ৩৫১. **হাতটান** [চুরির অভ্যাস]—চাকরটার একটু হাতটান আছে, পারো তো একটু নজর রেখো। ৩৫২. **হাটে হাঁড়িভাঙ্গা** [গুপ্ত কথা ব্যক্ত করা]—আমাকে রাগিও না, তাহলে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেব। ৩৫৩. **হরে কর কম্বা** [আবোল তাবোল]—'হরে কর কম্বা' এ সব কি লিখেছ ? কিছুই বোঝনি দেখ্‌ছি। ৩৫৪. **হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা** [উপস্থিত সুযোগ ত্যাগ করা]—হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলো না , যা পাচ্ছ তাই নিয়ে যাও। ৩৫৫. **হাতে পাঁজি মঙ্গলবার** [জানবার উপায় থাকতে মিথ্যা গবেষণা]—তোমাদের হাতে পাজি মঙ্গলবার—ঐ ত' শব্দবোধ অভিধান্ রয়েছে, অর্থ টা দেখে নাও। ৩৫৬. **হাতের পাঁচ** [বিনা আয়াসে যা পাওয়া যায়]—ছেলে-পড়ানো ত' হাতের পাঁচ, তাছাড়া কোন কাজ পাওয়া যায় কিনা তাই দেখছি। ৩৫৭. **হরিহর আত্মা** [অত্যন্ত সদ্ভাব]—ছেলে দুটির কি সদ্ভাব ! যেন হরিহর আত্মা ; দেখলেও চোখ জুড়ায়। ৩৫৮. **হাতে-কলমে** [প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা]—আরে, আমাকে আর বলতে হবে না—ও সব হাতে-কলমে করা আছে আমার। ৩৫৯. **হাড়হদ্দ** [আগাগোড়া]—আমার কাছে মিথ্যে কথা বলো না ; আমি হাড়হদ্দ সব জানি। ৩৬০. **হাত-পা বাঁধা** [নিরুপায়] —আইনে আমাদের হাত-পা বাঁধা, কারো জন্যে কিছু করা অসম্ভব। ৩৬১. **হাত-পা বাঁধিয়া জলে ফেলা** [মৃত্যুমুখে ঠেলিয়া দেওয়া]—পূর্বে বাংলাদেশে হাত-পা বেঁধে মেয়েদের জলে ফেলে দেওয়ার মতো প্রচলিত ছিল গৌরীদান প্রথা। ৩৬২. **হাত-সাফাই** [চুরি]—চাকরটা হাত-সাফাই ছাড়া অন্য কোন কাজই শিখতে পারেনি। ৩৬৩. **হরিমটর** [উপবাস]—কিছু সংগ্রহ করতে পারলুম না ; বুঝলুম, সেদিন রাত্তিরে আমার কপালে হরিমটর। ৩৬৪. **হীরের টুকরো** [বুদ্ধিমান ও সৎ]—হীরু আমাদের হীরের টুকরো ছেলে ; কারোর সঙ্গেই তার তুলনা হয় না।

প্রবাদ-বাক্য

প্রত্যেক জাতির তাহার নিজস্ব কিছু প্রবাদ-বাক্য থাকে। সেগুলি তাহার জাতীয় সম্পদ। কবে, কিভাবে এবং কে সেই সুভাষিত বাণী-মঞ্জরী রচনা করিয়াছিলেন, কেহ জানে না। কিন্তু সেগুলি লোকমুখে যুগ যুগ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। প্রবাদ-বাক্যগুলি যদি একটু মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, ইহাতে লৌকিক অভিজ্ঞতা এবং কখনও মানবচরিত্রের সমালোচনা সংক্ষেপে বিধৃত রহিয়াছে। অবশ্য কখনও কখনও কোন কোন কবির রচনা জনপ্রিয়তার গুণে প্রবাদ-বাক্যরূপে গণমানসে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

নিম্নে তাৎপর্যসহ বাংলার কিছু প্রবাদ বাক্যের দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল :

১. **অতিদর্পে হত লঙ্কা** [অহংকারের পতন আছে] : অত বড় ভালো নয় ;

ভুলো না, অতিদর্পে হত লঙ্কা। ২. **অতিবুদ্ধির গলায় দড়ি** [বেশী চালাকির পরিণাম ভাল হয় না]: আমার কথা না শুনে চালাকি করতে গেলে ; দেখলে তো, অতিবুদ্ধির গলায় দড়ি। ৩. **অতি লোভে তাঁতী নষ্ট** [বেশী লোভে সমূলে নষ্ট হয়]: বেশী লোভ করতে গিয়ে লোকটা সব খোয়ালে, একেই বলে—অতি লোভে তাঁতী নষ্ট। ৪. **অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট** [লোক বেশী হলে কাজ পণ্ড হয়]: এই সামান্য কাজটুকুর জন্যে এত লোক ! দেখো, শেষে অধিক সন্ন্যাসীতে না গাজন নষ্ট হয়ে যায়। ৫. **আসমানের চাঁদ হাতে পাওয়া** [দুর্লভ বস্তু পাওয়া]: বৃদ্ধা বহুদিন পরে ছেলেকে ফিরে পেয়ে যেন আসমানের চাঁদ হাতে পেলেন। ৬. **এক মাঘে শীত যায় না** [বিপদ বার বার আসে]: এক মাঘে শীত যায় না হে ! বিপদ আবার আসতে কতক্ষণ? ৭. **এক হাতে তালি বাজে না** [বিবাদে উভয় পক্ষেরই দোষ থাকে]: দোষ দুজনেরই আছে ; কখনো এক হাতে তালি বাজে না। ৮. **একে মনসা তায় ধুনোর গন্ধ** [যে যাতে রেগে যায়, তাই করা]: বড় সাহেবকে দিয়েছো কবিতার বই ! একে মনসা তায় ধুনোর গন্ধ ! ৯. **কাজের বেলায় কাজী কাজ ফুরোলে পাজী** [কার্যসিদ্ধির পর ভুলে যাওয়া]: বিপদে পড়ে ছুটে এসেছো। তোমাকে চিনি না? কাজের বেলায় কাজী, কাজ ফুরোলে পাজী। ১০. **গোরু মেরে জুতো দান** [গুরু পাপের লঘু প্রায়শ্চিত্ত]: সারা জীবন গ্রামগুলিকে শোষণ করে বৃদ্ধ জমিদার করলেন দরিদ্র নারায়ণের সেবা ; একেই বলে গোরু মেরে জুতো দান। ১১. **গেঁয়ো যুগী ভিখ্ পায় না** [চেনা গুণীর কদর নেই]: অতবড় শিল্পীকে পাড়ার কেউ চেনে না ; চিনবে কি করে? গেঁয়ো যুগী কোনকালেই যে ভিখ্ পায় না। ১২. **ঘরপোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়** [পূর্ব বিপদের আশঙ্কায় আশঙ্কিত হওয়া]: প্রচুর টাকা মেরে পালিয়ে গিয়ে লোকটা আবার এসেছে। আমি তো ঘরপোড়া গোরু, তাই সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরাই। ১৩. **চালুনির আবার ছুঁচের বিচার** [অজস্র ত্রুটিযুক্ত ব্যক্তির অন্যের ত্রুটি ধরা]: তুমি তো দিনরাত অজস্র মিথ্যেকথা বলো ; আজ অন্যকে বলছো মিথ্যেবাদী। চালুনির আবার ছুঁচের বিচার। ১৪. **চেনা বামুনের পৈতার দরকার হয় না।** [পরিচিত ব্যক্তির পরিচয় নিষ্প্রয়োজন]: আপনাকে আমরা চিনি, আপনার আবার কার্ডের কি দরকার? চেনা বামুনের পৈতার দরকার হয় না। ১৫. **চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা** [দুষ্ট লোকেরাই দুষ্ট লোকদের সমর্থক]: চোরাকারবারী তো মজুতদারকে সমর্থন করবেই ; এতে নতুন কি আছে? জানোই তো, চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা। ১৬. **ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি** [দায়িত্ব থেকে অব্যাহতির জন্যে ব্যাকুলতা]: শখ করে উনি কমিটির প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। একটা মিটিং চালিয়েই এখন ওঁর ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা। ১৭. **জলে কুমির ডাঙায় বাঘ** [উভয় সংকট]: আমি এখন কোথায় যাই? পাড়ার হয়ে খেললে ইস্কুলের রাগ, ইস্কুলের হয়ে খেললে পাড়ার রাগ। এখন যে আমার জলে কুমির ডাঙায় বাঘ। ১৮. **দশচক্রে ভগবান ভূত** [বহুর চক্রান্তে ভালোও মন্দ হয়ে যায়]: একা

আপনি কতদিন কমিটিতে ভালো থাকবেন? দশচক্রে ভগবানও ভূত হয়ে যায়। ১৯. **ধরি মাছ না ছুঁই পানি** [কষ্ট এড়িয়ে কার্যোদ্ধার]: ওঁর তো সব সময় ধরি মাছ না ছুঁই পানির নীতি,—দূরে দূরে পা বাঁচিয়ে চলবেন, কিন্তু কাজটি অন্যের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে ঠিক উদ্ধার করে নেবেন—দেখো। ২০. **বরের ঘরের মাসী, কনের ঘরের পিসী** [দু'মুখো সাপ]: দু' বন্ধুর ঝগড়ার মধ্যে লোকটা কোন্‌খান থেকে এসে একে বলছে এক কথা, অন্যকে বলছে আর এক কথা; লোকটা দেখছি, বরের ঘরের মাসী, কনের ঘরের পিসী। ২১. **বামুন গেল ঘর তো হাল তুলে ধর** [মালিকের অনুপস্থিতিতে কাজের ফাঁকি]: কর্তা মশাই এখন তীর্থে গেছেন; তাই তাঁর কর্মচারীদের এখন বামুন গেল ঘর তো হাল তুলে ধর। ২২. **বানরের গলায় মুক্তার হার** [অযোগ্য লোককে দামী বস্তু দান]: রাখালের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে—সে তো বানরের গলায় মুক্তার হার! ২৩. **বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়** [বড়োর চেয়ে ছোটোর অধিক আস্ফালন]: সরকার মশাইর চেয়ে আজকাল সরকার মশাইর ছেলের দাপট বেশী। এ যে দেখছি, বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড় [ছোটো সাপের বড়ো বিষ]। ২৪. **বেল পাকলে কাকের কী?** [অধিকারহীনের বৃথা আপসোস]: সরকারী অফিসের মাইনে বেড়েছে, আমাদের তো আয় বাড়েনি। বেল পাকলে কাকের কী? ২৫. **বুনো তেঁতুল বাঘা ওল** [দুষ্টের যোগ্য প্রতিপক্ষ]: কার সাহেবের টেবিলের ওপর সবুট পা তুলে দিয়ে চুরুট টানার প্রত্যুত্তরে বিদ্যাসাগর চটিসুদ্ধ তাঁর পা দুটি তেপায়ার ওপর তুলে হুঁকো টানতে টানতে কার সাহেবকে আপ্যায়িত করলেন। কার সাহেব যেমন বুনো তেঁতুল, বিদ্যাসাগর তেমনি বাঘা ওল! ২৬. **ভাগের মা গঙ্গা পায় না** [ভাগাভাগির কাজে সবাই দায়িত্ব এড়িয়ে চলে]: চৌধুরীবাবুর মৃত্যুর পর দেবী ভবানীর পূজা-অর্চনার ভার পড়ে তাঁর ছেলেদের ওপর। কিন্তু হলে কি হবে, ভাগের মা এখন গঙ্গা পায় না। ২৭ **ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া** [দাতব্য জিনিসের খুঁত ধরা উচিত নয়]: সরকারী খয়রাতি যা পেয়েছো, তাই ভালো, ভিক্ষের চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া। ২৮ **মাথা নেই তার মাথা ব্যথা** [অকারণ দুশ্চিন্তা]: তোমার কোন দায়-দায়িত্ব নেই, তুমি এত ভাবছো কেন?—মাথা নেই তার মাথা ব্যথা! ২৯ **মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত** [সীমিত ক্ষমতা]: কী কথায় কথায় তুমি মামলার ভয় দেখাও, জানি, মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। ৩০. **যার কাজ তারে সাজে অন্য লোকের লাঠি বাজে** [অযোগ্য লোকের হাতে কাজের দায়িত্ব দিলে বিভ্রাট দেখা দেয়]: তুমি তো কাঠের মিস্ত্রি, সেলাই কলের কি বোঝো? ছাখো, যার কাজ তারে সাজে, অন্য লোকের লাঠি বাজে। ৩১. **লাখ কথার এক কথা** [শ্রেষ্ঠ উক্তি]: উনি যে বললেন, টাকা বড়ো নয়, মানুষই বড়ো,—এটা হলো লাখ কথার এক কথা। ৩২. **লাগে লাখ টাকা দেবে গৌরী সেন** [অর্থের অপচয়]: দুহাতে তোমরা আমার টাকা উড়িয়েছ; ভেবেছো, লাগে লাখ টাকা দেবে গৌরী সেন!

॥ অনুসরণী ॥

১. অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া বাক্য রচনা কর :

ক. শিমুল ফুল, বর্ণচোরা, সুখের পায়রা, মাটির মানুষ, রাহুর দশা, জিলিপির প্যাঁচ ; মা. '৫৩। খ. অরণ্যে রোদন, কূপমণ্ডুক, উত্তম মধ্যম, তীর্থের কাক, দক্ষযজ্ঞ, পুকুর চুরি, শাঁখের করাত, শিরে সংক্রান্তি ; বকধার্মিক, চিনির বলদ ; মা. '৫৫। গ. সোনায় সোহাগা, আক্কেল সেলামি, তেলে-বেগুনে, ভূতের বেগার, পায়ের ঝাল, পাকা ধানে মই, ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো, আকাশের চাঁদ ; মা. '৫৮। ঘ. ভস্মে ঘি ঢালা, বাগে পাওয়া, কেঁচে গণ্ডূষ করা, অগ্নিশর্মা হওয়া, ননীর পুতুল, অরণ্যে রোদন, হাল ছাড়িয়া দেওয়া ; মা. '৫৯। ঙ. বাগে পাওয়া, চোখ টাটানো, বালির বাঁধ, ভাগের মা, মুখ রাখা, তাসের ঘর, শাঁখের করাত, সোনায় সোহাগা ; মা. '৬১। চ. কড়ায় গণ্ডায়, এক চোখো, অন্ধের যষ্টি, অরণ্যে রোদন, কাঠের পুতুল, উত্তম মধ্যম, কলুর বলদ, শাঁখের করাত , মা. [কম্পার্ট.] '৬১। ছ. শাপে বর, চর্বিত চর্বণ, আকাশ কুসুম, ননীর পুতুল, শ্মশান বৈরাগ্য, হাল ধরা ; মা. [কম্পার্ট.] '৬২। জ. পায়াভারি, মাটির মানুষ, বিদুরের ক্ষুদ, গোবর গণেশ, চোখের চামড়া, ধান ভানতে শিবের গীত ; মা. '৬৩। ঝ. মগের মুলুক, অরণ্যে রোদন, হিতে বিপরীত, তুষের আগুন, হাতের পাঁচ, চোখে আঙুল, ঢাকের বাঁয়া, কূপমণ্ডুক, জিলিপির প্যাঁচ ; ক.প্রা. '৬৩। ঞ. দু'নৌকায় পা, শিরে সংক্রান্তি, চোখের বালি, পোয়া বারো, আক্কেল সেলামি, আশমানজমিন, চুলচেরা, ছিনে জোঁক ; ক.প্রা. '৬৪। ট. চোখ-টাটানো, চাল চালা, মান ভাঙানো, কান ভারি করা, পাশ কাটানো, দায় সারা, ঘাট মানা, ঢাক পিটানো ; ক. প্রা. '৬৫। ঠ. অমাবস্যার চাঁদ, আমড়া কাঠের ঢেঁকি, ডুমুরের ফুল, তাসের ঘর, তীর্থের কাক, রাবণের চিতা, ঝাঁকের কই ; ক. প্রা. ৬১। বক-ধার্মিক, মাটির মানুষ, বুকের পাটা, জড় ভরত, গড্ডলিকা প্রবাহ, গোবর গণেশ, উভয় সঙ্কট, সোনায় সোহাগা, পথিকৃৎ, পায়াভারি, ঢাক-পিটানো, অগ্রণী ; উ. মা. '৬৯। শাঁখের করাত, ডুমুরের ফুল, আঁটসাঁট, ভুলকালাম, জারিজুরি, গনগনে, কলুর বলদ ; উ. মা. [কম্পার্ট.] '৬৯। আকাশ কুসুম, তালকানা, রাশভারি, জলাঞ্জলি, মুখনাড়া, বকধার্মিক, গলাবাজি, অগস্ত্যযাত্রা, চুনকালি, নেপথ্যে, নাস্তানাবুদ, তালকানা ; উ. মা. '৭০। মণিকাঞ্চনযোগ, হাতের পাঁচ, গোড়ায় গলদ, সুখের পায়রা, গোকুলের ষাঁড়, পায়াভারি, তালকানা, নাড়ি-নক্ষত্র, সাতপাঁচ, ডান হাতের ব্যাপার ; [উ. মা. কম্পার্ট.] ৭০। অরণ্যে রোদন, কলুর বলদ, পুকুর চুরি, মিছরির ছুরি, সুখের পায়রা, সোনায় সোহাগা, গোকুলের ষাঁড়, চোখের চামড়া, শাঁখের করাত, অর্ধচন্দ্র ; উ. মা. [কম্পার্ট] '৭০। অন্ধের যষ্টি, আকাশ কুসুম, কূপমণ্ডুক, চিনির বলদ, জিলিপির প্যাঁচ, পুকুর চুরি, ভূতের বেগার, তীর্থের কাক, দক্ষযজ্ঞ ; মা. '৭৩।

২. নিম্নলিখিত বাক্যাংশগুলি বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশ করিয়া তাহাদের প্রত্যেকটিকে স্বরচিত বাক্যে ব্যবহার কর :

কাঁচা পয়সা, এক হাত লওয়া, কত ধানে কত চাল, বুকে হাত দিয়ে বলা, ভাতে মারা, কপাল ভাঙা, কাঁধে পা দেওয়া, আকাশ ভাঙিয়া পড়া, পুকুর চুরি, পাথরে পাঁচ কিল, অকাল কুষ্মাণ্ড, অকূল পাথারে পড়া, আক্কেল গুড়ুম, আঙুল ফুলে কলাগাছ, উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ, ইতি গজ, কলুর বলদ, চিনির বলদ, ধর্মের ষাঁড়, খয়ের খাঁ, সবেধন নীলমণি, গোকুলের ষাঁড়, গোঁফ-খেজুরে, গৌরচন্দ্রিকা, চোখের বালি, ঠুঁটো জগন্নাথ, তুলসীবনের বাঘ, নখ-দর্পণে থাকা, প্রজাপতির নির্বন্ধ, মাছের মা, ব্যাঙের সর্দি, মাছিমারা কেরানী, শাঁখের করাত, সাপের পাঁচ-পা, হাটে হাঁড়ি ভাঙা, হাতের পাঁচ, হাত-সাফাই, হরিহর আত্মা।

৩. নিম্নলিখিত প্রবাদ বাক্যগুলির অর্থসহ প্রয়োগ দেখাও : অতিলোভে তাঁতী নষ্ট, অতিদর্পে হত লঙ্কা, অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট, এক হাতে তালি বাজে না, একে মনসা তায় ধুনার গন্ধ, গোরু মেরে জুতো দান, গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না, ঘরপোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়, চেনা বামুনের পৈতে দরকার হয় না, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি, জলে কুমির ডাঙায় বাঘ, বামুন গেল ঘর তো লাঙল তুলে ধর, বুনো ওল বাঘা তেঁতুল, ভাগের মা গঙ্গা পায় না, ভিক্ষের চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া।

নির্ভুল ব্যাকরণ-জ্ঞান নির্ভুলভাবে ভাষা লিখিবার ও বলিবার জন্য একান্তভাবে প্রয়োজন। তোমরা ব্যাকরণের পঠিতব্য সকল অধ্যায় ধারাবাহিকভাবে শিক্ষা করিয়াছ। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে আমাদের ভুল হয়, এখন তোমাদের তাহা জানা দরকার এবং সেই সেই ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করিলে তোমরা বহু অবাঞ্ছিত ভুল পরিহার করিতে পারিবে এবং নিজেদের যাবতীয় বক্তব্য নির্ভুলভাবে লিখিতে পারিবে।

মুখ্যতঃ উচ্চারণের ত্রুটির জন্য শব্দের বানানের বিভ্রাট ঘটে। আবার, বাংলায় অনেক ক্ষেত্রে দুইটি বর্ণের উচ্চারণ একই রূপ হওয়ায় শব্দের বানানে কোন্ বর্ণটি বসিবে, সে সম্পর্কে বিভ্রাট ঘটিয়া থাকে। যেমন : ই, ঈ ; উ, ঊ ; ণ, ন ; শ, ষ, স ; জ, য, ইত্যাদি। বাংলায় এই বর্ণগুলির উচ্চারণ একই প্রকার হওয়ায় বানানের বিভ্রাট প্রায়ই ঘটিয়া থাকে।

সতর্কতা অবলম্বন করিলে এবং কোন্ বিশেষ বর্ণটি ব্যবহৃত হইবে—নিঃসংশয়রূপে জানা থাকিলে এই ধরনের অবাঞ্ছিত ভুলগুলি আর হয় না। দ্বিতীয় প্রকারের ভুল হয় সন্ধি, সমাস ও প্রত্যয়-ঘটিত। গভীর ব্যাকরণ-জ্ঞান এই দ্বিতীয় প্রকারের ভুলের হাত হইতে অব্যাহতি দিতে পারে।

● নিম্নে প্রদত্ত শব্দ-সম্ভারের শুদ্ধ ও অশুদ্ধ রূপ লক্ষ্য কর :

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অদ্ভূত	অদ্ভুত	অনাথিনী	অনাথা
অভ্যাস্থ	অভ্যস্ত	অধিনী	অধীনা
অনাটন	অনটন	অনুকুল	অনুকূল
অত্যান্ত	অত্যন্ত	অসহনীয়	অসহ্য, অসহনীয়
অদ্যবধি	অদ্যাবধি	অনুমত্যানুসারে	অনুমত্যনুসারে
অহর্নিশি	অহর্নিশ	অসুস্থ নিবন্ধন	অসুস্থতা নিবন্ধন
অত্যাধিক	অত্যধিক	অসুস্থতা নিবন্ধনের জন্য	অসুস্থতা নিবন্ধন
অহোরাত্রি	অহোরাত্র	আত্যাক্ষর	আদ্যক্ষর
অধ্যাবসায়	অধ্যবসায়	আপ্রাণ	প্রাণপণ
অন্তরেন্দ্রিয়	অন্তরিন্দ্রিয়	আশক্তি	আসক্তি
অধ্যায়ন	অধ্যয়ন	আবিষ্কার	আবিষ্কার
অনাধিক	অনধিক	আহ্নিক	আহ্নিক
অজ্ঞানী	অজ্ঞান	আস্পদ	আস্পদ
অন্তেষ্টি	অন্ত্যেষ্টি	আরুঢ়	আরূঢ়
আয়ত্তাধীন	আয়ত্ত বা অধীন	গোপিনী	গোপী

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
আকণ্ঠ পর্যন্ত	আকণ্ঠ বা কণ্ঠ পর্যন্ত	গৃষ্ম	গ্রীষ্ম
		চিরজিবী	চিরজীবী
আবশ্যক নাই	আবশ্যকতা নাই	চক্ষুরোগ	চক্ষুরোগ
আকাঙ্খা, আকাংখা	আকাঙ্ক্ষা	চক্ষুদ্বয়	চক্ষুর্দ্বয়
আবশ্যকীয়	আবশ্যক	চক্ষুরত্ন	চক্ষুরত্ন
ইয়ত্বা	ইয়ত্তা	চোষ্য	চূষ্য
উর্দ্ধ, উর্ধ	উর্ধ্ব	চ্যূত	চ্যুত
উপরোক্ত	উপর্যুক্ত, উপরিউক্ত	ছাগীশিশু	ছাগশিশু
উদ্বেলিত	উদ্বেল	ছাত্রগণেরা	ছাত্রগণ
উৎপাৎ	উৎপাত	জেষ্ঠ	জ্যেষ্ঠ
উৎকর্ষতা	উৎকর্ষ	জাত্যাভিমান	জাত্যভিমান
উচিৎ	উচিত	জ্যোতীন্দ্র	জ্যোতিরিন্দ্র
উচ্ছন্ন	উৎসন্ন	জাগরুক	জাগরূক
উজ্বল	উজ্জ্বল	জ্ঞানমান্	জ্ঞানবান
উদাসিনী	উদাসীনা	জাগ্রদাবস্থা	জাগ্রদবস্থা
উত্যক্ত	উত্ত্যক্ত	জগধাত্রী	জগদ্ধাত্রী
ঋণগ্রস্থ	ঋণগ্রস্ত	তরুছায়া	তরুচ্ছায়া
একত্রিত	একত্র	তপস্বীবেশ	তপস্বিবেশ
ঐক্যতা	ঐক্য, একতা	তিরস্কৃত	তিরস্কৃত
ঐক্যতান	ঐকতান	তোমাপেক্ষা	তোমা অপেক্ষা
কুরঙ্গিনী	কুরঙ্গী	তাহাপেক্ষা	তাহা অপেক্ষা
কৃষিজিবী	কৃষিজীবী	ত্রশ্ স্পর্শ	ত্র্যহস্পর্শ
কৌতুহল	কৌতূহল	ত্যেজ্য	ত্যাজ্য
কর্তাকারক	কর্তৃকারক	ত্রুটি	ত্রুটি
ক্ষিতিশ	ক্ষিতীশ	দীর্ঘজিবী	
ক্ষুধ্ পিপাসা	ক্ষুৎপিপাসা	দারিদ্রতা	দারিদ্র্য দরিদ্রতা
কিম্বদন্তী	কিংবদন্তী	দুর্ণাম	দুর্নাম
কুসাশন	কুশাসন	দুরাত্মাগণ	দুরাত্মগণ
গননা	গণনা	দিনরাত	দিনরাত্রি
গড্ডালিকা	গড্ডলিকা	দুরাদৃষ্ট	দুরদৃষ্ট
গুণীগণ	গুণিগণ	দুরাবস্থা	দুরবস্থা
গরিয়সি	গরীয়সী	দিগেন্দ্র	দিগিন্দ্র
গড়ুর	গরুড়	দিবারাত্র	দিবারাত্রি
দধিচী	দধীচি	পৃথকায়	পৃথগন্ন

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
দুর্বিসহ	দুর্বিষহ	পুরষ্কার	পুরস্কার
দংশিত	দষ্ট	পশ্বাধম	পশ্বধম
ধ্বংশ	ধ্বংস	পক্ষীশাবক	পক্ষিশাবক
ধর্মাত্মাগণ	ধর্মাত্মগণ	প্রত্যুৎ	প্রত্যুত
ধনীসন্তান	ধনিসন্তান	পরিমান	পরিমাণ
নমষ্কার	নমস্কার	পক্ষীজাতি	পক্ষিজাতি
নিপিড়িত	নিপীড়িত	প্রাণীবৃন্দ	প্রাণিবৃন্দ
নিশিথ	নিশীথ	প্রসারতা	প্রসার
নেহ্য	ন্যায্য	পূজ্যাষ্পদ	পূজাস্পদ, পূজ্য
নিস্কাম	নিষ্কাম	পৌরহিত্য	পৌরোহিত্য
নিস্ফল	নিষ্ফল	ফেন	ফেণ
নিরস	নীরস	ফণীভূষণ	ফণিভূষণ
নিরক্ত	নীরক্ত	বক্ষোপরি	বক্ষ উপরি
নির্ধনী	নির্ধন	ব্যবস্থা	ব্যবস্থা
নিরোগ	নীরোগ	ব্যায়	ব্যয়
নিরব	নীরব	ব্যাবধান	ব্যবধান
নিরপরাধী	নিরপরাধ	ব্যাতীত	ব্যতীত
নেতাগণ	নেতৃগণ	বাহুল্যতা	বাহুল্য, বহুলতা
নীরিহ	নিরীহ	বিকির্ণ	বিকীর্ণ
ননদিনী	ননদ	বিহঙ্গিনী	বিহঙ্গী
নীরিক্ষণ	নিরীক্ষণ	বয়ক্রম	বয়ঃক্রম
নদিমুখ	নদীমুখ	বাক্‌দান	বাগ্‌দান
নমিত	নত	বাল্মিকী	বাল্মীকি
নুপুর	নূপুর	ব্যাবসায়	ব্যবসায়
পঙ্ক	পঙ্ক	ব্যাবহার	ব্যবহার
পশ্চাদ্‌পদ	পশ্চাৎপদ	বিদ্রুপ	বিদ্রূপ
পৃথীবি, প্রথিবী	পৃথিবী	বয়ো কনিষ্ঠ	বয়ঃ কনিষ্ঠ
পুণ্য	পুণ্য	বিধর্মী	বিধর্মী
প্রত্তিকুল	প্রতিকূল	বেক্তি	ব্যক্তি
পূর্বাহ্ন	পূর্বাহ্ণ	বৈরতা	বৈর
প্রাঙ্গন	প্রাঙ্গণ	ব্যাঞ্জন	ব্যঞ্জন
পিচাশ	পিশাচ	ব্যাগ্র	ব্যগ্র
বিদ্যান	বিদ্বান	মহত্ব	মহত্ত্ব

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
বুৎপত্তি	ব্যুৎপত্তি	মধ্যান্হ	মধ্যাহ্ন
ব্যাক্ত	ব্যক্ত	মহদুপকার	মহোপকার
বন্দোপাধ্যায়	বন্দ্যোপাধ্যায়	মোতি	মতি
বাগেশ্বরী	বাগীশ্বরী	মহাত্মাগণ	মহাত্মগণ
বোমকেশ	ব্যোমকেশ	মাতঙ্গিনী	মাতঙ্গী
বাহ্যিক	বাহ্য	যদ্যাপি	যদ্যপি
বৈচিত্র	বৈচিত্র্য	যদ্যপিও	যদ্যপি, যদিও
বীভিষিকা	বিভীষিকা	যষ্ঠি	যষ্টি
বিকীরণ	বিকিরণ	যোগেন্দ্র	যোগীন্দ্র
ভূল	ভুল	যোগীবেশ	যোগিবেশ
ভ্রাতাগণ	ভ্রাতৃগণ	যোগীগণ	যোগিগণ
ভুজঙ্গিনী	ভুজঙ্গী	যশলাভ	যশোলাভ
ভয়ঙ্করী	ভয়ঙ্করা	যাবদীয়	যাবতীয়
ভাগিরথী	ভাগীরথী	রসায়ণ	রসায়ন
ভগবান্ প্রদত্ত	ভগবৎ প্রদত্ত	রামায়ন	রামায়ণ
ভবিষ্যৎবাণী	ভবিষ্যদ্বাণী	রাজাগণ	রাজগণ
ভূম্যাধিকারী	ভূম্যধিকারী	রুগ্ন	রুগ্ণ
ভৌগলিক	ভৌগোলিক	রক্ষরাজ	রক্ষোরাজ
ভুষণ	ভূষণ	রাশিকৃত	রাশীকৃত
মনহর	মনোহর	লজ্জাস্কর	লজ্জাকর
মনমোহন	মনোমোহন	লক্ষী	লক্ষ্মী
মধ্যরাত্রি	মধ্যরাত্র	শম্ভূ	শম্ভু
মাহাত্ম	মাহাত্ম্য	শিরমনি	শিরোমণি
মান্যনীয়	মাননীয়, মান্য	শিরনাম	শিরোনাম
মৈত্রতা	মিত্রতা	শিরচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ
মনঃ কষ্ট	মনোকষ্ট	শ্বেতাঙ্গিনী	শ্বেতাঙ্গী
মধুসুদন	মধুসূদন	শশীভূষণ	শশিভূষণ
মাধুর্য্যতা	মাধুর্য, মধুরতা	শোনিত	শোণিত
মুমুর্ষ	মুমূর্ষু	শিরোপীড়া	শিরঃপীড়া
মূহুর্ত	মুহূর্ত	শিখীপুচ্ছ	শিখিপুচ্ছ
মনষ্কাম	মনস্কাম	শ্রদ্ধাস্পদাসু	শ্রদ্ধাস্পদেষু
মন্ত্রীবর	মন্ত্রিবর	স্বরস্বতী	সরস্বতী
মুখছবি	মুখচ্ছবি	স্বাস্থ	স্বাস্থ্য
সান্তনা	সান্ত্বনা	সমীচিন	সমীচীন

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
সম্মান	সম্মান	সৌজন্যতা	সৌজন্য, সুজনতা
সন্মতি	সম্মতি	সারথী	সারথি
সন্মুখ	সম্মুখ	স্বাতন্ত্র	স্বাতন্ত্র্য
স্রোতবেগ	স্রোতোবেগ	সন্নাসী	সন্ন্যাসী
সলজ্জিত	সলজ্জ	সায়াহ্ন	সায়াহ্ন
সকাতর	কাতর	সত্ত্বা	সত্তা
সবিনয়পূর্বক	সবিনয়ে, বিনয়পূর্বক	সাধ্যায়ত্ত	সাধ্য
সুবুদ্ধিমান্	সুবুদ্ধি	সম্মিলন	সম্মেলন
স্বামীপুত্র	স্বামিপুত্র	স্বয়ম্বরা	স্বয়ংবরা
সুকেশিনী	সুকেশা	সম্বরণ	সংবরণ
সকৃতজ্ঞ	কৃতজ্ঞ	সানন্দিত	সানন্দ
সদ্যজাত	সদ্যোজাত	সর্পিনী	সর্পী
সিন্দুর	সিন্দূর	সহ্যাতীত	সহনাতীত
সপ্ন	স্বপ্ন	সমতুল্য	সম বা তুল্য
সচ্ছন্দ	স্বচ্ছন্দ	স্খালন	স্খলন
সাচ্ছন্দ্য	স্বাচ্ছন্দ্য	হস্তীদন্ত	হস্তিদন্ত
সন্ধা	সন্ধ্যা	হৃদপিণ্ড	হৃৎপিণ্ড
সাহার্য	সাহায্য	হৃদ্‌কম্প	হৃৎকম্প
সুরধনী	সুরধুনী	হৃষিকেশ	হৃষীকেশ

বানানের উভয় রূপ শুদ্ধ :

কতকগুলি শব্দের উভয় প্রকার বানানই শুদ্ধ। পরীক্ষকগণের অনেকেই কেবলমাত্র এক প্রকার বানানের সহিত পরিচিত বলিয়া তাঁহারা অন্য প্রকার বানানকে অশুদ্ধ মনে করিয়া কাটেন। ইহাতে বিচারকের অপরাধে নিরপরাধের দণ্ড হয়। শব্দগুলির উভয় প্রকার বানানই প্রদত্ত হইল :

অঙ্গুলি—অঙ্গুলী। অটবী—অটবি। অনুস্বর—অনুস্বার। অনুষ্টুপ—অনুষ্টুভ। অন্তরীক্ষ—অন্তরিক্ষ। অবনী—অবনি। অরণি—অরণী। অলি—অলী। আতস—আতশ। ইন্দীবর—ইন্দিবর। উষা—ঊষা। কপাট—কবাট। কটি—কটী। কলসী—কলসি। কস্তুরী—কস্তূরা। কিশলয়—কিসলয়। কাকলি—কাকলী। কুটির—কুটীর। কুসীদ—কুসীদ। কেশর—কেসর। কৃমি—ক্রিমি। কৈকেয়ী—কেকয়ী। কোটি—কোটী। কৌশল্যা—কৌসল্যা। ক্ষুর—খুর। গণ্ডি—গণ্ডী। গাগরি—গাগরী। গাণ্ডিব—গাণ্ডীব। চর্বি—চর্বী। চিৎকার—চীৎকার। ঝিল্লী—ঝিল্লি। তরণী—তরণি। তরী—তরি। তনু—তনূ। ত্রুটি—ত্রুটী। দম্পতি—দম্পতী। দেবকী—দৈবকী। ধরণী—ধরণি। ধূলি—ধূলী। ননি—ননী। নিহার—

নীহার। নিমিষ—নিমেষ। নিস্পন্দ—নিষ্পন্দ। পাটীগণিত—পাটিগণিত। পেশী—পেশিল প্রতিকার—প্রতীকার। প্রত্যুষ—প্রত্যূষ। পরীক্ষিৎ—পরিক্ষিৎ। পল্লী—পল্লি। প্রণালী—প্রণালি। পরিবেষণ—পরিবেশন। পদবী—পদবি। পূরবী—পূরবী। বীথি—বীথী। বেণী—বেণি। দেবী—দেবি। বল্লরী—বল্লরি। বাড়ি—বাড়ী। বিকশিত—বিকসিত। বিশদ—বিষদ। ব্যতিহার—ব্যতীহার। বশিষ্ঠ—বসিষ্ঠ। বেশি—বেশী। ভূমি—ভূমী। ভেরী—ভেরি। ভূশণ্ডি—ভূষণ্ডি। ভ্রূকুটি—ভ্রূকুটি। ভঙ্গি—ভঙ্গী। মহামারী—মহামারি। মহী—মহি। মঞ্জুষা—মঞ্জুষা। মঞ্জরি—মঞ্জরী। মাণিক—মানিক। মিলন—মেলন। মালিশ—মালিস। মামুলী—মামুলী। মাদুলি—মাদুলী। মাঝি—মাঝী। মাক্ষিক—মাক্ষীক। মহৌষধি—মহৌষধী। মহার্ঘ—মহার্ঘ্য। লহরী—লহরি। লিখন—লেখন। শচী—শচি। শম্বুক—শম্বুক। শাড়ী—শাড়ি। শিষ—শীষ। শেফালি—শেফালী। শিপ্রা—সিপ্রা। শাল্মলী—শাল্মলি। শ্রেণী—শ্রেণি। শূর্পনখা—সূর্পনখা। সরণী—সরণি। সরযূ—সরযু। সর—শর। সীকর—শীকর। সিঁড়ি—সিঁড়ী। সিঙ্গাড়া—শিঙ্গাড়া। সূচী—সূচি। স্বাতী—স্বাতি। সুরী—সুরি। সৈরিন্ধ্রী—সৈরন্ধ্রী। সুরভি—সুরভী। স্বয়ম্ভু—স্বয়ম্ভূ। হনুমান—হনূমান। হাতী—হাতি। হাম্বির—হাম্বীর। হার্দ—হার্দ্য।

● অশুদ্ধ, কিন্তু বহু-প্রচলিত শব্দ :

কতকগুলি শব্দ আছে, যেগুলি ব্যাকরণের বিচারে অশুদ্ধ; কিন্তু তাহারা বহু-প্রচলিত। ভাষা সব সময় ব্যাকরণের শাসন মানিয়া চলে না। সেইরূপ কিছুসংখ্যক শব্দ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

অতিথিশালা। অর্ধাঙ্গিনী। অর্ধেক। অনাথিনী। অন্তঃশীলা। অশ্রুজল। আদ্যোপান্ত। আবশ্যকীয়। আভ্যন্তরীণ। আহরিত। ইতিপূর্বে। ইতিমধ্যে। ইচ্ছিত। উদাসিনী। উদ্গীরণ। উপরন্তু। উপরোক্ত। একত্র। এদেশীয়। এ জাতীয়। করিতকর্মা। কান্না। কিম্বা। কৃষক। কেবলমাত্র। খোদিত। গণতান্ত্রিক। গুঞ্জরিত। গোপিনী। চণ্ডীদাস। চক্ষুলজ্জা। চক্ষুরোগ। চক্ষুজল। চক্ষুস্থির। চক্ষুদান। চক্ষুরত্ন। চক্ষুদ্বয়। চমকিত। চলৎশক্তি। চাতকিনী। চাকচিক্য। ছাত্রী। জর্জরিত। তৎকালীন। তথাচ। ত্রিনয়নী। দিগম্বরী। ধার্য। নমিত। নিরলস। সিন্দুক। নিরাশা। নির্জলা উপবাস। নির্দোষী। নির্বিরোধী। তটিনী। নিশি। নিঃশেষিত। নিশ্চয়তা। নির্ভরতা। পাশ্চাত্য। পাশবিক। প্রাকৃতিক। পৈশাচিক। প্রত্নতাত্ত্বিক। প্রবহমান। পদভ্রষ্ট। পার্বত্য। বহুরূপী। বয়স্ক। বনানী। বরযাত্রী। বাহ্যিক। বিতাড়িত। বিধর্মী। বিশেষত্ব। বিধাতা-পুরুষ। ভবদীয়। ভয়ংকরী। ভ্রাতৃবধূ। মনান্তর। মনোচোর। মানসিক। মহাত্মাগণ। মহারাণী। মহাশয়। মুখরিত। মৌন। মৌনতা। যুবাপুরুষ। রক্ষয়িত্রী। রজকিনী। রাজনৈতিক। রূপসী। শরৎচন্দ্র। শতবার্ষিক। শারীরিক। শিরোনামা। শিরোপরি। শ্বেতাঙ্গিনী। শ্রেষ্ঠতর। শ্রেষ্ঠতম। সক্ষম। সর্পিনী। সম্ভব। সত্তা। সঠিক। সকাতরে। সকৃতজ্ঞ। সচকিত। সলজ্জিত। সশঙ্কিত। সমসাময়িক। সাবধানী।

সাক্ষী দেওয়া। সাধ্যান্তীত। সাধ্যায়ত্ত। সাচ্ছল্য। সিংহিনী। সিঞ্চন। সিঞ্চিত। সুস্তিত। সুকেশিনী। সুড়ঙ্গ। সৃজন। সেবিকা। স্বচক্ষে। স্বজন। স্বত্বাধিকারী। হস্তারক। হেমাঙ্গিনী।

"সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী অশুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইলেও, ইহাদের আর কোনক্রমেই পরিহার করা যায় না এবং সেইজন্য বাঙ্গালা ব্যাকরণের দ্বারা ইহাদের সমর্থন করা হইয়াছে।" —সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান

• বিশ্ববিদ্যালয়-প্রবর্তিত বাংলা বানানের সংক্ষিপ্ত নিয়ম ঃ

এক. রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব বর্জন ঃ রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হইবে না। যেমন, কর্জ, ধর্ম, সর্ব, গর্ব, অর্চনা, মূর্ছা, অর্জুন, কর্তা, কার্তিক, কর্দম ইত্যাদি। এই নিয়ম তৎসম শব্দের ন্যায় তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যেমন ঃ মর্ম, শর্ত, পর্দা, সর্দার, চর্বি, ফর্দা, জার্মানী, আর্মানি, বর্তমান ইত্যাদি।

দুই. সন্ধিতে ঙ স্থানে বিকল্পে অনুস্বার ঃ ক, খ, গ ও ঘ পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত ম্-স্থানে 'ঙ' বা বিকল্পে অনুস্বার হয়। যেমন, অহঙ্কার [অহংকার], ভয়ঙ্কর [ভয়ংকর], শুভঙ্কর [শুভংকর], সঙ্খ্যা [সংখ্যা], সঙ্গম [সংগম], হৃদয়ঙ্গম [হৃদয়ংগম], সঙ্ঘটন [সংঘটন], সঙ্কলন [সংকলন], সঙ্কল্প [সংকল্প] ইত্যাদি।

উল্লিখিত বিধির অপপ্রয়োগ ঃ মনে রাখিতে হইবে যে, কেবলমাত্র ক, খ গ, ঘ পরে থাকিলে এবং ম আগে থাকিলেই [ং] অনুস্বার হয় না। ঐ 'ম্' পদের অন্তস্থিত 'ম্' হওয়া চাই। নচেৎ অনুস্বারের [ং] ব্যবহার অশুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইবে। যেমন, অহম্ [পদের অন্তস্থিত 'ম্'] + কার = অহংকার ; শুভম্ [পদের অন্তস্থিত 'ম্'] + কার = শুভংকর ; সম্ [পদের অন্তস্থিত 'ম্'] + কলন = সংকলন হৃদয়ম্ [পদের অন্তস্থিত 'ম্'] + গম = হৃদয়ংগম ইত্যাদি। কিন্তু বঙ্কিম, অঙ্ক, পঙ্ক, শঙ্খ ভঙ্গ, বঙ্গ, ব্যাঙ্গ, ভঙ্গি, মঙ্গল, ইঙ্গিত, কঙ্কাল, পঙ্গপাল, রঙ্গমঞ্চ, লঙ্ঘন, শঙ্কা আকাঙ্ক্ষা, গঙ্গা, গঙ্গোপাধ্যায়, পঙ্কিল, কলিঙ্গ, ভঙ্গুর, অঙ্গার, লবঙ্গ, অঙ্গ, ভঙ্গ, সঙ্ঘ, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী।

তিন. ঙ ও অনুস্বারের ভিন্নতর প্রয়োগ ঃ বাঙ্গলা, বাঙ্গালা, বাঙ্গালী, ভাঙ্গন প্রভৃতি শব্দের বাংলা, বাঙলা, বাঙালী, ভাঙন প্রভৃতি উভয় প্রকার বানানই শুদ্ধ। হসন্ত ধ্বনি হইলে বিকল্পে ং ও ঙ—দুই-ই হয়। যেমন, রং [রঙ], সং [সঙ], বাংলা [বাঙলা] ইত্যাদি। তবে স্বরাশ্রিত হইলে একমাত্র 'ঙ' ব্যবহারই বিধেয়। যেমন, রঙের, বাঙালী, ভাঙন ইত্যাদি।

চার. হস্ চিহ্নের প্রয়োগ ঃ অ-কারান্ত হইলেও তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দের শেষে সাধারণতঃ হস্ চিহ্নের ব্যবহার নিষ্প্রয়োজন। যেমন ঃ কাক, বক, মানুষ, কান, নাক, হাত, ওস্তাদ, তছনছ, পকেট, ডিশ, জজ, চেক, করেন, করিলেন, করিস ইত্যাদি। অবশ্য হসন্ত উচ্চারণ অভীষ্ট হইলে হস্ চিহ্ন ব্যবহার্য। যেমন ঃ শাহ্

তখ্‌ত্‌, জেবল্‌, জোন্‌স্‌, বণ্‌ ইত্যাদি। কিন্তু মধ্য-বর্ণে প্রয়োজন হইলে হস্‌ চিহ্ন অবশ্যই প্রযোজ্য। যেমন: উল্‌কি, ফুল্‌কি, চুট্‌কি, খট্‌কা ইত্যাদি। আবার, উচ্চারণ অত্যন্ত হ্রস্ব হইলে শব্দ-শেষে হস্‌-চিহ্নের ব্যবহার শুদ্ধ। যেমন, কট্‌মট্‌, কট্‌কট্‌, পট্‌পট্‌, খট্‌খট্‌ ইত্যাদি।

পাঁচ. ই ঈ-এর শুদ্ধ প্রয়োগ: মূল সংস্কৃত শব্দে ঈ থাকিলে তদ্ভব বা তৎসদৃশ শব্দে ঈ বা ই বিকল্পে হয়। যেমন, কুমীর [কুমির], পাখী [পাখি], বাড়ী [বাড়ি], শীষ [শিষ], কুটির [কুটীর] ইত্যাদি। কিন্তু কতকগুলি শব্দে কেবল 'ই' হয়। যেমন: খিল, পানি, কলি, গলি, খলি ইত্যাদি। আবার, কতকগুলি শব্দে কেবল 'ঈ' হয়। যেমন: কীল, পানীয়, স্থলী, নীলা, হীরা, দীপ, পীড় ইত্যাদি।

স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের অন্তে এবং ব্যক্তি, জাতি, ভাষা ও বিশেষণবাচক শব্দের অন্তে 'ঈ' হইবে। যেমন: বাঘিনী, চণ্ডালী, হস্তিনী, হরিণী, কাবুলী, কেরানী, ঢাকী, বরিশালী, ইংরেজী, বিলাতী, দামী, রেশমী ইত্যাদি। কিন্তু কতকগুলি শব্দে 'ই' হইয়া থাকে। যেমন: ঝি, দিদি, বিবি, কচি, মিহি, মাঝারি, চলতি ইত্যাদি। অবশ্য 'পিসী' স্থানে বিকল্পে 'পিসি' এবং 'মাসী' স্থানে বিকল্পে 'মাসি' লেখা চলিবে। অন্যত্র মনুষ্যেতর জীব, বস্তু, গুণ, ভাব ও কর্মবাচক শব্দের অন্তে এবং দ্বিরাবৃত্ত শব্দের অন্তে কেবল 'ই' হইবে। যেমন: বাজি, বেঙাচি, কাঠি, সুজি, চুরি, কেরামতি, পাগলামি, বাবুগিরি, তাড়াতাড়ি, ধরাধরি, সরাসরি, সোজাসুজি, ইত্যাদি।

ছয়. উ ঊ-র শুদ্ধ প্রয়োগ: মূল সংস্কৃত শব্দে 'ঊ' থাকিলে তদ্ভব বা তৎসদৃশ শব্দে 'উ' বা বিকল্পে 'ঊ' হয়। যেমন: উনিশ [ঊনিশ], উষা, [ঊষা], চুন [চূন], পুব [পূব] ইত্যাদি। কতকগুলি শব্দে কেবলমাত্র 'ঊ' হয়। যেমন: চূল, তাড়ু, ভুয়া ইত্যাদি।

সাত. ও-কার ও ঊর্ধ্ব-কমার প্রয়োগ: সুপ্রচলিত শব্দের উচ্চারণ, উৎপত্তি বা অর্থের ভেদ বুঝাইবার জন্য অতিরিক্ত ও-কার, ঊর্ধ্ব-কমা বা অন্য চিহ্ন যোগ বর্জনীয়। যদি অর্থ-গ্রহণে বাধা হয়, তবে কয়েকটি শব্দে অন্ত্য অক্ষরে ও-কার এবং আদ্য বা মধ্য অক্ষরে ঊর্ধ্ব-কমা বিকল্প দেওয়া যাইতে পারে। যেমন, কাল [কালো], ভাল [ভালো], মত [মতো], পড়ো [প'ড়ো] ইত্যাদি।

এত, কত, যত, তত ; তো, হয় তো ; কাল [সময়, কল্য], চাল [চাউল, চাল, গতি], ডাল [ডাইল, শাখা]—এইরূপ একই প্রকার বানান বিধেয়।

আট. জ ও য-র ব্যবহার: কাজ, জাউ, জাঁতা, জাতি, জুঁই, জুত, জো, জোড়, জোড়া, জোত, জোয়াল—এই সকল শব্দে 'য' না লিখিয়া, 'জ' লেখাই বিধেয়।

নয় ণ ও ন-র ব্যবহার: অ-সংস্কৃত শব্দে কেবল 'ন' ব্যবহার করাই বিধেয়। যেমন: কান, সোনা, বামুন, কোরান, করোনার। কিন্তু যুক্তাক্ষর ণ্ট, ণ্ঠ, ণ্ড, ণ্ঢ ব্যবহৃত হওয়া উচিত। যেমন: ঘণ্টি, লুণ্ঠন, ঠাণ্ডা ইত্যাদি।

দশ. শ, ষ ও স-র ব্যবহার: মূল সংস্কৃত শব্দে শ, ষ ও স থাকিলে তদ্ভব

শব্দেও শ, ষ বা স হইবে। যেমন : অংশু>আঁশ, আমিষ>আঁষ, শস্য>শাঁস, —মশা, পিতৃষ্বসা—পিসী। ব্যতিক্রম : মনুষ্য—মিনসে, শ্রাদ্ধ—সাধ ইত্যাদি

বিদেশী শব্দের উচ্চারণ অনুসারে s-স্থানে 'স' এবং sh-স্থানে 'শ' হইবে। যেমন : আসল, ক্লাস, গ্লাস, জিনিস, পুলিস, পেন্‌সিল, সাদা, সবুজ, খুশি, শহর, তামাশা, পশম, পোশাক, পালিশ, শখ, সৌখিন, শেক্‌সপিয়র।

- **বাক্যাংশের শুদ্ধি অশুদ্ধি [বন্ধনী চিহ্নের মধ্যবর্তী রূপটিই শুদ্ধ]**

আতিথ্য সংকার [অতিথি সংকার]। আবশ্যক নাই [আবশ্যকতা নাই]। আরোগ্য হইলাম [আরোগ্য লাভ করিলাম বা নীরোগ হইলাম]। অসম্ভব জিদ [অসংগত বা উৎকট জিদ]। অন্তর্ধান হইলেন [অন্তর্ধান করিলেন বা অন্তর্হিত হইলেন]। আপ্রাণ চেষ্টা [প্রাণপণ চেষ্টা]। অজস্র ব্যক্তি [অগণিত ব্যক্তি]। অস্বাভাবিক জাতিভেদ [কৃত্রিম জাতিভেদ]। অনুক্ত স্থান [অনুক্ত পদ]। প্রবেশ নিষেধ [প্রবেশ নিষিদ্ধ]। আলোচ্য গদ্যাংশ [আলোচ্যমান গদ্যাংশ]। অজীর্ণতা [অজীর্ণ রোগ]। অপমান হইবার ভয় [অপমানিত হইবার ভয়]। দেবতার উদ্দেশ্যে [দেবতার উদ্দেশে]। গৌরব লোপ হইয়াছে [গৌরব লুপ্ত হইয়াছে বা লোপ পাইয়াছে]। করা কর্তব্য [করা উচিত]। কৃতকার্যতার সহিত [কৃতিত্বের সহিত]। জীবন সংশয় [জীবন সংশয়াপন্ন]। দরিদ্রদের অত্যাচার করা [দরিদ্রদের উপর অত্যাচার করা]। কারো ধারি না [কারুর ধার ধারি না।]। ওর কথা বিশ্বাস করি না [ওর কথায় বিশ্বাস করি না]। রাত্রি অবসান হইল [রাত্রির অবসান হইল]। বিশুদ্ধ হিন্দুর হোটেল [হিন্দুর বিশুদ্ধ হোটেল]। বাঙ্গালী পাঁঠার দোকান [বাঙ্গালীর পাঁঠার দোকান]। সোনার হাল ফ্যাসানের গয়না [হাল ফ্যাসানের সোনার গয়না]। শোকানলে মগ্ন [শোক-সাগরে মগ্ন]। জীবনস্রোত, দ্রুতপদে ছুটিল [জীবনস্রোত দ্রুতবেগে ছুটিল]। তার সাথে ঝগড়া [তার সঙ্গে ঝগড়া]। মুদি দোকান [মুদির দোকান]। মুগ ডাল [মুগের ডাল]। মামাবাড়ি [মামার বাড়ি]। হরিলুট [হরির লুট]। ছোটদের মহাভারত [ছেলেদের মহাভারত]। ছোটবেলার কথা [ছেলেবেলার কথা]। পূজার বন্ধ [পূজার ছুটি]। নামজাদা লেখক [নামকরা লেখক]। লালপেড়ে শাড়ি [লালপাড় শাড়ি]। পুষ্পের সুরভি [পুষ্পের সৌরভ]। ভয়ংকর ক্ষুধা [অত্যন্ত ক্ষুধা]। ভীষণ ঘুম [খুব বেশী ঘুম]। আরম্ভ হইল [আরব্ধ হইল]। শেষ হইল [সমাপ্ত হইল]। উদয় হইল [উদিত হইল]। গোপন কথা [গোপনীয় কথা]। বিস্তর দেনা [অনেক দেনা]। সম্ভব নয় [সম্ভবপর নয়]। মৌন হইয়া রহিলেন [মৌনী হইয়া রহিলেন]। তদ্দৃষ্টে [তদ্দর্শনে]। আশ্চর্য হইল [আশ্চর্যান্বিত হইল]। সাবকাশ নাই [অবকাশ নাই]। সাক্ষী দিয়াছ [সাক্ষ্য দিয়াছে]। প্রমাণ হইয়াছে [প্রমাণিত হইয়াছে]। সঙ্কট অবস্থা [সঙ্কটাপন্ন অবস্থা]। রণ-কুশলী [রণ-কুশল]। সাংঘাতিক ভোজন [প্রচুর ভোজন]। সাংসারিক বুদ্ধি [সংসার-

বৃদ্ধি]। সাহায্য-কৃত বিদ্যালয় [সাহায্য-প্রাপ্ত বিদ্যালয়]। সময় সংক্ষেপ [সময় সংক্ষিপ্ত]। হওয়া কর্তব্য [হওয়া উচিত]। নাটক অভিনয় হইবে [নাটকের অভিনয় হইবে বা নাটক অভিনীত হইবে]। একত্রে গমন [একত্র গমন]। অত্র স্থানের [এই স্থানের বা অত্র স্থানে]। সকল লোকেরাই [সকল লোকই বা লোকেরা সকলেই]। বুদ্ধিমতী মহিলাগণ [বুদ্ধিমতী মহিলারা]। নানাবিধ পক্ষীগণ [নানাবিধ পক্ষী]। প্রায় পাঁচ সহস্র ছাত্রবৃন্দ [প্রায় পাঁচ সহস্র ছাত্র]। কানন-প্রাঙ্গণ [কুটির প্রাঙ্গণ]। আবাল্য হইতেই [বাল্যকাল হইতেই]। সযত্নপূর্বক [যত্নপূর্বক বা সযত্নে]।

চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার-জনিত অশুদ্ধি :

কাঁটা—কণ্টক। কাটা—ছেদন করা। বাঁধা—বন্ধন। বাধা—বিঘ্ন। গাঁথা—গ্রথিত করা। গাথা—কাব্য-কাহিনী। পাঁজি—পঞ্জিকা। পাজি—দুষ্ট প্রকৃতির। পাঁক—কর্দম। পাক—বন্ধন। কাঁদা—ক্রন্দন। কাদা—কর্দম। হাঁস—হংস। হাস—হাস্য। দাঁও—সুযোগ। দাও—দা-ধাতুর মধ্যম পুরুষের বর্তমানকালের অনুজ্ঞা। ছাঁদ—ছন্দ। ছাদ—গৃহের উপরিভাগ। চাঁই—নেতা [মন্দার্থে]। চাই—চাহ্ ধাতুর উত্তম পুরুষের বর্তমান। তাঁহার [তাঁর]—সম্মান-যোগ্য ব্যক্তি। তাহার [তার]—সম্মানের অযোগ্য ব্যক্তি।

। অনুসরণী ।

*১. নিম্নলিখিত প্রয়োগগুলি শুদ্ধ কি অশুদ্ধ, কারণ দেখাইয়া বিচার কর : ক. নিরপরাধিনী। সাম্রাজ্ঞী। রুচিবান। উৎকর্ষতা। প্রাঙ্গন। বিদ্যুত্যালোক। সত্ত্ব। প্রতিযোগীতা উ. মা. '৫১। খ. সর্ব সত্ত্ব সংরক্ষিত। প্রাক-রবীন্দ্র। ১৯৫৪ সালের হইবার আইনানুসারে। গুণীগণ। তড়িতাহত। শিরোশোভা। গায়কী। বঙ্গদেশ। উ. মা. '৬২। গ. মহিমামণ্ডিত। ব্রহ্মাস্পদ। নিরভিমানিনী। দুরাবস্থা। সসজ্জিত। মস্থত। সাবধানী। বৈক্ততা। উ. মা. [কম্পার্ট.] '৬২। ঘ. কুরঙ্গিনী। শ্রীমদ্ভাগবদগীতা। মুকুতিদায়িনী। মাতৃবৃন্দ। জগদীন্দ্র। অজ্ঞানতা। এতদ্‌সত্ত্বেও। ছন্দোকুণ্ডলী। দোষস্খালন। উ. মা. '৬৩। ঙ. লজ্জাণীয়। সত্ত্বা। ভৌগলিক। নিন্দানন্দী। ঐক্যমত। ব্রহ্মাস্পদায়। মন্মোহন। নিষ্করতা। বৈশিষ্ট্য। উ. মা. '৬৪। চ. দুরাবস্থা। ব্যবহার। জ্যোতিরত্ন। রোগগ্রস্থ। সবিনয়পূর্বক। লজ্জাণীয়। সমভ্রান্তশীল। প্রসারতা। উ. মা. '৬৫। ছ. তেজচন্দ্র। ব্যাখ্যা। মুখস্থ। লজ্জাণীয়। বিপদপাত। মহাশয় [ব্যক্তি]। আশীষ। উ. মা. '৬৭। জ. গোলকনাথ। আয়ত্ব। বিপদগ্রস্থ। বিদ্বান। কলুষতা। কথোপোকথন। বাল্মীকি। গুঞ্জন। উ. মা. '৬৮। ঝ. লক্ষ্মী। স্বরস্বতী। মুমুষু। আশীষ। শিরমণি। সুস্বপ্ন। বাহুল্যতা। উ. মা. '৬৯। ঞ. মুহুর্ত। ফাল্গুণ। মধ্যস্ত। প্রাসঙ্গিক। পর্যাটন। উ. মা. '৭০। ট. অনাটন। দাশরথী। নিরস। মুহূর্ত। রামায়ন। পক্ক। কচিৎ। চর্বচোষ্য। অধীনস্ত। আকণ্ঠ। পদস্থ। উ. মা. [কম্পার্ট.] '৭০।

*২. শুদ্ধ কি অশুদ্ধ, তাহা কারণ দেখাইয়া বল : ক. সর্বাঙ্গীন। পরিষ্কার। স্বায়ীত্ব। মহত্ব। একত্রাবস্থান। ঐক্যমত্য। নিঃস্বার্থপর। সাপেক্ষ্যা। প্রজ্জ্বলিত। সমৃদ্ধশালী। মাধুরিমা। মা. '৫২। খ. উৎকর্ষতা। আবশ্যকীয়। কল্যাণীয়াষু। মনযোগ। নিরপরাধী। অনুবাদিত। মহত্ব। মৃন্ময়। অপরাহ্ন। অচিন্তানীয়। ম. '৫৫। গ. পৌরোহিত্য। লজ্জাস্কর। দুরাবস্থা। জ্ঞানীগণ। বর্তমান। বাহুল্যতা। আকাংখা। ব্যাবহার। মা. '৫৭। ঘ. নিরপরাধী। কল্যাণীয়াষু। অপকর্ষতা। ভৌগলিক। মনযোগ। মহত্ব। মুহ্যমান। মা. '৬১। অপকর্ষতা। আবশ্যকীয়। মনযোগ। নিরপরাধী। মহত্ব। মুহ্যমান। অপরাহ্ন। কল্যাণীয়াষু। ভৌগলিক। মা. [কম্পার্ট.]। '৬১। ঙ. ভৌগলিক। অচিন্তানীয়। পূর্বাহ্ন। প্রতিদ্বন্দ্বীতা। মনোকষ্ট। পুরস্কৃত। ভুলভ্রান্তী। মা.

অশুদ্ধি সংশোধন

[কম্পার্ট.] '৬৩। ছ. দুরাবস্থা। আবরিত। সকৃতজ্ঞ। আরতী। ব্যাখ্যা। আগতকল্য। লক্ষ্মীর। বিপদগ্রস্থ। পৌরহিত্য। মা. '৬৯। জ. ঐক্যমত। ভৌগলিক। নিশ্চয়তা। আকাঙ্খা। বর্জণ। দুষ্পাচ্য। উচ্ছ্বাসিত। সবিনয়পূর্বক। মা. '৬৬। সুরুচিবান্। আবির্ভাব। ভূম্যাধিকারী। মুহুর্মুহু। স্খলন। উপস্থিত। লক্ষ্মীর। বিদুষী। সত্ত্বা। মা '৭৩। প্রেসকুপশান। ওয়ার্ডবার্থ। বৃটেন।

*৩. উদ্ধৃতাংশগুলির ভুল সংশোধন কর: ক. যে বাঙালীত্ব নিয়ে আমরা অহরাত্রি আস্ফালন করিয়া থাকি তাহাও অতি ছোট ও শীর্ণ চেহারা ধারণ করে। এই চতুঃপার্শ্বের ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ধবলগিরির ন্যায় শীর্ষ তুলিয়া দাঁড়িয়ে থাকে। ড মা. '৬১। খ. নন্দাদেবীর শিরপরি এক অতি বৃহৎ ভাস্কর জ্যোতিঃ বিরাজ করিতেছে, তাহা একান্ত দুর্নিরিক্ষ। সেই জ্যাতিপুঞ্জ হইতে নির্গলিত ধুম্ররাশি দিক-দিগন্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে। এবে এই কি মহাদেবের জটা? এই জন্য পৃথিবীরূপী নন্দাদেবীকে চন্দ্রাতপের ন্যায় আভরণ করিয়া রাখিয়াছে। উ. মা [কম্পার্ট] '৬১। গ. [১] খন্ড গলাধকরণ করাই প্রাণীদেহের পক্ষে পরম প্রাপ্তি নয়। [২] গণতন্ত্রশাসনে রাজার এবানীন্তন অনুকল্প সমগ্র জাতির উদ্দেশ্যেই এই শাশ্বতী ভ গবতী উক্তি প্রযুক্ত। [৩] আবাল্য হইতেই নদীর সহিত আমার সখ্যতা। [৪] সযত্নপূর্বক অধ্যায়ন না করিলে পর্যাপ্ত উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ড. মা '৬১। ঘ. একথ সত্য যে আমাদের বহু কুসংস্কার আছে। সমাজদেহে ইহাদের কদর্থ অবস্থিতি। এইগুলিকে কাটিয়া বাদ দিতে হইবে, অবশ্য তাহাতে জাতীয় প্রাণশক্তি, ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা নষ্ট হইবে না। আসলে ধর্মের মূল তত্ত্বগুলি এখনও অক্ষতই রহিয়াছে এবং যতই তাহাদের ঐ অবাঞ্ছিত কলঙ্ক কালিমা বিদুরিত হইবে, ততই এই তত্ত্বগুলি প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। মা '৫৮।

৪ ক নিম্নোক্ত শব্দযুগ্মগুলির মধ্য হইতে শুদ্ধরূপটি লিখ: উৎকর্ষতা; উৎকর্ষ। সহনীল, সহনশীল। শয়নানন্তর, শয়নান্তর নম্রশীল নম্রশীলী। ঐকমত্য, ঐকামত্য। ভৌগলিক, ভৌগোলিক। আয়ত্ত, আয়ত্ত্ব। উ. মা [কম্পার্ট] '৬৯। খ 'নয়মুদ্রিত' শব্দগুলির শুদ্ধরূপ লিখ: অনুমত্যানুসারে। দুরাদৃষ্ট। পাঙ্গন। চিন্ময় চাক্ষুষ। প্রজ্জ্বলিত। দিগেন্দ্র। আদ্যাক্ষর। মহারাজা। পথমধ্যে। উ মা কম্পার্ট] '৭২।

৫. পত্রগুলি শুদ্ধ করিয়া লিখ:

ক স্নেহের জ্যোতীশ,

তোমার পত্র পাইয়াছি। তোমার পিতৃদেবের স্বাস্থ ভাল থাকিতেছে না। এবং বিশেষ শুশ্রুষা প্রয়োজন লিখিয়াছ। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে যে শোকানল প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছে তাহাতে বাহিরের চিকিৎসায় আরগ্য লাভ করিবেন কি? আশা করি তোমার নবজাত শিশুটি ভাল আছে।

আশীর্বাদক—
শ্রীফণীভূষণ দে,
মা. '৫৪

খ ক্ষমা,

ভগবানের কৃপায় তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ, এই সংবাদে আনন্দিত হইলাম। তোমার জননী দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগিতেছেন জানিয়া দুঃখিত হইয়াছি। তাহার যথাযোগ্য সেবাশুশ্রূষা করিবে। তোমার শারীরীক কুশল কামনা করি।

ইতি
নিত্যশুভার্থী
শ্রীমধুসুদন বন্দোপাধ্যায়

• পাঠ্য-গ্রন্থের ব্যাকরণ-পাঠের নির্দেশ •

তৎ — তৎপুরুষ

কর্মধা — কর্মধারয়

মধ্যপ-কর্মধা — মধ্যপদলোপী কর্মধারয়

বহুব্রী — বহুব্রীহি

মধ্যপ-বহুব্রী — মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি

কর্তৃবা — কর্তৃবাচ্য

কর্মবা — কর্মবাচ্য

করণবা — করণবাচ্য

সম্প্রদানবা — সম্প্রদানবাচ্য

অপাদানবা — অপাদানবাচ্য

অধিকরণবা — অধিকরণবাচ্য

ভাববা — ভাববাচ্য

বি. দ্র. : পরীক্ষার উত্তর-পত্রে ডানদিকের মতো সম্পূর্ণ পদটিই লেখা উচিত।

পাঠ্য-গ্রন্থের ব্যাকরণ

মাধ্যমিক পরীক্ষা, ১৯৭৮

• নবম শ্রেণী •

পাঠ-সংকলন ॥ প্রথম খণ্ড ॥ ষষ্ঠ সংস্করণ

গদ্যাংশ

১. সমুদ্র-পথে
২. ভানুসিংহের পত্র
৩. লুই পাস্তুর
৪. মেজদা
৫. অচেনার আনন্দ

পদ্যাংশ

১. শ্রীরামের অত্রিমুনির আশ্রম গমন
২. মধ্যাহ্নে
৩. পুরাতন ভৃত্য
৪. ত্রিরত্ন
৫. হাট

• দশম শ্রেণী •

পাঠ-সংকলন ॥ প্রথম খণ্ড ॥ ষষ্ঠ সংস্করণ

গদ্যাংশ

১. হিমালয়-ভ্রমণ
২. সাগরসঙ্গমে নবকুমার
৩. আশ্রমের রূপ ও বিকাশ
৪. বাপ্পাদিত্য
৫. ভারতবর্ষ

পদ্যাংশ

১. দুর্যোধনের প্রতি ধৃতরাষ্ট্র
২. ইন্দ্রজিতের যজ্ঞগৃহে লক্ষ্মণ
৩. ধূলামন্দির
৪. কালবৈশাখী
৫. কাণ্ডারী হুঁশিয়ার

নবম শ্রেণী

পাঠ-সংকলন

প্রথম খণ্ড

। পদ্যাংশ ।

॥ সমুদ্রপথে ॥

সন্ধি ॥ দ্বীপ = দ্বি + ঈপ। তথাপি = তথা + অপি। লাভালাভ = লাভ + অলাভ। চড়ন্দারেরা = চড়ন + দারেরা। পর্যন্ত = পরি + অন্ত। গলদ্ঘর্ম = গলৎ + ঘর্ম। সংগ্রহ = সম্ + গ্রহ। পুরস্কার = পুরঃ + কার। গঙ্গা = গম্ + গা।

কারক-বিভক্তি ॥ বালীদ্বীপে—অধিকরণে 'এ' বিভক্তি। সবজায়গাই—অধিকরণে শূন্যবিভক্তি। কাজকর্ম - কর্মে শূন্যবিভক্তি। চারি পাঁচ মাস—অধিকরণে শূন্যবিভক্তি। জিনিস—কর্মে শূন্যবিভক্তি। মেঘের পয়েই—করণে 'এ' বিভক্তি। নানা জিনিস—কর্মে শূন্যবিভক্তি। সুখেই—অধিকরণে 'এ' বিভক্তি। সাতগাঁ—অধিকরণে শূন্যবিভক্তি। হাল কর্মে শূন্যবিভক্তি। হুকুমে - করণে 'এ' বিভক্তি। বাতাসে—করণে 'এ' বিভক্তি। দোষে—করণে 'এ' বিভক্তি। জায়গায়—অধিকরণে 'য়' বিভক্তি। ঝাপটা - করণে 'দিয়া' বিভক্তি। সেঁউতি—কর্মে শূন্যবিভক্তি। কষ্টের—করণে 'এর' বিভক্তি। দর্পণের - কর্ম-প্রবচনীয়যোগে 'এর' বিভক্তি।

সমাস ॥ বালীদ্বীপে - দ্বি [দুইদিকে] অপ্ [জল] যাহার—বহুব্রী ; বালী নামক দ্বীপ—মধ্যপ-কর্মধ, তাহাতে। কাজকর্ম—কাজ ও কর্ম—দ্বন্দ্ব। বাহাল-বরখাস্ত—বহাল ও বরখাস্ত - দ্বন্দ্ব। সাতগাঁ—সাত গাঁয়ের সমাহার—দ্বিগু। অদৃষ্টে—নয় দৃষ্ট—নঞ্তৎ, তাহাতে। দত্ত-মহাশয়—যিনি দত্ত, তিনিই মহাশয়—কর্মধা। নড়াচড়া—নড়া ও চড়া—দ্বন্দ্ব। ইষ্ট-দেবতার—ইষ্ট যে দেবতা—কর্মধা, তাহার। প্রাণপণে—প্রাণকে পণ - দ্বিতীয়াতৎ, তাহাতে। মাঝিমাল্লারা—মাঝি ও মাল্লা—দ্বন্দ্ব, তাহারা। নৌকারক্ষার—নৌকাকে রক্ষা—দ্বিতীয়াতৎ, তাহার। ঝড়-বৃষ্টির—ঝড় ও বৃষ্টি - দ্বন্দ্ব, তাহার। গলদ্ঘর্ম - গলৎ ঘর্ম যাহার—বহুব্রী। স্ত্রী-পুত্র—স্ত্রী ও পুত্র - দ্বন্দ্ব। ঝগড়া-বিবাদ—ঝগড়া ও বিবাদ—দ্বন্দ্ব। অজ্ঞান—নাই জ্ঞান যাহার—নঞ্-বহুব্রী। দাঁত-কপাটি - দাঁতের দ্বারা কপাটি—তৃতীয়াতৎ। স্ত্রী-পুরুষে—স্ত্রী ও পুরুষ—দ্বন্দ্ব, তাহাতে। বোনেবউ—বোনের বউ—ষষ্ঠী তৎ। যথাসর্বস্ব—সর্বস্বকে অতিক্রম না করিয়া—অব্যয়ীভাব। গর্জন-তেলের—গর্জনের (গর্জরসের) তেল—ষষ্ঠীতৎ; তাহার। উত্তর-পশ্চিম—উত্তর ও পশ্চিম—দ্বন্দ্ব।

প্রকৃতি-প্রত্যয় ॥ সমুদ্র—সম্-উন্দ্ + র [কর্তৃবা]। ব্যবসায়ের—বি-অব-সো + ঘঞ্ [ভাববা], তাহার। ফলাও—ফল + আও। লাভ—লভ্ + ঘঞ্ [ভাববা]। সংস্কার—সম্-কৃ + ঘঞ্ [ভাববা]। মন্দিরে—মন্দ্ + ইর [অধিকরণবা]

+এ। আনন্দ—আ-নন্দ্ + ঘঞ্ [ভাববা]। খেলুড়ি—খেল্ + উড়ি। স্নান—স্না + অনট্ [ভাববা]। আহ্লাদ—আ-হ্লাদ্ + ঘঞ্ [ভাববা]। দক্ষিণ—দক্ষ্ + ইন [কর্তৃবা]। সুবিধা—সু-বি-ধা + ঘঞ্ [ভাববা]+ আ। স্থির—স্থা + ইর [কর্তৃবা]। নড়া—নড়্ + আ। চড়া—চড়্ + আ। প্রমাদ—প্র-মদ্ + ঘঞ্ [ভাববা]। পাটনী—পাট + নী। শক্ত—শক্ + ক্ত [কর্তৃবা] গুটানো—গুট্ + আনো। নামানো—নাম্ + আনো। নৌকা—নৌ + ক + আ। গোঁয়ানি—গোঁ + আনি। বিপদ—বিপ-দ্ + ক্বিপ্ [ভাববা]। চড়ন্দার—চড়ন + দার। ইষ্টদেবতা—ইষ্ + ক্ত [কর্মবা] + দেব + তা [স্বার্থিক]। রক্ষা—রক্ষ্ + অঙ্ [ভাববা] + আ। মাঝি—মাঝ + ই। ভয়ানক—ভী + আনক। গলৎ—গল্ + শতৃ। নিশ্বাস—নি-শ্বস্ + ঘঞ্ [ভাববা]। সহ্য—সহ্ + ণ্যৎ। কপাটি—কপাট + ই। মূর্ছিত—মূর্চ্ছা + ইত। উপস্থিত—উপ স্থা + ক্ত [কর্তৃবা]। সুস্থ—সু-স্থা + ক। দর্পণ—দৃপ্ + অনট্ [কর্তৃবা]। বিশ্বাস—বি-শ্বস্ + ঘঞ্ [ভাববা]। পুরস্কার—পুরস্ + কৃ + ঘঞ্ [ভাববা]। স্বীকার—স্ব-অভূততদ্ভাবে চ্বি + কৃ + ঘঞ্ [ভাববা]। উপকার—উপ-কৃ + ঘঞ্ [ভাববা]। সন্ধ্যা—সম্-ধৈ + ঘঞ্ + আ। গঙ্গা—গম্ + গ [কর্তৃবা] + আ। মোহানা—মুহ [< মুখ] + আনা।

লিঙ্গান্তর ॥ মেয়ে—ছেলে। রাজা—রাণী। দত্ত-মহাশয়—দত্ত-জায়া। ইষ্টদেবতা—ইষ্টদেবী। বেটা—বেটী। স্ত্রী—স্বামী। পুত্র—কন্যা। পাগল—পাগলী, পাগলিনী। বেনে—বেনেবউ।

পদ-পরিবর্তন ॥ সমুদ্র (বি)—সামুদ্রিক (বিণ)। দেশ (বি)—দেশীয় (বিণ)। ব্যবসায় (বি)—ব্যবসায়ী (বিণ)। বদল (বি)—বদলী (বিণ)। সংস্কার (বি)—সংস্কৃত (বিণ)। লাভ (বি)—লুব্ধ (বিণ)। আদর (বি)—আদৃত (বিণ)। আনন্দ (বি)—আনন্দিত (বিণ)। স্নান (বি)—স্নাত (বিণ)। আহ্লাদ (বি)—আহ্লাদিত (বিণ)। স্থির (বিণ)—স্থৈর্য (বি)। বিপদ (বি)—বিপন্ন (বিণ)। সুস্থ (বিণ)—স্বাস্থ্য, সুস্থতা (বি)। জল (বি)—জলীয় (বিণ)। ফেনা (বি)—ফেনিল (বিণ)। দোষ (বি)—দুষ্ট (বিণ)। মূর্ছিত (বিণ)—মূর্ছা (বি)। স্ত্রী (বি)—স্ত্রৈণ (বিণ)। তেল (বি)—তেলা (বিণ)। পুরস্কার (বি)—পুরস্কৃত (বিণ)। স্বীকার (বি)—স্বীকৃত (বিণ)। বিশ্বাস (বি)—বিশ্বস্ত (বিণ)। নষ্ট (বিণ)—নাশ (বি)। উত্তর (বি)—উত্তরা (বিণ)। পশ্চিম (বি)—পশ্চিমা (বিণ)। উপকার (বি)—উপকৃত, উপকারী (বিণ)।

সার্থক বাক্যরচনা ॥ **তদারক**—সবই তো হলো, এখন কাজটা তদারক করবে কে? **বাহাল-বরখাস্ত**—নতুন বড়বাবু এসে কর্মচারীদের বাহাল-বরখাস্ত করে অফিসটাকে সম্পূর্ণ ঢেলে সাজালেন। **খেলুড়ি**—ছেলেবেলায় যে সব খেলুড়িদের সঙ্গে খেলতাম, তারা আজ সব কোথায় চলে গেছে। **ক্রমে ক্রমে**—জোয়ারের জল ক্রমে ক্রমে বাড়িতে লাগিল। **লাভালাভ**—ব্যবসায়ে লাভালাভ আছে। **অদৃষ্ট**—

মানুষের **অদৃষ্টে** কি আছে, তাহা শুধু অদৃষ্ট-দেবতাই জানেন। **ঝিস্‌ঝিসে—ঝিসঝিসে** কালো মেঘে আকাশ ঢাকা। **ঝড়-ঝাপ্‌টা**—জীবনে **ঝড়-ঝাপ্‌টা** আসে; তাতে তো আর ভেঙে পড়লে চলবে না। **চড়ন্দার**—নৌকার **চড়ন্দারেরা** একসঙ্গে কীর্তন গাহিতে লাগিল। **গলদ্‌ঘর্ম**—বছরের শেষে হিসাব মেলাতে বসে কর্মচারীরা **গলদ্‌ঘর্ম** হতে লাগলো। **দাঁতকপাটি**—অন্ধকারে সেই ভয়ানক আওয়াজ শুনে সকলের **দাঁতকপাটি** লাগার উপক্রম। **যথাসর্বস্ব**—অগ্নিকাণ্ডে লোকটির **যথাসর্বস্ব** ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে।

উক্তি-পরিবর্তন। মাঝি বলিল, 'মশাই, আমি.........সুস্থ হয়।' (প্রত্যক্ষ উক্তি)। মাঝি সবিনয়ে বলিল যে, সে সেই ঢেউ থামাইয়া দিতে পারে—কিন্তু তাহাতে তাহার (বিহারীর) সাত আট লক্ষ টাকা ক্ষতি হইবে। তাহা সে সহিতে পারিবে কিনা তাহাকে বলিতে হইবে। বিহারী বলিল যে, তাহার যথাসর্বস্ব যায় সেও আচ্ছা; কিন্তু তাহার স্ত্রী ও কন্যা যেন প্রাণ পায় ও সুস্থ হয়। (পরোক্ষ উক্তি)।

॥ ভানুসিংহের পত্র ॥

সন্ধি। বৃহস্পতি = বৃহৎ + পতি [নিপাতনে]। অর্ধেক = অর্ধ + এক। বৃষ্টি = বৃষ + তি। আচ্ছন্ন = আ + ছন্ন। নির্মল = নিঃ + মল। পুণ্যতীর্থোদকে = পুণ্যতীর্থ + উদকে। সন্ধানে = সম্ + ধানে। নিশ্চিত = নিঃ + চিত। নিশ্চল = নিঃ + চল। বিচ্ছেদ = বি + ছেদ। আশ্চর্য = আ + চর্য। কিন্তু = কিম্ + তু। অতএব = অতঃ + এব।

কারক-বিভক্তি॥ কাল - অধিকরণে শূন্যবিভক্তি। বোলপুর থেকে—অপাদানে 'থেকে' বিভক্তি। মেঘে—করণে 'এ' বিভক্তি। মোটরগাড়িতে—কর্মে 'তে' বিভক্তি। মোটর—কর্মে শূন্যবিভক্তি। জলে—করণে 'এ' বিভক্তি। পুণ্যতীর্থোদকে—করণে 'এ' বিভক্তি। রাত্রি—অধিকরণে শূন্যবিভক্তি। গ্রহ-বৈগুণ্যে—করণে 'এ' বিভক্তি। চিঠি—মুখ্যকর্মে শূন্যবিভক্তি। ডাক—কর্মে শূন্যবিভক্তি।

সমাস। ভানুসিংহের—ভানুদের মধ্যে সিংহ— সপ্তমীতৎ; তাহার। শিলংপর্বতে—যাহা শিলং, তাহাই পর্বত—কর্মধা; তাহাতে। মা-গঙ্গা—যিনি মা, তিনিই গঙ্গা—কর্মধা। বার-বেলা—বেলার বার—ষষ্ঠীতৎ। মোটরগাড়ি—যাহা মোটর, তাহাই গাড়ি—কর্মধা; অথবা মোটর-চালিত গাড়ি—মধ্যপদলোপী কর্মধা। গৌহাটি-স্টেশন—যাহা গৌহাটি, তাহাই স্টেশন—কর্মধা। ভাগ্যদেবতা—ভাগ্য-রূপ দেবতা—রূপক-কর্মধা। বজ্রনাদ—বজ্রের নাদ—ষষ্ঠীতৎ। মুষলধারে—মুষলের ন্যায় ধারা—উপমিত কর্মধা; তাহাতে। খেয়া-জাহাজে—যাহা খেয়া, তাহাই জাহাজ—কর্মধা; তাহাতে। বকাবকি, দাপাদাপি, ছুটোছুটি—ব্যতিহার বহুব্রী। নির্মল—নাই মল যাহাতে—বহুব্রী। গঙ্গাস্নান—গঙ্গায় স্নান—সপ্তমীতৎ। পুণ্যতীর্থোদকে—পুণ্য যে তীর্থ—কর্মধা, তাহার উদক [জল]—ষষ্ঠীতৎ; তাহাতে। কটাক্ষপাত—কটাক্ষের পাত—ষষ্ঠীতৎ।

সূর্যদেব—যিনি সূর্য, তিনিই দেব—কর্মধা। অসম্ভব—নয় সম্ভব—নঞ্‌তৎ গোয়ালন্দগামী—গোয়ালন্দে গমন করে যাহা—উপপদতৎ। স্টীমার-ঘাট—স্টীমার ভিড়িবার ঘাট—মধ্যপ-কর্মধা। মোটর-কোম্পানী—মোটর বিষয়ক কোম্পানী—মধ্যপ কর্মধা। মালগাড়ী—মাল বহনের নিমিত্ত গাড়ি—চতুর্থীতৎ। পথপার্শ্বে—পথের পার্শ্ব—ষষ্ঠীতৎ, তাহাতে। নিশ্চল—নয় চল—নঞ্‌তৎ। পূর্বদিনে—পূর্ব যে দিন—কর্মধা, তাহাতে। জিনিসে-মানুষে—জিনিসে ও মানুষে—অলুক্ দ্বন্দ্ব। গ্রহ বৈগুণ্য—গ্রহের বৈগুণ্য - ষষ্ঠীতৎ, তাহাতে।

প্রকৃতি-প্রত্যয়। বিঘ্ন—বি-হন্+অ (কর্তৃবা)। গঙ্গা- গম্+গ (কর্তৃবা +আ। আকার -আ-কৃ+অ (কর্মবা)। আয়তন—আ-যত্+অনট্। ভাগ্য—ভজ্+য (কর্মবা)। দেবতা—দেব+তা (স্বার্থিক)। ঝাঁকানি—ঝাঁক্+আনি রক্ত—রন্‌জ্+ক্ত। আচ্ছন্ন—আ-ছদ্+ক্ত (কর্মবা)। স্নান—স্না+অনট্। পৃথিবী—পৃথু+ঈ (কর্তৃবা)। স্রোত—স্রু+ক্ত। স্নিগ্ধ—স্নিহ্+ক্ত। পঙ্কিল—পঙ্ক+ইল। রাত্রি—রা+ত্রি (কর্তৃবা)। যাপন—যা+ণিচ্+অনট্। সন্ধান—সম্+ধা+অনট্ (কর্তৃবা)। অনুমতি—অনু-মন্+তি (ভাববা)। সূর্য—সৃ+য (কর্তৃবা)। অসম্ভব—নঞ্-সম্-ভূ+অ (ভাববা)। জিজ্ঞাসা—জ্ঞা+সন্+আ। আশ্রয়—আ-শ্রি+অ (ভাববা)। প্রভাত—প্র-ভা+ক্ত (কর্তৃবা)। আকাশ—আ-কাশ্+অ (অধিকরণবা)। ঘোরতর—ঘোর+তর। হাঁপানি—হাঁপ+আনি। বহন—বহ্ +অনট্ (কর্তৃবা)। নিবিড়তর—নিবিড+তর। অবস্থা—অব-স্থা+অ (ভাববা)। স্তব্ধ—স্তন্‌ভ্+ক্ত (কর্তৃবা)। বিশেষত—বিশেষ+ত। বিচ্ছেদ—বি-ছিদ্+অ (ভাববা)। বৈগুণ্য—বিগুণ+য (ভাববা)। আশ্চর্য—আ-চর্+য (ভাববা)।

পদ-পরিবর্তন। পর্বত [বি]—পার্বত্য [বিণ]। পথ [বি]—পাথেয় [বিণ]। গঙ্গা [বি]—গাঙ্গেয় [বিণ]। সাবধান [বি]—সাবধানী [বিণ]। পাহাড় [বি]—পাহাড়ী [বিণ]। দেহ [বি]—দৈহিক [বিণ]। স্নান [বি]—স্নাত [বিণ]। সময় [বি]—সাময়িক [বিণ]। স্নিগ্ধ [বিণ]—স্নেহ [বি]। নির্মল [বিণ]—নির্মলতা [বি]। পঙ্কিল [বিণ]—পঙ্কিলতা [বি]। অস্তমিত [বিণ]—অস্তগমন [বি]। আশ্রয় [বি]—আশ্রিত [বিণ]। দুঃখ [বি]—দুঃখী, দুঃখিত [বিণ]। বহন [বি]—বাহিত [বিণ]। নিশ্চল [বিণ]—নিশ্চলতা [বি]। বিচ্ছেদ [বি]—বিচ্ছিন্ন [বিণ]। বৈগুণ্য [বি]—বিগুণ [বিণ]। স্থান [বি]—স্থানীয়, স্থানিক [বিণ]। স্থির [বিণ]—স্থৈর্য [বি]।

সাধু ভাষায় পরিণত কর। কাল পৌঁচেছি...করে দিয়েছিলেন? [চলিত ভাষা]—কাল আসিয়া পৌঁছিয়াছি শিলং পর্বতে, পথে কত যে বিঘ্ন ঘটিল তাহার ঠিক নাই। মনে আছে—বোলপুর হইতে আসিবার সময় জননী গঙ্গা আমাকে জল-কর্দমের মধ্যে হিঁচড়াইয়া আনিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন?

বাচ্য-পরিবর্তন। তাঁহাকে টিকিট কিনিতে হয় নি [ভাববাচ্য]। তিনি টিকিট কেনেন নি [কর্তৃবাচ্য]।

উক্তি-পরিবর্তন ॥ কারখানার লোকেরা '...ডাকবাংলায়।' [প্রত্যক্ষ উক্তি]> কারখানার লোকেরা বলিল যে, সেদিন কিছু করা অসম্ভব। তাহারা পরের দিন চেষ্টা করিয়া দেখিবে। লেখক এবং তাঁহার সঙ্গীরা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহারা রাত্রে কোথায় আশ্রয় পাইবেন। তাহারা বলিল যে, ডাকবাংলায় তাঁহারা তাহা পাইবেন।

॥ দুই পাস্তুর ॥

সন্ধি ॥ জলাতঙ্ক=জল+আতঙ্ক। আবিষ্কার=আবিঃ+কার। সংবাদ=সম্+বাদ। পরীক্ষাগারে=পরি+ঈক্ষা+আগারে। যথাযথ=যথা+অযথ। গবেষণা=গো+এষণা। পদ্ধতি=পদ্+ইতি। জীবাণু=জীব+অণু। উজ্জ্বল=উৎ+জ্বল। সিদ্ধান্ত=সিদ্ধ+অন্ত। পুনরুজ্জীবিত=পুনঃ+উৎ+জীবিত। সংস্কার=সম্+কার। নির্ণয়=নিঃ+নয়। জগদ্বাসীর=জগৎ+বাসীর। জগদ্বিখ্যাত=জগৎ+বিখ্যাত। লোকারণ্য=লোক+অরণ্য। অত্যন্ত=অতি+অন্ত। স্বস্তি=সু+অস্তি। নিশ্চয়=নিঃ+চয়।

কারক-বিভক্তি ॥ ছেলে—কর্তায় শূন্যবিভক্তি। জলাতঙ্ক রোগে-করণে এ বিভক্তি। দিনরাত—অধিকরণে শূন্যবিভক্তি। ছিপিটা—কর্মে শূন্যবিভক্তি। পদ্ধতিতে—করণে 'তে' বিভক্তি। অণুবীক্ষণে—করণে 'এ' বিভক্তি। জীবাণুর—কর্ম-সম্বন্ধে 'র' বিভক্তি। আলো—কর্মে শূন্যবিভক্তি। জীবিকা-কর্মে শূন্যবিভক্তি। আবিষ্কার থেকে-করণে 'থেকে' বিভক্তি। অ্যানথ্রাক্স-রোগে—করণে 'এ' বিভক্তি। কারণ-কর্মে শূন্যবিভক্তি। চিকিৎসা-বিদ্যা—কর্মে শূন্যবিভক্তি।

সমাস ॥ ক্ষতবিক্ষত—ক্ষত ও বিক্ষত—দ্বন্দ্ব। জলাতঙ্ক—জল হইতে আতঙ্ক—পঞ্চমীতৎ। অনিবার্য—নয় নিবার্য—নঞ্‌তৎ। রোগ-নিবারণের—রোগকে নিবারণ—দ্বিতীয়াতৎ; তাহার। জলাতঙ্ক-রোগী—জল হইতে আতঙ্ক—পঞ্চমীতৎ; জলাতঙ্কে আক্রান্ত রোগী—মধ্যপদলোপী কর্মধা। পরীক্ষাগারে—পরীক্ষার নিমিত্ত আগার-চতুর্থীতৎ, তাহাতে। দূরদেশ-দূর যে দেশ কর্মধা। রসায়নবিদ্যা—রসায়ন বিষয়ক বিদ্যা—মধ্যপ-কর্মধা। জীবাণুশূন্য—জীবের অণু—ষষ্ঠীতৎ, জীবাণুর দ্বারা শূন্য—তৃতীয়াতৎ। ধূলিকণা-ধূলির কণা—ষষ্ঠীতৎ। পাত্রস্থিত—পাত্রে স্থিত—সপ্তমীতৎ। শয়নঘরে—শয়নের নিমিত্ত ঘর—চতুর্থীতৎ, তাহাতে। ভদ্রলোক—ভদ্র এমন লোক—কর্মধা। মূলকথা—মূল যে কথা—কর্মধা। জীবাণু-বিনাশের—জীবাণুকে বিনাশ—দ্বিতীয়াতৎ; তাহার। গুটিপোকা-চাষ—গুটি এমন পোকা-কর্মধা; তাহার চাষ—ষষ্ঠীতৎ। প্রাণিতত্ত্ববিশারদদের—প্রাণি-বিষয়ক তত্ত্ব—মধ্যপ-কর্মধা; তাহাতে বিশারদ—সপ্তমীতৎ; তাঁহাদের। রসায়নবিদ্‌কে—রসায়ন জানেন যিনি—উপপদতৎ; তাঁহাকে। জন্তুজানোয়ার—জন্তু ও জানোয়ার—দ্বন্দ্ব। বিশেষজ্ঞ—বিশেষ জানেন যিনি—উপপদতৎ। জনমণ্ডলী—জনের মণ্ডলী—ষষ্ঠীতৎ। জয়ধ্বনি—জয়-সূচক

ধ্বনি—মধ্যপ-কর্মধা। জগৎবাসী—জগতে বাস করে যে—উপপদতৎ। কৃতজ্ঞতাভাজন —কৃতজ্ঞতার ভাজন—ষষ্ঠীতৎ। লোকারণ্য—লোকের অরণ্য—ষষ্ঠীতৎ। গবেষণাকেন্দ্র —গবেষণার নিমিত্ত কেন্দ্র—চতুর্থীতৎ। মর্মরমূর্তি—মর্মর-নির্মিত মূর্তি—মধ্যপ-কর্মধা। মেষপালক—মেষ পালন করে যে—উপপদতৎ।

প্রকৃতি-প্রত্যয়॥ বিক্ষত—বি-ক্ষণ্ + ক্ত (কর্মবা)। অনিবার্য—নঞ্-নি-বারি + য (কর্মবা)। আবিষ্কার—আবিঃ-কৃ + অ (কর্মবা)। প্রতিষেধক—প্রতি-সিধ্ + ক। বিভিন্ন—বি-ভিদ্ + ক্ত (কর্মবা)। চিকিৎসা—কিৎ + সন্ + আ। প্রতিষ্ঠিত—প্রতি-স্থা + ক্ত (কর্মবা)। পরিণত—পরি-নম্ + ক্ত। গ্রহণ—গ্রহ্ + অনট্ (কর্তৃবা)। অভিলাষ—অভি-লস্ + অ (ভাববা)। ব্যবস্থা—বি-অব-স্থা + অ। প্রতিষ্ঠান—প্রতি-স্থা + অনট্। রসায়ন—রস + আয়ন। অনুশীলন—অনু-শীল্ + অনট্ (ভাববা)। আনন্দ—আ-নন্দ্ + অ (ভাববা)। মৌলিক—মূল + ষ্ণিক। ফুটন্ত—ফুট্ + অন্ত। গবেষণা—গো-ইষ্ + অনট্ + আ। বিজ্ঞানী—বিজ্ঞান + ঈ। রাসায়নিক—রসায়ন + ষ্ণিক। পদ্ধতি—পদ্-হন্ + ক্তি (কর্মবা)। প্রবেশ—প্র-বিশ্ + অ (ভাববা)। অনুবীক্ষণ—অনু-বি-ঈক্ষ্ + অনট্। ঘোলাটে—ঘোলা + টে। ঘোষণা—ঘোষ্ + অনট্ + আ। উৎপত্তি—উৎ-পদ্ + ক্তি (কর্তৃবা)। অনুসন্ধান—অনু-সম্-ধা + অনট্। উজ্জ্বল—উৎ-জ্বল্ + অ (ভাববা)। শয়ন—শী + অনট্। সাক্ষাৎ—সহ-অক্ষি-অৎ + ক্বিপ্ (কর্তৃবা)। বিনাশ—বি-নশ্ + অ। লম্বাটে—লম্বা + টে। চলন—চল্ + অন। দক্ষিণ—দক্ষ্ + ইন। জীবিকা—জীব্ + ক + আ। প্রতিকার—প্রতি-কৃ + অ। নির্ধারণ—নির্-ধৃ + ণিচ্ + অনট্। দুঃখিত—দুঃখ + ইত। পুনরুজ্জীবিত—পুনঃ-উদ্-জীব্ + ক্ত। জাতীয়—জাতি + ঈয়। মারাত্মক—মার্ + আত্মন্ + ক। আক্রমণ—আ-ক্রম্ + অনট্। প্রমাণ—প্র-মা + অনট্। আহ্বান—আ-হ্বে + অনট্। স্মরণীয়—স্মৃ + অনীয়। সাংবাদিক—সংবাদ + ষ্ণিক। দূরীকরণ—দূর-অভূততদ্ভাবে চ্বি-কৃ + অনট্। সংখ্যক—সংখ্যা + ক। অমায়িক—নঞ্-মায়া + ষ্ণিক। সাধন—সাধ্ - অনট্। স্থানীয়—স্থান + ঈয়।

পদ-পরিবর্তন॥ পাগলা (বিণ)—পাগলামি (বি)। সৌভাগ্য (বি)—সুভগ (বিণ)। আবিষ্কার (বি)—আবিষ্কৃত (বিণ)। নিবারণ (বি)—নিবারিত (বিণ)। সংবাদ (বি)—সাংবাদিক (বিণ)। পরিণত (বিণ)—পরিণতি (বি) অভিলাষ (বি)—অভিলষিত (বিণ)। পৃথিবী (বি)—পার্থিব (বিণ)। রসায়ন (বি)—রাসায়নিক (বিণ)। অনুশীলন (বি)—অনুশীলিত (বিণ)। মৌলিক (বিণ)—মূল, মৌলিকতা (বি)। প্রবেশ (বি)—প্রবিষ্ট (বিণ)। বিশুদ্ধ (বিণ) (বিণ)—বিশুদ্ধতা (বি)। সুনিশ্চিত (বিণ)—সুনিশ্চয় (বি)। পরীক্ষা (বি)—পরীক্ষিত (বিণ)। বিনাশ (বি)—বিনষ্ট (বিণ)। রেশম (বি)—রেশমী (বিণ) প্রতিষেধক (বিণ)—প্রতিষেধ (বি)। আক্রমণ (বি)—আক্রান্ত (বিণ) উপহাস (বি)—উপহসিত (বিণ)। প্রমাণ (বি)—প্রমাণিত (বিণ)। বিজ্ঞান (বি)—বৈজ্ঞানিক (বিণ)। ইতিহাস (বি)—ঐতিহাসিক (বিণ)। আহ্বান

(বি)—আহূত (বিণ)। নিবারণ (বি)—নিবারিত (বিণ)। নির্ণয় (বি)—নির্ণীত (বিণ)। অভিনন্দন (বি)—অভিনন্দিত (বিণ)। রক্ষিত (বিণ)—রক্ষণ (বি)। সমাধি (বি)—সমাহিত (বিণ)। স্থানীয় (বিণ)—স্থান (বি)।

। মেঘদূত।

সন্ধি। সমাচ্ছন্ন = সম + আ + ছন্ন। উত্তীর্ণ = উৎ + তীর্ণ। তত্ত্বাবধানে = তৎ + ত্ব + অবধানে। বিত্তাভাস = বিত্ত + অভি + আস। স্বাক্ষর = স্ব + অক্ষর। দুর্ভাগ্য = দুঃ + ভাগ্য। নির্বোধ = নিঃ + বোধ। পরীক্ষক = পরি + ঈক্ষক। তন্দ্রাভিভূত = তন্দ্রা + অভিভূত। দীপালোকের = দীপ + আলোকের। উন্মুখ = উৎ + মুখ। অপেক্ষা = অপ + ঈক্ষা। সংক্ষেপে = সম্ + ক্ষেপে। উত্তেজিত = উৎ + তেজিত। নির্ভয়ে = নিঃ + ভয়ে। পরিষ্কার = পরি + কার। সর্বাগ্রে = সর্ব + অগ্রে। সর্বাপেক্ষা = সর্ব + অপ + ঈক্ষা। বজ্জাতকে = বদ্ + জাতকে। উত্তরোত্তর = উত্তর + উত্তর।

কারক-বিভক্তি। দিনটা—কর্মে শূন্যবিভক্তি। সারাদিন—অধিকরণে শূন্য-বিভক্তি। ঘনমেঘে—করণে 'এ' বিভক্তি। অন্ধকারে—করণে 'এ' বিভক্তি। হুঁকায় —অপাদানে 'য়' বিভক্তি। নিজে—কর্তায় 'এ' বিভক্তি। নাক—কর্মে শূন্যবিভক্তি। সম্মান-সৌভাগ্য—কর্মে শূন্যবিভক্তি। কিসে—কর্তায় 'এ' বিভক্তি। কাজ—কর্মে শূন্যবিভক্তি। বগলে—করণে 'এ' বিভক্তি। তেজে—করণে 'এ' বিভক্তি। বাঘের —কর্মপ্রবচনীয়যোগে 'এর' বিভক্তি। শতকণ্ঠে—অপাদানে 'এ' বিভক্তি। বাঘ—কর্মে শূন্যবিভক্তি। সাহসে—করণে 'এ' বিভক্তি।

সমাস। সারাদিন—সারা ব্যাপিয়া দিন—দ্বিতীয়াতৎ। অবিশ্রান্ত—নয় বিশ্রান্ত —নঞ্‌তৎ। ঘনমেঘে—ঘন যে মেঘ—কর্মধা, তাহাতে। গম্ভীর-প্রকৃতি—গম্ভীর প্রকৃতি যাহার—বহুব্রী। মনোযোগ—মনের দ্বারা যোগ—তৃতীয়াতৎ। হাসিমুখে—হাসিপূর্ণ মুখ—মধ্যপ-কর্মধা, তাহাতে। সপ্তাহ—সপ্ত অহের সমাহার—দ্বিগু। সুশৃঙ্খলায়—সু শৃঙ্খলা—প্রাদিতৎ; তাহাতে। নির্বোধ—নাই বোধ যাহার—নঞ্‌তৎ। দারিদ্র্যবোধ—দারিদ্র্য বিষয়ক বোধ—মধ্যপ-কর্মধা। অদৃষ্টের—নয় দৃষ্ট—নঞ্‌তৎ, তাহার। তন্দ্রাভিভূত—তন্দ্রার দ্বারা অভিভূত—তৃতীয়াতৎ। গভীর-অধ্যয়ন-রত—গভীর যে অধ্যয়ন—কর্মধা; তাহাতে রত—সপ্তমীতৎ। আইনসঙ্গত —আইনের দ্বারা সঙ্গত—তৃতীয়াতৎ। আর্তকণ্ঠের—আর্ত যে কণ্ঠ—কর্মধা, তাহার। গগনভেদী—গগন ভেদ করে যাহা—উপপদতৎ। বিদ্যুৎবেগে—বিদ্যুতের বেগ—ষষ্ঠীতৎ; তাহাতে। দক্ষযজ্ঞ—দক্ষ-আহূত যজ্ঞ—মধ্যপ-কর্মধা। ঠেলাঠেলি—ঠেলিয়া ঠেলিয়া যে যুদ্ধ—ব্যতিহার বহুব্রী। নিমীলিতচক্ষে—নিমীলিত যে চক্ষু—কর্মধা, তাহাতে। দীর্ঘশ্বাস—দীর্ঘ যে শ্বাস—কর্মধা। ভয়চকিত—ভয়ের হেতু চকিত—তৃতীয়াতৎ। রুদ্ধ-নিশ্বাসে—রুদ্ধ এমন নিশ্বাস—কর্মধা; তাহাতে। মহামারী—মহা

যে নারী—কর্মধা। উত্তরোত্তর—উত্তর হইতে উত্তর—পঞ্চমীতৎ। বীরপুরুষ—বীর যে পুরুষ—কর্মধা। যথেষ্ট—ইষ্টকে অতিক্রম না করিয়া—অব্যয়ীভাব। সদুত্তর—সৎ এমন উত্তর—কর্মধা। অপমানকর—অপমান করে যাহা—উপপদতৎ।

প্রকৃতি-প্রত্যয়॥ অবিশ্রান্ত—নঞ্‌-বি-শ্রম্ + ক্ত (কর্তৃবা)। শ্রাবণ—শ্রবণ + ষ্ণ। সমাচ্ছন্ন—সম্-আ-ছদ্ + ক্ত (কর্মবা)। সন্ধ্যা—সম্-ধৈ + ঘঞ্ + আ। উত্তীর্ণ—উৎ-তৃ + ক্ত (কর্তৃবা)। গাঢ়—গাহ্ + ক্ত (কর্তৃবা)। অন্ধকার—অন্ধ-কৃ + ঘঞ্ (ভাববা)। উপভোগ—উপ-ভুজ্ + ঘঞ্ (ভাববা)। হিন্দুস্থানী—হিন্দুস্থান + ঈ। তুলসীদাসী—তুলসীদাস + ঈ। কঠোর—কঠ্ + ওর (কর্তৃবা)। তত্ত্ব—তৎ + ত্ব। অবধান—অব-ধা + অনট্ (ভাববা)। অভ্যাস—অভি-অস্ + ঘঞ্ (ভাববা)। গম্ভীর—গম্ + ঈর (অধিকরণবা)। প্রকৃতি—প্র-কৃ + ক্তি (ভাববা)। প্রস্তুত—প্র-স্তু + ক্ত (কর্তৃবা)। শাসন—শাস্ + অনট্ (ভাববা)। বিঘ্ন—বি-হন্ + ঘঞ্ (কর্তৃবা)। সরস্বতী—সরস্ + বতুপ্ + ঈ। নিশ্চয়—নিঃ-চি + অল্। সম্মান—সম্-মন্ + ঘঞ্ (ভাববা)। সৌভাগ্য—সুভগ + ষ্ণ্য। দুর্ভাগা—দুর্-ভজ্ + ব (কর্মধা)। নির্বোধ—নির্-বুধ্ + ঘঞ্ (ভাববা)। অনুরাগ—অনু-রঞ্জ্ + ঘঞ্ (ভাববা)। সম্বন্ধ—সম্-বন্ধ্ + ঘঞ্ (ভাববা)। সূক্ষ্ম—সূচ্ + স্ম। তন্দ্রা—তন্দ্র্ + অ (ভাববা) + আ। অভিভূত—অভি-ভূ + ক্ত (কর্তৃবা)। আলোক—আ-লোক্ + ঘঞ্ (ভাববা)। অধ্যয়ন—অধি-ই + অনট্ (ভাববা)। তৃষ্ণা—তৃষ্ + ক্বিপ্ (ভাববা) + আ। পরীক্ষা—পরি-ঈক্ষ্ + ঘঞ্ (ভাববা) + আ। প্রদীপ—প্র-দীপ্ + ঘঞ্ (কর্তৃবা)। লড়াই—লড্ + আই। পরিপূর্ণ—পরি-পূর্ + ক্ত (কর্মবা—নিপাতনে)। প্রকৃতিস্থ—প্রকৃতি-স্থা + ক। প্রশ্ন—প্রচ্ছ্ + ন (ভাববা)। চৈতন্য—চেতনা + ষ্ণ্য। দীর্ঘ—দ্রাঘ্ + অ (কর্তৃবা)। সংক্ষেপে—সম্-ক্ষিপ্ + ঘঞ্ (ভাববা)। উত্তেজিত—উৎ-তিজ্ + ক্ত (কর্তৃবা)। নিস্তব্ধ—নি-স্তন্‌ভ্ + ক্ত (কর্তৃবা)। উপস্থিত—উপ-স্থা + ক্ত (কর্তৃবা) চীৎকার—চীৎ-কৃ + ঘঞ্। ব্যাপার—বি-আ-পৃ + ঘঞ্ (ভাববা)। নিশ্বাস—নি-শ্বস্ + ঘঞ্ (ভাববা)। সহসা—সাহস + ষ্ণ। আভাস—আ-ভাস্ + ঘঞ্ (ভাববা) পরিষ্কার—পরি-কৃ + ঘঞ্ (ভাববা)। অভিযোগ—অভি-যুজ্ + ঘঞ্ (ভাববা)।

সার্থক বাক্য-রচনা॥ **সমাচ্ছন্ন**—সকাল হইতে আকাশ গাঢ় কৃষ্ণ মেঘে **সমাচ্ছন্ন**। **প্রথামত**—নিত্যকার **প্রথামত** আমরা ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলাম। **গম্ভীর-প্রকৃতি**—জলধরবাবু ছিলেন ভারী **গম্ভীর-প্রকৃতির** মানুষ। **তন্দ্রাভিভূত**—সারাদিনের ক্লান্তির পর মৃদুমন্দ বাতাসে তিনি **তন্দ্রাভিভূত** হইয়া পড়িলেন। **আইনসম্মত**—তাহাকে এখানে প্রবেশ করিতে না দেওয়া **আইনসম্মত** কিনা তাহা অবশ্য-বিচার্য। **প্রকৃতিস্থ**—আপনি **প্রকৃতিস্থ** হইয়া সমস্ত শ্রবণ করুন। **বিদ্যুদ্‌বেগে**—কোলাহল শুনিয়া সে **বিদ্যুদ্‌বেগে** ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। **ধুন্ধমার**—উৎসবমঞ্চে রমেন উঠামাত্রই **ধুন্ধমার** বাধিয়া গেল।

সন্ধি ॥ উল্লাসে = উৎ + লাসে। আবিষ্কারক = আবিঃ + কারক। সূর্যাস্তের = সূর্য + অস্তের। বর্ণচ্ছটা = বর্ণ + ছটা। অবস্থাপন্ন = অবস্থা + আপন্ন।

কারক-বিভক্তি ॥ এবার—ক্রিয়াবিশেষণে শূন্যবিভক্তি। বাড়ি—অধিকরণে শূন্যবিভক্তি। দোয়াড়ি—কর্মে শূন্যবিভক্তি। সর্বপ্রথম—ক্রিয়াবিশেষণে শূন্যবিভক্তি। রেললাইন—কর্মে শূন্যবিভক্তি। একদৃষ্টে—ক্রিয়াবিশেষণে 'এ' বিভক্তি। কী—কর্মে শূন্যবিভক্তি। রেলের রাস্তা—কর্মে শূন্যবিভক্তি। দুইজনে—কর্তায় 'এ' বিভক্তি। মরিয়ার ভাবে—ক্রিয়াবিশেষণে 'এ' বিভক্তি। পথ—কর্মে শূন্যবিভক্তি। কাঁটা—কর্মে শূন্যবিভক্তি। বাড়ি—অধিকরণে শূন্যবিভক্তি। জল, ধানক্ষেত—কর্মে শূন্যবিভক্তি। পিঠ—কর্মে শূন্যবিভক্তি। সড়কের—কর্মপ্রবচনীয়যোগে 'এর' বিভক্তি। রেলের—নিমিত্তে 'এর' বিভক্তি। চোখে—করণে 'এ' বিভক্তি। তারে—করণে 'এ' বিভক্তি। 'দিন'—অধিকরণে শূন্যবিভক্তি। ছাগল—কর্মে শূন্যবিভক্তি। গাঁ—কর্মে শূন্যবিভক্তি। মেঘের—অভেদ-সম্বন্ধে 'এর' বিভক্তি। আদরে—ক্রিয়াবিশেষণে 'এ' বিভক্তি।

সমাস ॥ গুলঞ্চলতা-দুলানো—গুলঞ্চের লতা—ষষ্ঠীতৎ, তাহা দোলায় যাহা—উপপদতৎ। রেল-লাইন—রেলের লাইন—ষষ্ঠীতৎ। কলাই-ফল—যাহা কলাই, তাহাই ফল—কর্মধা। সতৃষ্ণ—তৃষ্ণার সহিত বর্তমান—বহুব্রী। জলসত্রতলা—জলের সত্র—ষষ্ঠীতৎ, তাহার তলা—ষষ্ঠীতৎ। বাধাহীন—বাধার দ্বারা হীন—তৃতীয়াতৎ। ধানক্ষেত—ধান পূর্ণ ক্ষেত—মধ্যপ-কর্মধা। রেলরাস্তা—রেলের নিমিত্ত রাস্তা—চতুর্থীতৎ। রেলগাড়ী—রেল-বাহিত গাড়ী—মধ্যপ-কর্মধা। বিশ্বগ্রাসী—বিশ্বকে গ্রাস করে যে—উপপদতৎ। দেশ-আবিষ্কারক—দেশকে আবিষ্কার করে যে—উপপদতৎ। রহস্য-অবগুণ্ঠন—রহস্য রূপ অবগুণ্ঠন—রূপক-কর্মধা। মহাজন—মহৎ যে জন—কর্মধা। অবস্থাপন্ন—অবস্থাকে আপন্ন—দ্বিতীয়াতৎ। গৃহস্থ—গৃহে থাকে যে—উপপদতৎ।

প্রকৃতি-প্রত্যয় ॥ আনন্দ—আ-নন্দ্ + ঘঞ্ (ভাববা)। বৈশাখ—বিশাখা + ষ্ণ। জ্যৈষ্ঠ—জ্যেষ্ঠা + ষ্ণ। প্রকাশ—প্র-কাশ + ঘঞ্ (ভাববা)। দুর্গা—দুর্-গম্ + ঘঞ্ + আ। দক্ষিণ—দক্ষ্ + ইন (কর্তৃবা)। বিস্ময়—বি-স্মি + ঘঞ্ (ভাববা)। আবদ্ধ—আ-বন্ধ্ + ক্ত (কর্মবা)। রক্ত—রন্জ্ + ক্ত। অবসর—অব-সৃ + ঘঞ্ (ভাববা)। সহজ—সহ-জন্ + ড। অগ্রসর—অগ্র-সৃ + ঘঞ্ (ভাববা)। বিশ্বগ্রাসী—বিশ্ব-গ্রস্ + ইন্। ক্ষুধা—ক্ষুধ্ + ক্বিপ্ (ভাববা) + আ। আবিষ্কারক—আবিস্-কৃ + ণক। পৃথিবী—পৃথু + ঈ (কর্তৃবা)। অনুভূতি—অনু-ভূ + ক্তি (ভাববা)। অনাবিষ্কৃত—নঞ্-আবিস্ কৃ + ক্ত (কর্মবা)। নবীনতা—নবীন + তা। আস্বাদ—আ-স্বদ্ + ঘঞ্ (ভাববা)। প্রসার—প্র-সৃ + ঘঞ্ (ভাববা)। সমুদ্র—সম্-উন্দ্ + র (কর্তৃবা)। পরিচিত—পরি-চি + অন্ (ভাববা)। রহস্য—রহস্ + য। সন্ধ্যা

—সম-ধৈ + অঙ্ + আ। গন্তব্য—গম + তব্য। শিষ্য—শাস্ + য (কর্মবা)। অবস্থা - অব-স্থা + ক + আ। আপন্ন—আ-পদ্ + ক্ত (কর্তৃবা)। গৃহস্থ—গৃহ-স্থা + ক।

সার্থক বাক্য-রচনা॥ **মরিয়ার ভাবে**—চারিদিকে একবার চাহিয়া লইয়া সে **মরিয়ার ভাবে** লাফাইয়া পড়িল। **সুবিধাজনক**—যাই বলো, কাজটা খুব **সুবিধাজনক** হইবে না। **অবস্থাপন্ন**—গ্রামে অনেক **অবস্থাপন্ন** লোকের বাস। **মহাজন**—এমন সুদখোর **মহাজন** আমি আর একটিও দেখিনি।

নবম শ্রেণী

॥ পদ্যাংশ ॥

॥ শ্রীরামের অত্রিমুনির আশ্রম গমন ॥

সন্ধি॥ পুনর্বার = পুনঃ + বার। তপোবন = তপঃ + বন। কৃতাঞ্জলি = কৃত + অঞ্জলি। নমস্কার = নমঃ + কার। আশীর্বাদ = আশিস্ [আশীঃ] + বাদ। উজ্জ্বল = উৎ + জ্বল।

কারক-বিভক্তি॥ আমা—কর্মে শূন্যবিভক্তি। আমাতে—সম্প্রদানে 'তে' বিভক্তি। চিত্রকূট—কর্মে শূন্যবিভক্তি। তপোবন—অধিকরণে শূন্যবিভক্তি। চরণ সম্প্রদানে শূন্যবিভক্তি। রামে—কর্মে 'এ' বিভক্তি। সীতা—কর্মে শূন্যবিভক্তি। সীতারে—কর্মে 'রে' বিভক্তি। রাজকুলে (জন্মিয়া) - অপাদানে 'এ' বিভক্তি। গুণে, শীলে—করণে 'এ' বিভক্তি। সম্পদ - কর্মে শূন্যবিভক্তি। তপস্যায়—করণে 'য়' বিভক্তি। সম্পদে—করণে 'এ' বিভক্তি।

সমাস॥ চিত্রকূট—চিত্র শোভিত কূট যাহার—মধ্যপ-বহুব্রী। রঘুনাথ—রঘুবংশের নাথ যিনি—বহুব্রী। তপোবন—তপের নিমিত্ত বন—চতুর্থীতৎ। মুনিবর—মুনিদের বর—ষষ্ঠীতৎ। পাদ্যঅর্ঘ্য—পাদ্য ও অর্ঘ্য—দ্বন্দ্ব। মুনিপত্নী—মুনির পত্নী—ষষ্ঠীতৎ। কৃতাঞ্জলি—কৃত অঞ্জলি যাহার—বহুব্রী। রাজকুলে—রাজার কুল—ষষ্ঠীতৎ, তাহাতে। দূর্বাদলশ্যাম - দূর্বার দল—ষষ্ঠীতৎ; তাহার ন্যায় শ্যাম—উপমান-কর্মধা।

প্রকৃতি-প্রত্যয়॥ আইলে—<আস্ + ইলে (অসমাপিকা)। অযোধ্যা—নঞ্-যুধ্ + য (কর্মবা) + আ (স্ত্রী)। ভক্তি—ভজ্ + ক্তি (ভাববা)। দক্ষিণে—দক্ষ্ + ইন (কর্তৃবা) + এ। পরিশ্রম—পরি-শ্রম্ + ঘঞ্ (ভাববা)। আশ্রম—আ-শ্রম্ + ঘঞ্ (অধিকরণবা)। প্রবেশিয়া—প্রবেশ (নামধাতু) [প্র-বিশ্ + অ (ভাববা)] + ইয়া (অসমাপিকা)। বন্দনা - বন্দ্ + অনট্ (ভাববা) + আ। চরণ—চর্ + অনট্ (করণবা)। পাদ্য—পাদ্ + যৎ (ভাববা)। অর্ঘ্য—অর্হ্ + যৎ (ভাববা)।

সমর্পিলা—সম-অর্পি+ইল (কর্তৃবা)+আ। সীতা—সি+ক্ত (কর্তৃবা)+আ। পালন—পাল্+অনট্ (ভাববা)। করহ—কৃ+হ (অনুজ্ঞা)। দুহিতা—দুহ্+তৃ (কর্তৃবা)। মূর্তিমতী—মূর্তি+মতুপ্+ঈ (স্ত্রী)। করুণা—করুণ+আ। শ্রদ্ধা—শ্রৎ-ধা+অ (ভাববা)+আ। উপস্থিতা—উপ-স্থা+ক্ত (কর্তৃবা)+আ। শুক্ল—শুচ্+ল (কর্তৃবা)। বস্ত্র—বস্+ত্র (করণবা)। পরিধান—পরি-ধা+অনট্ (কর্মবা)। জ্ঞান—জ্ঞা+অনট্ (ভাববা)। গায়ত্রী—গায়ৎ-ত্রৈ+অ (কর্তৃবা)+ঈ (স্ত্রী)। নমস্যা—নমস্+যৎ (কর্মবা)+আ। নমস্কার—নমস্-কৃ+অ (ভাববা)। আশীর্বাদ—আশিস্-বদ্+অ (ভাববা)। বনিতা—বন্+ক্ত (কর্মবা)+আ (স্ত্রী)। প্রফুল্ল—প্র-ফুল্ল্+ক্ত (কর্তৃবা)। উজ্জ্বল—উৎ-জ্বল্+অ (কর্তৃবা)। সম্পদ—সম্-পদ্+ক্বিপ্ (কর্মবা)।

ব্যাকরণগত টীকা ॥ যতনে<যত্নে—স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ। ঠাঁই<স্থান। (কিবা) বা—বাক্যালংকার অব্যয়। কাম<কর্ম।

গদ্যরূপ ॥ আইলে—আসিলে। এমত—এমন। ঠাঁই—স্থান। সমর্পিলা—সমর্পণ করিলেন। করহ—করো। সবার—সকলের। হেন—এমন। মম—আমার।

সার্থক বাক্য-রচনা ॥ পাদ্য-অর্ঘ্য—মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে দশরথ পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়া বরণ করিয়া লইলেন। মূর্তিমতী—স্বামীপুত্রহীনা বিধবাটি ছিলেন যেন মূর্তিমতী বিষণ্ণতা। কৃতাঞ্জলি—প্রজাগণ কৃতাঞ্জলিপুটে রাজ-সমীপে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল।

॥ মধ্যাহ্নে ॥

সন্ধি ॥ মধ্যাহ্নে=মধ্য+অহ্নে।

কারক-বিভক্তি ॥ সমীরে—করণে 'এ' বিভক্তি। কাতরে—ক্রিয়াবিশেষণে 'এ' বিভক্তি। লাজে—হেত্বর্থে 'এ' বিভক্তি। আরামে—হেত্বর্থে 'এ' বিভক্তি।

সমাস ॥ মধ্যাহ্নে—অহ্নের মধ্য—একদেশী সমাস, তাহাতে। নদীকূলে—নদীর কূলে—ষষ্ঠীতৎ। নদী-বাঁকে—নদীর বাঁকে—ষষ্ঠীতৎ। তরুতলে—তরুর তলে—ষষ্ঠীতৎ। কুলবধূ—কুলের বধূ—ষষ্ঠীতৎ। অলস-স্বপন-জাল—স্বপনের জাল—ষষ্ঠীতৎ; অলস যে স্বপন-জাল—কর্মধা। স্বপন-ভরে—স্বপনের ভরে—ষষ্ঠীতৎ, তাহাতে। ধরাধামে—ধরা রূপ ধামে—রূপক-কর্মধা।

প্রকৃতি-প্রত্যয় ॥ নধর<সং নবধর। সমীর—সম্-ঈর্+অ (কর্তৃবা)। বাঁক<বক্র। জেলে<জাইল্যা<জালিয়া (=জাল+ইয়া)। পথিক—পথিন্+ক। মেঠো<মাউঠ্যা<মাঠুয়া (=মাঠ+উয়া)। ক্লান্ত—ক্লম্+ত (কর্তৃবা)। বিরাম—বি-রম্+অ (ভাববা)। শ্বাস—শ্বস্+ঘঞ্ (ভাববা)।

পদ-পরিবর্তন ॥ জগৎ (বি)—জাগতিক (বিণ)। কাতর (বিণ)—কাতরতা, কাতরিমা (বি)। মেঠো (বিণ)—মাঠ (বি)। লাজ (বি)—লাজুক

(বিণ)। অলস (বিণ)—আলস্য, অলসতা (বি)। হৃদয় (বি)—হৃদ্য (বিণ)। ব্যথা (বি)—ব্যথিত (বিণ)।

গদ্যরূপ ॥ ভুলে—ভুলিয়া। পড়ে—পড়িয়া। পড়েছে—পড়িয়াছে। হেলে—হেলিয়া। কাঁপিছে—কাঁপিতে[illegible] [illegible]রে—কাতরভাবে। লুকায়ে—লুকাইয়া। শুয়ে—শুইয়া। বেঁধে—বাঁধিয়া। [illegible]য়—চলিয়া যায়। দিয়ে—দিয়া। নিয়ে—নিয়া, লইয়া। চেয়ে—চাহি[illegible] [illegible]লায়ে—এলাইয়া। মুদে আসে—মুদিয়া আসে। চাহি—চাহিয়া। পড়িছে—পড়িতেছে। খসে—খসিয়া।

॥ *পুরাতন ভৃত্য* ॥

সন্ধি ॥ নির্বোধ=নিঃ+বোধ। বাপান্ত=বাপ+অন্ত। কণ্ঠাগত=কণ্ঠ+আগত। ব্যাধি=বি+আধি।

কারক-বিভক্তি ॥ ভূতের—কর্মপ্রবচনীয় যোগে 'এর' বিভক্তি। বেত, বেতন—কর্মে শূন্যবিভক্তি। কোথা—অধিকরণে শূন্যবিভক্তি। দরজার—কর্মপ্রবচনীয় যোগে 'র' বিভক্তি। ঘরদুয়ার—কর্তায় শূন্যবিভক্তি। কেষ্টারে—কর্মে 'রে' বিভক্তি। বাজার—অধিকরণে শূন্যবিভক্তি। তার—কর্ম-সম্বন্ধে 'র' বিভক্তি। টিকি—কর্মে শূন্যবিভক্তি। তারে—কর্মে 'রে' বিভক্তি। টাকা—কর্মে শূন্যবিভক্তি। দালালগিরি—কর্মে শূন্যবিভক্তি। পতির, সতীর—কর্তৃ-সম্বন্ধে 'র' বিভক্তি। পোঁটলাপুঁটলি, বলয়, বাক্স—কর্মে শূন্যবিভক্তি। প্রাণটা—কর্মে শূন্যবিভক্তি। ছয়-সাতে—কর্তায় 'এ' বিভক্তি। বসন্তে—করণে 'এ' বিভক্তি। ব্যাধিখরশরে—করণে 'এ' বিভক্তি। জ্বরে—কর্তায় 'এ' বিভক্তি। তীর্থ—কর্মে শূন্যবিভক্তি।

সমাস ॥ নির্বোধ—নাই বোধ যাহার—নঞ্-বহুব্রী। প্রাণপণে—প্রাণকে পণ—দ্বিতীয়াতৎ, তাহাতে। মহাকলরবে—কল যে রব—কর্মধা; মহা যে কলরব—কর্মধা, তাহাতে। হতভাগা—হত ভাগ [ভাগ্য] যাহার—বহুব্রী। রুদ্রমূর্তি—রুদ্র মূর্তি যাহার—বহুব্রী। ঘরদুয়ার—ঘর ও দুয়ার—দ্বন্দ্ব। অকাতর—নয় কাতর—নঞ্তৎ। শ্রীবৃন্দাবন—শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন—মধ্যপ-কর্মধা। রশারশি—রশি ও রশি—দ্বন্দ্ব। কষাকষি—কষিয়া কষিয়া যে কাজ—ব্যতিহার-বহুব্রী। নিবারণ—নাই বারণ যাহার—বহুব্রী। রেলগাড়ি—রেলবাহিত গাড়ি—মধ্যপ-কর্মধা। কণ্ঠাগত—কণ্ঠকে আগত—দ্বিতীয়াতৎ। ব্রজবালা—ব্রজের বালা—ষষ্ঠীতৎ। বনমালা—বনের মালা—ষষ্ঠীতৎ। বনমালী—বনমালা পরেন যিনি—উপপদতৎ। চিরবসন্ত—চিরব্যাপিয়া বসন্ত—দ্বিতীয়াতৎ। ব্যাধিখরশরে—খর যে শর—কর্মধা; ব্যাধিরূপ খরশর—রূপক-কর্মধা, তাহাতে। নিশিদিন—নিশি ও দিন—দ্বন্দ্ব। বিদেশে—নয় দেশ—নঞ্তৎ, তাহাতে। মাঠাকুরাণীরে—যিনি মা, তিনিই ঠাকুরাণী—কর্মধা, তাঁহারে। কালব্যাধিভার—ব্যাধির ভার—ষষ্ঠীতৎ; কালরূপ

ব্যাধিভার—রূপক-কর্মধা। জ্ঞানহীন—জ্ঞানের দ্বারা হীন—তৃতীয়াতৎ। চিরসাথি—চির ব্যাপিয়া সাথি—দ্বিতীয়াতৎ।

প্রকৃতি-প্রত্যয় ॥ পুরাতন—পুরা + তন। ভৃত্য – ভৃ + ক্যপ্। বাপান্ত—বাপ + অন্ত। চেতন—চিত্ + অন। চীৎকার – চীৎ-কৃ + ঘঞ্ [ভাববা]। তাড়া—তাড়্ + আ। সাড়া – সাড়্ + আ। নিমেষ – নি-মেষ্ + ঘঞ্। সাধা—সাধ্ + আ। কর্ত্রী—কর্তৃ + ঈ। শাসন—শাস্ + অনট্। বসন—বস্ + অনট্। অশন—অশ্ + অনট্। বুদ্ধি—বুধ্ + ক্তি [ভাববা]। বর্ধমান—বৃধ্ + শানচ্। প্রসন্ন—প্র-সদ্ + ক্ত। দালালগিরি – দালাল + গিরি। পুণ্য – পু + ণ্যৎ। নিবারণ—নি-বৃ + অনট্। প্রশান্ত—প্র-শম্ + ক্ত। স্পর্ধা—স্পর্ধ্ + ঘঞ্ + অ। পরম – পর + ম। বাসা—বাস্ + আ। আরাম—আ-রম্ + ঘঞ্। তীর্থ—তৃ + থ [কর্মবা]।

লিঙ্গান্তর ॥ ভূত—পেত্নী। গিন্নি—কর্তা। গাধা—গাধী। কর্ত্রী—কর্তা। বেটা—বেটী। পরিবার—স্বামী। পতি—পত্নী। গৃহিণী—কর্তা। কর্তা - গৃহিণী।

পদ-পরিবর্তন ॥ চোর (বিণ)—চৌর্য (বি)। প্রয়োজন (বি)—প্রয়োজনীয় (বিণ)। নিদ্রা (বি)—নিদ্রালু, নিদ্রিত (বিণ)। পিত্ত (বি) পৈত্তিক (বিণ)। মায়া (বি)—মায়াবী (বিণ)। ত্যাগ (বি)—ত্যক্ত (বিণ)। শাসন (বি)—শাসিত (বিণ)। বুদ্ধি (বি)—বুদ্ধিমান্ (বিণ)। প্রসন্ন (বিণ)—প্রসাদ, প্রসন্নতা (বি)। সতী (বিণ)—সতীত্ব (বি)। গৃহিণী (বিণ)—গৃহিণীপনা (বি)। কষ্ট (বি)—কষ্টকর (বিণ)। নিবারণ (বি)—নিবৃত্ত (বিণ)। প্রশান্ত (বিণ)—প্রশান্তি (বি)। স্পর্ধা (বি)—স্পর্ধিত (বিণ)। দক্ষিণ (বিণ)—দাক্ষিণ্য (বি)। ভঙ্গ (বি)—ভঙ্গিল (বিণ)। জল (বি)—জলীয় (বিণ)। কর্তা (বিণ)—কর্তৃত্ব (বি)। ভয় (বি)—ভীত (বিণ)। জ্ঞানহীন (বিণ)—জ্ঞানহীনতা (বি)। বন্ধ (বি)—বদ্ধ (বিণ)।

গদ্যরূপ ॥ দেই—দিই। যবে—যখন। কেষ্টারে—কেষ্টাকে। লয়ে—লইয়া। তারে—তাহাকে। মোর—আমার। পেনু—পাইলাম। বারেক - একবার। তায়—তাহাতে। বলিনু—বলিলাম। নহিলে—না হইলে। ধায়—ধাবিত হয়। হেরিলাম—দেখিলাম। হেনমতে—এইভাবে। সহিব—সহ্য করিব। দুষি—দোষ দিই। হনু—হইলাম। হেরি—দেখিয়া। নমিনু—নমস্কার করিলাম। কোথা—কোথায়। শিয়রে—মাথার কাছে। শুধায়—জিজ্ঞাসা করে। শিরে—মাথায়। পুন—পুনরায়। লভিয়া—লাভ করিয়া। তাহারে—তাহাকে। গেনু—গেলাম। ফিরিনু—ফিরিলাম।

সন্ধি ॥ দিগ্‌জয়ী = দিক্ + জয়ী। দিগ্‌গজ = দিক্ + গজ। চতুর্দোলায় = চতুঃ + দোলায়। প্রেমাবেশে = প্রেম + আবেশে। পরমাগ্রহে = পরম + আগ্রহে। সমুচিত = সম্ + উচিত। চরণাশ্রিত = চরণ + আশ্রিত। গোষ্পদে = গো + পদে (নিপাতনে)। দিগ্‌বিজয়ীর = দিক্ + বিজয়ীর।

কারক-বিভক্তি ॥ ব্রজধামে—অধিকরণে 'এ' বিভক্তি। রণমদে—করণে 'এ' বিভক্তি। চতুর্দোলায় অধিকরণে 'য়' বিভক্তি। ভয়ে—করণে 'এ' বিভক্তি। সবে—কর্তায় 'এ' বিভক্তি। পুঁথিপত্র—কর্মে শূন্যবিভক্তি। পাণ্ডিত্যের—করণ-সম্বন্ধে 'এর' বিভক্তি। প্রেমাবেশে—করণে 'এ' বিভক্তি। মোরে—কর্মে 'রে' বিভক্তি। কণ্ঠে—অপাদানে 'এ' বিভক্তি। শশকে—কর্মে 'এ' বিভক্তি। মল্লেরে—কর্মে 'এরে' বিভক্তি। প্রশ্নবাণ—কর্মে শূন্যবিভক্তি। জনতায়—কর্তায় 'য়' বিভক্তি। সনাতনে—কর্মে 'এ' বিভক্তি। গায়—অধিকরণে 'য়' বিভক্তি। অন্নজল—কর্মে শূন্যবিভক্তি। শূকরীবিষ্ঠা—কর্মে শূন্যবিভক্তি। তোমা—কর্মে শূন্যবিভক্তি। তায়—করণে 'য়' বিভক্তি। কোপের কর্ম-সম্বন্ধে 'এর' বিভক্তি। তল—কর্মে শূন্যবিভক্তি। চোখে—অপাদানে 'এ' বিভক্তি। বসনে—করণে 'এ' বিভক্তি। শ্রীজীবে—কর্মে 'এ' বিভক্তি। উপদেশে—করণে 'এ' বিভক্তি। জীবে—কর্মে 'এ' বিভক্তি। সন্তানে—কর্মে 'এ' বিভক্তি। অবিচারে—সম্প্রদানে 'এ' বিভক্তি। শিশুর—কর্মপ্রবচনীয়যোগে 'র' বিভক্তি। ধারায়—করণে 'য়' বিভক্তি। পরশে—করণে 'এ' বিভক্তি।

সমাস ॥ ত্রিরত্ন—তিন রত্নের সমাহার—দ্বিগু। দিগ্‌জয়ী—দিককে জয় করিয়াছেন যিনি—উপপদতৎ। দিগ্‌গজ—দিকরূপ গজ—রূপক-কর্মধা। বীরপণ্ডিত—বীর যে পণ্ডিত—কর্মধা। ব্রজধাম—যাহা ব্রজ, তাহাই ধাম কর্মধা। রণমদে—রণরূপ মদ—রূপক-কর্মধা, তাহাতে। পঙ্কজবনে—পঙ্কে জন্মে যাহা—উপপদতৎ; তাহার বন—ষষ্ঠীতৎ। অশ্বমুণ্ডে—অশ্বের মুণ্ড—ষষ্ঠীতৎ; তাহাতে। চতুর্দোলায়—চারি দোলার সমাহার—দ্বিগু। বিজয়মাল্য—বিজয়-সূচক মাল্য—মধ্যপ-কর্মধা। জয়নাদ—জয়-সূচক শব্দ—মধ্যপ-কর্মধা। অনুচর—অনু পশ্চাতে চরে যে—উপপদতৎ। পুঁথিপত্র—পুঁথি ও পত্র—দ্বন্দ্ব। সাধনভজন-রত—সাধন ও ভজন—দ্বন্দ্ব, তাহাতে রত—সপ্তমীতৎ। বিচারমল্ল—বিচারে মল্ল—সপ্তমীতৎ। প্রেমাবেশে—প্রেমের আবেশ—ষষ্ঠীতৎ, তাহাতে। পরমাগ্রহে—পরম আগ্রহ—কর্মধা, তাহাতে। জয়-ভিখারীর—জয়ের জন্য ভিখারী—চতুর্থীতৎ, তাহার। বিজয়গর্বে—বিজয়-জনিত গর্ব—মধ্যপ-কর্মধা। ভয়ে-বিস্ময়ে—ভয়ে ও বিস্ময়ে—অলুক্ দ্বন্দ্ব। সিক্তবসনে—সিক্ত যে বসন—কর্মধা, তাহাতে। প্রতিফল—ফলের বিপরীত—অব্যয়ীভাব। চরণাশ্রিত—চরণে আশ্রিত—সপ্তমীতৎ। জ্ঞানসাগরের—জ্ঞানরূপ সাগর—রূপক-কর্মধা, তাহার। জয়গৌরবে—জয়ের গৌরব—ষষ্ঠীতৎ, তাহাতে। রণে-আহ্বানবাণী—রণে আহ্বান—অলুক্‌তৎ; তাহার সূচক বাণী—মধ্যপ-কর্মধা। অট্টহাস্য—অট্ট যে হাস্য—কর্মধা।

গোষ্পদে—গো-র পদ—ষষ্ঠীতৎ, তাহাতে। পুরবাসী—পুরে বাস করে যে—উপপদ-তৎ। প্রশ্নবাণ—প্রশ্নরূপ বাণ—রূপক-কর্মধা। অবনতশির—অবনত শির যাহার—বহুব্রী। বিতণ্ডাবীর—বিতণ্ডায় বীর—সপ্তমীতৎ। শুভসংবাদ—শুভ যে সংবাদ—কর্মধা। বিজয়-বারতা—বিজয়-সূচক বারতা—মধ্যপ-কর্মধা। অন্নজল—অন্ন ও জল—দ্বন্দ্ব। যশ-প্রতিষ্ঠা—যশ ও প্রতিষ্ঠা—দ্বন্দ্ব। মুখদর্শন—মুখকে দর্শন—দ্বিতীয়া তৎ। গুরুমর্যাদা—গুরুর মর্যাদা—ষষ্ঠীতৎ। জয়গৌরব—জয়ের গৌরব—ষষ্ঠীতৎ। কুসুমকোমল—কুসুমের ন্যায় কোমল—উপমান-কর্মধারয়। কঙ্কালসার—কঙ্কাল সার যাহাতে—বহুব্রী। দিগ্‌বিজয়ীর—দিককে বিজয় করে যে—উপপদতৎ, তাহার।

প্রকৃতি-প্রত্যয়॥ পণ্ডিত—পণ্ডা + ইতচ্। মত্ত—মদ্ + ক্ত [কর্তৃবা]। দন্তী—দন্ত + ঈ। পঙ্কজ—পঙ্ক-জন্ + ড। চারণ—চর্ + ণিচ্ + অনট্। ভয়—ভী + অল্। সাধন—সাধ্ + অনট্। ভজন—ভজ্ + অনট্। রত—রম্ + ক্ত। পাণ্ডিত্য—পণ্ডিত + ষ্ণ্য। খ্যাতি—খ্যা + ক্তি। অভিযান—অভি-যা + অনট্। আবেশ—আ-বিশ্ + ঘঞ্। যুদ্ধ—যুধ্ + ক্ত [ভাববা]। পরম—পর + ম। আগ্রহ—আ-গ্রহ্ + ঘঞ্। বিজয়—বি-জি + অল্। পত্রী—পত্র + ঈ। ভিখারী—ভিখ্ + আরী। সূর্য—সৃ + যৎ [কর্তৃবা]। জনতা—জন + তা। বিস্ময়—বি-স্মি + ঘঞ্ [ভাববা]। সিক্ত—সিচ্ + ক্ত [কর্মবা]। স্নান—স্না + অনট্। আস্ফালন—আ-স্ফল্ + ণিচ্ + অনট্ [ভাববা]। সনাতন—সনা + তন। ধৈর্য—ধীর + ষ্ণ্য। আশ্রিত—আ-শ্রি + ক্ত। শিষ্য—শাস্ + যৎ। সন্তান—সম্-তন্ + অনট্। গৌরব—গুরু + ষ্ণ। আহ্বান—আ-হ্বে + অনট্। কেশরী—কেশর + ইন্। শশক—শশ + ক। কুতূহলী—কুতূহল + ঈ। পুরবাসী—পুর-বস্ + ইন্। শাণিত—শাণ + ইতচ্। খণ্ডিত—খণ্ড + ইতচ্। দণ্ডিত—দণ্ড + ইতচ্। দাম্ভিক—দম্ভ + ষ্ণিক। অবনত—অব-নম্ + ক্ত [কর্মবা]। পুলকিত—পুলক + ইতচ্। প্রতিষ্ঠা—প্রতি-স্থা + ঘঞ্ [ভাববা] + আ। অনুনয়—অনু-নী + অল্। হৃদয়—হৃ (+ দ্) + অয় [ভাববা]। অবিরাম—নঞ্-বি-রম্ + ঘঞ্। কাতরতা—কাতর + তা। বৈষ্ণব—বিষ্ণু + ষ্ণ। বিকৃত—বি-কৃ + ক্ত [ভাববা]। গুরুতর—গুরু + তর। অপরাধ—অপ-রাধ্ + ঘঞ্। প্রয়োজন—প্র-যুজ্ + অনট্ [ভাববা]। সহিষ্ণু—সহ্ + ইষ্ণু। অদৃষ্ট—নঞ্-দৃশ্ + ক্ত। উপদেশ—উপ-দিশ্ + ঘঞ্। অভিমান—অভি-মান্ + ঘঞ্। দীনতা—দীন + তা। অপরাধী—অপ-রাধ্ + ইন্। অরুণ—ঋ + উন। ব্রজ—ব্রজ্ + ঘঞ্।

লিঙ্গান্তর॥ ভিখারী—ভিখারিনী। সূর্য—সূর্যা, সূরী। শিষ্য—শিষ্যা। তরুণ—তরুণী। পুরবাসী—পুরবাসিনী। শূকরী—শূকর। বৈষ্ণব—বৈষ্ণবী। বালক—বালিকা।

পদ-পরিবর্তন॥ পণ্ডিত (বিণ)—পাণ্ডিত্য (বি)। মত্ত (বিণ)—মত্ততা (বি)। খ্যাতি (বি)—খ্যাত (বিণ)। মৃদু (বিণ)—মৃদুতা (বি)। স্নান (বি)—স্নাত (বিণ)। দম্ভ (বি)—দাম্ভিক (বিণ)। আশ্রিত (বিণ)—আশ্রয় (বি)।

গৌরব (বি)—গুরু (বিণ)। তর্ক (বি)—তার্কিক (বিণ)। শাণিত (বিণ)—শাণ (বি)। খণ্ডিত (বিণ)—খণ্ড (বি)। কুতূহলী (বিণ)—কুতূহল (বি)। অবনত (বিণ)—অবনতি (বি)। পাণ্ডুর (বিণ)—পাণ্ডুরতা (বি)। পুলকিত (বিণ)—পুলক (বি)। প্রহর (বি)—প্রাহরিক (বিণ)। ব্যথা (বি)—ব্যথিত (বিণ)। কাতর (বিণ)—কাতরতা (বি)। বিরূপ (বিণ)—বিরূপতা (বি)। অপরাধ (বি)—অপরাধী (বিণ)। প্রয়োজন (বি)—প্রয়োজনীয় (বিণ)। বর্জন (বি)—বর্জিত (বিণ)। উপদেশ (বি)—উপদিষ্ট (বিণ)। শিক্ষা (বি)—শিক্ষিত (বিণ)। অভিমান (বি)—অভিমানী (বিণ)। দয়া (বি)—দয়ালু (বিণ)। মূঢ় (বিণ)—মূঢ়তা (বি)। দেহ (বি)—দৈহিক (বিণ)। শিশু (বিণ)—শৈশব (বি)। শুচি (বিণ)—শুচিতা (বি)।

গদ্যরূপ ॥ উড়ায়ে—উড়াইয়া। গলে—গলায়। পাছে—পিছনে। আগায়—অগ্রসর হয়। মজি—মজিয়া। দোঁহে—দুইজনে। তব—তোমার। মোরে—আমাকে। জিনি—জয় করিয়া। কভু—কখনও। বধে—বধ করে। সেথা—সেখানে। হানিতে—আঘাত করিতে। বারতা—বার্তা। পিছে—পিছনে। তোমা—তোমাকে। ঠাঁই—স্থান। তায়—তাহাতে। ত্যজিলে—তাহা করিলে। গরব—গর্ব। জিনিবারে—জয় করিতে। ত্যজিব—ত্যাগ করিব। তোমায়—তোমাকে। চমকি—চমকিত হইয়া। হেনেছি—আঘাত করিয়াছি। তারে—তাহাকে। যাতনা—[illegible]ড়াইয়া। তিতিল—ভিজিল।

॥ হাট ॥

সন্ধি ॥ নির্জন = নিঃ + জন। [illegible] নিঃ + রব।

কারক-বিভক্তি ॥ সেথা—অধিকরণে শূন্যবিভক্তি। সবে—কর্তায় 'এ' বিভক্তি। মাঠ—কর্মে শূন্যবিভক্তি। হেথা—অধিকরণে শূন্যবিভক্তি। ওপারের, এপারের—বিশেষণ-সম্বন্ধে 'এর' বিভক্তি। শত হাতে—অপাদানে 'এ' বিভক্তি।

সমাস ॥ বেচা-কেনা—বেচা ও কেনা—দ্বন্দ্ব। শ্রেণীহারা—শ্রেণী হারাইয়াছে যে—উপপদতৎ। দোচালা—দুই চালার সমাহার—দ্বিগু। বিদ্রূপ-বাঁশি—বিদ্রূপসূচক বাঁশি—মধ্যপ-কর্মধা। চেনা-অচেনার—চেনা ও অচেনা—দ্বন্দ্ব; তাহার। চরণ-চিহ্ন—চরণের চিহ্ন—ষষ্ঠীতৎ। চেনাচিনি, জানাজানি, টানাটানি, হানাহানি—ব্যতিহার বহুব্রী। কানাকড়ি—কানা যে কড়ি—কর্মধা। শিশিরবিমল—বিগত মল যাহা হইতে—বহুব্রী; শিশিরের মত বিমল—উপমান-কর্মধা। ক্রেতা-বিক্রেতা—ক্রেতা ও বিক্রেতা—দ্বন্দ্ব। দিবসরাত্রি—দিবস ও রাত্রি—দ্বন্দ্ব। চিরকাল—চির ব্যাপিয়া কাল—দ্বিতীয়াতৎ।

প্রকৃতি-প্রত্যয় ॥ প্রভাত—প্র-ভা + ক্ত (ভাববা)। ক্লান্ত—ক্লম্ + ক্ত (কর্তৃবা)। আহ্বান—আ-হ্বে + অনট্ (ভাববা)। জীর্ণ—জৃ + ক্ত (কর্তৃবা)। একক—এক + ক। ছিন্ন—ছিদ্ + ক্ত (কর্মবা)। ক্রেতা—ক্রী + তৃচ্। বিক্রেতা—বি-ক্রী + তৃচ্। নূতন—নূ (<নব) + তন্।

পদ-পরিবর্তন ॥ হাট (বি)—হেটো (বিণ)। সন্ধ্যা (বি)—সান্ধ্য (বিণ)। মাঠ (বি)—মেঠো (বিণ)। নিশা (বি)—নৈশ (বিণ)। আহ্বান (বি)—আহূত (বিণ)। জীর্ণ (বিণ)—জীর্ণতা (বি)। ছিন্ন (বিণ)—ছেদ (বি)। নীরব (বিণ)—নীরবতা (বি)। ব্যথা (বি)—ব্যথিত (বিণ)। নূতন (বিণ)—নূতনত্ব (বি)। উদার (বিণ)—উদারতা, ঔদার্য (বি)।

গদ্যরূপ ॥ মুদিল—মুদ্রিত করিল। নয়ান—নয়ন। সেথা—সেখানে। ঠাঁই—স্থান। হেথা—এখানে। সহি—সহ্য করিয়া। পরখের—পরীক্ষার।

দশম শ্রেণী

॥ পদ্যাংশ ॥

॥ হিমালয়-ভ্রমণ ॥

সন্ধি ॥ হিমালয় = হিম + আলয়। বয়স্ক = বয়ঃ + ক। দাবানলে = দাব + অনলে। দুর্দশাগ্রস্ত = দুঃ + দশাগ্রস্ত। যানারোহণে = যান + আরোহণে। হরিদ্বর্ণ = হরিৎ + বর্ণ। পল্লবাবৃত = পল্লব + আবৃত। কদাকার = কু (কদ্) + আকার। নিষ্কলঙ্ক = নিঃ + কলঙ্ক। বনান্তরে = বন + অন্তরে। উচ্চৈঃস্বরে = উচ্চৈঃ + স্বরে। সায়ংকালে = সায়ম্ + কালে। পরস্পর = পরঃ + পর। মহোচ্চতার = মহা + উচ্চতার। আচ্ছন্ন = আ + ছন্ন। অপেক্ষা = অপ + ঈক্ষা। পত্রাবৃত = পত্র + আবৃত। আশ্চর্য = আ + চর্য। সম্ভাবনা = সম্ + ভাবনা। বনস্পতি = বনঃ + পতি। তথাপি = তথা + অপি। পুনর্বার = পুনঃ + বার। প্রত্যাশায় = প্রতি + আশায়। সন্নিকট = সম্ + নিকট। তদ্রূপ = তৎ + রূপ। অপরাহ্ণে = অপর + অহ্নে। স্রোতস্বতী = স্রোতঃ + বতী। রোষান্বিতা = রোষ + অনু + ইতা। সমাগমে = সম্ + আগমে। পরিষ্কার = পরি + কার। পরিচ্ছন্ন = পরি + ছন্ন। রাজাসনে = রাজ + আসনে। দুর্লভ = দুঃ + লভ। নির্গত = নিঃ + গত। দীপালোকের = দীপ + আলোকের। তুষারাবৃত = তুষার + আবৃত। মনোহর = মনঃ + হর। প্রত্যাবর্তন = প্রতি + আবর্তন। নির্বিঘ্নে = নিঃ + বিঘ্নে।

কারক-বিভক্তি ॥ দাবানলে—করণে 'এ' বিভক্তি। পক্ষীতেও—কর্তায় 'এ' বিভক্তি। বিবিধপ্রকারের—বিশেষণ সম্বন্ধে-'এর' বিভক্তি। হস্তের—করণে 'এর' বিভক্তি। গন্ধে—করণে 'এ' বিভক্তি। স্বর্ণবর্ণে—করণে 'এ' বিভক্তি। সূর্য-কিরণে

—করণে সপ্তমী। কাহাকেও—অপাদানে 'কে' বিভক্তি। বৃক্ষের—অপাদানে বিভক্তি। ইহাতে—অপাদানে 'তে' বিভক্তি। বৃক্ষের—সম্প্রদানে 'এর' বিভক্তি। জীবের—সম্প্রদানে 'এর' বিভক্তি। প্রস্তরখণ্ডে—করণে 'এ' বিভক্তি। সমুদ্র-সমাগমে—নিমিত্তে 'এ' বিভক্তি। দাবানলের—কর্ম-সম্বন্ধে 'এর' বিভক্তি।

সমাস॥ পদব্রজেই—পদের দ্বারা ব্রজ—তৃতীয়াতৎ; তাহাতেই। তরুণবয়স্ক—তরুণ বয়স যাহার—বহুব্রী। দাবানলে—দাবের অনল—ষষ্ঠীতৎ, তাহাতে। দুর্দশাগ্রস্ত—দুঃ দশা—কর্মধা, তাহার দ্বারা গ্রস্ত—তৃতীয়াতৎ। যানারোহণ—যানে আরোহণ—সপ্তমীতঃ। দৃষ্টিপাত—দৃষ্টির পাত—ষষ্ঠীতৎ। হরিদ্বর্ণ—হরিৎ বর্ণ যাহার—বহুব্রী। ঘন-পল্লবাবৃত—ঘন পল্লব—কর্মধা; তাহার দ্বারা আবৃত—তৃতীয়াতৎ। কদাকার—কু [কদ্] আকার—কর্মধা। বনান্তরে—অন্য বন—নিত্য সমাস। অখিলমাত্তার—নয় খিল—নঞ্‌তৎ; তাহার মাতা—ষষ্ঠীতৎ; তাহার। আপাদমস্তক—পাদ হইতে মস্তক পর্যন্ত—অব্যয়ীভাব। গোধূমক্ষেত্র—গোধূমের ক্ষেত্র—ষষ্ঠীতৎ। তৃণশূন্য—তৃণের দ্বারা শূন্য—তৃতীয়াতৎ। নিকটস্থ—নিকটে থাকে যে—উপপদতৎ। বনাকীর্ণ—বনের দ্বারা আকীর্ণ—তৃতীয়াতৎ। মহোচ্চতায়—মহৎ উচ্চতা—কর্মধা; তাহার। সশঙ্কিত [অশুদ্ধ]—শঙ্কার সহিত বর্তমান—[সশঙ্ক বা শঙ্কিত—শুদ্ধরূপ] বহুব্রী। মনুষ্যবসতি—মনুষ্যপূর্ণ বসতি—মধ্যপ-কর্মধা। পত্রাবৃত—পত্রের দ্বারা আবৃত—তৃতীয়াতৎ। সতেজ—তেজের সহিত বর্তমান—ষষ্ঠীতৎ। শ্রেণীবদ্ধ—শ্রেণীর দ্বারা বদ্ধ—তৃতীয়াতৎ। বিনীতভাবে—বিনীত ভাব—কর্মধা; তাহাতে। মনুষ্যকৃত—মনুষ্যের দ্বারা কৃত—তৃতীয়াতৎ। বনস্পতি—বনের পতি—ষষ্ঠীতৎ। তুষার-পরিণত—তুষারে পরিণত—সপ্তমীতঃ। প্রসন্নমনে—প্রসন্ন মন—কর্মধা; তাহাতে। রৌপ্যপত্রের—রৌপ্যের পত্র—ষষ্ঠীতৎ বা রৌপ্য-নির্মিত পত্র—মধ্যপ-কর্মধা; তাহাতে। নিম্নগামী—নিম্নে গমন করে যে—উপপদতৎ। পঞ্চবিংশতি—পঞ্চ-অধিক বিংশতি—মধ্যপ-কর্মধা। অপরাহ্ণে—নয় পর—নঞ্‌তৎ; অহনের অপর—একদেশী সমাস; তাহাতে। রোষান্বিতা—রোষের দ্বারা অন্বিত—তৃতীয়াতৎ (স্ত্রী)। সর্বনিয়ন্তা—সর্ব নিয়ন্ত্রণ করে যে—উপপদতৎ। সমুদ্র-সমাগমে—সমুদ্রে সমাগম—সপ্তমীতৎ, তাহাতে। উপত্যকাভূমি—যাহা উপত্যকা, তাহাই ভূমি—অব্যয়ীভাব। সংকট-স্থান—সংকটপূর্ণ স্থান—মধ্যপ-কর্মধা। দৌড়াদৌড়ি—দৌড়িয়া দৌড়িয়া যে খেলা—ব্যতিহার-বহুব্রী। রাজাসনে—রাজার নিমিত্ত আসন—চতুর্থীতৎ। অগ্নিবাণের—অগ্নিময় বাণ—মধ্যপ কর্মধা। দূরস্থ—দূরে থাকে যে—উপপদতৎ। উৎসব-রজনী—উৎসবপূর্ণ রজনী—মধ্যপ-কর্মধা। সর্বভুক্—সর্ব ভক্ষণ করে যে—উপপদতৎ। দুপ্রহরের—দুই প্রহরের সমাহার—দ্বিগু। তুষারাবৃত—তুষারের দ্বারা আবৃত—তৃতীয়াতৎ। মহদ্ভয়—মহৎ ভয় যাহা হইতে—বহুব্রী। তুষারজীর্ণ তুষারের দ্বারা জীর্ণ—তৃতীয়াতৎ। মনোহর—মনকে হরণ করে যে—উপপদতৎ।

প্রকৃতি-প্রত্যয়॥ দুগ্ধ—দুহ্ + ক্ত (কর্তৃবা)। পান—পা + অনট্ (ভাববা)। রৌদ্র—রুদ্র + ষ্ণ (ভাববা)। ভগ্ন—ভন্‌জ্ + ক্ত (কর্মবা)। দীপ্তি—দীপ্ + ক্তি (ভাববা)। ভূমিষ্ঠ—ভূমি-স্থা + ক। প্রণত—প্র-নম্ + ক্ত (কর্তৃবা)। দগ্ধ—দহ্ +

ক্ত (কর্মবা)। আবৃত—আ-বৃ+ক্ত (কর্মবা)। দৃষ্ট—দৃশ্+ক্ত (কর্মবা)। আহার—আ-হৃ+ঘঞ্ (ভাববা)। সহজ—সহ-জন্+ড। নয়ন—নী+অনট্ (ভাববা)। আকর্ষণ+আ-কৃষ্+অনট্ (ভাববা)। সৌন্দর্য—সুন্দর+ষ্যঃ। লাবণ্য—লবণ+ষ্য। পবিত্রতা—পূ+ইত্র+তা। পরম—পর+ম্। বর্তমান—বৃৎ+শানচ্। স্নেহ—স্নিহ্+ঘঞ্ (ভাববা)। সিক্ত—সিচ্+ক্ত (কর্মবা)। নিমগ্ন—নি-মস্জ্+ক্ত (কর্তৃবা)। উপস্থিত—উপ-স্থা+ক্ত (কর্তৃবা)। আবাস—আ-বস্+ঘঞ্ (ভাববা)। ব্যবধান-বি-অব-ধা+অনট্ (ভাববা)। নিকটস্থ—নিকট স্থা+ক। আকীর্ণ—আ-কৄ+ক্ত (কর্মবা)। শোভা—শুভ্+ঘঞ্ (ভাববা)+আ। বর্ধন—বৃধ্+অনট্ (ভাববা)। গরিমা—গুরু+ইমন্+আ। পথিক্—পথিন্+ক। ভৃত্য—ভৃ+যৎ। সূর্য—সূর+য বা সৃ+য (কর্তৃবা)। অস্তমিত—অস্ত-মন্+ইত। মানুষ—মনু (+ষ)+ষ্ণ। অবরোহণ—অব-রুহ্ অনট্ (ভাববা)। জীর্ণ—জৄ+ক্ত (কর্তৃবা)। শীর্ণ—শৄ+ক্ত (কর্তৃবা)। পরিত্যাগ—পরি-ত্যজ্+ঘঞ্ (ভাববা)। আশ্চর্য—আ-চর্+যৎ (কর্মবা)। দণ্ডায়মান—দণ্ডায়+শানচ্ (কর্তৃবা)। দৃশ্য—দৃশ্+যৎ (কর্তৃবা)। মহত্ত্ব—মহৎ+ত্ব। নিকৃষ্ট—নি-কৃষ্+ক্ত (কর্তৃবা)। নূতন—নূ (<নব)+তন। উপাসনা—উপ-আস্+অনট্ (ভাববা)+আ। করুণাময়—করুণা+ময়ট্। পক্ব—পচ্+ক্ত (কর্তৃবা)। প্রহৃষ্ট—প্র-হৃষ্+ক্ত (কর্তৃবা)। কর্ষণ—কৃষ্+অনট্ (ভাববা)। উপস্থিত—উপ-স্থা+ক্ত (কর্তৃবা)। প্রশস্ত—প্র শস্+ক্ত (কর্তৃবা)। বহমানা—বহ্+শানচ্+আ (স্ত্রী)। ক্রমিক—ক্রম+ইক। স্বীয়—স্ব+ঈয়। আঘাত—আ-হন্+অ (ভাববা)। রোষান্বিতা—রোষ-অনু-ই+ক্ত (কর্তৃবা)+আ (স্ত্রী)। গভীর—গম্+ঈর (অধিকরণবা)। সর্বনিয়ন্তা—সর্ব-নি-যম্+তৃচ্ (কর্তৃবা)। সমুদ্র—সম্-উন্দ্+র (কর্তৃবা)। সমাগম—সম্-আ-গম্+ঘঞ্ (ভাববা)। পরিষ্কার—পরি-কৃ+ঘঞ্ (ভাববা)। পরিচ্ছন্ন—পরি-ছদ্+ক্ত (কর্তৃবা)। বিশ্রাম—বি-শ্রম্+ঘঞ্ (ভাববা)। শয়ন—শী+অনট্ (ভাববা)। মোহিত—মুহ্+ণিচ্+ক্ত (কর্মবা)। বহ্নিমান্—বহ্নি+মতুপ্। অবসান—অব-সো+অনট্ (ভাববা)। ব্যাপ্ত—বি-আপ্+ক্ত (কর্তৃবা)। আক্রমণ-আ-ক্রম্+অনট্ (ভাববা)। প্রস্থান—প্র-স্থা+অনট্ (ভাববা)। দেবতা—দেব+তা (স্বার্থিক)। মহিমা—মহৎ+ইমন্+আ। নিবৃত্তি-নি-বৃত্+ক্তি (ভাববা)। আহ্লাদ—আ-হ্লাদ্+ঘঞ্ (ভাববা)। প্রভাত-প্র-ভা+ক্ত (কর্তৃবা)। লোলুপ—লুপ্+যঙ্লুক্+অ (কর্তৃবা)। ম্লান—ম্লৈ+ক্ত (কর্তৃবা)। মনোহর—মনস্-হৃ+ঘঞ্ (ভাববা)। ধারণ-ধৃ+অনট্ (ভাববা)। প্রত্যাবর্তন—প্রতি-আ-বৃত্+অনট্ (ভাববা)। প্রসাদ—প্র-সদ্+ঘঞ্ (ভাববা)।

পদ-পরিবর্তন। প্রাতঃকাল (বি)—প্রাতঃকালীন (বিণ)। নিবিড় (বিণ)।—নিবিড়তা (বি)। ভগ্ন (বিণ)—ভঙ্গ (বি)। শোভা (বি)—শোভাময় (বিণ)। মূল (বি)—মৌল, মৌলিক (বিণ)। দগ্ধ (বিণ)—দহন (বি)। আরোহণ (বি)—আরূঢ় (বিণ)। পর্বত (বি)—পার্বত, পার্বত্য (বিণ)। চমৎকার (বি)

—চমৎকৃত (বিণ)। সৌন্দর্য (বি)—সুন্দর (বিণ)। বিকশিত (বিণ)—বিকাশ (বি)। স্নেহ (বি)—স্নিগ্ধ (বিণ)। পরম্পরা (বি)—পারম্পরিক (বিণ)। নিবিড় (বিণ)—নিবিড়তা (বি)। বন (বি)—বন্য (বিণ)। শুভ্র (বি)—শৌভ্র (বিণ)। ভূষিত (বিণ)—ভূষণ (বি)। ঋজু (বিণ)—ঋজুতা, আর্জব (বিণ)। কেবল (বিণ)—কৈবল্য (বি)। উচিত (বিণ)—ঔচিত্য (বি)। পরিত্যাগ (বি) —পরিত্যক্ত (বিণ)। বিনীত (বিণ)—বিনয় (বি)। মহত্ত্ব (বি)—মহৎ (বি)। ব্রহ্ম (বি)—ব্রাহ্ম (বিণ)। পবিত্র (বিণ)—পবিত্রতা (বি)। প্রসন্ন (বিণ)—প্রসাদ (বি)। কর্ষণ (বি)—কর্ষিত (বিণ)। গম্ভীর (বিণ)—গাম্ভীর্য (বি)। বিরল (বিণ)—বিরলতা (বি)। শয়ন (বি)—শয়ান, শায়িত (বিণ)। আসন (বি)—আসীন (বিণ)। মোহিত (বিণ)—মোহ (বি)। ধারণ (বি)—ধৃত (বিণ)। আক্রমণ (বি)—আক্রান্ত (বিণ)। চিহ্ন (বি)—চিহ্নিত (বিণ)। প্রজ্বলিত (বিণ)—প্রজ্বলন (বি)। উৎপত্তি (বি)—উৎপন্ন (বিণ)। ব্যাপ্তি (বি)—ব্যাপ্ত (বিণ)। উন্নতি (বি)—উন্নত (বিণ)। নিবৃত্তি (বি)—নিবৃত্ত (বিণ)।

সার্থক বাক্য-রচনা ॥ প্রাতঃকালে—পরদিন **প্রাতঃকালে** আমরা উস্রি নদীর উৎস দেখিতে যাত্রা করিলাম। **পদব্রজে**—কোন যানবাহন না পাইলে আমরা **পদব্রজেই** যাইব। **তরুণবয়স্ক**—সে **তরুণবয়স্ক**, তাহার পক্ষে আমাকে একথা বলা আদৌ যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। **উচ্চৈঃস্বরে**—নির্জন অরণ্যমধ্যে পথ হারাইয়া সে **উচ্চৈঃস্বরে** কাঁদিতে লাগিল। **দুর্দশাগ্রস্ত**—আত্মীয়-স্বজন ও অন্যান্য সহায়-সম্বল হারাইয়া সে অত্যন্ত **দুর্দশাগ্রস্ত** হইয়া পড়িয়াছে। **কদাকার**—উট একটি **কদাকার** প্রাণী। **বহমানা**—আমাদের বাসভবনের সম্মুখেই প্রসন্ন-সলিলা ভাগীরথী **বহমানা**। **বনান্তরে**—সেই বনে শিকার না পাইয়া তাহারা **বনান্তরে** গমন করিল। **আপাদমস্তক**—তাহার অঙ্গভঙ্গী দেখিয়া আমার **আপাদমস্তক** জ্বলিয়া গেল। **প্রসন্নমনে**—বৃদ্ধ দাওয়ায় বসিয়া **প্রসন্নমনে** তামাক টানিতেছিলেন। **বয়ঃক্রম**—বালকটির **বয়ঃক্রম** দ্বাদশ বৎসর হইবে। **নক্ষত্রবেগে**—অগ্নিস্ফুলিঙ্গগুলি **নক্ষত্রবেগে** ছুটিতে লাগিল। **নির্বিঘ্নে**—শুভকার্য **নির্বিঘ্নে** সমাধা হইয়া গেল।

॥ সাগরসঙ্গমে নবকুমার ॥

সন্ধি ॥ সঙ্গম = সম্ + গম। প্রত্যাগমন = প্রতি + আগমন। অন্যান্য = অন্য + অন্য। নাবিক = নৌ + ইক। নৌকারোহীরা = নৌকা + আরোহীরা। কুজ্ঝটিকা = কুৎ + ঝটিকা। দিগন্ত = দিক্ + অন্ত। দিঙ্‌নিরূপণ = দিক্ + নিরূপণ। কথোপকথন = কথা + উপকথন। বারেক = বার + এক। ইতস্ততঃ = ইতঃ + ততঃ। তিরস্কার = তিরঃ + কার। মহাশয় = মহা + আশয়। জগদীশ্বর = জগৎ + ঈশ্বর। সম্বৎসর = সম্ + বৎসর। পশ্চাদাগত = পশ্চাৎ + আগত। জন্মান্তর = জন্ম + অন্তর

দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য = দূরাৎ + অয়ঃ + চক্রনিভস্য। লবণাম্বুরাশের্ধারা = লবণ + অম্বুরাশেঃ + ধারা। চতুর্দিক = চতুঃ + দিক। দিগ্‌ভ্রম = দিক্‌ + ভ্রম। প্রতীক্ষা = প্রতি + ঈক্ষা। সূর্যোদয় = সূর্য + উদয়। কণ্ঠাগতপ্রাণ = কণ্ঠ + আগতপ্রাণ। তরঙ্গান্দোলনকম্প = তরঙ্গ + আন্দোলনকম্প। দিঙ্‌মণ্ডল = দিক্‌ + মণ্ডল। জলোচ্ছ্বাস = জল + উৎ + শ্বাস। প্রাগুক্ত = প্রাক্‌ + উক্ত। উপহাসাস্পদ = উপহাস + আস্পদ। আত্মোপকারী = আত্ম + উপকারী। পুনর্বার = পুনঃ + বার। কাষ্ঠাহরণ = কাষ্ঠ + আহরণ।

কারক-বিভক্তি ॥ একদিন—অধিকরণে শূন্যবিভক্তি। নাবিক দস্যুদিগের—অপাদানে 'এর' বিভক্তি। অনেকেই—কর্তায় 'এ' বিভক্তি। পণ্ডিতে—কর্তায় 'এ' বিভক্তি। ছেলেপিলে—কর্তায় শূন্যবিভক্তি। সম্বৎসর—ক্রিয়াবিশেষণে শূন্যবিভক্তি। সংবাদ—কর্মে শূন্যবিভক্তি। মুখে—অপাদানে 'এ' বিভক্তি। মহাশয়ের—ভাববাচ্যের কর্তায় 'এ' বিভক্তি। তীর্থদর্শনে—করণে 'এ' বিভক্তি। স্রোতে—করণে 'এ' বিভক্তি। পশ্চাৎ—ক্রিয়াবিশেষণে শূন্যবিভক্তি। ভয়ে—ক্রিয়াবিশেষণে 'এ' বিভক্তি। ছেলে—কর্মে শূন্যবিভক্তি। সকলেই—কর্তায় 'এ' বিভক্তি। কুঠারহস্তে—ক্রিয়াবিশেষণে 'এ' বিভক্তি। কাষ্ঠাহরণে—নিমিত্তে 'এ' বিভক্তি। তাহাতে—অপাদানে 'তে' বিভক্তি। ব্যাঘ্রে—কর্তায় 'এ' বিভক্তি। 'শিয়ালে'—কর্তায় 'এ' বিভক্তি। ললাটে—অপাদানে 'এ' বিভক্তি। তাহা—কর্মে শূন্যবিভক্তি। জোয়ারের—নিমিত্তে 'এর' বিভক্তি। কাষ্ঠাহরণে—নিমিত্তে 'এ' বিভক্তি।

সমাস ॥ নাবিকদস্যুদিগের—যাহারা নাবিক, তাহারাই দস্যু—কর্মধা; তাহাদিগের। দলবদ্ধ—দলে বদ্ধ—সপ্তমীতৎ। নৌকারোহীরা—নৌকায় আরোহণ করে যাহারা—উপপদতৎ। সঙ্গিহীন—সঙ্গী দ্বারা হীন—তৃতীয়াতৎ। জগদীশ্বরের—জগতের ঈশ্বর—ষষ্ঠীতৎ; তাহার। পশ্চাদাগত—পশ্চাৎ আগত—সুপ্‌ সুপা। একতান-মন—এক যে তান—কর্মধা; একতান মন যাহার—বহুব্রী। বার-দরিয়ায়—বার (বাহির) যে দরিয়া কর্মধা; তাহাতে। ভয়কাতর—ভয়ের হেতু কাতর—পঞ্চমীতৎ। সশঙ্কচিত্তে—শঙ্কার সহিত বর্তমান—বহুব্রী; সশঙ্ক এমন চিত্ত—কর্মধা; তাহাতে। দিগ্‌ভ্রম—দিকের ভ্রম—ষষ্ঠীতৎ। নিশ্চেষ্ট—নাই চেষ্টা যাহার—বহুব্রী। প্রহরাতীত—প্রহরকে অতীত—দ্বিতীয়াতৎ। সকর্দম—কর্দমের সহিত বর্তমান—বহুব্রী। দূরস্থ—দূরে থাকে যাহা—উপপদতৎ। নীলপ্রভ—নীল প্রভা যাহার—বহুব্রী। উপকূল—কূলের সমীপ—অব্যয়ীভাব। অনতিদূরে—নয় অতিদূরে—নঞ্‌তৎ। মন্দগামী—মন্দ গমন করে যাহা—উপপদতৎ। তীরলগ্ন—তীরে লগ্ন—সপ্তমীতৎ। প্রাতঃকৃত্য-সম্পাদনে—প্রাতঃকালীন কৃত্য—মধ্যপ-কর্মধা; তাহার সম্পাদন—ষষ্ঠীতৎ; তাহাতে। ছেদনযোগ্য—ছেদনের যোগ্য—ষষ্ঠীতৎ। তরঙ্গাভিঘাত—তরঙ্গের অভিঘাত—ষষ্ঠীতৎ। ওষ্ঠাগত—ওষ্ঠকে আগত—দ্বিতীয়াতৎ। নিরাহারে—নাই আহার যাহাতে—বহুব্রী; তাহাতে। উপবাসনিবারণার্থ—উপবাসের নিবারণ—ষষ্ঠীতৎ; তাহার নিমিত্ত—নিত্যসমাস। আত্মোপকারীকে—আত্মার উপকারী—ষষ্ঠীতৎ; তাহাকে। কাষ্ঠাহরণ—কাষ্ঠকে আহরণ—দ্বিতীয়াতৎ।

প্রকৃতি-প্রত্যয়॥ নৌকা—নৌ+ক+আ। গঙ্গা—গম্+গা+আ। সাগর—সগর+ষ্ণ। প্রত্যাগমন—প্রতি+আ+গম্+অনট্ (ভাববা)। নাবিক—নৌ+ইক। হীন—হা+ক্ত (কর্মবা)। ঘোরতর—ঘোর+তর। ব্যাপ্ত—বি+আপ্+ক্ত (কর্মবা)। নিরূপণ—নি-রূপ্+ণিচ্+অনট্ (ভাববা)। প্রাচীন—প্রাচ্+ঈন। জাগ্রৎ—জাগৃ+শতৃ (কর্তৃবা)। জিজ্ঞাসা—জ্ঞা+সন্+আ। ব্যস্ত—বি অস্+ক্ত। উপনীত—উপ-নী+ক্ত। শাস্ত্র—শাস্+ষ্ট্রণ (করণবাচ্য)। গাঢ়—গাহ্+ক্ত (কর্তৃবা)। সূর্য—সৃ+য (কর্তৃবা)। উদয়—উৎ-ই+অ (ভাববা)। রৌদ্র—রুদ্র+ষ্ণ। বিন্যাস—বি-নি-অস্+ঘঞ্ (ভাববা)। ঔৎসুক্য—উৎসুক+ষ্ণ্য। নিবারণ—নি-বারি+অনট্ (ভাববা)। আবরণ—আ-বৃ+অনট্ (করণবাচ্য)। প্রস্তাব—প্র-স্তু+ঘঞ্ (ভাববা)। উচ্ছ্বাস—উৎ-শ্বস্+ঘঞ্ (ভাববা)। অবতরণ—অব-তৃ+অনট্ (ভাববা)। কৃত্য—কৃ+ক্যপ্ (কর্মবা)। উদ্ভিদ—উৎ-ভিদ্+ক্বিপ্ (কর্তৃবা)। আরোহণ—আ+রুহ্+অনট্ (ভাববা)। আহরণ—আ-হৃ+অনট্ (ভাববা)। সম্ভাব্য—সম্-ভূ+ণ্যৎ (কর্মবা)। মন্দীভূত—মন্দ+অভূততদ্ভাবে চ্বি+ভূ+ক্ত (কর্তৃবা)। ব্যাঘ্র—বি-আ-ঘ্রা+ক (কর্তৃবা)। হত্যা—হন্+ক্যপ্ (ভাববা)। প্রতিজ্ঞা—প্রতি-জ্ঞা+অ (ভাববা)+আ। উপবাস—উপ-বস্+অ (ভাববা)। উপকারী—উপকার+ইন্।

পদ-পরিবর্তন॥ প্রত্যাগমন (বি)—প্রত্যাগত (বিণ)। ব্যাপ্ত (বিণ)—ব্যাপ্তি (বি)। ক্রুদ্ধ (বিণ)—ক্রোধ (বি)। কাতর (বিণ)—কাতরতা (বি)। আশঙ্কা (বি)—আশঙ্কিত (বিণ)। বিন্যাস (বি)—বিন্যস্ত (বিণ)। বিসর্জন (বি)—বিসর্জিত (বিণ)। কীর্তিত (বিণ)—কীর্তন (বি)। সমাপ্ত (বিণ)—সমাপ্তি (বি)। অবতরণ (বি)—অবতীর্ণ (বিণ)। প্রবৃত্ত (বিণ)—প্রবৃত্তি (বি)। আহরণ (বি)—আহৃত (বিণ)। উদ্‌বিগ্ন (বিণ)—উদ্‌বেগ (বি)। উত্থিত (বিণ)—উত্থান (বি)। বনবাস (বি)—বনবাসিত (বিণ)।

বিপরীতার্থক শব্দ॥ প্রাচীন—আধুনিক। যুবা—বৃদ্ধ। তিরস্কার—পুরস্কার। পরকাল—ইহকাল। জন্ম—মৃত্যু। প্রবৃত্ত—নিবৃত্ত। দরিদ্র—ধনিক। বন্ধন—মোচন। আরোহণ—অবরোহণ। বিসর্জন—আবাহন। অধম—উত্তম।

সার্থক বাক্য-রচনা॥ **পশ্চাদাগত**—**পশ্চাদাগত** সৈন্যদল মৃত সৈন্যদের স্থান পূরণ করিল। **পূর্ববৎ**—শিশুটি **পূর্ববৎ** কাঁদিতে লাগিল। **অপেক্ষাকৃত**—তিনি বর্তমানে **অপেক্ষাকৃত** সুস্থ। **কণ্ঠাগতপ্রাণ**—ডাকাতদিগের ভয়ে পথিকরা **কণ্ঠাগতপ্রাণ**। **ইত্যবসরে**—আমরা গল্প করিতেছিলাম, **ইত্যবসরে** সেখানে তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

উক্তি-পরিবর্তন॥ যুবা কহিলেন, "যদি শাস্ত্র বুঝিয়া থাকি...সেইজন্তই আসিয়াছি।" (প্রত্যক্ষ উক্তি)>যুবা কহিলেন যে, যদি তিনি শাস্ত্র বুঝিয়া থাকেন তবে তীর্থদর্শনে যেরূপ পরকালের কর্ম হয়, বাটী বসিয়াও সেরূপ হইতে পারে। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তবে তিনি গিয়াছিলেন কেন। যুবা উত্তর করিলেন যে, তিনি

আগেই তাহা বলিয়াছেন। সমুদ্র দেখিবেন বড়ো সাধ ছিল, সেই জন্যই গিয়াছিলেন। (পরোক্ষ উক্তি)।

বাচ্য-পরিবর্তন ॥ মহাশয়ের আসা ভালো হয় নাই (ভাববাচ্য)। মহাশয় আসিয়া ভালো করেন নাই (কর্তৃবাচ্য)। তাকে শিয়ালে খাইয়াছে (কর্তৃবাচ্য)। সে শিয়াল কর্তৃক খাদিত হইয়াছে (কর্মবাচ্য)।

॥ আশ্রমের রূপ ও বিকাশ ॥

সন্ধি ॥ সংকল্প = সম্ + কল্প। ইতস্তত = ইতঃ + তত। নিরলংকৃত = নিঃ + অলম্ + কৃত। দিগন্ত = দিক্ + অন্ত। সংলগ্ন = সম্ + লগ্ন। তত্ত্ব = তৎ + ত্ব। গ্রন্থাগার = গ্রন্থ + আগার। চলাচল = চল + অচল। নীরব = নিঃ + রব। নিস্তব্ধ = নিঃ + স্তব্ধ। ভবন = ভো + অন। দ্বিপেন্দ্রনাথ = দ্বিপ + ইন্দ্রনাথ। উপাধ্যায়ের = উপ + অধ্যায়ের। বিদ্যালয়ের = বিদ্যা + আলয়ের। তপোবনে = তপঃ + বনে। চতুষ্পাঠীর = চতুঃ + পাঠীর। পরীক্ষিত = পরি + ঈক্ষিত। সন্ন্যাসী = সম্ + ন্যাসী। অধ্যাপনার = অধি + আপনার। সর্বাপেক্ষা = সর্ব + অপ + ঈক্ষা। অনুজ্জ্বল = অন্ + উৎ + জ্বল। প্রচ্ছন্ন = প্র + ছন্ন। নিঃসন্দিগ্ধ = নিঃ + সম্ + দিগ্ধ। পরীক্ষা = পরি + ঈক্ষা। সতীশ = সতী + ঈশ। নিরস্ত = নিঃ + অস্ত। সঞ্চরণ = সম্ + চরণ। সম্ভোগের = সম্ + ভোগের। সংকীর্ণ = সম্ + কীর্ণ। অত্যাবশ্যকের = অতি + আবশ্যকের। জগদানন্দ = জগৎ + আনন্দ। সর্বতোভাবে = সর্বতঃ + ভাবে। নির্মমতা = নিঃ + মমতা। অন্তর্গত = অন্তঃ + গত। যথার্থ = যথা + অর্থ। প্রত্যক্ষ = প্রতি + অক্ষ। অকৃতার্থ = অকৃত + অর্থ। অমনোযোগী = অমনঃ + যোগী। নির্বিচারে = নিঃ + বিচারে। সঞ্চয় = সম্ + চয়। আত্মোৎসর্গপরায়ণ = আত্ম + উৎসর্গপরায়ণ। সংশ্লিষ্ট = সম্ + শ্লিষ্ট। যথেষ্ট = যথা + ইষ্ট। কিঞ্চিৎ = কিম্ + চিৎ। পরীক্ষক = পরি + ঈক্ষক। একাত্মতা = এক + আত্মতা। আশ্চর্য = আ + চর্য। সম্পূর্ণতা = সম্ + পূর্ণতা। সংগতি = সম্ + গতি।

কারক-বিভক্তি ॥ সাহিত্য-চর্চা—কর্মে শূন্যবিভক্তি। সীমানায়—অধিকরণে 'য়' বিভক্তি। মার্বেলপাথরে—করণে 'এ' বিভক্তি। চাষ—কর্তায় শূন্যবিভক্তি। গ্রন্থাগার—কর্মবাচ্যের কর্তায় শূন্যবিভক্তি। জলে—করণে 'এ' বিভক্তি। আশ্রম থেকে—অপাদানে 'থেকে' বিভক্তি। ছেলে—কর্মে শূন্যবিভক্তি। ছেলেদের কাছে—অপাদানে 'এ' বিভক্তি। বহু দুঃখে—করণে 'এ' বিভক্তি। তাঁদের—কর্ম-প্রবচনীয়যোগে 'এর' বিভক্তি। বয়সের—অধিকরণে 'এ' বিভক্তি। কিছুতে—কর্তায় 'তে' বিভক্তি। বেতন—কর্মে শূন্যবিভক্তি। ছাত্রদের (সেবায়)—কর্ম-সম্বন্ধে 'এর' বিভক্তি। খ্যাতি-প্রতিপত্তি—কর্মে শূন্যবিভক্তি। রোগে, শোকে, অভাবে—অধিকরণে 'এ' বিভক্তি।

সমাস। পদ্মাতীরে—পদ্মার তীর—ষষ্ঠীতৎ ; তাহাতে। সাহিত্যচর্চা—সাহিত্যের চর্চা—ষষ্ঠীতৎ। শান্তিনিকেতনের—শান্তি-পূর্ণ নিকেতন—মধ্যপ-কর্মধা। সারবাঁধা—সার দিয়ে বাঁধা—তৃতীয়াতৎ। মাধবীলতা-বিতানে—মাধবীর লতা—ষষ্ঠীতৎ ; তাহার বিতান—ষষ্ঠীতৎ ; তাহাতে। নিরলংকৃত—নয় অলংকৃত—নঞ্‌তৎ। রান্নাবাড়ি—রান্নার নিমিত্ত বাড়ি—চতুর্থীতৎ। একতলা—এক তল যাহার—বহুব্রী। তত্ত্ববোধিনী—তত্ত্বের বোধ করায় যে (স্ত্রী)—উপপদতৎ। গ্রন্থাগার—গ্রন্থের নিমিত্ত আগার—চতুর্থীতৎ। ছায়াশূন্য—ছায়ার দ্বারা শূন্য—তৃতীয়াতৎ। রাঙামাটি—রাঙা যে মাটি—কর্মধা, তাহার। লোক-চলাচল—লোকের চলাচল—ষষ্ঠীতৎ। নীরব—নাই রব যাহার—নঞ্‌বহুব্রী। নিস্তব্ধ—নিষ্ঠুরভাবে স্তব্ধ যাহা—নঞ্‌-বহুব্রী। প্রাণসার—প্রাণই সার যাহার—বহুব্রী। দস্যুবৃত্তির—দস্যুর বৃত্তি, তাহার—ষষ্ঠীতৎ। অতিথি-ভবনের—অতিথিদের নিমিত্ত ভবন—চতুর্থীতৎ, তাহার। সস্ত্রীক—স্ত্রীর সহিত বর্তমান—বহুব্রী। দ্বিপেন্দ্রনাথ—দুইভাবে পান করে যে—উপপদতৎ ; তাহাদের ইন্দ্র ষষ্ঠীতৎ, তাহার নাথ—ষষ্ঠীতৎ।' জনবিরল—জন বিরল যেখানে—বহুব্রী। তপোবনে—তপের নিমিত্ত বন—চতুর্থীতৎ, তাহাতে। চতুষ্পাঠীর—চারি পাঠের সমাহার—দ্বিগু। নিত্যপ্রবাহিত—নিত্য ব্যাপিয়া প্রবাহিত—দ্বিতীয়াতৎ। দান-দক্ষিণা—দান ও দক্ষিণা। দেনা-পাওনার—দেনা ও পাওনা, তাহার। কর্মকর্তার—কর্মের কর্তা—ষষ্ঠীতৎ, তাহার। আত্মরক্ষা—আত্মকে রক্ষা—দ্বিতীয়াতৎ। অসাধ্য—নয় সাধ্য—নঞ্‌তৎ। জোড়াসাঁকো—জোড়া সাঁকো যেখানে—বহুব্রী। অনুজ্জ্বল—নয় উজ্জ্বল—নঞ্‌তৎ। অসহিষ্ণু—নয় সহিষ্ণু—নঞ্‌তৎ। বিশ্ববিদ্যালয়ের—বিশ্ব (সকল) বিদ্যা—কর্মধা, তাহার আলয়—ষষ্ঠীতৎ, তাহার। আশ্বাসবাণী—আশ্বাসময়ী বাণী—মধ্যপ-কর্মধা। আত্মীয়স্বজনের—স্ব-র জন—ষষ্ঠীতৎ ; আত্মীয় ও স্বজন—দ্বন্দ্ব, তাহার। সংসারযাত্রার—সংসারের যাত্রা ষষ্ঠীতৎ। ভাবরাজ্যে—ভাবরূপ রাজ্য—রূপক-কর্মধা, তাহাতে। প্রতিক্ষণে—ক্ষণে ক্ষণে—অব্যয়ীভাব। রসভাণ্ডার—রসপূর্ণ ভাণ্ডার—মধ্যপ কর্মধা। আত্মভোলা—আত্মকে ভোলে যে—উপপদতৎ। সাহিত্য-সম্ভোগের—সাহিত্যকে সম্ভোগ দ্বিতীয়াতৎ, তাহার। অর্বাচীন—নয় প্রাচীন—নঞ্‌তৎ। সোপানশ্রেণীর—সোপানের শ্রেণী—ষষ্ঠীতৎ, তাহার। রসজ্ঞ—রসকে জানেন যিনি—উপপদতৎ। অবগাহন-স্নান—অবগাহন যে স্নান—কর্মধা। দণ্ডবিধান—দণ্ডের বিধান—ষষ্ঠীতৎ। শাসনবিধি—শাসনের বিধি—ষষ্ঠীতৎ। অন্তর্গত—অন্তরকে গত—দ্বিতীয়াতৎ। যথার্থ—অর্থকে অতিক্রম না করিয়া—অব্যয়ীভাব। আত্মমর্যাদা—আত্মার মর্যাদা—ষষ্ঠীতৎ। প্রত্যক্ষ—অক্ষির সমীপে—অব্যয়ীভাব। অকৃতার্থ—নয় কৃতার্থ—নঞ্‌তৎ। অক্লান্ত—নঞ্‌ ক্লান্ত—নঞ্‌তৎ। অমনোযোগী—নয় মনোযোগী—নঞ্‌তৎ। ভয়-জনক—ভয়কে জন্ম দেয় যাহা—উপপদতৎ। খ্যাতি-প্রতিপত্তি—খ্যাতি ও প্রতিপত্তি—দ্বন্দ্ব। স্বভাবসংগত—স্ব-র ভাব—ষষ্ঠীতৎ ; সম্যক্‌রূপে গত দ্বিতীয়াতৎ ; স্বভাবকে সংগত দ্বিতীয়াতৎ। যথেষ্ট—ইষ্টকে অতিক্রম না করিয়া—অব্যয়ীভাব। কৃতার্থ—কৃত অর্থ যাহার—বহুব্রী। প্রতিদিন—

দিন দিন—অব্যয়ীভাব। সাধনাক্ষেত্র—সাধনার ক্ষেত্র—ষষ্ঠীতৎ। প্রতিভাসম্পন্ন—প্রতিভার দ্বারা সম্পন্ন—তৃতীয়াতৎ। শিল্পশিক্ষা—শিল্পকে শিক্ষা—দ্বিতীয়াতৎ। অনুবৃত্তি—বৃত্তির পশ্চাৎ—অব্যয়ীভাব।

প্রকৃতি-প্রত্যয়। আশ্রম—আ-শ্রম্ + ঘঞ্ [অধিকরণ বা]। বিকাশ—বি-কাশ্ + ঘঞ্ [ভাববা]। সৃষ্টি—সৃজ্ + ক্তি [ভাববা]। সংকল্প—সম্-কৢপ্ + ঘঞ্ [ভাববা]। পরিধি—পরি-ধা + ই [কর্মধা]। দক্ষিণ—দক্ষ্ + ইন। মাধবী—মধু + ষ্ণ + ঈ [স্ত্রী]। বিতান—বি-তন্ + ঘঞ্ [কর্মধা]। প্রবেশ—প্র-বিশ্ + ঘঞ্ [ভাববা]। প্রাচীন—প্রাচ্ + ঈন। ছাতিম—ছাতি + ম [সাদৃশ্যে]। নিরলংকৃত—নিঃ-অলম্-কৃ + ক্ত [কর্মধা]। আড়াল—আড় + আল। সংলগ্ন—সম্-লস্জ্ + ক্ত [কর্মধা]। তত্ত্ববোধিনী—তৎ + ত্ব + বুধ্ + অনট্ + ইনী [স্ত্রী]। বর্তমান—বৃৎ + শানচ্। মলিনতা—মলিন + তা। আহার্য—আহার + ষ্ণ্য। বিস্তার—বি-স্তৃ + ঘঞ্ [ভাববা]। আরম্ভ—আ-রম্ভ্ + ঘঞ্ [ভাববা]। বিরাজ—বি-রাজ্ + ঘঞ্ [ভাববা]। নিস্তব্ধ—নিঃ-স্তন্ভ্ + ক্ত [কর্তৃবা]। বৃত্তি—বৃৎ + ক্তি [ভাববা]। নিদর্শন—নি-দৃশ্ + অনট্ [ভাববা]। আশ্রয়—আ-শ্রি + ঘঞ্ [অধিকরণবা]। প্রয়োজন—প্র-যুজ্ + অনট্ [ভাববা]। আধুনিক—অধুনা + ষ্ণিক। অবলম্বন—অব-লম্ব্ + অনট্ [করণ বা]। সামাজিক—সমাজ + ষ্ণিক। দক্ষিণা—দক্ষিণ + আ। অস্তিত্ব—অস্তি + ত্ব। ক্ষীণ—ক্ষি + অনট্। আর্থিক—অর্থ + ষ্ণিক। নির্ভর—নির্-ভৃ + ঘঞ্ [করণবা]। প্রচলিত—প্র-চল্ + ক্ত [কর্মধা]। পরীক্ষিত—পরি-ঈক্ষ্ + ক্ত [কর্মধা]। সন্ন্যাসী—সন্ন্যাস + ইন্। অধ্যাপনা—অধি-ই + ণিচ্ + অনট্ + আ। তরুণ—তৃ + উন। আসন্ন—আ-সদ্ + ক্ত। বিস্তারিত—বি-স্তৃ + ণিচ্ + ক্ত [কর্মধা]। বিশ্লেষণ—বি-শ্লিষ্ + অনট্ [কর্মধা]। প্রবৃত্ত—প্র-বৃৎ + ক্ত [কর্মধা]। অসামান্যতা—অসামান্য + তা। প্রচ্ছন্ন—প্র-ছদ্ + ক্ত [কর্মধা]। নিঃসন্দিগ্ধ—নিঃ-সম্ + দিহ্ + ক্ত [কর্মধা]। অসহিষ্ণু—নঞ্-সহ্ + ইষ্ণু। সৌম্য—সোম + ষ্ণ্য। স্বীকার—স্ব-অভূততদ্ভাবে চি + কৃ + ঘঞ্। প্রসন্ন—প্র-সদ্ + ক্ত [কর্তৃবা]। মুখর—মুখ + র। ভবিষ্যৎ—ভূ + স্যতৃ [কর্তৃবা]। উজ্জ্বল—উৎ-জ্বল্ + ঘঞ্ [ভাববা]। দীপ্তি—দীপ্ + ক্তি [ভাববা]। আহ্বান—আ-হ্বে + অনট্ [ভাববা]। জীবিকা—জীব্ + ক + আ। যোগ—যুজ + ঘঞ্। পরীক্ষা—পরি-ঈক্ষ্ + ঘঞ্ + আ। নিরস্ত—নিঃ-অস্ + ক্ত। দারিদ্র্য—দরিদ্র + ষ্ণ্য। অবহেলা—অব-হেড়্ + ঘঞ্ + আ। মাসিক—মাস + ষ্ণিক। পরিধেয়তা—পরিধেয় + তা। জীর্ণ—জৄ + ক্ত। রাজ্য—রাজন্ + ষ্ণ্য। সঞ্চরণ—সম্-চর + অনট্ [ভাববা]। ভাণ্ডার—ভাণ্ড + আর। মানুষ—মনু (+ ষ) + ষ্ণ। সাহিত্য—সহিত + ষ্ণ্য। সম্ভোগ—সম্-ভুজ্ + ঘঞ্। আস্বাদন—আ—স্বদ্ + অনট্। অভিনিবেশ—অভি-নি-বিশ্ + ঘঞ্। অর্বাচীন—নঞ্-প্রাচ্ + ঈন। কেজো—কাজ + ও [<উয়া]। নৈপুণ্য—নিপুণ + ষ্ণ্য। মাস্টারি—মাস্টার + ই। সাধক—সাধ + অক। খাদ্য—খাদ্ + যৎ। অবগাহন—অব-গাহ্ + অনট্ [ভাববা]। গম্ভীরতা—গম্ভীর + তা। অনিবার্য—নঞ্-নি-বারি + যৎ। শাসন—শাস্ + অনট্।

অতিক্রম—অতি-ক্রম্ + ঘঞ্। উদার—উৎ-আ-ঋ + ঘঞ্ (কর্তৃবা)। মুক্তি—মুচ্ + ক্তি। মৃত্যু—মৃ + ত্যু (ভাববা)। বেদনা—বিদ্ + অনট্ (ভাববা) + আ। পরিচয়—পরি-চি-ঘঞ্ (ভাববা)। প্রেরিত—প্র-ঈর্ + ণিচ্ + ক্ত (কর্মবা)। বৈজ্ঞানিক—বিজ্ঞান + ষ্ণিক। প্রবন্ধ প্র-বন্ধ্ + ঘঞ্। প্রাঞ্জল—প্র-অন্জ্ + অল। শ্রদ্ধা—শ্রৎ + ধা + অ (ভাববা) + আ। আকৃষ্ট—আ-কৃষ্ + ক্ত (কর্মবা)। সাংসারিক—সংসার + ষ্ণিক। জমিদারি—জমিদার + ই। নিযুক্ত—নি-যুজ্ + ক্ত (কর্মবা)। কৃপণতা—কৃপণ + তা। আমন্ত্রণ—আ-মন্ত্র + অনট্ (ভাববা)। পরিমাণ—পরি-মা + অনট্ (ভাববা)। উপলক্ষ উপ-লক্ষ্ + ঘঞ্। নির্মমতা—নিঃ-মম + তা। নিষ্ঠুরতা—নিষ্ঠুর + তা। অকার্পণ্য—অকৃপণ + ষ্ণ্য। স্বাতন্ত্র্য—স্বতন্ত্র + ষ্ণ্য। আঘাত—আ-হন্ + ঘঞ্। অমনোযোগী—অমনোযোগ + ইন্। ভর্ৎসনা—ভর্ৎস্ + অনট্ + আ। প্রতিবাদ—প্রতি-বদ্ + ঘঞ্। উৎসর্গ—উৎ-সর্জ্ + ঘঞ্। যোগ্যতা—যোগ্য + তা। ঔদাসীন্য—উদাসীন + ষ্ণ্য। স্থাপতি—স্থা + ণিচ্ + তি। পারমার্থিক—পরমার্থ + ষ্ণিক। আশ্চর্য—আ-চর্ + যৎ। বিশিষ্টতা—বিশিষ্ট + তা। উপকরণ—উপ-কৃ + অনট্। সামঞ্জস্য—সমঞ্জস্ + ষ্ণ্য। পুরাতন—পুরা + তন। পরিবর্তমান—পরি-বৃৎ + শানচ্। সম্পূর্ণতা—সম্পূর্ণ + তা। আক্ষেপ—আ-ক্ষিপ্ + ঘঞ্।

লিঙ্গান্তর ॥ মাধবী—মাধব। রক্ষী—রক্ষিণী। বৃদ্ধ—বৃদ্ধা। সর্দার—সর্দারনী। অনুচর—অনুচরী। পরিচর—পরিচারিকা। প্রাচীন—প্রাচীনা। গুরু—গুর্বী, গুরুপত্নী। শিষ্য—শিষ্যা। খৃস্টান—খৃস্টানী। সন্ন্যাসী—সন্ন্যাসিনী। তরুণ—তরুণী। যুবক—যুবতী। কবি—মহিলা-কবি। মানুষ—মানুষী। ছেলে—মেয়ে। শিক্ষক—শিক্ষিকা। সাধক—সাধিকা। ছাত্র—ছাত্রী। অগ্রগণ্য—অগ্রগণ্যা। নিপুণ—নিপুণা। পরীক্ষক—পরীক্ষিকা।

পদ-পরিবর্তন ॥ আশ্রম (বি)—আশ্রমিক (বিণ)। সৃষ্টি (বি)—সৃষ্ট (বিণ)। দীর্ঘ (বিণ)—দৈর্ঘ্য, দীর্ঘতা (বিণ)। প্রাচীন (বিণ)—প্রাচীনতা (বি)। মাঠ (বি)—মেঠো (বিণ)। সংগ্রহ (বি)—সংগৃহীত (বিণ)। প্রশস্ত (বিণ)—প্রশস্ততা (বি)। স্থাপিত (বিণ —স্থাপন (বি)। বিস্তৃত (বিণ)—বিস্তর, বিস্তৃতি (বি)। শহর (বি)—শহুরে (বিণ)। মলিনতা (বি)—মলিন (বিণ)। নীরব (বিণ)—নীরবতা, (বি)। নিস্তব্ধ (বি)—নিস্তব্ধতা (বিণ)। ঋজু (বিণ)—ঋজুতা, আর্জব (বিণ)। দেহ (বি) দৈহিক (বিণ)। ছেলে (বিণ)—ছেলেমি (বিণ)। অতিথি (বিণ) আতিথ্য (বি)। আশ্রয় (বি)—আশ্রিত (বিণ)। শান্ত (বিণ)—শান্তি (বি)। জনবিরল (বিণ)—জনবিরলতা (বি)। আরম্ভ (বি)—আরব্ধ (বিণ)। প্রয়োজন (বি)—প্রয়োজনীয় (বিণ)। সামাজিক (বি)—সামাজিকতা (বি)। ক্ষীণ (বিণ)—ক্ষীণতা (বি)। নির্ভর (বিণ)—নির্ভরতা (বি)। দুঃখ (বি —দুঃখী, দুঃখিত (বিণ)। পরীক্ষিত (বিণ)—পরীক্ষা (বি)। শিষ্য (বিণ)—শিষ্যত্ব (বি)। সন্ন্যাসী (বিণ)—সন্ন্যাস (বি)। তরুণ (বিণ)—তারুণ্য (বি)। অনুকূল (বিণ)—আনুকূল্য (বি)। প্রবৃত্ত (বিণ)—প্রবৃত্তি (বি)।

অসামান্যতা (বি)—অসামান্য (বিণ)। প্রচ্ছন্ন (বিণ)—প্রচ্ছন্নতা (বি)। নিঃসন্দিগ্ধ (বিণ)—নিঃসন্দেহ (বি)। অসহিষ্ণু (বিণ)—অসহিষ্ণুতা (বি)। প্রসন্ন (বিণ)—প্রসন্নতা (বি)। মুখর (বিণ)—মুখরতা (বি)। উজ্জ্বল (বিণ) উজ্জ্বলতা, ঔজ্জ্বল্য (বি)। আহ্বান (বি)—আহূত (বিণ)। নিরস্ত (বিণ)—নিরসন (বি)। দারিদ্র্য (বি)—দরিদ্র (বিণ)। অবহেলা (বি)—অবহেলিত (বিণ)। অস্বীকার (বি)—অস্বীকৃত (বিণ)। সঞ্চরণ (বি)—সঞ্চারিত (বিণ)। আস্বাদন (বি)—আস্বাদিত (বিণ)। অভিনিবেশ (বি)—অভিনিবিষ্ট (বিণ)। নৈপুণ্য (বি)—নিপুণ (বিণ)। অবগাহন (বি)—অবগাঢ় (বিণ)। স্নান (বি)—স্নাত (বিণ)। অতিক্রম (বি)—অতিক্রান্ত (বিণ)। পরিচয় (বি)—পরিচিত (বিণ)। প্রাঞ্জল (বিণ)—প্রাঞ্জলতা (বি)। বৈজ্ঞানিক (বিণ)—বিজ্ঞান (বি)। শ্রদ্ধা (বি) —শ্রদ্ধেয় (বিণ)। আকৃষ্ট (বিণ)—আকর্ষণ (বি)। সাংসারিক (বিণ)—সংসার (বি)। নিযুক্ত (বিণ)—নিয়োগ (বি)। আমন্ত্রণ (বি)—আমন্ত্রিত (বিণ)। পরিমাণ (বি)—পরিমিত (বিণ)। স্বভাব (বি)—স্বাভাবিক (বিণ)। কৃপণতা (বি)—কৃপণ (বিণ)। নির্মমতা (বি)—নির্মম (বিণ)। নিষ্ঠুরতা (বি)—নিষ্ঠুর (বিণ)। বর্ষণ (বি)—বর্ষিত (বিণ)। অকার্পণ্য (বি)—অকৃপণ (বিণ)। পরিচয় (বি)—পরিচিত (বিণ)। স্বাতন্ত্র্য (বি)—স্বতন্ত্র (বিণ)। অকৃতার্থ (বিণ) —অকৃতার্থতা (বি)। আঘাত (বি)—আহত (বিণ)। অমনোযোগী (বিণ)—অমনোযোগিতা (বি)। অতিশয় (বিণ)—আতিশয্য (বি)। ভর্ৎসনা (বি)—ভর্ৎসিত (বিণ)। অধিকার (বি)—অধিকৃত (বিণ)। সাহিত্য (বি)—সাহিত্যিক (বিণ)। দর্শন (বি)—দার্শনিক (বিণ)। নির্লিপ্ত (বিণ)—নির্লিপ্তি (বি)। সংকীর্ণ (বিণ)—সংকীর্ণতা (বি)। ঔদাসীন্য (বি)—উদাসীন (বিণ)। স্বীকার (বি)—স্বীকৃত (বিণ)। নিপুণ (বিণ)—নিপুণতা, নৈপুণ্য (বি)। সন্দেহ (বি)—সন্দিগ্ধ (বিণ)। সংগত (বিণ)—সংগতি (বি)। সমাপ্ত (বিণ)—সমাপ্তি (বি)। পারমার্থিক (বিণ)—পরমার্থ (বি)। একাত্মতা (বি)—একাত্ম (বিণ)। বদান্যতা (বি)—বদান্য (বিণ)। বিচিত্র (বিণ)—বৈচিত্র্য (বি)। প্রেরণা (বি)—প্রেরিত (বিণ)। সমর্থ (বিণ)—সামর্থ্য (বি)। পরিবর্তমান (বিণ)— —পরিবর্তমানতা (বি)।

সার্থক বাক্যরচনা ॥ সাহিত্যচর্চা—শৈশবে আমরা কয় বন্ধুতে মিলে সাহিত্যচর্চা করতুম। **সারবাঁধা**—আমাদের বাড়ির সামনে ছিল সারবাঁধা দীর্ঘ সুপারির গাছ। **মাধবীলতা বিতানে**—বসন্ত সমাগমে মাধবীলতা বিতানে মৌমাছিদের আনাগোনা শুরু হইয়া গেল। **চতুষ্পাঠী** গ্রামে ছিল সংস্কৃত শিক্ষার একটি চতুষ্পাঠী। **অনুজ্জ্বলভাবে**—মেঘলা আকাশ হইতে খুবই অনুজ্জ্বলভাবে আলো আসিয়া মাটিতে পড়িয়াছিল। **স্বভাব-সংগত**—সকলকে বিশ্বাস করাই ছিল তাহার স্বভাব-সংগত বৈশিষ্ট্য। **পারমার্থিক**—ভারতবর্ষ চিরকাল পারমার্থিক কল্যাণকে সব কিছুর উপরে স্থান দিয়াছে। **বস্তুত**—বস্তুত, বিদ্যাসাগর ছিলেন উদার মানবপ্রেমিক।

সন্ধি ॥ দাবানলের – দাব + অনলের। নির্জন – নিঃ + জন। দুরন্ত – দুঃ + অন্ত। পুরোহিত – পুরঃ + হিত। নিশ্চিন্ত – নিঃ + চিন্ত। নগেন্দ্র – নগ + ইন্দ্র। যুগান্তরের – যুগ + অন্তরের। মহর্ষি – মহা + ঋষি। তেজোময় – তেজঃ + ময়। আশীর্বাদ = আশিস্ + বাদ। পবিত্র – পূ + ইত্র। উজ্জ্বল – উৎ + জ্বল। মনোহর – মনঃ + হর। নির্ভয়ে – নিঃ + ভয়ে। আশ্চর্য = আ + চর্য। অভ্যর্থনা – অভি + অর্থনা। বজ্রাহতের = বজ্র + আহতের। ষড়যন্ত্র – ষট্ + যন্ত্র। রাজচ্ছত্র – রাজ + ছত্র। সিংহাসন – সিংহ + আসন। নির্দোষ – নিঃ + দোষ। জন্মাবধি = জন্ম + অবধি। দিগ্বিজয়ী – দিক্ + বিজয়ী। রাজ্যেশ্বর – রাজ্য + ঈশ্বর। সরোবর – সরঃ + বর।

কারক-বিভক্তি ॥ শিকারে—নিমিত্তে 'এ' বিভক্তি। বল্লমের – করণে 'এ' বিভক্তি। খোঁচায়—করণে 'য়' বিভক্তি। ভাগ্য-দোষে—হেত্বর্থে 'এ' বিভক্তি। ধৈর্যের—অভেদ-সম্বন্ধে 'এর' বিভক্তি। প্রাণ-ভয়ে—অপাদানে 'এ' বিভক্তি। বল্লমহাতে—উপলক্ষণে 'এ' বিভক্তি। সোনার (চাবি)—উপাদান-সম্বন্ধে 'র' বিভক্তি। পাথরে—করণে 'এ' বিভক্তি। রক্তের—করণে 'এর' বিভক্তি। বাপ্পাকে (ভয়)—অপাদানে 'কে' বিভক্তি। বাঁশি—কর্মে শূন্যবিভক্তি। সকলে—কর্তায় 'এ' বিভক্তি। হীরের—উপাদান-সম্বন্ধে 'এর' বিভক্তি। পাথরের—উপাদান-সম্বন্ধে 'এর' বিভক্তি। সোনার (রোদে)—অভেদ-সম্বন্ধে 'র' বিভক্তি। গ্রাম, দেশ, শীত—কর্মে শূন্যবিভক্তি। মাটির (দেয়াল)—উপাদান-সম্বন্ধে 'র' বিভক্তি। লোকে—কর্তায় 'এ' বিভক্তি। হিংসার—অভেদ-সম্বন্ধে 'র' বিভক্তি। আগুনে—করণে 'এ' বিভক্তি। দুই চক্ষে—অপাদানে 'এ' বিভক্তি। অত্যাচারে—হেত্বর্থে 'এ' বিভক্তি। আমার—অপাদান-সম্বন্ধে 'র' বিভক্তি। সুতোয়—করণে 'য়' বিভক্তি। মহাবিস্ময়ে—ক্রিয়াবিশেষণে 'এ' বিভক্তি। আলোয়—করণে 'য়' বিভক্তি। চিতোর—অধিকরণে শূন্যবিভক্তি।

সমাস ॥ রাজপুত—রাজার পুত—ষষ্ঠীতৎ। পাহাড়ে পাহাড়ে, বনে-বনে—অলুক্তৎ। দাবানলের—দাবের (অরণ্যের) অনল—ষষ্ঠীতৎ; তাহার। রক্তপাত—রক্তকে পাত—দ্বিতীয়াতৎ। দুর্ভিক্ষের—ভিক্ষার অভাব—অব্যয়ীভাব; তাহার। আশ্রয়হীন—আশ্রয়ের দ্বারা হীন—তৃতীয়াতৎ। ভিল-প্রজা—যে ভিল, সেই প্রজা—কর্মধা। কাপুরুষ—কু যে পুরুষ—কর্মধা। মহারাজা—মহৎ যে রাজা—কর্মধা (শুদ্ধ—মহারাজ)। রাজহস্তী—হস্তীদের রাজা—ষষ্ঠীতৎ। রাজমহিষী—রাজার মহিষী—ষষ্ঠীতৎ। মহারানী—মহতী যে রানী—কর্মধা। সূর্যদেব—যিনি সূর্য, তিনিই দেব—কর্মধা। মহাবিপদে—মহৎ যে বিপদ—কর্মধা; তাহাতে। রাজ-পুরোহিতের—রাজার পুরোহিত—ষষ্ঠীতৎ; তাঁহার। পূর্বপুরুষ—পূর্ব যে পুরুষ—কর্মধা। মা হারা—মা হারাইয়াছে যে—উপপদতৎ। ত্রিকূট—ত্রি কূটের সমাহার—দ্বিগু। আগাগোড়া—আগা হইতে গোড়া পর্যন্ত—অব্যয়ীভাব। প্রতিদিন—দিন দিন—অব্যয়ীভাব। সারারাত্রি—সারা যে রাত্রি—কর্মধা। হরিণ ছানা—হরণ করে যে—উপপদতৎ;

তাহার ছানা—ষষ্ঠীতৎ। সজল—জলের সহিত বর্তমান—বহুব্রী। ঝুলন-পূর্ণিমা—ঝুলনের জন্য পূর্ণিমা—চতুর্থীতৎ। যুগান্তরের—অন্য যুগ—নিত্যসমাস; তাহার। রাখাল-রাজা—যে রাখাল, সেই রাজা কর্মধা। সমান—মানের সহিত বর্তমান—বহুব্রী। মহর্ষি—মহৎ ঋষি - কর্মধা। আশীর্বাদ—আশিস্ মিশ্রিত বাদ—মধ্যপ-কর্মধা। দীর্ঘজীবী—দীর্ঘ জীবিত থাকে যে—উপপদতৎ। মহাপ্রস্থানের- মহৎ যে প্রস্থান—কর্মধা; তাহার। গুপ্তচর—গুপ্তভাবে চরে যে - উপপদতৎ। রাজ-সিংহাসন- সিংহ চিহ্নিত আসন—মধ্যপ-কর্মধা; রাজার সিংহাসন—ষষ্ঠীতৎ। গোরুর গাড়িতে-গোরুর গাড়ি—অলুক্তৎ; তাহাতে। চির-বিশ্বাসী—চির ব্যাপিয়া বিশ্বাসী—দ্বিতীয়াতৎ। শুভক্ষণে—শুভ যে ক্ষণ—কর্মধা; তাহাতে। যুদ্ধক্ষেত্রে—যুদ্ধের নিমিত্ত ক্ষেত্র - চতুর্থীতৎ; তাহাতে। বাসস্থান—বাসের নিমিত্ত স্থান—চতুর্থীতৎ। জন্মাবধি—জন্ম হইতে—অব্যয়ীভাব। মহাবিস্ময়ে—মহৎ বিস্ময় - কর্মধা; তাহাতে। প্রাণহন্তা—প্রাণকে হত্যা করিয়াছে যে - উপপদতৎ। পিতৃহত্যা—পিতাকে হত্যা দ্বিতীয়াতৎ। জলশূন্য - জলের দ্বারা শূন্য - তৃতীয়াতৎ। সূর্যকুণ্ড— সূর্যের নিমিত্ত কুণ্ড—চতুর্থীতৎ। সূর্যপূজা—সূর্যকে পূজা চতুর্থীতৎ। শয়ন-মন্দিরে—শয়নের নিমিত্ত মন্দিরে—চতুর্থীতৎ। ঝুলন-গান - ঝুলনের নিমিত্ত গান—চতুর্থীতৎ। দোয়া লেখা- দোয়া লেখা যাহাতে - বহুব্রী। ইহলোকে—ইহ যে লোক—কর্মধা; তাহাতে।

প্রকৃতি-প্রত্যয় ॥ সাহস—সাহস + অ (ভাববা)। সহ্য—সহ্ + যৎ (কর্মবা)। আশ্রয়—আ-শ্রি + অ (ভাববা)। বৎসর—বস্-স্ব + অ (অধিকরণবা)। ঘাতক—হন্ + অক (কর্তৃবা)। অপমান—অপ-মা + অনট্ (ভাববা)। আরম্ভ—আ-রভ্ + অ (ভাববা)। সন্তুষ্ট—সম্-তুষ্ + ক্ত (কর্তৃবা)। ধৈর্য—ধীর + ষ্ণ (ভাববা)। সামান্য—সমান + ষ্ণ্য (ভাব)। নিষ্ঠুর—নি-স্থা + উর (কর্তৃবা)। নৃত্য—নৃত্ + যৎ (ভাব)। শিখর—শিখা + র। হরিণ—হৃ + ইন (কর্তৃবা)। সিংহ - হিন্স্ অ (কর্তৃবা)। নগর—নগ + র। হস্তী—হস্ত + ইন্ (অস্ত্যর্থে)। প্রকাণ্ড—প্র-কম্ + ণিচ্ + ড (কর্মবা)। অন্ধকার—অন্ধ-কৃ + অ। সমুদ্র—সম্-উন্দ্ + র (কর্তৃবা)। সন্ধ্যা—সম্-ধৈ + অ + আ। সুন্দর—সুন্দ্ + অর (কর্তৃবা)। অস্ত্র—অস্ + ত্র (কর্মবা)। সূর্য—সৃ + যৎ (কর্তৃবা)। অস্ত—অস্ + ক্ত (অধিকরণবা)। রাত্রি—রা + ত্রি (কর্তৃবা)। ভয়ানক—ভী + আনক। ব্যস্ত—বি-অস্ + ক্ত (ভাববা)। মানব—মনু + ষ্ণ (অপত্যার্থে)। জিজ্ঞাসা—জ্ঞা + সন্ + অ (ভাববা) + আ। ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মণ্ + অ। পুত্র—পুং-ত্রৈ + অ (কর্তৃবা)। বিদ্রোহী—বি-দ্রুহ্ + অ (ভাববা) + ইন্। রাজত্ব—রাজন্ + ত্ব। অরণ্য—ঋ + অন্য। রাখাল—রাখ্ + আল (জীবিকার্থে)। লড়াই—লড়্ + আই। শ্রাবণ—শ্রাবণী + অ। ঘাস—অদ্ (> ঘস্) + অ (ভাববা)। পূর্ণিমা—পূর্ণি-মা + অ (কর্তৃবা) + আ। বিদ্যুৎ—বি-দ্যুৎ + ক্বিপ্ (কর্তৃবা)। তেজোময়—তেজঃ + ময়ট্ (উপাদান অর্থে)। ধ্যান—ধ্যৈ + অনট্ (ভাববা)। স্থির—স্থা + ইর (কর্তৃবা)। গাঢ়—গাহ্ + ক্ত (কর্তৃবা)। প্রণাম—প্র-ণম্ + অ (ভাববা)। অঞ্জলি—অন্জ্ + অলি (করণবা)। পান—পা + অনট্ (ভাববা)। আশীর্বাদ—

আশিস্-বদ্ + অ (ভাববা)। দীর্ঘজীবী—দীর্ঘ (দ্রাঘ্ + অ) + জীব্ + ইন্। পৃথিবী—পৃথু + ঈ (কর্তৃবা)। পবিত্র—পূ + ইত্র (কর্তৃবা)। প্রস্তুত—প্র-স্তু + ক্ত (কর্তৃবা)। পালক—পাল্ + অক (কর্তৃবা)। মনোহর মনস্-হৃ + অ (কর্তৃবা)। রাজধানী—রাজন্-ধা + অনট্ (অধিকরণবা) + ঈ। শস্ত্র - শস্ + ত্র (করণবা)। সৈন্য—সেনা + ষ্ণ্য। মন্দির—মন্দ্ + ইর (অধিকরণবা)। আশ্চর্য—আ-[শ]-চর্ + য (কর্মবা)। ভিখারী—ভিখ্ + আরী। বীরত্ব—বীর + ত্ব (ভাবার্থে)। নিষ্ঠুর—নি-স্থা + উর (কর্তৃবা)। মূর্ছিত—মূর্চ্ + ক্ত (কর্তৃবা)। সাহস—সহস্ + অ। বিস্ময়—বি-স্মি + অ (ভাববা)। সীমা—সি + ইমন্ (কর্তৃবা)। প্রজা—প্র-জন্ + অ (কর্তৃবা)। ক্ষুণ্ণ—ক্ষুদ্ + ক্ত (কর্মবা)। শত্রুতা—শত্রু + তা (ভাবার্থে)। ভীষণ—ভী + ণিচ্ + অনট্ (কর্তৃবা)। পরামর্শ—পরা-মৃশ্ + অ (ভাববা)। তুষ্ট—তুষ্ + ক্ত (কর্তৃবা)। দীন—দী + ক্ত (কর্তৃবা)। হীন—হা + ক্ত (কর্মবা)। প্রচলিত—প্র-চল্ + ইত। পণ্ডিত—পণ্ডা + ইতচ্। অভ্যাস—অভি-অস্ + অ (ভাববা)। গম্ভীর—গম্ + ঈর (অধিকরণবা)। জ্যোৎস্না - জ্যোতিস্ + ন + আ। পিতৃ-হন্তা—পিতৃ-হন্ + তৃ (কর্তৃবা)। উপযুক্ত—উপ-যুজ্ + ক্ত (কর্মবা)। পিতৃহত্যা - পিতৃ-হন্ + ক্যপ্ (ভাববা) + আপ্। আত্মীয়—আত্মন্ + ঈয়। বধ—হন্ + অ (ভাববা)। ব্রত—বৃ + অত (কর্মবা)। শ্রান্ত—শ্রম্ + ক্ত (কর্তৃবা)। নিস্তব্ধ—নি-স্তন্ভ্ + ক্ত (কর্তৃবা)। প্রাসাদ—প্র-অ-সদ্ + অ (অধিকরণবা)। শয়ন—শী + অনট্ (ভাববা)। বিশ্রাম—বি-শ্রম্ + অ (ভাববা)। দক্ষিণ—দক্ষ + ইন (কর্তৃবা)। ঈশ্বর—ঈশ্ + বর (কর্তৃবা)। নিঃশ্বাস—নিঃ-শ্বস্ + অ (ভাববা)। রাজ্য—রাজন্ + ষ্ণ্য। স্তব—স্তু + অ (ভাববা)।

লিঙ্গান্তর॥ রাজা—রানী। মহারাজ—মহারাণী। দুঃখী—দুঃখিনী। দাস—দাসী। ভিল—ভিল্নী। হস্তী—হস্তিনী। মহিষী (প্রধানা রানী)—নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ। রাজকুমার—রাজকুমারী। রাজপুত্র - রাজকন্যা। রাজপুত—রাজপুতানী। ভগবান—ভগবতী। বিধবা—নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ। ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণী। সখা—সখী। রাজনন্দন—রাজনন্দিনী। নবাব—বেগম। ভব ভবানী। মুসলমান—মুসলমানী। সর্দার—সর্দারনী। বিদ্রোহী—বিদ্রোহিনী। ভিখারী—ভিখারিণী। নবাবজাদা—নবাবজাদী। সন্ন্যাসী—সন্ন্যাসিনী।

পদ-পরিবর্তন॥ সুন্দর (বিণ)—সৌন্দর্য (বি)। অত্যাচার (বি)—অত্যাচারী (বিণ)। বিশ্বাসঘাতক (বিণ)—বিশ্বাসঘাতকতা (বি)। পরিপূর্ণ (বিণ)—পরিপূর্ণতা (বি)। সন্তুষ্ট (বিণ)—সন্তোষ (বি)। ধৈর্য—(বি)—ধীর (বিণ)। ব্যস্ত (বিণ)—ব্যস্ততা (বি)। বিদ্যুৎ (বি)—বৈদ্যুতিক (বিণ)। ঋষি (বি)—আর্ষ (বিণ)। স্থির (বিণ)—স্থিরতা, স্থৈর্য (বি)। মলিন (বিণ)—মলিনতা, মালিন্য (বি)। বিদেশ (বি)—বিদেশী, বৈদেশিক (বিণ)। উপস্থিত (বিণ)—উপস্থিতি (বি)। প্রস্তুত (বিণ)—প্রস্তুতি (বি)। পুরোহিত (বিণ)—পৌরোহিত্য (বি)। উজ্জ্বল (বিণ)—ঔজ্জ্বল্য (বি)। শীত (বিণ)—শৈত্য (বি)। শরীর (বি)—শারীরিক (বিণ)। বিস্ময় (বি)—বিস্মিত (বিণ)। সীমা (বি)—

সীমিত (বিণ)। কৃতজ্ঞতা (বি)– কৃতজ্ঞ (বিণ)। নিষ্ঠুর (বিণ)—নিষ্ঠুরতা (বি)। পণ্ডিত (বিণ)—পাণ্ডিত্য (বি)। বৃদ্ধ (বিণ)– বার্ধক্য (বি)। সন্ধ্যা (বি)— সান্ধ্য (বিণ)। প্রফুল্ল (বিণ)—প্রফুল্লতা (বি)। পৃথিবী (বি)—পার্থিব (বিণ)। দক্ষিণ (বিণ)—দাক্ষিণ্য (বি)।

সার্থক বাক্য-রচনা ॥ **দাবানল**— সংবাদটি দেশময় **দাবানলের** মতো ছড়াইয়া পড়িল। **কর্ণপাত**—আপনি আমার কথায় **কর্ণপাত** করিলে এই দুর্ঘটনা এড়ানো যাইত। **মহাবিপদে**—তোমার কথা না শুনিয়া আমি **মহাবিপদে** পড়িয়াছিলাম। **তেজোময়**—সেই **তেজোময়** গিরিশৃঙ্গকে ধ্যানমগ্ন ঋষি বলিয়া ভ্রম হইতেছিল। **দীর্ঘজীবী**—গুরু শিষ্যকে আশীর্বাদ করিলেন, "**দীর্ঘজীবী** হও"। **জয়জয়কার**— সে জাতীয় পুরস্কার পাইয়াছে; এখন তো তাহার **জয়জয়কার**। **বজ্রাহত**— দুঃসংবাদটি শুনিয়া তিনি **বজ্রাহতের** মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সাধুভাষায় পরিবর্তন ॥ ১. 'তুষের আগুন যেমন প্রথমে···জলে উঠল'। ১১৬ পৃ.—তুষানল যেমন প্রথমে ধিকিধিকি, শেষে সহসা ধু ধু করিয়া জ্বলিয়া উঠে তেমনই গোহের পর হইতে রাজপুতদিগের উপর ভিলদিগের ক্রোধ ক্রমে অল্পে অল্পে বৃদ্ধি পাইতে পাইতে একদিন দাউ দাউ করিয়া পর্বতে পর্বতে, অরণ্যে অরণ্যে দাবানলের মতো জ্বলিয়া উঠিল। ২. 'তখন ভোর হয়েছে, মেলা-শেষে মলিন মুখে যে যার ঘরে ফিরছে, বাপ্পা সেই যাত্রীদের সঙ্গে ফিরলেন।' ১২৪ পৃ.—তখন প্রভাত হইয়াছে, মেলান্তে মলিন বদনে যে যাহার গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছে, বাপ্পা সেই যাত্রীদের সহিত গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ৩ 'কিছুদিন পরেই বাপ্পাকে·· উপস্থিত হলেন।' ১২৪ পৃ.—কিছু দিবস পরেই বাপ্পাকে নগেন্দ্রনগর পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইল। ঝুলন-পূর্ণিমায় ক্রীড়াচ্ছলে উভয়ের বিবাহ হইবার পর বিদেশ হইতে রাজকুমারীর বিবাহের সম্বন্ধ লইয়া অনেক ব্রাহ্মণ রাজসভায় উপস্থিত হইলেন।

উক্তি-পরিবর্তন ॥ 'অনেক কাঁদাকাটার পর ভিল্‌নীদিদি···কেমন-কেমন করে যে।' ১২৫ পৃ.—(প্রত্যক্ষ উক্তি)—অনেক কাঁদাকাটার পর বাপ্পাকে করুণ স্বরে বললেন যে. সে যদি যাবেই তবে সে যেন তার দুই ভাই—বালিয় ও দেবকে সাথে নেয়। তিনি কাতরকণ্ঠে আরো বললেন যে, তাকে একা ছেড়ে দিতে তার প্রাণ কেমন-কেমন করে।

॥ ভারতবর্ষ ॥

সন্ধি ॥ উজ্জ্বল = উৎ + জ্বল। অবশ্যম্ভাবী = অবশ্যম্ + ভাবী। ব্যস্ত = বি + অস্ত।

কারক-বিভক্তি ॥ আমাদের (যাওয়া-আসা)—ভাববাচ্যের কর্তায় 'এর' বিভক্তি। চাঁদির—উপাদান সম্বন্ধে 'র' বিভক্তি। বয়সের—বিশেষণ-সম্বন্ধে 'এর' বিভক্তি। তাহাদের—কর্ম-সম্বন্ধে 'এর' বিভক্তি। উৎসাহে—হেত্বর্থে করণকারকে 'এ' বিভক্তি। পথ দিয়ে—অধিকরণে 'দিয়ে' বিভক্তি। দৃষ্টিতে—করণে 'তে' বিভক্তি। ইচ্ছায়—হেত্বর্থে 'য়' বিভক্তি।

সমাস ॥ বিপুলকায়—বিপুল কায়া যাহার—বহুব্রী। সাপ-খেলানো—সাপকে খেলানো—দ্বিতীয়াতৎ। শ্মশ্রুগুম্ফশূন্য—শ্মশ্রু ও গুম্ফ—দ্বন্দ্ব; তাহার দ্বারা শূন্য—তৃতীয়াতৎ। কপিসেনা—যে কপি সেই সেনা—কর্মধা। লঙ্কাদ্বীপ—যাহা লঙ্কা তাহাই দ্বীপ—কর্মধা; দ্বি (দুই দিকে) অপ্ যাহার—বহুব্রী। সন্তান-সন্ততি—সন্তান ও সন্ততি—দ্বন্দ্ব। মধ্যবয়স্ক—মধ্য বয়স যাহার—বহুব্রী। মায়ামন্ত্রবলে—মায়াময় মন্ত্র—মধ্যপ-কর্মধা; তাহার বল—ষষ্ঠীতৎ; তাহাতে। সেতুবন্ধনের—সেতুর দ্বারা বন্ধন—তৃতীয়াতৎ। আপাদমস্তক—পাদ হইতে মস্তক পর্যন্ত—অব্যয়ীভাব। স্বামী-পুত্র—স্বামী ও পুত্র—দ্বন্দ্ব। কৃত্তিবাস—কৃত্তি বাস যাহার—বহুব্রী। ঠাকুরদাদা—যিনি ঠাকুর তিনিই দাদা—কর্মধা।

প্রকৃতি-প্রত্যয় ॥ ভারত—ভরত + ষ্ণ। বর্ষ—বৃষ্ + অ। গম্ভীর—গম্ + ঈর (অধিকরণবা)। মাঝারি—মাঝ + আরি। কৌতূহল—কুতূহল + ষ্ণ। সমুদ্র—সম্-উন্দ্ + র (কর্তৃবা)। তন্ময়—তৎ + ময়ট্। সন্তান—সম্-তন্ + ঘঞ্ (ভাববা)। —অস্তি + ত্ব। দেব—দেব + ষ্ণ। অবশ্যম্ভাবী—অবশ্যম্-ভূ + ঘঞ্ (ভাববা) + ঈ। দীর্ঘ—দ্রাঘ্ + অ (ভাববা)। ব্যস্ত—বি-অস্ + ক্ত। স্বর্গীয়—স্বর্গ + ঈয়। স্মিত—স্মি + ক্ত (কর্মবা)। কৃত্তিবাস—কৃত্তি-বস্ + ঘঞ্ (কর্তৃবা)। রামায়ণ—রাম + ষ্ণায়ণ।

পদ পরিবর্তন ॥ বৃদ্ধ (বিণ)—বার্ধক্য (বি)। গম্ভীর (বিণ)—গাম্ভীর্য (বি)। বিজ্ঞ (বিণ)—বিজ্ঞতা (বি)। বিশেষ (বিণ)—বৈশিষ্ট্য (বি)। উপভোগ (বি)—উপভোগ্য (বিণ)। মধ্যবয়স্ক (বিণ)—মধ্যবয়স (বি)। পরিবর্তন (বি)—পরিবর্তিত, পরিবর্তনশীল (বিণ)। বিস্ময় (বি)—বিস্মিত (বিণ)। স্বর্গীয় (বিণ)—স্বর্গ (বি)।

সার্থক বাক্য-রচনা ॥ **দৈবক্রমে**—বহু বৎসর পরে সেদিন **দৈবক্রমে** তাহার সহিত একটি সভায় সাক্ষাৎ হইয়া গেল। **মায়ামন্ত্রবলে**—যেন কোন **মায়ামন্ত্রবলে** আকাশের কোণে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ জমিতে লাগিল। **আপাদমস্তক**—আমি লোকটাকে **আপাদমস্তক** একবার দেখে নিলুম।

সাধু বাংলায় রূপান্তর ॥ 'তারপর বিস্ময়ের স্বরে বললে আমার ঐ ছেলের সন্তান।' [চলিত বাংলা]

তাহার পর বিস্ময়ের স্বরে বলিল, 'পঞ্চবিংশ পূর্বে আপনি এ স্থান দিয়া গমন করিয়াছিলেন?' আমি বলিলাম, 'আজ্ঞে হাঁ'। বৃদ্ধ বলিল, 'তাহা হইলে আপনি আমার স্বর্গীয় পিতা মহাশয়কে এই রামায়ণ পাঠ করিতে দেখিয়াছেন। আমার পুত্র-কন্যারা তাঁহার নিকটে বসিয়া পাঠ শ্রবণ করিত। পুত্রটি বর্তমানে ঐ বড়ো হইয়াছে। উহার বয়ঃক্রম আপনার মতোই হইবে। কন্যাদের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে তাহারা স্বামীপুত্র লইয়া গৃহকর্ম করিতেছে। এই বালকটি আমার পৌত্র এবং এই বালিকাদ্বয় আমার পৌত্রী—আমার ঐ পুত্রের সন্তান।' [সাধু বাংলা]

॥ দুর্যোধনের প্রতি ধৃতরাষ্ট্র ॥

সন্ধি ॥ দুর্যোধনের = দুঃ + যোধনের। হিংসা = হিন্‌স্ + আ। প্রশংসা = প্রশন্‌স্ + আ। যজ্ঞ = যজ্ + ন। ততোধিক = ততঃ + অধিক। সংসার = সম্ + সার। সন্তোষিত = সম্ + তোষিত। উদ্‌যোগ = উৎ + যোগ। সংহতি = সম্ + হতি। সংহার = সম্ + হার। নিষ্কণ্টকে = নিঃ + কণ্টকে। যুধিষ্ঠিরে = যুধি + স্থিরে।

কারক-বিভক্তি ॥ জনের—অপাদানে 'এর' বিভক্তি। পাণ্ডবের—কর্মে 'এর' বিভক্তি। আমারে—কর্মে 'রে' বিভক্তি। ধনে জনে—কর্মে 'এ' বিভক্তি। দানবে—কর্মে 'এ' বিভক্তি। তরুগণ—কর্মে শূন্যবিভক্তি। দুর্যোধনে—কর্মে 'এ' বিভক্তি। বিদুরে, যুধিষ্ঠিরে—কর্মে 'এ' বিভক্তি। রথে—কর্মে 'এ' বিভক্তি।

সমাস ॥ দুর্যোধনের—দুঃ (দুঃসাধ্য) যুদ্ধ যাহার সহিত—বহুব্রী, তাহার। ধৃতরাষ্ট্র—ধৃত রাষ্ট্র যাহার দ্বারা—বহুব্রী। অহিংসক—নাই হিংসা যাহার—নঞ্ বহুব্রী। নৃপবর—নৃদের পালন করেন যিনি—উপপদতৎ; নৃপদের বর—ষষ্ঠীতৎ। পরদ্রব্য—পরের দ্রব্য—ষষ্ঠীতৎ। স্বধর্মেতে—স্ব-র ধর্ম—ষষ্ঠীতৎ, তাহাতে। স্বকর্মে—স্ব-র কর্ম—ষষ্ঠীতৎ; তাহাতে। পর-উপকারী—পরের উপকারী—ষষ্ঠীতৎ। সদাকাল—সদা ব্যাপিয়া কাল—দ্বিতীয়াতৎ। দ্বেষভাব—দ্বেষের ভাব—ষষ্ঠীতৎ। শাস্ত্র-অনুসারে—সারের (সরণের) সদৃশ—অব্যয়ীভাব; শাস্ত্রের অনুসারে ষষ্ঠীতৎ। সহস্র-লোচন—সহস্র লোচন যাহার—বহুব্রী। নমুচি-সংহতি—নমুচির সহিত সংহতি—তৃতীয়াতৎ। নিষ্কণ্টকে—নাই কণ্টক যাহাতে—বহুব্রী; তাহাতে। অদিতিকুমার—অদিতির কুমার—ষষ্ঠীতৎ। মূলস্থ—মূলে থাকে যে—উপপদতৎ। দৈবগতি—দেবের গতি—ষষ্ঠীতৎ। কুলনাশ—কুলের নাশ—ষষ্ঠীতৎ। দৈববশ—দেবের বশ—ষষ্ঠীতৎ।

প্রকৃতি-প্রত্যয় ॥ দুর্যোধন—দুর্-যুধ্ + অনট্ (কর্মবা)। পুত্র—পুৎ-ত্রৈ + অ (কর্তৃবা)। হিংসা—হিন্‌স্ + অ (ভাববা) + আ। হিংসক—হিন্‌স্ + অক (কর্মবা)। পাণ্ডব—পাণ্ডু + ষ্ণ (অপত্যার্থে)। শান্ত—শম্ + ক্ত (কর্তৃবা)। প্রশংসা প্র-শন্‌স্ + অ (ভাববা) + আ। যজ্ঞ—যজ্ + ন। নিমন্ত্রণ—নি-মন্ত্র্ + অনট্ (ভাববা)। গৌরব—গুরু + ষ্ণ। বিস্তর—বি-স্তৃ + অ (কর্মবা)। বিচার—বি-চর্ + অ (ভাববা)। মার্গ—মৃজ্ + অ (কর্মবা)। দূষিবে—দূষ্ + ইবে (বাং)। সংসার—সম্-সৃ + অ (ভাববা)। দ্রব্য—দ্রু + যৎ (কর্মবা)। স্বধর্মেতে—স্ব-ধৃ + ম (কর্তৃবা) + এতে (বাং)। সন্তোষিত—সম্-তুষ্ + ণিচ্ + ক্ত (কর্মবা)। উদ্‌যোগ—উৎ-যুজ্ + ঘঞ্ (ভাববা)। উপকারী—উপ-কৃ + ইন্ (ভাববা)। নন্দন—নন্দ্ + অনট্ (কর্তৃবা)। দ্বেষ—দ্বিষ্ + অ (ভাববা)। ভাব—ভূ + অ (ভাববা)। প্রজ্ঞাবান—[প্র-জ্ঞা + অ (ভাববা) + আ =] প্রজ্ঞা + বতুপ্। শাস্ত্র—শাস্ + ত্র

(করণবা)। বিবাদ—বি-বদ্‌+অ (ভাববা)। অনুসার—অনু-সৃ+অ (ভাববা)। শান্তি—শম্‌+ক্তি (ভাববা)। বিশ্বাস—বি-শ্বস্‌+ঘঞ্‌ (ভাববা)। দানব—দনু+ষ্ণ (অপত্যার্থে)। উৎপত্তি—উৎ-পদ্‌+ক্তি (ভাববা)। প্রীতি—প্রী+ক্তি (ভাববা)। সংহতি—সম্‌-হন্‌+ক্তি (ভাববা)। ভোগ—ভুজ্‌+ঘঞ্‌ (ভাববা)। নাশ—নশ্‌+ঘঞ্‌ (ভাববা)। কারণ—কৃ+ণিচ্‌+অনট্‌ (ভাববা)। মূলস্থ—মূল-স্থা+ক। বঞ্চন—বঞ্চ্‌+অনট্‌। নিশ্চয়—নির্‌-চি+অ (ভাববা)। নিধন—নি-ধা+অনট্‌ (ভাববা) মধুর—মধু+র। বচন—বচ্‌+অনট্‌। ডাকাইল—ডাক্‌+ণিচ্‌ (আ)+ইল। যুধিষ্ঠির—যুধি-স্থা+ইর (কর্তৃবা)। আজ্ঞা—আ-জ্ঞা+অ+আ। শ্রেয়—প্রশস্য>শ্র+ঈয়স্‌। নাশ—নশ্‌+ঘঞ্‌ (ভাববা)। ব্যথা—ব্যথ্‌+অ (ভাববা)+আ। অন্ধ—অন্ধ্‌+ণিচ্‌+অ। নারিল—নার+ইল। হেলন—হেড়্‌+অনট্‌ (ভাববা)। ইন্দ্রপ্রস্থ—ইন্দ্র-প্র-স্থা+ক।

গদ্যরূপ ॥ আমারে—আমাকে। করহ—করো। দূষিবে—দোষ দিবে। বঞ্চে—বাঁচে। করিহ—করিও। নহিল—হইল না। কদাচন—কখনও। সবার—সকলের। গ্রাসে—গ্রাস করে। নিবারিতে—নিবারণ করিতে। জানিনু—জানিলাম। চাহ—চাও। বলিহ—বলিও। নারিল—পারিল না।

সার্থক বাক্য-রচনা ॥ **অহিংসক**—গান্ধীজীর **অহিংসক** নীতির কথা সর্বজনবিদিত। **ততোধিক**—জমিদারবাবু তাহাকে তিরস্কার করিলেন; কিন্তু জমিদারবাবুর নায়েব তাহাকে তিরস্কার করিলেন **ততোধিক**। **দূষিবে**—ভ্রাতাকে বঞ্চনা করিলে সকলেই তোমাকে **দূষিবে**। **দ্বেষভাব**—**দ্বেষভাব** পরিহার করিয়া আজ ভারত ও পাকিস্তানের মিত্র-সুলভ আচরণ করিতে হইবে। **নিষ্কণ্টকে**—আমাকে প্রতারিত করিয়া সে এখন **নিষ্কণ্টকে** বিষয়-সুখ ভোগ করিতেছে।

॥ ইন্দ্রজিতের যজ্ঞগৃহে লক্ষ্মণ ॥

সন্ধি ॥ কুশাসনে = কুশ + আসনে। যোগীন্দ্র = যোগী + ইন্দ্র। ক্ষুধাতুর = ক্ষুধা + আতুর। দেবালয়ে = দেব + আলয়ে। সম্মুখে = সম্‌ + মুখে। দেবাকৃতি = দেব + আকৃতি। মধ্যাহ্নে = মধ্য + অহ্নে। সাষ্টাঙ্গে = স + অষ্ট + অঙ্গে। কৃতাঞ্জলিপুটে = কৃত + অঞ্জলিপুটে। ফণীশ্বরে = ফণী + ঈশ্‌ + বরে। উত্তাপে = উৎ + তাপে। রামানুজ = রাম + অনুজ। রক্ষোরাজপুরে = রক্ষঃ + রাজপুরে। দেবকুলোদ্ভবে = দেবকুল + উৎ + ভবে। রক্ষোবৃন্দে = রক্ষঃ + বৃন্দে। নিরাকার = নিঃ + আকার। ভগ্নোদ্যম = ভগ্ন + উৎ + যম। দেবাকৃতি = দেব + আকৃতি। দুর্মতি = দুঃ + মতি। দেবাদেশে = দেব + আদেশে। কালানল = কাল + অনল। *মহাহবে = মহা + আহবে। রক্ষোরিপু = রক্ষঃ + রিপু। তপ্তলৌহাকৃতি = তপ্তলৌহ + আকৃতি। নির্লজ্জ = নিঃ + লজ্জ। তস্কর = তৎ + কর। নিরন্ত = নিঃ + অন্ত। কাকোদর = কাক + উদর। দুর্মতি = দুঃ + মতি। শূরেন্দ্র = শূর + ইন্দ্র।

কারক-বিভক্তি ॥ ইষ্টদেবে—সম্প্রদানে 'এ' বিভক্তি। অধীনে—কর্মে 'এ' বিভক্তি। রঘুকুলে—অপাদানে 'এ' বিভক্তি। কণীশ্বরে—কর্মে 'এ' বিভক্তি। উত্তাপে—করণে 'এ' বিভক্তি। মিহিরে—কর্মে 'এ' বিভক্তি। অনুরোধে—কর্মে 'এ' বিভক্তি। নগর-দ্বার—কর্মে শূন্যবিভক্তি। রণে—অপাদানে 'এ' বিভক্তি। রক্ষোযুদ্ধে—কর্মে 'এ' বিভক্তি। দাসে—কর্মে 'এ' বিভক্তি। কিঙ্করে—সম্প্রদানে 'এ' বিভক্তি। রাঘবে—কর্মে 'এ' বিভক্তি। কিষ্কিন্ধ্যা-অধিপে—কর্মে 'এ' বিভক্তি। বিভীষণে—কর্মে 'এ' বিভক্তি। রণরঙ্গে—অপাদানে 'এ' বিভক্তি।

সমাস ॥ কুশাসনে—কুশ নির্মিত আসন—মধ্যপ-কর্মধা ; তাহাতে। ইন্দ্রজিৎ—ইন্দ্রকে জয় করিয়াছে যে—উপপদতৎ। ইষ্টদেবে—যিনি ইষ্ট, তিনিই দেব—কর্মধা ; তাহাতে। ফুলমালা—ফুলের মালা—ষষ্ঠীতৎ। ধূপদান—ধূপের নিমিত্ত দান—চতুর্থীতৎ। ঘৃতরসে—ঘৃতের রস—ষষ্ঠীতৎ ; তাহাতে। কলুষনাশিনী—কলুষ নাশ করে যে (স্ত্রী)—উপপদতৎ। হেম-ঘণ্টা—হেম নির্মিত ঘণ্টা—মধ্যপ-কর্মধা। হেমপাত্রে—হেম নির্মিত পাত্র—মধ্যপ-কর্মধা ; তাহাতে। রথীন্দ্র—রথীগণের ইন্দ্র—ষষ্ঠীতৎ। চন্দ্রচূড—চন্দ্র চূড়ায় যাঁহার—বহুব্রী। যোগীন্দ্র—যোগীদের ইন্দ্র—ষষ্ঠীতৎ। ক্ষুধাতুর—ক্ষুধার দ্বারা আতুর—তৃতীয়াতৎ। গোষ্ঠগৃহে—গো থাকে যেখানে—উপপদতৎ ; গোষ্ঠের নিমিত্ত গৃহ—চতুর্থীতৎ। ভীম-বাহু—ভীম (ভয়ঙ্কর) বাহু যাহার—বহুব্রী। দেবালয়ে—দেবের উদ্দেশে আলয়—চতুর্থীতৎ ; তাহাতে। বীরপদভরে—বীরের পদ-ষষ্ঠীতৎ ; তাহার ভর—ষষ্ঠীতৎ ; তাহাতে। দেবাকৃতি—দেবের আকৃতি—ষষ্ঠীতৎ। মধ্যাহ্নে—অহনের মধ্য—ষষ্ঠীতৎ ; তাহাতে। অংশুমালী—অংশু মালা যাহার—বহুব্রী। সাষ্টাঙ্গে—অষ্ট অঙ্গের সমাহার—দ্বিগু ; অষ্টাঙ্গের সহিত বর্তমান—বহুব্রী। কৃতাঞ্জলিপুটে—কৃত অঞ্জলিপুট যাহার—বহুব্রী ; তাহাতে। বিভাবসু—বিভায় বসু যাহার—বহুব্রী। রক্ষঃকুলরিপু- রক্ষের কুল—ষষ্ঠীতৎ ; তাহার রিপু—ষষ্ঠীতৎ। ভূতলে—ভূ-র তল—ষষ্ঠীতৎ ; তাহাতে। বীরসিংহ—বীর যে সিংহ—কর্মধা। ঊর্ধ্বফণা—ঊর্ধ্ব ফণা যাহার-বহুব্রী। ফণীশ্বর—ফণীদের ঈশ্বর—ষষ্ঠীতৎ। হীনগতি—হীন গতি যাহার—বহুব্রী। ভয়শূন্য—ভয়ের দ্বারা শূন্য—তৃতীয়াতৎ। অম্বুনাথ—অম্বুর নাথ—ষষ্ঠীতৎ ; তাহাতে। রামানুজ—অনুতে জন্মিয়াছে যে—উপপদতৎ ; রামের অনুজ—ষষ্ঠীতৎ। রক্ষোরাজপুর—রক্ষদের রাজা—ষষ্ঠীতৎ ; তাহার পুর—ষষ্ঠীতৎ ; তাহাতে। যক্ষপতিত্রাস—যক্ষদের পতি—ষষ্ঠীতৎ ; তাহার ত্রাস—ষষ্ঠীতৎ। অস্ত্রপাণি—অস্ত্র পাণিতে যাহার—বহুব্রী। শৃঙ্গধরসম—শৃঙ্গ ধারণ করে যে—উপপদতৎ ; তাহার সম—ষষ্ঠীতৎ। পুর-প্রাচীর—পুরের প্রাচীর—ষষ্ঠীতৎ। চক্রাবলীরূপে—চক্রের আবলী—ষষ্ঠীতৎ ; তাহার রূপ—ষষ্ঠীতৎ ; তাহাতে। মানবকুল-সম্ভব—মানবের কুল—ষষ্ঠীতৎ ; তাহা হইতে সম্ভব—পঞ্চমীতৎ। দেবকুলোদ্ভব—দেবের কুল—ষষ্ঠীতৎ ; তাহা হইতে উদ্ভব যাহার—বহুব্রী। সর্বভুক্—সর্ব ভোজন করে যে—উপপদতৎ ; নিরাকার—নাই আকার যাহার—বহুব্রী। নিঃশঙ্কা—নাই শঙ্কা—নঞ্‌তৎ। কিষ্কিন্ধ্যা-অধিপে—অধি পালন করেন যিনি—উপপদতৎ ; কিষ্কিন্ধ্যার

অধিপ—ষষ্ঠীতৎ; তাহাতে। রাজপদে—রাজার পদ—ষষ্ঠীতৎ; তাহাতে। রাজ —রাজাকে দ্রোহ করে যে—উপপদতৎ। শৃঙ্গনাদিগ্রাম—শৃঙ্গনাদ করে যে—উপপদতৎ; তাহাদের গ্রাম (সমূহ)—ষষ্ঠীতৎ। জয়োত্তম—জয় উত্তম যাহার—বহুব্রী। রক্ষঃচমূ—রক্ষদের চমূ—ষষ্ঠীতৎ। কৃতান্ত—কৃত অন্ত যাহার দ্বারা—বহুব্রী. আয়ুহীন—আয়ুর দ্বারা হীন—তৃতীয়াতৎ। দুর্মতি—দুষ্টা মতি যাহার—বহুব্রী কালানল-তেজে—কালরূপ অনল—রূপক-কর্মধা; তাহার তেজ—ষষ্ঠীতৎ; তাহাতে কৃপাণবর—কৃপাণদের বর—ষষ্ঠীতৎ। মহাহবে—মহৎ আহব—কর্মধা; তাহাতে শূরশ্রেষ্ঠ—শূরদের শ্রেষ্ঠ—ষষ্ঠীতৎ। রক্ষোরিপু—রক্ষদের রিপু—ষষ্ঠীতৎ। বীরসাজে —বীরের সাজ—ষষ্ঠীতৎ, তাহাতে। নিরস্ত্র—নাই অস্ত্র যাহার—বহুব্রী। রথীকুল প্রথা—রথীদের কুল—ষষ্ঠীতৎ; তাহাদের প্রথা—ষষ্ঠীতৎ। বীরবর—বীরদের বর—ষষ্ঠীতৎ। অবিদিত—নয় বিদিত—নঞ্‌তৎ। জলদ-প্রতিম—জল দান করে যে—উপপদতৎ; তাহার প্রতিম—ষষ্ঠীতৎ। বাসবজেতা—বাসবকে জিতিয়াছে যে—উপপদতৎ। ক্ষত্রকুলগ্লানি—ক্ষত্রের কুল—ষষ্ঠীতৎ; তাহার গ্লানি—ষষ্ঠীতৎ। নির্লজ্জ—নাই লজ্জা যাহার—বহুব্রী। কাকোদর—কাকের ন্যায় উদর যাহার—বহুব্রী। তরুরাজ—তরুদের রাজা—ষষ্ঠীতৎ। রুধির-ধারা—রুধিরের ধারা—ষষ্ঠীতৎ। শুণ্ডধর—শুণ্ড ধরে যে—উপপদতৎ। শৃঙ্গধরশৃঙ্গে—শৃঙ্গ ধরে যে—উপপদতৎ; তাহার শৃঙ্গ—ষষ্ঠীতৎ তাহাতে। শূরেন্দ্র—শূরদের ইন্দ্র—ষষ্ঠীতৎ। সচকিতে চকিতের সহিত বর্তমান—বহুব্রী, তাহাতে। ধূমকেতুসম—ধূম কেতু যাহার—বহুব্রী; তাহার সম—ষষ্ঠীতৎ।

প্রকৃতি-প্রত্যয় ॥ ইন্দ্রজিৎ—ইন্দ্র-জি + ক্বিপ্। নিভৃত—নি-ভৃ + ক্ত (কর্মবা) কৌষিক—কোষ + ষ্ণিক। বস্ত্র—বস্ + ত্র (করণবা)। পূত—পূ + ক্ত (কর্মবা) জাহ্নবী—জহ্নু + ষ্ণ (জাতার্থে) + ঈ (স্ত্রী)। উপহার—উপ-হৃ + ঘঞ্ (ভাববা) রুদ্ধ—রুধ্ + ক্ত (কর্মবা)। নিমগ্ন—নি-মস্জ্ + ক্ত (কর্তৃবা)। ব্যাঘ্র—বি-আ + ঘ্রা + অ (কর্তৃবা)। গোষ্ঠ—গো-স্থা + ক। পিধান—অপি-ধা + অনট্ (ভাববা) ফলক—ফল + ক। মন্দির—মন্দ্ + ইর (অধিকরণবা)। মুদিত—মুদ্ + ই (কর্মধা)। রাবণি—রাবণ + ষ্ণি (অপত্যার্থে)। তেজস্বী—তেজ + স্বিন্ অংশুমালী—অংশু-মাল + ইন্। পবিত্রিলা পবিত্র (পূ + ইত্র) + ইলা (নামধাতু) অর্পণে—অর্পি + অনট্ (ভাববা) + এ। প্রভাময়—প্রভা (প্র-ভা + অ + আ) + ময়ট্ বলী—বল + ইন্। উত্তরিলা—উত্তর + ইলা (নামধাতু)। রৌদ্র—রুদ্র + ষ্ণ (ভা অর্থে)। দাশরথি—দশরথ + ষ্ণি (অপত্যার্থে)। সংগ্রাম—সংগ্রাম্ + অ (ভাববা) আগমন—আ-গম্ + অনট্ (ভাববা)। সহসা—সহ-সো + আ (কর্তৃবা)। ত্রাস-ত্রস্ + ঘঞ্ (ভাববা)। পথিক—পথিন্ + ক। প্রচণ্ড—প্র-চণ্ড্ + অ। উত্তাপ-উৎ-তপ্ + অ (ভাববা)। গ্রাসিল—গ্রাস (গ্রস্ + অ) + ইল্ (নামধাতু)। রাহু-রহ্ + উ (কর্তৃবা)। আঁধারি—আঁধার (<অন্ধকার) + ই (অসমাপিকা) নিদাঘ—নি-দহ্ + অ (ভাববা)। শুষিল—শুষ্ + ইল। পশিল—পশ্ (<প্রবেশ —ইল (নামধাতু)। কৌশল—কুশল (কুশ-লা + অ) + ষ্ণ (ভাববা)। বি

—বি-জি + অ (ভাববা)। নগর—নগ + র। যোধ—যুধ্ + অ (ভাববা)। মানব —মনু + ষ্ণ (অপত্যার্থে)। সম্ভব—সম্-ভূ + অল্ (ভাববা)। দেব—দিব্ + অ (কর্তৃবা)। উদ্ভব—উৎ-ভূ + অ (কর্তৃবা)। প্রপঞ্চ—প্র-পন্চ্ + অ। বঞ্চাইছ— বঞ্চ্ + ণিচ্ + ইছ। কৌতুক -কুতুক্ + অ। কৌতুকী—কৌতুক + ইন্। নিরাকার— নির্-আ-কৃ + অ। সৌমিত্রি—সুমিত্রা + ষ্ণি (অপত্যার্থে)। বর -বৃ + অ। প্রভু— প্র-ভূ + উ (কর্তৃবা)। কিংকর—কিম্-কৃ + অ (কর্তৃবা)। নিঃশঙ্কা -নিঃ-শন্ক্ + অ (ভাববা) + আ। রাঘব—রঘু + ষ্ণ (অপত্যার্থে)। অধিপ—অধি-পা + অ (কর্তৃবা)। বিভীষণ—বি-ভী + ণিচ্ + অনট্ (ভাববা)। রাজদ্রোহী—রাজ-দ্রুহ্ + অ (ভাববা) + ইন্। নাদিছে—নাদ + ইছে (নামধাতু)। ভগ্নোদ্যম—(ভন্জ্ + ক্ত)-উৎ-যম্ + অ (ভাববা)। কেশরী—কেশর + ইন্। কৃতান্ত—কৃত (কৃ + ক্ত) + অম্ + ক্ত। অবহেলা—অব-হেড়্ + অ (ভাববা) + অ। মূঢ়—মুহ্ + ক্ত (কর্তৃবা)। উলঙ্গিলা—উলঙ্গ + ইলা (নামধাতু)। ভৈরব—ভীরু + ষ্ণ। ইরম্মদময়—ইরা + মদ্ + অ (কর্তৃবা) + ময়ট্। রামানুজ—রাম-অনু-জন্ + ড। আহব —আ-হ্বে + অ (অধিকরণবা)। বিরত—বি-রম্ + ক্ত (কর্তৃবা)। রণরঙ্গ—রণ-রন্জ্ + অ (ভাববা)। আতিথেয়—অতিথি + ঢেয়। সেবা—সেব্ + অ (ভাববা) + আ। তিষ্ঠি -তিষ্ঠ্ (<স্থা) + ই (অসমাপিকা)। প্রথা—প্রথ্ + অ (ভাববা) + আ। অবিদিত—নঞ্-বিদ্ + ক্ত (কর্মবা)। জলদ—জল-দা + ক। প্রতিম— প্রতি-মা + অ (কর্তৃবা)। জন্ম—জন্ + মন্ (ভাববা)। অভিমন্যু—অভি-মন্ + উ। ক্ষত্রিয়—ক্ষত্র + ইয়। সমাজ—সম্-অজ্ + অ (অধিকরণবা)। শ্রবণ—শ্রু + অনট্ (ভাববা)। নিরস্ত—নির্-অস্ + ক্ত (কর্মবা)। নিমিষ—নি-মিষ্ + অ। নিক্ষেপিলা—নি-ক্ষিপ্ + অ (ভাববা) + ইলা (নামধাতু)। ঘোর—ঘুর্ + অ (কর্তৃবা)। নাদ—নদ্ + অ (ভাববা)। প্রহরণ—প্র-হৃ + অনট্ (ভাববা)। প্রভঞ্জন—প্র-ভন্জ্ + অনট্ (ভাববা)। অস্ত্র—অস্ + ত্র (কর্মবা)। ভূকম্পন— ভূ-কম্প্ + অনট্ (ভাববা)। রুধির—রুধ্ + ইর (কর্তৃবা)। সত্বর—সহ + ত্বরা। কোপ—কুপ্ + ঘঞ্ (ভাববা)। সাধন—সাধ্ + অনট্ (ভাববা)। জগৎ—গম্ + ক্বিপ্। অভিমান—অভি-মান্ + ঘঞ্ (ভাববা)। মানী—মান্ + ইন্।

গদ্যরূপ ॥ জ্বলিছে—জ্বলিতেছে। চৌদিকে—চারিদিকে। পশে—প্রবেশ করে। পশিলা—প্রবেশ করিল। ঝনঝনিল—ঝনঝন্ করিল। ধ্বনিল—ধ্বনিত হইল। চমকি—চমকিয়া। মেলিলা—মেলিল। দেখিলা—দেখিল। প্রণমি—প্রণাম করিয়া। কহিলা—কহিল। পূজিল—পূজা করিল। তোমারে—তোমাকে। তেঁই—তাই। পবিত্রিলা—পবিত্র করিল। আইলা—আসিল। প্রসাদিতে—প্রসাদ দিতে। অধীনে —অধীনকে। তব—তোমার। নমিলা—নমস্কার করিল। উত্তরিলা—উত্তর করিল। নিরখিয়া—নিরীক্ষণ করিয়া। সংহারিতে—সংহার করিতে। তোমায়— তোমাকে। হেথা—এখানে। মম—আমার। দেহ—দাও। মোরে—আমাকে। হেরিলে—দেখিলে। চাহিলা—চাহিল। হিয়া—হৃদয়। গ্রাসিল—গ্রাস করিল।

মিহিরে—মিহিরকে। আঁধারি—আঁধার করিয়া। শুষিল—শোষণ করিল। রক্ষিছে—রক্ষা করিতেছে। ভ্রমিছে—ভ্রমণ করিতেছে। বিমুখয়ে—বিমুখ করে। বঞ্চাইছ—বঞ্চিত করিতেছ। দাসেরে—দাসকে। বধিয়া—বধ করিয়া। রাঘবে—রাঘবকে। বাঁধি আনি—বাঁধিয়া আনিয়া। নাদিছে—নাদ করিতেছে। বিলম্বিলে—বিলম্ব করিলে। দংশে—দংশন করে। জনে—জনকে। আহ্বানি—আহ্বান করি। উলঙ্গিলা—উলঙ্গ করিল। ভাতিল—শোভা পাইল। এবে—এখন। আঘাতিতে—আঘাত দিতে। তারে—তাকে। বধিব—বধ করিব। পালিব—পালন করিব। হেরি—দেখিয়া। রোধিবে—রোধ করিবে। পশিলি—প্রবেশ করিলি। শাস্তিয়া—শাস্তি দিয়া। নিক্ষেপিলা—নিক্ষেপ করিল। পড়িলা—পড়িল। নারিলা—পারিল না। কর্ষিলা—আকর্ষণ করিল। সাপটিলা—জড়াইয়া রাখিল।

সার্থক বাক্য-রচনা ॥ কলুষনাশিনী—নিম্নে **কলুষনাশিনী** গঙ্গা জগতের সমস্ত পাপ ধৌত করিয়া অনাদ্যন্ত রবে বহিয়া চলিয়াছে। **মায়াবলে**—যাদুকর **মায়াবলে** একটি হস্তীকে অদৃশ্য করিয়া দিলেন। **সর্বভুক্—সর্বভুক্** অগ্নি সমস্তই গ্রাস করিল। **ভগ্নোত্তম**—সেনাপতির মৃত্যুতে **ভগ্নোত্তম** সেনাবাহিনী একেবারে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। **অবিলম্বে**—তাহাকে **অবিলম্বে** স্বদেশে পাঠাইয়া দাও। **সচকিতে**—**সচকিতে** চাহিয়া দেখিলাম, ঈশান কোণে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে।

॥ ধূলামন্দির ॥

সন্ধি । ভজন = ভজ্ + অন। পূজন = পূজ্ + অন। সাধন = সাধ্ + অন। দেবালয়ের = দেব + আলয়ের। সংগোপনে = সম্ + গোপনে। নয়ন = নে + অন।

কারক-বিভক্তি ॥ কাহারে—সম্প্রদানে 'রে' বিভক্তি। যেথায়—অধিকরণে 'য়' বিভক্তি। মাটি, পাথর—কর্মে শূন্যবিভক্তি। সবার—কর্মপ্রবচনীয়-যোগে 'র' বিভক্তি। কর্মযোগে—করণে 'এ' বিভক্তি।

সমাস ॥ ধূলামন্দির—ধূলা নির্মিত মন্দির বা ধূলাময় মন্দির—মধ্যপ-কর্মধা। রুদ্ধদ্বারে—রুদ্ধ যে দ্বার—কর্মধা; তাহাতে। দেবালয়ের—দেবের নিমিত্ত আলয়—চতুর্থীতৎ, তাহার। সৃষ্টিবাঁধন—সৃষ্টিরূপ বাঁধন—রূপক-কর্মধা। ধূলাবালি—ধূলা ও বালি—দ্বন্দ্ব। কর্মযোগে—কর্মের যোগ—ষষ্ঠীতৎ, তাহাতে।

প্রকৃতি-প্রত্যয় ॥ মন্দির—মন্দ্ + ইর (অধিকরণবা)। ভজন—ভজ্ + অনট্ (ভাববা)। পূজন—পূজ্ + অনট্ (ভাববা)। সাধন—সাধ্ + অনট্ (ভাববা)। আরাধনা—আ-রাধ্ + অনট্ (ভাববা) + আ। সংগোপন—সম্-গুপ্—অনট্ (ভাববা)। নয়ন—নী + অনট্ (করণবা)। দেবতা—দেব + তা (স্বার্থিক)। চাষা—চাষ + আ। রৌদ্র—রুদ্র + ষ্ণ (ভাববা)। শুচি—শুচ্ + ই (কর্তৃবা)।

বসন—বস্ + অন। মুক্তি—মুচ্ + ক্তি (ভাববা)। সৃষ্টি—সৃজ্ + ক্তি (ভাববা)। বাঁধন—বাঁধ্ + অন। বস্ত্র—বস্ + ষ্ট্রণ্ (কর্মবা)। কর্ম—কৃ + মন্ (কর্মবা)।

গদ্যরূপ ॥ কাহারে—কাহাকে। যেথায়—যেখানে। সবার—সকলের।

পদ-পরিবর্তন ॥ পূজন (বি)—পূজিত (বিণ)। সাধন (বি) সাধিত (বিণ)। আরাধনা (বি)—আরাধ্য, আরাধনীয় (বিণ)। রুদ্ধ (বিণ)—রোধ (বি)। নয়ন (বি)—নীত (বিণ)। মাটি (বি)—মেটে (বিণ)। পাথর (বি)—পাথুরে (বিণ)। পথ (বি)—পথ্য, পাথেয় (বিণ)। শুচি (বিণ)—শৌচ, শুচিতা (বি)। মুক্তি (বি)—মুক্ত (বিণ)। সৃষ্টি (বি)—সৃষ্ট (বিণ)। ধ্যান (বি)—ধ্যানী, ধ্যেয় (বিণ)। যোগ (বি)—যোগী (বিণ)।

সার্থক বাক্য-রচনা ॥ **রুদ্ধদ্বারে**—ক্লান্ত পথিক আসিয়া **রুদ্ধদ্বারে** করাঘাত করিল। **সংগোপনে**—দুই বন্ধুতে বসিয়া **সংগোপনে** বহু শলাপরামর্শ করিল। **কর্মযোগে**—**কর্মযোগে** আমরা পৃথিবীর সকল মানুষের সহিত যুক্ত।

॥ *কাল-বৈশাখী* ॥

সন্ধি ॥ বনস্পতি = বন + পতি [নিপাতনে]। নিস্পন্দ = নিঃ + স্পন্দ। রশ্মিছটা = রশ্মি + ছটা [বিকল্প রূপ—রশ্মিচ্ছটা]। দিগ্‌বারণেরা = দিক্ + বারণেরা। দ্যুলোকের = দিব্ + লোকের। নিশ্চিহ্ন = নিঃ + চিহ্ন। উচ্ছ্বাসে = উৎ + শ্বাসে।

কারক-বিভক্তি ॥ আজিকে—অধিকরণে 'কে' বিভক্তি। নিস্পন্দ—ক্রিয়াবিশেষণে শূন্যবিভক্তি। মিহিরে—কর্মে 'এ' বিভক্তি। উল্লাসে—হেত্বর্থে 'এ' বিভক্তি। পিনাকে—অপাদানে 'এ' বিভক্তি। নববিধানের—কর্মে 'এর' বিভক্তি।

সমাস ॥ কাল-বৈশাখী—কাল [মৃত্যু]-রূপ বৈশাখী—রূপক-কর্মধা। মরুৎ-পাথারে—মরুৎ-রূপ পাথারে—রূপক-কর্মধা। বজ্রঘোষণ—বজ্রের ঘোষণ—ষষ্ঠীতৎ। আকাশকটাহে—আকাশ-রূপ কটাহে—রূপক-কর্মধা। রশ্মিছটা—রশ্মির ছটা—ষষ্ঠীতৎ। ধূলিধূসরিত—ধূলির দ্বারা ধূসরিত—তৃতীয়াতৎ। বেদনা-অধীর—নঞ্ ধীর—নঞ্‌তৎ; বেদনার দ্বারা অধীর—তৃতীয়াতৎ। মেঘ-কজ্জল—মেঘ কজ্জলের ন্যায়—উপমিত কর্মধা। বিজয়-শঙ্খ—বিজয়সূচক শঙ্খ—মধ্যপ-কর্মধা। কালপুরুষ—কাল [ভয়ঙ্কর] যে পুরুষ—কর্মধা। নীল-অঞ্জন-গিরি-নিভ—নীল যে অঞ্জন—কর্মধা; নীল-অঞ্জন যে গিরি—কর্মধা; তাহার নিভ [সদৃশ]—ষষ্ঠীতৎ। নিশীথ-নীরব—নিঃ [নাই] রব যাহাতে—বহুব্রী; নিশীথের মতো নীরব—উপমান-কর্মধা। ঘনঘোর—ঘনের [মেঘের] মতো ঘোর—উপমান-কর্মধা।

প্রকৃতি-প্রত্যয় ॥ বৈশাখী—বিশাখা + ষ্ণ (সম্বন্ধ অর্থে) + ঈ (স্ত্রী)। নিশ্বাস—নি-শ্বস্ + ঘঞ্ (ভাববা)। নির্ঘোষ—নির্-ঘুষ্ + ঘঞ্ (ভাববা)। সন্ধ্যা—সম্-ধ্যৈ + অঙ্ (অধিকরণবা) + আ (স্ত্রী)। ম্লান—ম্লা + ক্ত (কর্তৃবা)। উচ্ছ্বাস—

উৎ-শ্বস্‌ + ঘঞ্‌ (ভাববা)। উল্লাস—উৎ-লস্‌ + ঘঞ্‌ (ভাববা)। আশ্বাস—আ-শ্বস্‌ + ঘঞ্‌ (ভাববা)। চৈত্র—চিত্রা + ষ্ণ (সম্বন্ধ)। ভীষণ—ভী + ণিচ্‌ + অনট্‌ (কর্তৃবা)। পরামর্শ—পরা-মৃশ্‌ + ঘঞ্‌ (ভাববা)। দুর্ধর্ষ—দুর্‌-ধৃষ্‌ + খল্‌ (কর্মবা)।

পদ-পরিবর্তন ॥ রক্ত (বি)—রক্তিম (বিণ)। পাণ্ডুর (বিণ)—পাণ্ডুরতা (বি)। তন্দ্রা (বি)—তন্দ্রালু (বিণ)। জটা (বি)—জটিল (বিণ)। উন্মাদ (বিণ)—উন্মাদনা (বি)। নীল (বিণ)—নীলিমা (বি)। নির্মল (বিণ)—নির্মলতা (বি)। পঙ্ক (বি)—পঙ্কিল (বিণ)। উচ্ছ্বাস (বি)—উচ্ছ্বসিত (বিণ)। বাসর (বি)—বাসরীয় (বিণ)। আশ্বাস (বি)—আশ্বস্ত (বিণ)। রস (বি)—রসাল (বিণ)। মধু (বি)—মধুর (বিণ)। হর্ষ (বি)—হৃষ্ট (বিণ)। গিরি (বি)—গৈরিক (বিণ)।

গদ্যরূপ ॥ ব্যাকুলি—ব্যাকুলিত করিয়া। পশিয়াছে—প্রবেশ করিয়াছে। হেরি—দেখি। ধাইছে—ধাবিত হইতেছে। গ্রাসিতে—গ্রাস করিতে। বিদরিছে—বিদীর্ণ করিতেছে। যুঝিতেছে—যুদ্ধ করিতেছে।

অলংকারগত টীকা ॥ 'আলয়ে কুলায়ে তন্দ্রা ভুলায়ে'—অনুপ্রাস। 'হেরি যে হোথায়…মেঘের ঘটা'—অনুপ্রাস ও রূপক। 'সে যেন কাহার…ভীমকুণ্ডল জটা'—অনুপ্রাস ও উৎপ্রেক্ষা। 'দিগ্‌বারণেরা…নভ দন্তে'—অনুপ্রাস ও উৎপ্রেক্ষা। 'আলো-ঝলমল…নিশ্বাস নিঃশঙ্ক'—অনুপ্রাস।

বিপরীত শব্দ ॥ নিশ্বাস—প্রশ্বাস। বঙ্কিম—ঋজু। আলোক—অন্ধকার। নির্মল—মলিন। শুভ—অশুভ। জয়—পরাজয়। হর্ষ—বিষাদ। কায়া—ছায়া।

॥ *কাণ্ডারী হুঁশিয়ার* ॥

সন্ধি ॥ দুর্গম = দুর্‌ + গম। দুস্তর = দুঃ + তর। যুগান্ত = যুগ + অন্ত। পুনর্বার = পুনঃ + বার। পরীক্ষা = পরি + ঈক্ষা।

কারক-বিভক্তি ॥ তরী—কর্মে শূন্যবিভক্তি। পার—অধিকরণে শূন্যবিভক্তি। পথমাঝ—অধিকরণে শূন্যবিভক্তি। খুনে—করণে 'এ' বিভক্তি। জাতের—কর্মে 'এর' বিভক্তি।

সমাস ॥ দুর্গম—দুঃ (দুঃসাধ্য) গমন করা যেখানে—উপপদতৎ। দুস্তর—দুঃ (দুঃসাধ্য) তরণ করা যাহা—উপপদতৎ। রাত্রি-নিশীথে—রাত্রির নিশীথ—ষষ্ঠীতৎ; তাহাতে। তিমিররাত্রি—তিমিরময়ী রাত্রি—মধ্যপ-কর্মধা। মাতৃ-মন্ত্রী—মাতার মন্ত্র—ষষ্ঠীতৎ; তাহা আছে যাহার—উপপদতৎ; তাহাদের। যুগ-যুগান্ত-সঞ্চিত—যুগের অন্ত—ষষ্ঠীতৎ; যুগ ও যুগান্ত—দ্বন্দ্ব; তাহা ব্যাপিয়া সঞ্চিত—দ্বিতীয়াতৎ। মাতৃমুক্তিপণ—মাতার মুক্তি—ষষ্ঠীতৎ; তাহার জন্য পণ—চতুর্থীতৎ। গিরি-সংকট—গিরির সংকট—ষষ্ঠীতৎ। পশ্চাৎ-পথ-যাত্রীর—পশ্চাৎ যে পথ—কর্মধা;

তাহাতে যাত্রী—সপ্তমীতৎ; তাহার। হানাহানি—হানিয়া হানিয়া যে যুদ্ধ—ব্যতিহার বহুব্রী। মহাভার—মহৎ ভার—কর্মধা। দিবাকর—দিবা করে যে—উপপদতৎ।

প্রকৃতি-প্রত্যয়॥ দুর্গম—দুর্-গম্+খল্ (কর্মধা)। দুস্তর—দুস্-তৃ+খল্ (কর্মধা)। পারাবার—পার-আ-বৃ+ঘঞ্ (ভাববা)। ভবিষ্যৎ—ভূ+স্যতৃ (কর্তৃবা)। অভিযান—অভি-যা+অনট্ (কর্তৃবা)। অধিকার—অধি-কৃ+ঘঞ্ (ভাববা)। সন্তরণ—সম্-তৃ+অনট্ (ভাববা)। জিজ্ঞাসে—জ্ঞা+সন্+আ (নামধাতু)+এ। মানুষ—মনু (+ষ)+ষ্ণ (অপত্যার্থে)। সন্দেহ—সম্-দিহ্+ঘঞ্ (ভাববা)। দিবাকর—দিবা-কৃ+খচ্ (কর্তৃবা)। পরীক্ষা—পরি-ঈক্ষ্+অঙ্ (ভাববা)+আ (স্ত্রী)। ত্রাণ—ত্রৈ+অনট্ (ভাববা)।

পদ-পরিবর্তন॥ দুর্গম (বিণ)—দুর্গমতা (বি)। গিরি (বি)—গৈরিক (বিণ)। নিশীথ (বিণ)—নিশা (বি)। যাত্রী (বি)—যাত্রা (বি)। ব্যথা (বি)—ব্যথিত (বিণ)। বঞ্চিত (বিণ)—বঞ্চনা (বি)। অভিযান (বি)—অভিযাত্রী (বিণ)। অভিমান (বি)—অভিমানী (বিণ)। ভীরু (বিণ)—ভীরুতা (বি)। গুরু (বিণ)—গৌরব (বি)। সন্দেহ (বি)—সন্দিগ্ধ (বিণ)। খুন (বি)-খুনী (বিণ)। গঙ্গা (বি)-গাঙ্গেয় (বিণ)। পরীক্ষা (বি)—পরীক্ষিত (বিণ)। হুঁশিয়ার (বিণ)—হুঁশিয়ারি (বি)।

গদ্যরূপ॥ লঙ্ঘিতে—লঙ্ঘন করিতে। ঘোষিয়াছে—ঘোষণা করিয়াছে। হাঁকিছে—হাঁক দিতেছে। গরজায়—গর্জন করে। উদিবে—উদিত হইবে। রাঙিয়া—রঞ্জিত হইয়া।

ব্যাকরণগত টীকা॥ রাত্রি-নিশীথে—নিশীথ অর্থাৎ মধ্যরাত্রি। এখানে 'রাত্রি' শব্দটি অতিরিক্ত দোষে দুষ্ট। হুঁশিয়ার, হিম্মৎ, জোয়ান, তুফান, খুন—বিদেশী শব্দ (ফার্সী)। আগুয়ান—আগ (<অগ্র)+উ+আন। পাড়ি—পাড় (দেশী শব্দ)+ই (ভাবার্থে)। গরজায়<গর্জায়—স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ।

---

৮. বঙ্গানুবাদ

প্রস্তাবনা

অনুবাদ আমরা সবাই করিয়া থাকি। যখন মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় কোন কথা শুনি বা বই পড়ি, এবং সে ভাষা যদি আমাদের জানা থাকে, তবে তখন আমরা মনে মনে বক্তব্যটুকু মাতৃভাষায় অনুবাদ করিয়া তারপর তাহাকে আমাদের উপলব্ধির দুয়ারে পাঠাইয়া দিই। ইহা অনুবাদের নীরব প্রক্রিয়া। বলা যায়, নীরব অনুবাদ। আবার, যখন ইংরেজিতে কথা বলি বা ইংরেজিতে লিখি, তখন আমরা প্রথমে ভাবি বাংলায় এবং তারপর মনে মনে ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়া লই। এই প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চলে। তাই ধরা যায় না। তবে কাগজে-কলমে অনুবাদ করিবার সময় এত বিহ্বলতা কেন ?

অনুবাদকের কাছে আমাদের দাবি দুইটি : প্রথমতঃ, অনুবাদ যথাসম্ভব আক্ষরিক [literal] হওয়া উচিত। ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দের উপযুক্ত প্রতিশব্দ অনূদিত অংশে যথাযথরূপে ব্যবহার করা চাই। দ্বিতীয়তঃ, অনূদিত অংশের সাবলীলতা রক্ষিত হওয়াও দরকার। অর্থাৎ, প্রাথমিক প্রয়াসে আক্ষরিক অনুবাদ করিয়া যদি দেখা যায় যে, বক্তব্য অস্পষ্ট থাকিয়া যাইতেছে, ভাব খোঁড়াইয়া চলিতেছে, তবে সাবলীলতা আনিবার জন্য ভাবানুবাদের দিকে একটু মন দিতে হইবে। আক্ষরিক অনুবাদ ও ভাবানুবাদের মিশ্র-পদ্ধতিই অনুবাদ-শিল্পের শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি।

তবে স্মরণীয় যে, ইংরেজি ও বাংলা—এই দুই ভাষার রূপ-রীতি ও বিন্যাস-প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। কাজেই, উভয় ভাষার স্বতন্ত্র রূপ-রীতি ও বাগ্‌ধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়া চাই। দ্বিতীয়তঃ, একের বৈশিষ্ট্য অন্যের বৈশিষ্ট্যে রূপান্তরিত হওয়া চাই।

কোন প্রবন্ধ বা কোন অনুচ্ছেদের আছে দুইটি দিক : ভাব এবং ভাষা। অনুবাদ-কর্ম হইল, ভাবকে অটুট রাখিয়া ভাষান্তরীকরণ। তবু এক ভাষার আবেগ ও উত্তাপ অন্য ভাষায় সঞ্চারিত হওয়াও প্রয়োজন। অনুবাদ-কর্মে সাফল্য ধরা পড়ে সেইখানেই। অর্থাৎ, মূল অংশে ভঙ্গী যদি সরস হয়, অনূদিত অংশের ভঙ্গীও হইবে সরস। আর, মূল অংশে ভঙ্গী যদি ধীরোদাত্ত হয়, অনূদিত অংশেও তাহা হইবে ধীরোদাত্ত।

অনুবাদ-কর্মে হাত দিবার আগে ছাত্রদের নিজ নিজ শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিতে হইবে। যাহার শব্দভাণ্ডার যত সমৃদ্ধ, অনুবাদ-কর্মে সে ততই সিদ্ধহস্ত। আবার, শুধু প্রচুর শব্দের অধিকারী হইলেই ভালো অনুবাদ করা যায় না। সেগুলি যথাযথভাবে ব্যবহার করিতে পারা চাই। মূল বাক্যে যে শব্দ ও বাক্যাংশে গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে, অনূদিত অংশেও যেন তাহার প্রতিশব্দগুলিতে ঠিক সেই গুরুত্ব আরোপিত হয়।

সবশেষে একটি কথা, ইংরেজি হইতে বাংলায় অনুবাদকালে সাধু বা চলিত ভাষার যে কোন একটি রীতি অনুসরণীয়। যে রীতিই অনুসরণ করা হউক না কেন, আদ্যন্ত সেই এক রীতিই অনুসরণ করিতে হইবে। তাছাড়া, একদিনে অনুবাদ-কার্যে দক্ষতা অর্জন করা যায় না। তাহার জন্য চাই নিয়মিত অনুবাদ-চর্চা। সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রথম অংশে হাতে-কলমে অনুবাদ শিক্ষা, দ্বিতীয় অংশে আদর্শ অনুবাদ এবং তৃতীয় অংশে পরীক্ষার জন্য পর্যাপ্ত সংকেতসহ অনুচ্ছেদ প্রদত্ত হইয়াছে।

ক. বাক্যের ভিত্তিতে অনুবাদ

প্রথমেই প্রদত্ত বাক্যটিকে বিশ্লেষণ করিয়া লইতে হইবে। বাক্য-বিশ্লেষণের সহজ পদ্ধতিটি হইল: বাক্যের মধ্যস্থিত সব কয়টি সমাপিকা ক্রিয়াকে [finite verb] প্রথমে নিম্নরেখাঙ্কিত করিয়া লইতে হইবে। যতগুলি সমাপিকা ক্রিয়া আছে, ততগুলি বাক্যাংশ [clause] আছে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। যদি একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকে, তবে বুঝিতে হইবে, ইহা একটি সরল বাক্য [simple sentence]।

Simple Sentence-এর বঙ্গানুবাদ:

প্রথমে বাক্যটির finite verb-টিকে ধরো। তাহাকে who বা what দিয়া প্রশ্ন করিয়া কোন্ পদটি কর্তা [nominative] বুঝিয়া নাও। তারপর finite verb-কে whom বা what দিয়া প্রশ্ন করিলে কোন্ পদটি কর্ম [object] বাহির হইয়া আসিবে। এইবার কর্তা, সমাপিকা ক্রিয়া এবং কর্মপদের বাংলা প্রতিশব্দ বসাইয়া নাও। এখন আগে কর্তা, তারপর কর্ম এবং সর্বশেষে ক্রিয়াপদ—বাংলা বাক্যের এই ক্রম-অনুসারে সাজাইয়া নাও। এবার কর্তার যদি বিশেষণ থাকে, কর্তার আগে এবং কর্মের যদি বিশেষণ থাকে, কর্মের আগে বসাও। আর, ক্রিয়াবিশেষণ যদি থাকে, তবে তাহাকে সমাপিকা ক্রিয়ার আগে বসাইয়া নাও। বাংলার সাধারণ পদ-বিন্যাস-পদ্ধতি [syntax] এই রকম। কিন্তু স্টাইলের খাতিরে কখনও কখনও এই পদ-বিন্যাস-রীতির সামান্য বিপর্যয়ও ঘটানো যাইতে পারে।

স্মরণীয়, এক. মূল বাক্যটির যে বাচ্য এবং যে উক্তি, অনূদিত বাক্যটিরও সেই বাচ্য এবং সেই উক্তি রক্ষিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। দুই. প্রশ্নাত্মক ও বিস্ময়বোধক বাক্যের অনুবাদ মূলানুসারী হইবে। তিন. মূল বাক্যটিতে ক্রিয়ার যে কাল [tense],

অনূদিত বাক্যটিতে ক্রিয়ার সেই কাল হইবে। চার. মূল রচনায় অনুচ্ছেদ ভাগ থাকিলে অনূদিত অংশেও অনুচ্ছেদ ভাগ থাকা উচিত। পাঁচ. ই ও ঈ-কার; উ ও ঊ-কার; খ ও ক্ষ; ন ও ণ; শ, ষ ও স এবং র ও ড়—এইগুলির ক্ষেত্রে বানানের ভুল প্রায়ই হইয়া থাকে; ছাত্র-ছাত্রীরা এইগুলির ক্ষেত্রে সতর্ক থাকিবে।

অনুশীলনী

● A great king lived in the city of Baghdad. প্রথমে finite verbটি ধর—'Lived', এবং প্রশ্ন কর—Who lived? King—ইহাই কর্তা: object নাই। 'King lived'—ইহার বাংলা প্রতিশব্দ বসাইলে দাঁড়ায় 'রাজা বাস করিতেন।' কি রকম রাজা? A great king—'এক মহান্ রাজা।' কোথায় বাস করিতেন—'in the city of Baghdad'—'বাগদাদ শহরে।'

অনূদিত বাক্য : 'বাগদাদ শহরে এক মহান্ রাজা বাস করিতেন।'

● The name of Thomas Edison is well-known. Finite verb—'is': প্রশ্ন—What is? উত্তর—The name is—'নাম [হয়]'। কাহার নাম?—The name of Thomas Edison—'টমাস এডিসনের নাম'। Well-known—'সুপরিচিত, সুবিদিত'।

অনূদিত বাক্য : টমাস এডিসনের নাম সুপরিচিত।

● A thirsty crow saw a pitcher of water.

একটি তৃষ্ণার্ত কাক দেখিয়াছিল একটি জলের কলসী।

অনূদিত বাক্য : একটি তৃষ্ণার্ত কাক একটি জলের কলসী দেখিয়াছিল।

● Some boys were at play by the side of a tank.

কয়েকটি বালক খেলা করিতেছিল একটি পুকুরের ধারে।

অনূদিত বাক্য : কয়েকটি বালক একটি পুকুরের ধারে খেলা করিতেছিল।

● The prize-giving ceremony of our school came off yesterday.

পুরস্কার-বিতরণী উৎসব আমাদের বিদ্যালয়ের হইয়া গেল গতকাল।

অনূদিত বাক্য : আমাদের বিদ্যালয়ের পুরস্কার-বিতরণী উৎসব কাল হইয়া গেল।

● Vidyasagar had great regard for his mother.

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছিল অসীম ভক্তি তাঁহার মায়ের প্রতি।

অনূদিত বাক্য : বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তাঁহার মায়ের প্রতি ছিল অসীম ভক্তি।

● For the last three weeks our village has been in a state of excitement.

গত তিন সপ্তাহ ধরিয়া আমাদের গ্রাম রহিয়াছে একটি উত্তেজনার অবস্থায়।

অনূদিত বাক্য : গত তিন সপ্তাহ ধরিয়া আমাদের গ্রাম একটি উত্তেজনার অবস্থায় রহিয়াছে।

● The postman is considered to be an important public servant.

ডাকপিয়নকে মনে করা হয় বলিয়া একজন গুরুত্বপূর্ণ গণ-সেবক।

অনূদিত বাক্য : ডাকপিয়নকে একজন গুরুত্বপূর্ণ গণ-সেবক বলিয়া মনে করা হয়।

● Coal is an inflammable mineral substance.

কয়লা [হয়] একটি দাহ্য খনিজ পদার্থ।

অনূদিত বাক্য : কয়লা একটি দাহ্য খনিজ পদার্থ।

● From his very childhood Gautama had a religious bent of mind.

অতি শৈশব হইতেই গৌতমের ছিল ধর্মীয় প্রবণতা মনের।

অনূদিত বাক্য : অতি শৈশব হইতেই গৌতমের মনে ধর্মীয় প্রবণতা ছিল বা অতি শৈশব হইতেই গৌতমের মনে ছিল ধর্মীয় প্রবণতা।

Complex Sentence-এর বঙ্গানুবাদ ঃ

প্রদত্ত বাক্যটিতে যদি একাধিক finite verb থাকে, তবে উহাতে একাধিক বাক্যাংশ [clause] থাকিবে। যদি বাক্যাংশগুলির একটি স্বাধীন বাক্যাংশ [independent clause] এবং এক বা একাধিক অধীন বাক্যাংশ [dependent clause] হয়, তবে উহা অবশ্যই একটি Complex Sentence. স্বাধীন বাক্যাংশটি Principal Clause ; এবং অধীন বাক্যাংশ বা বাক্যাংশগুলি Subordinate Clause.

প্রথমে Principal Clause-টিকে Simple Sentence-এর মতো অনুবাদ করিয়া লইতে হইবে। তারপর Subordinate Clause বা Clause-গুলিকে অনুরূপভাবে অনুবাদ করিয়া শেষে সর্বনাম বা অব্যয়ের সাহায্যে যোগ করিয়া দেওয়াই বিধেয়।

নমুনা

● **One day, when I was cutting down some brushwood, I came upon a peculiar insect. Principal clause—One day I came upon…insect.**—একদিন আমি একটি অদ্ভুত কীট দেখিতে পাইলাম। **Subordinate clause—when…brushwood.**—যখন আমি ছোট ছোট ঝোপ কাটিতেছিলাম।

অনূদিত বাক্য ঃ একদিন যখন আমি ছোট ছোট ঝোপ কাটিতেছিলাম, তখন আমি একটি অদ্ভুত কীট দেখিতে পাইলাম।

● **The world always will be the same as long as men are men.**

The world…the same.—পৃথিবী সর্বদা একই প্রকার থাকিবে।

As long as…men —যতদিন মানুষ মানুষ থাকিবে।

অনূদিত বাক্য ঃ যতদিন মানুষ মানুষ থাকিবে, [ততদিন] পৃথিবী সর্বদা একই প্রকার থাকিবে।

● **The appearance of the island when I came on deck next morning was altogether changed.**

The appearance of the island was altogether changed.—দ্বীপটির রূপ সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া গিয়াছিল।

When I came on deck next morning.—পরের দিন সকালে যখন আমি জাহাজের পাটাতনের উপর আসিলাম।

অনূদিত বাক্য ঃ পরের দিন সকালে যখন আমি জাহাজের পাটাতনের উপর আসিলাম, তখন দ্বীপটির রূপ সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া গিয়াছিল।

● **It is said that Gladstone, the British Prime Minister, used to relax after hard work by cutting wood.**

It is said—কথিত আছে। **that**—যে।

Gladstone…cutting wood—ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোন চিত্তবিনোদন করিতেন কঠিন পরিশ্রমের পর গাছ কাটিয়া।

অনূদিত বাক্য ঃ কথিত আছে যে, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোন কঠিন পরিশ্রমের পর গাছ কাটিয়া চিত্তবিনোদন করিতেন।

● **The merchant, before he left, gave a costly watch to the poor man as a reward.**

The merchant gave a costly...a reward—বণিকটি দরিদ্র লোকটিকে পুরস্কার হিসাবে একটি মূল্যবান ঘড়ি দিয়াছিলেন।

Before he left—ত্যাগ করিবার পূর্বে ; অর্থাৎ বিদায়ের পূর্বে।

অনুদিত বাক্য : বিদায়ের পূর্বে বণিকটি দরিদ্র লোকটিকে পুরস্কার হিসাবে একটি মূল্যবান ঘড়ি দিয়াছিলেন।

● **The man who perpetually hesitates which of the two things he will do first, will do neither.**

The man will do neither.—ব্যক্তিটি কোনটিই করিবে না।

Who perpetually hesitates—যে চিরকাল ইতস্তত: করে।

Which of the two things he will do first—সে দুইটির মধ্যে কোন্‌টি আগে করিবে।

অনুদিত বাক্য : যে ব্যক্তি [কাজ] দুইটির মধ্যে কোন্‌টি আগে করিবে [ভাবিয়া] চিরকাল ইতস্তত: করে, সে কোনটিই করিবে না।

● **A poor woman once came to Buddha to ask him whether he could give her any medicine to restore her dead child to life.**

A poor woman ..to ask him—একদিন এক দরিদ্র স্ত্রীলোক বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহার কাছে আসিয়াছিল।

Whether he could give her...child to life—তাহার মৃত সন্তানকে বাঁচাইয়া তোলার জন্য তাহাকে তিনি কোন ঔষধ দিতে পারেন কিনা।

অনুদিত বাক্য : একদিন এক দরিদ্র স্ত্রীলোক তাহার মৃত সন্তানকে বাঁচাইয়া তোলার জন্য তাহাকে কোন ঔষধ দিতে পারেন কিনা জিজ্ঞাসা করিতে বুদ্ধের কাছে আসিয়াছিল।

● **Sir Walter Scott was a man who was honest to the core of his nature.**

Sir Walter Scott was a man—স্যার ওয়াল্টার স্কট ব্যক্তি ছিলেন। Who was honest...his nature—যিনি তাঁহার স্বভাবের অন্তস্তল পর্যন্ত সৎ ছিলেন।

অনুদিত বাক্য : স্যার ওয়াল্টার স্কট তাঁহার স্বভাবের অন্তস্তল পর্যন্ত সৎ ব্যক্তি ছিলেন।

● **The mystery of Napoleon's career was this; that under all difficulties and disadvantages he pressed on.**

The mystery of Napoleon's career was this—নেপোলিয়নের জীবনের রহস্য ছিল এই। That under all···pressed on—যে, সমস্ত কষ্ট ও অসুবিধার মধ্যে তিনি অগ্রসর হইয়া চলিতেন।

অনুদিত বাক্য : নেপোলিয়নের জীবনের রহস্য ছিল এই যে, তিনি সমস্ত কষ্ট ও অসুবিধার মধ্যে অগ্রসর হইয়া চলিতেন।

● **It happened one day that, going towards my boat, I [Robinson Crusoe] was exceedingly surprised with the print of a man's naked foot on the shore, which was very plain to be seen in the sand.**

It happened one day—একদিন ঘটিল ; that, going···on the shore—যে, আমার নৌকার দিকে যাইতে যাইতে আমি [রবিনসন ক্রুসো] তীরের উপর মানুষের খালি পায়ের চিহ্ন দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া গেলাম ; which was···in the sand—যাহা ছিল বালিতে সহজে চোখে পড়ার মতো।

অনুদিত বাক্য : একদিন এমন ঘটিল যে, আমার নৌকার দিকে যাইতে যাইতে তীরের উপর বালিতে সহজে চোখে পড়ার মতো মানুষের খালি পায়ের চিহ্ন দেখিয়া আমি [রবিনসন ক্রুসো] অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া গেলাম।

Compound Sentence-এর বঙ্গানুবাদ :

প্রদত্ত বাক্যে একাধিক finite verb থাকিলে একাধিক বাক্যাংশ থাকিবে এবং বাক্যটি simple sentence না হইয়া complex অথবা compound হইবে। কিন্তু যদি দেখা যায় বাক্যাংশগুলির সব কয়টিই স্বাধীন বাক্যাংশ, তবে উহা অবশ্যই compound sentence হইবে।

প্রথমে compound sentence-এর স্বাধীন বাক্যগুলিকে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে simple sentence-এর মতো বঙ্গানুবাদ করিয়া লইবে ; তারপর প্রদত্ত বাক্যানুযায়ী সংযোজক অব্যয় [ও, এবং, আর ইত্যাদি] বা বিয়োজক অব্যয় [অথবা, কিংবা, বা ইত্যাদি] যোগ করিয়া লইলে অনূদিত বাক্যটির পূর্ণরূপ পাওয়া যাইবে।

অনুশীলন।

● **God made the country and man made the town.**

God made the country—ঈশ্বর দেশ সৃষ্টি করিয়াছেন।

Man made the town—মানুষ শহর তৈয়ারী করিয়াছে। **And**—এবং।

অনূদিত বাক্য : ঈশ্বর দেশ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং মানুষ তৈয়ারী করিয়াছে শহর। [ক্রিয়াপদটিকে কর্মের পূর্বে বসানো হইয়াছে।]

● **'Vidyasagar' literally means 'the ocean of learning', but Iswar Chandra, in spite of his vast scholarship was perhaps more an ocean of kindness than of learning.**

'Vidyasagar'...of learning—'বিদ্যাসাগরে'র আক্ষরিক অর্থ 'বিদ্যার সাগর'। **Iswar Chandra ...than of learning**—ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও সম্ভবতঃ বিদ্যার অপেক্ষা দয়ার সাগরই ছিলেন বেশী। **but**—কিন্তু।

অনূদিত বাক্য : 'বিদ্যাসাগরে'র আক্ষরিক অর্থ 'বিদ্যার সাগর' ; কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও সম্ভবতঃ বিদ্যার অপেক্ষা দয়ার সাগরই ছিলেন বেশী।

● **In Japan Netaji Subhas Chandra Basu organised his Azad Hind Army from among Indian war-prisoners, crossed South-East Asia and finally planted the Indian flag of independence on the eastern frontiers of India.**

In Japan Netaji Subhas Chandra Basu...war-prisoners—জাপানে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের লইয়া তাঁহার আজাদ হিন্দ ফৌজ সংগঠিত করেন। **[He] crossed South-East Asia**—[তিনি] দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পার হইলেন। **[He] finally planted...frontiers of India**—[তিনি] অবশেষে ভারতের পূর্ব-সীমান্তে ভারতের স্বাধীনতার নিশান প্রোথিত করিয়া দিলেন। **And**—এবং।

অনূদিত বাক্য : জাপানে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের লইয়া তাঁহার আজাদ হিন্দ ফৌজ সংগঠিত করিলেন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পার হইয়া অবশেষে ভারতের পূর্ব-সীমান্তে ভারতের স্বাধীনতার নিশান প্রোথিত করিয়া দিলেন।

● **The old gardener came from the next village and planted some mango and apple trees in the side border of my uncle's garden.**

The old gardener...village—বুড়ো মালী পাশের গ্রাম হইতে আসিল। **[He] planted some mango...uncle's garden**—[সে] আমার কাকার বাগানের সীমানার ধারে কয়েকটা আম এবং আপেল গাছ পুঁতিয়া দিল। **And**—এবং।

অনুদিত বাক্য : বুড়ো মালী পাশের গ্রাম হইতে আসিয়া আমার কাকার বাগানের সীমানার ধারে কয়েকটা আম এবং আপেল গাছ পুঁতিয়া দিল।

● After a long battle Napoleon's troop were eager to return home and refused to advance further.

After a long battle...to return home—সুদীর্ঘ যুদ্ধের পর নেপোলিয়নের সৈন্যদল গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। [They] refused...further—[তাহারা] আর অগ্রসর হইতে অস্বীকার করিল। and—এবং।

অনুদিত বাক্য : নেপোলিয়নের সৈন্যদল গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং আর অগ্রসর হইতে অস্বীকার করিল।

● The princess went to the garden next morning and saw the handsome prince there, but he could not recognise her.

The princess went...morning—রাজকন্যা পরদিন সকালে বাগানে গেল। [She] saw... there—সেখানে সে সুন্দর রাজপুত্রকে দেখিতে পাইল। He could not...her—সে তাহাকে চিনিতে পারিল না। And—এবং, but—কিন্তু।

অনুদিত বাক্য : পরদিন সকালে রাজকন্যা বাগানে গিয়া সেই সুন্দর রাজপুত্রকে দেখিতে পাইল ; কিন্তু তাহাকে সে চিনিতে পারিল না।

● Instantly the figure reappeared, and, making a wide circuit, began to head me off.

Instantly the figure reappeared—তৎক্ষণাৎ সেই কলেবরটি পুনরায় উপস্থিত হইল। [He] making a wide.. me off—[সে] বিশাল বৃত্ত রচনা করিয়া আমাকে গুঁতাইতে লাগিল। And—এবং।

অনুদিত বাক্য : তৎক্ষণাৎ সেই কলেবরটি পুনরায় উপস্থিত হইল এবং বিশাল বৃত্ত রচনা করিয়া আমাকে গুঁতাইতে লাগিল।

● He was concealed by this time behind another tree trunk ; but he must have been watching me closely, for as soon as I began to move in his direction he reappeared and took a step to meet me.

He was concealed...tree trunk—এইবার সে অন্য একটি গাছের কাণ্ডের আড়ালে লুকাইয়া পড়িল। He must have been...me closely—সে আমাকে নিশ্চয়ই তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করিতেছিল। [He] took a step to meet me—আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে এক পা আগাইয়া আসিল। As soon as I...direction—যেইমাত্র আমি তাহার দিকে অগ্রসর হইতে শুরু করি। He reappeared—সে পুনরায় উপস্থিত হইল। But—কিন্তু, for—কারণ, and—এবং।

অনুদিত বাক্য : এইবার সে অন্য একটি গাছের কাণ্ডের আড়ালে লুকাইয়া পড়িল ; কিন্তু সে আমাকে নিশ্চয়ই তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করিতেছিল, কারণ, যেইমাত্র আমি তাহার দিকে অগ্রসর হইতে শুরু করিলাম, অমনি সে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আগাইয়া আসিল।

● The old lady pulled her spectacles down and looked over them about the room ; then she put them up and looked out under them.

The old lady...down—বৃদ্ধ মহিলাটি তাহার চশমা নীচে নামাইয়া দিলেন। [She] looked... the room—তাহার উপর দিয়া ঘরের চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন। She put them up—তিনি উহা উপরে তুলিয়া দিলেন। [She] looked out under them—[তিনি] তাহার নীচ দিয়া তাকাইতে লাগিলেন। And—এবং, then—তারপর।

অনুদিত বাক্য : বৃদ্ধা মহিলাটি তাহার চশমা নীচে নামাইয়া তাহার উপর দিয়া ঘরের চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন, তারপর উহা উপরে তুলিয়া তাহার নীচ দিয়া তাকাইতে লাগিলেন।

পারে এবং আরও পরে বিদায় লইতে পারে। বছরের মধ্যে এই ঋতুতেই আমরা সাধারণতঃ প্রচুর বৃষ্টি পাইয়া থাকি।

৪. The post of a clerk fell vacant in an office. Among those who applied for the post was a youngman who was a bit hard of hearing. He had heard that the employer ordinarily put three questions to those candidates whom he granted an interview. First he would ask, 'How old are you?' Then he would ask, 'How long are you in this line?' Lastly, he would say, 'Are you fond of study or games?'

Being called for an interview, the youngman appeared before the employer.

'How long are you in this line?' he was asked.

'Eighteen years, sir.'

'Eighteen years! Well, how old are you, then?'

'Only six months, sir?'

'Are you a fool, or a scoundrel?'

'Both', was the prompt reply.

কোন অফিসে একটি কেরানীর পদ খালি হইয়াছিল। পদটির জন্য আবেদনকারীদের মধ্যে ছিল একটি যুবক; সে কানে একটু কম শুনিত। সে শুনিয়াছিল যে, যাহাদের সাক্ষাৎকার মঞ্জুর করা হইয়াছে, মালিক তাহাদের সাধারণতঃ তিনটি প্রশ্ন করেন। প্রথমে তিনি প্রশ্ন করেন, 'তোমার বয়স কত?' তারপর তিনি প্রশ্ন করেন, 'তুমি কতদিন এই কাজে আছ?' সবশেষে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'লেখাপড়া অথবা খেলাধুলার কোন্‌টা তোমার প্রিয়?'

সাক্ষাৎকারে আমন্ত্রিত হইয়া যুবকটি মালিকের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

তাহাকে প্রশ্ন করা হইল, 'কতদিন তুমি এ কাজে আছ?'

'আঠার বছর, মহাশয়।'

'আঠার বছর! বেশ, তাহলে তোমার বয়স কত?'

'মাত্র ছয় মাস, মহাশয়।'

'তুমি নির্বোধ, না দুর্বৃত্ত?'

চটপট উত্তর আসিল—'দুই-ই।'

৫. A traveller hired an ass to carry him to a distant place. The day being intensely hot, the traveller stopped to rest under the shadow of the ass. As this afforded protection only for one and both the traveller and the owner of the ass claimed it, a violent dispute arose between them as to which of them had the

right to it. The traveller said that he had, with the hire of the ass, hired the shadow also. The owner maintained that he had let the ass only, and not the shadow. The quarrel proceeded from words to blows, and while the men were fighting, the ass galloped off.

কোন পথিক একটি দূরবর্তী স্থানে তাহাকে বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য একটি গাধা ভাড়া করিয়াছিল। প্রখর উত্তপ্ত দিন ছিল বলিয়া পথিকটি গাধার ছায়ায় বিশ্রাম করিবার জন্য থামিল। উহা কেবলমাত্র একজনকেই আশ্রয় দিতে পারিত এবং পথিক ও গাধার মালিক উভয়েই উহা দাবি করায় তাহাদের মধ্যে কে উহা পাইবার অধিকারী —তাহা লইয়া প্রচণ্ড বিবাদ উপস্থিত হইল। পথিকটি বলিল, গাধাটি ভাড়া করার সঙ্গে সঙ্গে সে তাহার ছায়াটিও ভাড়া করিয়াছে। মালিক বলিল যে, সে শুধু গাধাটাই ভাড়া দিয়াছে, ছায়া নয়। বিবাদটা কথা কাটাকাটি হইতে হাতাহাতিতে পরিণত হইল, এবং লোক দুইটি যখন মারামারি করিতেছিল, গাধাটি সেই অবসরে চম্পট দিল।

৬. Once a wood-cutter was cutting a tree on the bank of a river. Suddenly, his axe fell into the water of the river. The wood-cutter was very much aggrieved. He bewailed and bemoaned over the loss of his axe. In no time, a stranger appeared before him with a golden axe. The stranger asked him, if that axe was his. The wood-cutter replied that it was not his. The stranger again appeared with a silver axe. But the wood-cutter again refused. The stranger vanished and reappeared with the iron axe. On seeing his own axe, the wood-cutter was beside himself with joy. He exclaimed, 'Oh, generous-hearted God, this axe is mine!' The God of water was very much impressed and pleased at the honesty of the poor wood-cutter. He gave all the three axes to him as a reward for his honesty and truthfulness.

একদিন এক কাঠুরিয়া নদীর ধারে একটি গাছ কাটিতেছিল। হঠাৎ তাহার কুড়ুলটি নদীর জলে পড়িয়া গেল। কাঠুরিয়া মনে মনে খুবই দুঃখিত হইল। কুড়ুল হারাইয়া সে কাঁদিতে ও উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিল। অবিলম্বে তাহার সম্মুখে এক অজ্ঞাত ব্যক্তি একটি সোনার কুড়ুল লইয়া উপনীত হইলেন। আগন্তুক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ কুড়ুলটি তাহার কিনা। কাঠুরিয়া উত্তর করিল যে, উহা তাহার নয়। আগন্তুক একটি রূপার কুড়ুল লইয়া পুনরায় আবির্ভূত হইলেন। কিন্তু কাঠুরিয়া পুনরায় অস্বীকার করিল। আগন্তুক অদৃশ্য হইলেন এবং লোহার কুড়ুলটি লইয়া পুনরায় আবির্ভূত হইলেন। নিজের কুড়ুলটি দেখিয়া কাঠুরিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিল। সে চিৎকার করিয়া বলিল, 'হে দয়ালু ঈশ্বর! এই

কুড়ুলটাই আমার।' জলদেবতা কাঠুরিয়ার এই সততায় গভীরভাবে মুগ্ধ ও সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি তাহাকে তাহার সততা ও সত্যপরায়ণতার জন্য পুরস্কার হিসাবে তিনটি কুড়ুলই দান করিলেন।

৭. Once a greedy dog managed to secure a big piece of meat from a shop in a town. As he was very selfish, he decided to run away with the piece of meat from the town and eat it all alone. On the way, he was crossing a river by a bridge. The water under it was deep and crystal clear. The dog, while passing over the bridge saw his own reflection in the water. He contended that there must be another dog in the stream with a big piece of meat in his mouth. He wanted to get that piece also. Without wasting any time, he opened his teeth to bark at the dog in water. At once his own piece of meat dropped from his mouth and was carried away by the current of the river.

একদিন একটি লোভী কুকুর শহরের কোন একটি দোকান হইতে বড় এক টুক্‌রো মাংস সংগ্রহ করিয়াছিল। সে ছিল স্বার্থপর, তাই সে স্থির করিয়াছিল, মাংসের টুক্‌রোটি লইয়া শহর হইতে পলাইবে এবং একাই উহা ভক্ষণ করিবে। পথিমধ্যে সে সেতু দিয়া একটি নদী পার হইতেছিল। উহার নীচে জল ছিল গভীর এবং স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ। কুকুরটি সেতুর উপর দিয়া পার হইবার সময় জলে তাহার নিজের ছায়া দেখিতে পাইল। সে মনে করিল যে, বিরাট একটুক্‌রো মাংস মুখে লইয়া অন্য একটি কুকুর নদীতে রহিয়াছে। ঐ মাংসের টুক্‌রোটিও পাইতে তাহার বাসনা হইল। বিলম্ব না করিয়া সে জলের ভিতরের কুকুরটার দিকে চিৎকার করিতে দাঁত ফাঁক করিল। তৎক্ষণাৎ তাহার নিজের মাংস টুক্‌রোটি তাহার মুখ হইতে খসিয়া পড়িল এবং নদীর স্রোতে ভাসিয়া গেল।

৮. Once a thirsty crow was flying hither and thither in search of water. It was the month of June. All the tanks and ponds of the locality had dried up. At length, after a long labour, a pitcher came in his sight. He flew to the pitcher and found that the water was just at the bottom of it. He tried his level best to reach the water with his beak but could not succeed.

He strained his nerves to hit out a plan to quench his thirst with the water of the pitcher. He saw some pebbles lying nearby. He took the pebbles with his beak and dropped them into the pitcher one by one. The level of the water rose slowly to the mouth and the crow was able to quench his thirst with the water.

একদিন একটি তৃষ্ণার্ত কাক জলের অন্বেষণে ইতস্ততঃ উড়িতেছিল। জুন মাস। স্থানীয় সব কয়টি দীঘি ও পুষ্করিণী শুকাইয়া গিয়াছিল। অবশেষে দীর্ঘ পরিশ্রমের পর একটি কলসী তাহার চোখে পড়িল। সে কলসীটির কাছে উড়িয়া গেল এবং দেখিল যে, কলসীটির তলদেশে জল রহিয়াছে। সে তাহার ঠোঁট দিয়া জলের নাগাল পাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিল, কিন্তু সফল হইতে পারিল না।

কলসীর জলে তৃষ্ণা দূর করিবার জন্য সে অনেক চিন্তা করিয়া একটি ফন্দি বাহির করিল। সে দেখিতে পাইল, কাছেই কতকগুলি পাথরের নুড়ি পড়িয়া আছে। পাথরের নুড়িগুলিকে সে ঠোঁটে করিয়া একটি একটি করিয়া কলসীতে ফেলিতে লাগিল। জলের স্তর ধীরে ধীরে মুখের কাছে উঠিয়া আসিল এবং কাকটি ঐ জলে তাহার তৃষ্ণা দূর করিতে সক্ষম হইল।

৯. The human race is spread all over the world, from the polar regions to the tropics. The people eat different kinds of food, partly according to the climate in which they live, and partly according to the kind of food which their country produces. Thus in India, the people live chiefly on different kinds of grain, eggs, milk, or sometimes fish and meat. In Europe, people eat more flesh and less grain. In the Arctic regions where no grain and fruits are produced, the Eskimo and other races live almost entirely on flesh, especially fat.

মানবজাতি মেরু-অঞ্চল হইতে ক্রান্তি-অঞ্চল পর্যন্ত পৃথিবীর সর্বত্র বিস্তৃত। মানুষ বিভিন্ন ধরনের খাদ্য গ্রহণ করে—অংশতঃ যে জলবায়ুতে তাহারা বাস করে, তদনুসারে এবং অংশতঃ তাহাদের দেশ যে জাতীয় খাদ্য উৎপাদন করে, তদনুযায়ী। এইভাবে ভারতে মানুষ প্রধানতঃ শস্য, ডিম, দুধ অথবা কখনও কখনও মাছ এবং মাংস খাইয়া জীবন ধারণ করে। য়ুরোপে মানুষ অধিকতর মাংস এবং স্বল্পতর শস্য গ্রহণ করে। সুমেরু অঞ্চলে, যেখানে শস্য বা ফল কিছুই উৎপন্ন হয় না, সেখানে এস্কিমো এবং অন্যান্য জাতিরা পুরোপুরি প্রায় মাংস, বিশেষতঃ চর্বি খাইয়াই বাঁচিয়া থাকে।

১০. The giraffe is a very strange-looking animal. What you would notice first about it is its very long neck, so long that its head is often twenty feet from the ground. It has a small head of a deer, with a beautiful large brown eyes and two small blunt horns. Its back slopes down from the shoulders so steeply that it would be very hard to ride on it without slipping off over its tail. Its legs are thin like those of a deer. Its skin is covered with large brown spots. When giraffes were first brought from Africa, which is their home, to Rome in the old days, the Roman people who

ভারতীয় ইতিহাসে বহু শতাব্দী ধরিয়া উজ্জয়িনী নগরীর মতো কোন নগরী তত বিখ্যাত ছিল না। জ্ঞানের পীঠস্থান হিসাবে ইহা প্রসিদ্ধ ছিল। হোমার, দান্তে ও শেক্সপীয়ারের সহিত একসঙ্গে উচ্চারিত হইবার যোগ্য বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবিদের একজন —কবি কালিদাস একদা এখানে বাস করিতেন। মাত্র দেড়শত বৎসর আগে অনেক মহান্ ভারতীয় রাজা তদানীন্তন কালের শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ্—জয়পুরের রাজা জয়সিংহ এখানে আসিয়াছিলেন এবং কাজ করিয়াছিলেন। কাজেই, যাঁহারা ভারত-প্রেমিক, তাঁহারা প্রাচীন উজ্জয়িনী নগরীর প্রতি কি গভীর ভালোবাসা পোষণ করেন, তাহা যে কেহ দেখিতে পাইবেন। কিন্তু আমি যাঁহাদের নামের উল্লেখ করিয়াছি, তদপেক্ষা প্রিয়তর যে নাম ভারতীয় জনগণের অন্তরের অন্তস্তলে সংরক্ষিত আছে, তাহা হইল বিক্রমাদিত্যের নাম ; কথিত আছে, তিনি যীশুখ্রীস্টের জন্মের ৫৭ বৎসর পূর্বে মালবের রাজা হইয়াছিলেন। তাহা কত, কত বৎসর আগের কথা !

১৪. It was not long before his grandmother and all the neighbourhood knew what Isaac had been about. He had constructed a model of the windmill, though not so large, I suppose, as one of the box-traps which boys set to catch squirrels, yet every part of the mill and its machinery was complete. Its little sails were neatly made of linen, and whirled round very swiftly when the mill was placed in a draught of air. Even a puff of wind from Isaac's mouth or from a pair of bellows was sufficient to set the sails in motion. And, what was most curious, if a handful of grains of wheat were put into the little hopper, they would soon be converted into snow-white flour.

Isaac's playmates were enchanted with his new windmill. They thought that nothing so pretty and so wonderful had ever been seen in the world.

আইজাক কি হইবেন, তাহা জানিতে তাঁহার পিতামহী এবং প্রতিবেশী সকলের বেশী দেরী হয় নাই। তিনি একটি নকল বায়ুকল তৈয়ারী করিয়াছিলেন—খুব একটা বড় নয়, মনে হয়, কাঠবিড়ালী ধরিবার জন্ম পাতিবার ইঁদুরকলের মতো ; কিন্তু কলটি এবং উহার যন্ত্রপাতির প্রতিটি অংশ ছিল সম্পূর্ণ। ইহার ছোট দাঁড়গুলি পরিচ্ছন্নভাবে পট্টবস্ত্রে নির্মিত ছিল এবং ইহা এক দমক বাতাসের মধ্যে রাখিয়া দিলে দ্রুত ঘুরিতে থাকিত। এমন-কি, আইজাকের মুখ-নিঃসৃত অথবা হাপর-নিঃসৃত একটি ফুঁ-ই দাঁড়গুলিকে গতি দান করিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এবং, সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় ছিল, যদি এক মুঠো গমের দানা ইহার ছোট মুষলটিতে দেওয়া হইত, তাহারা অবিলম্বে তুষার-ধবল ময়দায় রূপান্তরিত হইত।

আইজাকের খেলার সঙ্গীরা তাঁহার নূতন বায়ুকল মুগ্ধ হইয়া দেখিত। তাহারা ভাবিত যে, এত সুন্দর ও বিস্ময়কর কোন জিনিস পৃথিবীতে কখনও দেখা যায় নাই।

৮. Man is the architect of his own fate. If he makes a proper division of his time and does his duties accordingly, he is sure to improve and prosper in life; but if he does otherwise, he is sure to repent when it is too late, and he will have to drag a miserable existence from day to day. To kill time is as culpable as to commit suicide, for our life is nothing but the sum-total of hours, days and years. Youth is the seed-time of life. In youth, the mind is pliable and soft and can be moulded in any form, we like. If we lose the morning hours of life, we shall have to repent afterwards.

মানুষই তাহার নিজের ভাগ্যের স্থপতি। যদি সে তাহার সময়কে ঠিকমতো ভাগ করিয়া তদনুযায়ী তাহার কর্তব্য সম্পাদন করে, তবে সে জীবনে নিশ্চয়ই উন্নতি এবং সমৃদ্ধি লাভ করিবে। কিন্তু যদি সে তাহা না করে [অন্যরূপ করে], যখন দেরী হইয়া যাইবে, তখন তাহাকে অনুশোচনা করিতে হইবে, এবং তাহাকে দিনের পর দিন এক শোচনীয় জীবন যাপন করিতে হইবে। সময় অপচয় করা আত্মহত্যার মতো নিন্দনীয়, কারণ আমাদের জীবন ঘণ্টা, দিন ও বছরের যোগফল ছাড়া অন্য কিছুই নয়। শৈশব জীবনের বীজবপনের সময়। শৈশবে মন নরম ও নমনীয় থাকে এবং আমাদের ইচ্ছামত ছাঁচে তাহাকে গঠন করা যায়। জীবনের প্রভাতকাল যদি আমরা নষ্ট করি, আমাদিগকে ভবিষ্যতে অনুশোচনা করিতে হইবে।

গ. **অনুচ্ছেদ**

সংকেত-সহ

১. Honesty is a great virtue. If you do not tell a lie, if you do not deceive others, if you are strictly just and fair in your dealings with others, you are an honest man.

Honesty is the best policy. An honest man is respected by all. Everyone trusts an honest man. No one can prosper in his life, if he is not honest. A shop-keeper who is honest, is liked very much by his customers. All men go to visit his shop and buy things from him. They take him in their confidence. His credit grows and his business flourishes.

সংকেত: Virtue : গুণ। Dealings : ব্যবহার। Prosper : উন্নতি করা। Customers : ক্রেতাগণ। Confidence : বিশ্বাস। Credit : খ্যাতি।

২. A real friend is he who remains true to us, as long as he lives. He will share our sorrows as well as our joys. He will stand by us in our hard times and is always ready to help us. He will risk

everything, even his very life for the sake of his friend. How fortunate is the man who has such a friend.

A friendship may last throughout the whole of life, if it is between equals. A rich man can hardly understand the sorrows of a poor man. On the other hand, a poor man can not freely open his heart to a rich friend. Similarly, a youngman and an old man can not be friends with each other.

সংকেত ঃ Fortunate : ভাগ্যবান্। May last : স্থায়ী হইতে পারে। Similarly : অনুরূপভাবে।

৩. 'I am seriously ill', moaned Buddhu to his wife. 'Yesterday a headache laid me low, and today I am struck down with a cold I shall be dead if you do not fetch me a doctor.'

When the doctor arrived, he felt Buddhu's pulse and examined his chest. After he had finished, he wrote a prescription on a piece of paper and handed it over to Buddhu. 'Take this before going to bed to-night,' he said.

Before he fell asleep that night, Buddhu swallowed the paper ; and when he rose next morning, he was completely cured

সংকেত ঃ Seriously : সাংঘাতিকভাবে। Moaned : গোঙাইতে গোঙাইতে বলিল। Fetch : আনা। Pulse : নাড়ী। Chest : বুক। Prescription : ব্যবস্থাপত্র।

৪. A man was begging in the crowded streets of a big city. He was wearing a label with the word 'Blind' on it. A gentleman passing his way dropped a coin into his hand, but the coin fell on the ground and rolled into the gutter. To the astonishment of the gentleman, the beggar quickly stepped into the gutter and picked up the coin 'I thought you were blind', said the man who had been moved to pity at the thought of the beggar's loss of sight. 'Blind !' said the beggar. 'Why, they must have put the wrong label on me. I am deaf and dumb.'

সংকেত ঃ Crowded : জনবহুল। Label : লেবেল। Gutter : নর্দমা, পয়োনালী।

৫. It is wonderful how a rumour grows. A traveller, while walking along a road at night, noticed a glow-worm shining in a hedge near a haystack. Soon after, he met a man and told him what he had seen, adding that at first he thought the light was a burning match. The man told another that a traveller had seen a burning match near a haystack, and that there was danger of the haystack getting on fire. When the next report of the incident

danger of the farm-house catching fire too. Finally, the story was that the farm-house was burnt down with all the inmates of it. And all this arose out of the traveller's simple remark that a glow-worm's light looked like a burning match.

সংকেত: Rumour: গুজব। Glow-worm: জোনাকি। Hedge: ঝোপ। Haystack: খড়ের গাদা। Report: বিবরণ। Farm-house: খামারবাড়ী।

৬. One day, Emperor Akbar asked Birbal, 'How many crows are there in the city of Delhi ?' What a strange question this was! But Birbal was ever ready with his wit. Without losing a moment he replied, 'At the present moment, O King, there are in this city exactly ninety-nine thousand, nine hundred and ninty-nine crows.' 'How do you know that ?' asked the king. 'If your Majesty doubts my word,' said Birbal to the king, 'please order someone to count them. If there are fewer than the number I have told, please remember that some of them may have gone to visit their friends and relations round about this city. If there are more, some of their near relations and friends may have come to see them.' No doubt, Emperor Akbar was highly pleased with Birbal's clever answer.

সংকেত: Strange: অদ্ভুত। Exactly: ঠিক। Your Majesty: জাঁহাপনা [এখানে]। Relations: আত্মীয়গণ।

৭. I do not know whence I got the notion that good hand-writing was not a necessary part of education, but I retained it until I went to England. When later, especially in South Africa, I saw beautiful hand-writting of lawyers and youngmen born and educated in South Africa, I was ashamed of myself and repented of my neglect I saw that bad hand-writing should be regarded as a sign of imperfect education. I tried later to improve mine but it was too late. Let every man and woman be warned by my example, and understand that a good hand-writing is necessary part of education.

সংকেত: Whence: কোথা হইতে। Hand-writing: হস্তাক্ষর। Education: শিক্ষা। Late: পরে। Especially: বিশেষতঃ। Lawyers: উকিল। Ashamed: লজ্জিত।

৮ The Swallow passed by the castle where the rich were making themselves merry. He passed by the rivers and saw all the ships ready to sail away. He passed over the crowded shops, and saw the people buying and selling. At last, he came to the poor

house and looked in. The boy was lying ill on his bed, and the mother had fallen asleep, as she was very tired. In he flew, and laid the great ruby on the table beside the woman's hand. Then he flew round in bed, cooling the boy's head with his wings. 'How cool I feel,' said the boy, 'I must be getting better,' and he went to sleep.

সংকেত : Castle : প্রাসাদ। Merry : স্ফূর্তি। Ruby : চুনি।

৯. In civilized countries, when two individuals have a quarrel that they can not settle among themselves, they go before the judge. The judge, by his decision, settles the quarrel. It might be expected that a similar course would be followed by civilized nations in quarrels among nations; and some progress has been made in this matter, in recent times, by the employment of arbitration to settle quarrels between nation and nation. But, in spite of this, war is still generally regarded as the only ultimate way of settling national quarrels; the armies of great nations are larger than they ever were before in the history of the world, and there seems little hope of the peace of the world, without the need of war.

সংকেত : Civilized : সভ্য। Individuals : ব্যক্তি। Settle : মীমাংসা করা। Decision : সিদ্ধান্ত। Arbitration : সালিশী।

১০. One winter morning the Selfish Giant looked out of his window as he was dressing. He did not hate the winters now, for he knew that it was merely the spring asleep, and that the flowers were resting.

Suddenly he rubbed his eyes in wonder, and looked and looked. It certainly was a marvellous sight. In the farthest corner of the garden was a tree quite covered with lovely white blossoms. Its branches were golden, and silver fruits hung down from them, and underneath it stood the little boy he had loved.

সংকেত : Rubbed : রগড়াইল। Wonder : বিস্ময়। Marvellous : বিস্ময়কর, অবিশ্বাস্য। Blossoms : ফুল।

১১. I was trembling, as I handed the confession to my father. He was then lying on a sick-bed. His bedstead was a plain wooden plank. I handed him the note and awaited my doom.

He read it through, and pearl-drops trickled down his cheeks, wetting the paper. For a moment he closed his eyes in thought, and then tore up the note. He had sat up to read it. He lay down. I wept with him. I could see my father's agony. If I

were a painter, I could draw a picture of the whole scene today, it is still so vivid in my mind.

These pearl-drops of love cleared my mind, and washed my sin away. Only he who has experienced such love can know what it is.

সংকেত: Confession: স্বীকারোক্তি। Sick-bed: রোগশয্যা। Bedstead: খাট। Plank: তক্তা। Doom: শাস্তি। Pearl-drops: মুক্তাবিন্দু। Agony: মানসিক যন্ত্রণা। Has experienced: অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে।

১২. Next moment we were both groping downstairs, leaving the candle by the empty chest; and the next we had opened the door and were in full retreat. We had not started a moment too soon, the fog was rapidly dispersing; already the moon shone quite clear on the high ground on either side; and it was only in the exact bottom of the dell and round the tavern door that a thin veil still hung unbroken to conceal the first steps of our escape. For less than half-away to the hamlet, very little beyond the bottom of the hill, we must come forth into the moonlight. Nor was this all; for the sound of several footsteps running came already to our ears, as we looked back in their direction, a light tossing to and fro, and still rapidly advancing, showed that one of the newcomers carried a lantern.

সংকেত: Were groping: হাতড়াইতেছিলাম। Chest: সিন্দুক। Retreat: পিছু হটা। Was...dispersing: অদৃশ্য হইতেছিল। Ground: ভূমি। Dell: উপত্যকা। Tavern: সরাইখানা। Hamlet: ক্ষুদ্র গ্রাম।

১৩. The face of the earth is constantly changing. Places which were once dry land are now at the bottom of the sea. The soil that was formerly on the surface is now buried deep down in the earth Where there were trees and plants, now there are rocks and sand.

Long long ago, dead leaves and branches of trees were buried underground. Areas bearing trees often sank down as a result of an earthquake. The waves of the sea sometimes flowed up to those areas and washed the trees away. The trees were taken down to the bottom of the sea where they lay for a long time. In course of time the sea moved away leaving the trees on dry land. The wind blew dust over them. Pieces of rock fell and covered the soil. The trees were thus buried deep down in the earth.

In the bosom of the earth the dead leaves and branches of these

trees were changed first into peat, and then into something hard and black, which we call coal.

সংকেত: Constantly: অনবরত। Formerly: পূর্বে। Is buried: তলাইয়া গিয়াছে। Underground: ভূগর্ভে। Earthquakes: ভূমিকম্প। In course of time: কা

১৪. Once a philosopher was going to a village. On the way he came across a villager who was also proceeding to the same village. The villager enquired of the philosopher, how much time he would take to reach the village. The philosopher only replied, 'Go on.' The villager thought that the philosopher had not understood his question. He repeated his question, but got the same reply. Now he became sure that the philosopher was a mad man. He went ahead. He hardly covered fifty yards when the philosopher called out to him to come back. 'Well', said the philosopher, 'it will take you one hour and a half to reach the village.' 'God', said the villager, 'but why did not you tell it to me before?'. 'O fool!' replied the philosopher, 'how could I tell you anything, when I did not know the speed at which you walk?' The villager felt ashamed and took his way.

সংকেত: Philosopher: দার্শনিক। Repeated: পুনরাবৃত্তি করিল। Speed: গতিবেগ। Ashamed: লজ্জিত।

১৫. The men and women who lived a few thousand years ago are generally described today as savages or barbarians. They create in our minds a picture of particularly cruel people. On the other hand, there are a few people who look with longing to the earliest periods of human history which they describe as the 'Golden Age', when men were pure and unspoilt, and lived a simple, open-air life in peace and equality. A reading of history does not justify either of these opposite ideas. The Golden Age only looks attractive because we are so far away from it. Distance, as you know, lends enchantment to the view. It is true, there was an equality in those days. But it was an equality of ignorance and poverty, not of knowledge and wealth.

সংকেত: Savages: অসভ্য। Barbarians: বর্বর। Particularly: বিশেষভাবে। On the other hand: অপরপক্ষে। Longing: আকুল আকাঙ্ক্ষা। Golden Age: স্বর্ণযুগ। Unspoilt: নিষ্কলঙ্ক। Open-air: মুক্তবায়ু। Enchantment: মোহ। Ignorance: অজ্ঞতা।

১৬. When the cold, sullen morning dawned, and my people began to load the camels, I always felt loath to give back to the waste this little spot of ground that had glowed for a while with the cheerfulness of a human dwelling. One by one the cloaks, the

saddles, the baggage, the hundred things that strewed the ground and made it look so familiar—all these were taken away, and laid upon the camels.

My tent was spared to the last, but when all else was ready for the start, then came its fall, the pegs were drawn, the canvas shivered, and in less than a minute there was nothing that remained of my genial home but only a pole and a bundle.

A few days' journey in the loneliness of the desert will become frightfully oppressive to anyone. Upon my poor fellows also the access of melancholy came heavy. They bent their necks, and bore it as best as they could; but their joy was great on the fifth day, when we came to an Oasis, where we found encamped a caravan from Cairo.

সংকেত: Sullen: বিশ্রী। Loath: অনিচ্ছুক। Waste: ধূ ধূ ভূখণ্ড। Strewed: ছড়ানো। Genial: অমায়িক। Oppressive: দুঃখদায়ক। Melancholy: বিষাদ। Oasis: মরূদ্যান।

১৭. At the Bose Institute in Calcutta, the great experimenter himself was our guide. Through all an afternoon we followed him from marvel to marvel. We watched the growth of a plant being traced out automatically by a needle on a sheet of smoked glass; we saw its sudden, suddering reaction to an electric shock. We watched a plant feeding; in the process it was exhaling minute quantities of oxygen. Each time the accumulation of exhaled oxygen reached a certain amount, a little bell, like the bell that warns you when you are nearly at the end of your line of type-writing, automatically rang. When the sun shone on the plant, the bell rang often and regularly. Shaded, the plant stopped feeding; the bell rang only at long intervals, or not at all.

সংকেত: The Bose Institute: বসু বিজ্ঞান-মন্দির। Experimenter: পরীক্ষক। Guide: পথ-প্রদর্শক। Marvel: বিস্ময়। Automatically: আপনা-আপনি। Electric shock: বৈদ্যুতিক অভিঘাত। Was exhaling: নিঃশ্বাস ছাড়িতেছিল। Accumulation: সঞ্চয়। Type-writing: মুদ্রলিখন।

১৮. The Taj Mahal is a tomb, and we cannot help feeling a certain religious atmosphere as we approach it.

The great gateway to the garden is built of red sandstone, inlaid with ornaments and inscriptions from the Koran in white marble, and surmounted by twenty-six white marble minarets. On entering the gateway, we are surprised at its height and size;

it is like a very spacious hall. At night the scene is much more impressive. The interior is illuminated by the soft light from a huge brass lamp, which hangs from the centre of the ceiling.

Through the ever-open gateway we see at the far end of the long garden, the beautiful white Taj Mahal itself. No man can remain unmoved at this sight.

সংকেত : Religious atmosphere : ধর্মীয় আবহাওয়া। Sandstone : বেলেপাথর। Inlaid . the Koran : অলংকরণ ও কোরান হইতে উদ্ধৃত শিলালিপিখচিত। Surmounted : ঊর্ধ্ব স্থাপিত। Minarets : মিনার। Spacious : চওড়া, প্রশস্ত। Illuminated : আলোকিত।

১৯. To be properly enjoyed, a walking tour should be gone upon alone. If you go in a company, or even in pairs, it is no longer a walking tour in anything but name, it is something else, and more to the nature of a picnic. A walking tour should be gone upon alone, because freedom is of the essence; because you should be able to stop and go on, and follow this way or that as the freak takes you; and because you must have your own pace, and not trot alongside as a champion walker. And then you must be open to all impressions and let your thoughts take colour from what you see. You should be as a pipe for any wind to play upon.

সংকেত : Walking tour : হাঁটিয়া ভ্রমণ। Picnic : চড়ুইভাতি, বনভোজন। On the essence : অপরিহার্য। Fleak : খেয়াল। Champion walker : হন্টন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী। Pipe : বাঁশী।

২০. In village India this is a time of expectancy. Will the monsoon keep its appointment on the normal date? Will it bring plentiful rain properly spread over the season? How will rivers behave? These are questions momentous for the countryside, and anyone gifted with the eye of imagination can see thirsty fields watching the heavens for the answer. The last fortnight before monsoon is a testing time for living creatures. The ploughman goes more slowly to the field, the village artificer prolongs his mid-day rest taken on the floor of his place of work or under a V-shaped roof of straw.

সংকেত : Village India : গ্রাম-ভারত। Expectancy : প্রত্যাশা। Appointment : আগমন-সূচী। Normal : স্বাভাবিক। Plentiful : পর্যাপ্ত। Momentous : গুরুত্বপূর্ণ। Testing time : পরীক্ষার সময়। Artificer : কারিগর। V-shaped roof : দোচালা।

ভাবার্থ রচনা ও ভাব-সম্প্রসারণ

কবিতা বা কাব্য-ধর্মী রচনায় ভাবেরই কারবার। ভাবই ঐ সকল রচনার প্রাণ। নিত্য-ব্যবহারিক জীবনের ভাষাই কাব্য-কবিতায় ভাবের গৌরবে অনবদ্য হইয়া উঠে। ভাবের সেই সমুচ্চ জগতে উত্তরণই কাব্য বা সাহিত্য-পাঠের মূল লক্ষ্য। শব্দের সিঁড়ি বাহিয়া, ভাষার নানা স্তর অতিক্রম করিয়া ভাব-লোকে উত্তীর্ণ হওয়াই বড়ো কথা। সেই ভাবটিকে প্রকাশ করিবার জন্য কত আয়োজন! ছন্দ, অলংকার, শব্দ-বিন্যাস—সবই ভাবের সৌন্দর্য ও চমৎকারিত্ব সৃষ্টির জন্য। ভাবের স্বর্গলোকে পৌছিতে হইলে শব্দ-বিন্যাসের সেই আবরণ ভেদ করিতে হইবে; ছন্দ ও অলংকারের প্রসাধনে বিভ্রান্ত হইলে চলিবে না; উহাদের একপাশে সরাইয়া রাখিয়া ভাবের মর্মলোকে প্রবেশ করিতে পারিলে কাব্য-সাহিত্য পাঠ সার্থক হইবে।

● ভাবার্থ-রচনা (Substance-writing)

ভাবার্থ-রচনায় উদ্ধৃতাংশের মধ্যে যে মূল ভাবটি সংগুপ্ত থাকে, তাহাকে আবিষ্কার করিয়া নিজের ভাষায় পরিস্ফুট করিতে হয়। ভাবার্থ-রচনা উদ্ধৃতাংশের অন্তর্নিহিত মৌল ভাবের পরিস্ফুটন হইলেও শিল্প-সৌষ্ঠব-বর্জিত নয়। ভাবার্থ-রচনার আয়তনও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অর্থাৎ, সংক্ষেপে অথচ শিল্প-সৌকর্যময় ভাষায় ভাবার্থ রচনা করিতে হইবে। ইহার আয়তন সম্পর্কে স্মরণীয় যে, ইহা সব সময় উদ্ধৃতাংশ অপেক্ষা ক্ষুদ্রাকার হইবে, তেমন কোন ধরাবাঁধা নির্দেশ নাই। তবে প্রশ্নপত্রে আয়তন সম্পর্কে কোন সীমা-নির্দেশ থাকিলে তাহা অবশ্যই পালনীয়। নতুবা ভাবার্থ রচনা উদ্ধৃতাংশ অপেক্ষা বড় কিংবা ক্ষুদ্র হইতে পারে অথবা সমান-সমানও হইতে পারে।

আসল কথা, অলংকার ও শব্দ-বিন্যাসের মধ্য হইতে ভাব-বস্তুটিকে আবিষ্কার করিয়া সহজ সরল ও নিরলংকারভাবে প্রকাশ করিতে হইবে। তাহার জন্য যেটুকু পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়, তাহা অবশ্যই অনুমোদনযোগ্য। ভাষা সহজ, সরল হইলেই শিল্প-সৌষ্ঠববর্জিত হয় না। বরং সরল পদ্ধতিই শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। সেখানে বাচন-ভঙ্গি এমন স্বচ্ছ এবং সুনিপুণ হইবে, তাহা অন্তরস্পর্শী হইয়া উঠিতে পারে। ভাষা যথাসম্ভব জীবন্ত হইলে তবেই উহা সম্ভব হইবে। এবং মূল ভাবটিকে আবিষ্কার করিতে পারিলেই ভাষাও স্বাভাবিক কারণেই জীবন্ত হইয়া উঠিবে।

ভাবার্থ-রচনা সম্পর্কে কয়েকটি পালনীয় নির্দেশ : ১. প্রদত্ত অংশটি কয়েকবার পাঠ করিতে হইবে এবং প্রতিবারেই অর্থোপলব্ধির চেষ্টা করিতে হইবে। ২. উদ্ধৃতাংশে প্রতিটি শব্দের প্রয়োগ-সার্থকতার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ৩. তারপর মূল অর্থটিকে নিজের ভাষায় প্রকাশের জন্য অগ্রসর হইতে হইবে। ৪. প্রারম্ভিক বাক্যটিতে সুসংহত আকারে ভাবটি পরিবেশিত হইবে। ৫. প্রদত্ত অংশে উক্তি-প্রত্যুক্তি থাকিলে তাহাকে নিজের বিবৃতিতে প্রকাশ করিতে হইবে। ৬. প্রদত্ত অংশে কোন উদ্ধৃতি থাকিলে তাহার সার-সংকলন করিয়া দিতে হইবে। ৭. রূপক, উপমা ইত্যাদি অলংকার বর্জন করিতে হইবে। প্রদত্ত অংশে যে কথার উল্লেখ নাই, তাহা লেখা উচিত নয়।

● ভাব-সম্প্রসারণ [Amplification]

সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশিত কোন ভাবকে শিল্প-সৌকর্যময় ভাষার সাহায্যে পল্লবিত করিয়া তুলিবার নাম ভাব-সম্প্রসারণ। কবিতার দুই-একটি ছত্রে কিংবা গদ্যের দুই-একটি বাক্যে—অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে—বিশাল সমুচ্চ ভাব বীজাকারে অন্তর্নিহিত থাকে। ইংগিতে সেখানে অনেক কথা বলা হয়, ব্যঞ্জনায় অনেক ভাব রূপলাভ করে। ব্যঞ্জনায় কিংবা ইংগিতে ব্যক্ত সেই সব অকথিত কথাকে নিজের কথায় বিকশিত করিয়া তুলিবার নাম ভাব-সম্প্রসারণ। যে ভাব সংকুচিত কিংবা কুণ্ঠিত অবস্থায় মূল অংশে রহিয়াছে, তাহার বিস্তার বা সম্প্রসারণই ভাব-সম্প্রসারণের লক্ষ্য। অর্থাৎ, উদ্ধৃতাংশে অন্তর্নিহিত ভাবটিকে আশ্রয় করিয়া নিজের চিন্তা বা কল্পনার পথে পাড়ি জমাইতে হইবে। সাধারণতঃ মহৎ কোন ভাব বা মহৎ কোন আদর্শের কথা উদ্ধৃতাংশের মধ্যে নিহিত থাকে। তাহাকে অবলম্বন করিয়া কবি বা লেখকের চিন্তা ও কল্পনার অনুসরণে সেই ভাবাদর্শের জগতে বিচরণ করিতে হইবে।

ভাব-সম্প্রসারণ সম্পর্কে কতকগুলি পালনীয় কর্তব্য : ১. প্রদত্ত বাক্যাংশ বা পদ্যাংশটি প্রথমেই কয়েকবার পাঠ করিয়া অন্তর্নিহিত ভাব-সত্যটির মর্মোদ্ধার করিতে হইবে। ২. বাক্যাংশে প্রযুক্ত শব্দসমূহের প্রয়োগ-সার্থকতা অনুধাবন করিতে হইবে। ৩. মূল ভাব-বস্তুর প্রকাশে বিভিন্ন শব্দ কিভাবে সাহায্য করিতেছে, লক্ষ্য করিতে হইবে। ৪. প্রারম্ভিক বাক্যটি সুরচিত, দৃঢ়পিনদ্ধ এবং ক্রিয়াপদ-বর্জিত হইলে ভাব-সম্প্রসারণটি আকর্ষণীয় হয়। ৫. প্রযুক্ত বিভিন্ন শব্দ মূল ভাবের সহিত যে ভাবানুষঙ্গ সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাকে সম্প্রসারিত করিতে হইবে। ৬. সম্প্রসারণ-প্রসঙ্গে কোন ক্ষুদ্র কথিকা কিংবা সুভাষিত বাণীমঞ্জরীর দুই-একটি উদ্ধৃত করা যায়। তবে লক্ষণীয় যে, উদ্ধৃতিটি যেন মূল ভাব-পরিস্ফুটনের সহায়ক হয়। ৭. ভাব-সম্প্রসারণের আয়তন প্রবন্ধের ন্যায় বিশাল কিংবা সার-সংক্ষেপের ন্যায় ক্ষুদ্র হইবে না। ৮. 'কবি বলিতেছেন' কিংবা 'এখানে কবির বক্তব্য হইল' এই ধরনের মন্তব্য ভাব-সম্প্রসারণে নিষ্প্রয়োজন।

১০

১. মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই!
ধরায় প্রাণের খেলা চিরতরঙ্গিত,
বিরহ মিলন কত হাসি-অশ্রু-ময়—
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সংগীত
যদি গো রচিতে পারি অমর-আলয়।
তা যদি না পারি, তবে বাঁচি যত কাল
তোমাদেরি মাঝখানে লভি যেন ঠাঁই,
তোমরা তুলিবে বলে সকাল বিকাল
নব নব সংগীতের কুসুম ফুটাই।
হাসিমুখে নিয়ো ফুল, তারপরে হায়
ফেলে দিয়ো ফুল, যদি সে ফুল শুকায়।

সুন্দর এই পৃথিবী। সুন্দর এই পৃথিবীর মানুষ। তাই এই রূপরসগন্ধময় পৃথিবী সৌন্দর্য-প্রেমিক কবির অতি প্রিয় স্থান। এখানে সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনার মধ্যে তিনি বাঁচিতে চান। তিনি এই পৃথিবীর মানুষের সুখ-দুঃখ-বিরহ-মিলনের সংগীত রচনা করিয়া মানুষকে উপহার দিয়া যাইবেন। প্রয়োজনমতো পৃথিবীর মানুষ সেই সব সংগীতের রস গ্রহণ করিবে। প্রয়োজন ফুরাইলে তাহারা সেগুলি বিস্মৃত হইলেও কবির কোন ক্ষোভ নাই॥

২. কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক!
কে বলে তা বহুদূর।
মানুষের মাঝে স্বর্গ নরক—
মানুষেতে সুরাসুর।
রিপুর তাড়নে যখনি মোদের
বিবেক পায় গো লয়,
আত্মগ্লানির নরক-অনলে
তখনি পুড়িতে হয়।

প্রীতি ও প্রেমের পুণ্য বাঁধনে
　　যবে মিলি পরস্পরে,
স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন
　　আমাদেরি কুঁড়ে ঘরে।

স্বর্গ ও নরক মানুষের অলীক কল্পনা। ইহার অস্তিত্ব কোন সুদূরলোকে নাই। মানুষের হৃদয়েই স্বর্গ ও নরকের অবস্থান। যখন মানুষের হৃদয় হইতে প্রেম-প্রীতি-দয়া-ক্ষমা ইত্যাদি শুভবোধগুলি লুপ্ত হইয়া সেখানে কাম-ক্রোধ-হিংসা-দ্বেষ ইত্যাদি অশুভ বোধগুলির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই তো তাহা নরক। আর, যখন অশুভ বোধগুলি মুছিয়া গিয়া মানুষের মনে শুভবোধ জাগ্রত হয়, তখনই পৃথিবী পরিণত হয় যথার্থ স্বর্গভূমিতে॥

৩.　　　ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হ'তে পারি তথা
তোমার আদেশে, যেন রসনায় মম
সত্য বাক্য ঝলি' উঠে খর খড়্গসম
তোমার ইঙ্গিতে, যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান।
অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।

সকল মানুষের বিবেক-বুদ্ধিই মানুষের প্রকৃত ন্যায় বিচারক। মানুষ সকল ক্ষেত্রেই তাহার সেই বিবেক-বুদ্ধির প্রয়োগ করিয়া মানুষের সকল কাজের বিচার করিবে—ইহাই কাম্য। যদি সে তাহা না করে, তবে তাহাতে মানুষের অন্তরস্থিত ন্যায়ধর্মের অবমাননা করা হয়। সেই বিচারে ক্ষমা একটি মহৎ গুণ হইলেও যেখানে উহা দুর্বলতার প্রকাশরূপে উপহসিত হয়, সেখানে কঠোরতা অবলম্বনও সমর্থনযোগ্য। কারণ, অন্যায়কারী ও অন্যায়ের প্রশ্রয়দাতা উভয়েই সমান অপরাধী, সমানভাবে দণ্ডনীয়॥

৪.　　　হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,—
তা সবে (অবোধ আমি) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি'.
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি
অনিদ্রায়, অনাহারে সঁপি কায়-মন,

মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি'—
কেলিনু শৈবালে ভুলি' কমল-কানন।
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী ক'য়ে দিলা পরে ;—
'ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি ?
যা ফিরি অজ্ঞান তুই, যারে ফিরে ঘরে।'
পালিলাম আজ্ঞা সুখে পাইলাম কালে
মাতৃভাষারূপ খনি, পূর্ণ মণিজালে।

বঙ্গভাষা বিবিধ ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ। তাহার সম্ভাবনাও সুবিপুল। যাহারা তাহার সন্ধান পায় না, তাহারা কেবল বিদেশী ভাষার পশ্চাতে ছুটিয়া মরে। তাহাতে দুঃখ পায়, পায় মানসিক যন্ত্রণা। কিন্তু একদিন তাহাদের এই ভ্রান্তির অবসান ঘটে। বিদেশী ভাষার অসচ্ছলতা ও মাতৃভাষার প্রাচুর্য তাহাদের নিকট ধরা পড়ে। তখনই তাহারা পরভাষা-চর্চা হইতে বিরত হইয়া মাতৃভাষা চর্চায় আত্মনিয়োগ করে। এবং তখনই তাহারা মাতৃভাষার ঐশ্বর্য আবিষ্কার করিয়া বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া যায়।

৫. বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি' বারংবার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানা বর্ণগন্ধময়। প্রদীপের মতো
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির-মাঝে। ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন ; সে নহে আমার ;
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।

বন্ধনের মধ্যেই রহিয়াছে মুক্তির সুনিশ্চিত ঠিকানা। এই বন্ধনময় সংসারকে ত্যাগ করিয়া অরণ্যে বৈরাগ্য-সাধনায় মুক্তি লাভ ঘটে না। সংসারের স্নেহ-প্রেম-দয়া-ক্ষমার সকল বন্ধনের মধ্যেই আছে মুক্তির সন্ধান। বিশ্বসংসারই ঈশ্বরের বাস-মন্দির। এই

পৃথিবীর রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধের মধ্যেই তাহার প্রকাশ। এই বিশ্বের মধ্যেই বিশ্বেশ্বরের আসন পাতা, এই জীবনের মধ্যেই জীবনেশ্বরের প্রতিষ্ঠা। কাজেই, এই সংসারের বন্ধনের মধ্যেই, সাংসারিক সকল অনুভূতির মধ্যেই লাভ করা যাইবে মানুষের প্রার্থিত মুক্তি।

৬. আঘাত-সংঘাত মাঝে দাঁড়াইনু আসি।
অঙ্গদ কুণ্ডল কণ্ঠী অলংকাররাশি
খুলিয়া ফেলেছি দূরে। দাও হস্তে তুলি
নিজ হাতে তোমার অক্ষয় শরগুলি,
তোমার অক্ষয় তূণ। অস্ত্রে দীক্ষা দেহো
রণগুরু। তোমার প্রবল পিতৃস্নেহ
ধ্বনিয়া উঠুক আজি কঠিন আদেশে।
করো মোরে সম্মানিত নব-বীরবেশে,
দুরূহ কর্তব্যভারে, দুঃসহ কঠোর
বেদনায়। পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর
ক্ষতচিহ্ন-অলংকার। ধন্য করো দাসে
সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে।
ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি বিলীন
কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন।

আঘাত-সংঘাতের মধ্যেই মানুষের শক্তি ও সামর্থ্যের প্রকৃত প্রকাশ। বিলাস-জীবন ত্যাগ করিয়া এই কর্মময় পৃথিবীতে কঠিন কর্তব্য উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়া মানুষের মহত্ত্ব প্রকাশিত হয়। তাহাতে আঘাত আসে আসুক, ব্যাঘাত আসে আসুক; বুক পাতিয়া সেই সব দুঃখ আঘাত গ্রহণ করিয়া জীবন-সংগ্রামের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। তাহাতে আছে সাফল্য, আছে ব্যর্থতা। কিন্তু তাহাই শেষ কথা নয়। বিলাস-জীবন অপেক্ষা কর্মময় জীবনই মানুষের কাছে সমধিক গৌরবের।

৭. ত্যাখ্‌ মানুষের কষ্ট থাকে না, হয় যদি লোক খাঁটি,
সোনার ফসল ফলায় যখন পায়ের তলার মাটি
মাটির-ই যদি না এ-হেন মূল্য মানুষের দাম নাই?
এই সংসারে এই সোজা কথা সব আগে বোঝা চাই।
বিশ্বপিতার মহাকারবার এই দিন-দুনিয়াটা,
মানুষই তাঁহার মহামূলধন কর্ম তাহার খাটা;

তারি দায় দিয়ে ঘাড়ে [illegible]
বিধাতার সেই সাচ্চা বাচ্চা কখনো পড়ে [illegible]
তবে যে হেথায় দেখিবারে পাই গরিবের দুর্গতি,
অর্থ তাহার—চেনে না সে তার শক্তির সংহতি।

মানুষ অসীম শক্তিমান্‌। সে তাহার সেই শক্তির সন্ধান রাখে না। তাই সে জীবনে অশেষ দুঃখ পায়। এই পৃথিবীর মাটিতে এবং মানুষের মধ্যে অফুরন্ত সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে। বিশ্ববিধাতা পৃথিবী এবং তাহার মানুষকে অসীম সম্ভাবনায় পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। মানুষ তাহার পরিশ্রম দিয়া সেই সকল সম্ভাবনাকে সফল করিয়া তুলিবে। তাহাতে মানুষের দুঃখ ঘুচিবে, সকল দুর্গতির অবসান হইবে। কাজেই, এই পৃথিবীতে কাহারও অভুক্ত থাকিবার কথা নয়, দীন-দুঃখী থাকিবার কথা নয়। তবু মানুষ দুঃখ পায়, অভুক্ত থাকে। তাহার কারণ, সে তাহার শক্তির সন্ধান জানে না, ঐক্যশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হইতে জানে না॥

৮. নিত্য অভাবের কুণ্ড জ্বালাইয়া বুকে
সাধিতেছে মৃত্যুযজ্ঞ পৈশাচিক সুখে।
লক্ষ্মীর কিরীট ধরি' ফেলিতেছে টানি,
ধূলিতলে, রুদ্ধ রোষে করাঘাত হানি'।
ওরে মোর সর্বনাশা দারিদ্র্য অসহ।—
পুত্র হ'য়ে জায়া হ'য়ে কাঁদো অহরহ
আমার দুয়ার ধরি'। কে বাজাবে বাঁশী?
কোথা পাব আনন্দিত সুন্দরের হাসি?
আজো শুনি আগমনী গাহিছে সানাই,
ও যেন কাঁদিছে শুধু—নাই, কিছু নাই।

দারিদ্র্য সকল দুঃখের মূল। মানুষকে নিত্য-অভাবের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া দারিদ্র্য প্রতিনিয়ত তাহার মৃত্যুর চক্রান্ত করিতে থাকে। পরিবার-পরিজনের হাহাকারের মধ্য দিয়া দারিদ্র্য তাহার কুৎসিত ভয়াল রূপ মেলিয়া ধরে। অসুন্দর এবং অকল্যাণ সেখানে বাঁধে স্থায়ী বাসা। কোথাও আর আনন্দের আশ্বাস থাকে না। দারিদ্র্য মানুষের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নির্মূল করিয়া জীবনকে নিরানন্দ করিয়া তোলে॥

৯. মৃত্তিকার নীচে অনেক দিন বীজ লুকাইয়া আছে। মাসের পর মাস এইরূপে কাটিয়া গেল। শীতের পর বসন্ত আসিল। এখন আর

লুকাইয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই; বাহির হইতে কে যেন শিশুকে ডাকিয়া বলিতেছে, "আর ঘুমাইও না, উপরে উঠিয়া আইস, সূর্যের আলো দেখিবে।" আস্তে আস্তে বীজের ঢাকনাটি খসিয়া পড়িয়া, দুইটি কোমল পাতার মধ্য হইতে অঙ্কুর বাহির হইল। অঙ্কুরের এক অংশ নীচের দিকে গিয়া মাটি ধরিয়া রহিল, আর এক অংশ মাটি ভেদ করিয়া উপরে উঠিল। মনে হয়, শিশুটি যেন ছোট মাথা তুলিয়া আশ্চর্যের সহিত নতুন দেশ দেখিতেছে।

প্রকৃতির মধ্যে জীবনের খেলা নিত্য চলিতেছে। মাটির মধ্যে বীজ লুকাইয়া থাকে। তারপর ঋতু-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বীজের মধ্যে সুপ্ত তরুশিশুটি বাহিরে আত্মপ্রকাশ করে অঙ্কুররূপে। সেই অঙ্কুরের একটি অংশ মাটিকে আঁকড়াইয়া রাখে, অন্য অংশটি মাটি ভেদ করিয়া উপরে উঠিতে থাকে। এইভাবে প্রকৃতি তাহার জীবনের খেলা খেলিয়া চলে॥

১০. দেশ সম্বন্ধে একটি কথা খুব স্পষ্ট করে বুঝতে হবে—দেশটা কেবল মাটি দিয়ে গড়া নয়, মানুষ দিয়েও গড়া। দেশকে ভালবাসতে হলে সর্বাগ্রে দেশের মানুষকে ভালবাসতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, দেশের সব চাইতে বড় সম্পত্তি হল দেশের মানুষ, দেশের জনবল একটা মস্ত বড়ো বল। ভারতবর্ষ আকারে কত বৃহৎ, তা তোমাদের জানা আছে। জনসংখ্যার দিক থেকেও ভারতবর্ষ পৃথিবীর বৃহত্তম দেশগুলির অন্যতম। তোমরা বোধ হয় জান, এদেশে প্রায় পঞ্চাশ কোটি লোকের বাস। সারা পৃথিবীর লোকসংখ্যা ধরলে দেখা যায়, তার প্রায় এক-ষষ্ঠাংশ বাস করে ভারতবর্ষে। অর্থাৎ প্রতি ছ'জন মানুষের মধ্যে একজন ভারতবাসী। গর্ব করবার মতো কথা বটে, কিন্তু শুধু সংখ্যাতেই সব সময় কাজ দেয় না। দেখছ তো মাত্র পাঁচ কোটি ইংরেজ চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর উপর কত বৎসর রাজত্ব করে গেল! এর একমাত্র কারণ আমাদের নিজেদের মধ্যে মিল ছিল না।

দেশ কেবল মাটি দিয়া তৈয়ারী নয়, মানুষ দিয়াও তৈয়ারী। দেশকে ভালোবাসিতে হইলে দেশের মানুষকে ভালোবাসিতে হইবে। মানুষই দেশের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ। ভারতবর্ষ বিশাল দেশ, তাহার জনসংখ্যাও বিশাল। পৃথিবীর জনসংখ্যার এক-ষষ্ঠাংশ ভারতীয়। ইহা নিঃসন্দেহে গর্বের বিষয়। কিন্তু বিশাল জনসংখ্যা হইলেই দেশ বড় হয় না। মাত্র পাঁচ কোটি ইংরেজ চল্লিশ কোটি ভারতবাসীকে পদানত রাখিয়াছিল। তার মূলে ছিল ভারতবাসীদের ঐক্যের অভাব॥

॥ অনুসরণী ॥

ভাবার্থ লিখ :

১. পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে
হে স্নেহার্ত বঙ্গভূমি—তব গৃহক্রোড়ে
চিরশিশু ক'রে আর রাখিয়ো না ধরে।
দেশদেশান্তর-মাঝে যার যেথা স্থান
খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান।
পদে পদে ছোটো ছোটো নিষেধের ডোরে
বেঁধে বেঁধে রাখিয়ো না ভালো ছেলে ক'রে।
প্রাণ দিয়ে, দুঃখ স'য়ে আপনার হাতে
সংগ্রাম করিতে দাও ভালোমন্দ-সাথে।
শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুত্রদের ধ'রে
দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া ক'রে।
সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালি করে—মানুষ কর নি।

২. চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নিবারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়,
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি—
পৌরুষেরে করেনি শতধা, নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।

৩. অন্ধ মোহবন্ধ তব দাও মুক্ত করি।
রেখো না বসায়ে দ্বারে জাগ্রত প্রহরী,

হে জননী, আপনার স্নেহকারাগারে
সন্তানেরে চিরজন্ম বন্দী রাখিবারে।
বেষ্টন করিয়া তারে আগ্রহপরশে,
জীর্ণ করি দিয়া তারে লালনের রসে,
মনুষ্যত্ব-স্বাধীনতা করিয়া শোষণ
আপন ক্ষুধিত চিত্ত করিবে পোষণ?
দীর্ঘ গর্ভবাস হতে জন্ম দিলে যার
স্নেহগর্ভে গ্রাসিয়া কি রাখিবে আবার?
চলিবে সে এ সংসারে তব পিছু পিছু?
সে কি তব অংশ তবে, আর নহে কিছু?
নিজের সে, বিশ্বের সে, বিশ্বদেবতার—
সন্তান নহে গো মাতঃ, সম্পত্তি তোমার।

৪. বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা—
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখতাপে-ব্যথিত চিতে নাই-বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।
সহায় মোর না যদি জুটে নিজের বল না যেন টুটে—
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি, লভিলে শুধু বঞ্চনা,
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়॥
আমারে তুমি করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা—
তরিতে পারি শকতি যেন রয়।
আমার ভার লাঘব করি নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
বহিতে পারি এমনি যেন হয়।
নম্রশিরে সুখের দিনে তোমারি মুখ লইব চিনে—
দুখের রাতে নিখিল ধরা যেদিন করে বঞ্চনা
তোমারে যেন না করি সংশয়॥

৫. যৌবরাজ্যে বসিয়ে দে, মা, লক্ষ্মীছাড়ার সিংহাসনে।
ভাঙা কুলোয় করুক পাখা তোমার যত ভৃত্যগণে।
দগ্ধভালে প্রলয়শিখা দিক্‌, মা, এঁকে তোমার টীকা—
পরাও সজ্জা লজ্জাহারা জীর্ণকন্থা ছিন্নবাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস॥

লুকোক তোমার ডঙ্কা শুনে কপট সখার শূন্য হাসি
পালাক ছুটে পুচ্ছ তুলে মিথ্যে চাটু মক্কা-কাশী।

আত্মপরের প্রভেদ-ভোলা জীর্ণ দুয়োর নিত্য খোলা—
থাকবে তুমি, থাকব আমি সমানভাবে বারো মাস
হাস্তমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস ॥

জীবনে যত পূজা হল না সারা
জানি হে, জানি তাও হয়নি হারা।
যে ফুল না-ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে
যে নদী মরুপথে হারালো ধারা।
জানি হে, জানি তাও হয়নি হারা ॥

জীবনে আজও যাহা রয়েছে পিছে,
জানি হে, জানি তাও হয়নি মিছে।
আমার অনাগত আমার অনাহত
তোমার বীণাতারে বাজিছে তারা—
জানি হে, জানি তাও হয়নি হারা।

৭. 'মুক্তি চাস্? মোক্ষ চাস্? চাস্ চির-স্বর্গবাস?
শত পুত্র চাস্ যদি পাবি
পরমায়ু বর্ষ-শত রাজ্য ধনরত্ন যত,
কিবা চাস্—বল্, পুনঃ ভাবি।'
জোড় হাতে নেয়ে কয়, 'মরিতে করি না ভয়,
মোক্ষ? মুক্তি?—কাজ নাই তা'তে।
রাজ্যধন নেব কেন? আমার সন্তান যেন
চিরদিন থাকে দুধে-ভাতে।'
অন্নপূর্ণা ক'ন, 'নেয়ে, সোনা ফেলে এলি ধেয়ে,
যে সোনা এসেছি নায়ে রাখি,
সে সোনা সামান্ত নয়, যাবে তাতে দৈন্ত-ভয়—'
নেয়ে কয় ছলছল আঁখি—
'সোনা নিয়ে কি মা হবে? জমিদার কেড়ে লবে,
লুটে লবে চোরে বা ডাকাতে।
বর দাও মোরে হেন, আমার সন্তান যেন
চিরদিন থাকে দুধে-ভাতে।'

৮. ভারতবর্ষে রামমোহন রায়ের যাঁরা পূর্ববর্তী ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম, কবীর, নিজেকে বলেছিলেন ভারতপথিক। ভারতকে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন মহাপথরূপে। এই পথে ইতিহাসের আদিকাল থেকে চলমান মানবের ধারা প্রবাহিত। এই পথে স্মরণাতীত কালে এসেছিল যারা, তাদের চিহ্ন ভূগর্ভে। এই পথে এসেছিল

হোমাগ্নি বহন করে আর্যজাতি। এই পথে একদা এসেছিল মুক্তিতত্ত্বের আশায় চীনদেশ থেকে তীর্থযাত্রী। আবার কেউ এসেছে সাম্রাজ্যের লোভে, কেউ এল অর্থকামনায়। সবাই পেয়েছে আতিথ্য। এ ভারতে পথের সাধনা, পৃথিবীর সকল দেশের সঙ্গে যাওয়া-আসার নেওয়া-দেওয়ার সম্বন্ধ, এখানে সকলের সঙ্গে মেলবার সমস্যা সমাধান করতে হবে। এই সমস্যার সমাধান যতক্ষণ না হয়েছে ততক্ষণ আমাদের দুঃখের অন্ত নাই। এই মিলনের সত্য সমস্ত মানুষের চরম সত্য, এই সত্যকে আমাদের ইতিহাসে অঙ্গীভূত করতে হবে। রামমোহন রায় ভারতের এই পথের চৌমাথায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন, ভারতের যা সর্বশ্রেষ্ঠ দান তা নিয়ে।

৯. আমরা সাধারণত প্রবল সাহেবি অথবা প্রচুর নবাবি দেখাইয়া সম্মানলাভের চেষ্টা করিয়া থাকি। কিন্তু আড়ম্বরের চাপল্য বিদ্যাসাগরের উন্নত-কঠোর আত্মসম্মানকে কখনো স্পর্শ করিতে পারিত না। ভূষণহীন সারল্যই তাঁহার রাজভূষণ ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র যখন কলিকাতায় অধ্যয়ন করিতেন তখন তাঁহার দরিদ্রা জননীদেবী চরকা-সুতা কাটিয়া পুত্রদ্বয়ের বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া কলিকাতায় পাঠাইতেন। সেই মোটা কাপড়, সেই মাতৃস্নেহমণ্ডিত দারিদ্র্য তিনি চিরকাল সগৌরবে সর্বাঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধু তদানীন্তন লেফ্‌টেনান্ট গবর্ণর হ্যালিডে সাহেব তাঁহাকে রাজসাক্ষাতের উপযুক্ত সাজ পরিয়া আসিতে অনুরোধ করেন। বন্ধুর অনুরোধে বিদ্যাসাগর কেবল দুই একদিন চোগা-চাপকান পরিয়া সাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু সে লজ্জা আর সহ্য করিতে পারিলেন না। বলিলেন, 'আমাকে যদি এই বেশে আসিতে হয় তবে এখানে আর আমি আসিতে পারিব না।' হ্যালিডে তাঁহাকে তাঁহার অভ্যস্ত-বেশে আসিতে অনুমতি দিলেন।

১০. বস্তুতঃ বাহুবল অপেক্ষা বাক্যবল সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ। এ পর্যন্ত বাহুবলে পৃথিবীর কেবল অবনতিই সাধন করিয়াছে—যাহা কিছু উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা বাক্যবলে। সভ্যতার যাহা কিছু উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা বাক্যবলে। সমাজনীতি রাজনীতি ধর্মনীতি সাহিত্য বিজ্ঞান শিল্প—যাহারই উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা বাক্যবলে। যিনি বক্তা, যিনি কবি, যিনি লেখক—দার্শনিক বৈজ্ঞানিক নীতিবেত্তা ধর্মবেত্তা ব্যবস্থাবেত্তা সকলেই বাক্যবলে বলী।

ইহা কেহ মনে না করেন যে, কেবল বাহুবলের প্রয়োগ নিবারণই বাক্যবলের পরিণাম বা তদর্থেই বাক্যবল প্রযুক্ত হয়। মনুষ্য কতকদূর পশুচরিত্র পরিত্যাগ করিয়া উন্নতাবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। অনেক সময়ে মনুষ্য ভয়ে ভীত না হইয়াও সৎকর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত। যদি সমগ্র সমাজের কখনও এককালে কোনো বিশেষ সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মে তবে সে সৎকার্য অবশ্য অনুষ্ঠিত হয়। এই সৎপথে জনসাধারণের প্রবৃত্তি কখনও কখনও জ্ঞানীর উপদেশ ব্যতীত ঘটে না।

১১. সৃষ্টিকর্তা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি দিয়াছেন। একদল হয়তো গণিত বুঝিতে পারিবে না, সাহিত্য রসপান করিতে পারিবে। অপর কেহ বা

সাত-কাণ্ড রামায়ণ শুনিয়া অম্লানমুখে বলিবে, 'ইহাতে তো কিছুরই উপপত্তি হইল না।' কেহ হয়ত একখানি চিত্র দেখিয়া মোহিত হইবে, সঙ্গীতের মনোহর তান বিরক্তিকর ভাবিবে। কেহ বা সুরম্য চিত্রপট অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করিয়া গীত-সাগরে নিমগ্ন হইবে। কেহ প্রফুল্ল কুসুমোদ্যান পরিত্যাগ করিয়া বিজন বন্য শৈলময় প্রদেশ ভালোবাসিবে; কেহ বা তরুলতাশূন্য বন্ধুর গিরি কষ্টকর বোধ করিয়া প্রসূনপরিপূরিত বল্লরীপল্লববিভূষিত নিকুঞ্জে মনস্তুষ্টি সাধনার্থ আশ্রয় লইবে। কেহ চিন্তাশীল কার্যে অপটু; কেহ বা কার্যদক্ষ, চিন্তায় অপটু। এইরূপ স্বাভাবিক শক্তিভেদ যে প্রতিভার মূল, তাহাতে সন্দেহ নাই। নতুবা, আমি, তুমি, সকলেই কালিদাস বা আর্যভট্ট, সেক্সপিয়র বা নিউটন হইতে পরিতাম।

১২. আমি জানি, কোনো ঔষধসত্রে এক বিলাতি ডাক্তার ছিলেন। তার কাছে এক বৃদ্ধ এসে করুণ স্বরে যেমনি বলেছে 'জ্বর' অমনি তিনি ব্যস্ত হয়ে তখনি তাকে একটা অত্যন্ত তিতো জ্বরঘ্ন রস গিলিয়ে দিলেন; সে লোকটা হাঁপিয়ে উঠল, কিন্তু আপত্তি করবার সময় মাত্র পেল না। সেই সংকটের সময় আমি যদি ডাক্তারকে বাধা দিয়ে বলতুম, জ্বর ওর নয়, জ্বর ওর মেয়ের, তাহলে কি ডাক্তার রেগে আমাকে বলতে পারতেন যে, 'তবে তুমিই চিকিৎসা করো-না; আমি তো তবু যা হয় একটা কোনো ওষুধ যাকে হয় একজনকে খাইয়েছি, তুমি তো কেবল ফাঁকা সমালোচনাই করলে?' আমার এইটুকু মাত্র বলবার কথা যে, আসল সমস্যাটা হচ্ছে, বাপের জ্বর নয়, মেয়ের জ্বর; অতএব বাপকে ওষুধ খাওয়ালে এ সমস্যার সমাধান হবে না।

১৩. ওহে দেব! ভেঙে দাও ভীতির শৃঙ্খল
ছিঁড়ে দাও লাজের বন্ধন;
সমুদয় আপনারে দিই একেবারে,
জগতের পায়ে বিসর্জন।
স্বামীন্, নির্দেশ তব হৃদয়ে ধরিয়া,
তোমারি নির্দিষ্ট করি কাজ,
ছোট হোক্, বড় হোক্, পরের নয়নে
পড়ুক বা না পড়ুক তাহে কেন লাজ?
তুমি জীবনের প্রভু, তব ভৃত্য হয়ে
বিলাইব বিভব তোমার,
আমার কি লাজ, আমি ততটুকু দিব,
তুমি দেছ যেটুকুর ভার।

১৪. দণ্ডিতের সাথে
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার। যার তরে প্রাণ

কেনো ব্যথা নাহি পায়, তারে দণ্ড দান
প্রবলের অত্যাচার। যে দণ্ডবেদনা
পুত্রেরে পার না দিতে, সে কারে দিও না।
যে তোমার পুত্র নহে, তারো পিতা আছে;
মহা অপরাধী হবে তুমি তার কাছে,
বিচারক। শুনিয়াছি, বিশ্ববিধাতার
সবাই সন্তান মোরা, পুত্রের বিচার
নিয়ত করেন তিনি আপনার হাতে
নারায়ণ; ব্যথা দেন, ব্যথা পান সাথে,
নতুবা বিচারে তাঁর নাহি অধিকার॥

১৫. ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল;
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে—
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে।
রাজছত্র ভেঙে পড়ে; রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে;
জয়স্তম্ভ মূঢ়সম অর্থ তার ভোলে;
রক্তমাখা অস্ত্র হাতে যত রক্ত আঁখি
শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি।
ওরা কাজ করে
দেশে দেশান্তরে
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের সমুদ্র-নদীর ঘাটে ঘাটে
পঞ্জাবে বোম্বাই গুজরাটে।

॥ সংকেত ॥

১. বাঙ্গালী জাতি শুধুমাত্র বাঙ্গালী নয়, সে বিশ্বেরও মানুষ।
২. সকল সংস্কার ও ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে, সকল কর্মোদ্যোগের মধ্যে ভারতের স্বাধীন ও নির্ভীক আত্মপ্রকাশ কাম্য।
৩. সন্তানের উপর জননীর অধিকার যতখানি, তাহার উপর বিশ্বেরও অধিকার ততখানি।
৪. ভগবানের কৃপা অপেক্ষা স্ব-শক্তিতে বিপদ-উত্তরণ অনেক বেশী গৌরবময়।
৫. বিশ্বের লক্ষ্মীছাড়ার দল বিপদ, দারিদ্র্য, বঞ্চনা ও আত্মপরের ভেদাভেদ ভুলিয়া অদৃষ্টকে উপহাস করিয়া যায়।
৬. পৃথিবীর কিছুই হারায় না, কোন কিছুই ব্যর্থ নয়। ঈশ্বরের পদতলেই পূর্ণতা ও সফলতা।
৭. বাঙ্গালী জাতি অল্পে তুষ্ট। দীর্ঘায়ু, ঐশ্বর্য বা মুক্তি কোনকালেই সে চায় নাই, সে চাহিয়াছে তাহার সন্তান-সন্ততিদের শান্ত নিরবচ্ছিন্ন জীবন।

৮. বিভিন্ন মানব-সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যের সাধনাই ভারতের সাধনা ; রামমোহন তাহার প্রতীক।

৯. দারিদ্র্য ছিল বিদ্যাসাগরের রাজ-ভূষণ এবং উন্নত-কঠোর আত্মসম্মান ছিল তাঁহার চরিত্রের মূল ভিত্তি।

১০. বাহুবল পশুবল অপেক্ষা সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ।

১১. পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি ও প্রবণতা।

১২. যাহা আসল সমস্যা, তাহার সমাধানই প্রকৃত সমাধান।

১৩. শক্তিমতো সাধ্যমতো নির্ভীক কর্তব্য সম্পাদনেই জীবনের সার্থকতা।

১৪. সহৃদয় এবং সংবেদনশীল দণ্ডাদেশই অপরাধের শ্রেষ্ঠ শাস্তি।

১৫. সাম্রাজ্যের সহস্র উত্থান-পতনের মধ্যেও [illegible] চিরকাল দেশ-দেশান্তরে নানা কর্মরত।

ভাব-সম্প্রসারণ

১. ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে,
ধ্বনি-কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে॥

বিপন্ন মানুষ মানুষের দ্বারে আসিয়া আর্তকণ্ঠে সাহায্য প্রার্থনা করে। তাহার সাহায্য প্রার্থনায় মানুষের সাড়াও পাওয়া যায়। বিপন্নকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য মানুষ নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়ে, বিপন্নকে উদ্ধার করিয়া অন্তরে লাভ করে পরম পরিতৃপ্তি। যাহারা প্রকৃত পরোপকারী, তাহারা তাহাদের এই সাহায্য দানের জন্য কোন প্রতিদানের প্রত্যাশা রাখে না। কিন্তু মানব-চরিত্র বড় বিচিত্র। যে উপকারীর উপকারের সাহায্যে বিপন্ন ব্যক্তির বিপদ্-উত্তরণ ঘটে, তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকারে কোথায় যেন তাহার বাধে! সে উপকারীর উপকার তো স্বীকার করেই না, উপরন্তু তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া তাহার স্বাভাবিক মহত্ত্বকে করে উপহাস। উপকারীর উপকার স্বীকারে যে অমূলক আত্মগ্লানি তাহার অন্তরে জাগিয়া উঠে, তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভের সহজতম উপায় হইল উপকারী ব্যক্তিকে উপহাস করা। এইরূপে এই পৃথিবীর অমল আলোক-শিখাগুলিকে গলা টিপিয়া হত্যা করিবার জন্য কৃতঘ্নেরা থাকে সদা-সক্রিয়। কিন্তু তাই বলিয়া পৃথিবীর সেই আলোক-শিখাগুলি কোনদিন নির্বাপিত হইবে না। জগতের কৃতঘ্নদের শত কৃতঘ্নতা উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা জীবন বিপন্ন করিয়া অনাবিল আলোক দান করিবেন। এই কলুষিত বিষাক্ত পৃথিবীতে তাঁহারাই তো একমাত্র আশা-ভরসা॥

২. জগতে দরিদ্ররূপে ফিরি দয়াতরে,
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে॥

মানবতার সেবাই প্রকৃত মুক্তির পথ। ঈশ্বরকে আমরা দেখি না, আমরা দেখি মানুষকে। মানুষই আমাদের জাগ্রত দেবতা। তাহাদের দুঃখ-দুর্দশা মোচনে

আমাদের প্রকৃত ঈশ্বর-সেবা। কারণ মানবতার সেবাই ঈশ্বর-সেবার শ্রেষ্ঠ পন্থা। পার্থিব দুঃখ-দুর্দশার রাহুগ্রাসে নিপতিত হইয়া মানুষ বড় অসহায়ভাবে আর্তনাদ করিয়া উঠে। সেই আর্ত, পীড়িতের দুঃখ-মোচনের জন্য যদি মানুষের হৃদয়-দুর্গ অর্গলমুক্ত না হয়, তবে এই পৃথিবীতে মানুষ কাহার দ্বারে গিয়া দাঁড়াইবে? সমাজের একশ্রেণীর মানুষ আছেন, যাঁহারা জগতের দুঃখী হতভাগ্য মানুষগুলিকে দূরে বিতাড়িত করিয়া, তথাকথিত পবিত্রতা-রক্ষার নামে তাহাদের স্পর্শকে দূরে ঠেকাইয়া মন্দিরের পাষাণ-প্রাচীরের মধ্যে খোঁজেন ঈশ্বরকে। কিন্তু ঈশ্বরের অধিষ্ঠান তো কেবল মন্দিরের পাষাণ-বেদীতেই নয়। তাঁহার আবির্ভাব যে মানুষের অন্তরে অন্তরে। জগতের লাঞ্ছিত-উৎপীড়িতের মধ্যে যে তাঁহার আসন পাতা, তাহার উপস্থিতি যে 'সবার পিছে সবার নিচে সবহারাদের মাঝে।' কাজেই, জগতের দরিদ্র-নারায়ণের সেবার মধ্য দিয়াই লাভ করা যাইবে ঈশ্বরের অবারিত স্পর্শ। মানবতার সাধনাই শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর-সাধনা॥

৩. নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস,
ওপারেতে সর্ব সুখ আমার বিশ্বাস।
নদীর ওপার বসি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে,
কহে, যাহা কিছু সুখ সকলি ওপারে॥

মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা অন্তহীন। সেই তৃপ্তিহীন আশা-আকাঙ্ক্ষার পশ্চাতে মানুষ ছুটিয়া মরে। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার যেমন শেষ নাই, তাহার ছুটিয়া চলারও তেমনি অন্ত নাই। মানুষের আকাঙ্ক্ষা করিবার ক্ষমতা অসীম, কিন্তু তাহাকে রূপদানের ক্ষমতা তাহার সীমিত। তাই সে আকাঙ্ক্ষা করে প্রচুর, কিন্তু পায় অল্প। ইহাই তাহার চিরন্তন অতৃপ্তির কারণ। তাই সে যাহা পায়, তাহাতে তাহার চিত্তের ক্ষুধা মিটে না। সে চায় আরো, আরো বেশী। আসল কথা, মানুষ কি চায়, তাহা সে জানে না। তাই সে অনাদি অনন্ত আকাঙ্ক্ষার অন্তহীন আকর্ষণে ঊর্ধ্বশ্বাসে এক দিগন্ত হইতে অন্য দিগন্তে ধাবিত হয়। কিন্তু তাহার আকাঙ্ক্ষা তো কোনদিনই পূর্ণ হইবার নয়। ফলে, নৈরাশ্যের এক সূচীভেদ্য অন্ধকারে সে অবশেষে নিক্ষিপ্ত হয়। কবি তাই গভীর মনস্তাপে উচ্চারণ করেন—'যা চাই তা ভুল করে চাই, যা পাই তা চাই না।' এইভাবে ক্লান্ত পার্থিব সুখের অন্বেষণে মানুষ অসম্ভবের পায়ে মাথা কুটিয়া মরে॥

৪. কহিল ভিক্ষার ঝুলি টাকার থলিরে,
'আমরা কুটুম্ব দোঁহে ভুলে গেলি কিরে?'
থলি বলে, 'কুটুম্বিতা তুমিও ভুলিতে
আমার যা আছে গেলে তোমার ঝুলিতে।'

অর্থই সকল অনর্থের মূল। মানুষ জাগতিক সুখের আশায় অর্থ কামনা করে। সে অর্থ পায়, কিন্তু সুখ পায় না। অর্থ একবার লাভ করিলে মানুষকে অর্থ-লালসায় পাইয়া বসে। তখন সে চায় আরো, আরো। দিনে দিনে তাহার অর্থ-ভাণ্ডার পূর্ণ হইয়া উঠে। কিন্তু অর্থের সঙ্গে থাকে অর্থের অহংকার। সেই অহংকারে মানুষ স্ফীত হইয়া উঠে। তখন সে তাহার চারিদিকের মানুষকে মানুষ বলিয়া মনে করে না। ফলে, বন্ধু-বিচ্ছেদ, আত্মীয়-বিচ্ছেদ এবং প্রিয়জন-বিচ্ছেদ অনিবার্য হইয়া দেখা দেয়। দুই হাতে অর্থভাণ্ডার আঁকড়িয়া ধরিয়া সে ধনকুবের সাজে বটে; কিন্তু সকলকে হারাইয়া সে এক নিঃসঙ্গ নির্জনতায় হয় নির্বাসিত। অন্যদিকে, তাহার হৃদয় অর্থচিন্তায় সারাক্ষণ থাকে ভারাক্রান্ত। সেখানে স্নেহ-প্রীতি, দয়া-দাক্ষিণ্য থাকিবার আর স্থান সংকুলান হয় না। তাই অর্থবান্ ব্যক্তিরা স্নেহ-প্রীতিহীন অন্তঃসারশূন্য হইয়া উঠে। সেই শূন্যতা পূরণ করিবার জন্য অনিবার্যরূপে দেখা দেয় ঐশ্বর্যের অহংকার। মুদ্রা-রাক্ষস এইভাবে মানুষের হৃদয়ের সমস্ত স্বাভাবিক সরসতা শোষণ করিয়া তাহাকে একটি দয়াহীন, মরুভূমিতে পরিণত করে॥

৫. বসুমতী, কেন তুমি এতই কৃপণা ?
কত খোঁড়াখুঁড়ি করি পাই শস্যকণা।
দিতে যদি হয় দে, মা, প্রসন্ন সহাস।
কেন এ মাথার ঘাম পায়েতে বহাস ?
বিনা চাষে শস্য দিলে কী তাহাতে ক্ষতি ?
শুনিয়া ঈষৎ হাসি কন বসুমতী,
'আমার গৌরব তাহে সামান্যই বাড়ে,
তোমার গৌরব তাহে নিতান্তই ছাড়ে।'

বিশ্বের অকর্মণ্যের দল বিনা পরিশ্রমেই জীবনে সফলতা কামনা করে। কিন্তু পায় না। বিশ্বে সাফল্যের পথ দুঃখ-বেদনা-কণ্টকিত। যে কোন কর্মে সাফল্যই পরিশ্রমসাধ্য। এই পৃথিবী সংগ্রাম-ক্ষেত্র। বাঁচার জন্য সকল মানুষকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়। নিজ নিজ শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী মানুষ পরিশ্রম করিবে, পরিশ্রমকে হাতিয়ার করিয়া সে জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিবে—ইহাই কাম্য। পৃথিবীতে যাহারা পরিশ্রমী; যাহারা উদ্যোগী, তাহারাই সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর হাত হইতে বিজয়-মাল্য ছিনাইয়া আনে। আর, যাহারা অলস, কর্ম-বিমুখ, তাহারা অসাড় কর্মহীনতার স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া চির-পরাজিতদের দলে স্থান করিয়া নেয়। অবশেষে বাঁচার তাগিদে তাহারা ভিক্ষাপাত্র হাতে তুলিয়া লইয়া দ্বার হইতে দ্বারে ক্ষুধার অন্ন ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। কিন্তু ভিক্ষার দ্বারা কোনদিন দারিদ্র্য মোচন হয় না—'ভিক্ষায়াম্ নৈব নৈব চ।' আর, ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে জীবন-ধারণের অবমাননার হাত হইতে নিষ্কৃতিই বা কোথায় ? কাজেই, বিশ্বের কর্মভীরু শ্রম-পলাতকের দল, যাহারা

পরিশ্রমকে ফাঁকি দিয়া সুখের স্বর্গে পৌছিতে চায়, তাহাদের স্থান হয় চির-দুঃখের নরককুণ্ডে।



কেরোসিন শিখা বলে মাটির প্রদীপে,
'ভাই বলে ডাক যদি দেব গলা টিপে।'
হেনকালে আকাশেতে উঠিলেন চাঁদা;
কেরোসিন বলি উঠে, 'এসো মোর দাদা!'

ভ্রান্ত আভিজাত্যের গর্বে মানুষ মানুষকে করে ঘৃণা, মানুষের স্পর্শকে দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়া বিশ্বে স্বাতন্ত্র্য জাহির করে। কিন্তু তাহাতে সে প্রকারান্তরে মানুষের জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এক স্বেচ্ছা-নির্বাসিত জীবন যাপন করে। স্মরণীয় যে, এই পৃথিবীর সকল মানুষই ঈশ্বরের সৃষ্টি—সকলেই সমান। 'জগৎ জুড়িয়া একজাতি শুধু সে জাতির নাম মানুষ জাতি।' একই রক্তমাংসের উপাদানে তাহাদের শরীর গড়া, একই চেতনার উপকরণে গড়া তাহাদের অনুভূতি। এই পৃথিবীর একই সূর্যের কিরণে, একই জল-হাওয়ায় তাহাদের জীবন সম্ভব হইয়াছে। অথচ কতিপয় ভ্রান্ত অন্ধ মানুষ মানুষে-মানুষে ভেদ-বৈষম্যের লৌহ-প্রাচীর সৃষ্টি করিয়া তাহার উপরে স্বাতন্ত্র্যের গর্বাঙ্ক নিশান উড়াইয়া দেয়। ইহাতে নাকি তাহাদের আভিজাত্যের জাতি-রক্ষা হয়। তাহারা নির্বোধ; তাই তাহারা জাতি লইয়া এই বজ্জাতির বড়াই করে। কিন্তু ইহাতে ঘৃণা দিয়া মানুষকে দূরে সরাইয়া মানুষ দুর্বল, পঙ্গু ও শক্তিহীন হইয়া পড়ে। ভারতে বর্ণ-হিন্দুদের এই মানসিকতায় তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মানুষদের বুকে 'পুঞ্জিত অভিমান' স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল। আজ বিশ্বে শ্বেতকায়দের নির্লজ্জ কালো আচরণে অশ্বেত-কায়দের জীবন দুর্বিষহ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ইতিহাস-দেবতা ইহা বেশীদিন ক্ষমা করিবেন না। একদিন না একদিন তাঁহার হাতের রুদ্র-বীণা বাজিয়া উঠিবে। সেদিন সকলেই 'মৃত্যুমাঝে হবে তবে চিতাভস্মে সবার সমান॥'

৭. রথযাত্রা, লোকারণ্য মহা ধুমধাম,
ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম।
পথ ভাবে 'আমি দেব', রথ ভাবে 'আমি',
মূর্তি ভাবে 'আমি দেব', হাসে অন্তর্যামী।

দেবতার নামে এই পৃথিবীতে যে কত অপদেবতার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। মানুষ তাহার স্বাভাবিক ঈশ্বর-প্রীতির প্রেরণায় যুগে যুগে দেবতার উদ্দেশ্যে রচনা করিয়াছে পূজার অর্ঘ্য। কিন্তু সেই অর্ঘ্য দেবতার কাছে পৌঁছায় নাই। পথিমধ্যে তাহা লোভী, ভণ্ড অপদেবতাদের হাতে গিয়া পড়িয়াছে। এইভাবে বিশ্বের সহজ সরল মানুষগুলিকে প্রতারণা করিয়া সেই অপদেবতার দল নিজেরাই মর্ত্যের দেবতার আসন গ্রহণ করিবার জন্ত লিপ্ত হয় নানা নির্লজ্জ চক্রান্তে। দেবতার নামে

উৎসর্গীকৃত শ্রদ্ধাভক্তির নৈবেদ্য সেই ধর্মধ্বজের দল মধ্যপথ হইতে ছিনাইয়া লইয়া আত্মসাৎ করে। ফলে, একদিকে ভক্তের ভক্তির অর্ঘ্য দেবতার পদতলে পৌঁছাইয়া দিবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া তাহারা বিশ্বের সহজ সরল মানুষগুলির সহিত করে প্রতারণা ; অন্যদিকে, দেবতার ধন নিজেরাই আত্মসাৎ করিয়া তাহারা আশাতিরিক্ত-ভাবে ধনী ও বিত্তশালী হইয়া উঠে। এইভাবেই পৃথিবীর ইতিহাসে যাজক-শক্তির আবির্ভাব। কিন্তু একদিন মানুষের জ্ঞানচক্ষুর উন্মেষ হইবে। সেদিন দেবতার সম্মুখের অপদেবতাদের কদর্য ছায়ামূর্তিগুলি অপসারিত হইবে। সত্যের উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে ঈশ্বরের জ্যোতির্ময় প্রকাশ ॥

৮. 'কে লইবে মোর কার্য ?' কহে সন্ধ্যারবি,
শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি।
মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল, 'স্বামী,
আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি।'

প্রত্যেক মানুষেরই জীবনে আসে মহৎ কর্মের আহ্বান। জীবনের সার্থকতা সেই মহৎ কর্মের উদ্‌যাপনের মধ্যেই নিহিত। পৃথিবীতে সকলের শক্তি সমান নয়। যাহার যেটুকু শক্তি আছে, তাহা লইয়া বিশাল কর্মানুষ্ঠানে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তির সমবায়ে রচিত হয় যে বিশাল শক্তি-সংঘ, তাহা দিয়া অসাধ্য সাধনও করা যায়। কিন্তু প্রত্যেক মহৎ কর্মানুষ্ঠানের মধ্যে আছে দুঃখ, আছে কষ্ট, আছে ত্যাগ-স্বীকার। মহাপুরুষেরা অসীম ত্যাগ স্বীকার করিয়া, অকথ্য দুঃখকষ্ট স্বীকার করিয়া পৃথিবীর দুঃখ-কষ্ট দূর করিবার জন্য করেন জীবনপণ প্রয়াস। যে মহান্ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া তাঁহারা পৃথিবীর কালিমা-মোচনে আত্মনিয়োগ করেন, সাধারণ স্বার্থ-সন্ধানী মানুষেরা সেই আদর্শ উপলব্ধি করিতে পারে না। তাহারা স্বার্থ-চিন্তা ও ব্যক্তিগত লাভক্ষতির হিসাব-নিকাশের অঙ্ক কষিয়া হতাশ হয় এবং আদর্শ উদ্‌যাপনের মহান্ ব্রত হইতে নিজেদের দূরে সরাইয়া রাখে। আর, যাঁহারা বিশ্বপ্রেমিক, মানবপ্রেমিক, যাঁহারা অন্ধকার পৃথিবীতে আলো আনিবার জন্য জীবনপণ করেন, পৃথিবীর মানুষকে অন্ধকারে পথ দেখাইবার জন্য যাঁহারা বুকের পাঁজর জ্বালাইয়া নিজেদের নিঃশেষে খাক্ করেন, তাঁহাদের আদর্শের অনুসরণে কেহ আর অগ্রসর হইয়া আসে না। কিন্তু পৃথিবীর আলো কখনও নিঃশেষে মুছিয়া যাইতে পারে না। পরবর্তীকালের আদর্শনিষ্ঠ সেবা-ব্রতীরা ছুটিয়া আসে। ক্ষমতা তাহাদের যতই সীমিত হউক, তাহা লইয়াই তাহারা বিশ্বের ব্রত উদ্‌যাপনে ঝাঁপাইয়া পড়ে ॥

৯. যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে
সহস্র শৈবালদামে বাঁধে আসি তারে,
যে জাতি জীবনহারা অচল অসাড়
পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।

চলমানতাই জীবন, নিশ্চলতাই মৃত্যু। সেই চলমানতার স্রোতে জীবন সহজ ও স্বচ্ছন্দ গতিতে রূপ-রূপান্তরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া চলে। কিন্তু কখনও কোন কারণে যদি তাহার সেই গতিছন্দ ব্যাহত হয়, জীবন যদি তাহার স্বাভাবিক অগ্রসরণের পথে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সে তাহার সুন্দর স্বাভাবিক বিকাশ হারাইয়া বিকৃত রূপ পরিগ্রহ করে। তখন তাহার মধ্যে বিকার এবং নানা কদর্যতার ঘটে প্রাচুর্য। নানা পাপ ও পঙ্কিলতার আবর্তে জীবন হাঁপাইয়া মরে। ইহা যেমন ব্যক্তির জীবনে সত্য, তেমনি সত্য জাতির জীবনেও। সকল জাতিরই থাকে একটি স্বাভাবিক গতির ছন্দ। সেই ছন্দের মধ্যেই জাতির বিকাশ, জাতির মর্মের সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়। সেই ছন্দে অগ্রসর হইয়া সেই জাতি চরম সাফল্য লাভ করে। কিন্তু কোনদিন যদি সেই জাতি তাহার গতিশীলতা হারাইয়া ফেলে, তবে তাহার জাতীয় জীবনের দিকে দিকে দেখা দেয় অবাঞ্ছিত জড়তা ও নৈষ্কর্ম্য। এই জড়তা ও নৈষ্কর্ম্যই জাতীয় জীবনের প্রধান শত্রু। কালক্রমে উহা হইতে জন্ম নেয় নানা বিকৃতি ও পচন। সঙ্গে সঙ্গে নানা দেশাচার ও লোকাচারের আবর্জনা-স্তূপ তাহার জীবনধারা পঙ্গু ও নিশ্চল করিয়া দেয়। তখনই জাতির ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের মেঘ ঘনাইয়া আসে। তখনই জাতির হাতে-পায়ে পড়ে নানা বিধি-নিষেধের বেড়ী, নিষ্ঠুরভাবে বাজিতে থাকে পরাধীনতার শৃঙ্খল॥

৩. বলো, মিথ্যা আপনার সুখ,
মিথ্যা আপনার দুঃখ! স্বার্থমগ্ন যেজন বিমুখ
বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।

সুবিশাল এই পৃথিবী। সুবিশাল তাহার মানবগোষ্ঠী। অন্তহীন তাহাদের দুঃখ-বেদনা। মানুষের কত ব্যথা, কত কান্না পৃথিবীর বুকে পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। বলদর্পীর অত্যাচারে দিনের পর দিন অত্যাচারিত হইতেছে কত অসহায় জনগোষ্ঠী। কত বীরের রক্তস্রোত, কত মাতার অশ্রুধারা ব্যর্থ হইয়া যায়। তবু মানুষের ভাগ্যে ঘটে না নূতন সূর্যোদয়, অবসান ঘটে না মানুষের দুঃখ-লাঞ্ছনার। আর, অন্যদিকে পৃথিবীর স্বার্থমগ্ন মানুষ সেই বিশাল জগৎ হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিজেকে স্বার্থপরতার স্বরচিত কারাগারে বন্দী করিয়া রাখে। পাছে জগতের আর্ত-পীড়িতের ক্রন্দনধ্বনি তাহার সুখ-সম্ভোগের জীবনকে স্পর্শ করে, সেইজন্য সে তাহার আত্ম-সর্বস্বতার সকল দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাহার মধ্যে বাস করে। কিন্তু ইহা জীবন নয়। আত্মসুখসর্বস্বতার জীবন যে মিথ্যা, ভ্রান্ত এবং নিষ্ফল—ইহা সে একদিন বুঝিতে পারে। তখন স্বার্থপরতার পাষাণ-প্রাচীর ভাঙিয়া পড়ে, ভোগ-সুখ-সর্বস্বতার অলীক দুর্গ ধূলিসাৎ হয়। নূতন জীবনের মন্ত্রে দীক্ষা লইয়া সে বাহিরের বিশ্বের অবাধ আকাশের নীচে আসিয়া দাঁড়ায়। তখন সে মহাবিশ্ব-জীবনের ছন্দের সঙ্গে, জগতের সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজের জীবনকে যুক্ত করিয়া লাভ করে জীবনের পরিপূর্ণ স্বাদ, খুঁজিয়া পায় জীবনের চরম এবং পরম সার্থকতা॥

॥ অনুসরণী ॥

ভাব-সম্প্রসারণ কর :

১. পথের প্রান্তে আমার তীর্থ নয়,
পথের দুধারে আছে মোর দেবালয়।

২. শৈবাল দিঘিরে বলে উচ্চ করি শির,
লিখে রেখো এক ফোঁটা দিলেম শিশির।

৩. দ্বার বন্ধ করে দিয়ে ভ্রমটারে রুখি।
সত্য বলে, 'আমি তবে কোথা দিয়ে ঢুকি?'

৪. পুষ্প আপনার জন্ম ফুটে না।

৫. বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?

৬. জাল কহে, 'পঙ্ক আমি উঠাব না আর।'
জেলে কহে, 'মাছ তবে পাওয়া হবে ভার।'

৭. হাউই কহিল, 'মোর কী সাহস ভাই,
তারকার মুখে আমি দিয়ে আসি ছাই।'
কবি কহে, 'তার গায়ে লাগে নাকো কিছু,
সে ছাই ফিরিয়া আসে তোরি পিছু পিছু।'

৮. এ জগতে যাঁহারাই বড় হইয়াছেন, তাঁহারা আরামে পালিত লক্ষ্মীর ক্রীতদাস নহেন।

৯. উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে,
তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে।

১০. হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান্।
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীস্টের সম্মান
কণ্টক-মুকুট শোভা।

১১. পেঁচা রাষ্ট্র করি দেয় পেলে কোনো ছুতা,
'জান না? আমার সাথে সূর্যের শত্রুতা।'

১২. প্রাচীরের ছিদ্রে এক নামগোত্রহীন
ফুটিয়াছে ছোটো ফুল অতিশয় দীন।
'ধিক্ ধিক্' করে তারে কাননে সবাই—
সূর্য উঠি বলে তারে, 'ভালো আছ ভাই?'

১৩. টিকি মুণ্ডে চড়ি উঠি কহে ডগা নাড়ি,
'হাত পা প্রত্যেক কাজে ভুল করে ভারি।'
হাত পা কহিল হাসি, 'হে অভ্রান্ত চুল,
কাজ করি আমরা যে, তাই করি ভুল।'

১৪. অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।

১৫. তৃষিত গর্দভ গেল সরোবর-তীরে
'ছি ছি কালো জল!' বলি চলে এল ফিরে।
কহে জল, 'জল কালো জানে সব গাধা,
যে জন অধিক জানে বলে জল সাদা।'

১৬. জন্মিলে মরিতে হবে
অমর কে কোথা কবে
চিরস্থির কবে নীর হায়রে, জীবন-নদে?

সংকেত ॥

১. জীবনে শ্রেষ্ঠ পূজা প্রেম, প্রকৃতি ও সৌন্দর্য উপভোগের মধ্যেই নিহিত।
২. স্বার্থ-কলুষমুক্ত প্রচারবিহীন নীরব দানই প্রকৃত দান।
৩ উদার মুক্ত মনই সত্যের বিহার-ভূমি।
৪. বিশ্ব-মানবের কল্যাণের জন্যই জীবন।
৫. মানুষই জীবন্ত ঈশ্বর; মানব-সেবাই ঈশ্বর-সেবা।
৬. নিষ্ক্রিয়তাই সত্য ও সাফল্য লাভের পথে প্রবল অন্তরায়।
৭. নীচ ব্যক্তিরা জগতের মহৎ ব্যক্তিদের গায়ে কালিমা লেপন করিবার চেষ্টা করে: কিন্তু তাহাতে নিজেরাই কালিমালিপ্ত হয়।
৮. দারিদ্র্যই মহাপুরুষগণের লালন-ভূমি।
৯. জগতের মধ্যপন্থীরা সামাজিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত হইতে সর্বদা দূরে থাকে।
১০. দারিদ্র্য প্রতিভার জননী এবং মহাপুরুষগণের অঙ্গের ভূষণ।
১১. নীচ ব্যক্তিরা নিজেরা কিছুই করে না; কিন্তু মহাপুরুষগণের কর্মের নিন্দায় সদা মুখর।
১২. মহাপুরুষেরা সমাজের অবহেলিত ও পতিতদের আত্মার আত্মীয়।
১৩. জগতের কর্মীরা কাজ করে, ভুলও করে; আর নিষ্কর্মার দল ভুলের ভয়ে কোন কাজ করে না।
১৪. অন্যায়কারী ও অন্যায়ের প্রশ্রয়দাতা উভয়েই সমান অপরাধী।
১৫. নির্বোধ ব্যক্তিরা কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা বুঝিতে পারে না।
১৬. জাত ব্যক্তির মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

অতিরিক্ত সংযোজন

৫৪. শরৎচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী

প্রবন্ধ-সূত্র : সূচনা। বাংলার সমাজের কলঙ্কিত চিত্র ও শরৎচন্দ্র। সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব। শরৎ-সাহিত্যের চরম জিজ্ঞাসা। শরৎচন্দ্র বস্তুবাদী নন, আদর্শবাদী। শরৎচন্দ্রের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা। জন্মশতবার্ষিকীর প্রেক্ষাপটে শরৎচন্দ্র ও শরৎ-সাহিত্য। উপসংহার।

সূচনা

শরৎচন্দ্র বাংলার প্রাণের শিল্পী, বাঙালীর বেদনার কাব্যকার। বাংলার সাহিত্য-গগনে যখন বঙ্কিম-প্রতিভা অস্তমিত এবং রবীন্দ্রনাথ পূর্ণ দীপ্তিতে ভাস্বর, তখনই শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব। তিনি শুনাইলেন সমাজের চির-বঞ্চিত, চির-পতিত, চির-অবহেলিতদের জীবন-কাহিনী, অশ্রুর অক্ষরে রচনা করিলেন সেই হতভাগ্যদের জীবন-কাব্য।

বাংলার সমাজের কলঙ্কিত চিত্র ও শরৎচন্দ্র

বাংলার রক্ষণশীল সমাজে নারীর স্থান ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ। তাহার উপর কৌলিন্য-প্রথা সমাজে সৃষ্টি করিয়াছিল এক দুরপনেয় ক্ষত। রামমোহনের সতীদাহ-নিবারণ এবং বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন বাংলাদেশে নারী-নিগ্রহের কিছুটা উপশম ঘটাইলেও লোকচক্ষুর অন্তরালে নারী-সমাজের পতন ও অবক্ষয়ের নিত্য-নূতন করুণ কাহিনী রচিত হইতেছিল। অন্যদিকে, কৃত্রিম জাতিভেদকে হাতিয়ার করিয়া ব্রাহ্মণ-সমাজ নিম্নশ্রেণীর মানুষগুলির উপর শুরু করিয়াছিল হৃদয়হীন লাঞ্ছনা ও অপমান। তার উপর, লর্ড কর্নওয়ালিশ-প্রবর্তিত জমিদারী-প্রথায় ক্ষমতাবান জমিদার-শ্রেণী অকথ্য অত্যাচারে তাহাদের জীবন করিয়া তুলিয়াছিল দুর্বিষহ। বাংলার সমাজে সেদিন 'প্রতিকারহীন শক্তির অপরাধে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে' কাঁদিতেছিল। শরৎচন্দ্র বাংলার সেই ব্যথাদীর্ণ বেদনার উপর সমবেদনার করস্পর্শ বুলাইয়া দিলেন, ন্যায় বিচারের আশায় সেই নিপীড়িত, বঞ্চিত, হতভাগ্যদের করুণ কাহিনীর অন্তরালে আর্জি পেশ করিলেন মানবতার বিচারশালায়।

১৮৭৬ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর। স্থান : হুগলি জেলার দেবানন্দপুর। এখানেই এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবারে শরৎচন্দ্রের জন্ম। পিতার নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায়, মাতার নাম ভুবনমোহিনী দেবী। শৈশবে প্যারী পণ্ডিতের পাঠশালায় এবং সিদ্ধেশ্বর মাস্টারের বাংলা স্কুলে শুরু হয় তাঁহার শিক্ষা-জীবন। কিন্তু অল্পকাল পরেই তিনি ভাগলপুরে মাতুলালয়ে চলিয়া যান। সেখানে তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজিয়েট

হাই স্কুল হইতে দ্বিতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু পরীক্ষার ফী সংগ্রহ করিতে না পারায় এফ. এ. পরীক্ষা দেওয়া তাঁহার ভাগ্যে জোটে নাই। তারপর কোন অজ্ঞাত কারণে তিনি চলিয়া যান ভারতের বাহিরে —সুদূর রেঙ্গুনে। কৈশোরে রচিত তাঁহার 'কাশীনাথ' গল্পটিকে বাদ দিলে কুন্তলীন-পুরস্কার-প্রাপ্ত 'মন্দির' গল্পটিই তাঁহার সম্ভবতঃ প্রথম রচনা। দীর্ঘকাল নিরুদ্দেশের পর হঠাৎ একদিন কলিকাতার 'ভারতী' পত্রিকায় বাহির হইল শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি' নামে বড় গল্পটি। এই গল্পটির আবেদনে শরৎচন্দ্র একদিনেই বাঙালীর হৃদয় হরণ করিয়া লইলেন। এ যে সম্পূর্ণ নূতন স্বাদ! কাহিনী, চরিত্র ও বক্তব্য সমাজের নিরুদ্ধ বেদনা হইতে সংগৃহীত।

সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব

শরৎ-সাহিত্য তাই যুগ-যন্ত্রণায় কাতর, সামাজিক ব্যথা-বেদনায় অশ্রুসিক্ত। শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব সেইখানেই। তাঁহার দেবদাস, অরক্ষণীয়া, বামুনের মেয়ে, বিপ্রদাস, চন্দ্রনাথ, গৃহদাহ, চরিত্রহীন, দেনাপাওনা, দত্তা, শ্রীকান্ত, শেষ প্রশ্ন, পথের দাবী ইত্যাদি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। তাঁহার চন্দ্রমুখী, সাবিত্রী, কিরণময়ী, রাজলক্ষ্মী, অন্নদাদিদি একদিন বাঙালীর সমাজ-চেতনায় এক বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল।

শরৎ-সাহিত্যের চরম জিজ্ঞাসা

নারী-চরিত্র অঙ্কনে শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব সর্বাধিক। বাঙালী নারীর বাণীহারা বেদনা শরৎ-সাহিত্যে প্রকাশের প্রকৃত ভাষা পাইয়াছে। সমাজ-জীবনের রূঢ় বাস্তবতাকে তিনি স্বীকার করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাকে 'রিয়ালিস্ট' বলা কখনই উচিত হইবে না। এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন, 'যারা শুধু দিলে, বিনিময়ে পেলে না কিছুই, তারাই আমাকে পাঠালে মানুষের দরবারে নালিশ জানাতে।' তাঁহার সাহিত্যে তিনি রূঢ় বাস্তবকে রূপ দিয়া অসুন্দরের মধ্যে সুন্দরকে খুঁজিয়াছেন। সেদিক দিয়া শরৎচন্দ্র অবশ্যই আদর্শবাদী।

শরৎচন্দ্র বস্তুবাদী নন, আদর্শবাদী

শরৎ-সাহিত্যে আমরা দেখি আমাদের সমাজের বহু-কলঙ্কিত মুখ, শুনি আমাদের আত্মার ক্রন্দন। কিন্তু মানবাত্মা সামাজিক পচন ও অবক্ষয়ের মধ্যেও থাকে নিষ্কলঙ্ক। শরৎচন্দ্র সেই নিষ্কলঙ্ক মানবাত্মার জয়গান করিয়াছেন। তাঁহার 'মহেশ', 'অভাগীর স্বর্গ', 'একাদশী বৈরাগী'—ছোটগল্পগুলি শুধু বাংলা সাহিত্যেই নয়, বিশ্ব-সাহিত্যেও বিশিষ্ট মর্যাদা দাবী করে।

শরৎচন্দ্রের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা

আজ শরৎচন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকীর প্রেক্ষাপটে শরৎচন্দ্রকে নূতন করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, তাঁহার সাহিত্যের নূতন মূল্য বিচার করিতে হইবে। উগ্র আধুনিকতায় শরৎ-সাহিত্যকে দূরে সরাইয়া রাখিলে চলিবে না। যথার্থ সংবেদনশীল পাঠকের মতো শরৎ-সাহিত্যের পূর্ণ মূল্য উপলব্ধি করিতে হইবে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শরৎ-সাহিত্য বহু পূর্ব হইতেই প্রায় সকল ভারতীয় ভাষাতেই অনূদিত হইয়া ভারতীয় পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে। আজ জন্মশতবার্ষিকীর আলোকে শরৎ-সাহিত্যকে

নূতন করিয়া উপলব্ধি করিবার প্রয়াস সূচিত হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে শরৎচন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী কমিটি গঠিত হইয়াছে। সভা-সমিতির মধ্য দিয়া শরৎ-সাহিত্যের বিভিন্ন দিক্-দিগন্ত বিষয়ে আলোচনা, শরৎচন্দ্রের কাহিনীর নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করিবার ব্যবস্থা ইত্যাদি জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের প্রধান অঙ্গ। এই উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার শরৎচন্দ্রের একটি প্রামাণ্য জীবন-চিত্র উপহার দিয়াছেন এবং শরৎচন্দ্রের রচিত দুইটি কাহিনী চলচ্চিত্রে রূপায়িত করিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। সেই সঙ্গে শরৎ-সাহিত্য সুলভে প্রকাশের ব্যবস্থা করিলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জনগণের ধন্যবাদার্হ হইবেন।

জন্মশতবার্ষিকীর প্রেক্ষাপটে শরৎচন্দ্র ও শরৎ-সাহিত্য

বাঙ্গালী জাতি শরৎচন্দ্রের নিকট বহুভাবে ঋণী। কেবল বাঙ্গালী জাতিই নয়, সমগ্র ভারতবর্ষই, এমন-কি স্বাধীন বাংলাদেশও শরৎচন্দ্রের নিকট অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ। আজ সেই দরদী, মরমী, প্রিয় কথাশিল্পীর জন্মশতবার্ষিকী। আজ তাঁহার নিকট আমাদের ঋণ-শোধের দিন। হৃদয়ের শ্রদ্ধাভক্তি ভালোবাসা উজাড় করিয়া আমরা আজ তাঁহার জন্ম-শতবর্ষকে যথার্থ মর্যাদার সহিত পালন করিব এবং নিজেদের গৌরবান্বিত করিব। তাহার মধ্য দিয়া শরৎচন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী সার্থক হইয়া উঠিবে॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- বাংলা সাহিত্য ও শরৎচন্দ্র
- বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের দান
- দরদী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র

প্রবন্ধ-সূত্র : সূচনা। ভারতে জরুরী অবস্থা। গণতন্ত্রের প্রয়োজনে। বাক্‌-স্বাধীনতা। অর্থনৈতিক প্রয়োজনে : দুর্নীতি-দমন। বিশদফা কর্মসূচী। ফলাফল। উপসংহার।

৫৫. বর্তমান ভারতে জরুরী অবস্থা

স্বাধীনতা-লাভের আটাশ বছর পরে ভারতে এমন এক অদ্ভুত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, যখন দিকে দিকে আইন ও শৃঙ্খলা ভেঙে পড়তে থাকে। গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত সরকারকে অপসারিত করবার জন্য সরকারী কর্মচারী, পুলিশ, এমনকি সেনাবাহিনীকেও আইন অমান্য করবার জন্য উস্‌কানি দেওয়া হচ্ছিল। ফলে, সরকার যে সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচীর রূপায়ণে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তাকে বাধা দান করে দেশময় একটা হতাশার ভাব ছড়িয়ে দেবার অপচেষ্টা সূচিত হয়েছিল। তখন ১৯৭৫ সালের ২৬শে জুন পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্যে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়।

সূচনা

জরুরী অবস্থা ভারতে নতুন ঘটনা নয়। ইতিপূর্বে দু'দুবার ভারতে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হয়। ১৯৭১ সালে পাক-ভারত সংঘর্ষের সময় যে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হয়েছিল, তা এখনো বহাল আছে। তার ওপর আবার নতুন করে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে হলো। শান্তির সময়ে আভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলার প্রয়োজনে এবং দুর্নীতি-দমনে জরুরী অবস্থার ঘোষণা এই প্রথম।

ভারতে জরুরী অবস্থা

বর্তমান জরুরী অবস্থার বলে হিংসার রাজনীতিতে বিশ্বাসী চারটি রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। দলগুলি হলো রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ, আনন্দ মার্গ, জমাত-এ-ইসলামী এবং সি. পি. আই. [এম. এল.]। কোন ব্যক্তি যদি এইসব দল পরিচালনা করেন বা পরিচালনায় সাহায্য করেন, তাঁদের বিরুদ্ধে নতুন 'মিসা' আইন প্রয়োগ করা হবে। নতুন 'মিসা' আইনে জামিন, মুচলেকা বা অন্য কোন প্রকার মুক্তিদান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এইভাবে হিংসার রাজনীতি থেকে দেশকে, দেশের গণতন্ত্রকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

গণতন্ত্রের প্রয়োজনে

বাক্‌-স্বাধীনতা ভারতীয় সংবিধানের একটি পবিত্র অধিকার। কিন্তু অধিকার মানে তো আর স্বেচ্ছাচারিতা নয়। দেখা গেছে, 'বাক্‌-স্বাধীনতা দেশের কয়েকটি সংবাদপত্র দারুণভাবে অপপ্রয়োগ করেছে।' তাই সরকারকে সব সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে 'সেন্সার'-পদ্ধতি চালু করতে হয়। বর্তমানে ভিত্তিহীন গুজব, কিংবা সরকারী কর্মচারী এবং সশস্ত্র বাহিনীতে অসন্তোষ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে, এমন কোন সংবাদ বা মন্তব্য প্রকাশ বে-আইনী।

বাক্‌-স্বাধীনতা

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জরুরী অবস্থার প্রয়োগ খুবই ব্যাপক। আগেকার 'মিসা' আইনে অনেক অর্থনৈতিক অপরাধী বেকসুর খালাস পেয়ে নতুন উদ্যমে চোরাই কারবার, কর-ফাঁকি ইত্যাদি সমাজ-বিরোধী কাজে লিপ্ত হতো। কিন্তু নতুন 'মিসা'

আইনে কাউকে গ্রেপ্তারের কারণ দেখাতে হবে না, জামিনে মুক্তি লাভেরও উপায় নেই। সরকার নতুন 'মিসা' আইনে এক হাজারেরও বেশী অর্থনৈতিক অপরাধীকে আটক করেন। যারা পলাতক, তাদের সম্পত্তি পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সেই সঙ্গে 'কালো টাকা' উদ্ধারের অভিযান জোরদার করা হয়। অন্যদিকে, নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন ও যোগান অব্যাহত রাখার জন্যে জরুরী নির্দেশ দেওয়া হয়। সমস্ত দোকানে দ্রব্যের মূল্য ও মজুতের হিসাব টাঙিয়ে রাখতে হবে।

অর্থনৈতিক প্রয়োজনে: দুর্নীতি-দমন

সেই সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচীর রূপায়ণে জরুরী অবস্থা প্রয়োগ করা হয়েছে। সেজন্যে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী বিশদফা কর্মসূচী জরুরী ভিত্তিতে রূপদানের জন্যে সরকারের হাতে তুলে দিয়েছেন। এই কর্মসূচীর লক্ষ্য হলো শোষিত জনশ্রেণীকে শোষণের হাত থেকে রক্ষা করে এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করে যথার্থ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। ভূমি-সংস্কার সফল করে, কর-ফাঁকি বন্ধ করে, পণ্যমূল্য হ্রাস করে, নিম্ন আয়ের মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে করের আওতার বাইরে রেখে, বেকার সমস্যার সমাধান করে এবং ছাত্রদের সুলভে বইপত্র ও অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি যোগান দিয়ে সরকার নতুন এক অর্থনৈতিক সংগ্রামের সূচনা করেছেন।

বিশদফা কর্মসূচী

জরুরী অবস্থার কতকগুলি জরুরী ফল পাওয়া গেছে: এক. পণ্যের যোগান অব্যাহত আছে। দুই. পণ্যমূল্য কমতির দিকে। তিন. জিনিসপত্রের দাম কমে যাওয়ায় এবং ঋণশোধ স্থগিত রাখায় গ্রামের কৃষক ও কারিগরেরা স্বস্তি পেয়েছে। চার. আট হাজার টাকা পর্যন্ত আয়কর মুক্ত হওয়ায় স্বস্তি পেয়েছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীও। পাঁচ. ভূমিহীন কৃষকেরা বাসগৃহ তৈরীর জন্যে জমি পেয়েছে। ছয়. সংবাদপত্রে 'সেন্সার' প্রথা চালু হওয়ায় সরকার সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচীর রূপায়ণে পুরোপুরি মনোযোগ দিতে পারছেন। সাত. কালো টাকাকে জব্দ করা সম্ভব হচ্ছে। আট. চোরাই চালানের বহর কমেছে। নয়. উদ্বৃত্ত জমির সংগ্রহ ও বণ্টন সহজ হয়েছে। এবং দশ. বেকার-সমস্যার আংশিক সমাধানে ধীরে ধীরে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে।

ফলাফল

স্বাধীনতালাভের পর কাজ যত না হয়েছে, বাগ্‌বিস্তার হয়েছে অনেক বেশী। এবার আর বাগ্‌বিস্তার নয়, কাজের কাজ করার পালা। জরুরী অবস্থা সেই সুযোগ সরকারের হাতে এনে দিয়েছে। আমরা আশাকরি, সরকার তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে দেশে গরিবী, অসাম্য, বিশৃঙ্খলা, বেকারত্ব ও অশিক্ষা দূর করে সুন্দর একটি সমাজ-ব্যবস্থা জনগণের হাতে তুলে দিতে পারবেন॥

উপসংহার

—

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- জরুরী অবস্থা কি ও কেন
- জরুরী অবস্থার সুফল

প্রবন্ধ-সূত্র ঃ সূচনা। বিশদফা কর্মসূচী রচনা। বিশদফা কর্মসূচীর খুঁটিনাটি। উপসংহার।

প্রধানমন্ত্রীর বিশদফা কর্মসূচী ও তাহার রূপায়ণ

সূচনা

স্বাধীনতা-লাভের পর দীর্ঘ আটাশ বছর কেটে গেছে। ইংরেজ জাতির দুশো বছরের শাসনে ও শোষণে ভারতের অর্থনীতি এক সর্বস্বান্ত অবস্থায় পৌচেছিল। স্বল্পতম কৃষি-উৎপাদন, অপরিকল্পিত কিছু কলকারখানা, অন্নাভাব, পণ্যাভাব, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য, বেকার-সমস্যা, ধন-বৈষম্য ইত্যাদি উপহার দিয়ে ইংরেজ জাতি এদেশ থেকে বিদায় গ্রহণ করে। স্বাধীনতা-লাভের পর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করবার জন্যে দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছিল। দিকে দিকে নানা কর্মকাণ্ড শুরু হয়ে যায়। তারপর গৃহীত হলো সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী। কিন্তু দেশের বিত্তশালী সম্প্রদায় নানাভাবে সেই কর্মসূচীকে বানচাল করে দেবার চক্রান্ত করতে থাকে। অবশেষে ১৯৭৫ সালের ২৬শে জুন দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে সরকার জরুরী ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচীর রূপায়ণে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে এলেন। বিশদফা কর্মসূচী হলো সেই অর্থনৈতিক প্রগতির প্রতীক।

বিশদফা কর্মসূচী রচনা

এই কর্মসূচীর রচয়িত্রী হলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। তিনি উপলব্ধি করেছেন, অযথা বাগ্‌বিস্তারে বহু বছর কেটে গিয়েছে। নানা চক্রান্তে সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচীর রূপায়ণ বানচাল অথবা বিলম্বিত হয়েছে। দেশের দরিদ্র এবং অনুন্নত সম্প্রদায় যে তিমিরে, সেই তিমিরে পড়ে আছে। কাজেই, অযথা বাগ্‌বিস্তারের সময় আর নেই। বিত্তশালীদের চক্রান্ত বানচাল করে এখনই সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচীর রূপায়ণে কাজের কাজ শুরু করা চাই। নইলে, ভারতের অর্থনৈতিক পুনর্জাগরণ নেই। এক বলিষ্ঠ ভারত-গঠনই শ্রীমতী গান্ধীর স্বপ্ন। সেই স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেবার জন্যে তিনি প্রণয়ন করলেন বিশদফা কর্মসূচী এবং সরকার ও জনগণকে নিষ্ঠার সঙ্গে তার রূপায়ণে করলেন অনুপ্রাণিত।

বিশদফা কর্মসূচীর খুঁটিনাটি

কর্মসূচীগুলি হলো : এক. নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির দাম কমাবার জন্যে সেগুলির উৎপাদন, সংগ্রহ ও বণ্টন-ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুতর করতে হবে। সেজন্য সরকারী ব্যয়-বাহুল্য হ্রাস করতে হবে। দুই. যে সব জমি চাষের যোগ্য, তাদের মালিকদের হাতে কত পরিমাণ জমি থাকবে, তা বেঁধে দেওয়া হয়েছে ; তাকে কার্যকর করে উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে। তিন. ভূমিহীন ও অনুন্নত শ্রেণীর মানুষদের গৃহ-নির্মাণের জন্যে দ্রুত জমির ব্যবস্থা করে দিতে হবে। চার. বেগার-প্রথা বা পারিশ্রমিক ছাড়া বাধ্যতামূলক শ্রমিক-প্রথাকে অবৈধ ঘোষণা করা হবে। পাঁচ. গ্রামের ভূমিহীন

কৃষক, ছোট চাষী এবং হস্তশিল্পের কারিগরদের ঋণ শোধ স্থগিত রাখা হবে। ছয়. কৃষি-শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী আইনের পর্যালোচনা করা হবে। সাত. আরো পঞ্চাশ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচের সুবিধা সম্প্রসারিত করা হবে। এবং ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহার করবার জন্যে একটি জাতীয় কার্যসূচী গ্রহণ করা হবে। আট. বিদ্যুৎ-উৎপাদনের কর্মসূচীকে দ্রুত রূপায়িত করতে হবে এবং সমস্ত তাপবিদ্যুৎ-কেন্দ্রগুলিকে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে আনা হবে। নয়. হস্তচালিত তাঁতশিল্পের উন্নয়ন-প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। দশ. সাধারণের ব্যবহারযোগ্য কাপড়ের মান ও সরবরাহের ব্যবস্থা উন্নত করা হবে। এগারো. শহরে খালি জমির মালিকানা ও বসতবাটির ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দেওয়া হবে। বারো. শহরের বড় বড় বাড়িগুলির মূল্য নির্ধারণ করা হবে ও কর-ফাঁকি বন্ধ করবার জন্যে বিশেষ বাহিনী গড়া হবে। তেরো. অর্থনৈতিক অপরাধীদের সরাসরি বিচার ও কঠোর শাস্তিদানের ব্যবস্থা করা হবে। চৌদ্দ. চোরাই-চালানদারদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবার জন্যে বিশেষ আইন রচনা করা হবে। পনেরো. বিনিয়োগপদ্ধতি সহজ করে আমদানি লাইসেন্সের অপব্যবহার বন্ধ করা হবে। ষোলো. কলকারখানায় কর্মী-সমিতির জন্যে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। সতেরো. সড়ক-পরিবহণের জন্যে জাতীয় পারমিটের ব্যবস্থা করা হবে। আঠারো মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্ষেত্রে আট হাজার টাকা পর্যন্ত আয়কর ধরা হবে না। উনিশ. ছাত্রদের জন্যে সুলভ মূল্যে নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং বইপত্র সরবরাহ করা হবে। কুড়ি. কর্ম-সংস্থান ও প্রশিক্ষণ-ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করা হবে এবং এ ব্যাপারে সমাজের অনুন্নত সম্প্রদায়ের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হবে।

এইভাবে বিশদফা কর্মসূচীর দ্বারা সমাজের সকল অংশকে স্পর্শ করা হয়েছে। কি দরিদ্র কৃষক, কি ক্ষুদ্র চাষী, কি অনুন্নত সম্প্রদায়, কি মধ্যবিত্ত শ্রেণী—সকলেই এই বিশদফা কর্মসূচীর দ্বারা উপকৃত হবে। আর, যারা চোরাই কারবারী, যারা কর-ফাঁকি দেয়, তারা এর দ্বারা জব্দ হবে।

উপসংহার

কাজেই, এবার আর অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল ধনীদের প্রাসাদে প্রবাহিত হয়ে যাবে না, যাবে দরিদ্রের পর্ণকুটিরে—সকল মানুষের ঘরে—সমানভাবে। ফলে, বলিষ্ঠ ও সুখী সমাজ স্থাপনের স্বপ্ন সফল হবে॥

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- বিশদফা কর্মসূচীর গুরুত্ব
- সমাজতন্ত্র ও বিশদফা কর্মসূচী
- বিশদফা কর্মসূচীর সাহায্যে গরিবি হটাও

প্রবন্ধ-সূত্র : সূচনা। আর্যভট্ট। জন্মস্থান ও জন্মকাল। পৃথিবীর আহ্নিক-গতি আবিষ্কার। 'আর্যভট্টীয়'। সমালোচনা। কৃত্রিম উপগ্রহ—আর্যভট্ট। কার্যকারিতা ও দ্বিতীয় উপগ্রহ—রোহিণী। উপসংহার।

৫৭. ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ : আর্যভট্ট

সূচনা

প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান-সাধনার ধারাকে ধ্বংস করে কূটকুশলী ইংরেজ জাতি প্রচার করেছিল যে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এদেশ চিরকালই অনুন্নত; আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতের যেটুকু উন্নতি তা ইংরেজ জাতির সঙ্গে যোগাযোগের প্রত্যক্ষ সুফল। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, ভারত অতি প্রাচীনকাল থেকেই বিজ্ঞান-সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিল; তাঁর আর্যভট্ট, ভাস্করাচার্য, নাগার্জুন প্রমুখ বিজ্ঞানীরা বিশ্ব-বিজ্ঞানকে তাঁদের গবেষণা ও আবিষ্কার দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন।

আর্যভট্ট

সে কথা স্বীকার করতে আধুনিক য়ুরোপের আত্মসম্মান ক্ষুন্ন হতে পারে। কিন্তু মহাবিশ্ববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারত সেদিন যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল, তা আজ প্রমাণিত হয়ে গেছে। আর আশ্চর্যের বিষয়, ভারতই পৃথিবীতে প্রথম প্রমাণ করে যে, সূর্য নয়, পৃথিবীই নিজের মেরুরেখার ওপর ভর দিয়ে পশ্চিম দিক থেকে পুব দিকে ঘুরছে। ভারত একথা প্রমাণিত করবার প্রায় হাজার বছর পরে য়ুরোপের পোল্যাণ্ডের অধিবাসী নিকোলাস কোপারনিকাস বৈজ্ঞানিক তথ্যের সাহায্যে প্রমাণ করলেন ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কৃত সত্যটিকে। যে ভারতীয় বৈজ্ঞানিক পৃথিবীর আবর্তনের সত্যটিকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তাঁর নাম আর্যভট্ট।

জন্মস্থান ও জন্মকাল

তখন ভারতে গুপ্ত সম্রাটদের শাসনকাল। ভারতের ইতিহাসে ঐ সময়টি 'স্বর্ণযুগ' নামে চিহ্নিত। সেই স্বর্ণযুগে ৪৭৬ খ্রীস্টাব্দে পৃথিবীর একটি অনুদ্‌ঘাটিত সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করবার জন্যে মগধ রাজ্যের কুসুমপুরে জন্মগ্রহণ করেন আর্যভট্ট। মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রের অদূরে অবস্থিত ছিল কুসুমপুর। বর্তমানে স্থানটি উত্তর বিহারের অন্তর্গত।

পৃথিবীর আহ্নিক-গতি আবিষ্কার

অতি শৈশব থেকেই আর্যভট্ট মহাকাশের গ্রহনক্ষত্র এবং অঙ্কশাস্ত্রের প্রতি ছিলেন বিশেষ অনুরাগী। প্রথম যৌবনেই তিনি এই দুটি বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে সাফল্য লাভ করেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান ও অঙ্কশাস্ত্র—এই দুটি বিষয় পরস্পর-বিরোধী নয়; বরং তারা পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। আর্যভট্ট তাই প্রথম থেকেই একসঙ্গে দুটি বিষয়ের গবেষণা শুরু করেন। তার ফল-পরিণাম হলো, পৃথিবীর আহ্নিক-গতির আবিষ্কার। তিনিই প্রথম আবিষ্কার করলেন, পৃথিবী প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় নিজের মেরুদণ্ডের ওপর পশ্চিম থেকে পুবে একবার আবর্তন করে। তার ফলে দিনরাত্রি হয় এবং তার ফলে মনে

হয়, সূর্য পূবদিকে উদিত হয় ও পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। আসলে, সূর্যের উদয়াস্ত বলে কিছু নেই। আহ্নিক-গতির ফলে পৃথিবীর আবর্তনের জন্যে ওটা মানুষের দৃষ্টিভ্রম মাত্র।

শুধু আহ্নিক-গতি আবিষ্কারই নয়, অঙ্কশাস্ত্রেও আর্যভট্ট বহু সূক্ষ্ম বিষয়ের আবিষ্কর্তা। অনেকের মতে, তাঁর শ্রেষ্ঠগ্রন্থ 'আর্যভট্টীয়' মাত্র তেইশ বছর বয়সে লেখা হয়। এতেই পৃথিবীর আহ্নিক-গতির কথা প্রথম লিপিবদ্ধ হয়। তাছাড়া, এতে আছে অঙ্কশাস্ত্রের বহু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়। 'আর্যভট্টীয়' মাত্র ১২৩টি শ্লোকের সংকলন। শ্লোকগুলি চারটি ভাগে বিভক্ত। দশগীতিকা, কালক্রিয়া, গোলপাদ এবং গণিতপাদ। দশ-গীতিকা, কালক্রিয়া এবং গোলপাদে পৃথিবীর এবং অন্যান্য গ্রহনক্ষত্রের কথা আলোচিত হয়েছে। আর, গণিতপাদে অঙ্কশাস্ত্রের বর্গমূল, ঘনমূল, সমীকরণ, ত্রৈরাশিক ইত্যাদি বিষয় নিয়ে এবং অঙ্কশাস্ত্রের অন্যান্য রীতিপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি যেভাবে সময়ের অতি-বিশাল ও অতি-সূক্ষ্ম হিসাব দেখিয়েছেন, তা আধুনিক বৈজ্ঞানিকদেরও বিস্ময় উদ্রেক করে। তিনি মিনিট-সেকেণ্ডের চেয়েও সূক্ষ্মতর কাল-বিভাগ দেখিয়েছেন; তেমনি এক মহাযুগে অর্থাৎ ৪,৩২০,০০০ বছরে পৃথিবী কতবার আবর্তিত হবে, তাও হিসেব করে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর গ্রন্থেই প্রথম শূন্যের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। অঙ্কশাস্ত্রে তিনিই শূন্যের প্রথম আবিষ্কর্তা।

'আর্যভট্টীয়'

অথচ আর্যভট্টের আবিষ্কার প্রচলিত ধারণার সঙ্গে না মেলায় অচিরে তা প্রবল সমালোচনার সম্মুখীন হয়। ভাস্করাচার্য তাঁর কঠিন সমালোচনা করে মাটিতে একটি দণ্ড পুঁতে দিয়ে এবং তার মাথায় একখানা নিশান উড়িয়ে দিয়ে সর্বসমক্ষে দেখালেন, আর্যভট্টের আবিষ্কার ভুল; কারণ, নিশানের মুখ বরাবর পশ্চিম দিকে না হয়ে হাওয়ার গতি যখন যেদিক, সেদিকেই হতে লাগলো। কাজেই, পৃথিবী যে গোলাকার এবং তার যে আহ্নিক-গতি আছে, তা অস্বীকৃত হলো। এইভাবে এক ভুল প্রমাণের দ্বারা আর্যভট্ট বাতিল হয়ে যান

সমালোচন

কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান বিস্ময়ের সঙ্গে স্বীকার করেছে, আর্যভট্টই নির্ভুল। তাই আধুনিক ভারত প্রাচীন ভারতের সেই সুমহান্ বৈজ্ঞানিকের অবিস্মরণীয় নামটিকে মহাকাশের পাতায় আলোকের অক্ষরে লিপিবদ্ধ করবার জন্যে ১৯৭৫ সালের ১৯শে এপ্রিল অর্থাৎ আর্যভট্টের জন্মের ঠিক দেড হাজার বছর পরে মহাকাশে তার প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহটি স্থাপিত করে এবং তার নামাঙ্কিত করে 'আর্যভট্ট'। এই 'আর্যভট্টে'র পরিকল্পনা, নির্মাণ-কৌশল এবং তার কার্যকারিতা—সমস্তই ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্দেরই একনিষ্ঠ সাধনার ফল। তাকে তার কক্ষপথে স্থাপন করেছে যে শক্তিশালী রকেট, তাতেও রয়েছে ভারতীয় কৃতিত্বের স্বাক্ষর। উপগ্রহ 'আর্যভট্ট' ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থাকে মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের নানা খুঁটিনাটি তথ্য সরবরাহ করবে এবং আবহমণ্ডলের নানা সংবাদ জানিয়ে মানুষের অনাগত বিপদ-আপদ সম্বন্ধে পূর্বাহ্লেই সতর্ক করে দেবে।

কৃত্রিম উপগ্রহ—'আর্যভট্ট'

আর্যভট্ট এখন প্রতি মিনিটে পাঁচবার পাক খাচ্ছে এবং কক্ষপথে তার গতি সেকেণ্ডে প্রায় আট কিলোমিটার। আর্যভট্ট টেলিভিশনযোগে তার গ্রাউণ্ড স্টেশনে যে তথ্য সরবরাহ করে চলেছে, তাতে আবহবিজ্ঞান, জলবিজ্ঞান এবং মহাসমুদ্র-বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্ভব হচ্ছে। এর দ্বারা এই সব বিজ্ঞানকে অধিকতর কার্যকরভাবে মানুষের সেবায় লাগানো যাবে। তাছাড়া, গণ-শিক্ষায়ও আর্যভট্টকে কাজে লাগানো যায়। সুদূর গ্রামাঞ্চলে যেখানে আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পরিধি ব্যাপ্ত হয়নি, সেখানে কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সেবা পৌঁছিয়ে দেওয়া যায়। মোট কথা, আর্যভট্টের সাফল্য আজ ভারতের প্রযুক্তি-বিজ্ঞানীদের সামনে বহু পথ খুলে দিয়েছে।

কার্যকারিতা ও দ্বিতীয় উপগ্রহ—রোহিণী

মহাকাশে আর্যভট্টের আয়ু আর মাত্র এক বছর। ইতিমধ্যে সে প্রায় ৫৫ হাজার বার তার পৃথিবী-পরিক্রমা সমাপ্ত করেছে। দু'বছর কাল মহাকাশে সফল পরিক্রমণের শেষে আর্যভট্টের কার্যকারিতা সমাপ্ত হবে। তারপর ধ্বংস হবার আগে সে প্রায় আট বছর মহাকাশে থাকবে। কিন্তু তার আগেই ১৯৭৮ সালে ভারত তার দ্বিতীয় কৃত্রিম উপগ্রহ রোহিণীকে মহাকাশে পাঠাবে। চল্লিশ কিলোগ্রাম ওজনের রোহিণীকে তার কক্ষপথে স্থাপন করবে ভারতের প্রথম নিজস্ব তৈরী রকেট—এস. এল. ভি—৩।

বর্তমান ভারত তার সুমহান্ বৈজ্ঞানিক আর্যভট্টের মূল্যবান উত্তরাধিকার গ্রহণ করেছে এবং মহাকাশ গবেষণায় আর্যভট্টের প্রদর্শিত পথে নতুন যুগের সূচনা করেছে। ভারতের এই সাধনা সফল হোক। বর্তমান ভারত মহাকাশের রহস্য ভেদ করবার জন্যে যে নতুন সিংহদ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে, তা-ই হবে আগামীকালের মহাকাশ গবেষণার প্রবেশ পথ এবং সেই সিংহদ্বারের নাম অন্য কিছু নয়—'আর্যভট্ট' ॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- ভারতের মহাকাশ গবেষণা
- প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান-সাধনা
- 'আর্যভট্ট' কি ও কেন ?

৫৩.

পরীক্ষার পূর্বরাত্রি

সূচনা ॥ পরীক্ষার পূর্বরাত্রির কথা ভোলা যায় না। **ভয়াবহতা** ॥ মনের মধ্যে একটা ভয়ের চলাফেরা। **অনিশ্চয়তা** ॥ কি হবে, প্রশ্ন সহজ না কঠিন হবে, প্রশ্ন আমার জানার মধ্যে না অজানা, আমি কেমন উত্তর করতে পারবো—এমনি অসংখ্য অনিশ্চয়তা আমাকে বিহ্বল করে তুলেছিল। **স্মৃতিশক্তির প্রতি অবিশ্বাস** ॥ মনে হয়, স্মৃতিশক্তি যেন প্রতারণা করছে। কিছুই মনে থাকছে না। যা পড়ছি, সব ভুলে যাচ্ছি। যা মনে আছে, তাও যদি পরীক্ষা-মন্দিরে মনে না পড়ে—এমনি নানা অবিশ্বাসে মন থাকে দোদুল্যমান। **পরীক্ষা-মন্দিরের ভীতি** ॥ পরীক্ষা-মন্দিরের অবধায়ক বা প্রহরীরা কেমন হবেন? তাঁদের আচরণই বা কেমন হবে—ঈশ্বর জানেন। **রাত্রিতে দুঃস্বপ্ন** ॥ এইসব ভয়, অনিশ্চয়তা ও অবিশ্বাস পরীক্ষার পূর্বরাত্রিতে দুঃস্বপ্নের আকারে দেখা দেয়। **উপসংহার** ॥ সকাল হয়। দুঃস্বপ্নের অবসান হয়। বুক টিপটিপ করতে থাকে। কি জানি, কি হবে? অবশেষে একটা প্রাণহীন যন্ত্রের মতো পরীক্ষা-মন্দিরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে থাকি ॥

৫৪.

পরীক্ষা-কক্ষের বর্ণনা

সূচনা ॥ একটা থমথমে ভয় এবং প্রবল উৎকণ্ঠা নিয়ে পরীক্ষা-কক্ষে প্রবেশ করি। **পরীক্ষা-আরম্ভের পূর্বে** ॥ সবাই বইখাতা নিয়ে তাতে দ্রুত শেষবারের মতো চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে। শিক্ষক বা অভিভাবকেরা শেষবারের মতো বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন 'অত্যন্ত প্রয়োজনীয়' প্রশ্নটা। ছাত্রের গলা শুকিয়ে আসছে। সে ঘন ঘন জল খায়। **পরীক্ষা-আরম্ভ** ॥ পরীক্ষা-আরম্ভের সংকেত-ঘণ্টা বেজে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক-অভিভাবকেরা বাইরে চলে যান। পরীক্ষার্থীরা বইখাতা তুলে দেয় পরীক্ষা-অবধায়কদের হাতে। পরীক্ষার খাতা আসে, আসে প্রশ্নপত্র। বুকের স্পন্দন বাড়তে থাকে। **কক্ষের বর্ণনা** ॥ যে যার আসনে মাথা নীচু করে উত্তর লেখার

ব্যস্ত। চারদিকে খসখস শব্দ। তাছাড়া এক গভীর নিস্তব্ধতা। তার মধ্যে পরীক্ষা-অবধায়কদের মসমস জুতোর শব্দে, কেউ পরীক্ষার নিয়মভঙ্গ করলে তার প্রতি নিক্ষিপ্ত হয় তাঁদের কঠোর নিষেধ-বাক্যে—হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। কোন পরীক্ষার্থীর অতিরিক্ত কাগজ বা তৃষ্ণার জল প্রার্থনা। **উপসংহার॥** ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেজে চলে। সমাপ্তির সময় নিকটবর্তী হয়। কতগুলি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে বা দেওয়া যায়নি, তার হিসেব মিলিয়ে কেউ হয় আনন্দিত, কেউ বা নিরানন্দ॥

৫৫.
একটি ক্রিকেট ম্যাচ

সূচনা॥ কলকাতার ইডেন গার্ডেনে ভারত ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচের স্মৃতি আমি কোনদিন ভুলতে পারব না। **মাঠে প্রবেশ॥** অতি কষ্টে একখানি টিকিট সংগ্রহ। মাঠে প্রবেশ করে আসন সংগ্রহ। চারদিকে ক্রিকেট-উৎসাহী মানুষ, বিজ্ঞাপন, ব্যানার, হই-চই। সবার মনেই জিজ্ঞাসা—কে টসে জিতবে? **খেলা-আরম্ভ॥** ভারত টসে জিতল। গাভাসকার ও ইঞ্জিনিয়ার ইনিংসের সূচনা করতে এলো। **বিপর্যয়॥** মাত্র বত্রিশ রানে ভারতের তিনটি উইকেটের পতন। মাঠে হতাশা ও বিষণ্ণতা। কিন্তু ভারত শেষ পর্যন্ত প্রথম ইনিংস ৩২৫ রানে শেষ করল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৩৬২। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত ৪১০। কিন্তু ওয়েস্ট ইণ্ডিজ মাত্র ১৫৩। ভারতের জয় ২২০ রানে। **উপসংহার॥** পাঁচদিনই মাঠে গিয়েছি। মাঝখানে একদিন বিরতি। ক্রিকেটের গৌরবময় অনিশ্চয়তা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করেছি॥

৫৬.
একটি দুর্ঘটনা

সূচনা॥ দুর্ঘটনামাত্রই আকস্মিক এবং ভয়াবহ। কিন্তু কোন কোন দুর্ঘটনা সব আকস্মিকতা ও ভয়াবহতাকে ছাড়িয়ে যায়। **দুর্ঘটনার বিবরণ॥** আমি স্কুলের পথে। লোহার পাত নিয়ে একটা লরী। পেছন থেকে একটি মোটর সাইকেলের তাকে অতিক্রম করবার চেষ্টা। হঠাৎ একটি লোহার পাত পড়লো মোটর সাইকেল আরোহীর ঘাড়ে। আরোহীটি ছিলেন একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক। মুহূর্ত-মধ্যে তাঁর শিরশ্ছেদ। কিন্তু মুণ্ডহীন শরীর মোটর সাইকেলটি চালিয়ে নিয়ে চলেছে। তা দেখে পথচারীদের ভয়ে দৌড়। রাস্তায়, দোকানে, বাড়ির ঝুলবারান্দায় দারুণ প্রতিক্রিয়া। শেষে একটি বাতিস্তম্ভে ধাক্কা খেয়ে মোটর সাইকেলের ভগ্নদশা।

উপসংহার ॥ পরদিন খবরের কাগজে সংবাদ। ছবি? ভয়ে কেউ ছবি তুলতে পারেনি। দুজন ফটোগ্রাফার ছবি তুলতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যায় ॥

৫৭.

বর্ষায় পল্লীগ্রাম

সূচনা ॥ পল্লী-অঞ্চলই প্রকৃতির বিহার-ভূমি। **বর্ষা-সমাগম** ॥ প্রখর গ্রীষ্মের পর যখন বর্ষা আসে, পল্লীগ্রামের দিগন্তজোড়া আকাশে তার অপরূপ রূপের বিস্তার। **সৌন্দর্য** ॥ মেঘ-গর্জন, বিদ্যুৎ-বিকাশ এবং বাতাসের হাহাকারের মধ্যে বৃষ্টি নামে। মাঠ, ঘাট, নদীনালা, খালবিল, দীঘি-পুষ্করিণী সব জলময়। গাছপালার রং গাঢ় সবুজ, মাঠের রং কচি ধানের চারাগাছে সবুজ। মাঠে মাঠে কৃষকদের গলায় গান। ধান্য-রোপণ, বৃক্ষ-রোপণ। আকাশে বকের সারি। বনে বনে পাখীর কূজন। **অসুবিধা** ॥ পথঘাট কর্দমাক্ত, নোংরা, পিচ্ছিল। কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড ইত্যাদি রোগের প্রাদুর্ভাব। বৃষ্টির জন্য হাটবাজার বসে না। কৃষি-শ্রমিকেরা বেকার। ঘরে ঘরে অভাব, দৈন্য, দুর্দশা। সাপের উৎপাত। **উপসংহার** ॥ সব জিনিসেরই ভালো এবং মন্দ দুটি দিক আছে। পল্লী-গ্রামের বর্ষার দুটি দিক প্রায় সমান-সমান ॥

৫৮.

বন্যপ্রাণী-সংরক্ষণ

সূচনা ॥ ভারতের বন্যপ্রাণীগুলির বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। **ভারতের বন্য-প্রাণীর বৈশিষ্ট্য** ॥ ভারতের রেওয়ার সাদা বাঘ, সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার আর চিতা-হরিণ, কুমায়ুনের মানষখেকো বাঘ, জলদাপাড়ার গণ্ডার এবং আসামের হাতীর বিশ্ব-মর্যাদা আছে। **ব্রিটিশ আমলে সংরক্ষণের অভাব** ॥ ব্রিটিশ আমলে এই প্রাণীগুলিকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে। **স্বাধীন ভারতে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ** ॥ স্বাধীন ভারতে এইসব বন্যপ্রাণীর হত্যার বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে এবং একটি কেন্দ্রীয় সুগঠিত সরকারী বিভাগের হাতে তাদের সংরক্ষণের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে। শুধু তাই নয়, ভারতের বিভিন্ন স্থানে 'অভয়-অরণ্য' স্থাপন করে তাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। **সংরক্ষণের সুবিধা** ॥ পশুশালায় কৃত্রিম পরিবেশের চেয়ে 'অভয়-অরণ্যে'র প্রাকৃতিক পরিবেশে বন্য পশুরা স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দভাবে বিচরণ করতে পারে। এইসব পশুদের দেখিয়ে ভ্রমণার্থীদের কাছ থেকে বিদেশী মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। **উপসংহার** ॥ বন্যপশু-হননের অর্থ প্রকৃতিকে হনন। বন্যপশু-সংরক্ষণের অর্থ প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সংরক্ষণ ॥

৫৯.

পক্ষীর আলয়

সূচনা ॥ 'পক্ষীর আলয়' কথাটির অর্থ প্রাকৃতিক পরিবেশে পক্ষী-নিবাস। **পক্ষীর আলয়** ॥ প্রকৃতির কোন কোন নিরালা পরিবেশ পাখীদের অত্যন্ত প্রিয়। লোকবসতি থেকে দূরে—শান্ত বনভূমি, জলের সান্নিধ্য—এসব পাখীদের খুবই পছন্দ। তাই তারা সেরূপ জায়গায় দল বেঁধে বাস করে। **বিচিত্র সব পাখী** ॥ নানা জাতের পাখী সে সব জায়গায় ভিড় করে। তাদের কলকাকলিতে স্থানটি পরিপূর্ণ থাকে। **দেশী-বিদেশী পাখী** ॥ শুধু দেশী পাখীরাই সেখানে ভিড় করে না, বহু বিদেশী পাখীও সেখানে যাতায়াত করে। হাজার হাজার মাইল দূর থেকে দল বেঁধে তারা বছরের নির্দিষ্ট সময়ে এখানে উড়ে আসে। আবার, নির্দিষ্ট সময় অন্তে তারা ফিরে যায়। টিকিট কাটতে হয় না, বাক্স গোছাতে হয় না। এরা সব বিনে-পয়সার ভ্রমণকারী। **ব্রিটিশ আমলে পক্ষী-সংরক্ষণ** ॥ ব্রিটিশ আমলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতীক এই পাখীদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে। **স্বাধীন ভারতে পক্ষীর আলয়** ॥ স্বাধীন ভারতে এদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 'পক্ষীর আলয়' তার নিদর্শন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রাকৃতিক পরিবেশে 'পক্ষীর আলয়' আছে। **উপসংহার** ॥ 'পক্ষীর আলয়' মানুষের প্রকৃতি-প্রীতির প্রতীক ॥

৬০.

বাংলার যে-কোন একটি উৎসব

সূচনা ॥ দুর্গোৎসব বাংলার জাতীয় উৎসব। **সময়** ॥ বর্ষার পর শরৎকালেই এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। **প্রাকৃতিক পরিবেশ** ॥ মেঘমুক্ত সুনীল আকাশে উজ্জ্বল সূর্যকিরণ। ভোরে শিশিরপাত এবং শিউলি ফুলের সমারোহ। **প্রস্তুতি** ॥ মাসাধিক কাল থেকে প্রতিমা প্রস্তুত হতে থাকে। ঘরে ঘরে উৎসবের পোশাক-পরিচ্ছদ কেনার ধুম। শহরের রাস্তায় রাস্তায় পূজার বিজ্ঞাপন। **শুরু** ॥ যদিও শারদ শুক্লা-সপ্তমী থেকে দশমী এই উৎসবের কাল, তবু মহালয়ার পর থেকেই উৎসব শুরু হয়ে যায়। সুসজ্জিত মণ্ডপে প্রতিমা আনয়ন। পূজা, অঞ্জলি, ঢাক, মাইক, প্রতিদিন নতুন নতুন পোশাকে সাজসজ্জা। ঘরে ঘরে নানা সুখাদ্যের আয়োজন, মণ্ডপে মণ্ডপে প্রসাদ-বিতরণ, প্রতিমা-দর্শনার্থীদের ভিড়, ভিড়-নিয়ন্ত্রণে উদ্যোক্তাদের হয়রানি। **সমাপ্তি** ॥ দশমী সন্ধ্যায় প্রতিমা বিসর্জন। ভাসানের মিছিল। বিষাদ। **উপসংহার** ॥ দুর্গোৎসবের মতো কোন উৎসবই বাঙালীর হৃদয় ভরে আসে না, এতখানি শূন্য করে দিয়ে কোন উৎসব চলে যায় না ॥

৬১.

বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা ?

সূচনা ॥ মাতৃভাষাতেই আমাদের প্রাণের মুক্তি, হৃদয়ের আনন্দ। **মাতৃভাষার মূল্য ॥** সন্তানের কাছে মাতৃভাষার মূল্য অপরিসীম। এই ভাষাতেই মায়ের কোলে তার মুখের বুলি প্রথম ফুটেছিল। এই ভাষাতেই সে কত ছড়া, রূপকথা-উপকথার গল্প শুনেছে। **বাংলাভাষার গৌরব ॥** বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এই ভাষায় মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, জীবনানন্দ তাঁদের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ সম্পদ উজাড় করে দিয়ে গেছেন। **মাতৃভাষার দুঃসময় ॥** ব্রিটিশ শাসনে ইংরেজির দাপটে আমাদের মাতৃভাষার অন্তিম দশা উপস্থিত হয়েছিল। অনেক আন্দোলনের পর মাতৃভাষার মাধ্যমে পঠনপাঠন শুরু হয়েছে। কিন্তু দুঃসময় ঘনীভূত হয়েছিল তখনই, যখন মাতৃভাষার সন্তানেরা মাতৃভাষা ত্যাগ করে বিদেশী ভাষাকে গ্রহণ করতে শুরু করেছিল। **উপসংহার ॥** স্বাধীন বাংলাদেশ মাতৃভাষাকে সরকারী ভাষারূপে বরণ করেছে। আমরা কথায় তা করলেও কার্যতঃ এখনো তা করে উঠতে পারিনি—এ লজ্জা রাখবো কোথায় ?

৬২.

মহাভারতের তোমার ভালো-লাগা একটি চরিত্র

সূচনা ॥ মহাভারতে নানা চরিত্র নানা জনের ভালো লাগে। কারো ভালো লাগে যুধিষ্ঠিরকে, কারো ভালো লাগে অর্জুনকে, কারো ভালো লাগে ভীষ্মকে, কারো ভালো লাগে মহাবীর কর্ণকে। **আমার ভালো-লাগা ॥** আমার কিন্তু ভালো লাগে হলধর বলরামকে। **চরিত্রের বর্ণনা ॥** এই হলধর বলরাম হলেন শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ। মহাভারতে যখন সবাই হিংসা, ঈর্ষা, কপটতা, স্বার্থ-বিদ্বেষ ও জ্ঞাতি-কলহে লিপ্ত, তখন বলরাম নিরাসক্ত। সত্য ও ন্যায়ের পূজারী। **কেন ভালো লাগে ? ॥** কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সবাই যখন যুদ্ধলিপ্ত, বলরাম তখন সারা ভারতে তীর্থ-ভ্রমণের যাত্রী। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরও অর্ধসত্য বলেছেন, নিরপেক্ষ শ্রীকৃষ্ণ পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু বলরামই মহাভারতের একমাত্র নিষ্কলঙ্ক চরিত্র। দ্বৈপায়ন-হ্রদের তীরে ভীম-দুর্যোধনের গদাযুদ্ধের সময় ভীমের অন্যায়-যুদ্ধকে তিনি তাঁর অকপট ঘৃণা জানাতে দ্বিধা করেননি। **উপসংহার ॥** মহাভারতে এমন আদর্শ, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র বিরল ॥

৬৩.

দেশের সমৃদ্ধিতে বিজ্ঞানের দান

সূচনা ॥ আজ পৃথিবীতে যে সব দেশ বড় হয়েছে, তাদের উন্নতির মূলে রয়েছে বিজ্ঞানের অবদান। **বিজ্ঞান কি ? ॥** বিজ্ঞান হলো কোন বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান।

সেই জ্ঞান আহরণ করে মানুষ প্রকৃতিকে আজ জয় করেছে এবং তাকে মানুষের সেবায় লাগিয়েছে। **কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞান॥** বিজ্ঞান আজ কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধিতে হাত লাগিয়েছে। ট্রাক্টার, পাম্প, উৎকৃষ্ট বীজ, সার, ফসল-কাটা ও ঝাড়াই-মাড়াইর যন্ত্র বিজ্ঞানের অবদান। **শিল্পক্ষেত্রে বিজ্ঞান॥** বিজ্ঞান আজ নানা যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করে কলকারখানা স্থাপন করেছে। **পথ ও পরিবহণ॥** বিজ্ঞানের প্রসাদে আজ পথ ও পরিবহণের নানা উন্নতি হয়েছে। **স্বাস্থ্য ও শিক্ষা॥** বিজ্ঞানের অনুগ্রহে মানুষের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার জগতে নতুন অধ্যায় সূচিত হয়েছে। মানুষ অকাল-মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে, তেমনি অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে আলোর জগতে উত্তীর্ণ হয়েছে। **উপসংহার॥** বিজ্ঞানই দেশের সমৃদ্ধির গোপন চাবিকাঠি॥

৬৪.

বর্তমান ভারতে যুব-সমাজের কর্তব্য

সূচনা॥ যুব-সমাজই সকল দেশের নতুন আশা ও ভরসার প্রতীক। **ভারতে যুব-সমাজের দায়িত্ব॥** দীর্ঘদিনের পরাধীনতার অবসানে রাষ্ট্র-নেতৃত্ব যখন আমাদের দেশবাসীর হাতে এসে পড়লো, তখন সেই নেতৃত্ব স্বাধীনতার দীর্ঘ সংগ্রামে ক্লান্ত এবং বার্ধক্যের ভারে অবসন্ন। রাষ্ট্র-নেতৃত্বে এখন যুবশক্তিকে বড়ো প্রয়োজন। দেশগঠনের জন্যে এখন চাই সবুজ, সতেজ, প্রাণবন্ত যুব-সমাজকে। **ভারতে যুব-সমাজের কর্তব্য॥** গ্রামে, শহরে, কৃষিতে, শিল্পে—সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বত্র যুব-সমাজের রয়েছে অসীম কর্তব্য। **উপসংহার॥** দেশের জড়তা ও বার্ধক্যকে তারাই ঘুচাতে পারে। কিন্তু শৃঙ্খলাহীনতা দেশের নানা বিপদ ডেকে আনতে পারে। সেজন্য যুব-সমাজের সর্বাগ্রে শৃঙ্খলা ও সতর্কতা প্রয়োজন॥

৬৫.

সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণে ছাত্রদের ভূমিকা

সূচনা॥ ছাত্র-সমাজই দেশের প্রগতির প্রতীক, অগ্রগতির অগ্রদূত। **সামাজিক কুসংস্কার ও ছাত্র-সমাজ॥** যুগে যুগে সমাজ নানা কুসংস্কারে তার অগ্রগতির পথ হারিয়ে ফেলে। কিন্তু নবযুগের নতুন শিক্ষায়-দীক্ষায় ছাত্র-সমাজেরই প্রথম ঘুম ভাঙে। সারা সমাজ যখন কুসংস্কারের বোঝা বুকে নিয়ে অজগর-নিদ্রায় কাল কাটায়, তখন ছাত্র-সমাজের মনে আসে প্রথম জাগরণ, আসে কর্মের আহ্বান। **ভারতের ছাত্র-সমাজ॥** সনাতনপন্থী ভারত চিরকাল মান্ধাতার আমলের নানা কুসংস্কার নিয়ে অগ্রগতি থেকে পিছিয়ে পড়েছে। কিন্তু ভারতের ছাত্র-সমাজ বিশ্বের শিক্ষা-জগৎ থেকে শক্তি সঞ্চয় করে কুসংস্কারের ওপর আঘাত হেনেছে। **উপসংহার॥** ভারতের

ছাত্র-সমাজের ঐতিহ্য অত্যন্ত গৌরবময়। তারাই সমাজকে অতীতের নানা সামাজিক নাগপাশ থেকে মুক্ত করে অগ্রগতির পথ দেখিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও দেখাবে ॥

৬৬.

বিদ্যালয়ে শেষদিন

সূচনা ॥ আমাদের জীবনে বিদ্যালয়ের শেষদিনটি অশ্রুসিক্ত, বেদনায় বিধুর। **কেন অশ্রুসিক্ত ?** ॥ এই বিদ্যালয়ে আমার জীবনের মধুময় শৈশব পড়ে আছে। এর প্রতিটি কক্ষের সঙ্গে, প্রতিটি আসনের সঙ্গে আমার পরিচয়। আমার জীবনের কত আনন্দ-বিষাদের স্মৃতি এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে মিশে আছে। কত বন্ধুর বন্ধুত্ব, কত শিক্ষকের স্নেহ-শাসন-উপদেশ এখানে পেয়েছি। আজ সব পেছনে পড়ে রইলো। মিলনের মেলা ভেঙে গেল। সব ত্যাগ করে আমাকে চলে যেতে হচ্ছে—এক অজানা ভবিষ্যতে দিকে। **অনুষ্ঠান** ॥ আমরা এ বছরের বিদায়ী শ্রেণীর ছাত্র। আমাদের বিদায় জানাবার জন্যে আমাদের শিক্ষক ও অনুজেরা একটি বিদায়-অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ছাত্র-বন্ধুদের বিদায়-সম্ভাষণ, শিক্ষক মহাশয়দের আশীর্বাদ, ফুল এবং বিদায়-সংগীতে আমাদের জীবনের মধুরতম অধ্যায়ের ওপর যবনিকা নেমে এলো। **উপসংহার** ॥ বিদ্যালয়-জীবনের স্মৃতি আমাদের জীবনে চির-অক্ষয় হয়ে থাকবে ॥

অনুবাদ

১. The value of man's life is measured not by the number of years he had lived, but by the number of good deeds he has done. A man may live a longer life without doing any great or noble work that may benefit the world. Such a life is useless and man is forgotten as soon as he dies. But a man who does noble works for the benefit of mankind lives in the memory of the people even long after his death, though he may live a short life here. The great men like Jesus Christ, Sankaracharyya and Vivekananda died young, but they are still remembered with great reverence on account of their noble deeds.

সংকেত : The value of...measured : মানুষের জীবনের মূল্যের বিচার করা হয়। That may ..the world : জগতের ভালোর জন্যে। Useless : ব্যর্থ, নিরর্থক। As soon...dies : তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই। For the benefit of mankind : মানুষের ভালোর জন্যে। Lives in...his death : তাঁর মৃত্যুর পরেও দীর্ঘদিন মানুষ তাঁকে মনে করে রাখে। They are still...deeds : তাঁদের মহৎ কর্মের জন্যে আজও তাঁদের গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়।

২. When he was quite young, George Washington once desired to go to sea. Everything had been done for his departure. Then he went to take leave of his revered mother. As he approached her, he saw tears bursting from her affectionate eyes. Washington was quite able to understand the reason of the tears in his mother's eyes. He stood silent for a moment and then threw himself into her arms saying, "I will never go away to break my mother's heart."

At this his mother said to him, "George, God has promised to bless those children that honour their parents and I believe, He will bless you."

সংকেত : Desired : সংকল্প করেছিলেন। Departure to take leave...mother : তাঁর শ্রদ্ধেয়া মায়ের কাছে বিদায় নিতে। Approached : কাছে গেলেন। Tears...eyes : তাঁর স্নেহার্ত চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে। Was quite...eyes : তাঁর মায়ের চোখের অশ্রুমোচনের কারণ বুঝতে পারলেন। Threw himself...arms : মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। To break...heart : আমার মায়ের প্রাণে কষ্ট দিতে। Honours : ভক্তি করে। Will bless : আশীর্বাদ করবেন।

৩. The most pressing problem of India today, which requires immediate solution, is the problem of poverty. Millions of people in India are half-fed and ill-clad. The tillers of the soil live in the most appalling condition; they cannot reap the fruit of their labour. The people working in mills and factories live in grovelling poverty. They live huddled together in unclean huts, eat inedible food and die soon. Others who are a little higher in rank are much poorer than ordinary people in other countries. Progress of India means the betterment of the condition of those who form the vast majority of the population. The government is now trying to improve their conditions by implementing the 20-item scheme.

সংকেত : The most pressing problem : সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা। That requires...solution : যার জরুরী সমাধান চাই। Poverty : দারিদ্র্য। Millions : লক্ষ লক্ষ। Half-fed : অর্ধভুক্ত। Ill-clad : সামান্য বস্ত্রাবৃত। The most appalling : সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। Grovelling : দীনহীন। Huddled : গাদাগাদিভাবে। Inedible : অখাদ্য। In rank : সমাজে। Betterment : উন্নতি। The vast...population : জন-সংখ্যার বৃহৎ অংশ। To improve : উন্নতি করতে। By implementing ..scheme : বিশদফা কর্মসূচীকে রূপায়িত করে।

8. When Napoleon Bonaparte after his defeat at Waterloo by the British and Prussians was sent off to St. Helena, not many people were sorry. Even the French people, who had admired Napoleon and was proud of the glory he had conferred on France, were tired of constant war; and so they were inclined to say, 'Well, he was a great man, but he turned the world upside down too much.'

The kings, statesmen and nobles of Europe, of course, was very glad to get rid of Napoleon. They regarded the French Revolution of 1789 as a kind of wild outburst of anarchy and Napoleon's exploits as the natural result of the Revolution. After Napoleon's fall, for first time, they felt secure.

সংকেত : After his ..Prussians : ওয়াটার্লু'র যুদ্ধে ইংরেজ ও প্রাশিয়ানদের হাতে তাঁর পরাজয়ের পর। Was sent...Helena : সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত হয়েছিলেন। Had admired : প্রশংসা করতো। Were proud...France : তিনি ফ্রান্সকে যে গৌরবে মণ্ডিত করেছিলেন, তাতে গর্বিত। Tired of ..war : ক্রমাগত যুদ্ধে অবসন্ন। Were inclined...say : বলতে চাইতো। Upside down : ওলটপালট। Statesmen : রাজনীতিবিদেরা। Anarchy : অরাজকতা। Exploits : কৃতিত্ব। Natural result : স্বাভাবিক ফল। Felt secure : নিরাপদ বোধ করলো।

৫. Soon her eye fell on a little glass box that was lying under the table. She opened it and found in it a very small cake, on which the words 'EAT ME' were beautifully marked in currants. "Well, I'll eat it," said Alice, "And if it makes me grow larger, I can reach the key; and if it makes the smaller, I can

creep under the door; so either way I'll get into the garden, and I don't care what happens."

সংকেত : Glass box : কাঁচের বাক্স। Lying...table : টেবিলের নীচে। Cake : পিঠে (পিঠি)। Were...currants : কিশমিশ দিয়ে সুন্দরভাবে লেখা ছিল। Makes me...larger : আমাকে বড় করে তোলে। I can...key : আমি চাবির নাগাল পাবো। I can...door : দরজার নীচ দিয়ে গলে যেতে পারবো। Either way : দুটির যে কোন উপায়েই। Get into : ঢুকতে পারা। I don't care : ভাবি না।

৬. It is well-known how violent the King's prejudices were against the queen, and how skilfully these prejudices were kept up by the Cardinal, who, in affairs of intrigue, mistrusted women much more than men. One of the principal clauses of the prejudice was the friendship of Anne of Austria for Madame de Chevreuse. These two women gave him more uneasiness than the war with Spain, the quarrel with England, or the embarrassment of the finances

সংকেত : Well-known : সুবিদিত। Violent : সাংঘাতিক। Prejudices : সংস্কার, মন্দ ধারণা। Skilfully : সুকৌশলে। Kept up : চালু রাখা হয়েছিল। Cardinal : ধর্মযাজক। In affairs of intrigue : চক্রান্তে। Mistrusted : অবিশ্বাস করতেন। Principal clauses : প্রধান অংশ। Uneasiness : অস্বস্তি। The embarrassment...finances : অর্থনৈতিক সংকট।

৭. My name is Rabinson Crusoe; I was born in the city of York. When quite a boy I wanted to be a sailor, but my parents said I was foolish to choose such a dangerous life, and begged me to stay at home. So for a time, I tried to be content.

But it was useless; I longed to see the great world and could not settle at home.

সংকেত : When quite a boy : খুব অল্প বয়সেই। I was foolish : আমি বোকামি করেছি। To choose...life : এরূপ বিপজ্জনক জীবিকা নির্বাচন করে। Begged : অনুনয় করলেন। To be content : সুখী থাকতে। It was useless : তা ব্যর্থ হলো। I longed...world : বিশাল পৃথিবীকে দেখবার জন্যে আমার বাসনা হলো। Could not settle : স্থির হয়ে থাকতে পারলাম না।

৮. Men in general do not know the true meaning of the word justice. Justice may be defined to be that virtue which impels us to give to every person what is his due. In this large sense of the word, it comprehends the practice of every virtue which reason prescribes, or society should expect. Our duty to our Maker, to each other, and to ourselves, is fully answered, if we give them what we owe them. Thus justice, properly speaking is the only virtue, and all the rest have their origin in it.

সংকেত : In general : সাধারণতঃ। Justice : ন্যায়। Justice may be defined : ন্যায়ের সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে। Virtue : গুণ। Impels : অনুপ্রাণিত করে। His due : তার

প্রাপ্য। Large sense : ব্যাপক অর্থ। It comprehends...expect : এর দ্বারা মুক্তসমূহ ও সমাজের প্রত্যাশিত প্রত্যেক গুণের অনুশীলন বোঝায়। Maker : স্রষ্টা। If fully answered : পুরোপুরি পালন করা হয়। If we...then : তাঁদের কাছে আমাদের যে ঋণ আছে, তা শোধ করা হয়। Properly speaking : ঠিকমতো বলতে গেলে বলতে হয়। All the rest...in it : বাকিগুলি জন্মায় তা থেকে।

৯. My next work was to discover the best place to store my goods. There was a steep hill near. I took one of my guns, climbed to the top of the hill, and saw I was on an island—with not a house or person in sight. I spent the rest of the day unloading the cargo.

সংকেত : To discover : খুঁজে বের করা। Steep : খাড়া। With not a...in sight : (কিন্তু তাতে) কোন বাড়িঘর বা মানুষ চোখে পড়লো না। I spent.. the cargo : জাহাজ থেকে মাল নামাতেই দিনের বাকি অংশটা আমার কেটে গেল।

১০. The world is like a looking glass ; if you smile, it smiles ; if you frown, it frowns back. If you look at it through a red glass, all seems red and rosy ; if through a blue, all blue ; if through a smoked one, all dull and dirty. Always try then to look at the bright side of things. Almost everything in the world has bright side. There are some persons whose smile, the sound of whose voice, whose very presence seem like a ray of sunshine and brighten a whole room. Greet everybody with a bright smile, kind words and a pleasant welcome.

সংকেত : A looking glass : আয়না। Frown : ভ্রূকুটি করো। It frowns back : ওটাও ভ্রূকুটি করবে। Through a red glass : লাল কাঁচের ভেতর দিয়ে। Rosy : গোলাপী। Through a blue : নীল কাঁচের ভেতর দিয়ে। A smoked one : ভুসো মাখানো কাঁচ। All dull and dirty : সব বিশ্রী এবং নোংরা দেখাবে। The bright side of things : সব জিনিসের উজ্জ্বল দিক। Seem like a ray of sunshine : সূর্যের রশ্মির মতো মনে হয়। Brighten : আলোকিত করে তোলে। Greet : প্রীতি জানাও। Kind words : মিষ্টি কথা। A pleasant welcome : মধুর অভ্যর্থনা (সম্ভাষণ)।

১১. Just fancy an English boy learning his Physics or Geography through Russian. He cannot but feel stupid. A good deal of the energy of a Bengalee boy is wasted in learning a foreign medium. And in most cases, he learns it very imperfectly. He gets the haziest impression about the things he is required to learn through English, so he is forced very often to mug up things without understanding a word of all he reads. This makes a farce of our education. The foreign medium of English has still a tight hold on our education system in a number of ways.

সংকেত ঃ Just fancy : কল্পনা কর। An English boy : একজন ইংরেজ বালককে। Learning...Russian : রুশ ভাষায় তার পদার্থ-বিজ্ঞান বা ভূগোল পড়তে। He cannot... stupid : নিজেকে তার বোকা মনে হবে। A good deal . medium : একটি বিদেশী ভাষা (মাধ্যম) শিখতে একটি বাঙালী বালকের প্রচুর শক্তি ক্ষয় হয়ে যায়। In most cases : অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। Very imperfectly : অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণভাবে। Haziest impression : অস্পষ্ট ধারণা। Very often : প্রায়ই। To mug up : খুব কষ্ট করে শিখতে। Without understanding : না বুঝে। Farce : প্রহসন। The foreign...ways : ইংরেজির বিদেশী মাধ্যম এখনো নানাভাবে আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি কব্জা করে রেখেছে।

১২. By this time Gulliver felt very hungry, for he had not eaten anything for many hours. He could not speak the strange language of the little folk, so he kept putting his finger to his mouth as a sign that he wanted food. How glad he was, when they showed that they understood what he wanted! They placed a ladder against his sides, and over a hundred of the little people, carrying baskets of food, climbed up and walked over his body towards his mouth.

সংকেত ঃ By this time : ততক্ষণে। He could not . little folk : সে সেই ক্ষুদে মানুষদের ভাষায় কথা বলতে জানতো না। Kept putting . sign : ইংগিত হিসেবে মুখে আঙুল পুরে রাখলো। When they showed that : যখন তারা জানালো যে। Placed . sides : তার পাশে মই লাগালো। Carrying...food : খাবারের ঝুড়ি নিয়ে। Climbed up .. mouth : তার শরীরের ওপর উঠে তার মুখের দিকে হেঁটে যেতে লাগলো।

১৩. The neighbours were good to her; occasionally some had the children into meals, occasionally some would do the downstairs work for her, one would mind the baby for a day. But it was a great drag, nevertheless. It was not everyday the neighbours helped. Then she had nursing of baby and husband, cleaning and cooking, everything to do. She was quite worn out, but she did what she wanted of her.

সংকেত ঃ The neighbours...her : প্রতিবেশীরা তাঁর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতো। Occasionally...meals : কখনো কখনো কেউ কেউ ছেলেমেয়েদের খাওয়াতো। Occasionally...for her : কখনো কখনো কেউ কেউ একতলার কাজকর্ম করে দিত। One would...day : কেউ একদিনের জন্যে বাচ্চাটাকে দেখতো। Great drag, nevertheless : তবু ভীষণ হেঁচড়ে চলা। Worn out : ক্লান্ত।

১৪. Rabindranath was fascinated by the description in Indian literature of the ancient Indian university of Nalanda. He felt keenly that modern India had a great need for such a truly national university, something which should be a natural expression of all

that was best in Indian thought, art, and civilization. He saw in the existing modern universities of India nothing but copies of institutions which had grown naturally in the west, but which were foreign to this country.

সংকেত ঃ Was fascinated...Nalanda : ভারতীয় সাহিত্যে নালন্দার প্রাচীন ... বিদ্যালয়ের বর্ণনা পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। Keenly : গভীরভাবে। Had a great...university : এরূপ একটি সত্যিকারের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ প্রয়োজন আছে। Something which...civilization : তা সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় চিন্তা, শিল্প ও সভ্যতার স্বাভাবিক প্রকাশ হবে। Existing modern : বর্ত্তমান আধুনিক। Copies...the west : পাশ্চাত্য দেশগুলিতে স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানগুলির অনুকরণ। Foreign : অপরিচিত।

১৫. I used to be haunted by the fear of thieves, ghosts and serpents. I did not dare to stir out of doors at night. Darkness was a terror to me. It was almost impossible for me to sleep in the dark, as I would imagine ghosts coming from one direction, thieves from another and serpents from the third. ...My friend knew all these weaknesses of mine. He would tell me that he could hold in his hand live serpents, could defy thieves and had no belief in ghosts, and all this was, of course, the result of eating meat. It began to grow on me that meat-eating was good, that it could make me strong and daring, and that if the whole country took to meat-eating, the English could be overcome.

সংকেত ঃ I used ..serpents : আমার মনে চোর, ভূত আর সাপের ভয় গুঁড়ি মেরে হাঁটতো। To stir out of doors : ঘরের বাইরে যেতে। A terror : আতঙ্ক। As I would...the third : কারণ আমি কল্পনা করতাম, ভূতেরা আসছে একদিক থেকে, চোরেরা আসছে অন্যদিক থেকে আর তৃতীয় দিক থেকে আসছে সাপেরা। Live serpent : জীবন্ত সাপ। Could defy thieves : চোরদের সঙ্গে লড়তে পারে। The result of meat-eating : মাংস খাওয়ার ফল। Took to meat-eating : মাংস খাওয়া ধরে।

১৬. What, then, causes disease ? The first idea that occurred to early man was that disease was brought about by an evil spirit entering into a person's body. Some primitive people still try to cure a disease by causing pain to the person who has it or by making a lot of noise. They think that such treatment will scare the evil spirit away and will make the person well again. Another early idea was that disease was punishment either of something the sick person had done or for something his father or ancestors had done. Other theories about what made a person ill had an origin in belief in magic, and the power of witches. These wild

superstitions prevailed so long as men lacked the means of finding out the truth.

সংকেত : What, then,...disease : কি থেকে তাহলে রোগ উৎপন্ন হয়। The first idea...man : আদিম মানুষের মনে প্রথম যে ধারণা হয়েছিল। Was that...person's body : তা হলো এই যে, কোন অশুভ শক্তি মানুষের শরীরে প্রবেশ করলে রোগ উৎপন্ন হয়। Some primitive people : কোন কোন আদিবাসী জাতি। To cure a disease : রোগ সারাতে। By causing...it : রোগীকে কষ্ট দিয়ে। By making ..noise : প্রচুর গোলমাল করে। Such treatment...away : এরূপ চিকিৎসায় অশুভ শক্তিকে তাড়ানো যাবে। Another early idea : অপর একটি প্রাচীন ধারণা। Punishment . had done : হয় সে করেছিল অথবা তার বাবা বা পূর্বপুরুষেরা করেছিল, এমন কোন কাজের শাস্তি। Other theories : অন্যান্য ধারণা। An origin...in magic : যাদুবিদ্যায় বিশ্বাস থেকে উৎপত্তি। Witches : ডাইনি। Wild superstitions : ইতর সংস্কারগুলি। Prevailed : বিরাজ করেছে। Lacked ..truth : সত্য আবিষ্কারের উপায় সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল।

ভাবার্থ-রচনা

১. মহাভারতের মধ্যে ঢুকেছেন কীট,
কেটেকুটে ফুঁড়েছেন এপিঠ ওপিঠ।
পণ্ডিত খুলিয়া দেখি হস্ত হানে শিরে ;
বলে, 'ওরে কীট, তুই একী করিলি রে।
তোর দন্তে শান দেয়, তোর পেট ভরে
হেন খাদ্য কত আছে ধূলির উপরে।'
কীট বলে, 'হয়েছে কী! কেন এত রাগ!
ওর মধ্যে ছিল কী বা, শুধু কালো দাগ।
আমি যেটা নাহি বুঝি সেটা জানি ছার,
আগাগোড়া কেটেকুটে করি ছারখার।'

পৃথিবীতে যারা নিন্দুক, তারা গুণী ও মানী ব্যক্তিদের যশকে অকারণে নিন্দিত করে, কালিমালিপ্ত করে। এটা তাদের স্বভাব-ধর্ম। কারণ, গুণী ও মানী ব্যক্তিদের যশের বিশেষত্ব উপলব্ধি করার মতো শক্তি তাদের নেই।

২. ছাতা বলে, 'ধিক্ ধিক্, মাথা মহাশয়,
এ অন্যায় অবিচার আমারে না সয়।
তুমি যাবে হাটে বাটে দিব্য অকাতরে,
রৌদ্র বৃষ্টি যত-কিছু সব আমা-'পরে।
তুমি যদি ছাতা হতে কী করিতে দাদা?'
মাথা কয়, 'বুঝিতাম মাথার মর্যাদা।
বুঝিতাম তার গুণে পরিপূর্ণ ধরা,
মোর একমাত্র গুণ তারে রক্ষা করা।'

জগতে যার যা কাজ, তার তাই করা উচিত। সবই জগতের কাজ। সেই কাজের জন্যে কাউকে করতে হয় দৈহিক পরিশ্রম, কাউকে করতে হয় মানসিক পরিশ্রম। কিন্তু প্রত্যেকেরই প্রত্যেকের প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল হওয়া প্রয়োজন।

৩. শুষ্ক তৃণগন্ধ বহি ধেয়ে আসে ছুটে
তপ্ত সমীরণ—চলে যায় বহুদূর।
থেকে থেকে ডেকে ওঠে গ্রামের কুকুর
কলহে মাতিয়া। কভু শান্ত হাম্বাস্বর,
কভু শালিকের ডাক, কখনো মর্মর
জীর্ণ অশথের, কভু দূর শূন্য 'পরে

চিলের সুতীব্র ধ্বনি, কভু বায়ুভরে
আর্ত শব্দ বাঁধা তরণীর—মধ্যাহ্নের
অব্যক্ত করুণ একতান, অরণ্যের
স্নিগ্ধছায়া, গ্রামের সুষুপ্ত শান্তিরাশি,
মাঝখানে বসে আছি আমি পরবাসী।

নীরব নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন। কিন্তু সেই নিস্তব্ধতার মধ্যেও প্রকৃতির রূপ, রস ও শব্দের কী বিচিত্র আয়োজন। সৌন্দর্যের কী মমতাময় প্রকাশ! কিন্তু মানুষ প্রকৃতির সেই সৌন্দর্য-পুরীতে প্রবেশ করতে পারে না। সে প্রবাসী অতিথির মতো বসে থাকে বাইরে॥

৪. পৃথিবীতে কত দ্বন্দ্ব, কত সর্বনাশ,
নূতন নূতন কত গড়ে ইতিহাস—
রক্তপ্রবাহের মাঝে ফেনাইয়া উঠে
সোনার মুকুট কত ফুটে আর টুটে!
সভ্যতার নব নব কত তৃষ্ণা ক্ষুধা—
উঠে কত হলাহল, উঠে কত সুধা!
দোঁহা-পানে চেয়ে আছে দুইখানি গ্রাম।
এই খেয়া চিরদিন চলে নদী স্রোতে—
কেহ যায় ঘরে, কেহ আসে ঘর হতে।

পৃথিবীর ইতিহাসে প্রতিদিন ঘটছে কত উত্থান-পতন, কত রাজ্য-ভাঙাভাঙি। মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে ঘটে গেছে কত রক্তপাত! যুদ্ধের শেষে শান্তি স্থাপিত হয়েছে কতবার। কিন্তু বাংলার নদীর দু' তীরের দুখানি গ্রাম পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে অনাদি অনন্তকাল। যুদ্ধ বা রক্তপাত তাদের নীরবতা ভঙ্গ করতে পারেনি। গ্রামের নির্বিকার মানুষগুলি খেয়া-নৌকায় এপার-ওপার করে॥

৫. একদিন দেখিলাম উলঙ্গ সে ছেলে
ধূলি 'পরে বসে আছে পা দুখানি মেলে।
ঘাটে বসি মাটি ঢেলা লইয়া কুড়ায়ে
দিদি মাজিতেছে ঘটি ঘুরায়ে ঘুরায়ে।
অদূরে কোমললোম ছাগবৎস ধীরে—
ফিরিয়া চলিতেছিল সেই নদীতীরে।
সহসা সে কাছে আসি থাকিয়া থাকিয়া
বালকের মুখ চেয়ে উঠিল ডাকিয়া।
বালক চমকি কাঁপি কেঁদে ওঠে ত্রাসে,
দিদি ঘাটে ঘটি ফেলি ছুটি চলে আসে।
এক কক্ষে ভাই লয়ে, অন্য কক্ষে ছাগ,
দুজনেরে বাঁটি দিল সমান সোহাগ।

শিশু আর পশু প্রকৃতির খুব কাছের অধিবাসী। তাদের মধ্যে পার্থক্য অতি সামান্য। অনুভূতিপ্রবণ মানুষ উভয়কেই প্রীতির মধ্যে গ্রহণ করতে পারে। ওভাবেই সে তার হৃদয়ের ভালোবাসা শিশু ও পশুকে সমানভাবে বণ্টন করে দিতে পারে॥

৬. পর্দা উঠিবামাত্র ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রথমাঙ্কেই আমরা আর্য-অনার্যের প্রচণ্ড জাতিসংঘাত দেখিতে পাই। সেই সংঘাতের প্রথম প্রবল বেগে অনার্যের প্রতি আর্যের যে বিদ্বেষ জাগিয়াছিল তাহারই ধাক্কায় আর্যেরা নিজের মধ্যে নিজে সংহত হইতে পারিল।

এইরূপ সংহত হইবার অপেক্ষা ছিল। কারণ, ভারতবর্ষে আর্যরা কালে কালে ও দলে দলে প্রবেশ করিতেছিলেন। তাঁহাদের সকলেরই গোত্র দেবতা ও মন্ত্র যে একই ছিল তাহা নহে। বাহির হইতে যদি একটা প্রবল আঘাত তাঁহাদিগকে বাধা না দিত তবে এই আর্য-উপনিবেশ দেখিতে দেখিতে নানা শাখা-প্রশাখায় সম্পূর্ণ বিভক্ত হইয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইত। তাহারা আপনাদিগকে এক বলিয়া জানিতে পারিত না।

বাইরের আঘাতে বা প্রতিরোধে অনৈক্য দূর হয়ে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ভারতের ইতিহাসের প্রথম পর্বে আর্যরা বিচ্ছিন্নভাবে নানা দলে ভারতে প্রবেশ করে অনার্যদের প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। তাতে আর্যদের বিভিন্ন গোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ হতে বাধ্য হয়। তা নইলে কখনই তাদের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হত না॥

৭. একজন সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁর অনুচরদের ডেকে বলেছিলেন, নিজেদের চেয়ে শত্রুপক্ষের সৈন্যকে ভাল করে চিনে রেখো, যুদ্ধজয়ের অর্ধেক সেখানেই। যে চিকিৎসক ব্যাধির সঙ্গে সংগ্রামে চলেছেন, তাঁকে এই কথাটা ভাল করে মনে রাখতে হবে। মানুষের সকল শত্রুর বড় শত্রু হল ওই সব জীবাণু, তারা চোখের আড়ালে থাকে, অনেক তোড়জোড় করে তাদের খুঁজে বের করতে হয়, তাদের রীতিনীতির পরিচয় পেতে হয়, তাদের ধ্বংসের উপায় ঠিক করতে হয়।

যুদ্ধজয়ের প্রধান উপায় হলো, শত্রুপক্ষ সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত হওয়া। তেমনি রোগজয়ের জন্তে চিকিৎসককে বিভিন্ন রোগ-বীজাণু সম্পর্কে খুঁটিনাটি জ্ঞান লাভ করতে হয় এবং তাদের ধ্বংসের উপায় আবিষ্কার করতে হয়॥

৮. দেশের মঙ্গল? দেশের মঙ্গল, কাহার মঙ্গল? তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি, কিন্তু তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয়জন? আর এই কৃষিজীবী কয়জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয়জন থাকে? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ—দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। তোমা হইতে আমা হইতে কোন্ কাজ হইতে পারে? কিন্তু সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে? কি না হইবে? যেখানে তাহাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোন মঙ্গল নাই।

দেশের অধিকাংশ মানুষই হলো কৃষিজীবী। কাজেই, দেশের উন্নতি করতে হলে তাদের উন্নতি আগে করতে হবে। দেশের অসংখ্য কৃষিজীবীকে বঞ্চিত রেখে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ব্যক্তির উন্নতিতে দেশের প্রকৃত উন্নতি নেই॥

৯. বীরসিংহ গ্রাম থেকে পায়ে হেঁটে কলকাতায় আসছেন বিদ্যাসাগর। মাঠের মাঝে দেখতে পেলেন এক বৃদ্ধ কৃষককে। তার মাথায় একটা বোঝা। একে বয়স হয়েছে, তার ওপর বেশ ভারি বোঝা। বেচারার চলবার শক্তি নেই। তার বাড়ি আবার কাছে নয়, দু'তিন ক্রোশ দূরে। বৃদ্ধের এই অবস্থা দেখে বিদ্যাসাগর ছুটে

দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশির-বিন্দু।

মানুষ বহু অর্থব্যয় করে, বহু কষ্ট স্বীকার করে দূর-দূরান্তরে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতে যায়। কিন্তু তার বাড়ির পাশে প্রকৃতি যে অনবদ্য সৌন্দর্যের ডালি নিয়ে বসে আছে, তা তার দেখা হয় না। প্রকৃতি কি দূর-দূরান্তরের সমুদ্র-পর্বতেই আছে? আমাদের ঘরের পাশে ধানের শিষের ডগায় পতনোন্মুখ শিশির-বিন্দুতে কি প্রকৃতি নেই?

১৩. দেবতা-মন্দির-মাঝে ভকত প্রবীণ
জপিতেছে জপমালা বসি নিশিদিন।
হেনকালে সন্ধ্যাবেলা ধূলিমাখা দেহে
বস্ত্রহীন, জীর্ণদীন পশিল সে গেহে।
কহিল কাতরকণ্ঠে—"গৃহ মোর নাই,
একপাশে দয়া করে দেহ মোরে ঠাঁই।"
সসঙ্কোচে ভক্তবর কহিলেন তারে,
'আরে আরে অপবিত্র, দূর হয়ে যা রে!"
সে কহিল, "চলিলাম।" চক্ষের নিমেষে
ভিখারী ধরিল মূর্তি দেবতার বেশে।
ভক্ত কহে, "প্রভু মোরে কি ছল ছলিলে?"
দেবতা কহিল, "মোরে দূর করি দিলে।
জগতে দরিদ্ররূপে ফিরি দয়াতরে,
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে।"

ঈশ্বরের বাস কি কেবল মন্দিরে-মসজিদে? মানুষকে দূরে সরিয়ে দিয়ে মন্দির বা মসজিদের শুচিতা রক্ষার চেষ্টা মূঢ়তার নামান্তর মাত্র। ঈশ্বর আছেন মানুষের অন্তরে। তিনি দীনদরিদ্ররূপে ঘুরে ঘুরে বেড়ান মানুষের দ্বারে দ্বারে। তারাই তো জাগ্রত ভগবান। শুচিতার ভ্রান্ত ধারণার বশে তাদের দূরে তাড়িয়ে দেওয়ার অর্থ ঈশ্বরকে ঘৃণায় বিতাড়িত করা।

ভাব-সম্প্রসারণ

১. জোটে যদি মোটে একটি পয়সা
খাদ্য কিনিও ক্ষুধার লাগি ;
দুটি যদি জোটে তবে অর্ধেকে
ফুল কিনে নিও, হে অনুরাগী।
বাজারে বিকায় ফল-তণ্ডুল
সে শুধু মিটায় দেহের ক্ষুধা,
প্রাণের, মনের ক্ষুধা নাশে ফুল
দুনিয়ার মাঝে সেই তো সুধা।

দেহ ও মন—এই নিয়ে মানুষ, এই নিয়ে তার জীবন। দেহের যেমন ক্ষুধা আছে, তেমনি আছে মনের ক্ষুধা। পৃথিবীতে বাঁচতে হলে দু'রকম ক্ষুধারই পরিতৃপ্তি চাই। পেটের ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্যে মানুষকে খাদ্য সংগ্রহ করতে হয়। সেজন্যে মানুষ খাটে, দিনরাত পরিশ্রম করে। দিনরাতের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের মজুরী হিসেবে সে যা পায়, তা যত সামান্যই হোক, তা দিয়ে শুধু পেটের অন্ন সংগ্রহ করলে তার চলে না। এইখানেই সে পশু থেকে পৃথক্। পশুর শুধু উদর-পূর্তি হলে চলে যায়, কিন্তু মানুষের চলে না। মানুষের উদরের অতিরিক্ত আছে তার মন। উদর-পূর্তির সঙ্গে চাই তার মানসিক ক্ষুধার পরিতৃপ্তি। উদর-পূর্তির পর যা তার হাতে থাকে, তা দিয়ে সে কেনে ফুল কিংবা ছবি কিংবা বই কিংবা কোন শিল্প-সামগ্রী ; অথবা সে গান শোনে, অভিনয় দেখে। তার সেই মানসিক ক্ষুধার পরিতৃপ্তির জন্যে শিল্পের সৃষ্টি ; শিল্পকলার নব নব আয়োজন। মানুষ তাই উদর-সর্বস্ব হয়ে বাঁচতে পারে না, সে তাই সুন্দরেরও পূজারী॥

২. মেঘ দেখে কেউ করিস নে ভয়
আড়ালে তার সূর্য হাসে,
হারাশশীর হারা হাসি
অন্ধকারেই ফিরে আসে।

মানুষের জীবন হলো সুখ এবং দুঃখ দিয়ে গাঁথা এক বিচিত্র মালার মতো। নিরবচ্ছিন্ন সুখ কিংবা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ কোন মানুষ পায় না। তার জীবনে আছে

দুঃখের অমারাত্রি, দুঃখ-বেদনা তখন অসহ্য বোধ হয়; মনে হয়, সেই দুঃখ-রজনীর বুঝিবা শেষ নাই। কিন্তু তার দুঃখ-বেদনার সেই অমারাত্রির অবসান হয়। পূর্বদিগন্তে উদিত হয় সুখের সূর্য। কিন্তু সেই সুখও তার ভাগ্যে চিরস্থায়ী হতে পারে না। নদীর জোয়ারভাটার মতো তার জীবনে আবার আসবে দুঃখ, দুঃখের পর সুখ।

কখনো কখনো আবার মানুষের জীবনের আকাশে দুঃখ এবং বিপদ-আপদের ঘোর কালো মেঘ ঘনিয়ে আসে। মাথার ওপরে ভেঙে পড়ে ঝড়-ঝঞ্ঝা-বজ্রপাত। অসহায় মানুষ সেই ঘোর বিপদের কালো মেঘ দেখে ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু সেই ঝটিকা-সংকুল রাতের অন্ধকারের আড়ালে লুকিয়ে আছে তার সুখের সূর্য। অচিরে সেই কৃষ্ণকুটিল কালো মেঘ কেটে গিয়ে সূর্যের মুখ দেখা যাবে। বিপদ-বাধা কেটে গিয়ে দেখা দেবে নতুন দিনের সূর্যোদয়। কাজেই, দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-বাধা সাময়িক। তা দেখে মানুষের ভয় পাওয়া বা বেদনায় ভেঙে পড়া উচিত নয়॥

৩. এ জগতে হায় সেই বেশী চায় আছে যার ভুরি ভুরি,
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।

পৃথিবীতে যারা প্রচুর সম্পদের মালিক, যাদের প্রচুর আছে, তাদের সম্পদ-তৃষ্ণা কোনদিন পরিতৃপ্ত হয় না। তারা যত পায়, তত চায়। এইভাবে তারা নিজেদের মোটা পেট আরো মোটা করে তোলে। তাদের সেই নির্বিচার সম্পদ সংগ্রহের ফলে গরীবের কানাকড়িতে হাত পড়ে। পৃথিবীর দুঃখী মানুষেরা তাদের সামান্য পুঁজিপাটা নিয়ে করে জীবনযাপন। ধনিকের ঐশ্বর্যের প্রতি তাদের লোভ নেই, রাজার বিলাস-বৈভবের প্রতি তারা উদাসীন। 'শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোন মতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ' বাঁচিয়ে রাখে। কিন্তু ধনিকের অপরিসীম ধনতৃষ্ণা ক্রমাগত স্ফীত হতে হতে একদিন গরীবের পর্ণকুটিরকে স্পর্শ করে। নানা ছলে, নানা কৌশলে কিংবা বল প্রয়োগ করে তারা দরিদ্রের সর্বশেষ সম্বল—তাদের সামান্য কানাকড়িটুকু ছিনিয়ে এনে ধনিকেরা নিজেদের সম্পদ-তৃষ্ণার আগুনে আহুতি দেয়। এইভাবে পৃথিবীর দরিদ্রেরা তাদের সব কিছু হারিয়ে ভিটেমাটি ছেড়ে সাজে পথের ভিক্ষুক, অন্নের কাঙাল। কেউ তাদের হিসেব রাখে না, কেউ তাদের খবর রাখে না॥

৪. দণ্ডিতের সাথে
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার।

ন্যায়ের শুভ্র পাষাণ-বেদীর ওপর বিচারকের আসন পাতা। নিরপেক্ষভাবে অপরাধী নির্ণয় করে তাকে শাস্তি দান করাই বিচারকের কাজ। এই কাজ বড় সুকঠিন। কিন্তু অপরাধীকে দণ্ডদানের ব্যাপারে বিচারককে সংবেদনশীল হতে হবে, অনুভূতিপ্রবণ হতে হবে। তা না হয়ে তিনি যদি অপরাধীকে নির্মমভাবে দণ্ডদান করেন, দণ্ডিত অপরাধীর বেদনায় তাঁর হৃদয়ে যদি করুণার উদ্রেক না হয়, তবে তিনি

বিচারক পদের অযোগ্য। কারণ যে দণ্ডিত, যাকে তিনি দণ্ড বিধান করলেন, সেও কোন হতভাগ্য পিতামাতার সন্তান। সন্তানের ব্যথা-বেদনায় তাঁরাও ব্যথিত হবেন। তাছাড়া, যে কোন শাস্তিই কষ্টদায়ক। অপরাধীকে সেই কষ্ট ভোগ করতে হয়। বিচারক যদি তার এবং তার পিতামাতার ব্যথা-বেদনার কথা চিন্তা করে ব্যথিত না হন, তাহলে তাঁর শাস্তিদান হবে নিষ্ঠুরতার নামান্তর। কাজেই, দণ্ডিতের প্রতি বিচারককে সমব্যথী হতে হবে। সমব্যথী বিচারকের বিচারই সর্বশ্রেষ্ঠ বিচার এবং তিনি যে শাস্তিদান করেন, তাই-ই সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্তি।

৫. বন্ধু, তোমার বুকভরা লোভ, দুচোখে স্বার্থঠুলি
নতুবা দেখিতে তোমারে সেবিতে দেবতা হয়েছে 'কুলি'।

এই পৃথিবীতে মানুষ মানুষকে ভালোবাসে, তার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে। মানুষের এই বন্ধুত্বের কোন তুলনাই হয় না। মানুষ বন্ধুত্বের আকর্ষণে মানুষের জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করে, জীবন পর্যন্ত দান করে মনুষ্যত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। কিন্তু বন্ধুর জন্যে মানুষের এই যে ত্যাগ-স্বীকার বা জীবন-দান, তা অনেক সময় নিঃস্বার্থ হয় না। স্বার্থের কারণেই মানুষ মানুষের বন্ধুত্ব প্রার্থনা করে, বন্ধুর উপকার করার চেষ্টা করে। এইভাবে তার পবিত্র বন্ধুত্বকে স্বার্থের কলুষ স্পর্শ করে। এই স্বার্থ-কলুষের স্পর্শে বন্ধুর ভালোবাসা কলঙ্কিত হয়। তা নইলে তার পবিত্র বন্ধুত্বের উজ্জ্বল দীপ্তির পাশে স্বর্গের দেবতাদের দেবত্বও ম্লান হয়ে যায়। এই ধূলিময় পৃথিবীতে বন্ধুত্বই মানুষের সবচেয়ে বড়ো আশা-ভরসা এবং মানুষের বন্ধুত্বেই স্বর্গীয় সৌন্দর্যের অমলিন প্রকাশ। পৃথিবীতে স্বর্গীয় সৌন্দর্য যদি কোথাও থেকে থাকে, তবে তা হলো মানুষের বন্ধুত্ব। তার আকর্ষণে স্বর্গের দেবতাও মর্ত্যের মানুষ হবার জন্যে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পৃথিবীর কোন বন্ধুত্বই স্বার্থমুক্ত নয়, নিষ্কলুষ নয়।

৬. অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।

প্রত্যেক মানুষেরই অন্তরে ন্যায়বোধের প্রকাশ। তার বিবেকের শুভ্র বেদীতে ন্যায়ের আসন পাতা। জগতের সব কাজেই তার অন্তরের বিবেক থেকে আসে অমোঘ নির্দেশ। মানুষকে সেই নির্দেশ পালন করতে হয়। কিন্তু ভীতি ও দুর্বলতার কারণে অনেক সময় মানুষ ন্যায়ের সেই অমোঘ নির্দেশ পালনে পশ্চাৎপদ হয়, সেই পবিত্র দায়িত্ব পালনে কুণ্ঠিত হয়। ন্যায়ের নির্দেশ পালনে এই অক্ষমতার অর্থ অন্যায়কে প্রশ্রয় দান। তেমনি অন্যায়কে ক্ষমা করা বা উপেক্ষা করাও অন্যায়কে প্রশ্রয় দান। তার ফলে অন্যায়কারীরা আরো অন্যায় করবার জন্যে সাহস পায় এবং তাতে পৃথিবী থেকে ন্যায়বোধ ধীরে ধীরে তিরোহিত হয়। কাজেই, অন্যায়কারী এবং যে অন্যায় সহ্য করে, তারা উভয়েই দোষী, উভয়েই শাস্তির যোগ্য। অন্যায়ের আচরণে কেউ কেউ নীরব উদাসীন দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। তাতে প্রশ্রয় পেয়ে অন্যায়কারী স্ফীত ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কিন্তু রুদ্রদেবতা বেশীদিন তা সহ্য করবেন না। তাঁর

করতেতে একদিন না একদিন অন্যায়কারী এবং অন্যায়ের প্রশ্রয়দাতা উভয়কেই কঠিন শাস্তি লাভ করতে হবে।

৭. লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

সংকেত: লোভের শেষ নেই। লোভের জন্যে মানুষ নানা পাপকর্ম করে। লোভের তাড়নায় দিনের পর দিন সে পাপকর্ম করে চলে। অবশেষে মৃত্যুতেই তার পরিসমাপ্তি ঘটে।

৮. ইচ্ছা থাকিলেই উপায় হয়।

সংকেত: যে কোন কাজের জন্যে চাই আগ্রহ। মানুষের অদম্য আগ্রহই তাকে সাফল্যের দ্বারে পৌঁছিয়ে দেয়।

৯. যে জন দিবসে মনের হরষে
জ্বালায় মোমের বাতি।
আশু গৃহে তার জ্বলিবে না আর
নিশিতে প্রদীপ ভাতি।

সংকেত: অমিতব্যয়ীরা অচিরেই অভাবের মধ্যে নিপতিত হয়। কাজেই, আয় বুঝে ব্যয় করা উচিত। সুখ ও সচ্ছলতার দিনেই দুঃসময়ের জন্যে সঞ্চয় করা বুদ্ধিমানের কাজ।

১০. কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে,
দুঃখ বিনা সুখলাভ হয় কি মহীতে?

সংকেত: পরিশ্রম বা দুঃখকষ্টের ভয়ে কর্ম থেকে বিরত হওয়া অনুচিত। পৃথিবীর যে কোন কাজই পরিশ্রম-সাধ্য। পৃথিবীতে দুঃখ ছাড়া সুখ লাভ করা যায় না।

১১. চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে?
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে?

সংকেত: সুখী ব্যক্তিরা দুঃখীর দুঃখ উপলব্ধি করতে পারে না। ধনীরা পারে না গরীবের দুঃখ উপলব্ধি করতে। যে কখনো উপবাস করেনি, সে ক্ষুধার্তের দুঃখ বুঝতে পারবে না।

১২. নর কহে, 'ধূলিকণা, তোর জন্ম মিছে,
চিরকাল পড়ে র'লি চরণের নীচে।'
ধূলিকণা কহে, 'ভাই, কেন কর ঘৃণা
তোমার দেহের আমি পরিণাম কিনা?'

সংকেত: কোন মানুষকে ঘৃণা করা উচিত নয়। অবস্থার পরিবর্তনে মানুষের অবস্থারও পরিবর্তন ঘটতে পারে॥

১৩. আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী 'পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে

সংকেত: মানুষ পরস্পরের সহযোগিতার দ্বারা বাঁচে। পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করলে পৃথিবীতে মানব-জীবন সুখের হয়॥

১৪. সে কহে বিস্তর মিছা, যে কহে বিস্তর।

সংকেত: যারা বেশি কথা বলে, তারা অনেক মিথ্যা কথা বলে। বাচালতা মিথ্যা কথার মূল॥

১৫. যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে,
যে নদী মরুপথে হারালো ধারা।
জানি হে, জানি তাও হয়নি হারা॥

সংকেত: পৃথিবীতে কোন কিছুর ধ্বংস নেই, বিনাশ নেই। আপাতদৃষ্টিতে যা ধ্বংস, বিনাশ বা মৃত্যু, তা প্রকৃতপক্ষে রূপান্তর মাত্র। কোন ব্যর্থতাও ব্যর্থতা নয়। পরিশেষে সফলতা আছে॥

১৬. এই পৃথিবীতে যে একা, সে-ই ক্ষুদ্র, সে সামান্য।

সংকেত: একতাই বল। একক মানুষের শক্তি সীমিত। তার দ্বারা কোন বৃহৎ কাজ সম্পন্ন হয় না। পৃথিবীর বৃহৎ কাজগুলি ঐক্যবদ্ধ মানুষই সম্পন্ন করেছে॥

১৭. বিরাম কাজের অঙ্গ, একসাথে গাঁথা—
নয়নের অংশ যেন নয়নের পাতা।

সংকেত: কাজের ছুটিও কাজের অঙ্গ। এই ছুটি বিশ্রামের দ্বারা মানুষকে নতুন উদ্যম ও নতুন শক্তি দান করে, তা হয় আগামী কর্মের প্রেরণা॥

১৮. মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে গমন
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়,
সেই পথ লক্ষ্য করে স্বীয় কীর্তি-ধ্বজা ধরে
আমরাও হব বরণীয়।

সংকেত : মহাপুরুষগণ যে পথে কীর্তিলাভ করেছেন, সেই পথে পরবর্তীকালের মানুষেরাও কীর্তি লাভ করতে পারে। মহাপুরুষগণের জীবনই হবে তাদের প্রেরণার উৎস॥

১৯. সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়,
অসময়ে হায় হায় কেহ কারো নয়।

সংকেত : দুঃসময়ের বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু। সচ্ছলতার দিনে অনেক বন্ধু এসে ভিড় করে। কিন্তু অভাবের দিনে সকলেই উধাও হয়ে যায়। প্রকৃত বন্ধুই শুধু থাকে॥

২০. তুমি অধম, তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?

সংকেত : যে মানুষ সৎ এবং মহৎ, তিনি পরোপকারে নিজের জীবন বিসর্জন দেন। অন্যান্য মানুষ অকৃতজ্ঞ কিংবা কৃতঘ্ন হতে পারে। তাতে সৎ ব্যক্তি পরোপকার থেকে নিরস্ত হন না॥

২১. কুকুরের কাজ কুকুরে করেছে
কামড় দিয়েছে পায়,
তা বলে কুকুরে কামড়ান কিরে
মানুষের শোভা পায়?

সংকেত : যে নীচ, সে নীচ কর্ম করে। কিন্তু যিনি মহৎ, তাঁর পক্ষে কখনো নীচকর্ম করা সম্ভব নয়॥

২২. মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।

সংকেত : লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্যে মানুষকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। ব্রত পালনের সাহায্যে মৃত্যুবরণ করেছেন কত মহাপুরুষ। একনিষ্ঠ সাধনার দ্বারা মানুষের সংকল্প সফল হয়॥

২৩. সমুদ্রের পার আছে তল আছে তার,
অতল অপার মাতৃস্নেহ পারাবার।

সংকেত : মাতৃস্নেহের তুলনা নেই। মায়ের স্নেহ সীমাহীন—স্বর্গীয়। সন্তানের ওপর মায়ের স্নেহ অবারিত ধারায় ঝরে পড়ে॥

২৪. বোলতা কহিল, 'এ যে ক্ষুদ্র মউচাক,
এরি তরে মধুকর এত করে জাঁক!'
মধুকর কহে তারে, 'তুমি এসো ভাই,
আরো ক্ষুদ্র মউচাক রচো, দেখে যাই।'

সংকেত: পরশ্রীকাতর মানুষেরা অতি হীন। তারা যশস্বী ব্যক্তিদের যশকে সহ্য করতে পারে না। তাকে হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্যে তারা সদা সচেষ্ট।

২৫. আমার এ ধূপ না পোড়ালে
গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে,
আমার এ দীপ না জ্বালালে
দেয় না কিছুই আলো।

সংকেত: দুঃখই মানুষের হৃদয়কে সোনা করে, মানুষের প্রতিভার প্রকাশকে সম্ভব করে তোলে।

মধ্যশিক্ষা পর্ষতের পরীক্ষার প্রশ্ন-সম্ভার [উত্তর-সহ]

১৯৭৬

প্রথম পত্র

৪. স্বচ্ছন্দভাবে বাংলায় অনুবাদ কর :

With that age-long village plough Manik can be seen tilling the ground. But he is not making much headway. Look at him. Floods of perspirations are pouring in streams down his cheeks as he holds the plough by both his hands and scolds the bullocks at the top of his voice. The bullocks do not appear to like the idea of working. Every now and then they stand still. Manik catches the tails of the oxen, twists them with all his might and abuses the poor animals.

উত্তর : সেই মান্ধাতার আমলের গ্রাম্য লাঙ্গল দিয়ে মানিককে জমি চাষ করতে দেখা যায়। ওর কাজ খুব একটা এগোচ্ছে না। ওর দিকে তাকাও। দুহাত দিয়ে হাল চেপে ধরে চড়া গলায় বলদগুলোকে বকতে গিয়ে ওর দুগাল বেয়ে যেন ঘামের বন্যা ছুটছে। বলদগুলোকে দেখে মনে হয়, ওদের কাজ করার ইচ্ছে নেই। মাঝে মাঝে তারা স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে পড়ছে। মানিক বলদগুলোর লেজ ধরে প্রাণপণে মুচড়ে দিচ্ছে আর হতভাগ্য পশুগুলোকে গালমন্দ পাড়ছে ॥

৫. অন্ততঃ দশটি বাক্য সহযোগে নিম্নলিখিত অংশের ভাবার্থ বিস্তার কর :

আমি ভয় করব না, ভয় করব না।
দু'বেলা মরার আগে মরব না ভাই, মরব না।
তরীখানা বাইতে গেলে
মাঝে মাঝে তুফান মেলে।
তাই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে কান্নাকাটি করব না ॥

উত্তর : কর্মময় এই পৃথিবী। এখানে জীবন-ধারণের জন্যে প্রতিটি মানুষকে কোন-না-কোন কাজ করতে হয়। কিন্তু যে কোন কাজেই আছে বাধা, আছে

প্রতিবন্ধকতা। পরিশ্রম করে, দুঃখ-বেদনা সহ্য করে সেই সব বাধা জয় করতে হয়। তবেই জীবনে সাফল্য লাভ করা যায়। কিন্তু দুঃখ-কষ্ট-পরিশ্রমের ভয়ে কেউ যদি পৃথিবীর কাজ থেকে বিরত হয়, তবে প্রার্থিত সাফল্য জীবনেও লাভ করা যায় না। তেমনি যে কোন মহৎ কর্ম উদ্‌যাপনে দুঃখ আছে, কষ্ট আছে, আছে পরিশ্রমসাধ্য সংগ্রাম। দুঃখ-কষ্ট এবং পরিশ্রমের ভয়ে যদি কেউ সেই মহৎ কর্ম-উদ্‌যাপনের ব্রত থেকে নিরস্ত হয়, তাহলে কোনদিনই পৃথিবীতে কোন আদর্শের রূপায়ণ সম্ভব নয় সেই ব্যর্থ, পরাজিত, নিষ্ফল জীবন নিজের কাছেই বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই, ভয়ের গুহায় আত্মগোপন নয়, নিষ্ফলের ব্যর্থ ক্রন্দন নয়, চাই সংগ্রাম, কঠোর পরিশ্রম এবং সফল কর্মোদ্যোগ—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'॥

৬. প্রদত্ত সংকেতের সহায়তায় যে কোনো একটি বিষয় অবলম্বনে একটি প্রবন্ধ রচনা কর:

[ক] তোমার দেখা একটি মেলা ও ঐরূপ মেলার উপযোগিতা।

[মেলাটি শহরে, না গ্রামাঞ্চলে—কিরূপ পরিবেশ—মেলার দোকানপাট, প্রদর্শনী, যাত্রাগান, সভাসমিতি, প্রচার প্রভৃতির বর্ণনা—উহার বিশেষ আনন্দদানের দিক—স্কুলকলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা কোন্ কোন্ বিষয়ে উহাতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল—উহার জনকল্যাণের দিক—লোকসমাগমের বর্ণনা। ঐরূপ মেলার প্রয়োজনীয়তা।]

[প্রবন্ধ-সংকেত অংশে একটি গ্রাম্য মেলা দ্রষ্টব্য।]

[খ] কায়িক শ্রমের গৌরব ও তোমাদের কর্তব্য।

[সভ্যতা গঠনে মানসিক ও দৈহিক শ্রম উভয়েরই সমান গুরুত্ব—আমাদের কায়িক শ্রম-বিমুখতা, উহার প্রতি ঘৃণা ও তাহার বিষময় ফল—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্র—গান্ধীজীর বাস্তব আদর্শ—শ্রমজীবীদের মহিমা কীর্তনে স্বামী বিবেকানন্দ—কায়িক শ্রমে উৎপাদনের আনন্দ—ছাত্রজীবন হইতেই কায়িক শ্রমে অভ্যাস।]

[প্রবন্ধ-অংশে 'পরিশ্রমের মর্যাদা' দ্রষ্টব্য।]

[গ] একটি বিতর্ক-সভা ও উহা হইতে তোমার শিক্ষা।

[অনুষ্ঠানের স্থান ও সময়—বিতর্কের বিষয়—যোগদাতাদের পরিচয়—বিতর্ক আরম্ভ হওয়ার পূর্বেকার ব্যবস্থাপনা—এক এক বক্তার যুক্তি অন্য কর্তৃক খণ্ডনের সময় তোমাদের আনন্দ—বিতর্কের ফলাফল। সভাশেষে—তোমার শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা।]

[প্রবন্ধ-সংকেত অংশে 'বিতর্ক-সভা' দ্রষ্টব্য।]

দ্বিতীয় পত্র

৪. প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ী পাঠ্যগত ব্যাকরণ অংশের উত্তর দাও:

[যে কোন পাঁচটি]: ৫ × ২ = ১০

[ক] নিম্নরেখ অংশের পদ-পরিচয় দাও:

(অ) পাদুকা সৃষ্টির উদ্দেশ্য পদে পদে ব্যর্থ হইয়া উঠে।

(ব) বাটী বসিয়াও সেরূপ হইতে পারে।

উত্তর : (অ) **পদে পদে**—বিশেষ্য পদ, বহুবচন, ক্লীবলিঙ্গ, প্রথম পুরুষ, অধিকরণ কারকে 'এ' বিভক্তি।

(ব) **বাটী**—বিশেষ্য পদ, এক বচন, ক্লীবলিঙ্গ, প্রথম পুরুষ, অধিকরণ কারকে শূন্যবিভক্তি।

[খ] নিম্নে প্রদত্ত শব্দগুলির মধ্যে কোন্ দুইটি 'বিদেশী' তাহা জানাও :
দেউড়ী, ইস্পাত, থতমত, মরীয়া, তাজা।

উত্তর : ইস্পাত—বিদেশী শব্দ [পর্তুগীজ শব্দ]।
তাজা—বিদেশী শব্দ [ফারসী শব্দ]।

[গ] বাক্য দুইটিকে আরও সংক্ষেপে প্রকাশ কর :
(অ) পানার্থে জল প্রার্থনা করিলেন।
(ব) কোথাও তাহাদের কোন বাধা নাই।

উত্তর : (অ) পানীয় প্রার্থনা করিলেন।
(ব) তাহারা অবাধ।

[ঘ] সাধুরীতিতে রূপান্তরিত কর :
সেই দুপুর একটা অবধি বসে থাকতে হবে। চল্ আসবার দিন দেখাব।

উত্তর : সেই দ্বিপ্রহর এক ঘটিকা অবধি বসিয়া থাকিতে হইবে। চল, আসিবার দিবস দেখাইব।

[ঙ] এ—বিভক্তি-চিহ্ন প্রয়োগ করিয়া কী অর্থ বোঝানো হইয়াছে ?
(অ) **অশ্রুপূর্ণ নয়নে** তাহার পরিচয় দিলেন।
(ব) নির্বিঘ্নে দুইবেলা আহার ও ইংরাজী পড়া চলিতে লাগিল।

উত্তর : (অ) অশ্রুপূর্ণ নয়নের **দ্বারা** তাহার পরিচয় দিলেন।
(ব) নির্বিঘ্ন**ভাবে** দুইবেলা আহার ও ইংরেজী পড়া চলিতে লাগিল।

[চ] সমাসগুলি ভাঙ্গিয়া বাক্যটির পুনর্লিখন কর :
চঞ্চল রবিরশ্মিমালা প্রদীপ্ত হইয়া গগনপ্রান্তে মিশিয়াছে।

উত্তর : রবির চঞ্চল রশ্মির মালা প্রদীপ্ত হইয়া গগনের প্রান্তে মিশিয়াছে।

[ছ] প্রদত্ত দুইটি বাক্যে 'না' পদ দুইটির পার্থক্য নির্দেশ কর :
(অ) সেদিন দেখলেন না ?
(ব) হুজুরের হুকুম হলে আমি না বলতে পারি না।

উত্তর : (অ) না—বাক্যালঙ্কার অব্যয়।
(ব) না—বিশেষ্য পদ। না—নঞর্থক অব্যয়।

৫. যে কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ৫ × ৫ = ২৫

[ক] নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে কোন্ কোন্ সমাস হইয়াছে তাহা লিখ :
বাচস্পতি, অবিধেয়, দুঃসহ, বেসরকারী, নাড়িভুঁড়ি।

উত্তর : বাচস্পতি = বাচঃ [বাক্যের] পতি = ষষ্ঠীতৎ পুরুষ।
অবিধেয় = নয় বিধেয় = নঞ্‌তৎপুরুষ।
দুঃসহ = দুঃসাধ্য সহন যার = বহুব্রীহি।
বেসরকারি = নয় সরকারি = নঞ্‌তৎপুরুষ।
নাড়ীভুঁড়ি = নাড়ী ও ভুঁড়ি = দ্বন্দ্ব।

[খ] প্রতিটি শব্দের যে যে বর্ণে সন্ধি হইয়াছে, কেবল সেই বর্ণ '+' চিহ্ন দিয়া লিখ : দেবর্ষি, প্রত্যাশিত, সংগত, মনোহর, মাঘোৎসব

উত্তর : দেবর্ষি = অ + ঋ ; প্রত্যাশিত = ই + আ ; সংগত = ম্ + গ ,
মনোহর = ঃ + হ ; মাঘোৎসব = অ + উ।

[গ] ইংরেজি শব্দগুলি বাংলা লিপিতে লিখ :
Translation, Tradition, Steamer, Station, Machine.

উত্তর : ট্রান্‌স্লেশন, ট্র্যাডিশন, স্টীমার, স্টেশন, মেশিন।

[ঘ] নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দৃষ্টান্ত দাও : সংযুক্ত ক্রিয়াপদ, অনুসর্গ, বিধেয় বিশেষণ, অনুজ্ঞা বুঝাইতে ভবিষ্যতের রূপ কৃৎপ্রত্যয়।

উত্তর : **সংযুক্ত ক্রিয়াপদ**—'চলে যায়' মরি হায়, বসন্তের দিন।
অনুসর্গ—ব্যথা মোর উঠিবে জলে ঊর্ধ্ব-**পানে**।
বিধেয় বিশেষণ—'হে কাশী, করীশ দলে তুমি **পুণ্যবান্**।'
অনুজ্ঞা বুঝাইতে ভবিষ্যতের রূপ—'নিত্য যাহা পড়িবে নিত্য তাহা অভ্যাস **করিবে**।
কৃৎ প্রত্যয়—'আমি ভীম **ভাসমান** মাইন।'

[ঙ] প্রদত্ত শব্দ-যুগ্মকগুলির অর্থের পার্থক্য নির্দেশ কর :
রবীন্দ্র, রবীন্দু ; প্রকৃত, প্রাকৃত ; কাঁদুনে, কাঁদানে ; দশরথী, দাশরথি ; অবমান, উপমান।

উত্তর : **রবীন্দ্র** [রবি + ইন্দ্র]—শ্রেষ্ঠ সূর্য।
রবীন্দু [রবি + ইন্দু]—সূর্য ও চন্দ্র।
প্রকৃত—যথার্থ।
প্রাকৃত—প্রাকৃতিক, লৌকিক।
কাঁদুনে—যে কাঁদে। [যেমন—'কাঁদুনে ছেলে']
কাঁদানে—যা কাঁদায় [যেমন—'কাঁদানে গ্যাস']
দশরথী—দশজন রথী।
দাশরথি—দশরথের পুত্র।
অবমান—অপমান।
উপমান—তুলনা।

[চ] বাচ্য পরিবর্তন কর :

(ক) আমি যাইব, (খ) তুমি কখন এলে ? (গ) আসুন, বসুন, (ঘ) তিনি ইস্কুলে ছেলেদের পুরস্কার দিতেন। (ঙ) আর কি কোথাও ফিরে পাব সে জীবন ?

আমি যাইব—কর্তৃবাচ্য।
আমার যাওয়া হইবে—ভাববাচ্য।
তুমি কখন এলে ?—কর্তৃবাচ্য।
তোমার কখন আসা হলো ?—ভাববাচ্য।
আসুন, বসুন—কর্তৃবাচ্য।
[আপনার] আসা হউক, বসা হউক—ভাববাচ্য।
তিনি ইস্কুলের ছেলেদের পুরস্কার দিতেন—কর্তৃবাচ্য।
তাঁহার কর্তৃক ইস্কুলের ছেলেরা পুরস্কৃত হইত—কর্মবাচ্য।
আর কি কোথাও ফিরে পাব সে জীবন ? - কর্তৃবাচ্য।
আর কি কোথাও ফিরে পাওয়া যাবে সে জীবন ?—ভাববাচ্য।

[ছ] 'এ, তে, দের, রা, কে'—এই বিভক্তিগুলির প্রয়োগ দেখাইয়া পাঁচটি বাক্য রচনা কর।

উত্তর : এ—'**আকাশে বাতাসে** আমন্ত্রণ।'
তে—'**বুলবুলিতে** ধান খেয়েছে।'
দের—'**আমাদের** শান্তিনিকেতন **আমাদের** সব হতে আপন।'
রা—'**বন্যেরা** বনে সুন্দর, **শিশুরা** মাতৃক্রোড়ে।'
কে—'**নদীকে** প্রশ্ন করিলাম।'
